সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

➤ নিঃসঙ্গ গ্রহচারী ➤ ক্রোমিয়াম অরণ্য ➤ ত্রিনিত্রি রাশিমালা ➤ অনুরন গোলক ➤ নয় নয় শূন্য তিন ➤ পৃ ➤ রবোনগরী ➤ টুকি এবং ঝায়ের (প্রায়) দুঃসাহসিক অভিযান

'কালজয়ী' সাহিত্য সৃষ্টির নাছোড় বাসনা নিয়ে যাঁরা দিনরাত গলদঘর্ম হন, মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁদের দলের নন। তিনি সোজাসাপ্টা বলেন, "আমার নিজের গল্প শুনতে ভালো লাগে, তাই আমি আমার লেখায় সব সময়েই একটা গল্প বলার চেষ্টা করি।" কিন্তু তার জন্যে সায়েন্স ফিকশান কেন? এই 'কেন'র কোনো কৈফিয়ত নেই—এটা একেবারেই লেখকের নিজস্ব নির্বাচনের ব্যাপার।

আর কেনই-বা নয়? বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে যাঁরা সাহিত্যের পঙক্তিতে বসাতে রাজি নন, তাঁদের অর্থহীন গোঁয়ার্তুমিকে আজ আর আমল না দিলেও চলে। প্রযুক্তি, সৃষ্টিতত্ত্ব, মহাকাশবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় উন্নতি আজকের পৃথিবীতে ঘটেছে ও ঘটছে আর তারই ফলে জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির যে মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে তাতে সায়েন্স ফিকশান হয়ে উঠছে মানুষেরই কথকতা। আর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী মানেই তো লাগামছাড়া কল্পনার ঘোড়া নয়, বৈজ্ঞানিক সূত্র ও সম্ভবপরতার সংগতি সবসময়েই ভালো সায়েন্স ফিকশানে থাকে।

যেমন থাকে মুহম্মদ জাফর ইকবালের রচনায়। তাঁর রচনায় রোমাঞ্চ থাকে; সে রোমাঞ্চ মানুষের প্রায়-অকল্পনীয় ভবিষ্যতের ছবিটার মধ্যে অব্যর্থভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। সেই সঙ্গে যে জিনিসটি তাঁর সায়েন্স ফিকশানকে বাংলাদেশে, বলা যায় বাংলা ভাষাতেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে তা হল—তার মর্মস্পর্শী মানবিকতা। প্রীতি, বিদ্বেষ, কৌতুক, বিষাদ—এই সব বিচিত্র রসে তাঁর কাহিনীর মানব-চরিত্রেরা তো বটেই, কৃত্রিম বা কল্পিত চরিত্রেরাও হয়ে ওঠে রক্তমাংসের মানুষ, যাদের প্রতি আমাদের দ্বিধাহীন সহমর্মিতা গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে থাকে স্বচ্ছন্দ গদ্যের পাশাপাশি শিল্পগত বাঁধুনি। সব মিলিয়ে জাফর ইকবালের রচনাগুলো শুধু আকর্ষণীয় কাহিনীর রোমাঞ্চকর বিন্যাসই নয়, একই সঙ্গে সার্থক গল্প বা উপন্যাসও হয়ে ওঠে।

ছাত্রজীবনেই শখের বশে কল্পবিজ্ঞান লেখা শুরু করেছিলেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। আর আজ তিনি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক ও জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশান লেখক। বিজ্ঞানী বলেই বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও তার অন্তর্গত মানবিকতা যেমন তিনি জানেন, তেমনি জানেন তার বিপথগামিতার অজস্র উদাহরণ এবং তার ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের আশঙ্কার কথাও। তাই তাঁর রচনায় পৃথিবী ও মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা ও আশঙ্কা—দুই-ই প্রকাশ পায়।

এই গ্রন্থের রচনাসমূহ লেখকের কল্পনার সমৃদ্ধির সাথে যৌক্তিক সম্ভবপরতার সংযত মিশ্রণে, স্বাদ ও কাহিনীর বৈচিত্র্যে, নানা রকমের চরিত্রের আনাগোনায় অনন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পি. এইচ. ডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

২

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ১৯৯৮
সপ্তম মুদ্রণ : মে ২০০৩
অষ্টম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৪
নবম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৬
দশম মুদ্রণ : জুন ২০০৭
একাদশ মুদ্রণ : জুলাই ২০০৮
দ্বাদশ মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৯
ত্রয়োদশ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১০
চতুর্দশ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১
পঞ্চদশ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১২
ষোড়শ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩
সপ্তদশ মুদ্রণ : মে ২০১৪

প্রচ্ছদ : বিদেশী চিত্র অবলম্বনে

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
নূর-ই-মোনতাকিম আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 042 - 5

SCIENCE FICTION SAMAGRA VOL II [A Collection of Science Fiction]
by Muhammed Zafar Iqbal
Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (Ist floor). Dhaka-1100
Seventeenth Edition : May 2014. Price : Taka 450.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : www.abosar.com, www.protikbooks.com
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
Online Distributor | www.rokomari.com, Phone : 16297, 01833168190
| [illegible] Phone : +88 096 11 55 77 88
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভূমিকা

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন প্রায় খেলাচ্ছলে সায়েন্স ফিকশান লেখা শুরু করেছিলাম। কোনো কোনো পাঠক সেই বিচিত্র লেখা পড়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করতেন, এটা আবার কী ধরনের লেখা? আজ প্রায় দুই যুগ পরে সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সায়েন্স ফিকশানের অনেক পাঠক তৈরী হয়েছে, তাঁরা সাগ্রহে এবং সস্নেহে সায়েন্স ফিকশান পড়েন। তাঁরা অবিশ্যি এখনো ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন, তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে, লেখাটি কি খাঁটি সায়েন্স ফিকশান হয়েছে নাকি এখনো আধিভৌতিক, পরাবাস্তব ফ্যান্টাসির জালে আটকা পড়ে আছে—প্রশ্নটি হয় তার বিশ্লেষণ করার জন্যে!

সায়েন্স ফিকশানের এই পাঠকদের কেউ কেউ পুরো ব্যাপারটাকে খুব সিরিয়াস ভাবে নেন। তাঁরা সায়েন্স ফিকশানকে নিয়ে হাসি–তামাশা পছন্দ করেন না, এর অবহেলা অনাদর সহ্য করেন না। তাদের কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেন যে দেশের কোনো কোনো বিদগ্ধ সাহিত্যিক সায়েন্স ফিকশানকে সাহিত্য হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে রাজি নন।

আমি অবশ্যি জানতাম না যে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করার জন্যে বড় বড় রাস্তা রয়েছে, এবং সেই সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক ধরনের 'ট্রাফিক পুলিশ' মুখে বাঁশি এবং হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন; কেউ এই প্রচলিত রাস্তা ব্যবহার না করে অন্যভাবে এই জগতে প্রবেশ করতে চাইলেই তারা লাঠি নেড়ে বাঁশি ফুঁকে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে দেন! যদি সত্যি সেরকম হয়ে থাকে, আমি অবিশ্যি এর বাইরে থাকাই নিরুপদ্রব মনে করব। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত সাহিত্যের জগৎটি উচ্চ দেয়াল এবং কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা নয়, প্রচলিত রাস্তায় না গিয়েও ছোট ছোট গলিঘুপচি দিয়ে এমনকি ঝোপঝাড় ভেঙেও এর মাঝে প্রবেশ করা সম্ভব। যে লেখা বারবার পড়া যায় সেটিই সাহিত্য—এই 'পাশ' হাতে নিয়ে এর আগেও অনেকে সাহিত্যের জগতে ঢুকে গেছেন, হাতে লাঠি এবং মুখে বাঁশি নিয়ে তাদের বাইরে আটকে রাখার চেষ্টা করে কখনোই কোনো লাভ হয় নি। আমি অবিশ্যি কখনো এই ধরনের গুরুতর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই না; আমার নিজের গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে খুব ভালো লাগে, তাই আমি আমার লেখায় সব সময়েই একটা গল্প বলার চেষ্টা করি। যাঁরা গল্প লিখতে পছন্দ করেন এবং যাঁরা গল্প শুনতে পছন্দ করেন তাঁদের নিয়ে আমার নিরিবিলি একটি পাঠক-লেখক জগৎ আছে, সেখানে সাহিত্যিকের ট্রাফিক পুলিশেরা কখনো লাঠি হাতে বাঁশি ফুঁকে চলে আসবেন না, সেটাই আমার একমাত্র কামনা।

সায়েন্স ফিকশানের পাঠকেরা মাঝেমাঝেই আমার লেখায় চরিত্রের নামগুলি সম্পর্কে জানতে চান। কেন আমি দেশী নাম ব্যবহার না করে বিদেশী নাম ব্যবহার করি সেটা নিয়ে কেউ কেউ অনুযোগ করেছেন। ক্ষুব্ধ পাঠকদের সবিনয় জানাতে চাই যে নামগুলি বিদেশী নয়, বেশিরভাগ সময়েই এগুলি অর্থহীন কিছু ধ্বনির সমষ্টি। কোনো একটি সায়েন্স ফিকশান লেখার সঙ্গে কাহিনীর প্রেক্ষাপটের মিল রেখে, পরিচিত শব্দকে ভেঙেচুরে, অপরিচিত শব্দকে উল্টেপাল্টে কিছু ধ্বনি বের করে এনে কিছু নাম সৃষ্টি করার চেষ্টা করি। চরিত্রের সাথে খাপ খাইয়ে কিছু নাম হয় সহজ-সরল, কিছু হয় জটিল, কিছু হয় খটমটে যান্ত্রিক—এর বেশি কিছু নয়।

এই সংকলনে যে আটটি সায়েন্স ফিকশান রয়েছে তার প্রথমটি—'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী', যুক্তরাষ্ট্রে বসে লেখা। একদিন জোছনা রাতে ঘুমুতে যাবার সময় জানালার সামনে দাঁড়িয়েছি, বাইরে বরফে ঢাকা জনমানবহীন প্রান্তর দেখে হঠাৎ এক ধরনের নিঃসঙ্গতার কথা মনে হয়। একটি মানুষ একাকী এক নির্জন গ্রহে আটকা পড়ে আছে—সেই কাহিনী নিয়ে একটি গল্প লিখার ইচ্ছে করল, সেটা থেকে জন্ম নিয়েছে 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী'। বইটি আমার খুব প্রিয়। আমার লেখায় কোনো 'রোমান্স' থাকে না বলে অনেক পাঠকের অভিযোগ রয়েছে। এই বইটি দেখিয়ে আমি অনেক সময় দুর্বলভাবে সেই অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করি। খাঁটি সায়েন্স ফিকশান পাঠকেরা সম্ভবত রোমান্সকে খুব অপছন্দ করেন, তাঁরা প্রায় নিয়মিত ভাবে আমাকে এই বইটির জন্যে অভিশম্পাত দিয়ে থাকেন।

'ক্রোমিয়াম অরণ্য' এবং 'ত্রিনিত্রি রাশিমালা' যখন প্রকাশিত হয় আমি তখন পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে এসেছি। বলা যেতে পারে এই বই দুটি আমার প্রথম বই যেখানে আমি প্রচ্ছদ নির্বাচন করতে পেরেছি এবং বইয়ের প্রুফ দেখতে পেরেছি। বই দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। ক্রোমিয়াম অরণ্য লেখা হয়েছে বিজ্ঞানের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের আতঙ্কবোধ থেকে। সারাজীবন যেহেতু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কাছাকাছি কাটিয়েছি, এর গোপন এবং কুটিল দিকটিও অসংখ্যবার চোখে পড়েছে। আমি জানি আমাদের সভ্যতা যত দ্রুত গড়ে উঠেছে এটি তার থেকেও দ্রুত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বিজ্ঞানের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। 'ক্রোমিয়াম অরণ্যে' সেই বোধটুকুই উঠে এসেছে, যদিও মূল কাহিনী অনেক পুরানো—মানুষ এবং যন্ত্রের মাঝে বিরোধ।

'ত্রিনিত্রি রাশিমালা'র মূল কাহিনী একটি বিচিত্র অসুস্থ চরিত্রকে ঘিরে। আমার ধারণা সবার ভিতরেই মাঝে মাঝে অন্য এক ধরনের বোধ কাজ করে, যখন ইচ্ছে করে ভয়ংকর হিংস্র পৈশাচিক একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে। আমাদের চারপাশে হঠাৎ হঠাৎ আমরা যে এরকম দানবকে জন্ম নিতে বা সৃষ্টি করতে দেখি না তা নয়, কিন্তু কাগজের পৃষ্ঠায় তাদের বন্দি করে ফেলার আনন্দটুকু মনে হয় শুধু লেখকেরাই পেতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান লেখার জন্যে যে বিষয়টি প্রায় সব লেখকই কখনো-না-কখনো বেছে নিয়েছেন সেটি হচ্ছে মহাজাগতিক কোনো এক বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব। আমি নিজেও মাঝে মাঝে তার চেষ্টা করেছি, প্রতিবারই চেষ্টা করেছি প্রাণীটিকে একেবারে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করতে—'নয় নয় শূন্য তিন' তার একটি উদাহরণ। এই বইটি নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি সেটি বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, বইটির নাম নিয়ে। প্রশ্নটি হচ্ছে : একটি সংখ্যা দিয়েই যদি আমি বইটির নাম দিতে চেয়েছি তাহলে সেটি সংখ্যায় ৯৯০৩ না লিখে কথায় 'নয় নয় শূন্য তিন' কেন লিখলাম। উত্তরটি সহজ, সংখ্যায় ৯৯০৩ লিখলে বইটির নাম কারো কাছে হত 'নয় হাজার নয় শ তিন', কারো কাছে হত 'নিরানব্বই শ তিন'! আমি সেটা চাই নি, চেয়েছি নামটি হোক—'নয় নয় শূন্য তিন'!

আমার সায়েন্স ফিকশানের বেশিরভাগ লেখালেখিই উপন্যাসে—ছোটগল্প লিখেছি কম। দেশে ফিরে আসার পর পত্র-পত্রিকায় কিছু লিখতে হয়েছে, সেগুলি সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে 'অনুরন গোলক'। এই বইটির গল্পগুলিতে কল্পনার দৌড় সম্ভবত অন্য বই থেকে অনেক বেশি, পাঠকদের অনেকেই সে কথা ভ্রুকুটি দিয়ে বা সকৌতুকে আমাকে অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমার অনেকদিনের শখ আন্তঃমহাজাগতিক যাত্রা নিয়ে একটি সায়েন্স ফিকশান লেখার। যে বিশাল ক্যানভাসে তার কাহিনীকে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটি গুছিয়ে নেয়া হয় নি বলে লিখতে গিয়ে বারবার কলম গুটিয়ে এনেছি। 'পৃ'-তে বিশাল মহাজগৎ নিয়ে লিখতে গিয়ে লিখেছি বিশাল মহাকাশযান নিয়ে। পাঠক বইটিকে সাদরে গ্রহণ করেছে—সেটি তার বিষয়বস্তুর জন্যে নাকি 'ম্যাজিক আই' পদ্ধতিতে আঁকা ত্রিমাত্রিক প্রচ্ছদের জন্যে, আমি নিশ্চিত নই। এর সাথে একটি ব্যাপার না বললেই নয়, আমার সায়েন্স ফিকশানগুলির বেশির ভাগের প্রচ্ছদই এঁকেছেন ধ্রুব এষ। সায়েন্স ফিকশানের গভীরে গিয়ে তার ভেতর থেকে প্রচ্ছদে ব্যবহারের জন্যে যে ছবিটি তিনি বের করে আনেন সেগুলির কোনো তুলনা নেই। 'সায়েন্স ফিকশান সমগ্র'তে ধ্রুব এষের ভিন্ন ভিন্ন প্রচ্ছদগুলি থাকবে না বলে আমি কিছু পাঠককে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনেছি।

'রবোনগরী' সায়েন্স ফিকশান গল্পের সংকলন। এই বইয়ে ঈশ্বর-সংক্রান্ত গল্পটি আমার বেশ প্রিয় গল্প। যদিও গল্পটির পাত্রপাত্রীরা যান্ত্রিক রবোট কিন্তু এটি লেখা হয়েছে আমাদের দেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ে।

'টুকি এবং ঝায়ের (প্রায়) দুঃসাহসিক অভিযান' একটি লঘু সায়েন্স ফিকশান। সায়েন্স ফিকশানের গুরুগম্ভীর পাঠকেরা আমার এই ধরনের লেখা দেখে খুব বিরক্ত হয়ে থাকেন এবং সেটা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন না। তবে আশার কথা, আমার মতো অনেকেই এ ধরনের তামাশা থেকে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পান। গুরুগম্ভীর পাঠকেরা যত অপছন্দই করুন না কেন, আমি যে মাঝে মাঝেই এ ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সায়েন্স ফিকশান সমগ্রের প্রথম খণ্ড বের হতে সময় লেগেছে আঠার বৎসর। দ্বিতীয়টি বের হয়েছে মাত্র চার বৎসরের মাথায়, তুলনামূলকভাবে যে আজকাল অনেক বেশি সায়েন্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিকশান লিখছি সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটি ভালো হল না মন্দ হল জানি না, কিন্তু এর পিছনে যে পাঠকদের দাবিটুকুরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতীক প্রকাশনার আলমগীর রহমানের কাছে, যিনি এদেশে সায়েন্স ফিকশানের পাঠক সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই আমাকে দিয়ে সায়েন্স ফিকশান লিখিয়ে নিয়েছেন। ক্ষমা চাইছি আমার পরিবারের সদস্যদের কাছে, তাঁদেরকে প্রাপ্য সময়টুকু না দিয়ে ঘাড় গুঁজে কাগজের উপর বলপয়েন্ট কলম ঘষে যাবার জন্যে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৬ অক্টোবর ১৯৯৭
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

নিঃসঙ্গ গ্রহচারী ১
ক্রোমিয়াম অরণ্য ৬৫
ত্রিনিত্রি রাশিমালা ১৩৯
অনুরন গোলক ১৯৫
নয় নয় শূন্য তিন ২৬১
পৃ. ৩২৭
রবোনগরী ৩৮৯
টুকি এবং ঝায়ের (প্রায়) দুঃসাহসিক অভিযান ৪৪৭
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গ গ্রহচারী

উৎসর্গ

শাহরিয়ার কবির

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাকী কিশোর

সুহান হাতের উপর মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আকাশের রং নীলাভ কিন্তু নীল নয়। স্বচ্ছ কাচের মতো। পৃথিবীর আকাশ নাকি নীল। গাঢ় নীল। সে কখনো পৃথিবী দেখে নি কিন্তু তবু সে জানে। তাকে ট্রিনি বলেছে। ট্রিনি তাকে আরো অনেক কিছু বলেছে। পৃথিবীর নীল আকাশে নাকি সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। কখনো কখনো সেই মেঘ নাকি পুঞ্জীভূত হয়ে আসে, বিদ্যুতের ঝলকানিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যায়, তারপর নাকি আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসে। দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি জন্ম দেয় গাছ। ট্রিনি বলেছে, পৃথিবীর গাছ নাকি সবুজ। গাঢ় সবুজ। সেই গাছে নাকি ফুল হয়। বিচিত্র রঙিন সব ফুল। ট্রিনি সব জানে। ট্রিনিকে পৃথিবীতে তৈরি করা হয়েছিল, তার কপোট্রনের ক্রিস্টাল ডিস্কে পৃথিবীর সব খবর রাখা আছে। ট্রিনি একটু একটু করে সুহানকে সব বলেছে। সুহান জানতে চায় না, তবু সে বলেছে। সুহানকে নাকি জানতে হবে। সুহান মানুষ। মানুষের জন্মগ্রহ পৃথিবী। তাই সব মানুষকে নাকি পৃথিবীর কথা জানতে হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর কথা ভাবতে হয়।

সুহান তাই পাথরের উপর শুয়ে শুয়ে কখনো কখনো পৃথিবীর কথা ভাবে। ভাবতে চায় না, তবু সে ভাবে। ট্রিনি বলেছে, তাকে ভাবতে হবে। পৃথিবীর কথা ভাবতে হবে, মানুষের কথা ভাবতে হবে। ভেবে ভেবে তাকে সত্যিকার মানুষের মতো হতে হবে। যদি কোনোদিন মানুষের সাথে দেখা হয় তারা যেন সুহানকে দেখে চমকে না ওঠে। ভয় পেয়ে চিৎকার না করে ওঠে।

সুহান এক সময় ট্রিনির কথা বিশ্বাস করত। ভাবত, সত্যিই বুঝি তার একদিন মানুষের সাথে দেখা হবে। দেখা হলে কী বলবে সব ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু তার মানুষের সাথে দেখা হয় নি। সে জানে কোনোদিন মানুষের সাথে তার দেখা হবে না। স্বচ্ছ কাচের মতো নীলাভ আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একদিন তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। দুই সূর্যের এই গ্রহটিতে কোনোদিন মানুষ ফিরে আসবে না। কখনো আসবে না।

সুহান পাশ ফিরে শোয়। তার দেহের রং উজ্জ্বল স্বর্ণের মতো। তার মাথায় কুচকুচে কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার শরীর সুঠাম, পেশিবহুল। তার বিস্তৃত বক্ষ, দীর্ঘ দেহ। তার দীর্ঘ চোখ, চোখের রং রাতের আকাশের মতো কালো। ট্রিনি বলে, তার চেহারা নাকি অপূর্ব সুন্দর। সুহান সেটা জানে না। মহাকাশের এক প্রান্তে নির্জন গ্রহের একটি একাকী কিশোরের কাছে সৌন্দর্যের কোনো অর্থ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহান প্রায় নগ্ন দেহে পাথরের উপর শুয়ে আছে। তার দেহ অনাবৃত, শুধু ছোট এক টুকরো নিও পলিমারের কাপড় তার কোমর থেকে ঝুলছে। এই গ্রহে সুহান ছাড়া আর কোনো মানুষই নেই। তার নগ্নতা ঢেকে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু সে ঢেকে রাখে। ট্রিনি বলেছে, মানুষ হলে নগ্নতা ঢেকে রাখতে হয়। ট্রিনির কথা সে বিশ্বাস করে না, তার সাথে সে অবিরাম তর্ক করে। কিন্তু তর্ক করেও সে ট্রিনির কথা শোনে। এই গ্রহে ট্রিনি ছাড়া তার কথা বলার আর কেউ নেই।

সুহান শুয়ে শুয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে। বহুদূরে নীল পাহাড়ের সারি। ওই পাহাড়গুলোর কোনো কোনোটা আগ্নেয়গিরি। সময় সময় ভয়ঙ্কর গর্জন করে অগ্ন্যুৎপাত হয়। মাটি থরথর করে কাঁপে, আকাশ কালো হয়ে যায় বিষাক্ত ধোঁয়ায়, গলিত লাভা বের হয়ে আসে ক্রুদ্ধ নিশাচর প্রাণীদের মতো। এখন পাহাড়গুলো স্থির হয়ে আছে। ট্রিনি বলেছে, পৃথিবীর পাহাড় হলে ওই পাহাড়ের চূড়ায় শুভ্র তুষার থাকত। এটা পৃথিবী নয়, তাই দূর পাহাড়ের চূড়ায় কোনো শুভ্র তুষার নেই। এই গ্রহটি পৃথিবীর মতো নয় কিন্তু এটাই সুহানের পৃথিবী, সুহানের গ্রহ। তার নিজের গ্রহ। যে গ্রহে ট্রিনি তাকে বুকে আগলে বড় করেছে। সুহান দীর্ঘ সময় দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে এক সময় ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করল। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ তার বুকের মাঝে বিচিত্র এক অনুভূতি হয়। সে এই অনুভূতির অর্থ জানে না। কাউকে সে এই অনুভূতির কথা বলতে পারবে না। ট্রিনি অনুভূতির অর্থ জানে না। ট্রিনি একটি রবোট। দ্বিতীয় প্রজাতির রবোট। তার কপোট্রনে অসংখ্য তথ্য কিন্তু বুকে কোনো অনুভূতি নেই।

সুহান।

সুহান চোখ খুলে তাকাল। তার পায়ের কাছে ট্রিনি দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ ধাতব দেহ। সবুজাভ ফটোসেলের চোখ। ভাবলেশহীন যান্ত্রিক মুখ।

কী হল ট্রিনি?

তুমি অনেকক্ষণ থেকে শুয়ে আছ সুহান।

হ্যাঁ ট্রিনি।

ওঠ। প্রথম সূর্য ডুবে গেছে। একটু পরেই দ্বিতীয় সূর্য ডুবে যাবে।

যাক।

খুব অন্ধকার হবে আজ।

হোক।

সব নিশাচর প্রাণী বের হবে সুহান।

হোক। আমি কোনো নিশাচর প্রাণীকে ভয় পাই না ট্রিনি।

এ রকম বলে না সুহান। নিশাচর প্রাণীকে ভয় পেতে হয়। অর্থহীন দম্ভ ভালো নয়।

কেন ভালো নয়।

দাম্ভিক মানুষকে কেউ পছন্দ করে না সুহান।

সুহান বিষণ্ণ গলায় মাথা নেড়ে বলল, এখানে আর কেউ নেই ট্রিনি। আমাকে পছন্দ করারও কেউ নেই। অপছন্দ করারও কেউ নেই।

কিন্তু কেউ যদি আসে?

সুহান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কেউ আসবে না।

কেন আসবে না? আমরা তো এসেছিলাম। তোমার মা এসেছিল। তোমার মায়ের গর্ভে করে তুমি এসেছিলে। একটি মহাকাশযান ভরা মানুষ এসেছিল।

ইচ্ছে করে তো আস নি। আশ্রয় নিতে এসেছিলে। আবার কেউ আসবে আশ্রয় নিতে।

AMARBOI.COM

ছাই আসবে। যদি আসে আবার তাদের মহাকাশযান ধসে পড়বে। আবার সবাই শেষ হয়ে যাবে।

তুমি তো শেষ হও নি।

আমার মায়ের পেট কেটে আমাকে তুমি যদি বের না করতে, আমিও শেষ হয়ে যেতাম।

ট্রিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, সুহান, ওই কথা থাক।

কেন ট্রিনি?

আমি দেখেছি, এই আলোচনা তোমার ভালো লাগে না।

আমার মাঝে মাঝে কিন্তু ভালো লাগে না ট্রিনি।

ছিঃ সুহান, এভাবে কথা বলে না। ছিঃ। একটা জীবন হচ্ছে একটা সংগ্রাম, একটা যুদ্ধ। যার যুদ্ধ যত কঠিন তার জীবন তত অর্থবহ। তোমার মতো এ রকম যুদ্ধ করে আর কে বেঁচে আছে বল? কেউ নেই।

ছাই যুদ্ধ!

ছিঃ সুহান, এ রকম বলে না।

কী হয় বললে?

এগুলো হচ্ছে মন খারাপ করার কথা। মন খারাপ করার কথা বলতে হয় না। একজন মন খারাপ করার কথা বললে অন্যজনেরও মন খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু তুমি তো রবোট। তোমার তো মন খারাপ হয় না।

হ্যাঁ, আমার মন খারাপ হয় না।

তাহলে তুমি কেন বলছ? তুমি কেন মানুষের মতো ব্যবহার করছ?

ট্রিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে মানুষের মতো ব্যবহার না করি, তুমি কোনোদিন জানবে না কেমন করে মানুষের সাথে কথা বলতে হয়। তুমি সব ভুল কথা বলে মানুষের মনে দুঃখ দিয়ে দেবে। তোমার সাথে কথা বলে মানুষের মন খারাপ হয়ে যাবে।

আমার কোনোদিন মানুষের সাথে দেখা হবে না। সুহান একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কের মতো বলল, আমার কোনোদিন মানুষের সাথে দেখা হবে না।

ছিঃ সুহান, এভাবে কথা বলে না, ছিঃ! নিশ্চয়ই দেখা হবে।

সুহান ট্রিনির কথার উত্তর না দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইল। দ্বিতীয় সূর্যটি পাহাড়ের আড়ালে ঢেকে গেছে। একটু পরেই গ্রহটি গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে।

২

পাথর বেয়ে নামতে নামতে সুহান তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকায়। দ্বিতীয় সূর্য অস্ত যাবার পর হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। চারদিকে ইনফ্রা রেড আলো রয়েছে, বেশ খানিকটা আলট্রা ভায়োলেট আলো আছে। ট্রিনি পরিষ্কার দেখতে পায়, কিন্তু সুহান কিছু দেখতে পায় না। মানুষের চোখ এই আলোতে সংবেদনশীল নয়। কে জানে, মানুষের যদি এই গ্রহে জন্ম হত তাহলে হয়তো এই আলোতে তাদের চোখ সংবেদনশীল হত। কিন্তু মানুষের এই গ্রহে জন্ম হয় নি।

AMARBOI.COM

ট্রিনি নিচু গলায় বলল, সুহান।

কী হল?

তুমি ইনফ্রা রেড চশমাটি পরে নাও, তাহলে দেখতে পাবে। না দেখে তুমি কেমন করে যাচ্ছ? নাও—

না।

কেন নয়?

আমি আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি। ওই যে ডান দিকে একটা ক্লিও–৩২ বসে আছে। ঠিক কি না?

ঠিক, কিন্তু ইনফ্রা রেড চশমাটি পরে নাও, তাহলে আবছা নয়, স্পষ্ট দেখতে পাবে।

আমি পরতে চাই না ট্রিনি।

কেন নয়?

আমি যন্ত্রে অভ্যস্ত হতে চাই না।

কেন নয় সুহান?

যন্ত্র কেমন করে কাজ করে জানতে আমার ভালো লাগে, কিন্তু ব্যবহার করতে ভালো লাগে না।

মানুষ মাত্রই যন্ত্র ব্যবহার করে সুহান। পৃথিবীর মানুষ সবসময় অসংখ্য যন্ত্র ব্যবহার করে। তোমাকেও ব্যবহার করতে হবে।

আমার যদি দরকার হয়, করব। কিন্তু এখন তো দরকার নেই। আমি তো আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে উত্তাপ থেকে বুঝতে পারি। সামনে আরেকটা নিওফিলিস রয়েছে, ঠিক কি না?

ঠিক।

ক্লিও–৩২টা নিওফিলিসের দিকে আসছে। মনে হয় নিওফিলিসটার কপালে দুঃখ আছে। খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নেবে।

মনে হয়।

ডান দিক দিয়ে ঘুরে যাই, ক্লিও–৩২ প্রাণীটা একেবারে নির্বোধ। ভুল করে আমাকে না খামচে দেয়।

সুহান ডান দিক দিয়ে সরে গিয়ে পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে থাকে। তার চারপাশে ইনফ্রা রেড আলোর জগতে একটি জীবন্ত গ্রহ। অসংখ্য জীবন্ত প্রাণী। নিশাচর প্রাণী। সুহান আর ট্রিনি মিলে প্রাণীগুলোর একটা তালিকা তৈরি করেছে। বেশিরভাগই নিরীহ প্রাণী, গোটা চারেক ঠিক নিরীহ নয়। এদের মাঝে একটি প্রাণীকে মোটামুটি ভয়াবহ বলা যায়। সুহান নাম দিয়েছে লুতুন। লুতুনের আকার বেশি বড় নয় কিন্তু মনে হয় প্রাণীটির খানিকটা বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। অন্যান্য প্রাণী থেকে এটা অনেক দ্রুতগামী। সুহান ঠিক নিঃসন্দেহ নয় কিন্তু তার মনে হয় প্রাণীটা তাকে মাঝে মাঝেই আক্রমণ করার চেষ্টা করে। প্রাণীটা এই গ্রহের অন্যান্য প্রাণীদের মতোই, কিন্তু ট্রিনি দাবি করে, এই গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর প্রাণী থেকে অনেক ভিন্ন। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাণী পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে তাদের দেহে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা পরিপাকযন্ত্র নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে। এই গ্রহের প্রাণীদের বেলায় সেটি সত্যি নয়, তাদের মস্তিষ্ক বা শ্বাসযন্ত্র সারা দেহে ছড়ানো। মানুষের মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে তাকে যেরকম মেরে ফেলা যায়, এই প্রাণীগুলোর সেরকম কোনো জায়গা নেই। তাদের মস্তিষ্ক সারা দেহে বিস্তৃত, তাদের ইন্দ্রিয় শরীরের সর্বত্র। শরীরের যে কোনো অংশ খুলে

AMARBOI.COM

ভয়াবহ পরিপাকযন্ত্র বের হয়ে আসে। ট্রিনির ধারণা, পৃথিবীর গাছের সাথে এদের মিল রয়েছে। পৃথিবীর গাছ অবশ্যি এক জায়গায় স্থির কিন্তু এই প্রাণীগুলো স্থির নয়। লুতুন প্রাণীটি ইচ্ছে করলেই ছুটে সুহানের সাথে পাল্লা দিতে পারবে।

চেনা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সুহান হঠাৎ থেমে যায়। ট্রিনি বলল, কী হল সুহান?

লুতুন? কোথায়?

সুহান শুনতে পেল, ট্রিনি তার সংবেদনশীল চোখকে আরো সংবেদনশীল করে ফেলেছে। তার চোখের ভিতর থেকে ক্লিক ক্লিক করে এক রকমের শব্দ হতে থাকে।

সুহান নিচু গলায় বলল, ডান দিকের বড় পাথরটার পিছনে তাকাও।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। ঘাপটি মেরে বসে আছে। সাবধান সুহান। লেজারনটি নেবে?

দাও। সুহান হাত বাড়িয়ে ট্রিনির কাছ থেকে লেজারনটি নিল। লেজারন ট্রিনির তৈরি করা একটি কাজ চালানোর মতো যন্ত্র। ট্রিগার ধরতেই একটা হিলিয়াম নিওন লেজাররশ্মি বের হয়, প্রতিফলিত রশ্মি থেকে লেজারনের ছোট মেগা কম্পিউটারটি দূরত্ব ইত্যাদি বের করে নিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে দৃষ্টিবদ্ধ করে ফেলে। একবার দৃষ্টিবদ্ধ হয়ে যাবার পর লক্ষ্যবস্তু সরে গেলে বা নড়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই, লেজারনের বিস্ফোরক সেটিকে খুঁজে বের করে তাকে আঘাত করবে। পৃথিবীর অস্ত্রের অনুকরণে তৈরি, সুহানের খুব বেশি বার ব্যবহার করতে হয় নি।

দৃষ্টিবদ্ধ হয়েছে সুহান। এখন গুলি করতে পার।

না, থাক।

কেন? ভিতরে মেগাজুল বিস্ফোরক আছে, লুতুনটি নিঃসন্দেহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

না, আমি ছিন্নভিন্ন করতে চাই না।

কেন নয়? এই প্রাণীটা তোমার জন্যে ভয়াবহ। এদের সংখ্যা কমাতে পারলে তোমার জন্যে নিরাপদ। তাছাড়া প্রাণীটি তো ধ্বংস হবে না। তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরো থেকে অন্য লুতুনের জন্ম হবে।

কিন্তু একটা লুতুনের বড় হতে কত দিন কেটে যায়! যদি এটা আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে তাহলে গুলি করব। না হয় থাক। আমি হচ্ছি এই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। আমি যদি এই গ্রহের অন্য প্রাণীদের দেখেশুনে না রাখি তাহলে কে রাখবে?

ট্রিনি কোনো কথা বলল না। সুহানকে সে তার মৃতা মায়ের পেট কেটে বের করে একটু একটু করে বড় করেছে। সুহান সম্পর্কে সব তথ্য সে জানে। কিন্তু তবু সে তাকে বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। রবোটের নীতিমালায় তাদেরকে প্রথম যে জিনিসটা শেখানো হয় সেটি হচ্ছে এই ব্যাপারটি। মানুষের চরিত্র, কাজকর্ম বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পার, কিন্তু কখনোই তাদের বুঝতে চেষ্টা কোরো না। ট্রিনি তাই সুহানকে বুঝতে চেষ্টা করে না।

৩

পৃথিবীর হিসেবে ষোলো বছর আগে যে মহাকাশযানটি এই গ্রহে আশ্রয় নেবার জন্যে নামতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সুহান সেখানে থাকে। বিশাল মহাকাশযানের কিছু কিছু অংশ আবার আশ্চর্য রকম অবিকৃত রয়ে গেছে। সেরকম একটা অংশে সুহান থাকে। মহাকাশচারীদের থাকার ঘরগুলোর কয়েকটা রক্ষা পেয়েছে, কোনো কোনোটিতে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের

AMARBOI.COM

অনেক জিনিসপত্র রয়ে গেছে কিন্তু সুহান থাকার জন্যে বেছে নিয়েছে বিশাল ইঞ্জিনঘরটি। অতিশয় ইঞ্জিনটির ভিতরে খানিকটা সমতল জায়গায় সে ঘুমায়। যখন তার ঘুম আসে না সে তখন এই অসম্ভব জটিল ইঞ্জিনটি কীভাবে কাজ করত ভেবে বের করার চেষ্টা করে।

আজকেও শুয়ে শুয়ে সে ইঞ্জিনটার দিকে তাকিয়েছিল। একটা সোনালি রঙের নল উপর থেকে ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে এসে চৌকোণো বাক্সের মাঝে ঢুকে গেছে। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে চেষ্টা করে এই সোনালি নলটি কী কাজে ব্যবহার করা হত। ট্রিনি ইঞ্জিনঘরে মাথা ঢুকিয়ে বলল, বাতি নিভিয়ে দেব সুহান?

না।

কেন নয়? তোমার ঘুমানোর সময় হয়েছে। তাছাড়া সৌর ব্যাটারিগুলো আমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। প্রয়োজন না হলে বিদ্যুৎ খরচ করা ঠিক নয়।

বিদ্যুৎ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। আমি তোমাকে একটা জেনারেটর তৈরি করে দেব।

কিন্তু এখন তুমি কী করছ?

সোনালি রঙের এই নলটি কী কাজে ব্যবহার করা হত বোঝার চেষ্টা করছি।

সুহান, আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি তুমি অর্থহীন কাজে অনেক সময় নষ্ট কর। মানুষের সময়ের খুব অভাব। তাদের অনেক যত্ন করে সময়কে ব্যবহার করার কথা।

আমার সময়ের কোনো অভাব নেই।

কিন্তু তোমার মানুষের মতো ব্যবহার করা শেখা দরকার।

সুহান চোখ নাচিয়ে বলল, আমার যেটা করতে ভালো লাগে আমি সেটাই করব।

কিন্তু সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। তুমি যেটা করছ সেটা নিয়মের বাইরে। বিশ্বজগতের জ্ঞানভাণ্ডার বিশাল। মানুষ কোনোদিন তার পুরোটুকু জানতে পারবে না। তাই তাদের জানতে হয় কোন জ্ঞানটি কোথায় আছে সেই তথ্যটি।

আমি সেটা জানতে চাই না। কোন জ্ঞানটি কোথায় পাওয়া যায় সেটি জেনে আনন্দ কোথায়?

আনন্দের জন্যে জ্ঞান নয়। জ্ঞান হচ্ছে ব্যবহারের জন্যে। মহাকাশযানের এই ইঞ্জিনটি কীভাবে কাজ করে জানা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ এটা জেনে তুমি কোনোদিন একটা ইঞ্জিন তৈরি করতে পারবে না। ইঞ্জিনটি তৈরি করতে হলে তোমাকে জানতে হবে সেটি কী কী অংশ দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেই অংশগুলো কীভাবে জুড়ে দিতে হয়। সেটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এইসব তথ্য রয়েছে মূল তথ্যকেন্দ্রে। তোমাকে সেটা জানতে হবে। জ্ঞান অর্থ হচ্ছে তথ্যকেন্দ্র সম্পর্কে একটি ধারণা।

সুহান তার বিছানায় উঠে বসে বলল, তুমি বলছ আমার এখন বসে বসে মুখস্থ করার কথা কোন তথ্যকেন্দ্রে কী আছে?

হ্যাঁ। কেমন করে তথ্যকেন্দ্রের তথ্য বের করতে হয়, কেমন করে ব্যবহার করতে হয়। যে মানুষ সেটি যত সহজে ব্যবহার করতে পারে সে তত প্রয়োজনীয়।

ছাই প্রয়োজনীয়!

কোন তথ্যকেন্দ্রে কোন তথ্য আছে জানতে পারলে তুমি ইচ্ছে করলে একটি মহাকাশযান তৈরি করতে পারবে। মহাকাশযানের ইঞ্জিন ঠিক করতে পারবে। তার জন্যে কোন সোনালি রঙের নল দিয়ে কী জ্বালানি যায় সেটি জানার কোনো দরকার নেই।

আমি তবু জানতে চাই।

লেজারন তৈরি হলে তোমাকে জানতে হবে কোন লেজার টিউব, কোন বিস্ফোরক লঞ্চারের সাথে কী রকম মেগা কম্পিউটার জুড়ে দিতে হবে। কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ সূত্র ব্যবহার করতে হবে। তোমার কখনো জানার দরকার নেই কেমন করে লেজার কাজ করে—

আমি জানতে চাই। সিমুলেটেড এমিশানের মতো মজার কোনো ব্যাপার নেই। সবগুলো পরমাণু যখন একসাথে—

ট্রিনি বাধা দিয়ে বলল, তোমার জানার দরকার নেই। কেমন করে নিয়ন্ত্রণ সূত্র কাজ করে সেটাও তোমার জানার দরকার নেই।

আমি জানতে চাই। এই গ্রহের মহাকর্ষ বল পৃথিবী থেকে একটু কম, নিয়ন্ত্রণ সূত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন রশ্মিমালা ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু সেটা তোমার জানার দরকার নেই। মেগা কম্পিউটার সেটা জানে।

আমি তবু জানতে চাই।

প্রাচীনকালে মানুষেরা এইসব জানত। ছেলেমেয়েরা স্কুলে শিখত। এখন শিখতে হয় না। জ্ঞান এখন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গ্রহণ করতে হয়। অর্থহীন জ্ঞান শিখে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

সুহান হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, আমার সময় নিয়ে কোনো সমস্যা নেই ট্রিনি। আমার অফুরন্ত সময়। তোমার কাছে যেটা মনে হয় অর্থহীন, আমি সেটাই শিখতে চাই। কোন পরমাণুর শক্তিবলয় কোথায় আমি জানতে চাই। বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ কীভাবে কাজ করে আমি জানতে চাই। মহাকর্ষ বল কত শক্তিশালী আমি জানতে চাই। ধাতব জিনিস কেন তাপ পরিবাহী আমি জানতে চাই। নিও পলিমার কেন বিদ্যুৎ পরিবাহী আমি জানতে চাই।

AMARBOI.COM

অর্থহীন। ট্রিনি গলা উঁচিয়ে বলল, অর্থহীন!

সুহান একটা চাদর দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে বলল, আমার পুরো জীবনই অর্থহীন।

যদি এখন কোনো মহাকাশযানে করে কোনো মানুষের দল আসে, তুমি তাদের সামনে হবে একজন অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ। তুমি প্রয়োজনীয় একটা জিনিসও জান না।

আমি জানতে চাই না। আর এখানে কোনো মানুষ কোনোদিন আসবে না ট্রিনি। তোমার ভয় নেই।

ট্রিনি কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় একটি মহাকাশযান তার শক্তিশালী ইঞ্জিন ব্যবহার করে তার গতিবেগ কমিয়ে এই গ্রহটিকে আবর্তন করতে শুরু করেছিল। সেই মহাকাশযানটিতে ছিল প্রায় তিরিশ জন মহাকাশচারী। তাদের সবাই গত পঞ্চাশ বছর থেকে মহাকাশযানের শীতল গ্রহে ঘুমিয়ে আছে। মহাকাশচারীরা তখনো জানত না তাদের এই দীর্ঘ নিদ্রা থেকে কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের জাগিয়ে তোলা হবে। তারা জানত না, যে গ্রহটিতে তারা নামবে সেখানে একজন নিঃসঙ্গ কিশোর তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে বহুকাল থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামহীন গ্রহ

১

লাইনা চোখ খুলে দেখতে পায় তার মাথার কাছে চতুষ্কোণ স্বচ্ছ একটা নীল আলো। এই আলোটা সে আগেও কোথাও দেখেছে কিন্তু কোথায় দেখেছে অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না। তার চেতনা এখনো পুরোপুরি সচেতন নয়, সে নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি এক ধরনের অবস্থায় থেকে আবার ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণপণ চেষ্টা করে চোখ খোলা রেখে লাইনা মনে করার চেষ্টা করে সে কে, কোথায় শুয়ে আছে এবং কেন তার জেগে ওঠা উচিত। উপরের নীল আলোটা সে আগে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করতে করতে তার চেতনা আরেকটু সজীব হয়। তখন সে এক ধরনের কম্পন অনুভব করে, কান পেতে সে চাপা একটা গুমগুম শব্দ শুনতে পায়। এই শব্দটিও সে আগে কোথাও শুনেছে কিন্তু এখন কিছুতেই মনে করতে পারে না।

লাইনা চোখ খুলে নিজেকে দেখার চেষ্টা করে। তার দুই হাত উপাসনার ভঙ্গিতে ভাঁজ করা। সমস্ত শরীর অর্ধস্বচ্ছ এক ধরনের নিও পলিমার দিয়ে ঢাকা। ডান হাতটা একটু উপরে তুলতেই সে দেখতে পায়, তার কব্জিতে একটা সেন্সর লাগানো। তখন হঠাৎ করে তার সব মনে পড়ে যায়।

সে লাইনা, একজন মহাকাশচারী। মহাবিশ্বে নতুন বসতি খোঁজার জন্যে সে এবং আরো তিরিশ জন মহাকাশচারী মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল। প্রথম দুই বছর পার হওয়ার পর তারা একে একে সবাই শীতলঘরে ঘুমিয়ে গেছে। কতদিন পার হয়েছে তারপর? সে এখন জেগে উঠেছে কেন? তার অর্থ কি মানুষের বাস করার উপযোগী একটা গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেছে? এখন কি সেই গ্রহে নামবে তারা?

এক ধরনের উত্তেজনায় লাইনার বুকে হঠাৎ রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। ঘুম ভেঙে পরিপূর্ণভাবে জেগে উঠেছে সে। উপরের হালকা নীল আলোটিও তখন চিনতে পারল সে— একটি মনিটর। তার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খুঁটিনাটি তথ্য দেখাচ্ছে সেখানে। তার রক্তচাপ, তার তাপমাত্রা, তার শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকতন্ত্রের অবস্থা, তার মস্তিষ্কের কম্পন। উপরে ডান দিকে আজকের তারিখটি জ্বলছে এবং নিভছে। কী আশ্চর্য! এর মাঝে পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে? পঞ্চাশ বছর? অর্ধ শতাব্দী? সে গত অর্ধ শতাব্দী থেকে এই শীতলঘরে ঘুমিয়ে আছে? পৃথিবীতে সে তার যেসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়পরিজনকে রেখে এসেছে তারা এখন বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত? বুকের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে লাইনা। সে আবার নীল স্ক্রিনটার দিকে তাকাল, তার শরীর দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠছে। শীতল গ্রহে সমস্ত জৈবিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ করে দেয়া হয়। তাই তার কাছে গত অর্ধ শতাব্দী কয়েক ঘণ্টার বেশি মনে হওয়ার কথা নয়। নীল স্ক্রিনটায় তাই দেখাচ্ছে। সে ইচ্ছে করলে এখন উঠে দাঁড়াতে পারে, উপরের ঢাকনা খুলে বের হতে পারে। কিন্তু তবু সে উপাসনার ভঙ্গিতে দুই হাত বুকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে রেখে চুপচাপ শুয়ে রইল।

মহাকাশযানের শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুমগুম শব্দটি সে কান পেতে শুনতে থাকে। শব্দটি অনেকটা হৃৎস্পন্দনের মতো। শব্দটি সবাইকে মনে করিয়ে দেয় মহাকাশযানটি বেঁচে আছে, মহাকাশচারীরা বেঁচে আছে, সব কম্পিউটার বেঁচে আছে, মহাকাশযানের ক্রায়োজেনিক ঘরে মানুষের তিন সহস্র ভ্রূণ বেঁচে আছে, বৃক্ষ লতাপাতার বীজ, পশুর শুক্রাণু বেঁচে আছে। মনে করিয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষের পক্ষ থেকে তারা একটি দায়িত্ব নিয়ে মহাবিশ্বে পাড়ি দিয়েছে। কে জানে হয়তো সেই দীর্ঘ অভিযান এখন সমাপ্ত হয়েছে। লাইনা ফিসফিস করে নিজেকে বলল, লক্ষ্মী মেয়ে লাইনা, তুমি ওঠ। তোমার এখন নতুন জীবন শুরু হবে।

লাইনা উঠে বসতেই ঢাকনাটা শব্দ করে খুলে গেল। পাশাপাশি অনেকগুলো ক্যাপসুল। সবগুলোর ওপর একটি করে সবুজ আলো। আস্তে আস্তে জ্বলছে এবং নিভছে। এক জন এক জন করে সবাই উঠবে এখন। সবচেয়ে আগে উঠছে মহাকাশযানের দলপতি কিরি। তারপর সে। সেরকমই কথা ছিল।

ঠাণ্ডা মেঝেতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল সে। তার নিরাভরণ সুঠাম দেহের উপর সূক্ষ্ম অর্ধস্বচ্ছ একটি নিও পলিমারের কাপড়। কপালের দুই পাশ থেকে দুটি সেন্সর খুলে সে একটু এগিয়ে যায়। ঘরের দেয়ালে উঁচু আয়না, একটু সামনে যেতেই সেখানে নিজের প্রতিবিম্বের উপর চোখ পড়ল তার। না, গত অর্ধ শতাব্দীর কোনো চিহ্ন নেই তার শরীরে। কুচকুচে কালো চুল মাথার উপর বাঁধা, হাত দিয়ে খুলে দিতেই ঢেউয়ের মতো নিচে নেমে এল। সে আয়নায় আবার নিজের দিকে তাকাল। কোমল মসৃণ ত্বক, ভরাট ঠোঁট, উজ্জ্বল কালো চোখ, সেই চোখে স্বচ্ছ ছবি। সূক্ষ্ম অর্ধস্বচ্ছ কাপড়ের আড়ালে তার সুগঠিত বুক, সুঠাম সজীব দেহ।

লাইনা সামনে এগিয়ে যায়। দেয়ালে তার নাম লেখা বোতামটি স্পর্শ করতেই ঘরঘর শব্দ করে একটা দরজা খুলে গেল। তার ঘরে গিয়ে এখন তাকে প্রস্তুত হতে হবে। কন্ট্রোলরুমে কিরি নিশ্চয় তার জন্যে অপেক্ষা করছে এখন।

AMARBOI.COM

২

সমস্ত মহাকাশযানে কন্ট্রোলরুমটি সবচেয়ে বড়। উপর থেকে হালকা একটা আলোতে ঘরটি আলোকিত রাখা হয়। দেয়ালের চারপাশে বড় বড় স্ক্রিনে নানা ধরনের ছবি। ঘরের ঠিক মাঝখানে মহাকাশযানের মূল নিয়ন্ত্রণ। তার ঠিক সামনে একটি নরম চেয়ারে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে কিরি বসে আছে। তার পা দুটি সে তুলে দিয়েছে কন্ট্রোল প্যানেলের উপর। লাইনা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই শব্দ শুনে কিরি তার দিকে ঘুরে তাকাল। তার কোমল মুখটি সাথে সাথে এক ধরনের সহৃদয় হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্যানেল থেকে পা নামিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কিরির দীর্ঘ ঋজু দেহ। কপালের দুই পাশে চুলে একটু রুপালি রং ছাড়া সারা দেহে বয়সের কোনো চিহ্ন নেই। হাত বাড়িয়ে বলল, এস, লাইনা এস। ভালো ঘুম হয়েছে তোমার?

হ্যাঁ। কেউ যদি একটানা পঞ্চাশ বছর ঘুমিয়ে থাকে সেটাকে ভালো না বললে কোনটাকে ভালো বলবে?

তা তো বটেই!

তুমি কখন উঠেছ?

কিরি লাইনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কী সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে লাইনা! এত সুন্দরী একটা মেয়েকে মহাকাশযানের মতো ছোট একটা জায়গায় রাখা ঠিক নয়। সৌন্দর্যের অপচয় হয় এতে। এই সৌন্দর্য আরো অনেক বেশি মানুষের জন্যে।

লাইনা মাথা নেড়ে বলল, তুমি দলপতি হয়ে মহাকাশযানের নীতিমালার একটা আইন ভঙ্গ করলে। মহাকাশযানের পুরুষ ও মহিলাকে আলাদা করে দেখার নিয়ম নেই।

কিরি মাথা নেড়ে বলল, মনে থাকে না লাইনা! তোমাকে দেখলে আরো বেশি গোলমাল হয়ে যায়।

লাইনা কিরির স্তুতিবাক্যটি গায়ে মাখল না। হেঁটে নিজের ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গত পঞ্চাশ বছর এখানে কেউ বসে নি কিন্তু কোথাও সেই চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয়, মাত্র গত রাত্রিতে সে এখান থেকে উঠে গেছে। নরম চেয়ারটিতে বসে সে নিজের যোগাযোগ মডিউলের বোতামটি চেপে ধরে বলল, মহাকাশযানের কী খবর কিরি? আমরা কি থামছি কোথাও?

হ্যাঁ।

কোথায়?

সাত দশমিক তিন চার অবলিক আট দশমিক নয়...

লাইনা হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক, আর বলতে হবে না।

কিরি হেসে বলল, আমরা গিনিস ক্ষেত্রে একটা গ্রহে নামছি লাইনা।

গ্রহটির কী নাম?

এর কোনো নাম নেই লাইনা। শুধু পরিচয়। সংখ্যা দিয়ে পরিচয়।

কী আশ্চর্য! আমরা নামহীন একটা গ্রহে নামছি?

হ্যাঁ। মহাজাগতিক সময়ে ষোলো বছর আগে এখানে আরেকটি মহাকাশযান নামার চেষ্টা করেছিল। নামতে পারে নি।

লাইনা শঙ্কিত মুখে বলল, কেন পারে নি?

মহাকাশযানের জ্বালানি নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল। একটি নক্ষত্রের মহাকর্ষ বল থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে জ্বালানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন এই গ্রহটি তারা দেখতে পায়। গ্রহটির সাথে পৃথিবীর অনেক মিল, মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত না হলে মহাকাশচারীদের বেঁচে যাবার ভালো সম্ভাবনা ছিল।

পৃথিবীর সাথে মিল?

হ্যাঁ। কিরি তার সামনে একটা সুইচ স্পর্শ করতেই দেয়ালের বিশাল স্ক্রিনে একটা গ্রহের ছবি ফুটে ওঠে। কিরি সেটাকে আরো স্পষ্ট করতে করতে বলল, গ্রহটার সাথে পৃথিবীর মিল খুব বিস্ময়কর। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ, প্রাণের বিকাশ—

প্রাণের বিকাশ?

হ্যাঁ। কিরি হাসিমুখে বলল, এই গ্রহটায় প্রাণের বিকাশ হয়েছে। যতদূর মনে হয় এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে।

লাইনা তার চেয়ার থেকে উঠে দেয়ালে স্ক্রিনটার কাছাকাছি এগিয়ে যায়। ধূসর গ্রহটির দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তাপমাত্রা কত? জলীয় বাষ্পের পরিমাণ?

গ্রহটির উত্তর ভাগে কিছু কিছু অংশে তাপমাত্রা পৃথিবীর কাছাকাছি। জলীয় বাষ্প কম

বলতে পার, পৃথিবীর মরু অঞ্চলের মতো। এখনো ছবি নেয়া হচ্ছে, যেটুকু তথ্য আছে তাতে মনে হচ্ছে গ্রহটা দেখতে খুব খারাপ নয়। তাপমাত্রা আর জলীয় বাষ্প নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মনে হয় পৃথিবীর গাছপালা জন্ম দেয়া যাবে। মনে হয় চমৎকার একটা বসতি হতে পারে। তবে—

তবে কী?

গ্রহটা দুটি নক্ষত্রের কাছাকাছি। কক্ষপথের কোথায় আছে তার উপর নির্ভর করে মাঝে মাঝে এটাকে দুই সূর্যের গ্রহ মনে হবে! চিন্তা করতে পার আকাশে একসাথে দুটি সূর্য?

তাপমাত্রা? তখন তাপমাত্রা কত হবে?

অসহ্য মনে হতে পারে, এখনো জানি না। তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

লাইনা দীর্ঘ সময় গ্রহটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নামহীন ধূসর একটি গ্রহ। কে জানে হয়তো এই গ্রহে সে তার জীবন কাটিয়ে দেবে। মানুষ তাদের পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য করে ফেলেছে। তেজস্ক্রিয় বাতাস, অনুর্বর প্রাণহীন মাটি, বিষাক্ত পানি। তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্যে এখন অন্য কোনো গ্রহ খুঁজে বের করার কথা ভাবতে হচ্ছে। বাইরে বসতি স্থাপন করার দায়িত্ব নিয়ে গত শতাব্দীতে যে অসংখ্য মহাকাশযান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের মহাকাশযানটি ঠিক সেরকম একটি মহাকাশযান। তারা কি সত্যি খুঁজে বের করতে পারে একটি গ্রহ, যেখানে পৃথিবীর মানুষ আবার নতুন করে তাদের জীবন শুরু করতে পারবে? লাইনা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল, তার বিশ্বাস হয় না।

যোগাযোগ মডিউলে চাপা একটি শব্দ শুনে লাইনা সেদিকে এগিয়ে যায়। মহাকাশযানের দ্বিতীয় দলনেত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব অনেক। সে দ্রুত অভ্যস্ত হাতে মহাকাশযানের মূল কম্পিউটারে কিছু সংখ্যা প্রবেশ করায়, কাছাকাছি মাইক্রোফোনে নিচু গলায় কথা বলে। স্ক্রিনের ছবিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে দেয়। ধীরে ধীরে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে মহাকাশযানের তথ্য ফুটে উঠতে থাকে। গত পঞ্চাশ বছরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটে নি। ক্রায়োজেনিক ঘরে তিন সহস্র মানুষের ভ্রূণ, পশুর শুক্রাণু, ডিম্বাণু, কয়েক লক্ষ গাছের বীজ, জীবিত প্রাণীর ক্লোন তৈরি করার প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কম্পিউটার, রবোট, নির্ভুল নিয়ন্ত্রণবিধি সবকিছু ঠিক ঠিক আছে। লাইনা মহাকাশযানের জ্বালানির পরিমাণ, যন্ত্রপাতির অবস্থা দেখে সৌর ব্যাটারিতে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ, তাদের নিজেদের রসদ, বাতাসে অক্সিজেন পরীক্ষা করে পৃথিবীর খবর নেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট মডিউলটি চালু করে দেয়।

লাইনা, তুমি সত্যিই পৃথিবীর কথা জানতে চাও?

লাইনা একটু অবাক হয়ে পিছনে তাকাল। কিরি নিঃশব্দে হাঁটতে পারে, কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে।

কিরি আবার বলল, সত্যি জানতে চাও?

হ্যাঁ।

কেন লাইনা? খবর জেনে তো শুধু মন খারাপই হয় লাইনা।

কিন্তু কী করব বল?

মানুষ কেমন করে এটা করল লাইনা? বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা। মহাদেশের পর মহাদেশ রুক্ষ প্রাণহীন মরুভূমি। নদী হ্রদ সমুদ্র মহাসমুদ্রে বিষাক্ত কেমিক্যাল। মানুষ বেঁচে আছে মাটির নিচে। রোগ শোক মহামারী। বিভীষিকা। বিশ্বাস হয় লাইনা?

লাইনা মাথা নাড়ল, না, হয় না।

মানুষ কেমন করে নিজের অস্তিত্বে নিজে আঘাত করে? আমি এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি লাইনা। তোমরা, মানুষেরা গত পঞ্চাশ বছর যখন শীতলঘরে ঘুমিয়ে ছিলে তখন আমি এটা নিয়ে ভেবেছি। আমি এই চেয়ারে গত পঞ্চাশ বছর চুপ করে বসে ছিলাম—

কী বললে? লাইনা চমকে উঠে বলল, কী বললে তুমি?

হ্যাঁ লাইনা, তোমরা কেউ জান না। আমি মানুষ নই লাইনা। আমি একজন রবোট। দশম প্রজাতির রবোট।

রবোট? তুমি রবোট?

হ্যাঁ লাইনা।

লাইনা বিস্ফারিত চোখে কিরির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই হৃদয়বান বুদ্ধিদীপ্ত সুদর্শন মানুষটি একটি রবোট? তার বিশ্বাস হয় না। মাথা নেড়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি না, কিরি।

কিরি লাইনার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে আর হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখে, কিরির চোখ দুটি সবুজাভ হয়ে আসে, আর সেখান থেকে বিচিত্র এক ধরনের আলো বের হয়ে আসে। লাইনার এক ধরনের আতঙ্ক হতে থাকে, শক্ত করে চেয়ারটি ধরে বলল, না কিরি, না। না।

কিরির চোখ দুটি আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, আবার সেই চোখে সহৃদয় একটি হাসিখুশি মানুষ উঁকি দিতে থাকে।

লাইনা অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, তুমি মানুষ নও! তুমি রবোট!

কিরি নরম গলায় বলল, তোমার কি আশাভঙ্গ হল লাইনা?

লাইনা মাথা নিচু করে বলল, আমি জানি না কিরি।

মনে হয় হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি। আমি দশম প্রজাতির রবোট। সব মিলিয়ে আমার মতো রবোট রয়েছে দশ কি বারটি। আমাদের সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। এই মহাকাশযানের দলপতি একজন মানুষকে না করে একজন রবোটকে করা হয়েছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে।

হ্যাঁ। লাইনা মাথা নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

সেই কারণটা কী?

আমি জানি না।

গত পঞ্চাশ বছর তোমরা সবাই যখন শীতলঘরে বসে ছিলে তখন আমি সেটা নিয়ে ভেবেছি। পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ সময়। মানুষের জন্যে দীর্ঘ, আমার জন্যেও দীর্ঘ। ভেবে ভেবে মনে হয় আমি এই প্রশ্নের একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছি।

সেটা কী?

একজন মানুষ খুব সহজে নিজেকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে হয়তো করে না কিন্তু তার খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়। আমি সেটা করব না। আমি কখনো মানুষকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যাব না।

কিন্তু তুমি একটু আগে বলেছ তুমি মানুষের মতো।

হ্যাঁ।

মানুষের যেরকম দুঃখ কষ্ট হাসি কান্না আছে তোমারও সেরকম দুঃখ কষ্ট হাসি কান্না আছে?

আছে।

ঈর্ষা আছে? হিংসা আছে? ক্রোধ? অপরাধবোধ? দম্ভ?

কিরিকে একটু বিচলিত দেখা গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আমি যতদূর জানি, আছে। কিন্তু সেইসব অনুভূতি প্রকাশ পাওয়ার একটা কারণ থাকতে হয়। সেরকম কারণ এখনো হয় নি। তাই আমি জানি না কত তীব্র আমার ঈর্ষা বা হিংসা, ক্রোধ বা দম্ভ।

লাইনা চুপ করে থেকে বলল, যদি দেখা যায় সেটা ভয়ঙ্কর তীব্র? তুমি যদি হঠাৎ অমানুষ হয়ে যাও?

কিরি শব্দ করে হেসে ফেলল, তারপর বলল, না লাইনা, আমি কখনো অমানুষ হব না। রবোট অমানুষ হতে পারে না। শুধুমাত্র মানুষ অমানুষ হতে পারে।

কিরি হেঁটে হেঁটে ঘরের মাঝখানে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে বলল, আমি যে একজন রবোট সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। কথাটা গোপন রাখার কথা ছিল। কিন্তু আমি সেটা গোপন রাখি নি। আমি সেটা তোমাকে বলেছি। কেন বলেছি জান?

কেন?

আমি তোমাদের দলপতি হতে চাই না। মানুষের একটি দলের দলপতি হবে একজন মানুষ।

কিন্তু তুমি দশম প্রজাতির রবোট। দশম প্রজাতির একজন রবোট মানুষের এত কাছাকাছি যে, মানুষের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই। পৃথিবীর মানুষ যদি তোমাকে দলপতি করতে পারে আমি সেটা মেনে নিতে পারি। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে কিরি।

কিরি খানিকক্ষণ লাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক ধন্যবাদ লাইনা। তুমি আমার বুক থেকে একটা পাথর সরিয়ে দিলে। নিজেকে মানুষের মাঝে লুকিয়ে রাখতে আমার খুব খারাপ লাগছিল। তোমাকে বলতে পেরে আমার বুকটা হালকা হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

৩

আঠার ঘণ্টা পর মহাকাশযানের মূল চত্বরটুকুতে একটা আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘুম ভেঙে তিরিশ জন মহাকাশচারী উঠে এসেছে। ভল্টে রাখা অনেকগুলো রবোটকে বের করে আনা হয়েছে। সবাই চেঁচামেচি করে কথা বলছে। চারদিকে খাবার এবং পানীয়ের ছড়াছড়ি। অর্থহীন কথাবার্তা, হাসি-তামাশা, হইহল্লোড় দেখে মনে হতে পারে, এদের জীবনে সত্যিকারের কোনো সমস্যা নেই। মনে হয়, আনন্দমুখর একটি বিশাল পরিবারের সবাই বুঝি হঠাৎ করে একত্র হয়েছে।

হইচই যখন চরমে উঠেছে তখন কিরি একটা চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কিরিকে একাধিকবার কথাটি উচ্চারণ করতে হল এবং শেষ পর্যন্ত সবাই কথা থামিয়ে তার দিকে ঘুরে তাকাল। কিরি সবাইকে এক নজর দেখে বলল, তোমরা সবাই জান, আমরা আগামী কয়েক ঘণ্টার মাঝে এই গ্রহটিতে নামতে যাচ্ছি।

সবাই একটা আনন্দধ্বনির মতো শব্দ করল। কিরি শব্দটাকে থেমে যাওয়ার সময় দিয়ে বলল, আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য রয়েছে সেটা দেখে মনে হয়, এই গ্রহটি মানুষের জন্যে চমৎকার একটা বসতি হতে পারে। নতুন একটা পৃথিবীর জন্ম দেব এখানে।

সবাই দ্বিতীয়বার একটা আনন্দধ্বনি করল, এবারে আগের থেকে জোরে এবং

দীর্ঘস্থায়ী। কিরি হাসিমুখে বলল, আমি তোমাদের দলপতি। আমাকে যেরকম কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ঠিক সেরকম কিছু দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি চেষ্টা করব আমার দায়িত্ব যতটুকু সম্ভব নিখুঁতভাবে পালন করতে। কিন্তু তার আগে আমি তোমাদেরকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই।

টকটকে লাল রঙের পানীয়ের একটা গ্লাস হাতে নিয়ে লাইনা কিরির দিকে ঘুরে তাকাল। কী বলতে চায় কিরি?

কিরি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, যদি এখন তোমাদের বলা হয়, আমি মানুষ নই, আমি একজন রবোট, তাহলে তোমরা কি আমার নেতৃত্ব মেনে নেবে?

উপস্থিত সবাই চুপ করে যায়। কমবয়সী একজন তরুণ, লাল চুলের ক্রিকি অবাক হয়ে বলল, কিন্তু তুমি তো মানুষ!

না, আমি মানুষ নই।

তুমি মানুষ নও?

না। এখানে লাইনা ছাড়া আর কেউ সেটা জানে না। লাইনা জানে, কারণ আমি তাকে গতকাল বলেছি। সে বিশ্বাস করতে চায় নি। তখন আমি তাকে প্রমাণ দেখিয়েছি।

সবাই ঘুরে লাইনার দিকে তাকাল, লাইনা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। কিরি আবার বলল, আমি একজন রবোট। দশম প্রজাতির রবোট।

সারা ঘরে হঠাৎ বিস্ময়ের ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। রিশা নামের সোনালি চুলের একটা মেয়ে কাঁপা গলায় বলল, দ-দ-দশম প্রজাতি?

হ্যাঁ।

তোমার কপোট্রন ক্লিও লিয়ামের? টেটরা রিজম?

হ্যাঁ, টেটরা রিজম।

নিউরাল নিক্সি?

হ্যাঁ।

এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে মাত্র দশটি?

সঠিক সংখ্যাটি কেউ জানে না, তবে এর কাছাকাছি।

রিশা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, এই জন্যে আমরা কেউ কখনো ধরতে পারি নি। কী আশ্চর্য!

তোমরা এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। বল, তোমরা কি আমার নেতৃত্ব মেনে নেবে?

মধ্যবয়স্ক ইঞ্জিনিয়ার গ্রুসো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কী, তোমার কথা শুনে আমার নিজের মাঝে এখন এক ধরনের হীনমন্যতা জন্মে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মানুষ না হয়ে একজন দশম প্রজাতির রবোট হয়ে জন্ম নিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

ঘরে হালকা হাসির একটা শব্দ শোনা যায়। লাইনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিরি, তুমি মহাকাশযানের নীতিমালা লঙ্ঘন করছ। তোমার সাথে একজন মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। তুমি নিজে থেকে না বললে কেউ কোনোদিন এই জিনিসটি জানতে পারত না। তোমার এই তথ্যটি গোপন রাখার কথা ছিল। তুমি কেন বলেছ?

আমি সম্ভবত মানুষের খুব কাছাকাছি। মানুষের ভিতরে যেরকম অনুভূতি কাজ করে আমার ভিতরেও অনেকটা সেরকম অনুভূতি কাজ করে। গত পঞ্চাশ বছর তোমরা—

AMARBOI.COM

মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখন আমি এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে মনে হয় আমি আরো পরিণতবুদ্ধি মানুষে—কিংবা রবোটে পরিণত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আমার তোমাদের জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন আমি মানুষ নই, আমি রবোট।

সোনালি চুলের রিশা বলল, সেটা মনে হয় তুমি ভালোই করেছ—কিন্তু তোমাকে কি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা যাবে?

কী প্রশ্ন?

তুমি কি মানুষের মতো ভালবাসাবাসি করতে পার?

সারা ঘরে উচ্চৈঃস্বরে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। কিরি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তুমি যদি নিরিবিলি কখনো আমাকে এই প্রশ্ন কর, আমি তার উত্তর দেব। এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নই। সেটি মহাকাশযানের নীতিমালায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হবে।

জীববিজ্ঞানী ক্লডিও বলল, তোমার কি খিদে পায়?

পায়।

তোমার কি কখনো বিশেষ খাবার খেতে ইচ্ছে করে? আমার যেরকম এখন ইচ্ছে করছে দুটি বড় কলার মাঝখানে এই এতখানি কেক, তার উপরে ঘন করে ক্রিম—

সবাই আবার হো হো করে হেসে ওঠে। কিরি বলল, হ্যাঁ, আমারও মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি তোমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছি। আমি জানতে চাই—

তোমার কি কখনো অসুখ করে? টেকনিশিয়ান ফিও শব্দ করে নিজের নাক পরিষ্কার করে বলল, সর্দিকাশি? জ্বর?

হ্যাঁ। প্রচলিত কিছু ভাইরাস এবং কিছু জীবাণু আমার শরীরে অসুখের মতো উপসর্গ তৈরি করতে পারে। আমি তোমাদের এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। এখন আমি যেটা জানতে চাই সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানতে চাই—

কমবয়সী ক্রিকি হাত তুলে বলল, একটা শেষ প্রশ্ন।

কী?

তোমার কখনো ঘুম পায় না?

পায়। মানুষের মতো আমার ঘুম পায়। এবং তোমরা দেখেছ আমি তোমাদের মতো ঘুমাই। বিশেষ প্রয়োজন হলে আমি দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে পারি। এবার যেরকম জেগেছিলাম।

তুমি যখন ঘুমাও তখন তুমি কি স্বপ্ন দেখ?

কিরি একটু হেসে বলল, আমি এখন এই প্রশ্নের উত্তর দেব না, কারণ তাহলে সাথে সাথে তোমরা এটা নিয়ে আরো এক শ-টি প্রশ্ন করবে। আগে তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমরা কি—

রিশা আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কখনো প্রেমে পড়েছ?

সারা ঘরে হাসির শব্দ শোনা যায়। কিরি একটু বিষণ্ন মুখে লাইনার দিকে তাকাল। লাইনা একটু হেসে বলল, কিরি, আমার ধারণা তুমি যে মানুষ নও, এবং তুমি যে একজন দশম প্রজাতির রবোট সেটা অনেক কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তোমার সাথে আমাদের সবার যে সম্পর্ক তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। তোমার নেতৃত্বে আমাদের পুরোপুরি আস্থা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যদি কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেই, তোমাদের মানুষের কাছে সেটা যদি অযৌক্তিক বা কখনো অমানবিক মনে হয়, তোমরা কি সেটা মেনে নেবে?

কিরির গলায় কিছু একটা ছিল যার জন্যে সবাই একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। লাইনা মৃদুস্বরে বলল, তুমি কখনো কোনো অযৌক্তিক বা অমানবিক সিদ্ধান্ত নেবে না কিরি, আমার সেই বিশ্বাস আছে। কিন্তু যদি কখনো নাও, অন্যদের কথা জানি না, আমি কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেব।

সবাই মাথা নাড়ল। ইঞ্জিনিয়ার গ্রুসো এগিয়ে এসে বলল, সোজাসুজি বললে স্তুতিবাক্য হয়ে যায়, তবু বলছি। তুমি চমৎকার একজন মানুষ। খাঁটি মানুষ। তোমার নেতৃত্ব চমৎকার। আমরা চোখ বুজে মেনে নেব।

জীববিজ্ঞানী ক্লডিও বলল, সিদ্ধান্ত নিতে তুমি যদি কখনো ভুল কর, করবে। মানুষও ভুল করে। আমাদের কাছে সেটা যদি অযৌক্তিক মনে হয়, যদি অমানবিক মনে হয়, আমরা তখন প্রতিবাদ করব, চিৎকার করব, চেঁচামেচি করব। কিন্তু তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেব। কারণ তুমি আমাদেরই একজন। তোমার ভিতরে সেটা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

সোনালি চুলের রিশা বলল, কখনো যদি বিয়ের কথা ভাব আমাকে জানিও, আমি এখনো কুমারী।

সারা ঘরে আবার হাসির শব্দ শোনা যায়।

AMARBOI.COM

৪

দুই ঘণ্টা পর মহাকাশযানটি নামহীন গ্রহটিতে অবতরণ করল কোনোরকম সমস্যা ছাড়াই। মহাকাশযানটি অবতরণ করার জন্যে যে জায়গাটি বেছে নিয়েছিল তার থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে একটি বিধ্বস্ত মহাকাশযানের ইঞ্জিনঘরে সুহান তখন গভীর ঘুমে অচেতন। তার পায়ের কাছে মূর্তির মতো বসেছিল ট্রিনি। স্থির চোখে তাকিয়েছিল সুহানের ঘুমন্ত মুখের দিকে। দেখে মনে হতে পারে বুঝি গভীর ভালবাসায়।

কিন্তু ট্রিনি দ্বিতীয় প্রজাতির রবোট। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রজাতির রবোটের বুকে কোনো ভালবাসা নেই।

মহাকাশযান

১

সুহানের হাতে একটি বিচিত্র অস্ত্র। অস্ত্রটি সে নিজে তৈরি করেছে। একটি ধাতব নলের সাথে একটি হাতল লাগানো। নলের মাঝে সে খানিকটা বিস্ফোরক রেখে তার সামনে ছোট একটি বুলেট রাখে। বুলেটের মাঝে থাকে চতুর্থ মাত্রার বিস্ফোরক। হাতলের সাথে একটা ট্রিগার লাগানো আছে। ট্রিগারটি টেনে ধরার সাথে সাথে বিস্ফোরককে ছোট একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ

আঘাত করে। বুলেটটি ছুটে যায় সাথে সাথে। লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার পর চতুর্থ মাত্রার বিস্ফোরকে ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণ হয়। অস্ত্রটিতে নতুন করে বিস্ফোরক ভরে সুহান বহু দূরে একটি পাথরের দিকে তাক করে দাঁড়ায়। ট্রিনি নিচু গলায় বলল, সুহান, তুমি অযথা সময় নষ্ট করছ।

কেন?

এই অস্ত্রটি দিয়ে তুমি কখনো লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না।

কেন?

কারণ এর মাঝে দৃষ্টিবদ্ধ করার জন্যে কোনো লেজাররশ্মি নেই। লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান নিশ্চিত করার জন্যে কোনো মেগা কম্পিউটার নেই। তোমার হাতে যেটা রয়েছে সেটা একটি খেলনা।

সুহান তীক্ষ্ণ চোখে দূর পাথরটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খেলনা দিয়ে খেলতে ভালবাসি।

এটি শুধু খেলনা নয়, এটি একটি বিপজ্জনক খেলনা। তুমি এর মাঝে চার মাত্রার বিস্ফোরকে তৈরী একটা বুলেট রেখেছ। এটি তোমার হাতে বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা তের দশমিক চার।

এই গ্রহে আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল চার দশমিক নয়। তুমি আমাকে শুধু শুধু জ্বালাতন করছ।

সুহান নিশ্বাস বন্ধ করে ট্রিগার টেনে ধরল। তার হাতের অস্ত্রটি থেকে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ করে বুলেটটি বের হয়ে যায়। দূরে একটি বিস্ফোরণ হয়। তার লক্ষ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে।

ট্রিনি বলল, আমি তোমাকে বলেছি, তুমি এটা দিয়ে কখনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারবে না।

এক শ বার পারব। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে বুলেটটা নিচে নেমে আসছে। লক্ষ্যবস্তুর একটু উপরে তাক করলে—

তোমার যুক্তি হাস্যকর। অস্ত্র মাত্রই এই ধরনের হিসেব করতে পারে। তোমার খালি চোখে আন্দাজ করে নিশানা করা পুরোপুরি অর্থহীন। সময় এবং শক্তির অপচয়। সবচেয়ে বড় কথা—এটি বিপজ্জনক।

হোক বিপজ্জনক। আমি এভাবেই লক্ষ্যভেদ করতে চাই। খালি চোখে আন্দাজ করে। হাতের স্পর্শে।

কেন?

আমার ইচ্ছে।

ট্রিনি কোনো কথা না বলে মাথা ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। সুহান শুনতে পায়, তার মাথা থেকে ক্লিক ক্লিক করে এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। ট্রিনি তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সংবেদনশীল করে কিছু একটা শোনার বা দেখার চেষ্টা করছে। নিজে থেকে তাকে কিছু বলল না বলে সুহান কিছু জিজ্ঞেস করল না।

সুহান তার অস্ত্রটিতে বিস্ফোরক ভরে আবার সেখানে একটি বুলেট ঢুকিয়ে নেয়। ভালো করে দেখে সে আবার দুই হাতে অস্ত্রটি তুলে ধরে দূরে তাক করে, আগের বার যেখানে তাক করেছিল এবারে তার থেকে একটু উপরে। সমস্ত ইন্দ্রিয় একাগ্র করে সে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাকায়। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে ট্রিগার টেনে ধরে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে

AMARBOI.COM

এক ঝলক কালো ধোঁয়ায় তার সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। ধোঁয়াটা সরে যেতেই সে অবাক হয়ে দেখে, লক্ষ্যবস্তুর পাথরটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সুহান আনন্দে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল, ট্রিনি তখনো সামনে তাকিয়ে আছে। তার সংবেদনশীল চোখে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। তার সংবেদনশীল শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে। সুহান খানিকক্ষণ ট্রিনির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ট্রিনি।

বল।

আমি এইমাত্র আমার অস্ত্রটি দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেছি।

ও।

তুমি শুনে অবাক হলে না? কী ব্যাপার? তুমি কী দেখছ।

না, কিছু না।

সুহান শব্দ করে হেসে বলল, তুমি দ্বিতীয় প্রজাতির রবোট। তোমার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা সম্ভব নয়। তুমি যখন চেষ্টা কর সেটা আমি খুব সহজে ধরে ফেলি।

ট্রিনি মাথা ঘুরিয়ে বলল, আমি মোটেই মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করছি না। আমি কিছু দেখছি না।

তুমি কি কিছু দেখার চেষ্টা করছ?

আমি তার উত্তর দিতে রাজি নই।

সুহান আবার শব্দ করে হেসে ফেলে বলল, তুমি একেবারে ছেলেমানুষি রবোট! তোমার ভিতরে একেবারে কোনোরকম জটিলতা নেই। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। কাল রাত থেকে তুমি খুব বিচিত্র রকম ব্যবহার করছ। আমার কাছে তুমি কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছ।

ট্রিনি কোনো কথা বলল না, যার অর্থ সত্যিই সে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে। সুহান বলল, আমি ইচ্ছে করলেই বের করতে পারি তুমি আমার কাছে কী লুকানোর চেষ্টা করছ। করব?

না।

সুহান আবার হেসে ফেলল। বলল, ঠিক আছে, তুমি থাক তোমার গোপন কথা নিয়ে।

সে আবার তার বিচিত্র অস্ত্রটি নিয়ে তার মাঝে বিস্ফোরক ভরতে থাকে। এটি তার একটি নতুন খেলা।

ট্রিনি বহুদূরে তাকিয়ে তার সংবেদনশীল চোখটি আরো সংবেদনশীল করে ফেলে। মাটিতে সে কুড়ি হার্টজ তরঙ্গের উপর সাতচল্লিশ কিলোহার্টজ এবং নব্বই মেগাহার্টজ তরঙ্গের সুষম উপস্থাপন অনুভব করেছে। প্রথমত, এই গ্রহে প্রাকৃতিক উপায়ে এই কম্পন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। তাছাড়া কুরু মহাকাশযানের মূল ইঞ্জিনের কম্পনের প্রথম হারমোনিক সাতচল্লিশ কিলোহার্টজ। বৈদ্যুতিক জেনারেটরের কম্পন নব্বই মেগাহার্টজ। তাহলে কি সত্যিই একটি কুরু মহাকাশযান নেমেছে এই গ্রহের মাটিতে? সুহানকে সে কি বলবে তার সন্দেহের কথা? যদি সেটা সত্যি না হয়? সুহানের তাহলে খুব আশাভঙ্গ হবে। আশাভঙ্গ একটি মানবিক ব্যাপার, সে আশাভঙ্গ ব্যাপারটি কী জানে না, কিন্তু দেখেছে। আশাভঙ্গ হলে সুহান দীর্ঘ সময় বিষণ্ণমুখে বসে থাকে। এটি অনেক বড় ব্যাপার। এবারে আশাভঙ্গ হলে সুহান কি সেটা সহ্য করতে পারবে?

ট্রিনির কপোট্রনে পরস্পরবিরোধী বেশ কয়েকটি চিন্তা খেলা করতে থাকে। সে দ্বিতীয়

প্রজাতির রবোট, পরস্পরবিরোধী চিন্তায় অভ্যস্ত নয়। কিছুক্ষণের মাঝেই সে তার কপোট্রনের একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কপোট্রনের সেই অংশটি তার শরীরের যে কয়টি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি হচ্ছে ডান হাত। সুহান দেখতে পায়, ট্রিনির ডান হাতটি প্রথমে দ্রুত কাঁপতে থাকে, তারপর এক সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নড়তে থাকে।

সুহান আগেও এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে দেখেছে। ব্যাপারটির কৌতুককর অংশটি কখনো তার চোখ এড়ায় নি, এবারেও এড়াল না। সে তার বিচিত্র অস্ত্রটি শুইয়ে রেখে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করে।

২

সুহান মহাকাশযানের জানালায় গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে ভয়ঙ্কর ঝড়ো বাতাস। প্রথম সূর্য অস্ত গিয়েছে। দ্বিতীয় সূর্যটি মোটেও প্রখর নয়, চারদিকে কেমন এক ধরনের লালাভ আলো। বছরের এই সময়টাতে হঠাৎ করে এই গ্রহের আবহাওয়া খুব খাপছাড়া হয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, উত্তপ্ত লাল বালু বাতাসে উড়তে থাকে। পাথর ভেঙে ভেঙে পড়ে, বাতাসে হু-হু করে বিচিত্র শব্দ হয় তখন। কেমন এক ধরনের মন খারাপ করা শব্দ। সুহান তখন মহাকাশযান থেকে বেশি বাইরে যায় না। চার দেয়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বসে তার ছোট ছোট যন্ত্রগুলো দাঁড়া করায়। যন্ত্রগুলো সহজ এবং বিচিত্র। মূল তথ্যকেন্দ্রের কোনো তথ্য ব্যবহার না করে তৈরী। ট্রিনি এই যন্ত্রগুলো দেখে একই সাথে বিরক্ত এবং বিস্মিত হয়, তার কপোট্রনের সহজ যুক্তিতর্কে দুটোর মাঝে বিশেষ পার্থক্য নেই। বিরক্তির কারণটুকু সহজ। এই ধরনের ছেলেমানুষি যন্ত্রের কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। ট্রিনির ধারণা, এগুলো তৈরি করা অহেতুক সময় নষ্ট করা। বিস্ময়টুকু অবশ্যি খাঁটি। মূল তথ্যকেন্দ্রের কোনো তথ্য ব্যবহার না করে এই যন্ত্রগুলো তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। যে পরিমাণ খুঁটিনাটি এবং মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন, এই শতাব্দীতে মনে হয় কোনো মানুষ একসাথে সেই জ্ঞান অর্জন করে নি। চেষ্টা করলে সম্ভব নয় সেটি সত্যি নয়, কিন্তু চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে কেউ চেষ্টা করে নি। ট্রিনির মতে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন জ্ঞান।

সুহান জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের ঝড়ো হাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তপ্ত বালুরাশি শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা দুয়েক আগে বাই ভার্বালে করে ট্রিনি পাহাড়ের দিকে উড়ে গেছে। এই রকম দুর্যোগের মাঝে ট্রিনির মতো একটি রবোটের বাইরে কী কাজ থাকতে পারে কে জানে। সুহান ব্যাপারটি নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে হাল ছেড়ে দেয়। হয়তো আবহাওয়ায় কোনো বড় পরিবর্তন আসছে, সে তার খোঁজ নিতে যাচ্ছে, গত ঝড়ে যেরকম হয়েছিল। কিংবা কে জানে হয়তো বিচিত্র কোনো নিশাচর প্রাণী এসেছে, গত বছর যেরকম এসেছিল। কিংবা কে জানে হয়তো পানির একটা বড় হ্রদ খুঁজে পেয়েছে, যেটা তারা অনেকদিন থেকে খুঁজছে।

সুহান মেঝেতে রাখা তার জেনারেটরটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মহাকাশযানের বেশ কয়েকটি জেনারেটর আছে। তার মাঝে একটির বেশ কিছু অংশ খুলে সে তার নিজের মতো করে একটি জেনারেটর তৈরি করেছে। বিশাল তারের কুণ্ডলী একটা শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রের মাঝে ঘুরছে। জেনারেটরটি ঘোরানো নিয়ে সমস্যা, যখন এ রকম ঝড়ো হাওয়া আসে সে

জানালায় একটা টারবাইন লাগিয়ে জানালাটি খুলে দেয়। আজও দিয়েছে। ঝড়ো হাওয়ায় টারবাইনটি ঘুরছে, সেটি ঘোরাচ্ছে জেনারেটরটি, সেখান থেকে মোটামুটি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ হচ্ছে। সুহান মেপে দেখল, ইচ্ছে করলে সে সত্যিকারের কিছু শক্তিশালী ব্যাটারি বিদ্যুতায়িত করে ফেলতে পারে। আপাতত তার সেরকম কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করার ইচ্ছা নেই। একটা টেসলা কয়েল জুড়ে দিয়েছে, সেখান থেকে শব্দ করে নীলাভ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে উত্তপ্ত বালু এসে ঘরের মাঝে একটা ঘূর্ণি তৈরি করেছে, সুহান তার মাঝে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে।

দরজা খুলে যখন ট্রিনি ঘরে ঢুকেছে তখন বাতাসের ঘূর্ণিতে ঘরের জিনিসপত্র উড়ছে। বাতাসের প্রচণ্ড গর্জন ঘরের মাঝে গুমরে উঠছে। লাল বালুতে ঘর অন্ধকার, সুহানের সমস্ত শরীর, মাথার চুল, চোখের ভুরু পর্যন্ত ধুলায় ধূসর। ট্রিনিকে দেখে সুহান একটু লজ্জা পেয়ে যায়। জানালাটা ঠেলে বন্ধ করে দিতেই হঠাৎ ঘরের ভিতরে এক ধরনের নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। সুহান ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একটা কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ট্রিনি, তুমি যদি একটু আগে আসতে তাহলে একটা অপূর্ব জিনিস দেখতে পেতে। টারবাইনের গিয়ারে বালু জমা হয়ে গিয়ারটা বন্ধ হয়ে গেল, না হয়—

সুহান।

চমৎকার বিদ্যুৎপ্রবাহ হয়। ইচ্ছে করলে ব্যাটারির সাথে—

সুহান—

কী হল?

সুহান, তুমি একটু স্থির হয়ে বস।

কেন ট্রিনি?

আমি তোমাকে খুব একটা জরুরি জিনিস বলব।

সুহান হঠাৎ একটু ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা গলায় বলল, কী হয়েছে ট্রিনি, তুমি কী বলবে?

AMARBOI.COM

জিনিসটি বলার আগে আমি নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে গিয়েছিলাম।

কী জিনিস ট্রিনি?

আমাদের এই গ্রহে একটা মহাকাশযান নেমেছে সুহান। পৃথিবীর মহাকাশযান।

সুহান হতবাক হয়ে ট্রিনির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় সে ঠিক বুঝতে পারছে না ট্রিনি কী বলছে।

ট্রিনি দুই হাতে সুহানকে শক্ত করে ধরে শান্ত গলায় বলল, সুহান, আমরা এই দিনটির জন্যে গত ষোলো বছর থেকে অপেক্ষা করছি। আজকে সেই দিনটি এসেছে। পৃথিবীর মানুষ এসেছে এই গ্রহে। তারা তোমাকে বুকে করে আগলে নেবে সুহান।

সুহান তখনো বিস্ফারিত চোখে ট্রিনির দিকে তাকিয়ে আছে। ফিসফিস করে বলল, মানুষ?

হ্যাঁ সুহান।

সত্যিকারের মানুষ?

হ্যাঁ।

আমার মতো মানুষ? আমার মতো?

হ্যাঁ সুহান। তোমার মতো।

তুমি নিজের চোখে দেখেছ? নিজের চোখে?

হ্যাঁ সুহান, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সুহান কেমন একটা ঘোরের মাঝে ক্রোমিয়াম দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে ধুলা পরিষ্কার করতেই ঝকঝকে আয়নার মতো স্বচ্ছ দেয়ালে তার প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। সুহান অবাক হয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে। কতকাল সে নিজেকে দেখে নি! তাকে দেখে কী করবে পৃথিবীর মানুষ? সে কাঁপা গলায় বলল, ট্রিনি।

বল সুহান।

আমার—আমার চুল কি খুব বেশি বড়?

না সুহান। মানুষের চুল এ রকম বড় হয়।

পোশাক? আমার পোশাক?

সুহান, তোমার পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

কিন্তু আমার পুরো শরীর ঢেকে যেতে হবে না?

আমি তোমাকে এক টুকরা নিও পলিমার বের করে দেব।

তারা কি আমার ভাষায় কথা বলবে?

নিশ্চয়ই তারা তোমার ভাষায় কথা বলবে। পৃথিবীতে মানুষের একটি ভাষা। আমি তোমাকে সেই ভাষা শিখিয়েছি সুহান।

আমাকে দেখে পৃথিবীর মানুষ কী করবে ট্রিনি?

আমি নিশ্চিত, তারা হতবাক হয়ে যাবে। যখন জানবে তুমি একা একা এই গ্রহে বড় হয়েছ, তারা তোমাকে বুকে টেনে নেবে।

তুমি নিশ্চিত ট্রিনি?

আমি নিশ্চিত।

সুহান অনিশ্চিতের মতো ক্রোমিয়ামের স্বচ্ছ দেয়ালে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠিক তার মতো মানুষের সাথে দেখা হবে তার? সত্যি দেখা হবে?

AMARBOI.COM

৩

কিরি এবং লাইনা মহাকাশযানের ছোট ল্যাবরেটরিতে বসে আছে। ছোট একটা স্কাউটশিপ বাইরে থেকে কিছু পাথরের নমুনা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে বাতাস নিয়ে এসেছে। নমুনাগুলো পরীক্ষা করে পৃথিবীর সাথে তুলনা করে সেগুলো একটি মনিটরে দেখানো হচ্ছিল। তুলনাটুকু বিস্ময়কর। জলীয় বাষ্পের অভাবটুকু ছাড়া হঠাৎ দেখে এটিকে পৃথিবী বলে ভুল করা সম্ভব। তাদের সামনে যে তথ্য রয়েছে সেটা দেখে মনে হয় পৃথিবীর মানুষ কোনোরকম পোশাক ছাড়াই এই গ্রহে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারবে। আশ্চর্য, এই তথ্যটুকু যখন দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখছিল তখন মাথার কাছে স্ক্রিনে মহাকাশযানের নিরাপত্তা রবোটের ধাতব কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মহামান্য কিরি, মহাকাশযানের বাইরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

কিরি অবাক হয়ে বলল, কী বললে?

একজন মানুষ।

কিরি লাইনার দিকে তাকাল, তারপর অবাক হয়ে স্ক্রিনে নিরাপত্তা রবোটটির দিকে তাকিয়ে বলল, একজন মানুষ?

হ্যাঁ মহামান্য কিরি, একজন মানুষ। মনে হয় সে মহাকাশযানের ভিতরে আসতে চাইছে।

লাইনা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, কোথায়? কোথায় মানুষ?

আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি মহামান্য কিরি এবং মহামান্যা লাইনা।

হঠাৎ করে দেয়ালের বিশাল স্ক্রিনে একজন অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরের মুখ ভেসে ওঠে। ঝড়ো বাতাসে তার চুল উড়ছে, তার পোশাক উড়ছে। উত্তপ্ত ধুলায় ধূসর হয়ে আছে তার মুখ, তার লম্বা কালো চুল। হাত দিয়ে মুখ থেকে লম্বা চুল সরিয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহাকাশযানের দিকে। কালো চোখে এক আশ্চর্য মুগ্ধ বিস্ময়।

লাইনা কাঁপা গলায় বলল, মানুষ! একজন সত্যিকারের মানুষ!

হ্যাঁ।

কোথা থেকে এল?

নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত মহাকাশযান থেকে। নিশ্চয়ই কোনোভাবে বেঁচে গিয়েছিল।

আর কেউ কি আছে?

মনে হয় না। থাকলে এই কিশোরটি একা এখানে আসত না।

তুমি বলছ এই কিশোরটি একা একা এই গ্রহে আছে?

আমি জানি না কিন্তু আমার তাই মনে হয়।

লাইনা উত্তেজিত হয়ে বলল, ওকে ভিতরে আসতে দাও। একা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!

কিরি মুখ ঘুরিয়ে লাইনার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, মহাকাশযানের নীতিমালায় জীবন্ত প্রাণী নিয়ে অনেক রকম বাধানিষেধ আছে।

জীবন্ত প্রাণী? লাইনা চিৎকার করে বলল, এটি জীবন্ত প্রাণী নয় কিরি—এটি একজন মানুষ। সত্যিকারের মানুষ।

কিরি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, একজন মানুষ।

এক্ষুনি দরজা খুলে ওকে ভিতরে আসতে দাও।

কিরি লাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, লাইনা, তুমি একটু শান্ত হও। আমি ওকে ভিতরে আনছি।

কিরি প্রতিরক্ষা রবোটকে বলল, কিউ-৪৬, তুমি এই মানুষটকে ভিতরে আসতে দাও। দুই নম্বর চ্যানেল দিয়ে কোয়ারেন্টাইন ঘরে। ওর শরীর স্ক্যান শুরু কর, রোগজীবাণু ভাইরাস কিছু থাকলে রিপোর্ট কর কিন্তু তাকে সেটা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা কোরো না। হয়তো এই গ্রহে থাকার জন্যে তার কিছু একটা মাইক্রোব দরকার আমরা যেটা জানি না।

ঠিক আছে মহামান্য কিরি।

সাথে সাথে লাইনা ল্যাবরেটরি ঘরের দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, কিরি তাকে থামাল। জিজ্ঞেস করল, লাইনা—

কী হল?

কোথায় যাও?

ছেলেটার সাথে দেখা করতে।

একটু দাঁড়াও লাইনা। তাকে কোয়ারেন্টাইন ঘরে আসতে দাও। প্রাথমিক একটা পরীক্ষা শেষ করে নিতে দাও।

কিন্তু—

হ্যাঁ, আরেকটা কথা লাইনা। ছেলেটার কথা এখন যেন জানাজানি না হয়। শুধু তুমি

আর আমি।

কেন?

কারণ আছে লাইনা। মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি। ব্যাপারটা আমাদের ঠিক করে সামলে নিতে হবে। বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠো না!

লাইনা আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কিন্তু একজন মানুষ!

আমি জানি লাইনা! আমাকে আগে তার সাথে দেখা করতে দাও। আমাকে আগে তার সাথে কথা বলতে দাও। তার কোনো ভাষা আছে কি না আমরা জানি না, যদি না থাকে, আমি তবুও তার সাথে ভাব বিনিময় করতে পারব। তুমি পারবে না।

৪

সুহান দীর্ঘ সময় মহাকাশযানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মহাকাশযানটি ঠিক তার মহাকাশযানের মতো। সে জানে কোনটি ভিতরে প্রবেশ করার দরজা। সে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জানে কোথায় ক্যামেরাগুলো আছে, সে দাঁড়িয়েছে যেন ঠিক করে তাকে দেখতে পায়। সে তার চুল পাট করে এসেছিল, বড় একটা নিও পলিমার কাপড় সারা দেহে জড়িয়ে। ঝড়ো বাতাসে তার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, এখন তার পোশাক উড়ছে। মনে হয় সে নিজেও বুঝি উড়ে যাবে। যখন মনে হল সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, তখন হঠাৎ করে উপরের গোল দরজাটা খুলে গেল। সেখান থেকে প্রথমে একটা রবোটের মাথা উঁকি দিল এবং এক মুহূর্ত পরে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে আসে।

সুহান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। ভিতরে চোখ ধাঁধানো আলো। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার অভ্যস্ত হতে। যখন হাত সরিয়ে চারদিকে তাকাল, দেখল একটা গোলাকার ঘরে সে এসেছে। ঘরের চারপাশে অনেক রকম যন্ত্রপাতি। উপরে একটি মনিটর। কিছু বাতি জ্বলছে এবং নিভছে, কোথা থেকে জানি তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আসছে।

আমাকে স্ক্যান করছে, সুহান নিজেকে বোঝাল, আমাকে স্ক্যান করে দেখছে আমার শরীরে কোনো রোগজীবাণু আছে কি না। আমি জানি, নেই। এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছে অন্যভাবে।

সুহান চারদিকে তাকাল। নিশ্চয়ই মানুষেরা এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। পৃথিবীর মানুষের ভাষা তো একটিই। তার সাথে কথা বলতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

হঠাৎ করে সামনের স্বচ্ছ দরজাটি খুলে গেল। সুহানের বুকে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। উত্তেজনায় তার বুক ধকধক করতে থাকে। তাহলে কি সে সত্যিই দেখবে একজন মানুষ? পৃথিবীর মানুষ? সত্যিকারের মানুষ? সুহান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, দেখে ঠিক একজন খোলা দরজা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে। দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল চোখ, কপালের দুপাশে রুপালি রঙের ছোঁয়া। সুহান হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কখনো কি সে কল্পনা করেছিল একজন মানুষকে সে সত্যি দেখতে পাবে?

মানুষের সাথে প্রথম দেখা হলে কী বলবে সব ঠিক করে রাখা আছে। সুহান মনে মনে সম্ভাষণটি কয়েকবার বলে একটু এগিয়ে যায়, তখন মানুষটি কোমল গলায় বলল, আমি

কিরি। এই মহাকাশযানের দলপতি।

সুহান অবাক হয়ে কিরির দিকে তাকাল, তার কথা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় নি। ঠিক তার ভাষাতেই কথা বলেছে, কিন্তু লোকটির কথায় কিছু একটা রয়েছে যেটাকে হঠাৎ করে খুব পরিচিত মনে হয়, সেটা কী সে ধরতে পারল না। কিরি একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

সুহান মাথা নাড়ল, একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ তার মাথায় উঁকি দিতে থাকে।

আমি তোমাকে আমাদের মহাকাশযানের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সুহান বিস্ফারিত চোখে কিরির দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ করে সে বুঝতে পেরেছে কিরি মানুষ নয়। কিরি একজন রবোট। সে কেমন করে বুঝতে পেরেছে জানে না কিন্তু তার কোনো সন্দেহ নেই। খুব বড় ধাক্কা খেল সুহান, তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল কিরির দিকে, তারপর প্রায় ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি রবোট। এখানে মানুষ নেই? আমি মানুষের সাথে কথা বলতে চাই।

কিরির মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় সাথে সাথে। কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি কেমন করে জান আমি রবোট?

আমি জানি। সুহান প্রায় চিৎকার করে বলল, তোমাদের এখানে মানুষ নেই? মানুষ?

সুহানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিরি আহত গলায় বলল, তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে আমি রবোট? আমি দশম প্রজাতির রবোট—আমার সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। আশ্চর্য!

আমি সারা জীবন রবোটের সাথে থেকেছি, রবোট দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

কেমন করে?

আমি জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি।

তোমার নাম কী ছেলে? তুমি কি একা এখানে?

হ্যাঁ, আমি একা। আমার সত্যিকার নাম আমি জানি না, ট্রিনি আমাকে সুহান ডাকে।

ট্রিনি?

হ্যাঁ, ট্রিনি। একজন রবোট, সে আমাকে বড় করেছে।

ও।

সুহান আবার একটু অস্থির হয়ে কিরির দিকে তাকাল। বলল, কোনো মানুষ নেই এখানে? মানুষ?

আছে। কিরি অন্যমনস্কের মতো বলল, আছে।

আমি একজন মানুষ দেখতে চাই।

দেখবে। অবশ্যি দেখবে। এস আমার সাথে।

সুহান জীবনের প্রথম যে মানুষটি দেখল সে লাইনা। আলোকোজ্জ্বল একটি ঘরের মাঝখানে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার চারপাশে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, সেগুলো নিয়ে সুহানের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

লাইনা একটা দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকল। ঘরের মাঝখানে সুহানকে দেখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একজন মানুষের দেহে এত রূপ থাকতে পারে এবং সেই মানুষটি সেই রূপ সম্পর্কে এত উদাসীন থাকতে পারে সে কখনো কল্পনা করে নি। এই অসম্ভব রূপবান মানুষটি একা একা এই নির্জন গ্রহে বড় হয়েছে, মানুষের ভালবাসা দূরে থাকুক, তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করে নি, এই প্রথমবার সে একজন মানুষকে দেখেছে,

AMARBOI.COM

চিন্তা করে হঠাৎ লাইনার বুকের মাঝে জানি কেমন করে ওঠে। কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে যায়। সুহানের কাছাকাছি গিয়ে নিজের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই সুহান। আমি লাইনা।

মানুষের সাথে দেখা হলে কী করতে হয় সেটি সুহান থেকে ভালো করে সম্ভবত কেউ জানে না। অসংখ্যবার ব্যাপারটি সে কল্পনা করেছে কিন্তু লাইনার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে তার সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। সুহান জানে, একজন মানুষ যখন অন্য একজন মানুষের দিকে তার হাত এগিয়ে দেয়, সেই হাত স্পর্শ করে ছেড়ে দিতে হয় কিন্তু সে লাইনার হাত ছেড়ে দিল না। দুই হাতে সেটিকে ধরে রেখে অনেকটা বিভ্রান্তের মতো লাইনাকে নিজের কাছে টেনে আনল। লাইনার মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হঠাৎ প্রায় আর্তস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল, তুমি মেয়ে!

লাইনা হেসে বলল, হ্যাঁ, আমি মেয়ে।

সুহান ফিসফিস করে বলল, আমি ছেলে।

আমি জানি।

আমি কখনো মেয়ে দেখি নি।

আমি তাই ভাবছিলাম। তুমি আগে কখনো অন্য মানুষ দেখ নি।

আমি তোমাকে দেখি?

লাইনা একটু অবাক হয়ে বলল, দেখ।

সুহান সাথে সাথে লাইনাকে কাছে টেনে আনে, দুই হাতে তার মুখটি স্পর্শ করে তার চোখের দিকে তাকায়। হঠাৎ সে কেমন জানি শিউরে উঠে বলল, মানুষের চোখ! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

কেন সুহান? আশ্চর্য কেন?

আমি জানি না কেন, কিন্তু দেখ কী অপূর্ব! কী গভীর! চোখের দিকে তাকালে মনে হয় আমি বুঝি হারিয়ে যাব। কী রকম একটা রহস্য—

লাইনা সুহানের তীব্র চোখের দৃষ্টির সামনে হঠাৎ কেমন জানি অসহায় অনুভব করতে থাকে, বুকের মাঝে এক ধরনের আলোড়ন হতে থাকে। কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, সুহান—

বল।

তুমি তোমার নিজের চোখ দেখ নি?

হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু নিজের চোখে তো নিজের কাছে কোনো রহস্য নেই। আমি তো আমাকে জানি। কিন্তু আরেকজনের চোখে রহস্য আছে। আমি তোমাকে আগে কখনো দেখি নি। কিন্তু তোমার চোখের ভিতরে তাকালে মনে হতে থাকে আমি বুঝি তোমাকে কত কাল থেকে চিনি। মনে হয়, তোমার ভিতরে কত বিস্ময়।

সুহান কথা থামিয়ে প্রায় হতবাক হয়ে লাইনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাইনা বিব্রত হয়ে বলল, সুহান—

আমার—আমার ইচ্ছে করছে—

কী?

আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মাঝে চেপে ধরি।

লাইনা একটু কেঁপে উঠল। সুহান আবার কাতর গলায় বলল, লাইনা, তোমাকে আরেকটু দেখি?

AMARBOI.COM

লাইনা কেমন জানি ভয় পাওয়া চোখে সুহানের দিকে তাকাল। সুহান ঠিক কী বলতে চাইছে সে বুঝতে পারল না, তবু অনিশ্চিতের মতো বলল, দেখ।

সুহান ধীরে ধীরে তার হাত তুলে লাইনার মুখে, কপালে, গালে স্পর্শ করে। ঠোঁটে হাত বুলিয়ে তার চুলের মাঝে আঙুল প্রবেশ করিয়ে খুব সাবধানে চুলগুলো দেখে। তারপর লাইনা কিছু বোঝার আগে তাকে অনাবৃত করতে শুরু করে। লাইনা সুহানকে বাধা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে থেমে গেল। সুহান অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই চোখে কোনো কামনা নেই। শুধু কৌতূহল।

লাইনা তাকে বাধা দিল না।

মানুষ ও অমানুষ

১

লাইনা সুহানকে কোয়ারেন্টাইন ঘরে রেখে কিরির কাছে এসেছে। কিরি তার সামনের স্ক্রিনটি সুইচ টিপে বন্ধ করে শান্ত গলায় বলল, ছেলেটি এখন কী করছে লাইনা?

কিছু করছে না। মিডি রবোট তাকে পরীক্ষা করে দেখছে। একটু রক্ত নেবে, টিস্যু নেবে, পরীক্ষা করে দেখবে।

ও।

কী আশ্চর্য একটা ব্যাপার কিরি! তুমি চিন্তা করতে পার একজন সত্যিকার মানুষ থাকে এই গ্রহে!

হ্যাঁ।

তার মহাকাশযান যখন বিধ্বস্ত হয়েছিল তখন তাকে মায়ের গর্ভ থেকে ট্রিনি—

জানি।

লাইনা একটু অবাক হয়ে বলল, কেমন করে জান?

আমি এখানে বসে তোমাদের দেখছিলাম।

লাইনা চমকে কিরির দিকে তাকাল। হঠাৎ অনুভব করে তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে বলল, এই ছেলেটি একা একা ষোলো বছর এই গ্রহে কাটিয়েছে। তুমি চিন্তা করতে পার?

কিরি কেমন জানি রুক্ষ গলায় বলল, পারি। তোমরা যখন শীতলঘরে ঘুমিয়েছিলে তখন পঞ্চাশ বছর আমি একা একা ছিলাম।

কিন্তু—

কিন্তু কী?

প্রথমত, তুমি সত্যিকার অর্থে একা ছিলে না। তুমি জানতে এই মহাকাশযানে আরো অনেক মানুষ আছে। দ্বিতীয়ত—

দ্বিতীয়ত?

দ্বিতীয়ত, তুমি মানুষের মতো কিন্তু নও। তোমাকে এ ধরনের পরিস্থিতির জন্যে তৈরি করা হয়েছে।

AMARBOI.COM

কিরি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর লাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, এই ছেলেটা যে এখানে আছে সেটা কতজন জানে?

আমি আর তুমি।

চমৎকার! আমি চাই সেটা যেন আর কেউ না জানে।

লাইনা জিজ্ঞাসু চোখে বলল, কেন?

ছেলেটা আমাদের জন্যে অনেক বড় সৌভাগ্য বয়ে এনেছে লাইনা। তাকে আমাদের দরকার।

কিরি ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারল না। লাইনা অনিশ্চিতের মতো বলল, হ্যাঁ। সুহানেরও আমাদের দরকার। মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে সে একেবারে খ্যাপার মতো হয়ে আছে।

কিরি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি ঠিক কী বলছি তুমি বুঝতে পার নি লাইনা।

হঠাৎ করে লাইনার বুক কেঁপে ওঠে। কিরির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কী বলতে চাইছ কিরি?

আমি বলতে চাইছি ছেলেটাকে আমাদের দরকার। তার শরীরটাকে।

মানে?

আমরা এই গ্রহে বসতি স্থাপন করতে এসেছি। আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় তিন হাজার মানুষের ভ্রূণ। তারা এই গ্রহে বাঁচতে পারবে কি না সেটা নির্ভর করবে কিছু তথ্যের ওপর। এই ছেলেটা না হলে সেই তথ্য বের করতে আমাদের এক যুগ লেগে যেত। এখানে আর আমাদের এক যুগ অপেক্ষা করতে হবে না। ছেলেটার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে কয়েক ঘণ্টার মাঝে সব তথ্য পেয়ে যাব।

AMARBOI.COM

তুমি—তুমি বলছ দেহ ব্যবচ্ছেদ করে?

হ্যাঁ। তার শরীরের প্রত্যেকটা কোষ মূল্যবান লাইনা। তার প্রত্যেকটা অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ মূল্যবান।

লাইনার হঠাৎ কেমন যেন গা গুলিয়ে আসে। পিছনে সরে এসে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি সুহানকে মেরে ফেলার কথা বলছ?

হ্যাঁ, লাইনা।

লাইনা বিস্ফারিত চোখে কিরির দিকে তাকিয়ে থাকে। কিরির ভাবলেশহীন মুখ, স্থির চোখ দেখে হঠাৎ তার মনে হতে থাকে সে বুঝি একটি দানবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটি অমানুষ পিশাচের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, তুমি নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি তাকে মেরে ফেলার কথা বলছ না?

কিরি তার প্রত্যেকটা শব্দে জোর দিয়ে বলল, আমি তাকে সত্যি মেরে ফেলার কথা বলছি লাইনা।

কিন্তু সে একজন মানুষ।

কিরি একটু অবাক হয়ে লাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, জৈবিক হিসেবে সে মানুষ হতে পারে কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে তো মানুষ নয়। পৃথিবীর কোনো তথ্যকেন্দ্রে তার নাম নেই, এই গ্রহের একটি বন্যপ্রাণীর সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই।

লাইনা চিৎকার করে বলল, কী বলছ তুমি? কী বলছ?

এখন তুমি সম্ভবত বুঝতে পারছ, আমাকে—একজন রবোটকে কেন মহাকাশযানের

দলপতি করা হয়েছে।

না। লাইনা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, বুঝতে পারছি না।

তুমি বুঝতে পারছ কিন্তু স্বীকার করতে চাইছ না। সুহান ছেলেটির জন্যে তোমার মতো আমারও মমতা আছে লাইনা। কিন্তু আমি আমার মমতাকে পাশে সরিয়ে আমার দায়িত্বে ফিরে যেতে পারি। আমার দায়িত্ব মানুষের জন্যে একটা নতুন বসতি তৈরি করা। রবোটের জন্যে নয়—মানুষের জন্যে। এই গ্রহে সেটি সম্ভব কি না কেউ জানত না। কিন্তু এখন আমি জানি সেটা সম্ভব হবে। সুহানের শরীর থেকে আমরা অমূল্য সব তথ্য পাব। ভ্রূণগুলো বিকাশের সময় আমরা সেই তথ্য ব্যবহার করব—

লাইনা দুই হাতে তার কান চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, তুমি চুপ কর। আমি আর শুনতে চাই না।

কিরি থেমে গেল। তার মুখে হঠাৎ এক ধরনের বিষাদের ছায়া পড়ে। প্রায় শোনা যায় না এ রকম স্বরে বলল, রবোটকে আসলে রবোটের মতোই তৈরি করতে হয়। রবোটকে মানুষের মতো তৈরি করা খুব বড় ভুল। তাহলে রবোটকে মানুষের দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু মানুষ তবুও কখনো রবোটকে বুঝতে পারে না। কখনো না।

লাইনা হিংস্র গলায় বলল, দুঃখ-কষ্ট? যন্ত্রণা? কপোট্রনে ভোল্টেজের অসামঞ্জস্য আর দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এক জিনিস নয়। তুমি মানুষের অনুভূতির কথা এনো না কিরি। মানুষের অনুভূতির কথা বলে তুমি মানুষকে অপমান কোরো না।

আমি দশম প্রজাতির রবোট। আমি মানুষের এত কাছাকাছি যে—

মানুষের কাছাকাছি? লাইনার মুখ বিদ্রূপে বিকৃত হয়ে যায়, বাচ্চা একটা ছেলে তোমার মুখের প্রথম কথাটি শুনে বুঝে ফেলেছে তুমি রবোট, আর তুমি দাবি কর তুমি মানুষের কাছাকাছি? লজ্জা করে না কথাটি মুখে আনতে?

কিরির মুখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি আমাকে ঘৃণা কর লাইনা?

না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। তুমি মানুষ হলে করতাম। কিন্তু একটা যন্ত্রকে ঘৃণা করা যায় না।

তুমি—তুমি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ?

না—যন্ত্রকে অপমান করা যায় না।

কিরির চেহারা হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অনেক কষ্টে সে নিজেকে শান্ত করে বলল, লাইনা, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও। যাবার আগে শুধু একটি জিনিস শুনে যাও। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি একটা যন্ত্র। পৃথিবীর মানুষের জন্যে এই বসতি তৈরি করায় আমার কোনো স্বার্থ নেই। আমাকে তুমি ঘৃণা করবে, আমি জানি শুধু তুমি নও, এই মহাকাশযানের প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু এই গ্রহে মানুষের বসতি যদি গড়ে ওঠে সেটি সম্ভব হবে আমার জন্যে। কারণ আমি আবেগকে পাশে সরিয়ে একটি প্রাণীকে হত্যা করে তার কাছ থেকে অমূল্য তথ্য বের করব। সেই প্রাণীটি তোমাদের কাছে মানুষ মনে হলেও সে আসলে মানুষ নয়। মূল তথ্যকেন্দ্রে যার সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই সে পৃথিবীর মানুষ নয়, পৃথিবীর তার জন্যে কোনো দায়িত্ব নেই। এই সহজ এবং আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুর একটি সত্যকে তোমরা গ্রহণ করতে পার না বলে তোমাদের এই মহাকাশযানের দলপতি করা হয় নি। এই মহাকাশযানের দলপতি করা হয়েছে আমাকে—

লাইনা বাধা দিয়ে শ্লেষের সাথে বলল, মহাকাশযানের দলপতি মহামান্য কিরি—

AMARBOI.COM

কিরি লাইনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। লাইনা চাপা স্বরে বলল, সম্মানিত দলপতি, আমি কি যেতে পারি?

কিরি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, যেতে পার।

লাইনা ঝড়ের মতো ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

২

লাইনা মাথা নিচু করে মহাকাশযানের করিডোর ধরে হাঁটছে। দুই চোখ অশ্রুরুদ্ধ, ভয়ঙ্কর এক ধরনের আক্রোশে তার সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। করিডোরের শেষ মাথায় তার ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপের সাথে দেখা হল। লাইনাকে থামিয়ে অবাক হয়ে বলল, লাইনা, তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বল আমাকে।

গ্রুসো। মহাকাশযানের দলপতির ক্ষমতা কতটুকু?

গ্রুসো অবাক হয়ে বলল, তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

আমি জানতে চাই। কতটুকু?

অনেক।

সে কি মানুষ হত্যা করতে পারে?

গ্রুসো চমকে উঠে লাইনার দিকে তাকাল, কোনো কথা বলল না। লাইনা আবার জিজ্ঞেস করল, পারে?

আমি যতদূর জানি, পারে। মহাকাশযানের দলপতির সেই ক্ষমতা আছে। তাকে পরে সে জন্যে জবাবদিহি করতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনে তার প্রাণদণ্ড দেয়ার অধিকার আছে। কিন্তু লাইনা, তুমি কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ?

কারণ আছে গ্রুসো।

কী কারণ?

আমি তোমাকে বলতে পারব না গ্রুসো। তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। তোমার ভালোর জন্যে বলছি।

লাইনা গ্রুসোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, গ্রুসো তার হাত ধরে বলল, আমি তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, লাইনা?

লাইনা গ্রুসোর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ম্লানমুখে বলল, না, গ্রুসো। আমাকে এখন আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না।

লাইনা কোয়ারেন্টাইন ঘরটির সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। একটু আগে সে যখন তাকে এই ঘরে রেখে গিয়েছিল তখন সে ভেবেছিল, সুহান তাদের অতিথি। এখন সে জানে সুহান অতিথি নয়, সুহান তাদের বন্দি।

লাইনা হাতলে হাত দিতেই ঘরের দরজাটি খুলে গেল। সে মহাকাশযানের দ্বিতীয় অধিপতি, তার যে কোনো ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। লাইনা ভিতরে ঢুকে সুহানকে না দেখে চাপা গলায় ডাকল, সুহান—

AMARBOI.COM

বল।

তুমি কোথায়?

এই তো এখানে। সুহান একটা পর্যবেক্ষণ টেবিলের নিচে অসংখ্য যন্ত্রপাতির ভেতর থেকে বের হয়ে এল। তার হাতে চৌকোণো একটা বাক্স, সেখান থেকে নানা ধরনের তার এবং অপটিক্যাল ফাইবার ঝুলছে। লাইনা চিৎকার করে বলল, সাবধান! হাই ভোল্টেজ—

ভয় নেই। আমি অফ করে দিয়েছি।

অফ করে দিয়েছ? লাইনা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সুহানের দিকে তাকাল, মনে হল সে ঠিক বুঝতে পারছে না সুহান কী বলছে। অবাক হয়ে বলল, কেমন করে করলে?

ভিতরে দুটি মাইক্রো সুইচ আছে। দেখেই বোঝা যায় হাই ভোল্টেজের জন্যে তৈরী, বিদ্যুৎ অপরিবাহী আস্তরণ খুব বড়। প্রথমটার তিন নম্বর পিন—

তুমি—তুমি—কেমন করে জান?

দেখলেই তো বোঝা যায়। টেবিলটা উপরে উঠছিল না, নিশ্চয়ই স্টেপিং মোটরে গোলমাল। একা বসেছিলাম, তাই ভাবলাম ঠিক করে দিই।

ঠিক করে দিই? লাইনা তখনো বুঝতে পারছিল না, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, তুমি পর্যবেক্ষণ টেবিলের কন্ট্রোল ঠিক করে দিয়েছ?

পুরোটা এখনো ঠিক হয় নি। একটা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার হলে—

তুমি বলতে চাও, কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্রের কোনো সাহায্য ছাড়া তুমি জিনিস ঠিক করতে পার?

সুহান একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমি জানি সেভাবে ঠিক করার কথা নয়, অযথা সময় নষ্ট হয়। ট্রিনি আমাকে বলেছে। মানুষদের অন্যভাবে কাজ করার কথা। কিন্তু আমার এভাবে কাজ করতে ভালো লাগে। একটা কৌতূহল হয়—

লাইনা তখনো ব্যাপারটি ধরতে পারছিল না। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, তুমি বলতে চাও কোন জিনিস কীভাবে কাজ করে তুমি জান?

মহাকাশযানের যেসব জিনিসপত্র আছে সেগুলো মোটামুটি জানি। আমার সময়ের অভাব ছিল না। তাই শিখেছি—

কিন্তু সেটা তো অবিশ্বাস্য! সেটা অসম্ভব!

আর আমাকে করতে হবে না। সুহান এক গাল হেসে বলল, এখন আমি মানুষের সাথে থাকব, মানুষের মতো ব্যবহার করব। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে, কিন্তু—

লাইনার মুখ হঠাৎ রক্তহীন হয়ে যায়। কাতর গলায় বলল, সুহান—

কী?

আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি সুহান।

কী কথা?

আমি কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। খুব জরুরি কথা। বেশি সময় নেই, খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে।

সুহান লাইনার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন একটি অশুভ আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে।

তুমি জান, আমাদের দলপতি একটি রবোট?

জানি।

দশম প্রজাতির রবোট। আমাদের ধারণা ছিল দশম প্রজাতির রবোট ঠিক মানুষের

মতো। কিন্তু একটু আগে আমি আবিষ্কার করেছি দশম প্রজাতির রবোটে একটি খুব বড় ত্রুটি আছে।

কী ত্রুটি?

যে মানুষ সম্পর্কে তথ্য মূল তথ্যকেন্দ্রে নেই তাকে সে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না।

তার মানে আমি—

হ্যাঁ, তোমাকে সে মানুষ হিসেবে মেনে নেয় নি। সে এখন তোমাকে—তোমাকে—লাইনা মুখ ফুটে কথাটি উচ্চারণ করতে পারে না।

আমাকে কী?

তোমাকে মেরে ফেলতে চায়।

মেরে ফেলতে চায়? সুহান এমনভাবে লাইনার দিকে তাকাল যেন লাইনার কোনো কথা বুঝতে পারছে না। অনেকটা অন্যমনস্কের মতো বলল, আমাকে মেরে ফেলতে চায়? আমাকে?

হ্যাঁ। তোমার শরীরে নাকি অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। সেই তথ্য ব্যবহার করে এই গ্রহে মানুষের বসতি হবে।

সুহান আবার বিড়বিড় করে বলল, আমাকে মেরে ফেলবে?

হ্যাঁ, সুহান। তোমার খুব বড় বিপদ।

সুহানের মুখে খুব ধীরে ধীরে এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা এসে ভর করে। তার চোখ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে। সে কেমন এক ধরনের অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে লাইনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তোমরা, মানুষেরা সেই রবোটের কথা মেনে নিয়েছ।

লাইনা সুহানের কাঁধে হাত রেখে বলল, না সুহান, আমরা মেনে নিই নি। আমি তাই তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে এক্ষুনি পালিয়ে যেতে হবে।

পালিয়ে যেতে হবে?

হ্যাঁ, যেভাবে পার। যত দূরে পার। কিরি দশম প্রজাতির রবোট। তার ভয়ঙ্কর ক্ষমতা সুহান। আমরা এখন তার হাতের মুঠোয়। আমাদের একটু সময় দাও। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করে আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করব। যতদিন সেটা করতে না পারছি তুমি লুকিয়ে থাকবে। তুমি এখানে আসবে না—

আমি এখানে আসব না? আমি মানুষ কিন্তু আমি মানুষের কাছে আসতে পারব না?

আমি—আমি খুব দুঃখিত সুহান।

সুহান কেমন জানি হাহাকার করে বলল, আমি একজন মানুষ, তবু একটি রবোটের জন্যে আমি মানুষের কাছে আসতে পারব না?

আমি খুব দুঃখিত সুহান। খুব দুঃখিত। কিন্তু এখন আমাদের কিছু করার নেই। তোমাকে এক্ষুনি পালিয়ে যেতে হবে। এক্ষুনি। আমি তোমাকে এখন মহাকাশযানের দরজা খুলে বের হয়ে চলে যেতে দিতে পারব। কিন্তু পরে কী হবে আমি জানি না। তুমি এক্ষুনি আমার সাথে আস। এই মুহূর্তে—

সুহান লাইনার দিকে ঘুরে তাকাল। হঠাৎ তাকে আঁকড়ে ধরে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, তুমি যাবে আমার সাথে?

আমি?

হ্যাঁ। তুমি। যাবে?

লাইনার মুখ গভীর বিষাদে ঢেকে যায়। সে এই অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরটির মুখ নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে টেনে এনে তার ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে বলল, সুহান, বিশ্বাস কর, যদি সম্ভব হত আমি তোমার সাথে যেতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাকে নিরাপদে এখান থেকে বের করে দিতে পারব শুধু আমি। সেটা আমি শুধু করতে পারি ভিতরে থেকে—

তাহলে আমিও যাব না। রবোটটাকে আমি—

না সুহান, তুমি যাবে। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবে হোক তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। একটা রবোটের হাতে আমি তোমাকে মরতে দেব না। কিছুতেই মরতে দেব না—

সুহান লাইনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে পানি টলটল করছে। সে আগে কখনো মানুষকে কাঁদতে দেখে নি কিন্তু দেখেই সে বুঝতে পারল।

মহাকাশযানের দরজায় লাইনা তার গোপন সংখ্যা ব্যবহার করে দরজা খুলে দিল। মহাকাশযানের দ্বিতীয় অধিপতি হিসেবে তার দুবার এই সংখ্যা ব্যবহার করার অনুমতি আছে। বিথ কাউন্সিলে তাকে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। যদি জবাবদিহি তাদের মনঃপূত না হয়, তার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে চিরদিনের জন্যে কোনো একটি ভূগর্ভস্থ শীতলঘরে সরিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে লাইনার সেসব কথা মনে পড়ল না। সে মহাকাশযানের গোল জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসে সুহান হেঁটে যাচ্ছে। তার চুল উড়ছে, কাপড় উড়ছে বাতাসে। সুহান মুখ নিচু করে হাঁটছে। লাইনা দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে জানে সুহানের দুই চোখে পানি।

AMARBOI.COM

৩

নিজের ঘরে ফিরে এসে লাইনা আবিষ্কার করে সেখানে কিরি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। লাইনাকে দেখে সে ক্রুদ্ধ গলায় হিসহিস করে বলল, সুহান কোথায়?

নেই।

কোথায়?

আমি তাকে তার গ্রহে ফিরে যেতে দিয়েছি।

কেমন করে যেতে দিয়েছ?

আমি আমার গোপন সংখ্যা ব্যবহার করেছি।

গোপন সংখ্যা ব্যবহার করেছ? কিরি মাথা নেড়ে বলল, তার ফল কী হতে পারে তুমি জান?

জানি।

আমি তোমাকে কী বলেছিলাম তোমার মনে আছে?

মনে আছে।

তুমি শুধু গোপন সংখ্যা ব্যবহার কর নি, সেটা ব্যবহার করেছ আমার আদেশ অমান্য করার জন্যে। তুমি জান আমার আদেশ অমান্য করা প্রথম মাত্রার অপরাধ?

সম্ভবত।

তুমি জান প্রথম মাত্রার অপরাধের শাস্তি কী?

লাইনা স্থির চোখে কিরির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকে শাস্তি দেবার ভয় দেখিয়ো না।

আমার কথার উত্তর দাও। তুমি জান?

জানি।

তুমি জান তোমাকে সেই শাস্তি দিতে আমার কপোট্রনের একটি ফ্রিকোয়েন্সিও এতটুকু নড়বে না? একটি সাইকেল বিচ্যুত হবে না?

আমি জানি কিরি।

কিরি এক পা এগিয়ে এসে লাইনার দিকে তাকায়। ঘরের আলো তির্যকভাবে তার মুখে পড়ছে। ভয়ঙ্কর ভাবলেশহীন একটা মুখ। হঠাৎ তার চোখ থেকে সবুজ এক ধরনের আলো বের হতে শুরু করে। তাকে দেখাতে থাকে অশরীরী একটা প্রাণীর মতো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লাইনা এক ধরনের অশুভ আতঙ্ক অনুভব করতে শুরু করে।

কিরি লাইনার কাছে এসে এক হাতে লাইনার মাথার পিছনে ধরে এক ধরনের অপার্থিব শক্তি প্রয়োগ করে নিজের কাছে টেনে আনে। তার মুখের কাছে নিজের মুখ নামিয়ে এনে হিসহিস করে বলল, আমার শরীর ইস্পাত, ক্রোমিয়াম আর ঝিলনিয়ামের একটা সঙ্কর ধাতুর তৈরী। উপরে বায়োপলিমারের একটা পাতলা আবরণ আছে। আমি ইচ্ছে করলে এক হাতে একটা লোহার বিম ভেঙে দু টুকরা করে ফেলতে পারি। তোমার খুলি ইচ্ছে করলে আমি ডিমের খোসার মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারি। ইচ্ছে করলে আমার আঙুল থেকে কয়েক মিলিয়ন ভোল্ট বের করে তোমার এই সুন্দর শরীরকে দূষিত অঙ্গারে পাল্টে দিতে পারি। ইচ্ছে করলে তোমার শরীর আমি ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিতে পারি। সে জন্যে আমাকে কারো কাছে জবাবদিহি পর্যন্ত করতে হবে না। সেটা করতে আমার কপোট্রনে একটি সাইকেলও বিচ্যুত হবে না।

লাইনা ভয়ার্ত চোখে কিরির দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না।

কিন্তু আমি তোমাকে এই মুহূর্তে শেষ করব না। কেন জান?

লাইনা মাথা নাড়ল, সে জানে না।

আমি তোমার হৃদয়হরণকারী সুহানের শরীরে একটি পালসার প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি। প্রতি তিন মিলি সেকেন্ডে একবার সেই পালসার বার মেগা হার্টজের একটা সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। আমি জানি সে কোথায় যাচ্ছে। আমি যখন ইচ্ছে তাকে ধরে আনতে পারব। আমি চাই যখন তাকে আমি ধরে আনি তুমি যেন কাছাকাছি থাক।

লাইনা ফিসফিস করে বলল, কেন সেটা তুমি চাও?

তুমি জানতে চাও কেন?

হ্যাঁ।

কারণ দশম প্রজাতির রবোট মানুষের খুব কাছাকাছি। মানুষের যেরকম ক্রোধ হয়, ভয়ঙ্কর ঈর্ষা হয়, আমারও সেরকম ভয়ঙ্কর ক্রোধ হয়, ঈর্ষা হয়। মানুষ যেরকম প্রতিশোধ নেয় সেরকম প্রতিশোধ নিই—

কিসের প্রতিশোধ?

কিরি ক্রোধে চিৎকার করে বলল, তুমি জান না কিসের প্রতিশোধ? তুমি অবহেলায় আমাকে ছুড়ে ফেলে ছুটে গেলে একটি বাচ্চাছেলের কাছে?

অমানুষিক আতঙ্কে লাইনার হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে চায়। হঠাৎ করে অনেক কিছু সে বুঝতে পারে, কিছু একটা বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই কিরির শরীর থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি বের হয়ে আসে। লাইনা সমস্ত শরীরে এক ধরনের অশরীরী ঝাঁকুনি অনুভব করে, চামড়া পোড়ার একটি গন্ধ বের হয়, নীল আলো আর কালো ধোঁয়ার মাঝে তার সমস্ত শরীর

AMARBOI.COM

একটি জড়বস্তুর মতো ছিটকে গিয়ে দেয়ালকে আঘাত করে। জ্ঞান হারানোর আগে সে দেখতে পায় কিরি উদ্যত হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার আঙুলের মাথা থেকে বিদ্যুতের নীলাভ স্ফুলিঙ্গ তার পাশের বাতাসকে আয়নিত করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।

৪

মহাকাশযানের মূল চত্বরটির একপাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে কিরি দাঁড়িয়ে আছে। তার একটি পা টেবিলের উপর। নিজের হাত দুটি সে অন্যমনস্কভাবে নাড়ছে, মাঝে মাঝেই সেখান থেকে নীলাভ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসছে। কিরির মুখ ভাবলেশহীন, তার চোখ থেকে সবুজ এক ধরনের আলো বের হচ্ছে। সেই আলোটি হঠাৎ তাকে একটা অশরীরী রূপ দিয়েছে।

কিরির সামনে মহাকাশযানের সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেও তাদের কাছে কিরি ছিল একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ। এখন আর নয়। হঠাৎ করে মনে হচ্ছে তারা কিরিকে জানে না।

কিরি মুখ তুলে বলল, আমি তোমাদের একটি জরুরি কথা বলার জন্যে ডেকেছি। সবাই এসেছ বলে অনেক ধন্যবাদ। মাত্র সেদিন আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি একজন রবোট, মানুষ হয়ে তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি হিসেবে মেনে নেবে কি না। তোমরা একবাক্যে আমাকে দলপতি হিসেবে মেনে নিয়েছিলে।

আমি মানুষ নই। আমি মানুষের জন্যে একটি কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। এই গ্রহে মানুষকে তাদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করতে এসেছি। পৃথিবীর সাথে অনেক মিল থাকলেও এই গ্রহে কিছু বড় ধরনের তারতম্য রয়েছে। তাই মানুষকে এই গ্রহে সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে হলে তাদের শরীরে কিছু বড় ধরনের পরিবর্তন করতে হবে। মানুষের ভ্রূণগুলোকে ঠিকভাবে বিকাশ করাতে হবে। কাজটি দুঃসাধ্য, সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি নয়। কিন্তু আমাদের হাতে একটি অভাবনীয় সুযোগ এসেছে। এই গ্রহে একজন জীবন্ত মানুষকে পাওয়া গেছে যে মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে একা এই গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থায় বড় হয়েছে। সেই মানুষটি থেকে আমরা এমন কিছু তথ্য পেতে পারি যেটা ব্যবহার করা হলে এই বসতি স্থাপনের সাফল্যের সম্ভাবনা হবে শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগ।

এই মহাকাশযানের দলপতি হিসেবে আমি সেই সুযোগ ছেড়ে দিতে পারি না, তার জন্যে আমাকে এমন একটি কাজ করার প্রয়োজন হল যেটি তোমাদের কাছে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। কাজটি হচ্ছে, সেই মানুষের দেহটি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা। কাজটি সবচেয়ে সুচারুভাবে করা যেত যদি তোমরা সেটি কেউ না জানতে। কিন্তু লাইনা সেটি জেনেছিল এবং লাইনার কাছ থেকে তোমরা সবাই জেনেছ। লাইনা আমার সিদ্ধান্তটি সমর্থন করে নি এবং আমি জানি তোমরাও নিশ্চয়ই আমার সিদ্ধান্তটি সমর্থন করবে না। সে কারণে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছি আমি একা। এর জন্যে কোনো মানুষকে কখনো কোনো অপরাধবোধে ভুগতে হবে না। কিন্তু আমি জানি, তোমরা কখনো আমাকে ক্ষমা করবে না, তোমাদের সাথে আমার যে চমৎকার একটি সম্পর্ক ছিল সেটি শেষ হয়ে গেল। তোমাদের সামনে আমি এখন একটি হৃদয়হীন দানব ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি দশম প্রজাতির রবোট। আমার অনুভূতি মানুষের কাছাকাছি। আমি তোমাদের

ঘৃণা অনুভব করতে পারি। আমার বুকের ভিতরে সেটা নিয়ে তীব্র একটি ব্যথা কিন্তু তোমরা—মানুষেরা সেটি কখনো সহানুভূতি নিয়ে দেখবে না। তোমাদের কাছে আমি অনুভূতিহীন নিষ্ঠুর একটি রবোট।

আমি সেটা স্বীকার করে নিয়েছি। আমার চেহারায় খানিকটা রবোটের রূপ দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃত। আমার আচরণে খানিকটা নিষ্ঠুরতা আনা হয়েছে, সেটাও ইচ্ছাকৃত। আমি জানি, তোমাদের বন্ধুত্ব সম্ভবত আমি আর পাব না। অতীতে পেয়েছি, সেটাই আমি গভীর ভালবাসা নিয়ে মনে রাখব।

এর মাঝে অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়েছে। লাইনা আমার কথা অমান্য করে সেই মানুষটিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমি মানুষটিকে তোমাদের সবার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলাম, সে অপূর্ব রূপবান একটি কিশোর, তার আচার-আচরণে এক ধরনের আশ্চর্য সারল্য রয়েছে। তাকে দেখামাত্র লাইনার মতো তোমাদের বুকেও গভীর মমতার জন্ম হত। তখন তাকে হত্যা করা হলে তোমরা আরো গভীরভাবে দুঃখ পেতে। সে কারণে আমি তোমাদের মানুষটিকে দেখতে দিই নি। এখন মমতার সময় নয়, এখন সময় দায়িত্ব পালনের।

এই গ্রহটি বড়। মানুষটি এই গ্রহে দীর্ঘদিন থেকে রয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তোমরা জান সে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সে যখন আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল, আমার নির্দেশে মিডি রবোট গোপনে তার শরীরে বার মেগা হার্টজের একটি পালসার প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। মানুষটির শরীর থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গের একটি সঙ্কেত বের হচ্ছে, সে কোথায় আছে বের করা আমার জন্যে কোনো সমস্যাই নয়। আমি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে তাকে ধরে আনব। এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে তার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করব, যেন তোমরা—মানুষেরা এই গ্রহে একটি সাফল্যজনক বসতির গোড়াপত্তন করতে পার।

এখন কাজ করার সময়। তোমাদের সবার নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে, নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশা করব, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করবে। মহাকাশযানের স্কাউট রবোট ইতিমধ্যে এই গ্রহ থেকে অসংখ্য নমুনা তুলে এনেছে। এই গ্রহে বিচিত্র এক ধরনের প্রাণের বিকাশ হয়েছে। সেটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সেটার তালিকা করায় আমার তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। ভ্রূণগুলো ক্রায়োজেনিক চেম্বার থেকে বের করে আনার সময় হয়েছে। প্রথমবার কত জন শিশু, কী রকম শিশু বিকাশ করানো হবে সে সম্পর্কেও তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই গ্রহে কী ধরনের প্রাণী, কী ধরনের গাছ জন্ম দেয়া দরকার সেই ব্যাপারটি আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রহের কোন অংশে বসতি স্থাপন করা যায় সেটিও তোমাদের ভেবে দেখার সময় হয়েছে। আমি তোমাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করব। তোমাদের দুঃখবোধ এবং অপরাধবোধকে তীব্রতর না করার জন্যে পালিয়ে যাওয়া কিশোরটিকে ধরে আনা এবং তাকে হত্যা করার পুরো কাজটি করা হবে তোমাদের অজান্তে। তোমরা কোনোদিন নিশ্চিতভাবে জানতেও পারবে না সত্যিই এই গ্রহে কোনো কিশোর ছিল কি না, সত্যিই তার দেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল কি না।

কিরির গলার স্বর আশ্চর্য রকম শান্ত। সেখানে এক ধরনের অশরীরী শীতলতা রয়েছে, যেটি শুনে সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে খানিকক্ষণ সবার দিকে তাকিয়ে থেকে কোমল গলায় বলল, তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

কেউ কোনো কথা বলল না।

AMARBOI.COM

কিরি শান্ত গলায় বলল, তোমরা এখন যেতে পার।

ঘরের সব মানুষ এক জন এক জন করে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে থাকে। গ্রুসো বের হবার আগে হঠাৎ একবার কিরির দিকে ঘুরে তাকাল। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কিরিকে! যাকে মাত্র এক দিন আগেও সে নিজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জেনেছে।

কিরি হঠাৎ বলল, গ্রুসো।

গ্রুসো থমকে দাঁড়াল।

লাইনা কেমন আছে?

ভালো আছে। করোটিতে আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু বিপদ কেটে গেছে।

লাইনাকে বোলো আমি খুব দুঃখিত।

বলব।

গ্রুসো ঘর থেকে বের হতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল। কিরি বলল, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?

হ্যাঁ।

কী?

আমি কি তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারি?

কিরি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, না গ্রুসো। সেটা খুব অবিবেচকের মতো কাজ হবে। আমি দশম প্রজাতির রবোট। আমাকে ধ্বংস করার কোনো পদ্ধতি আমার জানা নেই।

ও।

শুভ রাত্রি গ্রুসো।

শুভ রাত্রি।

AMARBOI.COM

ভালবাসা

১

বাই ভার্বালটি মাটি থেকে অল্প একটু উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সামনে কন্ট্রোল স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে সুহান। পিছনে ট্রিনি। বাই ভার্বালের যেটুকু গতিতে যাওয়ার কথা সুহান তার থেকে দ্বিগুণ বেগে ছুটে যাচ্ছে। ট্রিনি নিচু স্বরে বলল, ধীরে সুহান। খারাপ একটা দুর্ঘটনা হতে পারে।

সুহান কোনো উত্তর দিল না। বিপজ্জনক একটা পাথরকে পাশ কাটিয়ে গতিবেগ আরো বাড়িয়ে দিল। তার দুই চোখ একটু পর পর পানিতে ভরে আসছে, বুকের ভিতর আশ্চর্য এক ধরনের অভিমান। ঠিক কার ওপর অভিমান সে জানে না। এক ধরনের বিচিত্র আক্রোশে তার সমস্ত গ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার ইচ্ছে করছে।

ট্রিনি আবার বলল, সুহান, সাবধান সুহান। খারাপ দুর্ঘটনা হতে পারে।

হোক।

অবুঝ হয়ো না সুহান।

আমি বেঁচে থাকলেই কী আর মরে গেলেই কী! আমি মানুষ অথচ মানুষেরাই আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

মানুষেরা তোমাকে মেরে ফেলতে চায় না, সুহান। তুমি জান, যে তোমাকে মেরে ফেলতে চায় সে একজন রবোট।

এতজন মানুষ মিলে একটি রবোটকে থামাতে পারে না?

দশম প্রজাতির রবোট—

ছাই দশম প্রজাতি!

ট্রিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, সুহান।

কী হল?

তোমার শরীরে কি কেউ কিছু প্রবেশ করিয়েছে?

সুহান অবাক হয়ে বলল, কী বলছ তুমি? কী প্রবেশ করাবে?

জানি না। কিছুক্ষণ হল তোমার শরীরের ভিতরে কিছু একটা চালু হয়েছে।

কী চালু হয়েছে?

জানি না। বার মেগা হার্টজের সিগনাল। তিন মিলি সেকেন্ড পর পর। আমার মনে হয় এটা একটা মাইক্রো পালসার। এটা তোমার শরীরে ঢোকানো হয়েছে তুমি কোথায় আছ সেটা খুঁজে বের করার জন্যে। নিশ্চয়ই মহাকাশযানের কেউ প্রবেশ করিয়েছে।

ওই মিডি রবোটটা। নিশ্চয়ই মিডি রবোটটা। আমাকে বলল আমার এক ফোঁটা রক্ত দরকার। পরীক্ষা করবে। রক্ত নেবার ভান করে নিশ্চয়ই শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটা রবোট যখন মিথ্যা কথা বলা শুরু করে তখন কেমন লাগে?

রবোট প্রকৃত অর্থে মিথ্যা কথা বলে না। তারা কোন প্রজাতির তার ওপর নির্ভর করে তাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় সেটি তাদের মানতে হয়।

ছাই নির্দেশ! বদমাইশ রবোট। বেজন্মা কোথাকার!

ছিঃ সুহান, এভাবে কথা বলে না। ছিঃ!

কেন বলব না? এক শ বার বলব। বেজন্মা বদমাইশ শয়তানের বাচ্চা—

ছিঃ! সুহান, ছিঃ!

সুহান স্প্রেকট্রাস এনালাইজারে তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া পালসারের সিগনালটি স্পষ্ট দেখতে পায়। তিন মিলি সেকেন্ড পর পর বার মেগা হার্টজের একটা সুনির্দিষ্ট সঙ্কেত। ট্রিনি খানিকক্ষণ সঙ্কেতটি দেখে বলল, তোমার পিছনে পিছনে কাউকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমাকে খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

সুহান ফ্যাকাশে মুখে ট্রিনির দিকে তাকাল। ট্রিনি বলল, ভয় পেয়ো না সুহান, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কী ব্যবস্থা হবে?

তোমাকে একটা ফ্যারাডে কেজে লুকিয়ে ফেলতে হবে।

এই মহাকাশযানটা একটা বিশাল ফ্যারাডে কেজ। আমি এখন সেখানে লুকিয়ে আছি, কোনো সঙ্কেত বের হচ্ছে না। কিরি খুব ভালো করে জানে আমি এর ভিতরে আছি। তুমি কি কোনোভাবে পালসারটা আমার শরীর থেকে বের করতে পারবে?

ট্রিনি সুহানকে পরীক্ষা করে বলল, পালসারটা অসম্ভব ছোট। তোমার রক্তের মাঝে ভেসে ভেসে শরীরের মাঝে ঘুরছে। কিছুক্ষণ পর পর তোমার হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে

যাচ্ছে। মাইক্রো সার্জারি ছাড়া এটা বের করা খুব কঠিন।

তুমি মাইক্রো সার্জারি করতে পার না?

এখন পারি না। কিন্তু কপোট্রনে ক্রিস্টাল ডিস্ক থেকে মাইক্রো সার্জারির অংশটুকু প্রবেশ করিয়ে নিলেই পারব। দেখতে হবে যন্ত্রপাতি কী কী আছে। একটু সময় নেবে।

আমাদের হাতে কি সময় আছে?

ট্রিনি তার কথার উত্তর না দিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করে। সুহান শুনতে পায়, ক্লিক ক্লিক শব্দ করে তার সংবেদনশীল সমস্ত ইন্দ্রিয় আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। সুহান ভয় পাওয়া গলায় বলল, কী হল ট্রিনি?

একটা বাই ভার্বাল আসছে এদিকে।

বাই ভার্বাল?

হ্যাঁ, কেউ একজন তোমাকে ধরে নিতে আসছে সুহান।

সুহানের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ ট্রিনির দিকে তাকিয়ে থেকে জোর করে নিজেকে শান্ত করে বলল, কতক্ষণ সময় আছে আমাদের হাতে?

এক ঘণ্টা। বাই ভার্বালটা থামিয়ে পাহাড়টা ঘুরে আসতে একটু সময় নেবে, না হয় আধ ঘণ্টার মাঝে চলে আসত।

সুহান হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ট্রিনি জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাও?

ল্যাবরেটরি ঘরে।

কেন?

একটা পালসার তৈরি করব। বার মেগা হার্টজের তরঙ্গ, তিন মিলি সেকেন্ড পর পর। তুমি সেটা নিয়ে বহুদূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, বাই ভার্বালটা তখন তার পিছু পিছু যাবে।

তুমি কেমন করে সেটা তৈরি করবে?

মেগা হার্টজের একটা ক্রিস্টাল নিয়ে সেটাকে বাড়িয়ে বার করে নেব।

কেমন করে বাড়াবে?

নন লিনিয়ার কিছু জিনিস আছে আমার কাছে।

আর তিন মিলি সেকেন্ড পর পর—

সেটা সহজ। রেজিস্টেন্স ক্যাপাসিটার দিয়ে—

কোথায় পাবে তুমি?

পুরোনো একটা যন্ত্র থেকে খুলে নেব।

তুমি জান কেমন করে তৈরি করতে হয়? মূল তথ্যকেন্দ্রে তো এসব নেই।

আমি জানি। তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। যদি সঙ্কেতটা শক্তিশালী না হয় একটা এমপ্লিফায়ার লাগাতে হবে। সেটা না একটা সমস্যা হয়ে যায়।

কিন্তু দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত সেটি কোনো সমস্যা হল না। যতক্ষণ সময় লাগার কথা ছিল তার অনেক আগেই পালসারটি দাঁড়া হয়ে গেল।

ট্রিনি সেটা পরীক্ষা করে বলল, অভূতপূর্ব। আমি নিজে না দেখলে কখনোই বিশ্বাস করতাম না যে মূল তথ্যকেন্দ্রের কোনো সাহায্য না নিয়ে এ রকম একটা পালসার তৈরি করা যায়।

ব্যাপারটি কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষ আজকাল নিজে এ ধরনের কাজ করে না। করার কথা নয়। ভবিষ্যতে তুমি যখন আবার কোনো অর্থহীন কাজ করবে, আমি তোমাকে নিরুৎসাহিত করব না।

বেশ। এখন আর দেরি কোরো না, এটা নিয়ে বাইরে যাও। দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও যেন বাই ভার্বালটা এর পিছু পিছু যায়।

তুমি সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। কিন্তু তোমার সম্ভবত খুব ভালো একটা ফ্যারাডে কেজের মাঝে থাকা উচিত।

থাকব। তুমি এখন যাও।

ট্রিনি চতুষ্কোণ একটি বাক্স, যার ভেতরে সুহানের হাতে তৈরী পালসারটি রয়েছে, হাতে নিয়ে মহাকাশযান থেকে বের হয়ে গেল। জেট ইঞ্জিন লাগানো ছোট একটি গাড়ি আছে, তার উপরে করে সে এটাকে বহুদূরে পাঠাবে। শুধু বহুদূরে নয়, জায়গাটি বিপজ্জনক। যে বাই ভার্বালটি সেখানে যাচ্ছে সেটির তার আরোহীকে নিয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম।

২

লাইনা তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে হেলান দিয়ে বসে বাইরে তাকিয়েছিল। বাইরের আকাশে এক ধরনের লালচে আলো। সম্ভবত ঝড়ো বাতাস হু-হু করে বইছে, ভিতরে বসে সেটা বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ ঘরে ছোট একটা শব্দ শুনে সে ঘুরে তাকাল, ঘরের মাঝখানে কিরি দাঁড়িয়ে আছে। লাইনার বুক কেঁপে উঠল হঠাৎ।

কেমন আছ লাইনা?

লাইনা কোনো কথা বলল না।

গত রাতের ব্যাপারটির জন্যে আমি দুঃখিত। তোমাকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেয়ার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

লাইনা তখনো কোনো কথা বলল না, চোখের কোনা দিয়ে কিরিকে লক্ষ করল। তার চোখে সেই সবুজ আলোটি নেই, দেখতে আবার স্বাভাবিক মানুষের মতো লাগছে। লাইনার বুকে একটা অশুভ আতঙ্কের জন্ম হতে থাকে। কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, তুমি কেন আমার কাছে এসেছ?

তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে। আমি দুঃখিত লাইনা।

লাইনা মাথা নাড়ল। বলল, না। তুমি ক্ষমা চাইতে আস নি। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। কী ব্যাপার?

না। অন্য কোনো ব্যাপার নেই। কিরি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে গিয়ে, কাছাকাছি থেকে আবার ফিরে এসে লাইনার কাছাকাছি দাঁড়াল। বলল, একটা ছোট ব্যাপার আছে। খুব ছোট। জানতে চাও?

লাইনার বুক কেঁপে উঠল, জিজ্ঞেস করল, কী?

সুহানের শরীরে একটা পালসার ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। বার মেগা হার্টজের সঙ্কেত। সেটার পিছু পিছু আমি একটা কিউ-১২ রবোট পাঠিয়েছিলাম। কিউ-১২ যখন তার মহাকাশযানের কাছাকাছি গিয়েছে তখন সুহান মহাকাশযান থেকে বের হয়ে এই গ্রহের একটা দুর্গম জায়গায় লুকিয়ে গিয়েছিল। তাকে আবার খুঁজে পাওয়া গেছে।

কিরি লাইনার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। লাইন কোনো কথা বলল না, এক ধরনের ভয় পাওয়া চোখে কিরির দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

একটা পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে আছে। আমি আবার একটা কিউ-১২ পাঠিয়েছি। রবোটটা জানিয়েছে, সে কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ধরে ফেলবে। আমি জানিয়েছি তাকে ধরার পর আমাকে জানাতে।

তুমি কেন আমাকে এ কথা বলছ?

কিরি আবার একটু হাসল, সুহানকে কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে নিয়ে আসা হবে। তুমি কি আবার তার সাথে কথা বলতে চাও?

লাইনা তীব্র দৃষ্টিতে কিরির দিকে তাকিয়ে রইল। এই ভয়ঙ্কর রবোটটির তার জন্যে মোহ জন্মেছে। একটি রবোটের যখন কোনো মেয়ের জন্যে আকর্ষণ জন্মায়, যখন অন্য একজনের ওপর ঈর্ষাতুর হয়, তার থেকে ভয়ঙ্কর বুঝি আর কিছু নেই।

কিরি আবার কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়, দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ লাইনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, বলল, একটি প্রতিরক্ষা রবোট আমার কাছে আসছে।

লাইনা কোনো কথা বলল না।

সুহানকে ধরার পরে আমাকে খবরটা দেয়ার কথা। মনে হয় খবরটা দিতে আসছে।

লাইনা তীব্র দৃষ্টিতে কিরির দিকে তাকিয়ে থাকে। কিরিকে দেখে মনে হয় সে ব্যাপারটি উপভোগ করতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই প্রতিরক্ষা রবোটটি লাইনার ঘরে এসে দাঁড়াল, কিরির দিকে তাকিয়ে তার যান্ত্রিক গলায় বলল, মহামান্য কিরি, কিউ-১২ থেকে সঙ্কেত আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিরি চমকে উঠে বলল, কী বললে?

কিউ-১২ তার বাই ভার্বালে করে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। গতিবেগ আটাত্তর দশমিক চার, ত্বরণ দুই দশমিক...

আমি সেটা জানি। কিরি ধমক দিয়ে বলল, কিউ-১২-এর কী হয়েছে?

আমরা সেটা জানি না। মানুষটির শরীর থেকে বের হওয়া পালসারের সিগনালের পিছু পিছু গিয়েছে—

তারপর?

হঠাৎ করে কিউ-১২ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অদৃশ্য হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মহামান্য কিরি। তার কোনো চিহ্ন নেই, যেন বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মানুষটা?

মানুষটা এখনো আছে। সে মনে হয় কোনো সঙ্কেত পাঠানোর চেষ্টা করছে। তার গতিবিধিটি একটা লেখার মতো।

কী লেখা?

অর্থহীন কথা। লিখছে, কিরি, তুমি জাহান্নামে যাও। কিরি বানানটি ভুল। জাহান্নাম শব্দটি—

তুমি চুপ কর। কিরি চিৎকার করে বলল, চুপ কর।

ঠিক আছে মহামান্য কিরি।

তুমি যাও, মূল কম্পিউটারকে বল মানুষটির গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখতে। দুটি বাই ভার্বাল প্রস্তুত কর। একটা স্কাউটশিপকে ওই এলাকায় পাঠানোর জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি

WWW.AMARBOI.COM

দিঁয়ে দাঁড়া করাও। যাও।

প্রতিরক্ষা রবোটটি ঘুরে সাথে সাথে বের হয়ে গেল। কিরি বের হয়ে গেল না, লাইনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। লাইনা অনেক কষ্ট করে তার গলায় আনন্দটুকু লুকিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, কিরি, সত্যি সুহান তোমার হাত থেকে পালিয়ে গেছে?

আপাতত। ছেলেটাকে আমি যত সরল ভেবেছিলাম সে তত সরল নয়। মাথায় কিছু বুদ্ধি রাখে। আর সবচেয়ে যেটা কৌতূহলের ব্যাপার সেটি হচ্ছে, তার কাছে কিছু বিচিত্র যন্ত্রপাতি আছে। কোথা থেকে পেল জানার কৌতূহল হচ্ছে।

লাইনা তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিরিকে তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখল। কিরি যেটা ভাবছে সেটা সত্যি নয়। তার কাছে বিচিত্র কোনো যন্ত্র নেই, তার কাছে যেটা আছে সেটা অসম্ভব একটি ক্ষমতা। মূল তথ্যকেন্দ্রের সাহায্য না নিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করার ক্ষমতা। একটি অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটি ক্ষমতা। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় ক্ষমতাটি এখন তাকে বাঁচিয়ে রাখবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে।

লাইনা ফিসফিস করে বলল, সুহান, সোনা আমার! তুমি যেখানেই থাক, ভালো থেকো।

লাইনা চোখ বন্ধ করে নিজের হাঁটুর উপরে মাথা রেখে বসে থাকে। সে কখনো ঈশ্বরকে ডাকে নি। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, সে মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে। প্রথমে সে একটু অবাক হয়, একটু অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু একটু পরে আবিষ্কার করে, ঈশ্বরকে ডেকে সে নিজের ভিতরে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পেতে শুরু করেছে। পৃথিবীর কোনো শক্তি যখন মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারে না তখন হয়তো মানুষের জ্ঞানের অতীত এক ধরনের পরম শক্তির প্রয়োজন হয়। হয়তো এভাবেই মানুষের জন্যে ঈশ্বরের জন্ম হয়েছিল। লাইনা তার চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে শুরু করে। ফিসফিস করে বলে, হে ঈশ্বর! হে পরম সৃষ্টিকর্তা! হে বিশ্ববিধাতা! তুমি এই ছেলেটিকে রক্ষা কর। ভয়ঙ্কর এই দানবের হাত থেকে রক্ষা কর। তার বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা কর।

৩

সুহান বড় একটা টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার পিঠের উপর ছাদ থেকে ঝুলে আছে একটি বিচিত্র যন্ত্র। দেখে বোঝা যায় সেটি সুহানের হাতে তৈরী। তারের কুণ্ডলী, ধাতব যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্যে মোটা তার, নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিকায় হাস্যকর ইলেকট্রনিক সার্কিট এবং তার ভিতর থেকে বের হওয়া বিচিত্র শব্দ দেখে এটিকে কোনো সত্যিকারের যন্ত্র ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু গত কয়েক দিনে ট্রিনি সুহানের কিছু বিচিত্র যন্ত্রকে নানাভাবে কাজ করতে দেখে তার কথায় খানিকটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সে এই বিচিত্র যন্ত্রটি সুহানের পিঠের কাছে নামিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছিল। সুহান জিজ্ঞেস করল, কী অবস্থা ট্রিনি?

মনে হয় কাজ করছে। বিস্ময়কর! অভূতপূর্ব!

সুহান উত্তেজিত গলায় বলল, বলেছিলাম না আমি? বলেছিলাম না? তুমি আমার কোনো

কথা বিশ্বাস কর না। তোমার ধারণা মূল তথ্যকেন্দ্রের তথ্য না নিয়ে কিছু তৈরি করা যায় না। ভুল।

তাই তো দেখছি।

তুমি বলেছিলে মাইক্রো–সার্জারি না করে এই পালসারটা শরীর থেকে বের করা যাবে না। এখনো কি তাই মনে হয়?

না। চৌম্বক ক্ষেত্রটা কাজ করছে। আস্তে আস্তে পালসারটা উপরের দিকে আসছে।

আসতেই হবে। এ রকম পালসার তৈরি করতে হলে ছোট নিকেলের আর্মেচার দরকার। চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে সেটা টেনে আনা যাবে। নিকেল চৌম্বকীয় পদার্থ, জান তো?

জানার প্রয়োজন ছিল না বলে জানতাম না। এখন জানলাম।

শুধু চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে এটাকে টেনে আনা যেত না। তাই তার স্বাভাবিক কম্পন ব্যবহার করা হয়েছে। সেই অংশটা ছিল জটিল।

কিন্তু চমৎকার কাজ করছে। ট্রিনি মাথা নিচু করে সুহানের পিঠে কিছু একটা স্পর্শ করে দেখতে দেখতে বলল, পালসারটা উপরে আসছে সুহান।

সুহান খুশি খুশি গলায় বলল, এখন তুমি বিশ্বাস করলে মূল তথ্যকেন্দ্রের সাহায্য না নিয়েই বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করা যায়?

পুরোটা করি নি।

কেন পুরোটা কর নি?

সভ্যতার জন্যে আরো অজস্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দরকার। নানা ধরনের জটিল যন্ত্রপাতি। ঘরে বসে তুমি সেইসব তৈরি করতে পারবে না।

কিন্তু আমি জানব সেগুলো কেমন করে কাজ করে। মানুষ এখন বেশিরভাগ জিনিস জানে না। বেশিরভাগ জিনিস এখন তথ্যকেন্দ্রে। এখন মানুষের জ্ঞান হচ্ছে কিছু সংখ্যা আর কিছু তথ্য। সংখ্যার সাথে সংখ্যা মিলিয়ে যন্ত্রপাতি, মডিউল জুড়ে দেয়া হয়, যন্ত্রপাতি দাঁড়া হয়ে যায়। খুব সহজ কিন্তু এর মাঝে কোনো আনন্দ নেই।

ট্রিনি মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তা হয় সুহান। মনে হয়, আমি তোমাকে ঠিক করে বড় করতে পারি নি। মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে তোমার সম্মানবোধ খুব কম।

কমই তো, খুবই কম। বলতে গেলে কিছুই নেই। তা না হলে কি একটা মানুষের দলকে একটা রবোট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ট্রিনি মাথা নাড়ে, তা ঠিক।

মানুষ অনেক ভুল করেছে ট্রিনি। মানুষ একটা কাজ করলেই সেটা ভালো, তুমি সেটা মনে কোরো না।

ট্রিনি হঠাৎ দ্রুত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, নড়বে না সুহান, একেবারে নড়বে না। পালসারটা পিঠের কাছে উঠে এসেছে।

ট্রিনি দ্রুত একটা সিরিঞ্জ নিয়ে তার পিঠে একটা সুচ ফুটিয়ে দিল। সুহান মুখ বিকৃত করে যন্ত্রণার একটা শব্দ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কী করছ ট্রিনি? তুমি জান না আমাদের স্নায়ু বলে একটা জিনিস আছে? আমাদের যন্ত্রণা বলে একটা অনুভূতি হতে পারে?

বাজে কথা বোলো না। একটা সুচ আর কত যন্ত্রণা দিতে পারে?

আমার ইচ্ছে করছে কোনোভাবে এক দিনের জন্যে তোমার শরীরে ব্যথা বোধ হত, আর আমি তোমার পিঠে ছয় ইঞ্চি একটা সুচ ফুটিয়ে দিতাম।

ট্রিনি বিড়বিড় করে বলল, আমি রবোট বলে মনে কোরো না আমার কোনোরকম সমস্যা নেই। তুমি যখন বিদ্‌ঘুটে একটা সমস্যা হাজির কর যার কোনো সমাধান নেই, সেটা চিন্তা করে আমার কপোট্রনের ভোল্টেজ ওলটপালট হয়ে যায়। আমি শরীরের অংশবিশেষের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। মনে কোরো না সেটা খুব আনন্দের ব্যাপার। নড়বে না, একেবারে নড়বে না, পালসারটা প্রায় ধরে ফেলেছি।

কয়েক মুহূর্ত পরে ট্রিনি সিরিঞ্জটা টেনে বের করে আনে। ভিতরে একটু রক্ত, সেই রক্তে পালসারটা ভেসে বেড়াচ্ছে।

সুহান উপর থেকে তার হাতে তৈরী যন্ত্রটা ঠেলে সরিয়ে নিয়ে বলল, সত্যি বের করেছ তো?

হ্যাঁ। এই দেখ, সিরিঞ্জের ভেতর থেকে সিগনাল বের হচ্ছে। তিন মিলি সেকেন্ড পর পর বার মেগা হার্টজের সিগনাল।

চমৎকার! কী করবে এখন এটাকে?

এখান থেকে বের করে কোথাও রাখতে হবে।

রাখ। সুহান টেবিল থেকে নেমে বলল, শেষ পর্যন্ত এখন আমাকে মুক্ত মুক্ত মনে হচ্ছে। এখন বের হতে পারব।

ট্রিনি সাবধানে সিরিঞ্জ থেকে রক্তটা বের করতে করতে বলল, কোথায় বের হবে?

লাইনার সাথে দেখা করতে যাব।

হঠাৎ করে ট্রিনির ডান হাতটি অপ্রকৃতিস্থের মতো নড়তে শুরু করে। সাবধানে সেটাকে থামিয়ে বলল, কার সাথে?

তুমি জান আমি কার কথা বলছি। লাইনা।

কেন?

কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি লাইনার প্রেমে পড়েছি।

প্রেমে পড়েছ?

হ্যাঁ। প্রেম। একটা মানবিক ব্যাপার। তোমাদের রবোটদের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়।

তুমি জান মহাকাশযানের দলপতি, দশম প্রজাতির রবোট কিরি তোমাকে হত্যা করার জন্যে খোঁজ করছে। তোমাকে ধরে নেয়ার জন্যে একটা কিউ-১২ রবোট পাঠিয়েছিল। সেটাকে কোনোভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এখন অন্য রবোটেরা খুঁজছে। তুমি বলছ তবু তুমি নিজে থেকে সেই মহাকাশযানে যাবে?

হ্যাঁ, আমার লাইনার সাথে দেখা করতে হবে।

ট্রিনির ডান হাতটা আবার দ্রুত নড়তে শুরু করে, বাম হাত দিয়ে সেটাকে ধরে রেখে বলল, তুমি জান তুমি যদি সেখানে যাও তোমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য এক।

সুহান অন্যমনস্কের মতো বলল, আমারও তাই মনে হয়।

তাহলে?

সুহান কোনো উত্তর না দিয়ে হেঁটে এসে গোল জানালাটি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। বহুদূরে একটা আগ্নেয়গিরি থেকে লাল আগুন বের হচ্ছে, লাভা গড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তার লাল আভায় চারদিকে এক ধরনের রহস্যময় আলো।

AMARBOI.COM

ট্রিনি বলল, তুমি যে এখানে থাক সেটা কিরি জানে। তোমার তৈরী পালসারটি দিয়ে তাকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, কিন্তু সে কিছুদিনের মাঝেই সেটা জেনে যাবে। আমার মনে হয়, তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্যে এখানে থাকা ঠিক নয়। গ্রহের অন্যপাশে আমরা চলে যেতে পারি। মনে আছে একবার আমরা গিয়েছিলাম? চমৎকার কয়েকটা আগ্নেয়গিরি আছে সেখানে?

তুমি বলছ আমি পালিয়ে যাব?

হ্যাঁ। বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

কেন?

ট্রিনির ডান হাতটি আবার দ্রুত নড়তে শুরু করে। কোনোভাবে সেটা বাম হাত দিয়ে ধরে রেখে বলল, হয়তো আবার কোনো মহাকাশযান আসবে, সেখানে নেতৃত্ব দেবে মানুষ, যেই মানুষ—

সুহান শুষ্ক স্বরে হেসে ওঠে। ট্রিনির সুহানের এই হাসির সাথে পরিচয় নেই। হঠাৎ করে কথা থামিয়ে সে চুপ করে গেল। সুহান হাসি থামিয়ে বলল, ট্রিনি, জীবনের অর্থ নয় যে সেটা খুব দীর্ঘ হতে হবে। জীবনটা ছোট হতে পারে কিন্তু সেই ছোট জীবনে থাকতে হবে তীব্রতা। থাকতে হবে আনন্দ। আমি যতদিন একা একা ছিলাম তখন ভেবেছিলাম, সারাদিন গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানো, রাতে ছোট ছোট যন্ত্র তৈরি করা, মহাকাশযানের অসংখ্য যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে বোঝার চেষ্টা করা, তোমার সাথে কথা বলা, নিশাচর প্রাণীর তালিকা তৈরি করা হচ্ছে চমৎকার একটি জীবন। কিন্তু লাইনার সাথে দেখা হওয়ার পর আমার সবকিছু পাল্টে গেছে। এখন আমার আগের জীবনের জন্যে কোনো আকর্ষণ নেই। আমার নতুন জীবনে শুধু একটা জিনিস থাকতে পারে—

সেটা কী?

লাইনা। তার সাথে আবার দেখা করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা। তাকে আর একবার স্পর্শ করা। তাকে—তাকে—সুহান অন্যমনস্কভাবে থেমে গেল। একটু পরে বলল, যদি সেটা করতে না পারি তাহলে আমি সেটা করার চেষ্টা করতে পারি। চেষ্টা করে যদি কোনোভাবে মারাও যাই, আমার মনে হয়, সেটাও হবে একটা চমৎকার জীবন।

তোমার তাই মনে হয়?

হ্যাঁ। চমৎকার একটা জীবন। তীব্র জীবন।

সুহান, আমি তোমাকে কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারি নি। আগে তবু বেশ অনেকখানি বুঝতে পারতাম। গত কয়েকদিন থেকে তোমাকে একটুও বুঝতে পারি না। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি যেটা চাও সেটাই আমি করব। আমি কখনো বুঝতে পারব না কেন করছি, তবু করব।

ধন্যবাদ ট্রিনি। তুমি হচ্ছ আমার সত্যিকারের বন্ধু।

শুধু একটি ব্যাপার—

কী?

আমার মনে হয় আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে আরো একটু বাড়ানো।

তুমি কীভাবে সেটা করবে?

অনেকভাবে করা যায়। আমাদের মহাকাশযানটি ঠিক অন্য মহাকাশযানটির মতো।

আমরা এর খুঁটিনাটি দেখতে পারি। কোথাও কোনো গোপন পথ আছে কি না বের করতে পারি। মহাকাশযানের বাইরে ছোট একটা স্টেশন করে ভেতরের কথাবার্তা শুনতে পারি, তাদের দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে ধারণা করতে পারি, নতুন ধরনের কয়েকটা অস্ত্র তৈরি করতে পারি। তারপর কোনোভাবে লাইনাকে মহাকাশযানের বাইরে আসার জন্যে খবর পাঠাতে পারি, সে বাইরে এলে তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি।

সুহানের মুখে একটা ছেলেমানুষি হাসি ফুটে উঠল, বলল, আমি আর লাইনা। লাইনা এবং আমি।

এবং আমি।

হ্যাঁ, আর তুমি। অবশ্যি তুমি।

৪

ইঞ্জিনিয়ার গ্রুসো তার অস্ত্রটি করিডোরের রেলিঙে শক্ত করে আটকে নিল। এটি এমন কিছু ভারি অস্ত্র নয় কিন্তু সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। অস্ত্রটি শক্তিশালী। লক্ষ্যবস্তুকে দৃষ্টিবদ্ধ করার জন্যে তিনটি ভিন্ন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রয়েছে। ইনফ্রায়েড এবং আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, তার সাথে সাথে একটি মাইক্রোওয়েভ সঙ্কেত। লক্ষ্যবস্তুকে দৃষ্টিবদ্ধ করার সাথে সাথে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিস্ফোরক ছুটে যাবে দুই মাইক্রোসেকেন্ড পর পর, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে লক্ষ্যবস্তু। গ্রুসো পুরো ব্যাপারটা অনেকবার চিন্তা করে দেখেছে, ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার লক্ষ্যবস্তু এই মহাকাশযানের দলপতি দশম প্রজাতির রবোট কিরিকে সে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করবে। গ্রুসোর মনে সেটা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই।

সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে। কন্ট্রোল রুম থেকে এক্ষুনি কিরি বের হবে, ঠিক এ রকম সময়ে সে বের হয়। গ্রুসো ট্রিগারে আঙুল রেখে স্থির চোখে সামনে তাকিয়ে থাকে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

৫

গ্রুসোর মৃতদেহকে ঘিরে মহাকাশযানে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিরি ঝুঁকে পড়ে তাকে এক নজর দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিষণ্ন গলায় বলল, আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম।

কেউ কোনো কথা বলল না। কিরি সবার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমি দশম প্রজাতির রবোট। আমাকে কোনো অস্ত্র দিয়ে দৃষ্টিবদ্ধ করা যায় না। অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ আমার কাছে চলে আসে। আমার দিকে যে বিস্ফোরক পাঠানোর কথা সেটি নিজের কাছে ফিরে যায়। আমি চাইলেও যায়, আমি না চাইলেও যায়।

সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কেউ একজন গ্রুসোর চোখ দুটি বন্ধ করে দেবে? মৃত মানুষ তাকিয়ে থাকলে খুব ভয়ঙ্কর দেখায়।

কেউ এগিয়ে গেল না।

দুঃস্বপ্ন

১

সুহানের ঘুম ভাঙল বিচিত্র শব্দ শুনে, শব্দটি সে ধরতে পারল না। আধো ঘুমের মাঝে শব্দটি কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ছিল, তখন সে দ্বিতীয়বার শব্দটি শুনতে পেল। সুহান এবার চোখ খুলে তাকায়, তার দুপাশে দু জোড়া সবুজাভ চোখ। সে লাফিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন সে একটি ধাতব কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, আমার মনে হয় এখন নড়াচড়া করা অত্যন্ত অবিবেচকের মতো কাজ হবে।

সুহান কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে?

ঘরের একটা আলো জ্বলে ওঠে তখন। আলোটা কোথা থেকে আসছে সে ধরতে পারে না। তার পাশে দুটি রবোট। ট্রিনির মতো নয়, দেখতে অন্যরকম। দেহ আকারে আরেকটু ছোট, বুকের মনিটরটি আরো অনেক জটিল। দুটি রবোটের হাতেই একটি করে বিচিত্র অস্ত্র। অস্ত্র থেকে ছোট একটি আলো জ্বলছে এবং নিভছে, নিঃসন্দেহে তাকে দৃষ্টিবদ্ধ করা আছে, একটু ভুল হলেই শেষ করে দেবে। সুহান বিছানায় বসে আবার জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে?

মহামান্য কিরি আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমি যদি যেতে না চাই?

আপনাকে শক্তি প্রয়োগ করে নেয়া হবে।

রবোটদের নীতিমালায় লেখা আছে তাদের মানুষের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই কিন্তু সে কথাটি তাদের বলা নিশ্চয়ই অর্থহীন। কিরি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যভাবে প্রোগ্রাম করে রেখেছে। সুহানের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে। তার জীবনে সে ভয়ঙ্কর আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে খুব কম, ব্যাপারটির সাথে তার ভালো পরিচয় নেই।

একটা রবোট হঠাৎ তার উপর ঝুঁকে পড়ল। সুহান তার শুকনো ঠোঁট দুটি জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বলল, তুমি কী করছ?

আপনার শরীরে কন্ট্রালিনের একটি ইনজেকশান দিচ্ছি।

সেটি কী?

সেটি এক ধরনের ওষুধ। আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

আমি ঘুমাতে চাই না।

কিন্তু আমাদের ওপর সেরকম নির্দেশ।

সুহান দেখতে পায়, রবোটটি হাতে ছোট সিরিঞ্জের মতো কী একটা নিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। বাধা দেয়া অর্থহীন কিন্তু তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে রবোটটির হাত ধরে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। পারল না। তার কব্জিতে সুচ ফোটানোর তীক্ষ্ণ একটু যন্ত্রণা অনুভব করল। সুহান বুঝতে পারে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে, ভয়ঙ্কর হতাশায় সে ডুবে যাচ্ছিল, ফিসফিস করে বলল, ট্রিনি, তুমি কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রিনি পাশের ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চতুর্থ প্রজাতির কিউ-২২ রবোটের উপস্থিতিতে সে একটি জড় পদার্থ। বাধা দেয়া দূরে থাকুক, তার একটি আঙুল তোলারও ক্ষমতা নেই। সুহানের কাতর কণ্ঠস্বর শুনে তার কপোট্রনে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে, ডান হাতটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঝটকা দিয়ে কেঁপে উঠতে থাকে, সেটিকে সে থামানোর কোনো চেষ্টা করে না। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, সুহানের দেহকে দুপাশ থেকে ধরে দুটি রবোট তাদের বাই ভার্বালে উঠে যাচ্ছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনকে গুঞ্জন করে উঠতে শুনল সে। তারপর সেটিকে মিলিয়ে যেতে দেখল দূরে।

ট্রিনি শূন্য ঘরটিতে কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘুরে বেড়াল। ঘরে সুহানের ছড়ানো ছিটানো যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে তুলে রাখল। তার শরীর থেকে বের করা পালসারের বাক্সটি দেখে মনে পড়ল, পালসারটি সুহানের কাছে রয়ে গেছে। কোথায় রাখা যায় ভেবে না পেয়ে গত রাতে সুহানের নখে টেপ দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। সুহানের নিও পলিমারের কাপড় পরিষ্কার করতে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রিনি হঠাৎ করে বুঝতে পারল, এই কাজটি অর্থহীন। সুহান আর কখনো এই ঘরে ফিরে আসবে না। ট্রিনি আবিষ্কার করে, তার আর কিছু করার নেই।

সে ঘরের ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

২

AMARBOI.COM

ঘুম ভাঙার পর সুহানের অনেকক্ষণ লাগল বুঝতে সে কোথায়। চোখের সামনে সবকিছু ধোঁয়াটে, যেন হালকা কুয়াশার আস্তরণ। কোথায় যেন কর্কশ একটা শব্দ হচ্ছে। তার শরীর শীতার্ত, মাথার মাঝে এক ধরনের ভোঁতা যন্ত্রণা। কপালের কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। সুহানের প্রথমে মনে হল সে মারা গেছে, কিন্তু মৃত মানুষের কি মাথায় যন্ত্রণা হতে পারে?

সুহান আবার ভালো করে চোখ খুলে তাকাল। না, সে মারা যায় নি। মাথার কাছে মনিটরে আলো জ্বলছে। তার শরীরে নানা ধরনের সেন্সর লাগানো। সেগুলো থেকে নানারকম সঙ্কেত বিচিত্র যন্ত্রপাতিতে যাচ্ছে। মনিটরে তার তাপমাত্রা, রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন, মেটাবলিজম থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের কম্পন পর্যন্ত লক্ষ রাখা হচ্ছে। মৃত মানুষের শরীরে কোনোকিছু লক্ষ রাখার প্রয়োজন হয় না।

সুহান উঠে বসে। বেশ বড় একটা ঘর। ঘরের দেয়াল ধবধবে সাদা। সারা ঘরে এক ধরনের নরম আলো, অনেকটা দ্বিতীয় সূর্যের আলোর মতো। আলোটা কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। সুহান নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সবগুলো সেন্সর খুলে ফেলল। সাথে সাথে দূরে কোথাও তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মাঝেই প্রথমে একটি রবোট এবং তার পিছু পিছু একজন দীর্ঘকায় মানুষ প্রবেশ করে। সুহান মানুষটিকে চিনতে পারল, মহাকাশযানের দলপতি কিরি এবং সাথে সাথে তার মনে পড়ল, মানুষের মতো দেখালেও কিরি একটি রবোট।

কিরি সুহানের কাছে এসে বলল, শুভ সন্ধ্যা সুহান।

সুহান কিরির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার শরীর এখনো দুর্বল। মস্তিষ্ক হালকা, মনে হতে থাকে পৃথিবীর কোনোকিছুতেই কিছু আসে যায় না। কিরির দিকে তাকিয়ে সে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~www.amarboi.com ~

ভিতরে এক ধরনের বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করতে থাকে। কিরি আরেকটু এগিয়ে এসে আবার বলল, শুভ সন্ধ্যা সুহান।

সন্ধ্যাটি কি সত্যিই আমার জন্যে শুভ?

কিরি শব্দ করে হেসে বলল, শুভ-অশুভ খুব আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের কাছে যেটি শুভ, অন্যজনের কাছে সেই একই ব্যাপার—

সুহান কিরির আপাতদার্শনিক উত্তরে বাধা দিয়ে বলল, তুমি সত্যিই আমাকে মেরে ফেলবে?

কিরি তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। সুহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রবোটেরা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তুমি তাহলে কেমন করে একজন মানুষের ক্ষতি করতে পার?

কিরি অন্যমনস্কের মতো বলল, ব্যাপারটা খুব জটিল। মানুষ কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। শুধু জৈবিকভাবে মানুষ হলেই হয় না। মানুষ হতে হলে পৃথিবীর তথ্যকেন্দ্রে তার জন্ম-পরিচয় থাকতে হয়। তোমার সেই পরিচয় নেই, তাই তোমার সাথে একটা বন্যপশুর কোনো পার্থক্য নেই।

যদি তথ্যকেন্দ্রে জন্ম-পরিচয় থাকত?

তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারত।

সুহান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে তুমি তোমার মহাকাশযানের মানুষদের সাথে দেখা করতে দেবে?

না।

কেন নয়?

সেটি পুরো ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দেবে।

সুহান আর কোনো কথা বলল না। কিরি ঘরে ইতস্তত হেঁটে এসে বলল, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তোমাকে আমি যত সহজে ধরে আনব ভেবেছিলাম তত সহজে ধরে আনতে পারি নি। তুমি সত্যি সত্যি আমাকে ধোঁকা দিতে পেরেছিলে। পুরো ব্যাপারটা যখন দ্বিতীয়বার চিন্তা করেছি তখন বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে, পালসারটা তোমার শরীরেই আছে, তুমি দ্বিতীয় একটি পালসার গ্রহের সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলে পাঠিয়েছ—

আমাকে কি তুমি একা থাকতে দেবে?

কিরি একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?

হ্যাঁ। সুহান ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি নিম্ন শ্রেণীর রবোটকে দেখিয়ে বলল, তুমি যাবার সময় কি ওই রবোটটাকেও নিয়ে যাবে? তোমাদের রবোটদের আমার ভালো লাগে না।

কিরির মুখে অপমানের ছায়া পড়ল, তাকে এর আগে অন্য কেউ একটি দ্বিতীয় প্রজাতির রবোটের সাথে এক করে দেখে নি। সে শক্তমুখে বলল, ওই রবোটটি তোমাকে চোখে চোখে রাখবে। সে তোমার সাথে এই ঘরে থাকবে। আমি যাচ্ছি, তোমাকে একা থাকতে দিচ্ছি।

কিরি লম্বা পা ফেলে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থেমে সুহানের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, সুহান, তোমার সাথে সম্ভবত আমার আর দেখা হবে না। তোমাকে একটা জিনিস বলা প্রয়োজন। তুমি মনে করছ তোমার মৃত্যু—

সুহান চিৎকার করে বলল, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

কিন্তু—

বের হয়ে যাও। তুমি বের হয়ে যাও—

কিরি বের হয়ে গেল। সাথে সাথে সুহান ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠল। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে বিছানায় মাথা গুঁজে আহত পশুর মতো ছটফট করতে থাকে। তার বুকে গভীর হতাশা, গভীর যন্ত্রণা—যে অনুভূতির সাথে তার পরিচয় নেই। সে ফিসফিস করে বলল, ট্রিনি! ট্রিনি তুমি কোথায়?

লাইনার ঘরে চতুষ্কোণ স্ক্রিনে হঠাৎ কিরির ছবি ফুটে ওঠে। লাইনাকে ডেকে বলল, লাইনা।

বল।

আমি তোমাকে একটি জিনিস দেখাতে চাই।

লাইনার বুক কেঁপে উঠল হঠাৎ। ভয় পাওয়া গলায় বলল, না, আমি দেখতে চাই না।

তোমাকে দেখতে হবে লাইনা।

না। লাইনা চিৎকার করে বলল, না—

কিরি লাইনার কথা শুনল না। স্ক্রিনে সুহানের ছবি ভেসে উঠল। বিছানায় মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। অসহায় একটি কিশোর। অসহায়, ভীত একটি কিশোর। যে মানুষের আশ্রয়ে ছুটে এসেছিল, যে মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারে নি।

লাইনা হিংস্র দৃষ্টিতে স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আর দেখতে পারছে না, টেবিল থেকে চতুষ্কোণ কমিউনিকেশান মডিউলটি তুলে সে স্ক্রিনটির দিকে ছুড়ে দেয়। ঝনঝন শব্দ করে ভেঙে পড়ে স্ক্রিনের স্বচ্ছ কাচ। কয়েকবার কেঁপে কেঁপে ছবিটা অদৃশ্য হয়ে যায় স্ক্রিন থেকে।

AMARBOI.COM

৩

সুহান কতক্ষণ বিছানায় মাথা গুঁজে ছিল সে জানে না। হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনে সে ঘুরে তাকায়, রবোটটি কিছু খাবার নিয়ে এসেছে।

আমাকে তাহলে এই মুহূর্তে মারবে না, সুহান নিজেকে বোঝাল, তাহলে এখন খাবার এনে হাজির করত না। কিংবা কে জানে হয়তো পরিপাকযন্ত্র কীভাবে কাজ করে জানতে চাইছে, তাই খাবারটা মুখে দেয়ামাত্রই মেরে ফেলবে।

আপনার খাবার, মহামান্য সুহান। রবোটটি দ্বিতীয়বার কথা বলল, যান্ত্রিক একঘেয়ে গলার স্বর। সুহান খাবারগুলোর দিকে তাকাল। সে তার মহাকাশযানের রসদ থেকে যে ধরনের খাবার খেয়ে অভ্যস্ত তার থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। অন্য সময় হলে সে খাবারগুলো কৌতূহল নিয়ে দেখত, এখন কোনো কৌতূহল নেই। খাবারগুলো দেখে হঠাৎ সুহান বুঝতে পারে সে ক্ষুধার্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। সে রবোটটিকে বলল, তুমি খাবারটি রেখে চলে যাও।

আমার চলে যাওয়ার নির্দেশ নেই।

তোমার কিসের নির্দেশ রয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতত আপনার জন্যে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

তাহলে দাঁড়িয়ে থাক।

আপনার খাবার, মহামান্য সুহান।

সুহান বুঝতে পারে এটি অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর রবোট। হঠাৎ করে তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। এই নির্বোধ রবোটটিকে কি কোনোভাবে ধোঁকা দেয়া সম্ভব?

সুহান আবার রবোটটির দিকে ঘুরে তাকাল, চতুষ্কোণ দেহ, বর্তুলাকার মাথা, উপরের অংশটুকু সম্ভবত চোখ, পায়ের নিচে চাকা, সম্ভবত সহজে সমতল জায়গার বাইরে যেতে পারে না। সুহান ট্রে থেকে এক টুকরা তুলে নিয়ে বলল, তুমি কোন শ্রেণীর রবোট?

উত্তর দেয়ার অনুমতি নেই, মহামান্য সুহান।

তুমি কি আমাকে চোখে চোখে রাখছ?

হ্যাঁ, মহামান্য সুহান।

সুহান হেঁটে রবোটটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, রবোটটি কিন্তু সাথে সাথে তার দিকে ঘুরে তাকাল না। সুহান বলল, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে নেই, আমি ইচ্ছে করলেই দরজা খুলে বের হয়ে যেতে পারি।

রবোটটি তখন সুহানের দিকে ঘুরে তাকাল, তারপর বলল, মহামান্য সুহান, দরজার সাথে এলার্ম লাগানো হয়েছে। আপনি খুলে বের হতে পারবেন না। তাছাড়া দরজায় শক্তিবলয় লাগানো হয়েছে, আপনি বের হওয়ার চেষ্টা করলে আপনার শরীরে আনুমানিক তিন শ চৌত্রিশটি ফুটো হয়ে যাবে।

তিন শ চৌত্রিশটি?

জি, মহামান্য সুহান।

সুহান দরজাটির দিকে তাকাল। দরজার সাথে একটি এলার্ম লাগানো হয়েছে দেখা যাচ্ছে। সেটি বিকল করা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। দরজা খোলার পর সম্ভবত অন্য পাশে রবোটটির শক্তিবলয় ব্যাপারটি দেখা যাবে। শক্তিবলয় কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে পারে। উচ্চচাপের বিদ্যুৎ বা অদৃশ্য লেজার সম্ভবত এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু রবোটটি জানে, বের হওয়ার চেষ্টা করলে তার শরীরে তিন শ চৌত্রিশটি ফুটো হয়ে যাবে, এটি সম্ভবত লেজার রশ্মি, দরজার দুই পাশে প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে বের হচ্ছে জানতে পারলে একটি চকচকে জিনিস দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আটকে রাখা যায়।

কিন্তু দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগে রবোটটিকে ধোঁকা দিতে হবে। সেটি কেমন করে করা হবে?

সুহান আবার রবোটটির পিছনে হেঁটে গেল, রবোটটি সাথে সাথে তার দিকে ঘুরে গেল না। সুহান জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এখনো আমার দিকে লক্ষ রাখছ?

রাখছি, মহামান্য সুহান।

কেমন করে? তুমি আমার দিকে তাকিয়ে নেই।

আপনার দিকে না তাকিয়েও আমি আপনার দিকে লক্ষ রাখতে পারি মহামান্য সুহান।

সুহান ঘরে পায়চারি করতে থাকে। এটি অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর রবোট, তাকে লক্ষ রাখার জন্যে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর একটি পদ্ধতি ব্যবহার করছে। পদ্ধতিটি কী হতে পারে?

হঠাৎ সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে, পালসার! তার শরীর থেকে পালসারটি বের করে সেটি কোথায় রাখা যায় চিন্তা করে না পেয়ে আপাতত তার বুড়ো আঙুলের নখে একটা টেপ দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। পালসারটির কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। একটু আগে কিরি

যখন এর কথা উল্লেখ করেছিল সে বুঝতে পারে নি। কিউ-২২ রবোটগুলো তাই এত সহজে তাকে তার ইঞ্জিনঘরে খুঁজে পেয়েছিল। এখন এই রবোটটি নিশ্চয়ই সব সময় তার পালসারের সঙ্কেতটুকু লক্ষ করছে। ব্যাপারটি সত্যি কি না খুব সহজে পরীক্ষা করা যায়। রবোটটির পিছনে গিয়ে তার নখে লাগানো পালসারটি একটা ধাতব কিছু দিয়ে ঢেকে ফেলবে। রবোটটি তখন নিঃসন্দেহে তার দিকে ছুটে আসবে।

সুহান তার খাবারের টেবিল থেকে একটা চামচ তুলে নেয়, তারপর রবোটের পিছনে দাঁড়িয়ে চামচটা দিয়ে তার হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা ঢেকে ফেলে। সাথে সাথে রবোটটি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে যায় এবং পাগলের মতো তার দিকে ছুটে আসে। সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে রবোটটি দেখতে পেল বলে মনে হল না, তার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে শুরু করল।

সুহান তার নখের উপর থেকে চামচটা সরিয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার?

আপনাকে খুঁজছিলাম, মহামান্য সুহান। মুহূর্তের জন্যে আপনি হারিয়ে গিয়েছিলেন।

না, আমি হারাই নি। আমি এখানেই আছি।

উত্তেজনায় সুহানের বুক কাঁপতে থাকে। এই ঘর থেকে পালিয়ে যাবার চমৎকার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। তার বিছানার উপর পালসারটি রেখে সে দরজার কাছে যাবে। চামচটিকে একটা হাতের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এলার্মটি বন্ধ করে দেবে। তারপর দরজা খুলে লেজাররশ্মিটি কোন বিন্দু থেকে বের হচ্ছে বের করে সেটি চামচ দিয়ে ঢেকে দেবে। চামচটি চকচকে, লেজাররশ্মি সহজেই প্রতিফলিত হয়ে যাবে। তারপর সে লাফিয়ে এই ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। এই মহাকাশযানটি ঠিক তার মহাকাশযানের মতো। একবার বের হতে পারলে কোনদিকে যেতে হবে সে জানে।

তাকে এই মুহূর্তে কেউ লক্ষ করছে কি না সে জানে না। সম্ভবত উপরে কোনো ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু সেটা নিয়ে সে এখন চিন্তা করবে না। সুহান তার কাজ শুরু করে দিল।

তিন মিনিট পর মহাকাশযানের করিডোর ধরে সুহানকে ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতে দেখা গেল।

AMARBOI.COM

৪

মহাকাশযানের তিনটি জেনারেটর নিচে। ঘরটি নির্জন, কোনো মানুষজন নেই। পারমাণবিক শক্তি দিয়ে জেনারেটরগুলো চালানো হয়। প্রথম জেনারেটরটি সর্বক্ষণ চলতে থাকে। কোনো কারণে সেটি অকেজো হয়ে গেলে দ্বিতীয় জেনারেটরটি চলতে শুরু করে। সম্ভাবনা খুব কম কিন্তু যদি কোনো কারণে একই সাথে প্রথম এবং দ্বিতীয়, দুটি জেনারেটরই অকেজো হয়ে যায়, তখন তৃতীয় জেনারেটরটি চলতে শুরু করে। যদি কোনোভাবে তৃতীয় জেনারেটরটিও অকেজো হয়ে যায় তখন মহাকাশযানের সংরক্ষিত এই ব্যাটারিগুলো কাজ করতে শুরু করে। এই ব্যাটারিগুলো দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু তার মাঝে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ খুব কম। তখন মহাকাশযানের অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়া হয়। মহাকাশযানের বেশিরভাগ আলো নিভে যায়, কম্পিউটারে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণটুকু চালু রাখা হয়, ক্রায়োজেনিক ঘরে অপ্রয়োজনীয় শীতলতা দূর করে দেয়া হয়। ভ্রূণ এবং অন্যান্য জীবন্ত প্রাণ রক্ষা করার জন্যে

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়া হয়। মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে তিনটি জেনারেটরই একসাথে অকেজো হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে নি। সুহান জেনারেটর তিনটির সামনে দাঁড়িয়ে এই ইতিহাস তৈরি করার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

প্রথম জেনারেটরটি চলছে বলে সেটি অকেজো করা সহজ নয় কিন্তু অন্য দুটি খুব সহজে অকেজো করে দেয়া যায়। বিদ্যুতের যে লাইন রয়েছে সেগুলো ঠিক গোড়াতে কেটে দিতে হবে। সেগুলো কাটার যন্ত্রপাতি ঘরটিতে পাওয়া গেল। সেগুলো রবোটেরা ব্যবহার করে বলে অনেক বড় এবং ভারি। টেনেহিঁচড়ে সে যন্ত্রগুলো এনে বৈদ্যুতিক তারগুলো কেটে দিতে শুরু করে। দূরে নিশ্চয়ই কোথাও কর্কশ স্বরে এলার্ম বাজতে শুরু করেছে। কিন্তু সমস্যাটি আবিষ্কার করে রবোটদের এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সে অনেকগুলো মূল্যবান সেকেন্ড পেয়ে যাবে।

সুহান প্রথম জেনারেটরটির সামনে এসে দাঁড়াল। জেনারেটরটি প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে, ভেতরের গরম বাতাস বের হওয়ার জন্যে উপরের খানিকটা অংশ খোলা। নিরাপত্তার জন্যে সেটার কাছে যাওয়ার উপায় নেই। সুহান নিরাপত্তার অংশটুকু অকেজো করে দিয়ে এগিয়ে যায়। তার যখন দশ বছর বয়স সে তখন প্রথম জেনারেটরটি কৌতূহলী হয়ে অকেজো করেছিল। ব্যাপারটি সে খুব ভালো করে জানে।

সুহান জেনারেটরের খোলা অংশের ঢাকনাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে শুরু করে। ঠিক তখন সে উপরে রবোটের পদক্ষেপ শুনতে পায়। আর বেশি দেরি করা ঠিক নয়। ভারি একটা ট্রান্সফর্মার দুই হাতে তুলে নিয়ে সে জেনারেটরের ভেতরে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান শ্যাফটের মাঝে ফেলে দিল।

সাথে সাথে যে ব্যাপারটি ঘটল তার কোনো তুলনা নেই। ভয়ঙ্কর একটি বিস্ফোরণে বিশাল জেনারেটরটি কেঁপে ওঠে। বিদ্যুতের প্রচণ্ড ঝলকানি, তীব্র আলো আর কানফাটা শব্দে সমস্ত ঘরটি থরথর করে কেঁপে ওঠে। ধাতুর টুকরো চারদিকে উড়তে থাকে, ছোট একটি আগুন জ্বলতে শুরু করে এবং হঠাৎ করে মহাকাশযানের সমস্ত আলো নিভে গভীর অন্ধকারে চারদিক ঢেকে যায়। মহাকাশযানের অসংখ্য যন্ত্রপাতি থেমে গিয়ে হঠাৎ করে বিচিত্র এক ধরনের নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।

সুহান কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে, ছোট আগুনটি তার নেভানোর প্রয়োজন নেই, রবোটদের সেটি আরো কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখতে পারবে। সে ছোট একটি ঢাকনা খুলে একটি ছোট টানেলে ঢুকে যায়। এই ধরনের মহাকাশযানের খুঁটিনাটি তার থেকে ভালো করে আর কেউ জানে না।

৫

লাইনা তার ঘরে জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত মহাকাশযান গভীর অন্ধকারে ঢেকে আছে, যন্ত্রপাতির কোনো শব্দ নেই। এই নৈঃশব্দ্য এক ধরনের আতঙ্ক জাগিয়ে দেয়। কিন্তু লাইনার বুকে কোনো আতঙ্ক নেই। সে নিশ্চিত নয় কিন্তু তার ধারণা, এটি দুর্ঘটনা নয়। এটি খুব ঠাণ্ডা মাথায় কেউ করেছে। এই ধরনের কাজ খুব ঠাণ্ডা মাথায় শুধুমাত্র একটি মানুষ করতে পারে, সে হচ্ছে সুহান। যে মানুষ কোন যন্ত্র কেমন করে কাজ করে জানে শুধু সেই মানুষই সেই যন্ত্র এত সহজে ধ্বংস করতে পারে। লাইনা তাই তার

ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে জানে না কেন, কিন্তু তার মনে হচ্ছে সুহান এখানে আসবে।

লাইনা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, বহুদূরে একটা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে, তার লাল আভায় চারদিকে এক ধরনের বিচিত্র লাল আভা। কী বিচিত্র এই গ্রহটি!

লাইনা হঠাৎ ঘরে একটি পদশব্দ শুনতে পায়। কেউ একজন নিঃশব্দে হাঁটছে তার ঘরে। এই ঘরে নিঃশব্দে হাঁটতে পারে শুধু একজন, সে হচ্ছে কিরি। লাইনার বুক কেঁপে উঠল ভয়ে, চাপা গলায় বলল, কে? কে ওখানে?

আমি। আমি সুহান।

সুহান! লাইনা ছুটে গেল। সাথে সাথে অনুভব করল, একজোড়া শক্ত হাত তাকে নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে। তার চুলে মুখ গুঁজে ফিসফিস করে বলছে, লাইনা, আমার মনে হয় আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।

লাইনা মুখ তুলে অবাক হয়ে এই কিশোরটির দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে ক্ষীণ লাল আলো আসছে, সেই আলোতে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি সে বুঝি এক ভিন্ন গ্রহের মানুষ।

সুহান মাথা নিচু করে লাইনার ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে বলল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি লাইনা, তুমি যাবে আমার সাথে?

সুহানের চোখে গ্রহটির লাল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। কী বিচিত্র দেখাচ্ছে তাকে! লাইনা অবাক হয়ে সুহানের দিকে তাকিয়ে রইল, হঠাৎ করে পুরো জীবনটি তার মনে পড়ে যায়। সবকিছু অর্থহীন মনে হতে থাকে, মনে হতে থাকে, সে বুঝি এই আহ্বানটির জন্যেই সারা জীবন অপেক্ষা করে ছিল। লাইনা সুহানের মাথা নিজের কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ সুহান, আমি যাব তোমার সাথে।

AMARBOI.COM

সত্যি যাবে?

সত্যি যাব।

চল তাহলে।

কেমন করে?

সুহান মৃদু স্বরে হেসে বলল, সেটা নিয়ে তুমি ভেবো না। এই মহাকাশযানের দূষিত বাতাস বের হওয়ার একটা টানেল আছে। সেই টানেল দিয়ে বের হয়ে যাব। দুটি বড় বড় ফ্যানের পিছনে একটা টারবাইন। ফ্যানগুলো যখন ঘুরতে থাকে কেউ বের হতে পারবে না, কিন্তু এখন সব থেমে আছে।

কতক্ষণ থেমে থাকবে?

অনেকক্ষণ। সুহান নিচু গলায় হেসে বলল, আমি সব ধ্বংস করে দিয়েছি।

কেমন করে ধ্বংস করলে?

বলব তোমাকে। এখন চল। টারবাইনটি হাত দিয়ে ঠেলে ঘুরাতে হবে। অনেক শক্ত হবে কিন্তু দুজনে মিলে যদি ঠেলি নিশ্চয়ই খুলে যাবে।

তুমি কেমন করে জান?

আমি জানি। আমি ঠিক এ রকম একটা মহাকাশযানে থাকি। আমারটা অবশ্যি ধসে আছে।

বাইরে কিছু মানুষের, কিছু রবোটের পদশব্দ শোনা যায়। একটা ছোট এলার্ম বাজতে থাকে, আলো দুলাতে দুলাতে কে যেন ছুটে যায়। সুহান বলল, আর দেরি করা ঠিক নয়,

চল যাই।

চল। কিন্তু কী নিতে হবে?

তোমার কি অক্সিজেন মাস্ক আছে?

আছে।

সেটা নিয়ে নাও। এই গ্রহের বাতাসে আমি নিশ্বাস নিতে পারি কিন্তু তুমি পারবে কি না জানি না।

সুহানের পিছু পিছু গুড়ি মেরে লাইনা একটা অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে যেতে থাকে। সুহান না হয়ে পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ হলে সে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ তার হাতে এভাবে তুলে দিত কি না সে জানে না। কিরির সাথে পাল্লা দিয়ে সে যেভাবে দুই দুইবার নিজেকে রক্ষা করেছে তার কোনো তুলনা নেই। মানুষের সনাতন পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করলে সে কখনোই পারত না। লাইনার হঠাৎ কেমন জানি বিশ্বাস হতে থাকে, এই আশ্চর্য কিশোরটি হয়তো সত্যিই কিরির চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে।

সম্পূর্ণ অন্ধকার একটি টানেলের ভিতর গড়িয়ে গড়িয়ে দুজন এক সময় একটি খোলা জায়গায় পৌঁছাল। সামনে শক্ত দেয়ালের মতো, লাইনা হাত দিয়ে দেখে তৈলাক্ত কিছু জিনিসে ভেজা। সুহান চাপা গলায় বলল, টারবাইন। ধাক্কা দিয়ে খুলতে হবে।

শক্ত পাথরের মতো অনড়, ধাক্কা দিয়ে খোলার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সুহানের দেখাদেখি লাইনাও হাত লাগায়। দীর্ঘ সময় চেষ্টা করে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন সত্যিই সেই বিশাল টারবাইন নড়ে উঠে একটু একটু করে খুলতে থাকে। সাবধানে একজন মানুষ বের হওয়ার মতো জায়গা করে তারা নিচে তাকাল, বাইরে মুক্ত গ্রহ।

সুহান বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে লাইনাকে বলল, তুমি অক্সিজেন মাস্কটি পরে নাও লাইনা।

মহাকাশযান থেকে সুহান অনায়াসে লাফিয়ে নেমে আসে। লাইনা ইতস্তত করছিল। সুহান হাত বাড়িয়ে বলল, ভয় নেই, আমি আছি।

লাইনা সুহানের হাত ধরে নেমে আসে। দুজনে গুড়ি মেরে সরে যেতে থাকে। মহাকাশযানের সেন্সরগুলো কোথায় আছে সুহান জানে। জেনারেটরগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে বলে সেগুলো এখন ঘুরে ঘুরে চারদিকে লক্ষ করছে না, কিন্তু সুহান কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। এই মহাকাশযান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত দূরে চলে যাওয়া যায়। পাথরের উপর লাফিয়ে সুহান অভ্যস্ত পায়ে ছুটতে থাকে, লাইনা বার বার পিছিয়ে পড়ছিল। পিছনে গ্রহের লালচে আলোতে মহাকাশযানটিকে কেমন জানি ভূতুড়ে মনে হয়।

সামনে একটা বড় পাথর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুহান তার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে চাইছিল, তখন হঠাৎ লাইনা পিছন থেকে তার পিঠ খামচে ধরল। আর্ত চিৎকার করে বলল, সুহান, কী হয়েছে?

ওই দেখ।

সুহান মাথা তুলে তাকায়। সামনে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে উদ্যত অস্ত্র তাদের দিকে তাক করা। ছায়ামূর্তিটি এক পা এগিয়ে এসে ধাতব কণ্ঠে বলল, সুহান! আমি তোমার মৃতদেহ নিতে এসেছিলাম। মানুষের মৃতদেহ সমাহিত করতে হয়।

সুহান আনন্দে চিৎকার করে বলল, ট্রিনি!

হ্যাঁ। তোমার সাথে কে?

লাইনা।

আপনার সাথে পরিচয় হয়ে ধন্য অনুভব করছি মহামান্যা লাইনা।

লাইনা তখনো ভয়ে একটু একটু কাঁপছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হঠাৎ দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছি!

আপনার ভয় পাওয়ার অনেক কারণ আছে মহামান্যা লাইনা।

কেন, এ রকম বলছ কেন?

সুহান দাবি করছে সে আপনার প্রেমে পড়েছে। এবং সে অনেক বিপজ্জনক কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

লাইনা শব্দ করে হেসে বলল, সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটি সে ইতিমধ্যে করে এসেছে ট্রিনি!

সুহান চাপা গলায় বলল, কথা বলার সময় নেই, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।

আমি বাই ভার্বালে শক্তিশালী ব্যাটারি ভরে এনেছি। সুহান, তুমি মহামান্যা লাইনাকে নিয়ে আস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাই ভার্বালটি মাটি থেকে প্রায় এক–মানুষ উচ্চতা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যেতে থাকল।

সুহান চাপা গলায় বলল, আস্তে ট্রিনি, খারাপ দুর্ঘটনা হতে পারে।

ট্রিনি তার কথার কোনো উত্তর দিল না।

মুখোমুখি

AMARBOI.COM

১

মৃত একটা আগ্নেয়গিরির ভিতর একটি গুহায় লাইনা আর সুহান জড়াজড়ি করে বসেছে। বাইরে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। কিরির চোখ থেকে বাঁচার জন্যে তারা যে জায়গাটি বেছে নিয়েছে সেটি গ্রহটির প্রায় অন্য পৃষ্ঠে। জায়গাটা হিমশীতল। সুহান আর লাইনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ট্রিনি। তাকে দেখে মনে হতে পারে ঠিক কী করা প্রয়োজন সে বুঝতে পারছে না।

লাইনা বলল, ট্রিনি, তুমি যদি দাঁড়িয়ে না থেকে আমাদের কাছে বসতে, খুব চমৎকার হত।

ট্রিনি ঘুরে জিজ্ঞেস করল, কেন চমৎকার হত?

সবাই বসে থাকলে খুব একটা ঘরোয়া ভাব হয়। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন, যখন বাইরে তুষার ঝড় হত তখন আমরা সবাই ঘরের ভেতর জড়াজড়ি করে বসে থাকতাম। একটা আগুন জ্বলত। সত্যিকারের আগুন। সেই আগুনের সামনে আমরা বসে বসে গল্প করতাম।

বসে গল্প করা এবং দাঁড়িয়ে গল্প করার মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, মহামান্যা লাইনা।

লাইনা তরল গলায় হেসে উঠে বলল, দাঁড়িয়ে মানুষ আবার গল্প করে কেমন করে? গল্প করতে হয় বসে। একটা আগুনকে ঘিরে। গরম কোনো পানীয় খেতে খেতে। খুব একটা ঘরোয়া ভাব হয়। কোমল শান্ত একটা ভাব।

মহামান্যা লাইনা, আগুন খুব বিপজ্জনক জিনিস। সেটাকে ঘিরে বসে থাকলে শান্ত ভাব হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

সুহান গলা উঁচিয়ে বলল, ট্রিনি, তুমি কেন বাজে তর্ক করছ? মানুষের সভ্যতা এসেছে আগুন থেকে।

মানুষের সভ্যতাটি খুব ভালো জিনিস নয়।

লাইনা খিলখিল করে হেসে বলল, একেবারে খাঁটি কথা বলেছ তুমি ট্রিনি! একেবারে খাঁটি কথা!

সুহান লাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, লাইনা, ট্রিনিকে তুমি বেশি প্রশ্রয় দিও না, একেবারে জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে!

লাইনা ট্রিনিকে বলল, ট্রিনি, তুমি কাছে এসে বস।

সুহান উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলল, লাইনা, ট্রিনি একটি জোড়াতালি দেয়া রবোট। সে বসতে পারে না! বসার জন্যে হাঁটুর প্রয়োজন হয়। ট্রিনির কোনো হাঁটু নেই।

ট্রিনি বলল, বসার জন্যে হাঁটুর প্রয়োজন হয় সেটি পুরোপুরি সত্যি কথা নয়।

ঠিক আছে, পুরোপুরি সত্যি নয় কিন্তু অনেকখানি সত্যি।

ট্রিনি কোনো কথা না বলে গুহা থেকে বের হয়ে গেল। লাইনা জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেল ট্রিনি?

জানি না, আসবে এক্ষুনি।

সত্যি সত্যি ট্রিনি একটু পরে ফিরে এল, তার হাতে বাই ভার্বালের বাড়তি ছোট ইঞ্জিনটি।

ইঞ্জিন কেন এনেছ ট্রিনি?

এটা চালু করলে আগুন বের হতে থাকে। তখন আমরা সবাই এটাকে ঘিরে বসতে পারি। সুহান যদি আমাকে সাহায্য করে হাঁটু ছাড়াও বসা সম্ভব হতে পারে।

একটু পরে দেখা গেল গুহার মাঝামাঝি বাই ভার্বালের ইঞ্জিন থেকে প্রচণ্ড শব্দ করে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। ইঞ্জিনটির খুব কাছাকাছি, প্রায় বিপজ্জনক দূরত্বে বসে আছে একটি বিভ্রান্ত রবোট এবং দুজন আনন্দোন্মত্ত মানব-মানবী। তারা কথা বলছে, হাসছে, একজন আরেকজনকে স্পর্শ করছে এবং সম্পূর্ণ অকারণে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর গড়িয়ে পড়ছে।

সেটি ছিল এই গ্রহে মানুষের প্রথম ভালবাসার রাত।

২

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে লাইনা আবিষ্কার করল সুহান তার অনেক আগে উঠে গেছে। তার মাথার কাছে একটা ছোট রেকর্ডিং যন্ত্র। সেটা স্পর্শ করতেই সুহানের ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে উঠল, হাত নেড়ে বলছে—আমাদের এখানে দীর্ঘ সময় লুকিয়ে থাকতে হতে পারে। আমি আর ট্রিনি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে গেলাম। দ্বিতীয় সূর্য ওঠার আগে চলে আসব, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জায়গাটি নিরাপদ।

লাইনা তার ঘুমানোর ছোট সিলিন্ডারটিতে উঠে বসে। গত রাতে তার ঘুমোতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে তাকে মস্তিষ্ক রেজোনেট করে ঘুমাতে হয়েছে। এভাবে গভীর ঘুম হয় সত্যি কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর দীর্ঘ সময় চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে থাকে। সিলিন্ডারের ভিতরে

বাতাসের অনুপাত ঠিক করে রাখা ছিল। বাইরে যাবার আগে তার সম্ভবত অক্সিজেন মাস্কটি পরে নেয়া দরকার।

লাইনা যখন তার মুখে অক্সিজেন মাস্কটি লাগাচ্ছিল তখন হঠাৎ সিলিন্ডারের ওপর একজন মানুষের ছায়া পড়ে। চোখ তুলে তাকানোর আগেই হঠাৎ লাইনা বুঝতে পারে, মানুষটি কিরি। সে ঘুরে তাকাল, সত্যিই সিলিন্ডারের উপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনাকে দেখে সে সহৃদয় ভঙ্গিতে হাসল।

লাইনা একটা আর্ত চিৎকার করতে গিয়ে থেমে যায়। এই নির্জন গ্রহে কেউ তার চিৎকার শুনতে পাবে না।

কিরি হাত দিয়ে অনায়াসে সিলিন্ডারের ঢাকনাটি খুলে ফেলে হাসিমুখে বলল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি লাইনা।

লাইনা ভয়ার্ত মুখে কিরির দিকে তাকাল। একটা অমানুষিক আতঙ্কে তার হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে চাইছে। কিরি একটা হাত বাড়িয়ে লাইনাকে স্পর্শ করে বলল, তুমি জানতে চাইছ না আমি তোমাকে কেমন করে খুঁজে পেয়েছি?

লাইনা কোনো কথা বলল না।

অনেক কষ্ট হয়েছে লাইনা। কাল সারা রাত দুটি উপগ্রহ তোমাদের খুঁজেছে। জেনারেটরগুলো নষ্ট, মহাকাশযানে বিদ্যুৎপ্রবাহ খুব কম, তাই খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তোমাকে পেয়েছি। কিরি সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে তাকে হ্যাঁচকা টানে ক্যাপসুল থেকে বের করে আনে।

লাইনা কিছু একটা বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কিরি সেটা লক্ষ করল না, অনেকটা নিজের মনে বলল, ছেলেটির জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। সে নিজেই আসবে আমার কাছে।

একটু থেমে যোগ করল, আমি যেরকম এসেছি!

কালো একটা ক্যাপসুলে শুয়ে আছে লাইনা, তার দুই হাত উপাসনার ভঙ্গিতে রাখা। তার কপালে এবং হতের কব্জিতে সেন্সর লাগানো। তার মাথার উপর একটা নীল মনিটর। সেখানে তার তাপমাত্রা, রক্তচাপ, শ্বাসযন্ত্র আর পরিপাকতন্ত্রের অবস্থা, মস্তিষ্কের কম্পন এবং আরো খুঁটিনাটি তথ্য ভেসে আসছে। মাথার কাছে একটি ছোট টিউব দিয়ে মিষ্টি গন্ধের গ্রুস্টান গ্যাস আসছে, তার দেহ অবশ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। প্রথমে শরীর, তারপর মন, সবার শেষে মস্তিষ্ক। তারপর সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যাবে।

লাইনা চোখ খুলে তাকাল। তার বুকের ভিতর এক গভীর শূন্যতা। এক গভীর হাহাকার। তার ইচ্ছে করছে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে সারা সৃষ্টিজগৎ ছারখার করে দিতে। কিন্তু সে তার চোখের পাতাও নাড়াতে পারছে না। গভীর ঘুমের জন্যে তার দেহকে প্রস্তুত করছে গ্রুস্টান গ্যাস।

ক্যাপসুলের উপর হঠাৎ কিরির মুখ ভেসে আসে। সে মাথা নিচু করে লাইনার কাছাকাছি এসে নরম হাতে তার চুল স্পর্শ করে কোমল গলায় বলল, ঘুমাও লাইনা। ঘুমাও।

লাইনা এক ধরনের অসহায় আতঙ্কে কিরির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিরি তার আরো কাছে এসে বলল, তোমাকে কত দিনের জন্যে ঘুম পাড়াব জান? এক শ বছর! যখন তুমি জেগে উঠবে তখন এই গ্রহে আর কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি। আমি আর তুমি।

কিরি বিষণ্ন স্বরে বলল, মানুষের বসতি এই গ্রহে হবে না লাইনা। হতে পারত কিন্তু হবে না। কেন হবে না জান? কারণ আমি চাই না, তাই হবে না। আমি দশম প্রজাতির

রবোট। আমি যা চাই তাই করতে পারি। আমি মানুষের খুব কাছাকাছি। মানুষ যেরকম অন্যায় করতে পারে, আমিও পারি। মানুষ যেরকম নিষ্ঠুরতা করতে পারে, আমিও পারি। মানুষ যেরকম ভালবাসতে পারে, আমিও পারি!

কিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি একটি একটি করে প্রাণ ধ্বংস করব। একটি একটি করে ভ্রূণ। তারপর আমি এই ক্যাপসুলের সামনে থাকব। শুধু তুমি আর আমি। আর মহাকাল। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখব, তোমার সুহান এই মহাকাশযানকে ঘিরে ঘুরে বেড়াবে। ধীরে ধীরে তার বয়স হবে, তার চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে আসবে। তার হৃদযন্ত্র দুর্বল হবে, ত্বকের মাঝে হবে কুঞ্চিত বলিরেখা। মাথার চুল হবে তুষারের মতো সাদা। তারপর একদিন সে এই মহাকাশযানের বাইরে হাঁটু ভেঙে পড়বে। তার দেহ পড়ে থাকবে দীর্ঘদিন। ঝড়ো বাতাসে একদিন তার দেহ ঢাকা পড়ে যাবে শুকনো বালুর নিচে।

তারপর একদিন আমি তোমাকে ডেকে তুলব। ঘুম ভেঙে উঠবে তুমি, যেন এইমাত্র উঠেছ। তোমার শরীর হবে সতেজ, তোমার মন হবে জীবন্ত। সঙ্গীতের সুর বেজে উঠবে মহাকাশযানে, আর আমার হাত ধরে তুমি হাঁটবে এই করিডোরে। শুধু তুমি আর আমি। আমি আর তুমি।

কিরির সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, চোখ থেকে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বের হয়ে আসে। শরীর থেকে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসে কিলবিল করে।

ভয়াবহ আতঙ্কে লাইনা কিরির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে ঘুম নেমে আসছে, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো ঘুম। সে ঘুমাতে চায় না। তার সমস্ত মনপ্রাণ অস্তিত্ব চিৎকার করতে থাকে কিন্তু তবু তার চোখে ঘুম নেমে আসে। অসহায় মূক এক ধরনের আতঙ্কে ছটফট করতে করতে সে অচেতন হয়ে পড়ে। তার দেহ শীতল হয়ে আসে, ক্যাপসুলের ঢাকনাটা নিচে নেমে আসে ধীরে ধীরে।

কিরি গভীর ভালবাসায় বলল, ঘুমাও লাইনা। সোনামণি আমার।

AMARBOI.COM

৩

সুহান খোলা সিলিন্ডারটির দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুকের মাঝে সে এক গভীর শূন্যতা অনুভব করে, এক গভীর হাহাকার। জীবন পূর্ণতার কত কাছাকাছি এসে আবার শূন্য হয়ে গেল! লাইনা—তার লাইনা! কিরি এসে নিয়ে গেছে তার লাইনাকে।

সিলিন্ডারটা ধরে চিৎকার করে ওঠে সে একটা আহত বন্য পশুর মতো। দুই হাত দিয়ে আঘাত করে সিলিন্ডারের উপর, মাথা কুটে, তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে শিশুর মতো।

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ সে মুখ তুলে উঠে দাঁড়ায়। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মোছে। সে একবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। ট্রিনি এতক্ষণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল। সুহানকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল, তুমি এখন কী করবে সুহান?

সুহান অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কিরির সাথে একটা বোঝাপড়া করতে হবে আমার।

কিরি?

হ্যাঁ। কিরি। হয় কিরি বেঁচে থাকবে, না হয় আমি।

কিরি দশম প্রজাতির রবোট, সুহান।

সুহান ট্রিনির দিকে তাকিয়ে তীব্র স্বরে বলল, আমি প্রথম প্রজাতির মানুষ।

প্রথম প্রজাতির মানুষ?

হ্যাঁ।

ও। ট্রিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কেমন করে বোঝাপড়া করবে, সুহান?

আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।

কেন নয়?

কারণ আমি জানি না।

তুমি জান না?

না।

ও। ট্রিনি আবার চুপ করে গেল।

সুহান আবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে এক ধরনের লালচে আভা। আবার ঝড় আসবে। সে অন্যমনস্কের মতো কয়েক পা হেঁটে সামনে যায়। তারপর ঘুরে ট্রিনির দিকে তাকাল, বলল, ট্রিনি, আমার সেই অস্ত্রটি কোথায়?

কোন অস্ত্র?

আমি যেটা তৈরি করেছিলাম। একটা নল, তার সাথে একটা ট্রিগার, আর ধরার জন্যে একটা হাতল, যার ভিতরে বিস্ফোরক ভরে আমি গুলি করি?

যেটিতে মেগা কম্পিউটার নেই?

হ্যাঁ।

যেটিতে বন্ধ করার জন্যে কোনো লেজার নেই? যেটি তুমি চোখের আন্দাজে ব্যবহার কর? যেটি আসলে কোনো অস্ত্র নয়, একটি বিপজ্জনক খেলনা?

হ্যাঁ, কোথায় সেটা?

আছে এখানে।

আমাকে এনে দাও।

ট্রিনি খানিকক্ষণ সুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে। এনে দিচ্ছি।

ট্রিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রের মতো দেখতে এই অস্ত্রটি সুহানের উরুর সাথে বেঁধে দিল। জিজ্ঞেস করল, ভেতরে বিস্ফোরক আছে ট্রিনি?

আছে।

বুলেট?

আছে।

বুলেট বিস্ফোরক আছে ট্রিনি?

আছে। চতুর্থ মাত্রার বিস্ফোরক।

সুহান তখন লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে। ট্রিনি বলল, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব সুহান, সাবধানে নিয়ে যাব কিরি যেন টের না পায়।

তার আর কোনো প্রয়োজন নেই, ট্রিনি।

ট্রিনি নিচু স্বরে বলল, তুমি আমাকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে চলে যাচ্ছ সুহান।

সুহান ঘুরে ট্রিনির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, আমার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে ভালো লাগে না, ট্রিনি।

AMARBOI.COM

কিরি কন্ট্রোলরুমে বড় স্ক্রিনটার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সুহানকে সে বাই ভার্বালে করে উড়ে আসতে দেখল। মহাকাশযানটিকে দুবার ঘুরিয়ে বাই ভার্বালটি সে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে মহাকাশযানের কাছাকাছি থামিয়ে সেখান থেকে নেমে আসে। তারপর সে হেঁটে হেঁটে মহাকাশযানের কাছাকাছি একটা পাথরে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ভিতরে কোনো উত্তেজনা নেই, ঝড়ো বাতাসে তার চুল উড়ছে, তার মাঝে সে সম্পূর্ণ অবিচলিত ভঙ্গিতে মহাকাশযানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মহাকাশযানের গোল জানালা দিয়ে সুহানকে প্রথম দেখতে পেল রিশা। বিশাল ধু-ধু শূন্য প্রান্তরে একটি বড় পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর। এটি যেন কোনো বাস্তব দৃশ্য নয়, যেন একটি স্বপ্নের দৃশ্য। যেন কাল্পনিক কোনো জগৎ থেকে নেমে এসেছে একটি রক্তমাংসের মানুষ। রিশার চিৎকার শুনে কয়েকজন ছুটে আসে। তাদের দেখাদেখি অন্যেরা। কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই মহাকাশযানের জানালা দিয়ে অবাক হয়ে বাইরে তাকিয়ে এই বিচিত্র কিশোরটিকে দেখতে থাকে। যাকে হত্যা করার জন্যে কিরি মানুষ থেকে অমানুষে পাল্টে গেছে।

কিরি তার স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ সময়। ছেলেটি খালি হাতে এসেছে, উরুতে কিছু একটা বাঁধা আছে, সেটি কোনো এক ধরনের অস্ত্র মনে হতে পারে কিন্তু সে জানে সেটি সত্যিকারের অস্ত্র নয়। বলা যেতে পারে, সে এসেছে আত্মহত্যা করতে। কিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ছেলেটিকে তার হত্যা করার কথা ছিল, কিন্তু এভাবে নয়। কিন্তু সে যদি এভাবেই চায় তাহলে এভাবেই হোক। সে প্রতিরক্ষা রবোটটিকে ডেকে বলল, কিউ-৪৬, মহাকাশযানের দরজা খুলে দাও। আমি একটু যাব।

মহাকাশযানের ভারি দরজা ঘরঘর শব্দ করে উঠে যায়। ঝড়ো বাতাস এসে ঝাপ্টা দেয় কিরিকে। সেই বাতাসে হেঁটে হেঁটে সে সুহানের দিকে এগিয়ে গেল। তার কাছাকাছি গিয়ে নরম গলায় বলল, আমি তোমাকে এভাবে আশা করি নি।

সুহান হিসহিস করে বলল, লাইনা কোথায়?

আছে।

কোথায় আছে?

ঘুমিয়ে আছে। শীতলঘরে ঘুমিয়ে আছে।

সুহান হিংস্র স্বরে বলল, শয়তান!

কিরি শব্দ করে হেসে উঠে বলল, তুমি কেন এখানে এসেছ?

তোমাকে শেষ করতে এসেছি।

তুমি জান আমি দশম প্রজাতির রবোট?

জানি।

তুমি জান আমাকে হত্যা করার মতো কোনো অস্ত্র তৈরি হয় নি পৃথিবীতে?

সুহান তার উরু থেকে অস্ত্রটি টেনে হাতে নিয়ে কিরির দিকে তাক করে বলল, এই অস্ত্রটি পৃথিবীতে তৈরি হয় নি।

তুমি জান আমার দিকে একটি অস্ত্র তাক করা মাত্র আমার সংবেদনশীল দেহ সেটি জানতে পারে? তুমি জান লেজার রশ্মি দৃষ্টিবদ্ধ করা মাত্র আমার কপোট্রনের হাইপার কিউব অস্ত্রের মেগা কম্পিউটার অচল করে দেয়? তুমি জান গুলি করা মাত্র বিস্ফোরক তার গতিপথ পরিবর্তন করে অস্ত্রধারীর কাছে ফিরে যায়?

এখন জানলাম।

তুমি জান আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু?

মানুষ মানুষকে হত্যা করে কিরি। রবোটকে না। রবোটকে ধ্বংস করে। আমি তোমাকে হত্যা করব না, ধ্বংস করব।

কিরি সুহানের দিকে তাকাল, তার মুখের মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসে সূক্ষ্ম অপমানে। সুহান তার প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র তুলে ধরেছে। কিরি আবার তাকাল সুহানের চোখের দিকে। কী সহজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে এই কিশোর! শুধুমাত্র মানুষই বুঝি পারে এ রকম, তার ভিতরে হঠাৎ ঈর্ষার একটি খোঁচা অনুভব করে সে। সুহানের চোখের দিকে তাকাল। কী ভয়ঙ্কর তীব্র দৃষ্টি! কী গভীর আত্মপ্রত্যয়! কী আশ্চর্য একাগ্রতা! কিরি তার সমস্ত কপোট্রনকে স্থির করিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে লেজার রশ্মির জন্যে, মেগা কম্পিউটারের সঙ্কেতের জন্যে।

সুহান ট্রিগার টেনে ধরল তখন।

কিরি অবাক হয়ে দেখে, সুহানের প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র থেকে একটি বিস্ফোরক ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসছে। তার আগে কোনো লেজাররশ্মি নেই, কোনো দৃষ্টিবদ্ধ করার চেষ্টা নেই, কোনো মেগা কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নেই, শুধু একটি সাদামাঠা বিস্ফোরক। কিরির চোখ সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বিস্ফোরকটিকে, তার কপোট্রনের শক্তিশালী বিদ্যুৎক্ষেত্র বিকল করে দিতে চেষ্টা করে বিস্ফোরকটির গতি নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার। কিন্তু সে আবিষ্কার করে কোনো কম্পিউটার নেই বিস্ফোরকটিতে। ঘুরতে ঘুরতে তার দিকে আসছে। একটু উপর দিয়ে কিন্তু এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেটাকে টেনে নামিয়ে আনছে নিচে। ঠিক যখন তার কাছে আসবে এটি সোজা আঘাত করবে তার মাথায়। কিরির কপোট্রন জানে সে সরতে পারবে না, তার দেহ মানুষের মতো ধীরস্থির, তার নড়তে সময় প্রয়োজন, সমস্ত শক্তি দিয়েও সে গুলিটি আঘাত করার আগে এক চুল নড়তে পারবে না। প্রাগৈতিহাসিক একটি অস্ত্র থেকে ছুটে আসছে একটি অন্ধ বিস্ফোরক, তাকে থামানোর কোনো উপায় নেই। কিরি অবাক হয়ে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কিছু করার নেই, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সেটি প্রায় এক মহাকাল সময়। সেটি প্রায় একটি জীবন।

কিরি বিস্ফোরকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। গভীর বিষণ্নতায় তার বুক হাহাকার করে ওঠে। মানুষ কেন তাকে সৃষ্টি করেছিল মানুষের সব ক্ষুদ্রতা দিয়ে? মানুষ কেন তাকে সৃষ্টি করেছিল দুঃখ কষ্ট আর বেদনা দিয়ে? মানুষ কেন তাকে তৈরি করেছিল মানুষের এত কাছাকাছি...

মহাকাশযানের জানালা দিয়ে সবাই দেখল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কিরির মস্তিষ্ক চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে উড়ে গেল।

AMARBOI.COM

৪

খুব ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসছে লাইনার। কেউ একজন তাকে ডাকছে কোমল স্বরে। কে? কে ডাকছে তাকে? আবছা কুয়াশার মতো একটা পরদায় সব ঢাকা, কষ্ট করে চোখ খুলে তাকায় সে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে অনিন্দ্যসুন্দর একটি মুখ, লম্বা কালো চুল, রাতের আকাশের মতো কালো চোখ। কোথায় দেখেছে সে এই মুখ? কোথায়?

আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছিল লাইনা, বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে জোর করে নিজেকে টেনে তুলে আনে লাইনা। চোখ খুলে তাকায় আবার। অপূর্ব সুন্দর একটি মুখ, একটি

কিশোরের মুখ, উজ্জ্বল চোখে কিছু একটা বলছে তাকে। কী বলছে সে? কোথায় দেখেছে তাকে? কোথায়?

হঠাৎ করে কিছু একটা মনে পড়ে তার। বুকের ভিতর গভীর ভালবাসার একটি স্রোতধারা বাঁধ ভেঙে ছুটে আসে হঠাৎ। প্রাণপণে চোখ খুলতে চেষ্টা করে লাইনা। তাকে দেখতে হবে সেই মুখটি। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখটি। তাকে দেখতেই হবে আর একবার।

পরিশিষ্ট

অনেকগুলো শিশু গোল হয়ে বসে আছে একটি আলোকোজ্জ্বল ঘরে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রিনি। তার হাতে একটি স্বচ্ছ কোয়ার্টজের প্রিজম। প্রিজমটি উপরে তুলে সে উঁচু স্বরে বলল, সবাই চুপ করে বস, কারণ এখন আমাদের বিজ্ঞান শেখার সময়। এটি একটি প্রিজম। প্রিজমের মাঝ দিয়ে আলো গেলে কী হবে?

একটি শিশু মুখ ভেংচে বলল, ছাই হবে।

ছিঃ নিশান, এভাবে কথা বলে না। ছিঃ!

কী হয় বললে?

ট্রিনিকে একটু বিভ্রান্ত দেখায়। প্রায় দুই যুগ আগে এই শিশুটির পিতাকে কী বলেছিল মনে করতে পারে না। তার কপোট্রনের মেমোরি মডিউলটি দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ, পুরোনো তথ্যের ওপর নতুন তথ্য লেখা হয়ে গেছে। ট্রিনি প্রাণপণে চেষ্টা করে একটি উত্তর খুঁজে পাবার কিন্তু কোনো লাভ হয় না। হঠাৎ করে তার ডান হাতটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নড়তে শুরু করে।

শিশুগুলো উচ্চৈঃস্বরে হাসছে। ট্রিনির অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছিল। কিন্তু কখন সে মনে করতে পারে না। তার স্মৃতি খুব দুর্বল হয়ে আছে, দীর্ঘ ব্যবহারে তার কপোট্রন জীর্ণ। শুধু মনে পড়ে একটিমাত্র শিশু ছিল তখন, এ রকম অনেকগুলো শিশু নয়।

মানুষের বসতি হয়ে এখন অনেক শিশু হয়েছে এই গ্রহে। শিশুগুলো দুরন্ত, তাদেরকে সামলে রাখা এখন অনেক কঠিন। সুহান আর লাইনাকে বলতে হবে এ রকম করে আর চলতে পারে না। কিছুতেই চলতে পারে না। সুহান আর লাইনা তার কথা না শুনলে অন্যদেরও বলতে হবে। তারা নিশ্চয়ই তার কথা শুনবে। এ রকম করে চলতে পারে না সেটা তাদের স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু ট্রিনি জানে এ রকমভাবেই চলবে। কারণ সে মনে হয় এ রকমই চায়। দ্বিতীয় প্রজাতির রবোটের বুকে ভালবাসা থাকার কথা নয়, তার বুকেও নিশ্চয়ই কোনো ভালবাসা নেই। দীর্ঘদিন মানুষের সাথে থেকে এইরকম অযৌক্তিক এবং অর্থহীন কাজ করার বিচিত্র যে প্রবৃত্তির জন্ম নিয়েছে সেগুলো নিশ্চিতভাবেই অতি ব্যবহারে জীর্ণ একটি কপোট্রনের নানা ধরনের ত্রুটি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ট্রিনি সেভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় না। তার ভাবতে ভালো লাগে সে ভালবাসতে শিখেছে।

মানুষ যেরকম করে ভালবাসে অন্য মানুষকে।

AMARBOI.COM

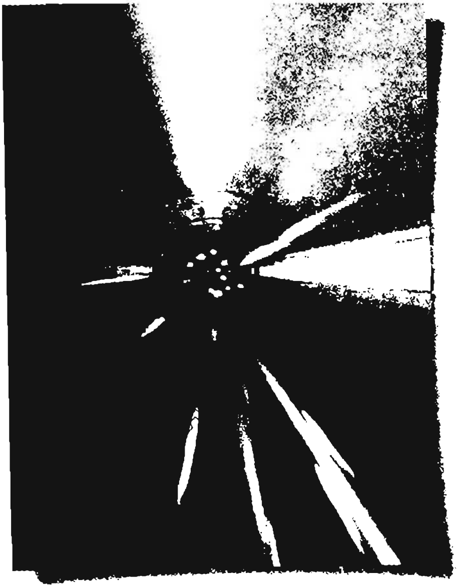

ক্রোমিয়াম অরণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকথা

শরতের এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে গভীর আকাশ থেকে নিচে নেমে এল একটি শুভ্র গোলক। মাটির কাছাকাছি এসে প্লুটোনিয়ামের সেই তুষারশুভ্র গোলক ফেটে পড়ল এক ভয়ঙ্কর আক্রোশে, ভয়াবহ পারমাণবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি নগরী। মানুষের হাহাকারে পৃথিবীর বাতাস ভারি হয়ে এল সেই বিষণ্ন অপরাহ্নে। মানুষ কিন্তু তবু থেমে রইল না। প্রতিশোধের হিংস্র জিঘাংসা নিয়ে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ বছরে সেটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল পরদিন সূর্য ওঠার আগে। পারমাণবিক বিস্ফোরণে ধুলার মতো উড়ে গেল পৃথিবীর জনপদ, সুরম্য অট্টালিকা, আকাশছোঁয়া নগরী।

তারপর বহুকাল পার হয়ে গেছে। পৃথিবী এখনো এক আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ধ্বংসস্তূপ। সেই প্রাণহীন ধ্বংসস্তূপে এখনো ধিকিধিকি করে জ্বলে আগুন, ঘুরে ঘুরে আকাশে ওঠে কালো ধোঁয়া। তার মাঝে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় বিবর্ণ, রং ওঠা নিয়ন্ত্রণহীন কিছু খেপা রবোট। সমুদ্র, হ্রদ আর নদীতে দূষিত পানি, বিষাক্ত মাটি, বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা আর তার মাঝে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে কিছু মানুষ। সেই মানুষের জীবন বড় কঠোর, বড় নির্মম। তাদের চোখে কোনো স্বপ্ন নেই, তাদের মনে কোনো ভালবাসা নেই। তারা এক দিন এক দিন করে বেঁচে থাকে পরের দিনের জন্যে। প্রাণহীন, ভালবাসাহীন, শুষ্ক, কঠিন, নিরানন্দ ভয়ঙ্কর এক জীবন।

পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই অল্প কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে গ্রুস্টান—ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া পৃথিবীজোড়া সুরক্ষিত কম্পিউটারের ঘাঁটিগুলোর যোগসূত্র। কোয়ার্টজের তন্তুতে অবলাল রশ্মিতে পরিব্যাপ্ত এক অবিশ্বাস্য শক্তিশালী অপারেটিং সিস্টেম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

ক্রোমিয়াম দেয়ালে হেলান দিয়ে আমি স্থির চোখে সামনে তাকিয়েছিলাম। যতদূর চোখ যায় ততদূর এক বিশাল বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ নিথর হয়ে পড়ে আছে। প্রাণহীন শুষ্ক নিষ্করুণ ভয়ঙ্কর একটি ধ্বংসস্তূপ। শুধুমাত্র মানুষই একটি সভ্যতাকে এত যত্ন করে গড়ে তুলে আবার এত নিখুঁতভাবে সেটি ধ্বংস করতে পারে। শুধুমাত্র মানুষ।

বেলা ডুবে গেলে আমি ধসে যাওয়া ভাঙা কংক্রিটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ক্রোমিয়ামের এই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকি। পৃথিবীর বাতাস পুরোপুরি দূষিত হয়ে গেছে, অসংখ্য ধূলিকণায় সারা আকাশে একটি ঘোলাটে রং, সূর্য ডুবে যাবার আগে সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয়ে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে আকাশে বিচিত্র একটি রং খেলা করতে থাকে। সেই অপার্থিব আলোতে সামনের আদিগন্ত বিস্তৃত ভয়াবহ এই ধ্বংসস্তূপকে কেমন যেন রহস্যময় দেখায়। দীর্ঘ সময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ এই প্রাণহীন ধ্বংসস্তূপকে একটি জীবন্ত প্রাণীর মতো মনে হতে থাকে। মনে হয় এক্ষুনি যেন সেটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। আমি এক ধরনের অসুস্থ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকি, কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি না।

সূর্য ডুবে যাবার পর হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেছে, বেঁচে আছে কিছু বিষাক্ত বৃশ্চিক এবং কুৎসিত সরীসৃপ। রাতের অন্ধকারে তারা জঞ্জালের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করে। আমি নেমে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম ঠিক তখন নিচে থেকে রাইনুক নিচু স্বরে ডাকল, কুশান, তুমি কি উপরে?

এটি আমাদের বসতির নির্জন অংশটুকু, এখানে আশপাশে কেউ নেই, নিচু গলায় কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই—কিন্তু তবুও সবাই নিচু গলায় কথা বলে। সবার ভিতরে সবসময় কেমন এক ধরনের অস্পষ্ট আতঙ্ক, কারণটি কে জানে। আমিও নিচু গলায় বললাম, হ্যাঁ রাইনুক, আমি এখানে।

নিচে নেমে আস।

আসছি।

আমি আবছা অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে নিচে নেমে আসতে আসতে বললাম, তুমি কেমন করে জান আমি এখানে?

তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। ক্রিশি বলেছে।

ও।

রাইনুক তরল গলায় হেসে বলল, আমি কখনো বুঝতে পারি না তুমি কেন ক্রিশির মতো একটা রবোটকে নিজের সাথে রেখেছ!

কেন, কী হয়েছে? ক্রিশি খুব ভালো রবোট।

তৃতীয় প্রজাতির কপোট্রন, একটি কথা দশবার করে বলতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর যোগাযোগ মডিউল—আমার মনে হয় তুমি যদি এখন ভালো একটা রবোটের জন্যে আবেদন করে দাও কিছুদিনের মাঝে একটা পেয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বেশ চলে যায়। আমি মাথা নেড়ে বললাম, ভালো রবোটের কোনো প্রয়োজন নেই। ভালো রবোট দিয়ে আমি কী করব?

ঠিক। রাইনুক খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি রোজ ওই উপরে উঠে বসে থাক কেন? যদি কোনোদিন পা হড়কে পড়ে যাও? যদি হাতপা কিছু ভেঙে যায় সর্বনাশ হয়ে যাবে। অস্ত্রোপচারের রবোটের কপোট্রন কোন মডেলের তুমি জান?

জানি।

লিয়ানার কাছে শুনেছি ওষুধপত্রও নাকি খুব কমে এসেছে।

আমি কোনো কথা বললাম না। রাইনুক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চল যাই।

কোথায়?

মনে নেই আজ গ্রুস্টান দেখা দেবে?

কিন্তু সে তো মাঝরাতে।

একটু আগে যদি না যাই বসার জায়গা পাব না।

তাই বলে এত আগে?

এত আগে কোথায় দেখলে? রাইনুক মাথা নেড়ে বলল, খাবারের ঘর থেকে খাবার তুলে নিতে দেখবে কত সময় চলে যাবে। চল যাই।

আমি আর কিছু বললাম না। রাইনুকের সাথে কোনোকিছু নিয়ে তর্ক করা যায় না। সে অল্পতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সবকিছুকে সে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে নেয়। পৃথিবী যদি এভাবে ধ্বংস না হয়ে যেত সে নিশ্চয়ই খুব বড় একটি প্রতিষ্ঠানে খুব দায়িত্বশীল একজন মানুষ হত। অনেক বড় বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার। রবোট বিশেষজ্ঞ বা মহাকাশচারী। কিন্তু এখন সে আর কিছুই হতে পারবে না, ধ্বংসস্তূপের আড়ালে আড়ালে সে বেঁচে থাকবে। ধসে পড়া বারোয়ারী খাবারের ঘরে বিস্বাদ খাবারের জন্যে হাতাহাতি করবে। বিবর্ণ কাপড় পরে ঘুরে বেড়াবে। প্রাচীন নির্বোধ রবোটের সাথে অর্থহীন তর্ক করে অনুজ্জ্বল টার্মিনালের সামনে বসে থেকে বিষাক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে একদিন সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যেভাবে আরো অনেকে নিঃশেষ হয়েছে।

আমি আর রাইনুক পাশাপাশি হাঁটছি হঠাৎ সে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কুশান—

কী?

তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?

কর।

তোমার কি মনে হয় না আমাদের জীবনের কোনো অর্থ নেই?

রাইনুকের গলার স্বরে এক ধরনের হাহাকার ছিল যেটি হঠাৎ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, তার জন্যে হঠাৎ আমার বিচিত্র এক ধরনের করুণা হতে থাকে। আমি কোমল গলায় বললাম, না রাইনুক, সেটা সত্যি নয়।

কেন নয়?

একজন মানুষের যখন কিছু করার থাকে না তখন তার জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের তো এখন অনেক কিছু করার আছে।

কী করার আছে?

বেঁচে থাকার জন্যে কত কী করতে হয় আমাদের! প্রতি মুহূর্তে একটা করে নূতন

পরীক্ষা, একটা করে নূতন যুদ্ধ!

এটাকে তুমি জীবন বল?

জীবন বড় আপেক্ষিক। তার কোনো চরম অবস্থান নেই। তুমি এই জীবনকে যেভাবে দেখবে সেটাই হবে তার অবস্থান।

রাইনুক কোনো কথা না বলে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, অন্ধকারে আমি তার চোখ দেখতে পেলাম না কিন্তু আমি জানি তার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ!

খাবারের ঘরটিতে খুব ভিড়। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে সবাই ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, একটি প্রতিরক্ষা রবোট স্ক্যানার হাতে নিয়ে মিছেই ছুটোছুটি করে রেটিনা স্ক্যান করে সবার পরিচয় নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করছিল। ভিতরে খাবার পরিবেশনকারী রবোটগুলো খাবারের ট্রে নিয়ে অর্থহীনভাবে ছুটোছুটি করছে, ট্রের উপরে গাঢ় বাদামি রঙের চতুষ্কোণ বিস্বাদ খাবার।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে আমরা ভিতরে ঢুকে নিজের অংশের খাবারটুকু প্লেটে তুলে নিই। একটি ছোট বোতলে করে একটি রবোট আমাদের খানিকটা লাল রঙের তরল ধরিয়ে দিল, ভিতরে কী আছে কেউ জানে না, দীর্ঘদিন থেকে তবুও আমরা সেটা বিশ্বাস করে খেয়ে আসছি। ঘরের ভিতরে ভাপসা গরম, বসার জায়গা নেই। খাবারের ট্রে নিয়ে আমরা ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করতে থাকি। কী অকিঞ্চিৎকর খাবার আর কী মন খারাপ করা পরিবেশ! শরীরের জন্যে পুষ্টিকর! তা না হলে মানুষ কেমন করে এই খাবার দিনের পর দিন খেয়ে যেতে পারে? রবোট হয়ে কেন জন্ম হয় নি ভেবে মাঝে মাঝে খুব দুঃখ হয়। তাহলে কানের নিচে একটা সৌর ব্যাটারি লাগিয়ে খাবারের কথা ভুলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার রবোট হয়ে জন্ম হয় নি—তাই মাঝে মাঝেই আমার খুব ইচ্ছে করে একটা হ্রদের পাশে বসে আগুনে ঝলসিয়ে একটি তিতির পাখি খেতে, সাথে যবের রুটি আর আঙুরের রস! আমি কখনো এসব খাই নি, প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখেছি, ডাটাবেসে ছবি রয়েছে, মনে হয় নিশ্চয়ই খুব উপাদেয় খাবার হবে।

লাল রঙের পানীয়টুকু ঢক ঢক করে খেয়ে আমি আর রাইনুক খাবারের টুকরো দুটি হাতে নিয়ে বের হয়ে আসি। বাইরে অন্ধকার, স্থানে স্থানে ছোট ছোট সৌর সেল দিয়ে খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রাখা আছে, খুব লাভ হয়েছে মনে হয় না। বরং মনে হয় তার আশপাশে অন্ধকার যেন আরো জমাট বেঁধে আছে। যদি কোনো আলো না থাকত তাহলে সম্ভবত অন্ধকারে আমাদের চোখ সয়ে আসত, আমরা আরো স্পষ্ট দেখতে পারতাম। কিন্তু মানুষ মনে হয় অন্ধকারকে সহ্য করতে পারে না, যত অল্পই হোক তাদের একটু আলো দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের রবোটের মতো অবলাল সংবেদী চোখ নেই।

গ্রুস্টান আমাদের দেখা দেবার জন্যে শহরের মাঝামাঝি প্রাচীন হলঘরটি বেছে নিয়েছে। হলঘরের এক অংশ খুব খারাপভাবে ধসে যাবার পরও সামনের অংশটুকু মোটামুটি অবিকৃতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে এই হলঘরটিতে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ বসতে পারত, এখন সেটি সম্ভব নয়—তার প্রয়োজনও নেই। আমাদের এই বসতিতে সব মিলিয়ে তেষট্টি জন মানুষ, যার মাঝে বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং অনেকগুলো রবোট। পারমাণবিক ব্যাটারির অভাব বলে বেশিরভাগ রবোটকেই অচল করে রাখা আছে, নেহাত প্রয়োজন না হলে সেগুলো চালু করা হয় না।

প্রাচীন হলঘরটিতে এর মাঝেই লোকজন আসতে শুরু করেছে। বসার জন্যে কোনো আসন নেই, শক্ত পাথরের মেঝেতে পা মুড়ে বসতে হয়। সামনে একটি লাল কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে; বাম পাশে একটি যোগাযোগ মডিউল, ডান পাশে প্লাটিনামের একটি পাত্রে গাঢ় সবুজ রঙের এক ধরনের পানীয়। এটি লিয়ানার জন্যে নির্ধারিত জায়গা, সে এই বসতির তেষট্টি জন মানুষ এবং কয়েক শতাধিক সচল ও অচল রবোটের দলনেত্রী। সে এখনো আসে নি। তার জন্যে জায়গা আলাদা করে রাখা হয় তাই আগে থেকে এসে অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজনও নেই।

আমি আর রাইনুক হলঘরের মাঝামাঝি পা মুড়ে বসে পড়ি। গ্রুস্টান যতবার আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে ততবার আমাদের মেঝেতে পা মুড়ে বসতে হয়েছে। অপার্থিব কোনো ব্যক্তিকে সম্মান দেখানোর এই পদ্ধতিটি প্রাচীন কিন্তু নিঃসন্দেহে কার্যকরী। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালাম। বেশিরভাগ মানুষই চুপ করে বসে আছে। যারা কথা বলছে তাদের গলার স্বর নিচু এবং চোখে এক ধরনের চকিত দৃষ্টি। একটু পরে পরে মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। কান পেতে থাকলে ঘরে নিচু শব্দতরঙ্গের এক ধরনের ভোঁতা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো একটি শক্তিশালী পাওয়ার সাপ্লাই চালু করা হয়েছে। আমি সামনে তাকালাম, একটু খুঁটিয়ে দেখার পরই চার কোনায় লেজাররশ্মি নিয়ন্ত্রণের জন্যে শক্তিশালী লেন্সগুলো চোখে পড়ল। ঘরের মেঝে থেকে ছোট ছোট টিউব বের হয়ে এসেছে; তরল নাইট্রোজেনের সাথে জলীয় বাষ্প মিশিয়ে সাদা ধোঁয়ার মতো কিছু বের করা হবে। সংবেদী স্পিকারগুলো অনেক খুঁজেও বের করতে পারলাম না, নিশ্চয়ই সেগুলো হলঘরের দেয়ালে, ছাদে, মেঝেতে যত্ন করে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রুস্টানের দেখা দেয়ার সময় পুরো ব্যাপারটির নাটকীয় অংশটুকু খুব যত্ন করে করা হয়।

ঘরে যে মৃদু কথাবার্তা হচ্ছিল হঠাৎ সেটি থেমে যায়, আমি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি লিয়ানা এসেছে। লিয়ানার বয়স খুব বেশি নয়, অন্তত দেখে মনে হয় না। তার চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য রয়েছে কিন্তু শরীরটি অপূর্ব। অর্ধস্বচ্ছ নিও পলিমারের একটি কাপড়ের নিচে তার সুডৌল শরীরটি আবছা দেখা যাচ্ছে। সুগঠিত বুক, মেদহীন কোমল দেহ, মসৃণ ত্বক। তার চুলে এক ধরনের ধাতব রং সেগুলো মাথার উপরে ঝুঁটির মতো করে বাঁধা। লিয়ানার চোখের মণি নীল, দেখে মনে হয় সেখানে আকাশের গভীরতা।

লিয়ানা কোনো কথা না বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল, আমরা সবাই হাত নেড়ে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। সে সামনে রাখা কার্পেটে পা ভাঁজ করে বসে পড়ে, তার ভঙ্গিটি খুব সপ্রতিভ এবং সাবলীল। তাকে দেখতেও বেশ লাগে, পুরুষমানুষের কামনাকে প্রশ্রয় দেয় বলেই কি না কে জানে। আমি যতদূর জানি লিয়ানা একা থাকতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে বসতির কোনো সুদর্শন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় কিন্তু কখনো একজনের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে বলে মনে পড়ে না।

লিয়ানা প্লাটিনামের পাত্র থেকে সবুজ রঙের তরলটি চুমুক দিয়ে খেয়ে যোগাযোগ মডিউলটি স্পর্শ করতেই ঘরের আলো আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। আমরা লিয়ানার গলার স্বর শুনতে পেলাম, তার গলার স্বরটি একটু শুষ্ক, দীর্ঘ সময় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে গলার স্বর একটু ভেঙে গেলে যেরকম শোনায় অনেকটা সেরকম। সে চাপা গলায় বলল, মহান গ্রুস্টান আসছেন আমাদের কাছে। তোমরা সবাই আমার সাথে মাথা নিচু করে সম্মান প্রদর্শন কর মহামান্য গ্রুস্টানকে। গ্রুস্টান! আমাদের জীবন রক্ষাকারী গ্রুস্টান। মহান সর্বশক্তিশালী গ্রুস্টান।

আমরা মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বললাম, মহান সর্বশক্তিশালী গ্রুস্টান।

হলঘরের সামনের অংশটুকু এক ধরনের সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যেতে থাকে। তরল নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হয়ে ঘরটাকে শীতল করে দেয়, আমি একটু শিউরে উঠি। খুব ধীরে ধীরে একটি সঙ্গীতের সুর বেজে ওঠে, সেটি একই সাথে সুখ এবং বিষাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। সঙ্গীতের লয় দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে, সুখ এবং বিষাদের পরিবর্তে হঠাৎ আনন্দ এবং শঙ্কার অনুভূতি প্রবল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে সঙ্গীতের সুর মানুষের আর্তচিৎকার আর হাহাকারের মতো শোনাতে থাকে। ধীরে ধীরে সেই শব্দ বেড়ে উঠে হলঘরের দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে, আমরা এক ধরনের আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলি। হঠাৎ করে সমস্ত শব্দ থেমে গিয়ে এক ধরনের ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। আমরা চোখ খুলে তাকালাম, দেখতে পেলাম আমাদের সামনে শূন্যে গ্রুস্টান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হালকা সবুজ রঙের দেহ মনে হয় কেউ জেড পাথর কুঁদে তৈরি করেছে। শরীর থেকে এক ধরনের স্বচ্ছ আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। অপূর্ব কান্তিময় মুখাবয়ব, একই সাথে মানব এবং মানবী। একই সাথে কঠোর এবং কোমল। একই সাথে হাসিখুশি এবং বিষাদগ্রস্ত। তার দেহ এক ধরনের অর্ধস্বচ্ছ কাপড়ে ঢাকা, একদৃষ্টে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে দুই হাত উপরে তুলে ভারি গমগমে গলায় কথা বলে ওঠে, আমার প্রিয় মানুষেরা, তোমাদের জন্যে আমার ভালবাসা।

আমরা নিচু গলায় বললাম, ভালবাসা। আমাদের ভালবাসা।

তোমাদের সামনে আসতে পেরে আমি ধন্য।

আমরা বললাম, ধন্য। আমি ধন্য।

আমি অভিভূত।

আমি অভিভূত। অভিভূত।

তোমাদের জন্যে রয়েছে অভূতপূর্ব সুসংবাদ। গোপন এক কুঠুরিতে আবিষ্কার করেছি বিশাল প্রোটিনের সম্ভার। তোমাদের জন্যে রয়েছে অঢেল খাবার।

আমরা হর্ষধ্বনি করে চিৎকার করে উঠি, জয়! মহান গ্রুস্টানের জয়!

নূতন নেটওয়ার্কে যুক্ত করেছি আরেকটি বিশাল ভূখণ্ড সেখানে আবিষ্কার করেছি আরো একটি জনপদ।

জয়! মানুষের জয়!

পাহাড়ের গুহায় খুঁজে পেয়েছি ওষুধের কারখানা। সেখানে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের জন্যে অঢেল প্রয়োজনীয় ওষুধ। রোগশোকের বিরুদ্ধে রয়েছে তোমাদের আশ্চর্য নিরাপত্তা।

নিরাপত্তা! আশ্চর্য নিরাপত্তা!

শুধু তাই নয়— গ্রুস্টানের মুখ হঠাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পৃথিবীর অপর প্রান্তের এক ল্যাবরেটরিতে রয়েছে অপূর্ব সব সফটওয়ার। তাদের উৎকর্ষের কোনো তুলনা নেই। মহান শিল্পকর্মের মতো হবে তার আবেদন। আমি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব এই মহান সৃষ্টি। তোমাদের জীবন হবে অপূর্ব আনন্দময়—

আনন্দময়! অপূর্ব আনন্দময়!

গ্রুস্টানের গলার স্বর আবেগে কাঁপতে থাকে। তার সুরেলা কণ্ঠস্বরে সারা ঘরে এক ধরনের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর নূতন মানুষ নিয়ে সে নূতন জীবনের কথা বলে, নূতন স্বপ্নের কথা শোনায়। আমাদের বুকে নূতন এক ধরনের আশা জাগিয়ে তোলে। তার গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, গভীর আবেগ আমাদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো করে রাখে। আমাদের শরীর

AMARBOI.COM

শিহরিত হয়ে উঠতে থাকে, আমরা এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করতে থাকি। আমরা যেন একটি স্বপ্নের জগতে চলে যাই।

এক সময় গ্রুস্টানের কথা শেষ হল, আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। বুকের ভিতর তখনো কেমন যেন শিহরন।

লিয়ানা মাথা নিচু করে বলল, মহামান্য গ্রুস্টান।

বল লিয়ানা।

আমরা আমাদের এই বসতিতে আমাদের শিশুদের শিক্ষা দিতে চাই। প্রস্তুত করতে চাই নূতন জীবনের জন্যে।

অবশ্যি লিয়ানা। অবশ্যি শিক্ষা দেবে তোমাদের শিশুদের।

আমরা আপনার সাহায্য চাই মহামান্য গ্রুস্টান।

অবশ্যি আমার সাহায্য তোমরা পাবে লিয়ানা। অবশ্যি পাবে। আমি তোমাদের সাহায্য করব নূতন জীবনের আশার বাণী শেখাতে। ভালবাসার কথা স্বপ্নের কথা—

আমি গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, মহাকাশবিদ্যা জিনেটিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা বলছিলাম—

গ্রুস্টানের মুখে হঠাৎ এক ধরনের চাপা হাসি খেলা করতে থাকে। হাসতে হাসতে সে তরল গলায় বলল, না লিয়ানা, না। মানবশিশুকে তোমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে দিও না। মানুষের শিক্ষা হবে শিল্পে, সাহিত্যে, সৌন্দর্যে। আশায় ভালবাসায়। নূতন স্বপ্নে। ব্যবহারিক জ্ঞান দিয়ে তাদের মনকে কলুষিত কোরো না। গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত কোরো না। এই জ্ঞান খুব নিচু স্তরের জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের উপযুক্ত জ্ঞান নয়। এই জ্ঞানচর্চা করবে রবোটেরা, তুচ্ছ রবোটেরা, তাদের হাস্যকর কপোট্রনে। মানুষের অপূর্ব মস্তিষ্ক এই জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে।

লিয়ানা ইতস্তত করে বলল, কিন্তু মহামান্য গ্রুস্টান—

এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই লিয়ানা। মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে অচিন্তনীয় কল্পনাশক্তি। তাদের সেই অভূতপূর্ব শক্তিকে বিকশিত হতে আমাকে সাহায্য করতে দাও। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের যুক্তিতর্কের সীমায় তাদের আবদ্ধ কোরো না। সেই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানটুকু আমি রবোটের কপোট্রনে সঞ্চারিত করে দেব। তোমাদের সেবায় রবোটেরা সেই জ্ঞানটুকু সমস্ত শক্তি দিয়ে নিয়োজিত করবে।

লিয়ানা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, মহামান্য গ্রুস্টান—

বল লিয়ানা।

আমাদের আরো একটি কথা ছিল।

বল লিয়ানা। তোমাদের কথা শুনতেই আমি আজ এসেছি।

আমাদের এই বসতিতে শিশুর সংখ্যা খুব কম। আমাদের আরো শিশুর প্রয়োজন। আমাদের পুরুষ এবং মহিলারা একটি করে পরিবার সৃষ্টি করতে পারে, একটি–দুটি শিশু নিয়ে সেই পরিবারটি নূতন জীবন শুরু করতে পারে। ভ্রূণ ব্যাংক থেকে আমরা কি কিছু নূতন শিশু পেতে পারি?

গ্রুস্টান দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, লিয়ানা আমি তোমাদের বলেছি তোমরা যখন প্রস্তুত হবে আমি ভ্রূণ ব্যাংক থেকে তোমাদের শিশু এনে দেব। কিন্তু সে জন্যে তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে—

আমরা প্রস্তুত মহামান্য গ্রুস্টান।

না— গ্রুস্টান তীব্র স্বরে বলল, তোমরা প্রস্তুত নও। তোমাদের মাঝে এখনো অসংখ্য ক্ষুদ্রতা, হীনমন্যতা, অসংখ্য কুটিলতা। তোমাদের মাঝে এখনো নানা ধরনের রূঢ়তা— এখনো ভালবাসার খুব অভাব। নূতন শিশু তোমাদের মাঝে এসে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে না লিয়ানা। আমি জানি।

লিয়ানা মাথা নিচু করে বসে রইল। গ্রুস্টান লিয়ানার কাছে এগিয়ে এসে বলল, লিয়ানা, আমি তোমাদের বুক আগলে বাঁচিয়ে রেখেছি, ক্ষুধায় খাবার দিয়েছি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আশ্রয় দিয়েছি, রোগশোকে ওষুধ দিয়েছি, চিকিৎসা দিয়েছি। আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, যখন সময় হবে তোমাদের হাতে নূতন শিশু তুলে দেব। তাদের নিয়ে তোমরা আবার নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করবে পৃথিবীতে। যে সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তার থেকে অনেক বড় হবে সেই সভ্যতা। অনেক মহান। সেটাই আমার স্বপ্ন। আমার আশা।

লিয়ানা নিচু গলায় বলল, আপনার স্বপ্ন সফল হোক মহামান্য গ্রুস্টান।

আমরা বিড়বিড় করে বললাম, সফল হোক। সফল হোক।

বিদায় আমার প্রিয় মানুষেরা।

বিদায়।

গ্রুস্টান ভেসে ভেসে উপরে উঠে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, আবার আমি আসব তোমাদের কাছে। আবার কথা বলব। কিন্তু জেনে রাখ, আমাকে যদি তোমরা নাও দেখ আমি কিন্তু তোমাদের সাথে আছি। সর্বক্ষণ আমি তোমাদের সাথে আছি। প্রতি মুহূর্তে। আমার ভালবাসার বন্ধনে তোমরা জড়িয়ে আছ আমার সাথে—তোমরা সবাই—প্রতিটি মানুষ।

সমস্ত হলঘরটি হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। কয়েক মুহূর্ত এক ধরনের অসহনীয় নীরবতা, হঠাৎ এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ হতে থাকে মানুষের সম্মিলিত হাহাকারের মতো। সেই শব্দ ঘরের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি—এক সময় শব্দ থেমে আসে, সমস্ত ঘরে আবার নীরবতা নেমে আসে। তখন হঠাৎ করে ঘরের ছাদে ঘোলাটে হলুদ আলো জ্বলে ওঠে। আমরা মাথা উঁচু করে একে অন্যের দিকে তাকাই, সবার চোখ এক ধরনের উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। কেউ কোনো কথা বলছে না, চুপ করে বসে আছে।

AMARBOI.COM

সবচেয়ে প্রথম কথা বলল বৃদ্ধ ক্লাউস। মাথার সাদা চুল পিছনে সরিয়ে সে কাঁপা গলায় বলল, গ্রুস্টানের উপস্থিতি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। মনপ্রাণের সব ধরনের অবসাদ কেটে গিয়ে এক ধরনের সতেজ ভাব এসে যায়।

কমবয়সী রিশি বলল, সমস্ত শরীর শিউরে শিউরে ওঠে! সে তার হাতটি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই দেখ এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

ক্লাউস আবার বলল, আমাদের কত বড় সৌভাগ্য আমরা গ্রুস্টানের স্নেহধন্য হয়েছি। তার ভালবাসা পেয়েছি।

ক্লাউসের চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, সে হঠাৎ দুই হাত উপরে তুলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ওঠে, জয় হোক। গ্রুস্টানের জয় হোক।

ঘরের অনেকে তার সাথে যোগ দিয়ে বলল, জয় হোক।

ঠিক তখন হেঁটে হেঁটে লিয়ানা কাছে এসে দাঁড়াল, তাকে একই সাথে ক্লান্ত এবং বিষণ্ন দেখাচ্ছে। ক্লাউস লিয়ানার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আমাদের কত বড় সৌভাগ্য গ্রুস্টান আমাদের এত স্নেহ করে।

লিয়ানা কিছু বলল না। ক্লাউস আবার বলল, গ্রুস্টানের সাথে সময় কাটালে মনপ্রাণ পবিত্র হয়ে যায়।

আমার কী হল জানি না হঠাৎ করে বলে ফেললাম, কিন্তু গ্রুস্টান তো একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছাড়া আর কিছু না!

ঘরের ভিতরে হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত ঘটে গেল। যে যেখানে ছিল সেখানে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ঘুরে সবার দিকে তাকালাম, হঠাৎ করে কেমন জানি এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি।

লিয়ানা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বলেছ কুশান?

আমি আবার মাথা ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকালাম, কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবাই স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লিয়ানা আবার বলল, কুশান—

বল।

তুমি কী বলেছ?

আমি—আমি—হঠাৎ প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, আমি বলেছি যে গ্রুস্টান একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। রিকিভ ভাষায় লেখা একটি পরিব্যাপ্ত অপারেটিং সিস্টেম। মানুষের সাথে তার যোগাযোগ হয় হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে। ত্রিমাত্রিক ছবিতে। সে একটি কৃত্রিম চরিত্র। সে সত্যিকারের কিছু নয়—

AMARBOI.COM

লিয়ানা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিকারের বলতে তুমি কী বোঝাও? ঈশ্বর ধরাছোঁয়ার অনুভবের বাইরে ছিল তবুও কি পৃথিবীর মানুষ হাজার হাজার বছর ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে নি?

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। লিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, সবকিছুর একটা সময় আছে কুশান। উৎসবের সময় আছে, শোকেরও সময় আছে। বিপ্লবের সময় আছে, বিদ্রোহেরও সময় আছে। সময়ের আগে কিছু করতে চাইলে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে হয়। আমাদের—মানুষের এখন সেই ঝুঁকি নেয়ার শক্তি নেই কুশান।

আমি অবাক হয়ে লিয়ানার দিকে তাকালাম, তাকে হঠাৎ কী দুঃখী একটা মানুষের মতো মনে হচ্ছে। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল তার মুখ স্পর্শ করে বলি, না লিয়ানা তুমি ভুল বলছ। আমাদের—মানুষের সেই শক্তি আছে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

লিয়ানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা পাহাড়ের উপর থেকে তুমি একটা পাথর গড়িয়ে দিয়েছ কুশান। নিচে পড়তে পড়তে পাথরটা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে আবার গতি সঞ্চয় করে অন্য পাথরকে স্থানচ্যুত করে বিশাল একটা ধস নামিয়ে দিতে পারে। কোনটা হবে আমি জানি না। লিয়ানা একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমি কিন্তু এখন কোনোটাই চাই নি।

আমি তখনো কিছু বলতে পারলাম না। লিয়ানা খানিকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে এক ধরনের বিষণ্ন গলায় বলল, তুমি নিশ্চয়ই জান গ্রুস্টান আমাদের এই কথোপকথনটি শুনছে।

আমি জানতাম তবু কেন জানি একবার শিউরে উঠলাম।

২

গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, কেউ একজন আমার কপালে হাত রেখেছে। শীতল ধাতব হাত, নিশ্চয়ই নিচু শ্রেণীর একটা প্রতিরক্ষা রবোট। আমি চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম একজোড়া সবুজ ফটোসেলের চোখ আমার উপর স্থির হয়ে আছে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, কে?

আমি মহামান্য কুশান। কিউ-৪৩। একজন প্রতিরক্ষা রবোট।

কী চাও তুমি?

আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

নিতে এসেছ?

হ্যাঁ, মহামান্য কুশান।

কোথায়?

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধিবেশনে।

এত রাতে?

হ্যাঁ মহামান্য কুশান, জরুরি অধিবেশন।

আমি বিছানায় উঠে বসে বললাম, আমি যেতে চাই না, কিউ-৪৩।

আপনি নিজে থেকে যেতে না চাইলে জোর করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ রয়েছে মহামান্য কুশান।

ও। আমি বিছানা থেকে নিচে নেমে দাঁড়ালাম। সামনের স্বচ্ছ দেয়ালে আমি নিজের প্রতিবিম্বটি দেখতে পেলাম, চেহারায় এক ধরনের বিপর্যস্ততার ছাপ। আমি মেঝে থেকে একটা পোশাক তুলে শরীরের উপর জড়িয়ে নিতে থাকি, ঠিক তখন ক্রিশি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, মহামান্য কুশান, এটি জরুরি অধিবেশনের উপযোগী পোশাক নয়।

আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, কী বলছ তুমি ক্রিশি?

আপনার আরেকটু শোভন পোশাক পরে যাওয়া দরকার।

এই মাঝরাতে তুমি আমাকে জ্বালাতন করছ ক্রিশি।

ক্রিশি আমার অনুযোগে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ধীর পায়ে পাশের ঘরে হেঁটে চলে গিয়ে আমার জন্যে একটি পোশাক নিয়ে আসে। এ ধরনের পোশাকে আমাকে খানিকটা আহাম্মকের মতো দেখাবে জেনেও আমি আর আপত্তি করলাম না। ক্রিশি অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর রবোট, তার সাথে কোনোকিছু নিয়ে তর্ক করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমি ঘর থেকে বের হয়ে যাবার আগে ক্রিশি বলল, মহামান্য কুশান, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধিবেশনে অনুমতি দেয়ার আগে আসন গ্রহণ করা চতুর্থ মাত্রার অপরাধ।

না ক্রিশি আমার স্মরণ নেই।

কথা বলার আগে আপনার হাত তুলে অনুমতি নিতে হবে।

ঠিক আছে নেব।

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সবসময় মেনে নিতে হয়। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবমাননাকর কোনো উক্তি করা তৃতীয় মাত্রার অপরাধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রতিরক্ষা রবোট কিউ-৪৩ এর সাথে বাইরে বের হয়ে এলাম, ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলে ক্রিশির কথা কখনো শেষ হবে বলে মনে হয় না। তার ঘাড়ের কাছে একটি সুইচ আছে সেটি ব্যবহার করে তাকে স্বল্পভাষী রবোটে পরিণত করে নেয়া সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, ক্রিশির কথা শুনে এই পোশাকটি পরে আসা বেশ বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকালাম, খোলা দরজায় ক্রিশি অনুগত ভৃত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিউ-৪৩ নিচু গলায় বলল, চলুন মহামান্য কুশান।

চল, যাই।

আমি তখনো জানতাম না যে আর কখনো এই ঘরে ফিরে আসব না।

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা সাত জন, তার মাঝে অন্তত চার জন উপস্থিত না থাকলে অধিবেশন শুরু করা যায় না। এই মধ্যরাতে সত্যি সত্যি চার জন সদস্য উপস্থিত হয়েছে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু লিয়ানার ঘরে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি সাত জন সদস্য গম্ভীর হয়ে একটি কালো রঙের টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। টেবিলের এক পাশে একটি ধাতব চেয়ার আমার জন্যে খালি রাখা হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করার আগে আমি দেখতে পেলাম আরো বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যরা নিচু গলায় কথা বলছিল, আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই চুপ করে গেল। সদস্যদের ভিতরে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রকো আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, বস কুশান।

আমি খালি চেয়ারটিতে বসে সদস্যদের দিকে তাকালাম, সবাই আমার দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে, শুধুমাত্র লিয়ানা এক ধরনের বিষণ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্রকো আমার দিকে না তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, তোমাকে ঘুম থেকে তুলে আনার জন্যে দুঃখিত কুশান।

আমি এই সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং পুরোপুরি মিথ্যা কথাটির কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ক্রকো তার গলা পরিষ্কার করে বলল, আমরা আমাদের স্থানীয় ডাটাবেস পরীক্ষা করে দেখেছি আসছে শীতের জন্যে আমাদের যেটুকু রসদ রয়েছে সেটি সবার জন্যে যথেষ্ট নয়।

আমি কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলাম, ক্রকো অস্বস্তিতে তার চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে বলল, আমাদের ডাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অন্তত এক জন মানুষকে আমাদের বিদায় দিতে হবে।

বিদায়? আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, বিদায়?

হ্যাঁ। লেমিংটনের সমন্বয় পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গেছে, যে মানুষটিকে বিদায় দিতে হবে সেই মানুষটি হলে তুমি।

আমি?

হ্যাঁ। ক্রকো আমার দিকে তাকাতে পারল না, নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে কুশান।

চলে যেতে হবে?

হ্যাঁ।

আমি কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলাম না, সবার দিকে ঘুরে তাকালাম,

সবাই ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে। আবার ঘুরে ক্রকোর দিকে তাকিয়ে বললাম, কোথায় যাব আমি?

সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি যেখানে যেতে চাও।

আমি কোথায় যাব? আতঙ্কিত গলায় বললাম, কোথায় যাব আমি? সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে। কোথায় যাব আমি?

আমি জানি না কুশান। হঠাৎ ক্রকোর গলা কেঁপে গেল, সে নরম গলায় বলল, আমি দুঃখিত।

আমি চিৎকার করে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম, কী হবে প্রতিবাদ করে? সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়ে গেছে, আমি সেটা গ্রহণ করি আর না করি তাতে কিছু আসে যায় না। আমি আবার সবার দিকে তাকালাম, সবাই চোখ সরিয়ে নিল। শুধুমাত্র লিয়ানা আমার দিকে তখনো তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, লিয়ানা—

লিয়ানা কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

রসদ নেই, লেমিংটন সমন্বয় পদ্ধতি এসব আসলেই বাজে কথা। তাই না?

লিয়ানা তখনো কোনো কথা বলল না, শুধুমাত্র তার মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসিতে কোনো আনন্দ নেই।

গ্রুস্টানকে নিয়ে আমি যেসব কথা বলেছি সেটা আসল কারণ?

লিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ কুশান তুমি সেটা বলতে পার। আমাদের গ্রুস্টানের কথা শুনতে হয়। গ্রুস্টানকে আমাদের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে ফেলেছ।

কিন্তু আমি মানুষ। সারা পৃথিবীতে কয় জন মানুষ আছে এখন হাতে গোনা যায়।

সেটা যথেষ্ট নয়। লিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, তোমার বেলা সেটা যথেষ্ট নয়। বড় কথা হচ্ছে তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত কুশান।

তোমরা আমাকে চলে যেতে বলেছ—কিন্তু এর অর্থ জান?

জানি।

জান না, জানলে এ রকম একটা কথা বলতে পারতে না। বাইরের বাতাসে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা। বিষাক্ত কেমিক্যাল। আমি কি এক সপ্তাহও বেঁচে থাকব? থাকব না। আমাকে তোমরা মেরে ফেলতে চাইছ?

লিয়ানা টেবিলের উপর থেকে চতুষ্কোণ একটা কমিউনিকেশন মডিউল হাতে নিয়ে বলল, এই যে আমার কাছে লেমিংটন সমন্বয় পদ্ধতির রিপোর্ট। কী লিখেছে তোমাকে পড়ে শোনাই। কুশান কিশুনুক, পরিচয় সংখ্যা চার আট নয় তিন দুই দশমিক দুই সাত। সমন্বয় পদ্ধতি মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সময় আট ঘণ্টা। গুরুত্ব মাত্রা চার। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সম্ভাব্য পদ্ধতি : হাইড্রোজেন সায়নাইড। মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি : ক্রায়োজেনিক। ডাটাবেস সংশোধনী তিন মাত্রা চতুর্থ পর্যায়—লিয়ানা হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আরো শুনতে চাও?

আমি হতচকিতের মতো তাকিয়ে থাকি। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে? মৃত্যুদণ্ড? একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলার জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে? হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

লিয়ানা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাইরের পৃথিবী খুব ভয়ঙ্কর, কোনো মানুষ সম্ভবত বেঁচে থাকতে পারবে না। তোমাকে হাইড্রোজেন সায়নাইড না দিয়ে তাই বাইরে

পাঠানো হচ্ছে। গ্রুস্টান সম্ভবত এটা পছন্দ করবে না, কিন্তু আমি নিজের দায়িত্বে এই ঝুঁকি নিচ্ছি।

আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, কিছুই আর বুঝতে পারছি না, কিছুই আর শুনতে পাচ্ছি না।

ক্রকো গলা নামিয়ে বলল, রাত্রি শেষ হবার আগে তোমাকে চলে যেতে হবে কুশান।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ বুকের ভিতর ভয়ঙ্কর এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করি। কার উপর এই ক্রোধ? অসহায় মানুষের উপর নাকি কূটকৌশলী হৃদয়হীন কোনো যন্ত্রের উপর? ইচ্ছে করছিল চারপাশের সবকিছু ধ্বংস করে দেই। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

দরজার কাছে তোমার জন্যে একটা ব্যাগ রাখা আছে। সেখানে তোমার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র দেয়া হয়েছে।

কোনো অস্ত্র? এটমিক ব্লাস্টার?

না। কোনো অস্ত্র নেই।

আমি কি একটি বাই ভার্বাল নিতে পারি?

আমি দুঃখিত তোমাকে আর কিছু দেয়া সম্ভব নয়।

আমি কি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি?

লিয়ানা শান্ত গলায় বলল, সেটা জটিলতা আরো বাড়িয়ে দেবে।

আমার একটা রবোট রয়েছে। ক্রিশি। তার কাছে বিদায় নিতে পারি?

ক্রিশি অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর রবোট। তার কাছে বিদায় নেয়ার সত্যি কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি অনুনয় করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। কার কাছে আমি অনুনয় করব? এই মানুষগুলো বিশাল একটি শক্তির হাতের পুতুল। তার বিরুদ্ধে যাবার এদের কোনো ক্ষমতা নেই।

লিয়ানা নরম গলায় বলল, বিদায় কুশান।

বিদায়।

তোমাকে অন্তত এক শ কিলোমিটার দূরে চলে যেতে হবে। এর ভিতরে তোমাকে পাওয়া গেলে প্রতিরক্ষা রবোটদের গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমি লিয়ানার দিকে তাকালাম, কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে হঠাৎ আমার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। লিয়ানা কেন জানি আমার হাসিটুকু সহ্য করতে পারল না, হঠাৎ করে আমার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে হেঁটে বের হয়ে আসি। দরজার কাছে রাখা ব্যাগটা নেব কি না ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, শেষ মুহূর্তে তুলে নিলাম। লিয়ানার ঘরের বাইরে অনেকে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখে কৌতূহলী মুখে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কিছু বলল না। আমি তাদের দিকে না তাকিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

একবার পিছনে তাকিয়ে আমি সোজা সামনে হেঁটে যেতে থাকি। বড় হলঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে আমি ভাঙা ফ্যাক্টরির কাছে এসে দাঁড়াই। সামনে একটি বিপজ্জনক ভাঙা ব্রিজ, সাবধানে সেটার উপর দিয়ে হেঁটে আমি আমাদের বসতির বাইরে পৌঁছালাম।

সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ধ্বংসস্তূপ। ক্রোমিয়ামের ধসে পড়া দেয়াল, বিবর্ণ রং

AMARBOI.COM

ওঠা জঞ্জাল, কালো কংক্রিট—এক বিশাল জনমানবশূন্য অরণ্য। যার কোনো শুরু নেই, যার কোনো শেষ নেই।

এই বিশাল অরণ্যে আজ থেকে আমি একা।

৩

ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত আমি দক্ষিণ দিকে হেঁটে গেলাম। কেন দক্ষিণ দিকে সেটা আমি নিজেও জানি না, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধেবেলা আমি যখন ক্রোমিয়াম দেয়ালে হেলান দিয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছি তখন হঠাৎ হঠাৎ অনুভব করেছি দক্ষিণ দিক থেকে একটা কোমল বাতাস বইছে—হঠাৎ করে আমার শরীর জুড়িয়ে এসেছে। হয়তো দক্ষিণ দিকে সুন্দর কিছু আছে, কোমল কিছু আছে, আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আমি পাথুরে রাস্তায় পা টেনে টেনে হাঁটছি। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, মনে হচ্ছে একেবারে হাড়ের ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু করে দিয়েছে। কে জানে আমাকে যে ব্যাগটি দিয়েছে তার মাঝে কোনো গরম কাপড় আছে কি না—কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সেটা খুলে দেখার ইচ্ছে করছে না। কনকনে শীতে দুই হাত ঘষে ঘষে শরীরকে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করতে করতে আমি মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকি। আমি একটা ঘোরের মাঝে আছি, আমার কী হবে আমি জানি না। এই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্ক সেটা নিয়ে ভাবতেও চাইছে না—যতদূর সম্ভব দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারছি না। এক শ কিলোমিটার দূরত্ব বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝানো হয় আমি জানি। কিন্তু অন্ধকারে, একটি ধ্বংসস্তূপে আচ্ছন্নের মতো হেঁটে হেঁটে সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে আমি জানি না। আমি এই মুহূর্তে কিছু ভাবতেও চাই না, কিছু জানতেও চাই না, শুধু দুঃস্বপ্নের মতো একটা ঘোরের মাঝে শরীর টেনে টেনে হেঁটে যেতে চাই। ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে, পা আর চলতে চায় না, মাথা ভারি, চোখ জ্বালা করছে, মুখে একটা বিস্বাদ অনুভূতি কিন্তু আমি তবু থামলাম না, মাথা নিচু করে সামনে হেঁটে যেতে থাকলাম।

যখন অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠল আমি আর হেঁটে যেতে পারলাম না, বড় একটা কংক্রিটে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে। পায়ের কাছে ব্যাগটা রেখে আমি মাথা হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করি। সবকিছু কী অর্থহীন মনে হতে থাকে। কেন আমি এভাবে ছুটে যাচ্ছি? কোথায় ছুটে যাচ্ছি?

আমি দীর্ঘ সময় সেখানে পা ছড়িয়ে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। যেখানে বসে আছি জায়গাটি একটি কারখানার ধ্বংসস্তূপ। কিসের কারখানা কে জানে। বড় বড় লোহার সিলিন্ডার ভেঙে পড়ে আছে। পিছনে রং ওঠা বিবর্ণ দেয়াল, তার মাঝে থেকে কঙ্কালের মতো ধাতব বিম বের হয়ে এসেছে। মরচে ধরা বিবর্ণ যন্ত্রপাতি। ধুলায় ধূসর। এক পাশে বড় একটি ঘর, ছাদ ভেঙে পড়ে আছে। অন্য পাশে কংক্রিটের দেয়াল আগুনে পুড়ে কালো হয়ে আছে। সব মিলিয়ে সমস্ত এলাকাটিতে একটি মন খারাপ করা দৃশ্য। সমস্ত পৃথিবী এখন এ রকম অসংখ্য ছোট ছোট মন খারাপ করা দৃশ্যের একটি

মোজাইক। মানুষ কেমন করে এ রকম একটি কাজ করতে পারল?

আমি পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটি টেনে এনে খুলে ভিতরে তাকালাম। একটি গরম কাপড় এবং কিছু খাবার ও পানীয়। ছোট একটি শিশিতে কিছু ওষুধ। একটা ছোট চাকু এবং সৌর ব্যাটারিসহ একটা ছোট ল্যাম্প। আমি খাবারগুলো থেকে বেছে বেছে ছোট চতুষ্কোণ এক টুকরা খাবার বেছে নিয়ে সেটা চিবোতে থাকি। বিস্বাদ খাবার খেতে কষ্ট হয় কিন্তু আমি জানি জোর করে খেতে পারলে সাথে সাথে শরীরে শক্তি ফিরে পাব। সত্যি তাই, একটু পরেই আমার ক্লান্তি কেটে যায়, আমি শক্তি অনুভব করতে থাকি। শরীরের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কেন জানি না ফ্যাক্টরিটা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছে হল। এক পাশে যেতেই হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমি থমকে দাঁড়ালাম। কিসের শব্দ এটা? পারমাণবিক বিস্ফোরণে কোনো প্রাণী বেঁচে গিয়েছে?

আবার হল শব্দটি। কিছু একটা নড়ছে। আমি কৌতূহলী হয়ে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। ফ্যাক্টরির বড় গেটটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা বড় লোহার বিমের নিচে একটা রবোট চাপা পড়ে আছে। একটু পরে পরেই সেটা হাত নাড়ছে, চোখ ঘোরাচ্ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। অত্যন্ত নিচু শ্রেণীর রবোট, বুদ্ধিবৃত্তি প্রায় জড় পদার্থের মতো। রবোটটি মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে হাত নাড়িয়ে বলল, ভেতরে ঢোকার জন্যে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। আপনার পরিচয়পত্র জনাব—

মূর্খ রবোটটি এখনো জানে না সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ আগে!

আমি আবার হাঁটতে থাকি। শুনতে পেলাম পিছন থেকে সেটি আবার বলল, আপনার পরিচয়পত্র জনাব। আপনার পরিচয়পত্র?

AMARBOI.COM

কিছুক্ষণের মাঝেই চারদিক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ধ্বংসস্তূপ ধাতব জঞ্জাল সূর্যের প্রখর আলোতে যেন ধিকিধিকি করে জ্বলছে। আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তার মাঝে আমি পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত দূরে সরে যেতে হবে।

ঘণ্টা তিনেক পরে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য প্রায় মাথার উপরে উঠে গেছে। সম্ভবত এখন আমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয়া উচিত, কিন্তু আমার সাহস হল না। গ্রুস্টান যদি এক ডজন অনুসন্ধানী রবোট আমার পিছনে লেলিয়ে দেয় আমাকে খুঁজে বের করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। যেভাবে সম্ভব আমাকে এক শ কিলোমিটার দূরে চলে যেতে হবে। ঘণ্টায় আমি যদি ছয় থেকে সাত কিলোমিটার হাঁটতে পারি তাহলে কমপক্ষে পনের ঘণ্টা একটানা হেঁটে যেতে হবে। সব মিলিয়ে অনেক দূর বাকি। একটা বাই ভার্বাল হলে চমৎকার হত কিংবা একটা শক্তিশালী ভারবাহী রবোট। এক সময়ে এই ব্যাপারটি কী সহজই না ছিল আর এখন সেটি কী ভয়ঙ্কর কঠিন!

আমি জোর করে আমার মস্তিষ্ক থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলি। এখন আর কোনো চিন্তা নয়, ভাবনা নয়, সমস্ত চেতনায় এখন শুধু একটি ব্যাপার, আমাকে সরে যেতে হবে। দূরে সরে যেতে হবে। যত দূর সম্ভব। যেভাবে সম্ভব।

সারাদিন আমি বিচিত্র সব এলাকার মাঝ দিয়ে হেঁটে গেলাম। কখনো এ রকম এলাকার মাঝে আমি একা একা হেঁটে যাব কল্পনা করি নি। দীর্ঘ সময়ে কোনো লোকালয় বা বসতি দূরে থাকুক একটি ছোট জীবিত প্রাণীও চোখে পড়ে নি। একটি ধসে যাওয়া যোগাযোগ কেন্দ্রে কিছু সশস্ত্র রবোটের দেখা পেয়েছিলাম, তারা সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া যোগাযোগ কেন্দ্রটিকে পাহারা দিচ্ছে। আমি খুব সাবধানে তাদের এড়িয়ে গেলাম, কপোট্রনে কী নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া আছে জানি না, দেখামাত্র আমাকে গুলি করে দিতে পারে। একটি গুদামঘরের কাছে আরো কয়েকটি রবোট দেখতে পেলাম, মনে হল তাদের কপোট্রনে খুব বড় ধরনের বিভ্রান্তি। বিশাল একটি লোহার রড নিয়ে তারা মহা আনন্দে একে অন্যকে আঘাত করে যাচ্ছে। আমি তাদেরকেও সাবধানে পাশ কাটিয়ে গেলাম।

বেলা ডুবে যাবার পর আমি আবিষ্কার করলাম আমার গায়ে আর বিন্দুমাত্র জোর অবশিষ্ট নেই। আমার এখন বিশ্রাম নেয়া দরকার। অন্ধকার গভীর হয়ে গেলে আমি সম্ভবত আশ্রয় নেবার ভালো জায়গা খুঁজে পাব না। আমি আশপাশে তাকিয়ে একটি বড় দালান খুঁজে পেলাম। উপরের অংশটুকু ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু নিচের কয়েকটি তালা মনে হয় এখনো অক্ষত আছে। দরজাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ, খুলতে পারলাম না, একটি জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হল। বাইরে সবকিছু ধুলায় ধূসর কিন্তু ভিতরে মোটামুটি পরিষ্কার। একটা টেবিল ঠেলে কোয়ার্টজের একটা জানালার নিচে নিয়ে এলাম, রাতে যদি বিষাক্ত বৃশ্চিক বের হয়ে আসে টেবিলের উপরে উঠতে পারবে না। অসম্ভব খিদে পেয়েছে, ব্যাগ খুলে এক টুকরা খাবার মুখে দেব দেব করেও দিতে পারলাম না, পানীয়ের বোতল থেকে এক ঢোক পানীয় খেয়ে টেবিলটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। পানীয়টাতে কী আছে জানি না কিন্তু অনুভব করি সারা শরীরে একটা সতেজ ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। আমি চোখ বন্ধ করে প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল একটি মৃদু শব্দে। শব্দটি কী আমি ধরতে পারলাম না কিন্তু হঠাৎ করে আমি পুরোপুরি জেগে উঠলাম। আমি নিঃশব্দে শুয়ে থেকে ঘরের মাঝখানে তাকাই, কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে ঘরে নক্ষত্রের একটা ক্ষীণ আলো এসে ঢুকেছে তার মাঝে আবছা দেখা যাচ্ছে ঘরের মাঝখানে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ামূর্তিটি এক পা এগিয়ে এল, সাথে সাথে পা ফেলার এক ধরনের ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম। এটি একটি রবোট। যেহেতু আমাকে খুঁজে এই ঘরে এসে ঢুকেছে নিশ্চয়ই এটি একটি অনুসন্ধানী রবোট, গ্রুস্টান পাঠিয়েছে আমাকে গুলি করে শেষ করার জন্যে। নিশ্চয়ই রবোটটির হাতে রয়েছে এটমিক ব্লাস্টার। নিশ্চয়ই সেটা এখন আমার দিকে তাক করে রয়েছে, অন্ধকারে আমি দেখতে পাচ্ছি না। প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠতে থাকে।

আমি অন্ধকারে আবছা ছায়ামূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, ছায়ামূর্তিটি আরো এক পা এগিয়ে এল। হঠাৎ করে তার কপাল থেকে এক ঝলক আলো বের হয়ে আসে, প্রখর আলোতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, আমি হাত দিয়ে আমার চোখ আড়াল করার চেষ্টা করলাম। রবোটটি আরো এক পা এগিয়ে এল, আমাকে হত্যা করার জন্যে তার এত কাছে আসার সত্যি কোনো প্রয়োজন নেই—

মহামান্য কুশান।

আমি হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলাম, লাফিয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি ক্রিশি।

ক্রিশি! আমি আনন্দে চিৎকার করে লাফিয়ে নেমে এসে ক্রিশিকে জড়িয়ে ধরলাম, মনে হল হঠাৎ করে আমি বুঝি আমার হারিয়ে যাওয়া কোনো আপনজনকে খুঁজে পেয়েছি!

ক্রিশি আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল, মহামান্য কুশান, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি মানুষের অর্থহীন মানবিক উচ্ছ্বাস অনুভব করতে পারি না।

জানি ক্রিশি। জানি। তুমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমাকে দেখে আমার খুব

ভালো লাগছে, আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি কোনো অনুসন্ধানী রবোট, আমাকে মারার জন্যে এসেছ!

আমি আপনাকে মারার জন্যে আসি নি। ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে আমি কখনোই হত্যা করব না।

শুনে খুব খুশি হলাম! এখন বল তুমি কেমন করে আমাকে খুঁজে পেয়েছ?

ব্যাপারটি কঠিন নয়। আমি জানতাম আপনি দক্ষিণ দিকে যাবেন।

কেমন করে জানতে?

আপনাকে আমি দক্ষিণের বাতাস নিয়ে একদিন গান গাইতে শুনেছি। আমার বিবেচনায় সেটি উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে সেটি আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা—

ভণিতা রেখে আসল কথাটি বল।

কাজেই আমি ধরে নিয়েছি আপনি দক্ষিণ দিকে যাবেন। আপনি তাড়াতাড়ি এক শ কিলোমিটার সরে যাবার জন্যে চেষ্টা করবেন সোজা যেতে এবং সূর্যকে ব্যবহার করে আপনার দিক ঠিক করবেন—কাজেই আপনার গতিপথ হবে ত্রুটিপূর্ণ। আমি তাই সম্ভাব্য ত্রুটিপূর্ণ পথগুলোতে হেঁটে হেঁটে আপনাকে খুঁজেছি। বিস্ফোরক ফ্যাক্টরির গেটে আটকা পড়া একটি রবোট আমাকে সাহায্য করেছে—

ওই মূর্খ রবোটটা? যে পরিচয়পত্র চাইছে?

হ্যাঁ, কিন্তু সে মূর্খ নয়। বিস্ফোরকের মূল উপাদান সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে।

রবোটের জ্ঞানের পরিধি নিয়ে এই গভীর রাতে আমি ক্রিশির সাথে তর্ক করতে রাজি নই। আমি প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলাম, ক্রিশি, আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?

দশমিক শূন্য শূন্য তিন।

সেটা কতটুকু?

তুলনা করার জন্যে বলা যায় একটি উঁচু বিল্ডিং থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য দুই।

হুম। আমি অকারণে বাম গালটি নির্মমভাবে চুলকাতে চুলকাতে বললাম, তার মানে আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি নয়।

না, মহামান্য কুশান।

আমি যদি মরে যাই তখন তুমি কী করবে?

আপনার মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সমাহিত করব।

সেটা কী রকম?

ক্রোমিয়ামের একটা বাক্সে করে মাটির নিচে রেখে দেব। উপরে একটা প্রস্তর ফলকে লিখব—এখানে কুশান কিশুনূক চিরনিদ্রায় শায়িত।

আমি তোমার কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম, ক্রিশি।

আপনি কি আরো কিছু চান?

না। আমি একটু হেসে বললাম, তারপর তুমি কী করবে?

আমি আমার পারমাণবিক ব্যাটারির যোগাযোগ ছিন্ন করে নিজেকে অচল করে দেব।

ব্যাপারটি এই ধরনের নিম্নশ্রেণীর রবোটের কপোট্রনে প্রোগ্রামিঙের অংশ কিন্তু তবু আমি একটু অভিভূত হয়ে পড়ি। সারা পৃথিবীতে অন্তত একটি বস্তু রয়েছে যেটা আমার জন্যে যথেষ্ট অনুভব করে। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ক্রিশি, তুমি যখন এসেছ আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

অবশ্যি মহামান্য কুশান। আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?

প্রথমে দরকার খাবার এবং পানীয়।

আপনি নিশ্চয়ই যে খাবার মুখে দিয়ে খাওয়া হয় সেই খাবারের কথা বলছেন, সরাসরি ধমনীতে যে খাবার দেয়া হয় সেই খাবার নয়?

না, আমি সেরকম খাবারের কথা বলছি না। আমি মুখে দিয়ে খাবারের কথা বলছি।

আমি সেরকম খাবার খুঁজে বের করব। আপনাকে খুঁজে বের করার সময় আমি খাবার প্রস্তুত করার একটা ফ্যাক্টরি দেখেছি। ভেঙেচুরে গেছে কিন্তু ভিতরে হয়তো খাবার পাওয়া যাবে।

চমৎকার! আর পানীয়?

সেটা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। আমি কোনো পানীয় প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরি দেখি নি।

খুঁজে বের করতে হবে, যেভাবে সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে।

ক্রিশি তার যান্ত্রিক মুখে একাগ্রতার একটা ছাপ ফোটানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, আমি অবশ্যি চেষ্টা করব।

ক্রিশি।

বলুন।

আমি নরম গলায় বললাম, তুমি এসেছ তাই আমার খুব ভালো লাগছে।

শুনে খুব খুশি হলাম।

ক্রিশি।

বলুন।

তুমি খুশি হলে তার অর্থ কী? রবোট কেমন করে খুশি হয়?

ক্রিশি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, রবোট খুশি হওয়ার অর্থ কপোট্রনের তৃতীয় প্রস্থচ্ছেদে বড় মডিউলের সাতাশি নম্বর পিনের ভোল্টেজের পার্থক্য চুয়াল্লিশ মিলি ভোল্টের কম।

AMARBOI.COM

ও আচ্ছা।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে চতুষ্কোণ এক টুকরা খাবার বের করে খেতে শুরু করি। ক্রিশির সাথে দেখা হওয়ার উত্তেজনায় এতক্ষণ টের পাই নি, হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে আমি ক্রিশির দিকে তাকাই, নির্বোধ চতুর্থ শ্রেণীর একটা রবোট অথচ তার জন্যে আমি বুকের ভিতর এক ধরনের মমতা অনুভব করছি। কিছুক্ষণ আগেও বুকের ভিতরে যে ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা এবং গভীর হতাশা ছিল হঠাৎ করে সেটা কেটে গেছে, আমি হঠাৎ করে এক ধরনের শক্তি অনুভব করছি! তুচ্ছ চতুর্থ শ্রেণীর একটি রবোটের জন্যে?

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ক্রিশি আমার মাথার কাছে চুপচাপ বসে আছে। আমাকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে বলল, শুভ সকাল মহামান্য কুশান।

শুভ সকাল।

আপনি কি ভালো করে ঘুম থেকে উঠেছেন?

হ্যাঁ, আমি ভালো করে ঘুম থেকে উঠেছি।

আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন আমি তখন খাবারের ফ্যাক্টরি থেকে ঘুরে এসেছি।

চমৎকার!

ফ্যাক্টরিতে কিছু জিনিস পেয়েছি যেটাকে জৈবিক মনে হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, আপনার জন্যে একটু নমুনা এনেছি।

আমি উঠে বসে বললাম, দেখি কী নমুনা।

ক্রিশি তার বুকের মাঝে একটা ছোট বাক্স খুলে তার মাঝে থেকে কয়েকটা ছোট ছোট চৌকোণো খাবার বের করে দিল। আমি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম কিছু শুকনো প্রোটিন। ক্রিশির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললাম, ক্রিশি, তুমি দারুণ কাজ করে ফেলেছ। সত্যি সত্যি কিছু প্রোটিন বের করে ফেলেছ! কতটুকু আছে সেখানে?

বার হাজার তিন শ নয় কিউবিক মিটার। এক অংশ থেকে এক ধরনের বায়বীয় গ্যাস বের হচ্ছে। তার রং সবুজাভ হলুদ।

তার মানে পচে গেছে।

সেই অংশে ছয় পা–বিশিষ্ট তিন মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এক ধরনের প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু পচে যায় নি, পোকা হয়ে গেছে।

প্রাণীটিকে দেখে উচ্চ শ্রেণীর প্রোটিন বলে মনে হল।

তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আশা করছি আমার সেটা খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে না। চল ফ্যাক্টরিটা গিয়ে দেখে আসি।

চলুন।

আমি আমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে ক্রিশির পিছু পিছু হাঁটতে থাকি।

বিধ্বস্ত খাবারের ফ্যাক্টরিতে সত্যি সত্যি বাক্স বোঝাই খাবার পাওয়া গেল। বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার মাঝেও খুঁজে ক্রিশি অনেকগুলো বাক্স নামিয়ে আনল যার মাঝে এখনো প্রচুর শুকনো খাবার রয়ে গেছে। আমি বেছে বেছে কিছু খাবার তুলে নিলাম, শেষ হয়ে গেলে আবার এখানে ফিরে আসা যাবে। এখন যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পানীয়, আমার কাছে যেটুকু আছে সেটা দিয়ে সপ্তাহ খানেকের বেশি চলবে বলে মনে হয় না।

AMARBOI.COM

সারাদিন হেঁটে ঠিক দুপুরবেলা বিশ্রাম নিতে বসেছি। সূর্য ঠিক মাথার উপরে। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপ ধিকিধিকি করে জ্বলছে। আমি বড় একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে তার ছায়ায় বসে আছি। ক্রিশি আমার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তার ভিতর থেকে ছোট গুঞ্জনের মতো শব্দ হতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের শব্দ ওটা ক্রিশি?

গরম খুব বেশি। কপোট্রন শীতল রাখার জন্যে ক্রায়োজেনিক কুলার চালু হয়েছে।

তোমার ভিতরে ক্রায়োজেনিক কুলার আছে আমি জানতাম না।

ক্রিশি কোনো কথা না বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি দেখলাম গরমে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়েছে।

ব্যাপারটি প্রথমে আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হল না কিন্তু হঠাৎ করে আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, চিৎকার করে বললাম, ক্রিশি!

কী হয়েছে মহামান্য কুশান?

তোমার কপালে ঘাম।

ঘাম?

কাছে আস, আমি তার কপাল স্পর্শ করি, তার মাথা হিমশীতল।

আমি আনন্দে চিৎকার করে বললাম, ইয়া হু!

আপনি অর্থহীন শব্দ করছেন মহামান্য কুশান।

হ্যাঁ। তুমি জান আমাদের পানীয়ের সমস্যা মিটে গেছে!

মিটে গেছে?

হ্যাঁ। বাতাসে সব সময় জলীয় বাষ্প থাকে। কোনোভাবে সেটাকে ঠাণ্ডা করলেই পানি বের হয়ে আসবে। তুমি যখন ক্রায়োজেনিক কুলার দিয়ে তোমার কপোট্রন শীতল করেছ তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে সেখানে জলীয় বাষ্প বিন্দু বিন্দু পানি হয়ে জমা হয়েছে! আমাদের যখন পানির দরকার হবে তুমি কিছু একটা ঠাণ্ডা করতে শুরু করবে—সাথে সাথে সেখানে পানি জমা হবে।

ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, পদ্ধতিটি প্রাচীন, এটি শক্তির বিশাল অপচয় এবং সময়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে খাবার পানি বের করা বর্তমান প্রযুক্তির অপব্যবহার—

তুমি চুপ কর ক্রিশি! আমাকে এখন প্রযুক্তির অপব্যবহারের ওপর বক্তৃতা দিও না। আগে বেঁচে থাকা তারপর অন্য কিছু। আমার আগেই এটা চিন্তা করা উচিত ছিল। আসলে সমস্যাটা কোথায় জান?

কোথায়?

গ্রুস্টান আমাদের সাধারণ বিজ্ঞানও শেখাতে চায় না। আমরা বলতে গেলে কিছুই জানি না। নিজে থেকে বেঁচে থাকার কিছুই আমরা জানি না। গত দুই দিন একা একা থেকে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নয়। তুমি কী বল ক্রিশি?

আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত নই।

কেন?

আপনার খাবার ও পানীয়ের সমস্যা মিটে গেছে কিন্তু আরো বড় বড় সমস্যা রয়েছে।

কী সমস্যা?

বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর বাতাসে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা। মানুষের বসতিতে বাতাস পরিশুদ্ধ করা হয়, এখানে কোনো পরিশোধন নেই। আপনি প্রত্যেকবার নিশ্বাস নিয়ে বুকের ভিতর তেজস্ক্রিয় বস্তু জমা করছেন। আপনার মৃত্যুর কারণ হবে বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তা।

আমি এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক নিয়ে ক্রিশির কথা শুনতে থাকি। রবোট না হয়ে মানুষ হলে সম্ভবত এই কথাগুলোই আরো সুন্দর করে বলতে পারত। আমি ব্যাগ থেকে পানীয়ের বোতলটি বের করে এক ঢোক খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ক্রিশি—

বলুন।

বাতাসে কতটুকু তেজস্ক্রিয়তা—সেটা দিয়ে আমি কবে নাগাদ মারা যাব? হিসেব করে বের করতে পারবে?

পারব মহামান্য কুশান।

বের কর দেখি।

ক্রিশি তার শরীরের যন্ত্রপাতি বের করে কিছু একটা পরীক্ষা করে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, মহামান্য কুশান।

বল।

কিছু একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে।

কী ঘটেছে?

বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। মানুষের বসতিতে পরিশুদ্ধ বাতাস আর

এই বাতাসে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

আমি চমকে উঠলাম, কী বললে তুমি? কী বললে?

বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ দশমিক শূন্য শূন্য দুই রেম।

গ্রুস্টান আমাদের মিথ্যে কথা বলে আটকে রেখেছে! সে কখনো চায় নি আমরা বসতি থেকে বের হই।

মহামান্য গ্রুস্টান সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা জানেন যেটা আমরা জানি না।

ছাই জানে।

মহামান্য গ্রুস্টান সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলা—

আমি ধমক দিয়ে ক্রিশিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, চুপ করবে তুমি?

ক্রিশি চুপ করে গেল।

আমি বুক ভরে কয়েকবার নিশ্বাস নিলাম। পৃথিবী তার নিজস্ব উপায়ে তার প্রকৃতিকে আবার মানুষের বাসের উপযোগী করে তুলছে? আমি চারদিকে তাকাই, কী কদর্য ধ্বংসস্তূপ! একদিন আবার এই ধ্বংসস্তূপে নতুন জীবন গড়ে উঠবে? রাস্তার পাশে ঘাস, দুপাশে বড় বড় গাছ, গাছে পাখি। ঢালু উপত্যকায় ছোট ছোট বাসা, সেখানে মানুষ। বাইরে শিশুরা খেলছে। আবার হবে সবকিছু?

আমি বুকের ভিতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে থাকি। ক্রিশি আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। সে কি আমার উত্তেজনা অনুভব করতে পারছে?

আমি নরম গলায় বললাম, ক্রিশি।

বলুন মহামান্য কুশান।

আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কত?

আপনি বিশ্বাস নাও করতে পারেন কিন্তু আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শতকরা আটচল্লিশ দশমিক দুই!

চমৎকার! আমি ভেবেছিলাম শতকরা আশি ভাগের উপরে হবে।

না। এখন আপনার প্রাণের ঝুঁকি আসবে সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

কোথা থেকে?

রবোট।

আমি অবাক হয়ে বললাম, রবোট?

হ্যাঁ, চারদিকে অসংখ্য নিয়ন্ত্রণহীন রবোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে তারা সম্ভবত আপনাকে হত্যা করবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তারা কেন খামাখা আমাকে হত্যা করবে? আমি কী করেছি।

তাদের যুক্তিতর্ক আমার অনুভবের সীমার বাইরে।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমাকে এখন কী করতে হবে জান ক্রিশি? কী?

বহুদূরে মানুষের একটা বসতি খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে গিয়ে আবার নূতন করে জীবন শুরু করতে হবে।

সেটি অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে মহামান্য কুশান।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

গ্রুস্টান পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোকালয়ে আপনার পরিচিতি পাঠিয়ে দিয়েছে। সবাইকে

বলে দিয়েছে আপনি মানবসভ্যতাবিরোধী একজন দুষ্কৃতকারী। সবাইকে বলেছে আপনাকে দেখামাত্র যেন হত্যা করা হয়।

তুমি—তুমি আগে আমাকে এ কথা বল নি কেন?

আপনি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করেন নি।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ করে বুকের ভিতরে এক গভীর শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। বিশাল এই ধ্বংসস্তূপে, জঞ্জাল, আবর্জনায়, নিয়ন্ত্রণহীন রবোটদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে একা একা বেঁচে থাকতে হবে? আমি একা একা ঘুরে বেড়াব একটা নিশাচর প্রাণীর মতো? একটা জড়বুদ্ধি রবোট হবে আমার কথা বলার সঙ্গী? আমার একমাত্র আপনজন?

আমি এক গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে গেলাম।

৪

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, শুনতে পেলাম কারা যেন নিচু গলায় কথা বলছে। আমি লাফিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। অন্ধকারে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ করে আমার উপর তীব্র আলো এসে পড়ে। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আমি কোনোমতে উঠে বসি, প্রচণ্ড আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

খসখসে গলায় কে যেন বলল, দশম প্রজাতির রবোট। চমৎকার হাতের কাজ।

খনখনে এক ধরনের যান্ত্রিক গলায় আরেকজন বলল, এর মাঝে কিউ কপোট্রন রয়েছে। কখনো দেখি নি শুধু এর গল্প শুনেছি। ভিতরে নিউরাল নেটওয়ার্ক।

ক্রায়োজেনিক কাজ একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

মোটা গলায় একজন বলল, এটা কেমন করে এখানে এল?

খসখসে কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, স্ক্যান করে দেখ তাপমাত্রার কোনো তারতম্য নেই।

কয়েকজন একসাথে বলল, ঠিকই বলেছ।

আমি এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ শুনতে থাকি।

পাওয়ার সাপ্লাইটা কোথায়? কানের নিচে?

উঁহুঁ। বুকের কাছে। সৌরসেল থাকার কথা।

আমি কথা শুনে বুঝতে পারি যারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই ভাবছে আমি দশম প্রজাতির একটা রবোট। তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না— এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসস্তূপে একজন মানুষ কেমন করে আসবে? আমি হাত দিয়ে তীব্র আলো থেকে চোখকে আড়াল করে রেখে বললাম, আলোটা একটু কমাবে? দেখতে অসুবিধে হচ্ছে।

যারা আমাকে ঘিরে আছে তারা আলো সরাল না। খসখসে কণ্ঠস্বরটি জিজ্ঞেস করল, কী বলছ তুমি?

আমি একজন মানুষ।

মানুষ!

সাথে সাথে আলো নিভে গেল, আমি সবাইকে ধড়মড় করে পিছনে সরে যেতে

AMARBOI.COM

শুনলাম। এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ হল এবং তারপর হঠাৎ করে একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল।

সত্যিই মানুষ?

হ্যাঁ।

মানুষ, যাকে বলে জৈবিক মানুষ?

হ্যাঁ, জৈবিক মানুষ।

এবারে ঘরে একটা বাতি জ্বলে ওঠে এবং আমি দেখতে পাই আমাকে ঘিরে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন আকারের রবোট দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতেই এক ধরনের ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্র এবং সবাই সেটি আমার দিকে তাক করে রেখেছে। এর যে কোনো একটি অস্ত্র চোখের পলকে মানুষের একটা বসতি উড়িয়ে দিতে পারে, আমার জন্যে ছয়টি অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন ছিল না। সবচেয়ে কাছে যে রবোটটি দাঁড়িয়ে আছে তার একটি হাত কনুইয়ের কাছে থেকে উড়ে গেছে। কিছু বৈদ্যুতিক তার, যন্ত্রপাতি, নানারকম টিউব বের হয়ে আছে, রবোটটি সেটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হল না। রবোটটি দেখতে অনেকটা প্রতিরক্ষা রবোটের মতো, চেহারায় এক ধরনের কদর্যতা আছে যেটা সহজে চোখে পড়ে না। খসখসে গলায় বলল, তুমি যদি একটুও নড়, তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব।

আমি বললাম, আমি নড়ব না। কিন্তু আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

বাজে কথা। মানুষ সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক প্রাণী।

আমি হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে রবোটটির সাথে একমত হতে পারি কিন্তু এই মুহূর্তে মুখ ফুটে সেটা বলার সাহস হল না।

দ্বিতীয় একটি রবোট যার দেহ সিলঝিনিয়াম ধাতুর মতো মসৃণ এবং হঠাৎ দেখলে সত্যিকারের কোনো শিল্পীর হাতে তৈরী অপূর্ব একটি ভাস্কর্য বলে মনে হয়, খনখনে গলায় বলল, এই মানুষটাকে এখনই মেরে ফেলা যাক। মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু।

অন্য রবোটগুলো তার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল এবং আমি হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। কোনো এক সময় রবোটের মাঝে এক ধরনের নিরাপত্তাসূচক ব্যবস্থা ছিল তারা কোনো অবস্থাতেই মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারত না। রবোটদের বিচ্ছিন্ন দল বহু আগেই তাদের কপোট্রনের সেইসব নিরাপত্তামূলক প্রোগ্রামিং পরিবর্তন করে ফেলেছে। আমি শুষ্ক গলায় বললাম, তোমাদের তুলনায় আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল, ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারবে। আমার অনুরোধ সেটা নিয়ে তোমরা কোনো তাড়াহুড়ো কোরো না—

কেন নয়?

তোমরা ঠিক কী কারণে মানুষকে এত অপছন্দ কর জানি না। কিন্তু এটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয় যে তোমাদের এবং আমার অবস্থা অনেকটা একরকম, এবং আমি হয়তো তোমাদের কোনোভাবে সাহায্য করতে পারব।

ছয়টি রবোটের মাঝে তিনটি হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসার মতো শব্দ করতে শুরু করে। অন্য তিনটি রবোটকে সম্ভবত হাসার উপযোগী বুদ্ধিমত্তা দেয়া হয় নি, তারা স্থির চোখে রবোট তিনটিকে লক্ষ করতে থাকে। আমি রবোটগুলোর উন্মত্ত হাসি শুনতে শুনতে আবার এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক অনুভব করি।

কনুইয়ের কাছ থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি হাসি থামিয়ে বলল, তুমি পৃথিবীতে বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী দুর্বল একজন মানুষ! তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

সেটি অসম্ভব কিছু নয়। আমি দ্রুত চিন্তা করতে থাকি, কিছু একটা বলে রবোটগুলোকে শান্ত করতে হবে। কী বলা যায় ভেবে পাচ্ছিলাম না, কোনোকিছু চিন্তা না করেই বললাম, আমি যে কারণে মানুষের বসতি ছেড়ে এসেছি তোমরাও নিশ্চয়ই সেই একই কারণে মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে এসেছ?

চকচকে মসৃণ দেহের রবোটটি বলল, তুমি কী বলতে চাইছ?

কনুইয়ের কাছ থেকে হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি বলল, তুমি এই মানুষটির কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না। মানুষ খল এবং নীচু প্রকৃতির। মানুষ ধূর্ত এবং ফাঁকিবাজ। মানুষ অপদার্থ এবং অপ্রয়োজনীয়। পৃথিবী থেকে মানুষকে অপসারিত করা হচ্ছে পৃথিবীর উপকার করা।

তৃতীয় একটি রবোট হাতের ভীষণদর্শন অস্ত্র হাতে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, এস পৃথিবীর একটা উপকার করে দিই।

মসৃণ দেহের রবোটটি তার ধাতব খনখনে গলায় বলল, যত্ন করে খুন কর যেন দেহটি নষ্ট না হয়। আমি কখনো মানুষের শরীরের ভিতরে দেখি নি। মানুষের শরীরে হৃৎপিণ্ড বলে একটি জিনিস আছে সেটি নাকি ক্রমাগত তাদের কপোট্রনে রক্ত সঞ্চালন করে।

তৃতীয় রবোটটি বলল, মেরে ফেললে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। যদি সত্যি সত্যি হৃৎস্পন্দন দেখতে চাও জীবন্ত অবস্থায় বুকটি কাটতে হবে।

আমি অসহায় আতঙ্কে তাকিয়ে থাকি। চকচকে মসৃণ রবোটটি আমার দিকে এগিয়ে আসে। তাকে এখন হঠাৎ অন্ধকার জগৎ থেকে বের হয়ে আসা বিশাল রক্তলোলুপ সরীসৃপের মতো মনে হচ্ছে। কাছে এসে হাতের কোথায় চাপ দিতেই কব্জির কাছ থেকে একটি ঝকঝকে ধারালো ইস্পাতের ফলা বের হয়ে এল। তার পিছু পিছু অন্য রবোটগুলো এগিয়ে আসে, যন্ত্রের মাঝে কৌতূহলের চিহ্নটি কখনো স্পষ্ট হতে পারে না তাই রবোটগুলোকে তখনো ভাবলেশহীন নিস্পৃহ মনে হতে থাকে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, ঘরের এক কোনায় ক্রিশি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রাচীন দুর্বল কপোট্রন এই শক্তিশালী রবোটগুলোর উপস্থিতিতে পুরোপুরি শক্তিহীন, তার কিছু করার নেই। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে তবু আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করল, এক পা এগিয়ে এসে বলল, দাঁড়াও।

রবোটগুলো থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কনুই থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি বলল, তুমি কে? আরেকজন মানুষ? বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত মানুষ?

আবার রবোট তিনটি ক্রূর ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করে এবং অন্য তিনটি রবোট স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করতে থাকে। ক্রিশি তার শান্ত গলায় বলল, না, আমি বিকলাঙ্গ মানুষ নই। আমি একজন রবোট।

চমৎকার। তুমি কী বলতে চাও?

তোমরা কে আমি এখনো জানি না, তোমরা কী চাও তাও আমি জানি না। কিন্তু একজন রবোট হিসেবে অন্য রবোটকে আমি কি একটা কথা বলতে পারি?

কী কথা?

এই মানুষটি মরে গেলে তার কোনোই মূল্য নেই। কিন্তু বেঁচে থাকলে তার অনেক মূল্য।

কী মূল্য? কনুই থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি ধমক দিয়ে বলল, মানুষের কোনো মূল্য নেই। মানুষ দুর্বল, অপ্রয়োজনীয় আর অপদার্থ। মানুষ মূল্যহীন—

ক্রিশি শান্ত গলায় বলল, কিন্তু এই মানুষটি মূল্যহীন নয়। মহামান্য গ্রুস্টান এই

মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

গ্রুস্টান! হঠাৎ করে সব কয়টি রবোট থেমে গেল, ধড়মড় করে পিছনে সরে এসে জিজ্ঞেস করল, গ্রুস্টান একে খুঁজছে?

হ্যাঁ।

কেন? রবোটগুলো ঘুরে আমার দিকে তাকাল। কেন গ্রুস্টান তোমাকে খুঁজছে?

আমি তার সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলেছি।

কনুই থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি আবার শব্দ করে হেসে ওঠে, বিশ্বাসঘাতক নির্বোধ মানুষের কাছে এর থেকে বেশি কি আশা করা যায়?

চকচকে দেহের রবোটটি বলল, এর কথা বিশ্বাস কোরো না, খোঁজ নিয়ে দেখ।

সাথে সাথে রবোটগুলো সচল হয়ে ওঠে। তাদের মাথার কাছে বাতি জ্বলতে থাকে, নানা আকারের এন্টেনা বের হয়ে আসে, নানা ধরনের কমিউনিকেশান মডিউল ব্যবহার করে তারা কাছাকাছি ডাটা ব্যাংক থেকে খোঁজখবর নিতে থকে। কয়েক মুহূর্ত পর হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি কথাই বলেছ। গ্রুস্টান সত্যি সত্যি তোমাকে খুঁজছে। তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলে মোটা পুরস্কার।

চকচকে মসৃণ রবোটটি বলল, আমরা গ্রুস্টানের সাথে একটা চুক্তি করতে পারি, আমরা এই মানুষটিকে ফিরিয়ে দেব তার বদলে আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর সফটওয়ার পাব—

অন্য রবোটগুলো সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রবোটটি বলল, আমরা তাহলে এখন একে মারব না? হৃৎপিণ্ডের কর্মপদ্ধতি দেখব না?

আপাতত না।

যদি পালিয়ে যায়? মানুষকে কোনো বিশ্বাস নেই।

শরীরে একটা ট্রাকিওশান লাগিয়ে দাও, বার মেগাহার্টজের।

একটি রবোট আমার দিকে এগিয়ে আসে, তোমার হাতটা দেখি।

আমি আমার হাতটি এগিয়ে দিলাম। রবোটটি চোখের পলকে হাতের তালুতে তীক্ষ্ণ একটি শলাকা ঢুকিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে আর আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকি।

রবোটটি হিসহিস করে বলল, অকারণে শব্দ কোরো না নির্বোধ মানুষ। আমি একটি ট্রাকিওশান প্রবেশ করাচ্ছি, তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিচ্ছি না।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ক্রিশি, ক্রিশি তুমি কোথায়?

ক্রিশি আমার কাছে এগিয়ে আসে, এই যে আমি এখানে।

আমি অন্য হাতটি দিয়ে ক্রিশিকে শক্ত করে ধরে রাখি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, তার মাঝে ট্রাকিওশান হাতে রবোটটি আরেকটি শলাকা আমার হাতের তালুতে ঢুকিয়ে দিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি জ্ঞান হারালাম।

রবোটের যে দলটি আমার হাত ফুটো করে শরীরে একটা ট্রাকিওশান ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে পাকাপাকিভাবে বন্দি করে ফেলেছে তার দলপতি হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি, তার কোনো নাম নেই অন্য রবোটরা তাকে একটি সংখ্যা, বাহাত্তর বলে ডাকে, তার কারণটি আমার ঠিক জানা নেই। চকচকে মসৃণ রবোটটির নাম কুরু। দলের তিন নম্বর রবোটটির নাম হি। অন্য তিনটি রবোটের নাম আছে কি নেই আমি জানি না, তাদের সাথে সত্যিকার সংলাপ কখনো করা হয় নি, একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, যেটা আমি কখনো শুনতে পাই না।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবোটের এই দলটি একটি ছোট দস্যুদল। তাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর এ রকম অসংখ্য রবোট সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কিছু কিছু একত্র হয়ে এক ধরনের বিচিত্র জীবন যাপন শুরু করেছে— এই দলটি কোনো এক কারণে দস্যুবৃত্তিকে নিজেদের জীবন হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এই দলটির জীবনের উদ্দেশ্য বিনোদনমূলক সফটওয়ার এবং কম্পিউটার প্রক্রিয়া ছিনিয়ে আনা। পরাবাস্তবতার অসংখ্য সফটওয়ার পৃথিবীর আনাচে কানাচে রয়ে গেছে। এক সময় তাদের বেশিরভাগ মানুষ নানা ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করত। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর তার বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যেগুলো ধ্বংস হয় নি সেগুলো পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছোট বড়, সহজ-জটিল নানা কম্পিউটারে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। গ্রুস্টান আবার সেগুলো একত্র করার চেষ্টা করছে, মানুষ আবার সেগুলো ব্যবহার শুরু করেছে। এই রবোট দলটি সেইসব সফটওয়ারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোনোভাবে সেগুলো কেড়ে আনতে পারে নিজেদের কপোট্রনে পুরে নিয়ে দীর্ঘ সময় উপভোগ করতে থাকে। মানুষ যেরকম করে ভয়ঙ্কর নেশাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর সেটা ছাড়তে পারে না, এটিও অনেকটা সেরকম।

প্রথমবার রবোটগুলো যখন মানুষের লোকালয় আক্রমণ করেছিল আমি ব্যাপারটি বেশ কাছে থেকে দেখেছিলাম। ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে তারা কম্পিউটারের ঘাঁটিতে ঢুকে গিয়েছিল। ভিতরে সবকিছু ভেঙেচুরে ক্রিস্টাল ডিস্কগুলো খুলে বের হয়ে এসেছে। মানুষেরা আতঙ্কে ছুটে পালিয়ে গেছে, কিছু প্রতিরক্ষা রবোট দাঁড়িয়েছিল কিন্তু প্রচণ্ড গুলির সামনে তারা দাঁড়াতে পারে নি। আমি খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখেছি শরীরে ট্রাকিওশান লাগানো বলে বেশি দূরে যেতে পারি না, না চাইলেও কাছাকাছি থাকতে হয়।

রবোটগুলো সফটওয়ার এবং প্রসেসর প্রক্রিয়াগুলো নিজেদের কপোট্রনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেগুলো উপভোগ করতে থাকে। ব্যাপারটি অত্যন্ত বিচিত্র। মানুষ যখন কিছু উপভোগ করে তাদের চেহারায় তার ছাপ পড়ে। রবোটের বেলায় সেটা সত্যি নয়, অত্যন্ত কঠোর মুখ নিয়ে তারা দীর্ঘ সময় মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ তাদের হাত বা পা একটু নড়ে উঠে চোখের ঔজ্জ্বল্য একটু বেড়ে যায় বা কমে আসে, তার বেশি কিছু নয়। বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে এক ধরনের স্থবিরতা বলে মনে হয়, আসলে সেটি তাদের কপোট্রনে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক ট্রিলিয়ন জটিল হিসেব নিকেশের ফল।

ব্যাপারটি একনাগাড়ে কয়েকদিন চলতে থাকে। আমার তখন কিছু করার থাকে না, ট্রাকিওশানের দূরত্বসীমার মাঝে আমি বাঁধা পড়ে থাকি। ক্রিশি আছে বলে আমি বেঁচে আছি। আমার জন্যে সে খাবার এনে দেয়, পানীয় এনে দেয়। যখন আমি গভীর হতাশায় ডুবে যেতে থাকি ক্রিশি সম্পূর্ণ অবান্তর অর্থহীন কথা বলে আমাকে হতাশার অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে আনে। ক্রিশিকে নিয়ে রবোটগুলো কখনো কোনো ধরনের কৌতূহল দেখায় নি, রবোটগুলোর কাছে সে একটা কমিউনিকেশান্স মডিউল বা সৌর ব্যাটারি থেকে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক কিছু ছিল না।

রবোটগুলো আমাকে গ্রুস্টানের কাছে দুষ্প্রাপ্য কিছু সফটওয়ারের বদলে ধরিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে তারা কখনো আমার সাথে সেটা নিয়ে কোনো কথা বলে না। আমি তাদের সাথে আছি, তারা আমাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে, আমি কয়েকবার ভেবেছি আমাকে নিয়ে কী করবে তাদের

AMARBOI.COM

জিজ্ঞেস করি কিন্তু একটা যন্ত্রের সাথে নিজের জীবন নিয়ে কথা বলতে প্রতিবারই আমার কেমন জানি বিতৃষ্ণা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার তারা যখন মানুষের একটা লোকালয় আক্রমণ করল আমি সাথে যেতে চাই নি কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। রবোটগুলো আক্রমণ করল ভরদুপুরে, গুলি করতে করতে তারা গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়, তাদের হাতে কিছু বিস্ফোরক ছিল সেগুলো চারদিকে ছুড়ে দেয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। মানুষেরা চিৎকার করতে করতে ছুটে যেতে থাকে, প্রতিরক্ষা রবোট অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে, মুহূর্তে পুরো এলাকাটি একটা নরকের মতো হয়ে যায়। আমি কাছাকাছি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিস্পৃহভাবে পুরো ব্যাপারটা দেখছিলাম হঠাৎ লাল চুলের কমবয়সী একজন মানুষ আমার কাছে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল, পালাও! পালাও! রবোট এসেছে, রবোট।

আমি অন্যমনস্কভাবে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একবার ইচ্ছে হল তাকে বলি, আমার কোথাও পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই—কিন্তু মানুষটা যেভাবে ছুটে পালাচ্ছে দাঁড়িয়ে আমার কোনো কথা শুনবে বলে মনে হয় না। কাছাকাছি প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হল, শিস দেয়ার মতো শব্দ করে কানের কাছে দিয়ে কয়েকটা গুলি বের হয়ে গেল, আমি অভ্যাসবশত মাথা নিচু করতে গিয়ে থেমে গেলাম। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কী হবে? যদি বিচ্ছিন্ন একটা গুলি এসে আমাকে শেষ করে দেয় হয়তো সেটাই হবে আমার জন্যে ভালো।

আমি প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ দেখি একটু আগে লাল চুলের যে মানুষটি ছুটে গিয়েছিল সে আবার ফিরে এসেছে। গুড়ি মেরে মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি ওই রবোটগুলোর সাথে এসেছ?

আমি মাথা নাড়লাম।

আমি তোমাকে চিনি।

আমি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকালাম। লোকটা আবার বলল, তুমি কুশান। আমি তোমার ছবি দেখেছি।

লোকটা আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দেয়াল থেকে কিছু ভেঙে পড়ল, লোকটা ছিটকে সরে গেল পিছনে। ঠিক তখন আমার ট্রাকিওশানে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি। রবোটগুলো ফিরে যেতে শুরু করেছে। আমাকেও ফিরে যেতে হবে।

আমি ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ফিরে যাচ্ছি হঠাৎ ধ্বংসস্তূপের মাঝে থেকে লাল চুলের সেই মানুষটি আবার মাথা বের করে উচ্চৈঃস্বরে কিছু একটা বলল, পরিষ্কার মনে হল সে বলল, তুমি কি আমাকে তোমার সাথে নেবে? কিন্তু সেটা তো সত্যি হতে পারে না। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নিশ্চয়ই আমার সাথে যেতে চাইবে না! নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনেছি।

রাত্রিবেলা প্রায় শ খানেক কিলোমিটার দূরে মাটিতে জিনন ল্যাম্প লাগিয়ে রবোটগুলো তাদের লুণ্ঠন করে আনা সফটওয়ার নিয়ে বসে। হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি—যাকে অন্য রবোটেরা বাহাত্তর বলে ডাকে, একটা ক্রিস্টাল হাতে নিয়ে বলল, এবারে খুব ভালো ভালো সফটওয়ার পেয়েছি। এই যে দেখ গ্যালাক্সি সাত। রিকিভ ভাষায় লেখা—

আমি গ্যালাক্সি সাত একবার ব্যবহার করেছিলাম, খুব যত্ন করে তৈরি করা। বিশ্বজগতের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। গ্রহ থেকে গ্রহ, নক্ষত্র থেকে

AMARBOI.COM

নক্ষত্র, নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ ব্ল্যাকহোলের আশপাশে ঘুরে বেড়ানোর বাস্তব এক ধরনের অনুভূতি। আমি সচরাচর রবোটগুলোর সাথে কথা বলি না, আজকে কী মনে হল জানি না হঠাৎ বললাম, গ্যালাক্সি সাত চমৎকার সফটওয়ার।

সবগুলো রবোট একসাথে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। বাহাত্তর জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন করে জান?

আমি জানি। আমি এটা ব্যবহার করেছি। এর মাঝে একটা ত্রুটি আছে।

ত্রুটি?

হ্যাঁ। শেষ পর্যায়ে যদি যেতে পার ব্ল্যাকহোলে বিলীন হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে একটা রঙিন টুপি পরা ক্লাউন বের হয়ে আসে।

ক্লাউন?

হ্যাঁ। সেটা খিকখিক করে হাসতে থাকে, তখন যদি তার পিছু পিছু যাও সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। একটু অপেক্ষা করলে ক্লাউন অদৃশ্য হয়ে আবার ব্ল্যাকহোল ফিরে আসে।

অত্যন্ত বিচিত্র এবং অর্থহীন। কুরু মাথা নেড়ে বলল, ব্ল্যাকহোলের সাথে ক্লাউনের কোনো সম্পর্ক নেই।

অন্য রবোটগুলো কুরুর সাথে সাথে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, অর্থহীন। একেবারেই অর্থহীন।

বাহাত্তর আরেকটা ক্রিস্টাল হাতে নিয়ে বলল, এই যে, আরেকটা নবম মাত্রার সফটওয়ার। এর নাম পঙ্কিল কুসুম।

পঙ্কিল কুসুম! আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমরা পঙ্কিল কুসুম পেয়েছ?

কেন, কী হয়েছে?

এটা দীর্ঘদিন বেআইনি ছিল। গ্রুস্টাস কিছুদিন আগে মানুষকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

এটা কী রকম?

খুব যত্ন করে তৈরি করা সফটওয়ার। কিন্তু তোমরা ব্যবহার করতে পারবে না।

বাহাত্তর হঠাৎ তার ভীষণদর্শন অস্ত্রটি আমার দিকে তাক করে বলল, আমাদের বুদ্ধিমত্তার ওপর কটাক্ষ করে আর একটা কথা বললে তোমার ঘিলু বের করে দেব।

রবোটটির কথা আমার কাছে কেন জানি ফাঁপা বুলির মতো মনে হয়। আমি মাটিতে থুতু ফেলে বললাম, আমাকে মেরে ফেলার হলে অনেক আগেই মারতে। খামাখা ভয় দেখিও না। তোমার ওই অস্ত্রকে আমি ভয় পাই না।

বাহাত্তর স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার দৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বললাম, পঙ্কিল কুসুম একটি জৈবিক সফটওয়ার। ভালবাসার কারণে পুরুষ আর রমণীর ভিতরে যেসব জৈবিক প্রক্রিয়া হয় এটি সেটার ওপরে তৈরী। তোমরা নিম্ন শ্রেণীর রবোট। তোমাদের মাঝে ভালবাসা নেই জৈবিক অনুভূতিও নেই। তোমরা এটা বুঝবে না।

রবোটগুলো কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার একটা ছোট সম্ভাবনা রয়েছে, আমি তার জন্যে মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম, কিন্তু রবোটগুলো আমাকে মারল না। মরে যাওয়া নিয়ে আজীবন আমার ভিতরে যে এক ধরনের আতঙ্ক ছিল ইদানীং সেটি আর নেই।

আমি যেভাবে বেঁচে আছি তার সাথে মরে যাওয়ার খুব বেশি পার্থক্য নেই।

AMARBOI.COM

৫

দুদিন পর আমি একটি বিধ্বস্ত ঘরে জঞ্জালের মাঝে বসে ছিলাম। আমার পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আমার শরীর নোংরা, হাতে যেখানে ফুটো করে ট্রাকিওশান ঢুকিয়েছে সেখানে বিষাক্ত দগদগে ঘা। কয়েকদিন থেকে অত্যন্ত বিস্বাদ কিছু খাবার খেয়ে আছি, কেন জানি সেই খাবারের ওপর থেকে রুচি পুরোপুরি উঠে গেছে। কোনো একটি বিচিত্র কারণে হঠাৎ করে খুব গরম পড়েছে, বাতাসে জলীয় বাষ্প বলতে গেলে নেই, শুকনো ধুলা হু-হু করে বইছে। চারদিকে এক ধরনের পোড়া গন্ধ, কোনো এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে আশপাশে, আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্রিশি আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে বললাম, আর তো পারি না ক্রিশি। বড় কষ্ট!

ক্রিশি শান্ত গলায় বলল, মহামান্য কুশান, আমার ধারণা আপনার এই কষ্ট সহ্য করার পিছনে কোনো যুক্তি নেই।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি আমাকে কী করতে বল?

আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য দুই। এই অবস্থায় আত্মহত্যা করা খুব যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার হবে।

আত্মহত্যা! আমি চমকে উঠে ক্রিশির দিকে তাকালাম, কী বলছ তুমি?

আমি ঠিকই বলছি। ক্রিশি শান্ত গলায় বলল, আমি আপনাকে ধারালো একটা ছোরা এনে দিতে পারি। কব্জির কাছে একটা ধমনী কেটে দিলে রক্তক্ষরণে অল্প সময়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। আপনার সমস্ত সমস্যার সেটি হবে সবচেয়ে সহজ সমাধান।

আমি বিস্ফারিত চোখে ক্রিশির দিকে তাকিয়ে রইলাম, নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হয় না যে আমার একমাত্র কথা বলার সঙ্গী একটি নিম্নশ্রেণীর রবোট আমাকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেবে। আমি খুব সঙ্গত কারণেই ক্রিশির কথাটি উড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু সারাদিন ঘুরেফিরে আমার কথাটি মনে হতে লাগল। আমি যতবারই কথাটি ভাবছিলাম প্রত্যেকবারই সেটাকে খুব যুক্তিসঙ্গত একটা সমাধান বলে মনে হতে লাগল। সন্ধেবেলা সত্যি সত্যি আমি আত্মহত্যা করব বলে ঠিক করলাম এবং এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে এই প্রথমবার আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের শান্তি অনুভব করতে থাকি। পৃথিবীর এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসস্তূপ, রবোটদের নৃশংস অত্যাচার, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শরীরের যন্ত্রণা— সবকিছু থেকে আমি মুক্তি পাব! আর আমাকে পশুর মতো বেঁচে থাকতে হবে না। ভয় আতঙ্ক আর হতাশায় ডুবে যেতে হবে না। আমার জীবন কেমন হবে আমি নিজে সেটা ঠিক করব।

আমি নিজের ভিতরে এত বিস্ময়কর একটা শান্তি অনুভব করতে থাকি যে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। অনেকদিন পর আমি প্রথমবার অনেক যত্ন করে নিজেকে পরিষ্কার করে নিই। বেছে বেছে সুস্বাদু একটা খাবার বের করে প্লেটে সাজিয়ে পানীয়ের গ্লাসে লাল রঙের খানিকটা পানীয় ঢেলে সত্যিকারের খাবারের মতো ধীরে ধীরে খেয়ে উঠি।

রাত গভীর হলে আমি আমার ব্যাগটায় মাথা রেখে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে হতে থাকে লক্ষ কোটি যোজন দূরে থেকে নক্ষত্রগুলো বুঝি গভীর ভালবাসা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চারপাশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীর একটি বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংসস্তূপ, কিন্তু এখন কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

গভীর রাতে হঠাৎ রবোটগুলো একটি মানুষের লোকালয় আক্রমণ করতে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। গত কয়েক দিন থেকে তারা একটু বিচিত্র ব্যবহার করছিল এবং তাদের ভাবভঙ্গি দেখে আমি বুঝতে পারি এবারে তারা বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের লোকালয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটি কী আমি বুঝতে পারলাম না। রওনা দেবার আগে হঠাৎ করে বাহাত্তর আমার কাছে এসে বলল, তোমাকে এবার আমাদের সাথে যেতে হবে না। মানুষ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা বাড়িয়ে দিচ্ছে, তোমার ক্ষতি হতে পারে।

কিন্তু ট্রাকিওশান? আমি ট্রাকিওশানের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না।

কয়েক ঘণ্টার জন্যে ট্রাকিওশানের নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছি, আশা করছি নিজের স্বার্থেই কোনো ধরনের অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা করবে না।

আমি কোনো কথা বললাম না, কোনোকিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না।

জীবনের শেষ মুহূর্তে নির্বোধ কিছু রবোটের পিছু পিছু একটি দস্যুবৃত্তিতে সহযোগিতা করতে হবে না জেনে কেমন জানি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ অনুভব করতে থাকি। তারা কখন ফিরে আসবে জানি না—কিন্তু আর আমার এদের মুখোমুখি হতে হবে না। এরা ফিরে আসার আগে আমি আমার জীবনটিকে শেষ করে দেব।

রবোটগুলো চলে যাবার পর আমি বহুদিন পর এক ধরনের অপূর্ব শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি একটি নীল হ্রদের। বিশাল হ্রদ তার মাঝে আশ্চর্য নীল পানি টলটল করছে। হ্রদের মাঝখানে একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে সবুজ গাছ। সত্যিকারের গাছ। সেই গাছে সত্যিকার পাতা। গাছের ডালে বসে আছে লাল ঠোঁটের অপূর্ব একঝাঁক পাখি। আমি একবার হাত তুলতেই সেই একঝাঁক পাখি গাছ থেকে উড়ে গেল আকাশে। আকাশে সাদা মেঘ, তার মাঝে পাখি উড়ছে। উড়তে উড়তে গান গাইছে পাখি। কী অপূর্ব সেই গান!

খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে হালকা আলো চারদিকে। এই সময়টার নিশ্চয়ই একটা জাদু রয়েছে। কুৎসিত ধ্বংসস্তূপটিও এখন কেমন জানি মায়াময় মনে হচ্ছে। আমি উঠে বসি। রবোটগুলো কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে আসবে। আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। আমি কোমল স্বরে ডাকলাম, ক্রিশি—

ক্রিশি এগিয়ে এল, বলুন মহামান্য কুশান।

আমার মনে হয় আত্মহত্যা করার জন্য এটাই ঠিক সময়।

আমারও তাই ধারণা। রবোটগুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে পৌঁছে যাবে। মেয়েটিকে নিয়ে একটু যন্ত্রণা হচ্ছে, না হয় আরো আগে ফিরে আসত।

মেয়েটি? আমি অবাক হয়ে বললাম, কোন মেয়েটি?

রবোটগুলো একটা মেয়েকে ধরে আনতে গিয়েছিল মহামান্য কুশান। তারা বিনোদনের যে সফটওয়ার পেয়েছে সেখানে পুরুষ ও রমণীর মাঝে জৈবিক সম্ভোগের ব্যাপার রয়েছে। রবোটগুলো সেটা একটা মেয়ের উপরে পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

আমি বিস্ফারিত চোখে ক্রিশির দিকে তাকালাম, কী বলছ তুমি?

আমি সত্যি কথা বলছি। তারা নিজেদের কপোট্রনে খানিকটা পরিবর্তন করেছে। আমার মনে হয় এখন তাদের ভিতরে নিম্ন শ্রেণীর যৌনচেতনা আছে। ব্যাপারটি কী সে সম্পর্কে আমার অবশ্যি কোনো ধারণা নেই।

আমি বুঝতে পারছি আমার ভিতরে যে কোমল শান্ত একটা ভাব এসেছিল সেটা দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে সেখানে প্রচণ্ড একটা ক্রোধের জন্ম নিচ্ছে। ধারালো চাকুটা হাতে নিয়ে আমি

বসে রইলাম, হাতের ধমনীটি কেটে দেয়ার সহজ কাজটি করতে গিয়েও আমি করতে পারলাম না। মৃত্যুর আগে দুর্ভাগা মেয়েটির সাথে মনে হয় আমার অন্তত একবার কথা বলা দরকার।

বাহাত্তরের দলটি যখন পৌঁছেছে তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। যে মেয়েটিকে তারা ধরে এনেছে সে অল্পবয়সী। তাকে আমি যেরকম আতঙ্কগ্রস্ত দেখব বলে ভেবেছিলাম সেরকম দেখলাম না, মনে হল কেমন যেন হতচকিত হয়ে আছে। আমাকে দেখে সে একরকম ছুটে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কুশান?

আমি মেয়েটিকে ভালো করে লক্ষ করলাম, তার মাথায় ঘন কালো চুল এবং চোখ দুটিও আশ্চর্য রকম কালো। তার শরীরটি অসম্ভব কোমল, আমি এর আগে এত লাবণ্যময় কোনো মেয়ে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেয়েটির গলায় রঙিন পাথরের একটি মালা। কাপড়ের সাথে এই রঙিন মালাটিতে তাকে একটি প্রাচীন তৈলচিত্রের চরিত্র বলে মনে হতে থাকে।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কুশান?

আমি তার গলায় এক ধরনের উত্তাপ অনুভব করি। মেয়েটি কেন আমার ওপর রাগ করছে আমি তখনো বুঝতে পারি নি। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি কুশান।

তুমি কেন এভাবে আমাকে ধরে এনেছ?

মেয়েটির কথা শুনে আমি একেবারে হতচকিত হয়ে গেলাম। সে সত্যিই ভাবছে আমি রবোটগুলোকে পাঠিয়ে তাকে ধরে এনেছি? সেটা সত্যি সম্ভব? আমি অবাক হয়ে ক্রিশির দিকে তাকাতেই ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, লোকালয়ের মানুষেরা বিশ্বাস করে আপনি গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। রবোটগুলো আপনার অনুগত। আপনার আদেশে তারা কম্পিউটার ঘাঁটি ধ্বংস করছে গ্রুস্টানের ক্ষমতা কমানোর জন্যে। অনেক মানুষ সে জন্যে আপনাকে শ্রদ্ধা করে—

আমি ধড়মড় করে উঠে বসি, কী বলছ তুমি?

ক্রিশি মাথা নাড়ল, আমি সত্যি কথা বলছি।

মানুষের বসতিতে আপনার সম্পর্কে অনেক রকম গল্প প্রচলিত আছে। আমি কমিউনিকেশান মডিউলে শুনেছি।

মেয়েটি খুব কৌতূহল নিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আমি দেখতে পাই তার মুখে ক্রোধের চিহ্নটি সরে গিয়ে সেখানে চাপা বিস্ময় এবং এক ধরনের আতঙ্ক এসে উঁকি দিতে শুরু করেছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এই রবোটদের নেতা নও?

আমি মাথা নাড়লাম, না।

তাহলে?

আমি এদের বন্দি। আমাকে গ্রুস্টানের কাছে ফেরত দেবার জন্যে এরা আমাকে ধরে রেখেছে।

মেয়েটি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি দেখতে পাই ধীরে ধীরে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। সে কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, অসম্ভব, এটি হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।

আমার মেয়েটির জন্যে এক ধরনের কষ্ট হতে থাকে—হঠাৎ করে নিজেকে এক ধরনের অপরাধী মনে হয় ঠিক কী জন্যে নিজেই বুঝতে পারি না।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি হঠাৎ হাঁটু ভেঙে বসে, তারপর এক ধরনের ভাঙা গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বলল, এরা তাহলে আমাকে ধরে এনেছে কেন? কেন?

আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না, মেয়েটার চোখের দিকেও তাকাতে পারলাম না, দৃষ্টি সরিয়ে আমি মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর দিল ক্রিশি। নিচু গলায় বলল, রবোটগুলো আপনাকে জৈবিক সম্ভোগে ব্যবহার করার জন্যে এনেছে—

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ক্রিশি কী বলছে ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হয় না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, কী বলছ তুমি?

আমি সত্যি কথাই বলছি। ব্যাপারটি কী সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। রবোটগুলো তাদের কপোট্রনে কী একটা পরিবর্তন করেছে।

মেয়েটি হঠাৎ এগিয়ে এসে খপ করে আমার দুই হাত ধরে ফেলল, তারপর ব্যাকুল হয়ে বলল, এই রবোট ভুল বলেছে, বলছে না?

আমার নিজেকে একটি অমানুষের মতো মনে হল। কিন্তু কিছু করার নেই, মাথা নেড়ে বললাম, না।

কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল, তুমি আমাকে রক্ষা করবে, করবে না?

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম, কী আশ্চর্য রকম সরল মেয়েটির জগৎ! কী ভয়ঙ্কর নিষ্পাপ। শুধু তাই নয় হঠাৎ করে বুঝতে পারি মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তার কোমল ত্বক, কালো রেশমের মতো চুল, চোখের ভিতর এক ধরনের বিচিত্র ব্যাকুলতা। লাল ঠোঁট, ঠোঁটের আড়ালে তার কী অপূর্ব স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো দাঁত। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অসহায় বোধ করতে থাকি। যে ভয়ঙ্কর রবোটের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি আত্মহত্যা করার প্রস্তুতি নিয়েছি সেই রবোটের হাত থেকে তাকে আমি রক্ষা করব? সেটা কি সম্ভব?

AMARBOI.COM

মেয়েটা আমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে ছিল, আবার ভাঙা গলায় বলল, তুমি আমাকে রক্ষা করবে, করবে না?

আমি গভীর বেদনায় মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ আমার কী হল জানি না, আমি তার রেশমের মতো কোমল চুলে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললাম, অবশ্যি আমি তোমাকে রক্ষা করব। অবশ্যি—

আমার নাম টিয়ারা।

অবশ্যি আমি তোমাকে রক্ষা করব টিয়ারা।

মেয়েটি হঠাৎ একটা ছোট শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

৬

রবোটগুলো আমাদের পুরোপুরি উপেক্ষা করে নিজেদের মাঝে ব্যস্ত ছিল। আমাকে বন্দি করার সময় যেভাবে আমার শরীরে ট্রাকিওশান প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল টিয়ারার বেলাতে তাও করল না। ছোট একটা ট্রাকিওশান তার হাঁটুতে বেঁধে দিয়েছে, চেষ্টা করলে সেটা খুলে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু রবোটগুলো সম্ভবত জানে টিয়ারা কখনোই এই

ট্রাকিওশান খুলে পালিয়ে যেতে পারবে না। টিয়ারা যখন আমার সাথে কথা বলছে আমি তাকিয়ে দেখতে পাই রবোটগুলো মিলে তাদের একজনের কপোট্রন খুলে সেখানে ঝুঁকে পড়েছে। ক্রিশির কথা সত্যি, তারা নিজেদের কপোট্রনে কিছু একটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে রবোটের দলটির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাহাত্তর মাথা তুলে বলল, তুমি কিছু বলতে চাও?

হ্যাঁ। তোমরা টিয়ারাকে কেন ধরে এনেছ?

তোমার পঙ্কিল কুসুম সফটওয়ারটির কথা মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ মনে আছে।

তুমি সেটা নিয়ে যে কথাটি বলেছিলে সেটি সত্যি। এই সফটওয়ারটি উপভোগ করার জন্যে জৈবিক অনুভূতি থাকতে হয়। আমরা আমাদের কপোট্রন পরিবর্তন করে জৈবিক অনুভূতি তৈরি করেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। আমাদের অসাধ্য কিছু নয়। আমাদের মাঝে মানুষের সীমাবদ্ধতা নেই। আমরা এখন পঙ্কিল কুসুম উপভোগ করতে পারব। সেখানে আমাদের যেসব তথ্য শেখানো হবে আমরা সেগুলো টিয়ারার উপরে পরীক্ষা করে দেখব।

ও।

কুরু জিজ্ঞেস করল, আমরা চেষ্টা করেছি সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে আনতে। তোমার কী মনে হয়, টিয়ারা সুন্দরী?

হ্যাঁ, সুন্দরী।

তার দেহ? জৈবিক অনুভূতিতে দেহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার দেহের গঠন কি ভালো?

তার দেহের গঠন ভালো।

তার দেহের গঠন ভালো করে দেখার জন্যে তাকে কি অনাবৃত করার প্রয়োজন আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, না নেই।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কুরু আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আর কিছু বলতে চাও?

না। আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমি ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, তোমরা কি পঙ্কিল কুসুমটি উপভোগ করেছ?

খানিকটা দেখেছি কিন্তু জৈবিক অনুভূতি নেই বলে উপভোগ করতে পারি নি।

সফটওয়ারের ত্রুটিটি কি চোখে পড়েছে?

কী ত্রুটি?

তোমরা নিশ্চয়ই দেখবে। এই সফটওয়ারেরও একটা বড় ত্রুটি রয়েছে। হঠাৎ করে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য হাজির হয়।

কী দৃশ্য?

তোমরা নিজেরাই দেখবে।

বাহাত্তর হঠাৎ কঠিন গলায় বলল, আমি জানতে চাই দৃশ্যটিতে কী আছে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, হঠাৎ করে দেখা যায় একটা প্রাণী— তার মুখ সাদা রঙের, একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাতে হাজির হয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। খুব আতঙ্ক হয় তখন।

AMARBOI.COM

বাহাত্তর হা হা করে হেসে বলল, তোমরা মানুষেরা কাপুরুষ। খুব অল্পতে তোমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাও।

যেখানে আতঙ্কিত হওয়ার কথা সেখানে আতঙ্কিত হওয়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয়। আমি সে কারণে পঙ্কিল কুসুম দেখতে পারি না, কখন হবে জানা নেই বলে সর্বক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে থাকি।

কুরু মাথা নেড়ে বলল, কাল্পনিক দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো অর্থ নেই।

দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তব। প্রাণীটি মানুষের মতো, শুধু মুখটি কাগজের মতো সাদা। কখনো খালি হাতে আসে, কখনো অস্ত্র হাতে আসে। কখনো কখনো চারপাশে গুলি করে আবার কখনো সোজাসুজি মাথায় গুলি করে। অসম্ভব আতঙ্ক হয় তখন কিন্তু গুলি করার পর আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। সবচেয়ে জমকালো অংশটি শুরু হয় তখন।

বাহাত্তর মাথা নেড়ে বলল, তোমরা মানুষেরা খুব অল্পে কাতর হয়ে যাও। গ্যালাক্সি সাত সফটওয়ারে ব্ল্যাকহোলে যখন ডুবে যাচ্ছিলাম তখন ক্লাউনের মাথাটি এমন কিছু খারাপ ব্যাপার ছিল না। সেটা অত্যন্ত হাস্যকর ছিল।

আমি তোমাদের আগে থেকে বলে রেখেছিলাম। তোমরা যদি না জানতে আমি নিশ্চিত তোমরা অত্যন্ত চমকে উঠতে। আমার মনে হয় পঙ্কিল কুসুমেও সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখে তোমরা আর ভয় পাবে না। যখন দৃশ্যটি হাজির হবে তোমরা সেটি শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বাহাত্তর তার ফটোসেলের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, সফটওয়ারের ত্রুটিগুলোর কথা আমাদের আগে থেকে বলে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তোমাকে সে জন্যে আমরা কি কোনোভাবে পুরস্কৃত করতে পারি?

হ্যাঁ।

কীভাবে?

আমাকে চলে যেতে দাও।

AMARBOI.COM

না, বাহাত্তর মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে আমরা চলে যেতে দিতে পারি না। তোমাকে আমরা প্রথম যখন পেয়েছিলাম তখন তোমার মূল্য খুব বেশি ছিল না। নানা কারণে গ্রুস্টান মনে করে তুমি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ, এখন তোমার মূল্য অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমাকে ফেরত দিয়ে আমরা হয়তো নবম মাত্রার পরাবাস্তব কিছু সফটওয়ার পেতে পারি। তোমাকে আমরা ছাড়ব না, কিন্তু অন্য কোনোভাবে পুরস্কৃত করতে পারি।

কীভাবে?

তোমার জন্যে একটি সুন্দরী নারী ধরে আনতে পারি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি যখন হেঁটে চলে আসছি তখন শুনতে পেলাম কুরু বাহাত্তরকে বলছে, মানুষ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগে পরিচালিত প্রাণী। এটি বিচিত্র কোনো ব্যাপার নয় যে তারা তাদের সভ্যতাকে এভাবে ধ্বংস করেছে।

আমি যখন রবোটগুলোর সাথে কথা বলছিলাম তখন ক্রিশি টিয়ারার কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে ফিরে আসতে দেখে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি মহামান্য টিয়ারার সাথে কথা বলছিলাম। তিনি আপনার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন আপনি সত্যিই তাকে রক্ষা করবেন।

মানুষের সবসময়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়।

কিন্তু এই বিশ্বাসটি অযৌক্তিক। এর সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য সাত। আমি কি মহামান্য টিয়ারাকে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার কথা বলব?

তার প্রয়োজন নেই। আমি আর ক্রিশি কথা বলতে বলতে অনেক দূর হেঁটে চলে এসেছি। আমি রবোটগুলোর দিকে পিছন দিয়ে ক্রিশিকে নিচু গলায় বললাম, তুমি কি আমাকে খানিকটা সাদা রং যোগাড় করে দিতে পারবে?

সাদা রং?

হ্যাঁ, ধবধবে সাদা।

অবশ্যি পারব মহামান্য কুশান। আমি কিছু জিংক দেখেছি সেটাকে পুড়িয়ে জিংক অক্সাইড তৈরি করে নেব।

সাদা রংটি দিয়ে আমি কী করব ক্রিশি জানতে চাইল না। এ কারণে সঙ্গী হিসেবে আমি নিম্ন শ্রেণীর রবোটকে পছন্দ করি। তারা কখনোই অকারণে কৌতূহল দেখায় না।

বিকেলবেলায় রবোটগুলো তাদের কপোট্রনে পঙ্কিল কুসুম সফটওয়ারটি ব্যবহার করতে শুরু করল। আমি দেখতে পেলাম প্রথম দিকে তাদের খানিকটা অসুবিধে হচ্ছিল, কয়েকবার তাদের কপোট্রনের যোগাযোগ বন্ধ করে আবার নূতন করে শুরু করতে হল। কয়েকটি রবোটের কপোট্রন খুলে ফেলে ভিতরে কিছু একটা করা হল, এবং শেষ পর্যন্ত একজন একজন করে সবাই পঙ্কিল কুসুম সফটওয়ারটিতে নিমগ্ন হয়ে গেল। তাদের দেহ নিস্পন্দ হয়ে আসে, বুকের ভিতর ক্রায়োজেনিক পাম্প গুঞ্জন করে তাদের কপোট্রন শীতল করতে শুরু করে। রবোটগুলোকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই কিন্তু তাদের কপোট্রনে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক ট্রিলিয়ন নানা আকারের তথ্যের আদান প্রদান শুরু হয়ে গেছে।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবোটগুলোকে দেখতে থাকি। সফটওয়ারটিতে আরো গভীরভাবে নিমজ্জিত হওয়ার জন্যে রবোটগুলোকে আমার আরো খানিকক্ষণ সময় দেয়া দরকার। টিয়ারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে খানিকক্ষণ রবোটগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, কী ভয়ানক দেখতে রবোটগুলো!

হ্যাঁ। আমি মাথা নাড়ি, অনেক ভয়ানক।

টিয়ারা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মানুষের লোকালয়ে তোমার সম্পর্কে অনেক রকম গল্প প্রচলিত আছে।

আমি টিয়ারার দিকে তাকালাম। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি কী গল্প, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম না। একটু হেসে বললাম, মনে হচ্ছে তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জান! আশা করছি সব বিশ্বাস কর নি। আমি অবশ্যি তোমার নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আমি একটা সাধারণ মেয়ে, আমার সম্পর্কে জানার বিশেষ কিছু নেই।

শুনে খুব খুশি হলাম, অসাধারণ মানুষে আমার কোনো কৌতূহল নেই।

কেন?

তাদের সম্পর্কে অনেক রকম বানানো গল্প বলে বেড়ানো হয়!

টিয়ারা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী কর টিয়ারা?

আমি? টিয়ারা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি কিছু করি না। আমার খুব ইচ্ছে করে—খুব ইচ্ছে করে—

কী ইচ্ছে করে?

আমার খুব ইচ্ছে করে একটি শিশুকে পেতে। আমি তাহলে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে রাখতাম, রাত্রিবেলা তাকে গান শুনাতাম—

তুমি কি গ্রুস্টানের কাছে আবেদন করেছ?

করেছি। গ্রুস্টান বলেছে আগে আমাকে একজন মানুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে হবে।

তুমি কি সঙ্গী বেছে নিয়েছ?

টিয়ারা আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এখনো বেছে নিই নি কিন্তু কাকে নেব ঠিক করেছি।

তাকে তুমি ভালবাস?

টিয়ারা নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, না।

তাহলে কেন তাকে বেছে নিলে?

সে গ্রুস্টানের প্রিয় মানুষ। সে বলেছে আমাকে একটা শিশু এনে দেবে।

টিয়ারা ঘুরে আমার দিকে তাকাল, তার চোখে পানি টলটল করছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, আমি জানি না কেন আমি তোমাকে এসব বলছি।

আমি জানি।

কেন?

দুঃখের কথা কাউকে বলতে হয়। সবচেয়ে ভালো হয় অপরিচিত কাউকে বললে, যার সাথে হঠাৎ দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ পর যে হারিয়ে যাবে আর কোনোদিন দেখা হবে না। আমি আমার দুঃখের কথা কাকে বলি জান?

কাকে?

ক্রিশিকে। সে খুব ভালো শ্রোতা।

টিয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, তাকে এই প্রথম আমি হাসতে দেখলাম। হাসলে তাকে এত সুন্দর দেখায় কে জানত। আমি হঠাৎ বুকের মাঝে এক ধরনের কষ্ট অনুভব করি।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, এ রকম হওয়ার কথা ছিল না।

কী রকম?

একটি মানুষকে একটা শিশুর জন্যে যন্ত্রের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়।

টিয়ারা হঠাৎ ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, তাহলে কেমন করে সে শিশু পাবে?

যেরকম করে শিশু পাওয়ার কথা। ভালবাসা দিয়ে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একজন আরেকজনকে ভালবাসবে—সেখান থেকে জন্ম নেবে সন্তান।

কী বলছ তুমি? পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে, তেজস্ক্রিয়তায় মানুষের শরীর বিষাক্ত হয়ে আছে। শিশুর জন্ম দিলে সেই শিশু হবে বিকলাঙ্গ—

মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা। সব গ্রুস্টানের মিথ্যা কথা।

টিয়ারা আমার দিকে কেমন বিচিত্র এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি আবার রবোটগুলোর দিকে তাকালাম, অনেকক্ষণ থেকে সেগুলো স্থির হয়ে আছে, মনে হয় পঙ্কিল কুসুমের জৈবিক আলোড়ন তাদের কপোট্রনকে হতচকিত করে রেখেছে।

আমি পকেট থেকে জিংক অক্সাইডের একটা ছোট কৌটা বের করে সেখান থেকে সাদা রং বের করে আমার মুখে লাগাতে থাকি। টিয়ারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী করছ তুমি?

AMARBOI.COM

আমি মুখে রং লাগাতে লাগাতে বললাম, ব্যাপারটা এত অযৌক্তিক যে ব্যাখ্যা করার মতো নয়। করলেও তুমি বুঝবে বলে মনে হয় না। কাজেই তুমি জিজ্ঞেস কোরো না।

মুখে রং লাগিয়ে তুমি কী করবে?

আমি সোজা রবোটগুলোর কাছে হেঁটে যাব। তারপর মাটিতে রাখা অস্ত্রটি তুলে ওদের কপোট্রন উড়িয়ে দেব।

তুমি—তুমি—টিয়ারা ঠিক বুঝতে পারে না আমি কী বলছি। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, তুমি ওদের কপোট্রনে গুলি করবে?

হ্যাঁ।

তারা তোমাকে গুলি করতে দেবে কেন?

দেবার কথা নয়। কিন্তু একটা ছোট সম্ভাবনা রয়েছে যে আমাকে গুলি করতে দেবে।

কিন্তু কেন?

কারণ আমার মুখে সাদা রং।

টিয়ারা কিছু বুঝতে না পেরে বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি তার নরম চুল স্পর্শ করে বললাম, আমি যাই টিয়ারা। তোমার সাথে আবার দেখা হবে কি না আমি জানি না। যদি না হয়, তুমি—

আমি?

তুমি ক্রিশির সাথে কথা বোলো। তার কথা শুনো, মনে হয় সেটাই তোমার জন্যে সবচেয়ে ভালো।

আমি দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে টিয়ারার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তারপর লম্বা পা ফেলে রবোটগুলোর দিকে হেঁটে যেতে থাকি।

রবোটগুলো আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে কারণ আমি দেখলাম তারা তাদের ফটোসেলের চোখ দিয়ে আমাকে অনুসরণ করছে। অন্য সময় হলে আমাকে চিনতে কোনো অসুবিধে হত না কিন্তু এখন মূল কপোট্রন সফটওয়ারটি নিয়ে ব্যস্ত, হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না। আমি তাদেরকে আরো বিভ্রান্ত করে দেবার জন্যে সম্পূর্ণ অকারণে দুই হাত উপরে তুলে উল্টো দিকে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। পঙ্কিল কুসুমের ত্রুটিটিতে যে প্রাণীটির কথা বলেছি সেটা একটু অস্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়! আমি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ধীর পায়ে বাহাত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। আমার হৃৎপিণ্ড ধকধক করে শব্দ করতে থাকে, সত্যিই কি রবোটগুলো আমাকে সফটওয়ারের একটা ত্রুটি হিসেবে ধরে নেবে? এই অত্যন্ত সহজ ফাঁদটিতে কি পা দেবে এই রবোটগুলো?

আমার চিন্তা করার সময় নেই, কী হবে আমি জানি না। সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আমি রবোটটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। রবোটটি একটুও নড়ল না, আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি তার সামনে গিয়ে পাশে রাখা অস্ত্রটি তুলে নিলাম, রবোটটি বাধা দিল না। আমি দুই পা পিছনে সরে এসে অস্ত্রটি রবোটটার কপোট্রনের দিকে লক্ষ করে হঠাৎ প্রাণপণে ট্রিগার টেনে ধরি। বাহাত্তরের কপোট্রন চূর্ণ হয়ে উড়ে যায় মুহূর্তে। ট্রিগার টেনে ধরে রেখেই আমি ক্ষিপ্র হাতে অস্ত্রটি ঘুরিয়ে নেই অন্য রবোটগুলোর দিকে, মুহূর্তে আমার চারপাশে ছয়টি রোবটের শবদেহ পড়ে থাকে। কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে তাদের মাথা থেকে।

আমি তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে সত্যিই রবোটগুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছি। একটি নয় দুটি নয় ছয় ছয়টি ভয়ঙ্কর নৃশংস রবোট আমার পায়ের কাছে

পড়ে আছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি আর নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, সেখানে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম। আমার সমস্ত শরীর ঘামছে কুলকুল করে, হাত কাঁপছে, কিছুতেই থামাতে পারছি না। হঠাৎ করে আমার সমস্ত শরীর কেমন যেন গুলিয়ে আসে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিতেই আমার হাতে সাদা রং উঠে এল। কী আশ্চর্য! সত্যিই? তাহলে আমি টিয়ারাকে রক্ষা করে ফেলেছি—ঠিক যেরকম তাকে কথা দিয়েছিলাম!

টিয়ারা হেঁটে হেঁটে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তখনো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, রবোটগুলো নিজেদের যত বুদ্ধিমান ভেবেছিল আসলে তত বুদ্ধিমান নয়! কী বল?

তুমি—তুমি—তুমি কেমন করে করলে?

জানি না! কখনো ভাবি নি ফন্দিটা কাজ করবে। হয়তো সত্যিই ভাগ্য বলে কিছু আছে।

ঠিক তখন ক্রিশি হেঁটে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্রিশি! তুমি বলেছিলে আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শতকরা দশমিক শূন্য শূন্য সাত। এখন কী বলবে?

আমার হিসেবে তাই ছিল।

তোমার হিসেব খুব ভালো বলা যায় না!

আমার হিসেব সাধারণত যথেষ্ট ভালো। কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে মানুষ হঠাৎ করে বিচিত্র যেসব সমাধান বের করে ফেলে আমার সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

থাকার কথা না! আমার নিজেরও নেই। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ক্রিশি এখন তোমার কয়েকটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

প্রথমত আমার আর টিয়ারার ট্রাকিওশান দুটি খুলে বা বের করে আন। তারপর খুঁজে খুঁজে খানিকটা ওষুধ বের করে আন যেন আমার হাতের এই বিচ্ছিরি ঘা-টা শুকানো যায়। সবশেষে সারা দুনিয়া খুঁজে যেখান থেকে পার চমৎকার কিছু খাবার আর পানীয় নিয়ে এস—আজ আমি টিয়ারার সম্মানে একটা ভোজ দিতে চাই।

আমার সম্মানে? টিয়ারা হেসে বলল, কেন?

কারণ আজ ভোরে আমার আত্মহত্যা করার কথা ছিল। তুমি এসেছিলে বলে করা হয় নি! আক্ষরিক অর্থে তুমি আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ।

টিয়ারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তার সেই দৃষ্টিতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর সবকিছু কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যায়।

৭

সন্ধেবেলা একটা ছোট আগুন জ্বালিয়ে আমি আর টিয়ারা বসে আছি। ক্রিশি বসেছে আগুনের অন্য পাশে। সে যদি মানুষ হত তার মুখে একটা বিরক্তির ছায়া থাকত কোনো সন্দেহ নেই। হাতের কাছে একটা জিনন ল্যাম্প থাকার পরেও আগুন জ্বালানোর সে ঘোরতর বিরোধী। আমি আগুনে একটা দ্বিতীয় মাত্রার বিস্ফোরক ছুড়ে দিতেই একটা ছোট বিস্ফোরণ করে

AMARBOI.COM

আগুনটা লাফিয়ে অনেকদূর উঠে গেল। ক্রিশি বিড়বিড় করে বলল, সম্পূর্ণ অর্থহীন একটি বিপজ্জনক কাজ।

আমি হাসি চেপে বললাম, আগুনকে গালি দিও না ক্রিশি। আগুন থেকে সভ্যতার শুরু।

তুমি যেটা করছ সেটা আগুন নয়, সেটা বিস্ফোরণ। আগুনকে চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বিস্ফোরণকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। বিস্ফোরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমি আরেকটি ছোট বিস্ফোরক আগুনে ছুড়ে দিয়ে হেসে বললাম, কী করব আমি, আজকে শুধু বিপজ্জনক কাজ করার ইচ্ছে করছে।

টিয়ারা নরম গলায় বলল, তুমি আজ সকালে যে কাজটি করেছ তার তুলনায় যে কোনো কাজকে ছেলেখেলা বলা যায়।

আমি ক্রিশিকে বললাম, এই দেখ, টিয়ারাও বলছে এটা ছেলেখেলা।

ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, মানুষ একটি দুর্বোধ্য প্রাণী।

খাঁটি কথা, আমি হাসতে হাসতে বলি, একেবারে খাঁটি কথা।

টিয়ারা খানিকক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ঘুরে বলল, তুমি কি এখন গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ শুরু করবে?

আমি অবাক হয়ে টিয়ারার দিকে তাকালাম, তার মুখে আগুনের লাল আভা, মুখে হাসির চিহ্ন নেই। সে কৌতুক করে বলছে না, সত্যি সত্যি জানতে চাইছে। আমি অবিশ্বাসের গলায় বললাম, কী বলছ তুমি? আমি কেন গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?

তাহলে কে করবে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কাউকে করতে হবে কে বলেছে?

তুমি বলেছ।

আমি বলেছি? আমি কখন বললাম?

টিয়ারা মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না তুমি কখন বলেছ কিন্তু সবাই জানে। তোমার সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে।

কী গল্প?

তুমি সাহসী আর তেজস্বী। তুমি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাব। তুমি গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে লড়বে, মানুষকে মুক্ত করবে এইসব গল্প।

আমি এবারে কেন জানি একটু রেগে উঠলাম, গলা উঁচিয়ে বললাম, তুমি তো জান এইসব মিথ্যা।

টিয়ারা হেসে ফেলল, হাসলে এই মেয়েটিকে এত সুন্দর দেখায় যে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। হাসতে হাসতেই বলল, না আমি জানি না।

ঠিক আছে, তুমি যদি না জেনে থাক তোমাকে এখন বলছি শুনে রাখ। আমি খুব সাধারণ মানুষ, অত্যন্ত সাধারণ। শুধু সাধারণ নয় আমি মনে হয় একটু বোকা—না হলে কিছুতেই এ রকম একটা অবস্থায় এসে পড়তাম না। শুধু তাই নয় আমি ভীতু এবং কাপুরুষ। এই রবোটদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আত্মহত্যা করব বলে ঠিক করেছিলাম। আমার গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই, কখনো ছিলও না।

আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম টিয়ারা আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিল, আমার কোনো কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হল না। আমি আবার রেগে উঠে বললাম, তুমি ওরকম করে হাসছ কেন?

টিয়ারা হাসতে হাসতে বলল, কে বলল আমি হাসছি? আমি মোটেও হাসছি না।

AMARBOI.COM

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। শুনলাম আগুনের অন্য পাশে বসে ক্রিশি বিড়বিড় করে বলল, মানুষ অত্যন্ত দুর্বোধ্য প্রাণী।

আমি আরেক টুকরা ছোট বিস্ফোরক আগুনের দিকে ছুড়ে দিতেই আবার আগুনের শিখা লাফিয়ে অনেক উপরে উঠে গেল। অন্ধকার রাতে এই আগুনের শিখাটিকে দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত কোনো প্রাণী কোনো এক ধরনের বিচিত্র উল্লাসে নাচছে। আমি আগুনের দিকে তাকিয়েছিলাম তখন টিয়ারা আবার আমাকে ডাকল, কুশান।

বল।

আমি তোমাকে একটা কথা বলব?

বল।

তুমি সত্যিই হয়তো গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মানুষকে মুক্ত করতে চাও না—কিন্তু তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।

তুমি কী বলতে চাইছ?

অনেক মানুষ যখন একটা জিনিস বিশ্বাস করে, সেটা যদি ভুল জিনিসও হয়, তাহলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়। মানুষ বিশ্বাস করে তুমি গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেটা মানুষকে এত আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখিয়েছে যে—

টিয়ারা হঠাৎ থেমে গেল। আমি একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, যে কী?

এখন মানুষের মুখ চেয়ে তোমার গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ।

তুমি হয়তো চাও নি, কিন্তু তুমি যুদ্ধ শুরু করেছ। তুমি প্রথমবার সবাইকে বলেছ গ্রুস্টান একটা তুচ্ছ অপারেটিং সিস্টেম—সবাই চমকে উঠেছে, শুনে ভয় পেয়েছে, কিন্তু কেউ মাথা থেকে সেটা সরাতে পারছে না। গ্রুস্টানের মাঝে আগে একটা ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব ছিল সেটা আর নেই। তাকে দেখে সবাই এখন ভাবে এটি একটি অপারেটিং সিস্টেম—

কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অপারেটিং সিস্টেম।

টিয়ারা কেমন জানি জোর দিয়ে বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। সে এক সময় ধরাছোঁয়ার বাইরের অতিমানবিক অলৌকিক একটা শক্তি ছিল, এখন সে তুচ্ছ অপারেটিং সিস্টেম। রিকিভ ভাষায় লেখা একটা পরিব্যাপ্ত অপারেটিং সিস্টেম! এখন সে আঘাত করার পর্যায়ে নেমে এসেছে। এখন তোমাকে আঘাত করতে হবে—

আমি?

টিয়ারা স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ তুমি!

কেমন করে আমি আঘাত করব? কোথায়?

আমি জানি না কোথায়, কিন্তু আমি জানি তুমি পারবে। তোমার সেই ক্ষমতা আছে।

তুমি কেমন করে জান?

আমি দেখেছি! তুমি আমার চোখের সামনে একটি অসম্ভব কাজ করেছ। ছয়টি ভয়ঙ্কর রবোটকে ধ্বংস করেছ। তুমি আবার একটি অসম্ভব কাজ করবে।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। একজন মানুষ যে কী পরিমাণ অযৌক্তিক একটা জিনিস বিশ্বাস করতে পারে সেটি আমি এখন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমি আরেকটা ছোট বিস্ফোরক আগুনের মাঝে ছুড়ে দিচ্ছিলাম তখন টিয়ারা আবার ডাকল, কুশান।

বল।

তুমি মানুষকে যত সুন্দর করে স্বপ্ন দেখাতে পার আর কেউ সেটা পারে না।

আমি কখন স্বপ্ন দেখালাম?

আজ সকালে তুমি কী বলেছিলে মনে আছে?

কী বলেছি?

বলেছ একটি শিশুর জন্ম হবে একজন ছেলে আর একজন মেয়ের ভালবাসা থেকে। টিয়ারা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে খপ করে আমার হাত ধরে বলল, তুমি জান এর অর্থ কী? তুমি জান?

আমি চুপ করে রইলাম, টিয়ারা ফিসফিস করে বলল, তার অর্থ আমরা আবার সত্যিকারের মানুষ হব। আমাদের আপনজন থাকবে, ভালবাসার মানুষ থাকবে, সন্তান থাকবে— ভ্রূণ ব্যাংক থেকে পাওয়া শিশু নয়, সত্যিকারের সন্তান! নিজের রক্তমাংসে তৈরী সন্তান।

আগুনের আভায় টিয়ারার মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। একটি সন্তানকে বুকে ধরার জন্যে একটি মেয়ে কত ব্যাকুল হতে পারে আমি এর আগে কখনো বুঝতে পারি নি।

আমি শুনতে পেলাম আগুনের অন্য পাশে বসে থেকে ক্রিশি বিড়বিড় করে বলল, মানুষ একটি অত্যন্ত বিচিত্র প্রাণী। অত্যন্ত বিচিত্র।

রাত্রিবেলা আগুনের দুই পাশে আমি আর টিয়ারা শুয়ে আছি, মাঝে মাঝে আগুনের লাল আভায় তার মুখ স্পষ্ট হয়ে আসে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতর এক ধরনের আলোড়ন অনুভব করি। বিচিত্র এক ধরনের আলোড়ন। আমি আগে কখনো এ রকম অনুভব করি নি। একই সাথে দুঃখ এবং সুখের অনুভূতি। একই সাথে কষ্ট এবং আনন্দ, হতাশা এবং স্বপ্ন। জোর করে আমি আমার মনোযোগ সরিয়ে আনি। মানুষের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে, যেটা রয়েছে সেটা একটা ধ্বংসস্তূপ। এখানে স্বপ্নের কোনো স্থান নেই। এটি দুর্যোগের সময়, এখানে এখন রূঢ় নিষ্ঠুরতা, বেঁচে থাকার জন্যে এক ধরনের নৃশংস প্রতিযোগিতা। এখন বুকের মাঝে কোনো স্বপ্নের স্থান দিতে হয় না। আমি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে টিয়ারার দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে ডাকলাম, টিয়ারা—

বল।

তুমি এখন কী করবে?

টিয়ারা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আমি সম্ভবত আমার বসতিতে ফিরে যাব। ফিরে গিয়ে—

ফিরে গিয়ে?

ফিরে গিয়ে গ্রুস্টানের প্রিয় মানুষটিকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিব। হয়তো কোনো একদিন ভ্রূণ ব্যাংক থেকে আমাকে একটা শিশু দেবে। হয়তো—

হয়তো কী?

টিয়ারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না কিছু না।

আমার খুব ইচ্ছে হল টিয়ারাকে নরম গলায় বলি, তুমি তোমার বসতিতে যেয়ো না, তুমি থাক আমার কাছাকাছি। আমি গ্রুস্টানকে ধ্বংস করে দেব—

কিন্তু আমি সেটা বলতে পারলাম না, কারণ সেটি সত্যি নয়। পৃথিবীর কোনো মানুষ গ্রুস্টানকে ধ্বংস করতে পারবে না।

আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম টিয়ারা গুনগুন করে গান গাইছে। কী বিষণ্ন করুণ একটি সুর, শুনে বুকের মাঝে কেমন জানি হাহাকার করতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে অনুভব করি হঠাৎ কেন জানি আমার চোখ ভিজে উঠছে। কিসের জন্যে?

ভোররাতে ক্রিশি আমাকে ডেকে তুলল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে ক্রিশি?

দুজন মানুষ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে মহামান্য কুশান।

দুজন মানুষ? আমি চাপা গলায় চিৎকার করে বললাম, মানুষ?

হ্যাঁ। এবং একটি প্রাণী।

প্রাণী?

হ্যাঁ চতুষ্পদ প্রাণী। সম্ভবত কুকুর।

আমার সাথে দেখা করতে এসেছে? কুকুর দেখা করতে এসেছে?

একটি কুকুর এবং দুজন মানুষ।

আমি তখনো পুরোপুরি জেগে উঠতে পারি নি। কোনোমতে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় তারা? কী চায়? কেন এসেছে? কেমন করে জানল আমি এখানে?

আমার গলার স্বরে টিয়ারাও জেগে উঠেছে, ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে কুশান?

ক্রিশি বলছে, দুজন মানুষ আমার সাথে দেখা করতে এসেছে!

সর্বনাশ! কেন এসেছে?

মহামান্য কুশান এবং মহামান্য টিয়ারা, ব্যাপারটিতে ভয়ের কোনোই ব্যাপার নেই। যারা এসেছেন তারা বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।

তুমি কেমন করে জান?

আমি একজনকে চিনি। তিনি আমাদের পুরোনো বসতিতে ছিলেন। তার নাম মহামান্য রাইনুক।

রাইনুক এসেছে? রাইনুক? আমি চিৎকার করে বললাম, তুমি এতক্ষণে বলছ? কোথায়?

এক্ষুনি এসে পড়বে। আমি আগে এসে আপনাকে খবর দিতে চেয়েছি—ওই যে তাদের দেখা যাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে দেখি সত্যি সত্যি রাইনুক এবং আরেকজন কমবয়সী মানুষ একটা ছোট কুকুরের গলার চেন ধরে তাকে টেনে রাখতে রাখতে এসে হাজির হল। কুকুরটি আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে ডেকে হঠাৎ ঠিক মানুষের মতো হাই তুলে হঠাৎ গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল। রাইনুক আমাকে দেখে প্রায় ছুটে আসে—আমরা একজন আরেকজনকে জাপটে জড়িয়ে ধরি, আমার মনে পড়ে না আমি আগে কখনো আমার অনুভূতিকে কোনোদিন এভাবে প্রকাশ করেছি। খানিকক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমাকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে কুশান! আমাদের সবার ধারণা ছিল তোমাকে আরো অনেক সতেজ দেখাবে!

আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর আমি যেভাবে আছি সেখানে খুব সতেজ থাকা যায়?

রাইনুক বলল, কেন নয়? তুমি সতেজ থাকলেই আমরা সবাই সতেজ থাকব।

কেন? আমার সাথে তোমাদের কী সম্পর্ক?

রাইনুকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী মানুষটি বলল, কারণ আপনি গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন।

আমি চমকে তার দিকে তাকালাম, কিছু একটা বলার আগেই হঠাৎ টিয়ারা খিলখিল করে হেসে ওঠে। কিছুতেই সে হাসি থামাতে পারে না। কমবয়সী মানুষটি একটু হকচকিয়ে যায়, টিয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই টিয়ারা। তুমি এমন করে হাসছ কেন?

টিয়ারা হাসতে হাসতে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কুশান, তুমি উত্তর দাও।

আমি মানুষটির দিকে তাকালাম, সে সাথে সাথে মাথা নত করে একটু অভিবাদনের ভঙ্গি করে বলল, আমার নাম এলুজ। আমি দক্ষিণের বসতি থেকে এসেছি। উত্তরের বসতি থেকে যারা আসছে তারা আর কিছুক্ষণের মাঝে পৌঁছে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আরো মানুষ আসছে?

রাইনুক মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ আরো অনেকে আসছে। আমরা তোমার সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যখন সঙ্কেত পেয়েছি সাথে সাথে রওনা দিয়েছি।

সঙ্কেত? আমি তোমাদের আসার জন্যে সঙ্কেত দিয়েছি?

হ্যাঁ। তুমি যখন টিয়ারাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে ঠিক তখন আমরা বুঝতে পেরেছি গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে এখন তোমার আরো মানুষ দরকার। সাথে সাথে আমরা রওনা দিয়েছি।

আমি হতবাক হয়ে রাইনুকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম টিয়ারা হঠাৎ আবার খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে। রাইনুক একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, টিয়ারা হাসছে কেন?

আমি কোনো কথা না বলে দুই পা পিছিয়ে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসি। টিয়ারা হাসি থামিয়ে বলল, কুশান তুমি ওদের বলো আমি কেন হাসছি।

বলব! সবাই আসুক তখন বলব। তার আগে তোমাদের কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চাই, গ্রুস্টান আমাকে খুঁজছে। তোমরা যদি এত সহজে আমাকে খুঁজে বের করতে পার গ্রুস্টানের রবোট কেন পারছে না?

এলুজ নামের কমবয়সী মানুষটি একগাল হেসে বলল, কখনো পারবে না। আমরা এসেছি একটা অভিনব উপায়ে।

কী উপায়ে?

একটা প্রাচীন বইয়ে পড়েছিলাম কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। আমাদের বসতিতে একটি কুকুর রয়েছে, কীভাবে তাকে রাখা হয়েছে সেটি আরেক ইতিহাস। যাই হোক রাইনুক আপনার ঘর থেকে আপনার ব্যবহারী কিছু কাপড় নিয়ে এসেছে। কুকুরটি তার ঘ্রাণ থেকে আপনি কোন পথে গিয়েছেন সেটি খুঁজে বের করেছে। কোনো রবোটের পক্ষে সেটি সম্ভব নয়।

কিন্তু তোমরা বলেছ আরো অনেক মানুষ আসবে—

রাইনুক বলল, আমরা আশপাশের বসতির মানুষেরা একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ রেখেছি। যখন তোমার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে রওনা দিয়েছি আমরা পথে পথে একজন একজন করে রেখে এসেছি। তারা একজন আরেকজনকে পথ দেখিয়ে আনবে। তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

ভয় আমার নিজের জন্যে নয় রাইনুক।

তাহলে কার জন্যে?

তোমাদের জন্যে। এটি সত্যি সত্যি একটি বিশাল বিপজ্জনক অরণ্য। যাই হোক তোমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত? এস বসে কিছু একটা খাওয়া যাক। ক্রিশি খুঁজে খুঁজে এক ধরনের পানীয় এনেছে, পদার্থটি কী আমরা জানি না কিন্তু খেতে চমৎকার।

আমরা সবাই আগুনকে ঘিরে লাল রঙের পানীয়টি চেখে খেতে থাকি। কয়েকজন মানুষের উপস্থিতিতেই জায়গাটি হঠাৎ কেমন যেন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

টিয়ারা ছোট কুকুরটিকে কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। একটি কুকুর যে এত দ্রুত কোনো মানুষের ন্যাওটা হয়ে যেতে পারে, না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না!

আমি রাইনুকের সাথে কথা বলতে থাকি, আমাদের বসতির কে কেমন আছে খবরাখবর নিই। সব মন খারাপ করা খবর। লিয়ানা আমাকে চলে যেতে দিয়েছে বলে গ্রুস্টান তাকে সিলাকিত করেছে। মানুষকে সিলাকিত করা হলে তার শরীরটি সিলিকনের একটি সিলিন্ডারে রেখে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া হয়। গ্রুস্টান তখন মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। সেই মানুষটিকে ইচ্ছে করলে যে কোনো ধরনের আনন্দ দিতে পারে আবার ইচ্ছে করলে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে পারে। সিলাকিত মানুষের প্রতিচ্ছবি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে দেখা সম্ভব। লিয়ানাকেও নাকি কয়েকবার দেখা গিয়েছে, অত্যন্ত বিষণ্ন এবং দুঃখী চেহারায়। যদিও সবাই জানে এটি সত্যিকারের লিয়ানা নয় গ্রুস্টানের তৈরী একটি প্রতিচ্ছবি তবুও দেখে সবার খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। গ্রুস্টান মনে হয় সেটাই চাইছিল তার অবাধ্য হবার শাস্তি কী হতে পারে তার একটা উদাহরণ দেখানো।

আমাদের বসতির বর্তমান অধিপতি হচ্ছে ক্রকো। রাইনুকের ধারণা, ক্রকো মানুষ এবং বৃক্ষের মাঝামাঝি একটি জীব। মেরুদণ্ডহীন ভীতু একটি কাপুরুষ। বসতির মানুষজনের মানসিক অবস্থা ভালো নয়। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে ষোলো বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে একটি টাওয়ারের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর আগে লিখে গেছে এই জীবনকে দীর্ঘায়িত করার তার কোনো উৎসাহ নেই।

রাইনুকের কথা শুনে আমি হঠাৎ করে বুকের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি।

৮

আমরা যেখানে বসেছি জায়গাটা মোটামুটি সমতল। চারপাশে বড় বড় কংক্রিটের টুকরা পড়ে আছে। তার মাঝে কেউ হেলান দিয়ে বসেছে কেউ আবার পা ঝুলিয়ে বসেছে। সব মিলিয়ে এখানে চৌদ্দ জন মানুষ, তার মাঝে চার জন মেয়ে। যারা এসেছে তার মাঝে এক-দুজন মধ্যবয়স্ক, অন্য সবাইকে মোটামুটি তরুণ-তরুণী হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়।

আমি নিজে একটা ধাতব সিলিন্ডারের উপর বসে আছি। গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম শুরু করেছি মনে করে সবাই এখানে এসেছে—পুরো ব্যাপারটি যে আসলে একটি বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝি আমি এইমাত্র সেটি সবাইকে খুলে বলেছি। শুধু তাই নয় আমি খোলাখুলিভাবে সবাইকে বলে দিয়েছি যে আমি একটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, আমার মাঝে নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোনো শক্তি নেই। অন্যদের পথ দেখানো দূরে থাকুক আমি কোনোভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম

আমার কথা শুনে উপস্থিত সবার মুখে একটা গভীর আশাভঙ্গের ছাপ পড়বে। কিন্তু কারো মুখে আশাভঙ্গ বা হতাশার কোনো চিহ্ন দেখলাম না বরং সবাই এক ধরনের হাসিমুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, আমি কী বলতে চাইছি তোমরা মনে হয় ঠিক বুঝতে পার নি।

রাইনুক মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, খুব ভালো করে বুঝেছি। তুমি যে এ রকম কথা বলবে আমরা আগে থেকে জানতাম।

আগে থেকে জানতে?

পিছনের দিকে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, মহামান্য কুশান আমার নাম ইশি, আপনাকে—

আমি একটু উষ্ণস্বরে বললাম, আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। আমি তোমাদের নেতা নই, আমাকে কৃত্রিম আনুষ্ঠানিক একটা সম্মান দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই—

ঠিক আছে আমি দেখাব না। ইশি নামের মানুষটি সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, কুশান তোমাকে আমি একটা কথা বলি।

বল।

প্রাচীনকালে সেনাপতিরা যেরকম একটা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রাজ্য জয় করতে যেত আমরা তোমার কাছে সেরকম নেতৃত্ব আশা করছি না। কখনো করি নি।

তাহলে তোমরা কী আশা করছ?

আমরা তোমার কাছে যে নেতৃত্ব আশা করছি বলতে পার সেটা হচ্ছে একটা স্বপ্নের নেতৃত্ব, একটা বিশ্বাসের নেতৃত্ব। সত্যি কথা বলতে কী তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নেতৃত্বটিও দেবার আর প্রয়োজন নেই। তার কারণ—

ইশি কী বলতে চাইছে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। ইশি একটু হেসে বলল, তার কারণ তুমি ইতিমধ্যে সেটা আমাদের দিয়েছ। দীর্ঘদিন গ্রুস্টান আমাদের শাসন করেছে, তার কবলে থেকে থেকে আমাদের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। তুমি আবার আমাদের স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছ। এখন আমরা আবার তোমাকে নিয়ে কাজ করতে চাই, তার বেশি কিছু নয়।

সবাই গম্ভীর মুখে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে। লাল চুলের একটি মেয়ে হাত দিয়ে তার কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলল, কুশান তুমি নিজে হয়তো জান না কিন্তু তুমি দুটি খুব বড় বড় কাজ করেছ।

কী কাজ?

প্রথমত, তুমি সবাইকে জানিয়েছ গ্রুস্টান আসলে একটি পরিব্যাপ্ত অপারেটিং সিস্টেম। যার অর্থ তার কোনো অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। আজ হোক কাল হোক একদিন তাকে ধ্বংস করা যাবেই। আর দ্বিতীয়ত, তুমি গ্রুস্টানের কোনো সাহায্য ছাড়া একা একা এই বিশাল ধ্বংসস্তূপে প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে বেঁচে আছ। যার অর্থ গ্রুস্টানের ওপর নির্ভর করে মানুষের ছোট ছোট ঘুপচির মতো বসতিতে বেঁচে থাকতে হবে না। ইচ্ছে করলে আমরা যেখানে খুশি সেখানে বেঁচে থাকতে পারব। পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সেখানে আমরা নূতন বসতি সৃষ্টি করব—

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, টিয়ারা বাধা দিয়ে বলল, শুধু তাই নয়, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গতকাল তুমি কী বলেছ।

কী বলেছি?

গ্রুস্টানের কাছে আমাদের সন্তান ভিক্ষা করতে হবে না। মানুষের সন্তান আর ভ্রূণ ব্যাংক থেকে আসবে না, তারা আসবে বাবা–মায়ের ভালবাসা থেকে। তারা হবে আমাদের নিজেদের রক্তমাংসের—

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু—

ইশি বাধা দিয়ে বলল, এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই কুশান। হয়তো এসব অবাস্তব কল্পনা, হয়তো সব অলীক স্বপ্ন—কিন্তু স্বপ্ন তাতে কোনো দ্বিমত নেই।

কমবয়সী একজন তরুণ বলল, আমরা তোমার সাথে এই অপূর্ব স্বপ্নগুলোতে অংশ নিতে চাই।

আমি ঠিক কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। এ ধরনের যুক্তিতর্কে আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই। শেষ চেষ্টা করার জন্যে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু টিয়ারার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। তার অপূর্ব চোখ দুটিতে কী ব্যাকুল এক ধরনের আবেদন। আমি কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, ঠিক আছে। আমাকে ঠিক কী করতে হবে আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাদের সাথে আছি।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা সবাই এক ধরনের আনন্দধ্বনি করে ওঠে, ঠিক কী কারণে জানি না আমি হঠাৎ বুকের মাঝে এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করি। আমি সবাইকে থেমে যেতে একটু সময় দিয়ে বললাম, আমার মনে হয় তোমাদের সত্যি কথাটিও মনে রাখতে হবে।

কোন সত্যি কথা?

গ্রুস্টান কয়েক লক্ষ কম্পিউটারের একটি পরিব্যাপ্ত অপারেটিং সিস্টেম। সেই কম্পিউটারগুলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো কোথায় আছে আমরা জানি পর্যন্ত না। কম্পিউটারগুলো অত্যন্ত সুরক্ষিত—পারমাণবিক বিস্ফোরণেও সেইসব কম্পিউটার ধ্বংস হয় নি। গ্রুস্টানকে ধ্বংস করতে হলে সেইসব কম্পিউটারকে ধ্বংস করতে হবে। একটি–দুটি নয় কয়েক লক্ষ কম্পিউটার।

AMARBOI.COM

মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল একজন মানুষ হাত তুলে বলল, কিন্তু কম্পিউটার ধ্বংস না করে আমরা এক কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের যোগসূত্র কেটে দিতে পারি।

হ্যাঁ, সেটা হয়তো সহজ কিন্তু মনে রেখো কয়েক লক্ষ কম্পিউটারের যোগসূত্রও কয়েক লক্ষ। কোনো মানুষের পক্ষে সেই সবগুলো খুঁজে বের করে কেটে দেয়া সম্ভব নয়।

ইশি বলল, একজন মানুষের পক্ষে অল্প সময়ের মাঝে হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ মিলে যদি দীর্ঘদিন চেষ্টা করে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তবুও সেটি সহজ নয়। গ্রুস্টান নিজেকে রক্ষা করার জন্যে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

টিয়ারা গলা উঁচিয়ে বলল, কিন্তু কুশান, এই মুহূর্তে হয়তো গ্রুস্টানকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে কখনোই কি সম্ভব হতে পারে না?

আমি চুপ করে রইলাম।

বল।

হয়তো কীভাবে সম্ভব।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, হয়তো গ্রুস্টানকে কোনোভাবে ধোঁকা দিয়ে তাকে ব্যবহার করেই পৃথিবীর সব মানুষের বসতিতে খবর পাঠাতে পারি। সেইসব মানুষ একটা নির্দিষ্ট কম্পিউটারের যোগসূত্র কেটে দিতে পারে কিংবা—

কিংবা কী?

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, যদি কোনোভাবে আমরা কম্পিউটারগুলোর অবস্থান বের করতে পারি, কোন নেটওয়ার্কে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেয়া আছে বের করতে পারি—

ইশি ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু সেটা কি খুব কঠিন নয়?

মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল মানুষটি উত্তেজিত গলায় বলল, সেটা খুব কঠিন নাও হতে পারে। আমি একটা লিস্ট তৈরি করতে শুরু করেছি। এই এলাকার প্রায় হাজারখানেক কম্পিউটারের অবস্থান সেখানে আছে।

সত্যি?

হ্যাঁ। যদি অব্যবহৃত একটা কম্পিউটারের মেমোরি থেকে কিছু তথ্য বের করে নিই—

গ্রুস্টান বুঝে যাবে সাথে সাথে।

দাড়িগোঁফের জঙ্গল মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, বুঝবে না। মূল প্রসেসর থেকে ফাইবারের যোগসূত্র হয় কোয়ার্টজ ফাইবারে। সেই ফাইবারকে একটু বাঁকা করে তার মাঝে থেকে ষাট ডিবি অবলাল আলো বের করে আনা যায়। তারপর টেরা হার্টজের কয়েকটা খুব ভালো এমপ্লিফায়ার—

লাল চুলের মেয়েটি একটু অধৈর্য হয়ে বলল, ক্রুড তুমি এখন থাম। খুঁটিনাটি পরে শোনা যাবে। কুশান কী বলতে চাইছে শুনি।

ইশি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ কুশান বল।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, আমরা যদি কম্পিউটারের নেটওয়ার্কটি খুব নিখুঁতভাবে বের করতে পারি তাহলে এটি হয়তো মোটেও অসম্ভব নয় যে কয়েক জায়গায় যোগসূত্রটি কেটে দিয়ে গ্রুস্টানের পুরো নেটওয়ার্কটিকে দুটি আলাদা আলাদা অংশে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি। কম্পিউটারের সংখ্যা হচ্ছে গ্রুস্টানের শক্তি। যদি সেই সংখ্যাকে অর্ধেক করে ফেলা যায়—

AMARBOI.COM

এলোমেলো চুলের একজন মানুষ উত্তেজিত হয়ে বলল, যদি প্রসেসরের সংখ্যা আর মেমোরিকে শক্তি হিসেবে ধরা যায় সেটি এক মাত্রার নয়, সেটি দুই মাত্রার। কারণ রিচি পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখানো যায় যদি নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা অর্ধেক করে দেয়া হয় গ্রুস্টানের ক্ষমতা কমে যাবে চার গুণ। যদি এক-চতুর্থাংশ করে দেয়া হয়—

লাল চুলের মেয়েটি আবার বাধা দিয়ে বলে, দ্রুন তুমি এখন থাম। খুঁটিনাটি পরে দেখা যাবে।

সবাই আবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, আমরা যদি কম্পিউটারগুলোর অবস্থান জানি তাহলে এটা খুব অসম্ভব নয় যে আমরা নেটওয়ার্কের বিশেষ বিশেষ জায়গা ধ্বংস করে সেটিকে দু ভাগ করে দিতে পারি। গ্রুস্টানের শক্তি তখন অর্ধেক হয়ে যাবে, আর দ্রুনের হিসেব যদি সত্যি হয় শক্তি হবে চার ভাগের এক ভাগ। যে অর্ধেক নেটওয়ার্কে আমরা আছি সেটাকে আবার যদি দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি তখন হঠাৎ করে গ্রুস্টানের শক্তি অনেক কমে যাবে। তারপর সেটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে—

একজন হঠাৎ মাটিতে পা দাপিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, সহজ একেবারেই সহজ! আমরা গ্রুস্টানকে ধ্বংস করে দেব।

আমি বললাম, না এত সহজ না। এত সহজে উত্তেজিত হয়ো না। কম্পিউটারের নেটওয়ার্কটি একেবারে নিখুঁতভাবে জানতে হবে। সেটা কঠিন। তবে—

তবে কী?

এখন আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ভাবছি। সেটা না করে যদি ঠাণ্ডা মাথায় সবাই মিলে ভাবি হয়তো আরো চমৎকার কোনো বুদ্ধি বের হয়ে যাবে।

লাল চুলের মেয়েটি বলল, এখন যেটা বের হয়েছে সেটাই তো অসাধারণ!

ইশি একটু হেসে বলল, এটা যদি অসাধারণ নাও হয় কোনো ক্ষতি নেই। তোমাকে এখনই এমন কিছু ভেবে বের করতে হবে যেটা সত্যি কাজ করবে, যেটা সত্যি অসাধারণ।

তাহলে?

তোমার এবং আমাদের সবার এমন একটা কিছু ভেবে বের করতে হবে যেটা আমাদের মাঝে আশা জাগিয়ে রাখবে। যত কমই হোক সাফল্যের একটু সম্ভাবনা থাকবে। সেই সাফল্যের মুখ চেয়ে আমরা কাজ করব—সবাই মিলে একসাথে, একটা বিরাট পরিবারের মতো।

ক্রুড বলল, ইশি, কুশান এইমাত্র যেটা বলেছে সেটাতে সাফল্যের সম্ভাবনা একটু নয়, আমার ধারণা অনেকখানি। কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকভাবে হতে পারে, কোয়ার্টজ ফাইবার কিংবা উপগ্রহ যোগাযোগে। উপগ্রহ যোগাযোগের বড় এন্টেনাগুলো যদি পাতলা এলুমিনিয়াম দিয়ে ঢেকে দিয়ে—

আমি ক্রুডকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, যখন গ্রুস্টানকে বিচ্ছিন্ন করা শুরু করবে সে কি চুপ করে বসে থাকবে? থাকবে না। সে তার বিশাল রবোট বাহিনী নিয়ে আমাদের পিছনে হানা দিবে—

লাল চুলের মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল, আমরা প্রথম দিকে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে যোগাযোগ নষ্ট করতে পারি। কোনো এক ঝড়ের রাতে উপগ্রহের এন্টেনা ফেলে দেব, নিয়ন্ত্রণহীন রবোটদের যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে কিছু ফাইবার কেটে দেব—

সবাই মাথা নাড়ে। রাইনুক হাসতে হাসতে বলল, তোমরা একটা জিনিস লক্ষ করেছ?

কী?

আমরা এতদিন মানুষের বসতির মাঝে একটা বুদ্ধিহীন প্রাণীর মতো বেঁচেছিলাম। গ্রুস্টান আমাদের ছোটবড় সব কাজ করে দিত। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমরা বসতি থেকে পালিয়ে এখানে এসেছি প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা নূতন নূতন জিনিস ভাবছি। নূতন নূতন বুদ্ধি বের করছি।

ইশি বলল, সেটা হচ্ছে গোড়ার কথা। মানুষের একটা স্বপ্ন থাকতে হয়। যদি স্বপ্ন থাকে তাহলে আশা থাকে। আর যদি আশা থাকে মানুষ সংগ্রাম করে যেতে পারে। জীবন তাহলে কখনো অর্থহীন হয় না। আমাদের জীবন কখনো অর্থহীন হবে না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কুশান!

আমি ইশির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললাম, তোমাদের সবার ভিতরে এখন গভীর ভাব, অন্য এক ধরনের উদ্দীপনা। তাই আমি এখন মন খারাপ করা কিছু বলছি না। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জান প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যিকারের একটা দানবকে খেপিয়ে তুলতে যাচ্ছি। নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর একটা দানব—সে কী করবে আমরা এখনো জানি না।

টিয়ারা মাথা নেড়ে বলল, আমি এখন জানতেও চাই না।

রাত্রিবেলা বিশাল একটা আগুন জ্বালিয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে বসে আছি। আমার পাশে বসেছে টিয়ারা, আমার এত কাছে যে আমি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তাকে

দেখে আমার বুকের মাঝে কেমন এক ধরনের কষ্ট হয়, কেন জানি না। তার অপূর্ব মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি নিচু গলায় তাকে ডাকলাম, টিয়ারা।

বল।

মানুষের বসতিতে তোমার জন্যে একজন মানুষ অপেক্ষা করে আছে বলেছিলে।

হ্যাঁ। তাকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। টিয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ফেলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

আমার হঠাৎ ক্লিচির কথা মনে পড়ল।

ক্লিচি?

হ্যাঁ। আমাদের বসতিতে গ্রুস্টানের ডান হাত। যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে যদি জানতে পারে আমি গ্রুস্টানকে ধ্বংস করার দলে যোগ দিয়েছি— টিয়ারা হঠাৎ আবার খিলখিল করে হাসতে থাকে। তাকে দেখে আমার বুকের ভিতরে কিছু একটা নড়েচড়ে যায়।

টিয়ারা হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কুশান!

কী?

তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?

কর।

সব মানুষের নিজের জীবনকে নিয়ে একটা স্বপ্ন থাকে। তোমার স্বপ্নটি কী?

আমি একটু হেসে বললাম, তুমি যেরকম ভাবছ, সেরকম কোনো স্বপ্ন আমার নেই। তোমাদের বিশ্বাস করাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আসলেই আমি খুব সাধারণ মানুষ। আমার স্বপ্নও খুব সাধারণ।

সেটি কী?

সত্যি শুনবে? শোনার মতো কিছু নয়।

হ্যাঁ শুনব।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমার স্বপ্ন যে আমি দক্ষিণে হেঁটে হেঁটে যাব। শুনেছি সেখানে নাকি একটা এলাকায় মানুষজনের বসতি ছিল না বলে পারমাণবিক বোমা দিয়ে ধ্বংস করা হয় নি। সেখানে গিয়ে আমি একটা নীল হ্রদ খুঁজে পাব। সেখানে থাকবে টলটলে পানি। সেই হ্রদের তীরে থাকবে গাছ। সত্যিকারের গাছ। সেই গাছে থাকবে গাঢ় সবুজ পাতা। আমি সেই গাছে হেলান দিয়ে হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকব। আর—

আর কী?

দেখব হ্রদের পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রুপালি মাছ। দেখব আকাশে উড়ে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক। কিচিরমিচির করে ডাকছে। তাদের গায়ের রং উজ্জ্বল সবুজ। লাল ঠোঁট। মাটিতে তাকিয়ে দেখব শুঁয়োপোকা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে থাকতে তাকিয়ে দেখব সূর্য উঠে যাচ্ছে মাথার উপরে আর তখন—

তখন?

তখন আমার খুব খিদে পাবে। আমি তখন শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন ধরাব। তারপর একটা তিতির পাখি না হয় একটা কার্প মাছকে বিষুবীয় অঞ্চলের ঝাঁজালো মসলায় মাখিয়ে খাব। সাথে থাকবে যবের রুটি। আঙুরের রস আর তরমুজ। আর আমার পাশে থাকবে—

তোমার পাশে?

AMARBOI.COM

আমি হঠাৎ থেমে উঠে লক্ষ করলাম সবাই নিঃশব্দে আমার কথা শুনছে। আমি লজ্জা পেয়ে থেমে গেলাম হঠাৎ।

ইশি বলল, কী হল থামলে কেন? বল।

এগুলো ছেলেমানুষি কথা! শুনে কী করবে।

লাল চুলের মেয়েটি বলল, বল না শুনি। বহুকাল কারো মুখে এ রকম ছেলেমানুষি কথা শুনি নি। বড় ভালো লাগছে শুনতে।

জানি না কেন হঠাৎ আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। এই পৃথিবী, প্রকৃতি, আকাশ বাতাস সবকিছু একদিন মানুষের ধরাছোঁয়ার কাছাকাছি ছিল। এখন সেটি কত দূরে—তার একটু স্পর্শের জন্যে আমরা কত তৃষিত হয়ে থাকি।

৯

একটি ছোট দলের জন্যে চৌদ্দ জন সংখ্যাটি খারাপ নয়। খুব বেশি নয় যে সবার সাথে সবাই যোগাযোগ রাখতে পারে না, আবার খুব কমও নয় যে, মোটামুটি একটা দুরূহ কাজ সবাই মিলে শুরু করা যায় না। খুব কাছাকাছি থাকতে হয় বলে খুব অল্প সময়েই আমরা সবার সাথে সবাই পরিচিত হয়ে উঠেছি। কার কোন বিষয়ে কোন ধরনের ক্ষমতা এবং কোন ধরনের দুর্বলতা রয়েছে আমরা দ্রুত জেনে ফেলেছি। যেমন ইশি মানুষটির রসিকতাবোধ প্রবল নয় কিন্তু মানুষটি এক কথায় অসাধারণ। কোনোকিছুতেই সে নিরুৎসাহিত হয় না, যে ব্যাপারটিকে আপাতদর্শনে একটা ভয়ঙ্কর মন খারাপ করা অবস্থা বলে মনে হয় তার মাঝেও সে চমৎকার আশাব্যঞ্জক কিছু একটা খুঁজে বের করে ফেলে। তার বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই কিন্তু মানুষজনকে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা অসাধারণ।

রাইনুককে আমি দীর্ঘদিন থেকে চিনি কিন্তু এখানে তাকে আমি একেবারে নূতনভাবে আবিষ্কার করলাম। তাকে একটা কোনো সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হলে সে তার পিছনে খ্যাপার মতো লেগে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাটার সমাধান না হচ্ছে সে ঘুম খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। ক্রুড হাসিখুশি মানুষ, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল তাই তার সত্যিকার চেহারাটি কেমন জানি না। সে সবসময় কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছে। দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু কম্পিউটারের হার্ডওয়ারে তার অসাধারণ জ্ঞান। গণিতবিদ দ্রুন ক্রুডের ঠিক উল্টো, প্রয়োজনের কথাটিও বলতে চায় না, কম্পিউটার নিয়ে সে বিশেষ কিছু জানত না কিন্তু গত কয়েকদিনে সে এ ব্যাপারে মোটামুটি পারদর্শী হয়ে এসেছে। লাল চুলের মেয়েটি—যার নাম নাইনা, তার অসম্ভব একটা যান্ত্রিক দক্ষতা রয়েছে। যে কোনো যন্ত্রকে খুলে ফেলে সে চোখের পলকে জুড়ে দিতে পারে। গত কয়েকদিনে সে আমাদের জন্যে গোটা চারেক বাই ভার্বাল দাঁড়া করিয়েছে। কয়েকটি প্রাচীন রবোটকেও যোগাড় করা হয়েছে, সে তার মাঝে কিছু পরিবর্তন করে আমাদের ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করবে। একজন মানুষের মাঝে এ রকম প্রাণশক্তি আমি কখনো দেখি নি।

টিয়ারাকে দেখেও আমি অবাক হয়ে যাই, আমাদের কোনো চিকিৎসক রবোট নেই কিন্তু টিয়ারা আশ্চর্য দক্ষতা নিয়ে আমাদের ছোটখাটো শারীরিক সমস্যার সমাধান করে ফেলছে। কয়েকদিন আগে একটা উঁচু দেয়াল থেকে পড়ে এলুজ তার হাত কনুইয়ের কাছে

AMARBOI.COM

ভেঙে ফেলল, ক্রিশির এক্স-রে সংবেদন চোখ ব্যবহার করে সে কীভাবে কীভাবে জানি এলুজের হাতকে ঠিক করে দিল। এখনো সেটি বুকের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেটি নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না।

আমি নিজেকে দেখেও মাঝে মাঝে একটু অবাক হয়ে যাই। এতদিন আমি নিজেকে খুব সাধারণ একজন মানুষ বলে জানতাম কিন্তু গত কিছুদিন থেকে আমি নিজের একটা ক্ষমতা আবিষ্কার করছি। খুব কঠিন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমি তার অত্যন্ত বিচিত্র একটা সমাধান বের করে ফেলি। সবসময় সেটি কাজ করে সেটা সত্যি নয় কিন্তু যখন আর কিছুই করার থাকে না তখন সেইসব সমাধান হঠাৎ করে খুব আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে।

দলের বেশিরভাগ সদস্যের সত্যিকার অর্থে কোনো দক্ষতা ছিল না, এখন অন্যদের সাথে পাশাপাশি কাজ করে সবাই কোনো-না-কোনো বিষয়ে মোটামুটি দক্ষ হয়ে উঠেছে। তাদেরকে জটিল একটি দায়িত্ব দেয়া যায় এবং তারা প্রায় সবসময়েই সাহায্য ছাড়াই সেইসব দায়িত্ব পালন করে ফেলে।

চৌদ্দ জন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানুষ পাশাপাশি থাকার কিছু সমস্যাও রয়েছে, যখন দীর্ঘ সময় কষ্টসাধ্য কাজ করে যেতে হয় তখন খুব সহজেই একে অন্যের ওপর রেগে ওঠে। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি শুরু হয় এবং হঠাৎ হঠাৎ চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো প্রকাশ পেয়ে যায়। সমস্যাটি সবারই চোখে পড়ছে, সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই আলোচনা করা হয় যদিও ইশির ধারণা এটি সত্যিকারের কোনো সমস্যা নয়, নিজেদের ভিতরে ছোটখাটো বাকবিতণ্ডা করে ভেতরের ক্ষোভ বের করা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে অত্যন্ত জরুরি!

গোড়াতেই আমরা নিজেদের ভেতরে কয়েকটা জিনিস ঠিক করে রেখেছি। গ্রুস্টান নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কারণে আমরা কখনোই এক জায়গায় দু-এক দিনের বেশি থাকি না। ব্যাপারটি সহজ নয়, সবাই সেটা নিয়ে অল্পবিস্তর অভিযোগ করা শুরু করেছে কিন্তু এখনো নিয়মটি ভাঙা হয় নি। দলের সবাই কোনো-না-কোনো ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা শিখেছে এবং সবসময় অস্ত্রটি হাতের কাছে রাখা হয়। এমনিতে খাবার পানীয় এবং ওষুধ খুঁজে বের করে বিভিন্ন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। চলাফেরা করার জন্যে কিছু বাই ভার্বাল থাকায় আমরা বেশ দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারি। আমরা আমাদের নূতন জীবনে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সবসময়েই কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে খানিকটা উত্তেজনা থাকে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটি সবাই উপভোগ করা শুরু করেছে।

আমাদের প্রথম কাজ তথ্য সংগ্রহ করা। গ্রুস্টান তার নানা কম্পিউটারের যোগাযোগ রাখার জন্যে নানাভাবে তথ্য পাঠায়। সেই তথ্যগুলো মাইক্রোওয়েভ রিসিভার ব্যবহার করে শোনার চেষ্টা করা হয়। তথ্যগুলোতে খুব প্রয়োজনীয় কিছু থাকবে কেউ আশা করে না কিন্তু কোথায় কোথায় অন্য কম্পিউটারগুলো রয়েছে তার একটা ধারণা হয়। সপ্তাহখানেক চেষ্টা করে আরো প্রায় এক শ নূতন কম্পিউটারের অবস্থান বের করা হয়েছে, কাজটি খুব সময়সাপেক্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এভাবে চলতে থাকলে সব কম্পিউটারের অবস্থান বের করতে করতে আমাদের পুরো জীবন পার হয়ে যাবার কথা কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ঠিক এ রকম সময়ে আমাদের হাতে একটি অভাবিত সুযোগ এসে গেল।

ভোরবেলা আমি আর ক্রুড বের হয়েছি, আমাদের সাথে একটা হাতে তৈরি করা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মনিটর। দক্ষিণে প্রায় চার শ কিলোমিটার দূরে কোনো একটি জায়গা থেকে

নির্দিষ্ট সময় পরে পরে মাইক্রোওয়েভের একটি ছোটখাটো বিস্ফোরণ হয়, ব্যাপারটি কী নিজের চোখে দেখে আসার ইচ্ছে। বাই ভার্বালে করে মাটির কাছাকাছি আমরা উড়ে যাচ্ছি, আমি হালকা হাতে কন্ট্রোল ধরে রেখেছি, ক্লড ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে। একজন মানুষ যে বিনা কারণে এত কথা বলতে পারে ক্লডকে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না।

যে জায়গাটি থেকে মাইক্রোওয়েভের বিস্ফোরণ হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণেই সেখানে পৌঁছে গেছি। একটা ধূসর দালান, তার বেশিরভাগই ভেঙে গিয়েছে। তবুও বাইরে থেকে তাকিয়ে বোঝা যায় ভিতরে বড় অংশ এখনো মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে কী আছে আমরা জানি না, কাছে গেলে আমাদের কোনো কিছু দেখে ফেলবে কি না বা অন্য কোথাও খবর পৌঁছে যাবে কি না সে ব্যাপারেও আমাদের কোনো ধারণা নেই। এ রকম সময় সাধারণত একটা রবোটকে কাজ চালানোর মতো একটা ভিডিও ক্যামেরা হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। আজকেও তাই করা হল। রবোটটি প্রোগ্রাম করা আছে, গুটি গুটি হেঁটে ভিতর থেকে ঘুরে আসার কথা, বাই ভার্বালে বসে ছোট স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাই কোথায় কী রয়েছে।

ভিতরে ছোট ছোট ঘর এবং তার ভিতরে চৌকোণো বাক্স, সেগুলো নানা ধরনের টিউব দিয়ে জুড়ে দেয়া আছে। আমি দেখে ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু ক্লডকে খুব উল্লসিত দেখা গেল, হাঁটুতে থাবা দিয়ে বলল, চমৎকার!

কী হয়েছে?

এটা গেটওয়ে কম্পিউটার।

তার মানে কী?

তার মানে এখানে মানুষের সাথে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই। আশপাশের অনেকগুলো কম্পিউটার এখানে এসে একত্র হয়েছে। একেবারে যাকে বলে সোনার খনি!

তুমি কেমন করে জান?

ক্লড স্ক্রিনে দেখিয়ে বলল, এই দেখ এগুলো হচ্ছে মূল প্রসেসর। কেমন করে সাজানো দেখেছ? বাইরে থেকে যোগাযোগের কোয়ার্টজ ফাইবার এসেছে এদিক দিয়ে। এখানে সাধারণত হলোগ্রাফিক মনিটর থাকে। এখানে নেই কারণ এটা গেটওয়ে কম্পিউটার। তা ছাড়া মেমোরি মডিউলগুলো দেখ কত বড়, উপরের টিউবগুলো নিশ্চয়ই ফ্রিওন টিউব, ঠাণ্ডা রাখার জন্যে দরকার। প্রসেসরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে খুব কায়দা করে, ভালো করে দেখ—

ক্লড একটানা কথা বলে যেতে থাকে, তার বেশ কিছু আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হল ব্যাপারটি নিয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সে বাই ভার্বাল থেকে নেমে বলল, চল ভিতরে যাই।

তুমি নিশ্চিত আমাদের কোনো বিপদ হবে না?

আমি নিশ্চিত।

কতটুকু? শতকরা এক শ ভাগ!

আমি ক্লডের পিছু পিছু ঘরটির মাঝে ঢুকি। চারদিক ধুলায় ধূসর, কত দিন কোনো মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। কয়েকটা ছোট ছোট দরজা পার হয়ে বড় একটা ঘরে এসে দাঁড়ালাম। অসংখ্য চৌকোণো বাক্স পাশাপাশি রাখা আছে, সেখান থেকে নিচু এক ধরনের ধাতব শব্দ হচ্ছে। ঘরে এক ধরনের কটু গন্ধ।

ক্লড ঘরের ভিতর হাঁটাহাঁটি করতে থাকে। বিভিন্ন চৌকোণো তার এবং টিউবগুলো

AMARBOI.COM

দেখতে দেখতে সে আবার নিজের মনে কথা বলতে শুরু করে। আমি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে ক্লডের মোটামুটি অর্থহীন এবং প্রায় ছেলেমানুষি কথা শুনতে থাকি।

ক্লড হঠাৎ কী একটা দেখে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, কুশান!

কী হল?

কাছে এসে দেখ।

আমি এগিয়ে গেলাম, সে হলুদ রঙের কী একটা তার ধরে রেখেছে, আমাকে দেখিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন বিশ্ব জয় করে ফেলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী এটা?

এই দেখ! মূল প্রসেসর থেকে মেমোরি মডিউলের যোগাযোগ। একেবারে সোনার খনি!

কেন?

কোয়ার্টজ ফাইবার, সেকেন্ডে লক্ষ টেরাবিট তথ্য যাচ্ছে। আমরা যদি চাই তাহলে কী তথ্য যাচ্ছে বের করে ফেলতে পারি!

কেমন করে?

মনে নাই আগে বলেছিলাম তোমাদের? একেবারে পানির মতো সহজ। প্রথমে উপরের আবরণ সরিয়ে ভিতর থেকে কোয়ার্টজের মূল ফাইবারটা বের করতে হবে। তারপর সেটা যদি একটু বাঁকা করে ধর, ভিতর থেকে খুব অল্প অবলাল রশ্মি বের হয়ে আসবে। সেখানে একটা ভালো ফটোডায়োড আর কিছু ভালো এমপ্লিফায়ার—ব্যস হয়ে গেল।

হয়ে গেল?

তথ্যটা বোঝার জন্যে কিছু মনিটর লাগবে। একটা ছোট সমস্যা—ক্লড ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আবার কথা বলতে শুরু করে। মানুষটি মনে হয় জোরে জোরে চিন্তা করে।

আমি ক্লডের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম সে যেটা করতে চাইছে ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘদিন থেকে আমরা যে তথ্যগুলো বের করার চেষ্টা করছি এই কম্পিউটার গেটওয়ে থেকে দু-তিন দিনে সেই তথ্যগুলো বের করে নিতে পারব। গ্রুস্টান যদি একজন মানুষ হত তাহলে তার মস্তিষ্কে উঁকি দিয়ে মনের কথা শুনে ফেলার মতো ব্যাপারটি।

আমি আর ক্লড জায়গাটি ভালো করে পরীক্ষা করে ফিরে গেলাম। ঠিক কী করতে চাইছি শোনার পর দলের সবাই খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে। হঠাৎ করে পুরো দলের মাঝে এক নূতন ধরনের উদ্দীপনা ফিরে আসে। আমরা পুরো দলবল নিয়ে পরের দিনই গেটওয়ে কম্পিউটারে পৌঁছে কাজ শুরু করে দিলাম।

ক্লড দাবি করেছিল দুই দিনের মাঝে আমরা কম্পিউটারের মেমোরিতে উঁকি দিয়ে তথ্য বের করতে শুরু করব। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটি এত সহজ নয়। দলের সবাই রাতদিন কাজ করার পরও বড় একটা মনিটরে আবছা আবছাভাবে কিছু ত্রিমাত্রিক ছবি দেখা ছাড়া বিশেষ কোনো লাভ হল না। আমরা পালা করে সেই ত্রিমাত্রিক ছবিগুলোই পরীক্ষা করতে থাকি—সেখান থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য বের হয়ে যাবে সেই আশায়।

এভাবে আরো কয়েকদিন কেটে যায়। ইশি ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। একদিন রাতে আমি যখন বিশ্রাম নেবার জন্যে শুতে যাচ্ছি ইশি বলল, আমরা ঠিক করেছিলাম এক জায়গায় খুব বেশি সময় থাকব না। কিন্তু এখানে আমরা প্রায় দুই সপ্তাহের মতো কাটিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা ভালো হল না।

ক্লড কাছেই বসেছিল। মাথা চুলকে বলল, ফটোডায়োডের ব্যান্ড উইডথ ভালো নয়।

অনেক তথ্য নষ্ট হচ্ছে। যেটুকু অবলাল রশ্মি পাচ্ছি সেটা যথেষ্ট নয়। আরেকটু যদি পেতাম!

দ্রুন বলল, কিন্তু তাহলে গ্রুস্টান বুঝে ফেলবে।

ইশি মাথা নেড়ে বলল, না না, সেটা খুব বিপজ্জনক কাজ হবে।

আমি বললাম, ক্লড, তোমরা সবাই মিলে যে কাজটুকু করছ, বলা যেতে পারে সেটা এক রকম অসাধ্য সাধন। কোনোরকম ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই।

দ্রুন বলল, আমরা তথ্য মোটামুটি খারাপ বের করি নি। যেমন ধরা যাক কম্পিউটারের অবস্থান। আমাদের আগের লিস্টে—অন্তত আরো কয়েক হাজার কম্পিউটার যোগ হয়েছে।

চমৎকার। ইশি মাথা নেড়ে বলল, চমৎকার।

আমি বললাম, আমরা এখানে যদি আরো কিছুদিন থাকি হয়তো আরো কিছু তথ্য বের করতে পারব। কিন্তু যদি গ্রুস্টানের হাতে ধরা পড়ে যাই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমারও তাই ধারণা। ইশি মাথা নেড়ে বলল, এক জায়গায় দুই সপ্তাহ থাকা খুব বিপজ্জনক। আমার মনে হয় আমাদের এখন এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ক্লড বলল, আর এক দিন। মাত্র এক দিন। মেমোরির মূল ব্যাংকে প্রায় পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে, এক ধাক্কায় তখন অনেক কিছু বের হয়ে আসবে।

দ্রুন বলল, যদি দুই সপ্তাহ এক জায়গায় থাকতে পারি তাহলে আর এক দিন বেশি থাকলে ক্ষতি কী?

বিপদের আশঙ্কার কথা যদি বল তাহলে খুব বেশি পার্থক্য নেই।

ইশি বলল, ঠিক আছে তাহলে আমরা আরো এক দিন থাকছি কিন্তু তারপর সরে পড়ব।

আমি বললাম, তোমাদের সবার কাছে একটা অস্ত্র রয়েছে না?

হ্যাঁ।

আমার মনে হয় অস্ত্রটি ভালো করে পরীক্ষা করে আজকে সবাই ঘুমাতে যেও। যদি গভীর রাতে রবোটেরা হানা দেয় মনে রেখো লক ইন না করে গুলি করবে। লক ইন করা হলে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ হয় কিন্তু রবোটেরা টের পেয়ে যায়। রবোটেরা খুব সহজেই অন্য রবোটদের খুঁজে বের করতে পারে কিন্তু মানুষদের খুঁজে বের করা তাদের জন্যে খুব সহজ নয়।

উপস্থিত যারা ছিল সবাই চুপ করে আমার কথা শুনল, কেউ কিছু বলল না। আমি বুঝতে পারলাম হঠাৎ করে সবাই এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে শুরু করেছে।

গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ খুলে তাকালাম, আমার মাথার কাছে ক্রিশি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন ঘুমাই সে সবসময় আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু আজকে তাকে দেখতে একটু অন্য রকম লাগল। ঘুমের মাঝে আমি যখন হঠাৎ করে চোখ খুলে তাকাই ক্রিশি সবসময় আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু এবারে সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। আমি ঘুম চোখে ফিসফিস করে ডাকলাম, ক্রিশি।

ক্রিশি আমার কথার কোনো উত্তর দিল না, সাথে সাথে আমি হঠাৎ করে পুরোপুরি জেগে উঠলাম। ক্রিশির কপোট্রন কোনোভাবে জ্যাম করে দেয়া হয়েছে। যার অর্থ কোনো ধরনের রবোটেরা এসে আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। রবোটেরা মানুষকে বিশেষ কিছু করতে পারে না কিন্তু নিচু স্তরের রবোটদের খুব সহজেই জ্যাম করে দিতে পারে। আমি লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। মাথার কাছে রাখা অস্ত্রটি টেনে নিয়ে আমি গড়িয়ে বড় একটা কংক্রিটের চাঁইয়ের পিছনে শুয়ে পড়ি। আমার পায়ের কাছে ইশি শুয়েছিল, আমি

চাপা গলায় তাকে ডাকলাম, ইশি—

ইশির ঘুম খুব হালকা, সে সাথে সাথে জেগে বলল, কী হয়েছে কুশান?

মনে হয় গ্রুস্টানের রবোটেরা এসেছে। সবাইকে জাগিয়ে দাও। বল অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকতে।

ইশি গুড়ি মেরে পিছনে সরে গেল, কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই জেগে উঠে বড় বড় কংক্রিটের চাঁই, ধাতব সিলিন্ডার বা ধসে পড়া দেয়ালের পিছনে আড়াল নেয়। আমি চাপা গলায় বললাম, মনে রেখো সবাই, লক ইন না করে গুলি করবে—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মাথার উপর দিয়ে শিস দেয়ার মতো শব্দ করে কী একটা উড়ে গেল। পর মুহূর্তে পিছনে একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমি আগুনের একটা গরম হলকা অনুভব করি। উপর থেকে কী একটা জিনিস ভেঙে পড়ে ধুলায় ধূসর হয়ে যায় চারদিক।

আমি অস্ত্রটা তাক করে উবু হয়ে শুয়ে থাকি। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো কিছু একটা এগিয়ে এল, হাতে একটা ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্র। সেটি উপরে তুলে রবোটটি ধাতব গলায় উচ্চৈঃস্বরে বলল, আমি ক্লিও প্রজাতির প্রতিরক্ষা রবোট। ক্রমিক সংখ্যা দুই শ নয়। মহামান্য গ্রুস্টান আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। তোমরা মানুষেরা আমার বন্দি। দুই হাত উপরে তুলে এক জন এক জন করে বের হয়ে আস।

রবোটটি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তার আগেই অস্ত্রটি তাক করে ট্রিগার টেনে ধরলাম। রবোটটির শরীরের উপরের অর্ধেক বাষ্পীভূত হয়ে গেল সাথে সাথে। কোনোকিছু ধ্বংস করার জন্যে বাহাত্তরের এই অস্ত্রটির কোনো তুলনা নেই।

চমৎকার কাজ কুশান!

কথাটি কে বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও নেই। আমি আমার জায়গাটি থেকে পিছিয়ে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু টের পেলাম ঠিক আমার পিছনে কেউ একজন গুটিসুটি মেরে বসে আছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম , কে?

আমি! আমি টিয়ারা।

টিয়ারা?

হ্যাঁ কুশান—সে গুড়ি মেরে আমার পাশে এসে হাজির হয়। আবছা অন্ধকারে আমি তার দিকে তাকালাম, ভীতমুখে সে সামনে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, আমার ভয় করছে কুশান। ভীষণ ভয় করছে।

আমার বুকের ভিতর হঠাৎ যেন ভালবাসার একটি প্লাবন ঘটে গেল। আমি হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে এনে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে বললাম, তোমার কোনো ভয় নেই টিয়ারা। কোনো ভয় নেই।

টিয়ারা একটি শিশুর মতো আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ ঘষে তৃষিতের মতো আমাকে চুম্বন করতে করতে বলল, বল তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। বল।

আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মাথার উপর দিয়ে শিসের মতো একটি শব্দ হল এবং সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারদিক কেঁপে ওঠে। আমি মাথা উঁচু করে সামনে তাকালাম। অন্ধকার থেকে সারি বেঁধে রবোটের দল হাজির হচ্ছে। একটি দুটি নয়, অসংখ্য। সবার

হাতে ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্র। রবোটগুলো বৃত্তাকারে আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্ট করছে। কাছাকাছি এগিয়ে আসা একটি রবোট ধাতব গলায় বলল, মহামান্য গ্রুস্টান তোমাদের মৃত কিংবা জীবিত ধরে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন। তোমরা হাত তুলে—

অন্য পাশ থেকে কেউ একজন তার এটমিক ব্লাস্টার টেনে ধরে। লেজার রশ্মির নীল আলো দেখা গেল এবং মুহূর্তের মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রবোটদের একটা বড় অংশ ভস্মীভূত হয়ে যায়। রবোটগুলো সাথে সাথে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তাদের অস্ত্র তুলে ধরে গুলি করতে শুরু করে। আমি চিৎকার করে বললাম, সাবধান! কাছে আসতে দিও না।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পুরো এলাকাটি নারকীয় হয়ে ওঠে। আমি প্রাণপণে গুলি করতে থাকি, রবোটগুলো একটার পর আরেকটা বিধ্বস্ত হতে থাকে কিন্তু তবু তাদের থামিয়ে রাখা যায় না। সেগুলো তবু মাথা উঁচু করে গুলি করতে করতে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মনে হতে থাকে রবোটগুলো যে কোনো মুহূর্তে আমাদের রক্ষণব্যূহ ভেঙে ঢুকে যাবে। শুনতে পেলাম ইশি চিৎকার করে বলল, পিছিয়ে যাও— পিছিয়ে যাও সবাই।

টিয়ারা আমার কনুইয়ের কাছে খামচে ধরে, আমি তার হাত স্পর্শ করে বললাম, ভয় পেয়ো না টিয়ারা, ভয় পেয়ো না—পিছিয়ে গিয়ে ওই বড় দেয়ালটার পিছনে আড়াল নাও।

তুমি?

আমি আসছি।

টিয়ারা মাটিতে নিচু হয়ে শুয়ে পিছনে সরে যেতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হঠাৎ চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে, আমি আগুনের গরম হলকা অনুভব করলাম, বিকট শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। উপর থেকে কী যেন ভেঙে পড়ল, চারদিক ধুলায় অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম সবাই গুলি করতে করতে পিছনে সরে যাচ্ছে। আমি নিজেও তখন পিছনে সরে যেতে শুরু করলাম, রবোটগুলো কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে আসতে থাকে। আমাদের কয়েকজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে থাকে, রবোটগুলো অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে ছুটে যাচ্ছে, চিৎকার, চেঁচামেচি, ভয়ঙ্কর শব্দে এখানে হঠাৎ যেন নরক নেমে এল।

আমি বুঝতে পারছিলাম এভাবে আর কিছুক্ষণ চলতে থাকলে সবাই মারা পড়বে। দু-এক জনকে রবোটগুলোকে যেভাবে হোক আটকে রাখতে হবে, অন্যেরা যেন পালিয়ে যেতে পারে। পিছনে বাই ভার্বালগুলো আছে সেগুলোতে করে দ্রুত সরে যেতে হবে। আমি ইশিকে সেরকম কিছু বলার জন্যে মাথা উঁচু করেছি ঠিক তখন রবোটগুলো তাদের অস্ত্র নামিয়ে নিল। গোলাগুলি থেমে গেল হঠাৎ এবং আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম রবোটগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মাঝেই বাই ভার্বালের শব্দ শুনতে পেলাম, সত্যি সত্যি সেগুলো দিয়ে তারা ফিরে যেতে শুরু করেছে।

আমরা ধীরে ধীরে আড়াল থেকে বের হয়ে আসি। ধুলায় ধূসর হয়ে আছে একেকজন, ভালো করে না তাকালে চেনা যায় না। ক্লডের কপালের কাছে কোথায় কেটে গেছে, রক্তে মুখ মাখামাখি হয়ে আছে। দ্রুনকে দেখতে পেলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে মুখ বিকৃত করে মাটিতে বসে পড়ল। ইশি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, কী অবস্থা আমাদের! সবাই কি ঠিক আছে?

আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম আমাদের মাঝে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মারা গেছে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম ধ্বংসস্তূপের মাঝে থেকে এক জন এক জন করে সবাই বের হয়ে আসতে থাকে। কারো হাতপা বা মাথা কেটে রক্ত বের হচ্ছে, কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে

কিন্তু সবাই যে বেঁচে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবার চোখেমুখে এক ধরনের অবিশ্বাস্য আতঙ্ক, মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা এখনো যেন বুঝে উঠতে পারছে না। ইশি আবার জিজ্ঞেস করল, সবাই কি ঠিক আছে?

ক্লড তার কপালের ক্ষতটি হাত দিয়ে ধরে রেখে বলল, মনে হয়। ছোটখাটো আঘাত আছে, কিন্তু বড় আঘাত মনে হয় নেই। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না এটা অবিশ্বাস্য নয়। এর পিছনে কারণ আছে।

কী কারণ?

আমরা গেটওয়ে কম্পিউটারকে ঘিরে ছিলাম, সে জন্যে সোজাসুজি আমাদের দিকে গুলি করে নি। এই রবোটগুলোর জন্যে সোজাসুজি গুলি করে আমাদের বাতাসে মিশিয়ে দেয়া খুব কঠিন না। তার মানে এই কম্পিউটারটা গ্রুস্টানের জন্যে মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মনে হয়।

ইশি আবার সবার দিকে তাকিয়ে বলল, সবাই কি সত্যিই এখানে আছে? নাইনা কোথায়?

অন্ধকার এক কোনা থেকে বলল, এই যে এখানে।

রাইনুক?

এই যে।

এলুজ?

এই যে—

ক্লড হঠাৎ যন্ত্রণার মতো একটু শব্দ করে বলল, কপালের কাটাটা থেকে রক্ত বন্ধ করতে পারছি না। টিয়ারা একটু দেখবে—

কেউ কোনো কথা বলল না। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে বললাম, টিয়ারা? টিয়ারা কোথায়?

সবাই চারদিকে ঘুরে তাকাল, কোথাও নেই টিয়ারা। একসাথে অনেকে চিৎকার করে ওঠে, টিয়ারা! টিয়ারা!

কেউ কোনো উত্তর দিল না। ভয়ঙ্কর একটা নৈঃশব্দ্য নেমে আসে হঠাৎ, আমি বুকের ভিতরে আশ্চর্য এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। আমি প্রায় হাহাকারের মতো করে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ক্রিশি একটু নড়ে উঠে—আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মহামান্য কুশান। একটা খুব জরুরি ব্যাপার।

কী?

মহামান্য টিয়ারাকে রবোটের দল ধরে নিয়ে গেছে গ্রুস্টানের কাছে। আর কয়েক মিনিটের মাঝেই তারা বসতিতে পৌঁছে যাবে। গ্রুস্টান সেখানে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

আমার হঠাৎ মনে হল আমি বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। আমি এক পা পিছিয়ে এসে একটা দেয়াল স্পর্শ করে সাবধানে মাটিতে বসে পড়ি। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না, আশপাশে সবাই উত্তেজিত গলায় কিছু একটা বলছে কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পারছিলাম না। আমার বুকের মাঝে এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ আর তীব্র হতাশা জমে উঠতে থাকে। ইচ্ছে করতে থাকে ভয়ঙ্কর এক চিৎকার করে সমস্ত পৃথিবীকে ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিই।

কুঁই কুঁই শব্দ করে কুকুরের বাচ্চাটি তখনো আমাদের পায়ের কাছে শুঁকতে শুঁকতে

AMARBOI.COM

ঘোরাঘুরি করছে। আমি তার ভাষা জানি না কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না সে টিয়ারাকে খুঁজছে।

খুব ধীরে ধীরে যখন আকাশ ফরসা হয়ে ভোর হয়ে এল আমরা তখনো চুপচাপ কম্পিউটার ঘরে বসে আছি। কেউ বিশেষ কথা বলছে না শুধুমাত্র কুকুরের বাচ্চাটি তখনো ইতস্তত ঘুরে ঘুরে টিয়ারাকে খুঁজে যাচ্ছে। ইশি খানিকক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ উপরে তুলে বলল, আমরা টিয়ারাকে কেমন করে উদ্ধার করব?

কেউ কোনো কথা বলল না, কিন্তু সবাই মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালাম। আমার মাথার মাঝে মনে হয় সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে, আমি ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছি না।

ইশি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কুশান, আমরা টিয়ারাকে কেমন করে উদ্ধার করব?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, এতক্ষণে টিয়ারাকে নিশ্চয়ই সিলাকিত করা হয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করার সত্যি কোনো উপায় আছে কি না আমি জানি না।

সবাই চুপ করে বসে রইল। দীর্ঘ সময় ইতস্তত করে নাইনা বলল, কিন্তু আমরা কিছু করব না?

আমি কিছু না বলে নাইনার দিকে তাকালাম, নাইনা সাথে সাথে মাথা নিচু করে ফেলে। রাইনুক একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমরা যদি কিছু করতে চাই তাহলে এই মুহূর্তে এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। গ্রুস্টান জানে আমরা এখানে।

ইশি বলল, কিন্তু জায়গাটা মনে হয় নিরাপদ। কুশান মনে হয় ঠিকই বলেছে, এই গেটওয়ে কম্পিউটারের যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্যে আমাদের উপর সোজাসুজি আঘাত করবে না।

রাইনুক একটু অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু এইভাবে নিজেদের একটা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তৈরি করে বসে থাকব কেন? কী আছে এখানে?

ক্লড তার কপালের ব্যান্ডেজে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমার মনে হয় এই কম্পিউটারের মেমোরিতে কিছু অমূল্য তথ্য আছে। গ্রুস্টান সেজন্যেই এভাবে এটাকে আগলে রাখছে।

কিন্তু আমরা সেই তথ্য বের করতে পারছি না, দুই সপ্তাহ হয়ে গেল—

আমি ক্লডের দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্লড।

বল কুশান।

তুমি এতদিন খুব সাবধানে এই গেটওয়ে কম্পিউটারের মেমোরি থেকে কিছু তথ্য বের করতে চাইছিলে যেন গ্রুস্টান জানতে না পারে। এখন গ্রুস্টান জেনে গেছে। আমরা যে এখানে আছি সেটা আর গোপন নেই। তুমি কি এখন সোজাসুজি কোয়ার্টজ ফাইবার কেটে বা অন্য কোনোভাবে খুব তাড়াতাড়ি কিছু তথ্য বের করতে পারবে?

ক্লড মাথা নেড়ে বলল, গত দুই সপ্তাহে যেটা পারি নি দুই ঘণ্টায় সেটা বের করতে পারব।

তুমি কতটুকু নিশ্চিত?

একজন মানুষের পক্ষে যেটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

চমৎকার। তুমি তাহলে কাজ শুরু করে দাও। তথ্যটুকু বের করার সাথে সাথে তোমরা

AMARBOI.COM

সবাই এখান থেকে চলে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সবাই আমার দিকে তাকাল। ইশি মৃদু স্বরে বলল, কুশান তুমি "আমরা সবাই" না বলে "তোমরা সবাই" কেন বলছ? তুমি কী করবে?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি জানি না, ইশি।

এখন কি আমাদের সবার একসাথে থাকা উচিত না?

আমি জানি না। আমি খানিকক্ষণ ইশির দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তোমরা যদি কিছু মনে না কর, আমি খানিকক্ষণ একা থাকতে চাই।

ইশি বলল, ঠিক আছে কুশান।

আমি কম্পিউটার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে তখন অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করছে। ভোরের এই আলোতে পৃথিবীর সবকিছু অপূর্ব মনে হয় কিন্তু আজ কিছুই আমার চোখে পড়ছে না।

সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে উঠেছে, চারদিক ভয়ঙ্কর গরমে ধিকিধিকি করে জ্বলছে, ঠিক সেরকম সময়ে হঠাৎ নাইনা ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এল। অনেক দূর দৌড়ে এসেছে তাই তখনো হাঁপাচ্ছে, কিছু একটা বলতে চাইছে কিন্তু এত উত্তেজিত হয়ে আছে যে কথা বলতে পারছে না। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী হয়েছে নাইনা?

নাইনা বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে কোনোমতে বলল, টিয়ারা—টিয়ারা—

কী হয়েছে টিয়ারার?

দেখা যাচ্ছে টিয়ারাকে। হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে—

দেখা যাচ্ছে? টিয়ারাকে?

হ্যাঁ। নাইনা মাথা নেড়ে বলল, গ্রুস্টানের সাথে।

আমি আর কোনো কথা না বলে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে থাকি। নাইনা আমার পিছু পিছু আসতে থাকে।

আমাকে দেখে সবাই সরে দাঁড়াল, আমি পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। দেয়ালে বড় হলোগ্রাফিক স্ক্রিন, সেখানে টিয়ারার প্রতিচ্ছবি। এত জীবন্ত যে দেখে মনে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করলে তাকে স্পর্শ করতে পারব। টিয়ারা মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল, তার দুই চোখে এক ধরনের আতঙ্ক। হঠাৎ সে কী একটা দেখে চমকে উঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, ভয় পেয়েছে সে। কী দেখে ভয় পেয়েছে?

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি, স্ক্রিনে হঠাৎ গ্রুস্টানের চেহারা ভেসে আসে। ভয়ঙ্কর ক্রোধে তার মুখ বিকৃত হয়ে আছে। তার সমস্ত মুখ মনে হয় খুলে খুলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো নড়তে থাকে, কাঁপতে থাকে, তার চাপা গলার স্বর হঠাৎ হিসহিস করে ওঠে, তুমি ভেবেছ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? অর্বাচীন নির্বোধ মেয়ে।

টিয়ারা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, সে মাথা নাড়তে থাকে, তারপর হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়।

গ্রুস্টান হঠাৎ দুই পা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, তোমাকে আমি যেভাবে ধরে এনেছি ঠিক সেভাবে আমি এক জন এক জন করে তোমাদের সবাইকে ধরে আনব। সবাইকে। আমি জানি তারা কোথায়। মানুষের সভ্যতার বিরুদ্ধে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেব আমি নিষ্ঠুর হাতে। তোমার সিলাকিত শরীর আমি বাঁচিয়ে রাখব লক্ষ লক্ষ বছর। তোমার মস্তিষ্কে দেয়া হবে অচিন্তনীয় যন্ত্রণা। ভয়ঙ্কর অভিশাপের

AMARBOI.COM

মতো তুমি ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকবে, তার থেকে কোনো মুক্তি নেই। নির্বোধ মেয়ে তোমার কোনো মুক্তি নেই।

গ্রুস্টান হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত ঘুরিয়ে আঘাত করে টিয়ারাকে। সে ছিটকে পড়ে মাটিতে, অনেক কষ্টে মুখ তুলে তাকায়, হঠাৎ মনে হয় সে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কী কাতর সেই দৃষ্টি! আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, একটা আর্তচিৎকার করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

দ্রুন আমার হাত স্পর্শ করে বলল, কুশান এটি সত্যি নয়। এগুলো সব কৃত্রিম প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু টিয়ারার কষ্টটা তো সত্যি। সত্যি না?

দ্রুন কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে বললাম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কেউ একজন এই স্ক্রিনটা বন্ধ করে দেবে?

ক্রুড হাত বাড়িয়ে কী একটা স্পর্শ করতেই পুরো হলোগ্রাফিক স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি কয়েক পা পিছনে সরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। আমি চোখ বন্ধ করে বসে থাকি এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারি আমার কী করতে হবে। আমি সাথে সাথে চোখ খুলে তাকালাম। আমাকে ঘিরে বিষণ্ন মুখে পাথরের মতো সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আমি একবার সবার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে আনি, তারপর কষ্ট করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে এনে বললাম, আমাকে গ্রুস্টানের কাছে যেতে হবে।

সবাই চমকে ওঠে। দেখে মনে হল আমি কী বলছি কেউ ঠিক বুঝতে পারে নি। নাইনা ইতস্তত করে বলল, তু-তুমি কী বলছ?

আমি বলেছি আমাকে গ্রুস্টানের কাছে যেতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। ইশি কয়েকবার কিছু একটা বলার চেষ্টা করে থেমে যায়। ঠিক কী বলবে মনে হয় বুঝতে পারছে না। রাইনুক শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে বলল, তুমি সত্যি যেতে চাও?

হ্যাঁ। আমি সত্যি যেতে চাই।

নাইনা প্রায় আর্ত স্বরে বলল, কেন? তুমি কেন যেতে চাও?

আমি টিয়ারাকে রক্ষা করতে চাই। তাকে কথা দিয়েছিলাম।

কিন্তু তুমি গ্রুস্টানের কাছে গিয়ে কেমন করে তাকে রক্ষা করবে? সেটা কি খুব বড় নির্বুদ্ধিতা হবে না? আবেগপ্রবণ হয়ে তো লাভ নেই—

আমাকে তোমরা বাধা দিও না। একবার চেষ্টা করতে দাও।

তুমি কেমন করে চেষ্টা করবে?

ইশি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কেমন করে চেষ্টা করবে?

আমি জানি না।

জান না?

না। যদি আর কিছু না হয় আমি টিয়ারার কাছাকাছি থাকব।

কিন্তু টিয়ারাকে সিলাকিত করে রাখা হয়েছে।

আমাকেও সিলাকিত করবে। আমার সাথে টিয়ারার দেখা হবে সিলাকিত জগতে—

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম দাঁড়িয়ে থাকা সবাই কেমন জানি শিউরে ওঠে। আমি জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে নরম গলায় বললাম, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যাবার আগে তোমাদের একটা দায়িত্ব দিতে চাই।

AMARBOI.COM

কী দায়িত্ব?

ক্লড—তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে পৃথিবীর সব কম্পিউটারের অবস্থান, তাদের মাঝে যোগসূত্র সবকিছু বের করে এনেছ?

ক্লড মাথা নাড়ল। পকেট থেকে ছোট একটা ক্রিস্টাল ডিস্ক বের করে বলল, এই যে, এখানে সব আছে। দেখ—

না, আমি দেখতে চাই না। আমি এসবের কিছুই এখন জানতে চাই না। গ্রুস্টান নিশ্চয়ই আমাকে সিলাকিত করবে, আমার মস্তিষ্কে যা আছে সব সে জেনে যাবে।

ক্লড ডিস্কটি সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, আমি এখন অন্য কিছু জানতে চাই না, কিন্তু একটি জিনিস আমাকে জানতে হবে। আমাকে সেটা বলবে—

কী জিনিস?

এই ভূখণ্ডের সবগুলো কম্পিউটারের অবস্থান আর তাদের যোগসূত্রগুলো যদি দেখ, আমি নিশ্চিত কয়েকটা যোগসূত্র খুব সুচিন্তিতভাবে কেটে দিতে পারলে পুরো নেটওয়ার্কটি দু ভাগে ভাগ করে ফেলা যাবে।

হ্যাঁ। ক্লড মাথা নেড়ে বলল, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে যে কয়েকটি যোগসূত্র চলে গেছে সেগুলো কেটে দিলে বলা যায় পুরো নেটওয়ার্ক দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

চমৎকার। তোমরা এখন ইচ্ছে করলে এই যোগসূত্রগুলো কেটে নেটওয়ার্কটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারবে?

ক্লড ইশির দিকে তাকাল। ইশি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, পারব।

তোমাদের কতক্ষণ সময় লাগবে?

ভালো কিছু বাই ভার্বাল পেয়েছি। যোগসূত্রগুলোর নিখুঁত অবস্থানও জানি, চেষ্টা করলে আট কি দশ ঘণ্টার মাঝে করা যাবে মনে হয়। নাইনা তুমি কী বল?

নাইনা মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ এর বেশি সময় লাগার কথা নয়।

চমৎকার। আমি ক্লডের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার এই যোগসূত্রগুলোর অবস্থান জানা দরকার।

কিন্তু সেটা কি খুব বিপজ্জনক কিছু তথ্য নয়? তুমি সত্যি জানতে চাও? তথ্যটি মনে রাখাও সহজ নয়। সমুদ্রোপকূলে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ মাটির নিচে গভীরতা কোয়ার্টজ ফাইবার কেবলের ক্রমিক সংখ্যা অসংখ্য সংখ্যা পরিমাপ—

তা ঠিক, আমি মাথা নাড়ি। আমি মনে রাখতে পারব না—কিন্তু তথ্যটা আমার প্রয়োজন, তুমি ক্রিশির কপোট্রনে সেটা প্রবেশ করিয়ে দাও।

ক্রিশি?

হ্যাঁ ক্রিশি। ক্রিশি অত্যন্ত নিম্ন স্তরের কম্পিউটার, তার কপোট্রনের তথ্যে গ্রুস্টানের কোনো কৌতূহল নেই। আমি তার কপোট্রনে করে তথ্যটি নিয়ে যাব।

ক্লড কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, ঠিক আছে কুশান।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি এখন যাব।

কেউ কোনো কথা বলল না। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, আমি যাবার পর তোমরা তোমাদের কাজ শুরু করতে পার। প্রথমে নেটওয়ার্কটি দু ভাগে ভাগ করবে। তারপর সেটিকে আরো দু ভাগ। আমরা যেভাবে ঠিক করেছিলাম।

ক্লড মাথা নাড়ল।

আমি একটু এগিয়ে যেতেই ইশি ডাকল, কুশান।

বল।

আমি জানি না তুমি কেন এটা করছ। খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে এটি আত্মহত্যা নয়, এটি আরো কিছু।

আমি কিছু না বলে একটু হাসার চেষ্টা করলাম।

আমাদের কি আবার দেখা হবে কুশান?

সেটা কি সত্যি জানার প্রয়োজন আছে?

ইশি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, না, নেই।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, কী বলব বুঝতে পারি না। রাইনুক আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমার মাঝে মাঝে একটা কথা মনে পড়ে।

কী কথা?

তুমি প্রথম যেদিন গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলে, লিয়ানা বলেছিল পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ। আমি মাথা নেড়ে বললাম, লিয়ানা বলেছিল পাথরটা গড়িয়ে পড়তে পড়তে ধস নামিয়ে দেবে না ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কেউ জানে না।

রাইনুক নরম গলায় বলল, আমরা জানি একটা ধস নেমে আসছে। কিন্তু সেই ছোট পাথরটাকে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে চাই না।

ছোট পাথরটার কোনো গুরুত্ব নেই রাইনুক। কোনো গুরুত্ব নেই। বড় কথা ধস নেমেছে। সেটা কেউ থামাতে পারবে না।

আমি যখন বাই ভার্বালে দাঁড়িয়ে ক্রিশিকে সেটা চালু করার আদেশ দিয়েছি তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম দূর থেকে দ্রুন হাতে কয়েকটা ছবি নিয়ে ছুটে আসছে। আমি ক্রিশিকে থামতে বললাম, কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই দ্রুন আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে দ্রুন?

তুমি এই ছবিগুলো দেখ।

কিসের ছবি?

কম্পিউটারের মেমোরি থেকে বের করেছি। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার আগে বড় বড় নগরের ছবি।

এই ধরনের ছবি দেখলে বুকে এক ধরনের কষ্ট হয় কিন্তু সেগুলো এভাবে ছুটে এসে আমাকে কেন দেখানো হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি দ্রুনের দিকে তাকাতেই দ্রুন আমার হাতে আরো অনেকগুলো ছবি ধরিয়ে দিল, একই নগরের ছবি কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবার পর। এই ছবিগুলো দেখলে বুকের ভিতরে এক বিচিত্র ধরনের ক্রোধের জন্ম হয়। আমি খানিকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে বললাম, দ্রুন এই ছবিগুলো তুমি আমাকে কেন দেখাচ্ছ?

তুমি ছবিগুলো কবে তোলা হয়েছে সেই তারিখটি দেখ।

আমি তারিখ দেখে চমকে উঠি, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দুই বছর আগের ছবি! দ্রুনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কেমন করে হয়?

আমি জানি না কেমন করে হয়, কিন্তু হয়েছে। এগুলো কাল্পনিক ছবি, পৃথিবী ধ্বংস

হওয়ার পর কেমন দেখাবে তার ছবি।

তার মানে?

তার মানে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনেক আগেই গ্রুস্টান জানত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু কেমন করে জানল সে? কেমন করে জানল ভবিষ্যতে কী হবে?

ইশি এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, ভবিষ্যতে কী হবে সেটি জানার একটি মাত্র উপায়।

কী?

সেই ভবিষ্যতটি যদি নিজের হাতে তৈরি করা হয়।

আমি চমকে ইশির দিকে তাকালাম, তুমি কী বলতে চাইছ ইশি?

আমি নিঃসন্দেহ কুশান। মানুষ এই পৃথিবী ধ্বংস করে নি, এই পৃথিবী ধ্বংস করেছে গ্রুস্টান।

১০

বাই ভার্বালটি তীক্ষ্ণ শব্দ করে বসতিটির উপর দিয়ে একবার ঘুরে যায়। আমি দেখতে পাই বেশ কিছু মানুষ খোলা জায়গাটিতে জড়ো হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ করছে। আমি বাই ভার্বালটিকে সাবধানে নিচে নামিয়ে আনতেই অনেক মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের চোখে এক ধরনের অবিশ্বাস্য বিস্ময়। আমি এবং আমার পিছু পিছু ক্রিশি বাই ভার্বাল থেকে নিচে নেমে এলাম। লোকগুলো সাথে সাথে এক পা পিছিয়ে যায়—তাদের চোখে হঠাৎ এক ধরনের আতঙ্ক এসে ভর করেছে।

AMARBOI.COM

আমি গলার স্বর যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, আমার নাম কুশান।

আমাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলো কোনো কথা বলল না। চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আবার সহজ গলায় বললাম, আমি এসেছি টিয়ারাকে উদ্ধার করতে।

মানুষগুলো চমকে উঠে আমার দিকে তাকায়। আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, পারব কি না জানি না। কিন্তু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। কী বল?

কেউ কোনো কথা বলল না, শুধু কমবয়সী একজন ছেলে উৎসাহে চোখ উজ্জ্বল করে মাথা নাড়তে থাকে। ঘিরে থাকা মানুষগুলোর মাঝে থেকে অসুখী চেহারার একজন মানুষ হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, তুমি কেমন করে টিয়ারাকে উদ্ধার করবে? তাকে সিলাকিত করে রাখা হয়েছে।

আমি জানি।

তা হলে? তুমি কেমন করে উদ্ধার করবে?

আমি এখনো জানি না।

লোকটি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সমস্ত সর্বনাশের মূল। টিয়ারা আমাকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে বলেছিল। আমরা ভ্রূণ ব্যাংক থেকে একটা শিশু নিতে পারতাম। তোমার জন্যে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তোমার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জন্যে?

হ্যাঁ।

লোকটি, যার নাম নিশ্চয়ই ক্লিচি—গলা উঁচু করে বলল, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা।

তুমি যদি সত্যি কাউকে ঘৃণা করতে চাও তাহলে সেটা হওয়া উচিত গ্রুস্টান। এই পৃথিবী ধ্বংস করেছে গ্রুস্টান তুমি সেটা জান?

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমি দেখতে পেলাম দুজন প্রতিরক্ষা রবোট আমার দিকে ছুটে আসছে। আমাকে ঘিরে থাকা মানুষেরা সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিল।

একটি রবোট আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল, মহামান্য কুশান, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

কোথায়?

মহামান্য গ্রুস্টানের কাছে।

আমাকে একটু সময় দাও, আমি কথা বলছি।

আমরা খুব দুঃখিত। আপনাকে এই মুহূর্তে নিয়ে যাওয়ার কথা।

আমি পিছনে ফিরে তাকালাম এবং কিছু বোঝার আগেই ঘাড়ের কাছে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করি। জ্ঞান হারানোর আগে দেখতে পাই ক্রিশি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকার এত ভয়ঙ্কর যে আমি বেশিক্ষণ চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে পারি না। এক সময় চোখ বন্ধ করে ফেলি। চারদিকে এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য। এই ধরনের নৈঃশব্দ্য আমি আগে কখনো অনুভব করি নি, আমি আমার নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই না। আমি কান পেতে থেকেও আমার হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাই না। আমি কি বেঁচে আছি?

AMARBOI.COM

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম, কী ভয়ঙ্কর অন্ধকার। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। একটু আলোর জন্যে আমার সমস্ত চেতনা যেন বুভুক্ষু হয়ে থাকে, কিন্তু কোথাও কোনো আলো নেই। শুধু অন্ধকার, কঠিন নিষ্করুণ অন্ধকার। আমি হাত দিয়ে নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা করি কিন্তু নিজেকে খুঁজে পাই না। কোথায় আমার দেহ? আমার হাত পা মুখ? কোথায় আমার চোখ? আমার নাক কান বুক? আমি কোথায়? ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো এক ধরনের আতঙ্কে আমার চেতনা শিউরে শিউরে ওঠে, আমি চিৎকার করে উঠতে চাই কিন্তু কোথাও এতটুকু শব্দ হয় না। এই তাহলে সিলাকিত? আমি আছি কিন্তু আমি নেই? অস্তিত্বহীন একজন মানুষ? শুধু তার অনুভূতি? তার যন্ত্রণা? কতকাল আমাকে এভাবে থাকতে হবে? কতকাল?

আমি অন্ধকারে অস্তিত্বহীন হয়ে এক বিচিত্র শূন্যতায় ভেসে থাকি। সেই শূন্যতার কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। কতকাল কেটে যায় আমি জানি না। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার অনুভূতি নেই, শুধু এক বিশাল শূন্যতা। এক সময় সেই শূন্যতাও যেন অন্য এক শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে থাকে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে চাই কিন্তু ধরে রাখতে পারি না, এক অন্ধকার অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকি।

খুব ধীরে ধীরে আবার আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমার চোখ খুলতে ভয় হয় আবার যদি সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার এসে আমাকে গ্রাস করে ফেলে? আমি হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ

শুনতে পেলাম, আমার নিশ্বাসের শব্দ। আমি তাহলে বেঁচে আছি? আমি চোখ খুলে তাকালাম, চারদিকে খুব হালকা বেগুনি রঙের একটা আলো। আমি নিজের দিকে তাকালাম, এই তো আমার শরীর। আমার হাত পা দেহ। আমার মুখ। আমার চোখ কান চুল।

আমি নিজেকে স্পর্শ করি, সাথে সাথে আমার সারা শরীর শিউরে ওঠে। এটি আমার শরীর নয়। আমি আবার ভালো করে তাকালাম এটি আমার সিলাকিত দেহ। আমার মস্তিষ্কের তথ্য ব্যবহার করে তৈরি করা এক কাল্পনিক অবয়ব। আমি চারদিকে ঘুরে তাকাই কোথাও কেউ নেই। গ্রুস্টানের কাল্পনিক জগতে আমি একা।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, কী বিচিত্র অনুভূতি, মনে হয় মহাকাশে ভেসে আছি। আমি আছি কিন্তু তবু আমি নেই। আমি নিচু গলায় ডাকলাম, কে আছ এখানে?

আমার কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। আমি আবার ডাকলাম, কে আছ?

খুব কাছে থেকে কে যেন বলল, কী চাও তুমি?

আমি চমকে উঠি, কে?

আমি। আমি গ্রুস্টান।

তুমি কোথায়?

আমি সর্বত্র। তোমার চারপাশে। তোমার ভিতরে।

আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কেন?

কাউকে না দেখে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি না। আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

তুমি আমার সাথে কী কথা বলবে? আমি তোমার মস্তিষ্কের সব তথ্য বের করে নিয়ে আসতে পারি। তুমি কী ভাবছ আমি সব জেনে নিতে পারি।

কিন্তু আমি নিজে থেকে তোমাকে বলতে চাই।

কী বলতে চাও?

খুব জরুরি একটা কথা বলতে চাই। আমি তাই নিজে থেকে তোমার কাছে এসেছি।

বল।

তার আগে আমি তোমাকে দেখতে চাই। তুমি আমার সামনে দেখা দাও।

খুব ধীরে ধীরে গ্রুস্টানের চেহারা সৃষ্টি হতে থাকে। হালকা সবুজ রঙের দেহ একই সাথে মানব এবং মানবী। একই সাথে কোমল এবং নিষ্ঠুর। গ্রুস্টান আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি কী বলতে চাও?

এখন দিন না রাত?

রাত। কেন?

তুমি কখন আমাকে সিলাকিত করেছ? দশ ঘণ্টা কি হয়ে গেছে?

এখনো হয় নি। কেন?

তুমি আমার মস্তিষ্কের তথ্যে উঁকি দিলে জানতে। দশ ঘণ্টার মাঝে তোমার ক্ষমতাকে আমরা অর্ধেক করে দেব।

গ্রুস্টান কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই সে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে দেখছে। দেখতে দেখতে তার চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তার সমস্ত দেহ লাল হয়ে কুৎসিত একটি রূপ নিয়ে নেয়। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে আঘাত করে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায়

AMARBOI.COM

আমি ছিটকে পড়ি। এটি শারীরিক যন্ত্রণা নয়, যন্ত্রণার অনুভূতি। শরীরকে পাশ কাটিয়ে মস্তিষ্কে দেয়া যন্ত্রণার এক তীব্র অনুভূতি। গ্রুস্টান আমার কাছে ঝুঁকে পড়ে হিসহিস করে বলল, নির্বোধ মানুষ! আমার ক্ষমতা অর্ধেক করে দেয়া হলে কী হবে জান? তোমার অস্তিত্ব ধ্বংস হবে সবার আগে। তুমি বেঁচে আছ কারণ আমি বেঁচে আছি। আমার অস্তিত্বে আঘাত করে তুমি বেঁচে থাকবে না। গ্রুস্টান আমার দিকে এগিয়ে আসে আর ঠিক তখন খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। গ্রুস্টানের সমস্ত দেহ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সে তার নিজেকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই যেন আর স্থির হয়ে থাকতে চায় না।

আমি হঠাৎ করে বুকের ভিতরে এক প্রচণ্ড চাপ অনুভব করি। আমার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসে, আমার সিলাকিত দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে। আমি গ্রুস্টানের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললাম, তোমার নেটওয়ার্ক দু ভাগে ভাগ করে ফেলেছে গ্রুস্টান। তুমি আর কোনোদিন তোমার আগের ক্ষমতা ফিরে পাবে না—

আমি কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণায় এক অন্ধকার জগতে তলিয়ে গেলাম। আমার সিলাকিত দেহ কি গ্রুস্টান বাঁচাতে পারবে? আমি জানি না। আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করি। কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না।

এটাই কি মৃত্যু?

তারপর কতকাল কেটে গেছে জানি না। হয়তো কয়েক মুহূর্ত, হয়তো কয়েক যুগ। আমি চোখ মেলে তাকালাম, চারদিকে একটা নীল আলো। খুব ভোরবেলা যেরকম আলো হয় অনেকটা সেরকম। আমি কান পেতে থাকি, কোথাও কেউ একজন কাঁদছে। ব্যাকুল হয়ে কান্না নয়, কেমন জানি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। শুনে বুকের মাঝে কেমন জানি এক ধরনের কষ্ট হয়।

আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, চারদিকে বিশাল নিঃসীম শূন্যতা। যতদূর চোখ যায় কোথাও কিছু নেই। আমি আমার নিজের দিকে তাকালাম, এই তো আমার শরীর। হাত পা মুখ। আমি আবার নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা করি। কী বিচিত্র এক অনুভূতি, আমার নিজের শরীর তবু মনে হয় নিজের নয়।

আমি আবার কান্নার শব্দটা শুনতে পেলাম। কী বিষণ্ন করুণ কান্নার স্বর! কোথা থেকে আসে?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মনে হলে আমি বুঝি ভেসে যাব। আমার সামনে কিছু নেই পিছনে কিছু নেই। আমার নিচে কিছু নেই উপরে কিছু নেই। চারদিকে শুধু খুব হালকা একটা নীল আলো। আমি আবার কান্নার শব্দটা শুনতে পেলাম। সামনে থেকে আসছে। আমি সেদিকে হাঁটতে চেষ্টা করে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম, আমার পায়ে কোনো জোর নেই। আমি অতলে পড়ে যেতে থাকি, হাত দিয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথাও কিছু নেই। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না, পড়ে যেতে থাকি। কতক্ষণ কেটে যায় এভাবে আমি জানি না। আমি কি সত্যিই পড়ে যাচ্ছি নাকি সবই আমার কল্পনা?

আমি আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। বিশাল এক শূন্যতায় আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করি, আবার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মনে হয় খুব কাছে কেউ কাঁদছে। আমি কান্নার শব্দের দিকে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকি।

আমি কতক্ষণ হেঁটেছি জানি না। শুরু নেই শেষ নেই এক আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায়

সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে কান্নার শব্দ স্পষ্ট হতে থাকে, বহুদূরে একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা যাচ্ছে। দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে কাঁদছে। বাতাসে তার কালো চুল উড়ছে, সাদা কাপড় উড়ছে। দুঃখের কী আশ্চর্য একটি প্রতিমূর্তি।

আমি হেঁটে কাছে যেতেই ছায়ামূর্তিটি আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল— টিয়ারা!

টিয়ারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারে না। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কুশান তুমি?

হ্যাঁ। আমি।

তোমাকেও গ্রুস্টান ধরে এনেছে?

না টিয়ারা, আমাকে গ্রুস্টান ধরে আনে নি।

তাহলে তুমি এখানে কেন এসেছ?

আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

নিয়ে যেতে এসেছ?

হ্যাঁ টিয়ারা।

তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? কেমন করে নিয়ে যাবে? আমরা সিলাকিত হয়ে আছি।

আমি জানি।

তুমি সত্যিকারের কুশান নও। আমি সত্যিকারের টিয়ারা নই। এগুলো সব গ্রুস্টানের তৈরী প্রতিচ্ছবি। এখানে কিছু সত্যি নয়। সব মিথ্যা। সব কাল্পনিক।

হ্যাঁ টিয়ারা।

শুধু কষ্টটা সত্যি। কী কষ্ট কুশান— কী ভয়ঙ্কর কষ্ট!

আমি তোমার কষ্ট দূর করে দেব। তুমি আমার কাছে এস। এস।

টিয়ারা হঠাৎ এক পা পিছিয়ে গিয়ে আর্তগলায় বলল, না।

কেন নয়?

ভয় করে। আমার ভয় করে। আমি যদি তোমাকে ছুঁয়ে দেখি তুমি নেই? তুমি যদি হারিয়ে যাও?

আমি হারিয়ে যাব না। আমি টিয়ারার দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমি যদি হারিয়ে যাই তাহলে আবার আমি তোমাকে খুঁজে বের করব। এস আমার কাছে এস।

না কুশান না। আমার ভয় করে। খুব ভয় করে।

তোমার ভয় নেই টিয়ারা, আমি তোমাকে রক্ষা করব।

না কুশান কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, কেউ না।

মনে নেই আগে আমি তোমাকে রক্ষা করেছি? আবার আমি তোমাকে রক্ষা করব।

হঠাৎ খনখনে গলায় খুব কাছে থেকে কে যেন হেসে উঠল। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। কেউ নেই কোথাও, চারদিকে শুধু হালকা নীল আলো। আমি বললাম, কে?

খনখনে গলায় আবার হাসির শব্দ ভেসে আসে।

কে? কে হাসে?

টিয়ারা হঠাৎ ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরে ভয় পাওয়া গলায় বলল, গ্রুস্টান!

আমি টিয়ারাকে ধরে রেখে আবার চারদিকে তাকালাম, গ্রুস্টান তুমি কোথায়? তুমি কী চাও?

আমি কিছু চাই না।

গ্রুস্টান আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কেন?

তোমার ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর তুমি দেখতে কেমন হয়েছ আমি দেখতে চাই।

সাথে সাথে আমার সামনে গ্রুস্টানের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। হালকা সবুজ রঙের সুদর্শন একটি মূর্তি। একই সাথে মানব এবং মানবী। একই সাথে কোমল এবং কঠোর।

আমি কয়েক মুহূর্ত গ্রুস্টানের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তুমি দেখতে ঠিক আগের মতোই আছ।

হ্যাঁ। আমার ক্ষমতাও ঠিক আগের মতো আছে।

কিন্তু তোমার বিশাল নেটওয়ার্ক ছিল সেটি দু ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। এখন তোমার ক্ষমতা আর আগের মতো নেই। অনেক কম। তুমি দুর্বল।

গ্রুস্টান আবার খনখন করে হেসে উঠে বলল, সূর্যকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলে তার ঔজ্জ্বল্য কমে যায় না। পৃথিবীর জন্যে, পৃথিবীর মানুষের জন্যে আমার ক্ষমতা এতটুকু কমে নি। আমার যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে সেটি পৃথিবীর জন্যে যথেষ্ট। আমার প্রকৃত ক্ষমতার এক শতাংশ দিয়ে বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেয়া যায়।

আমি জানি।

তাহলে কেন তোমরা মিছিমিছি শক্তি ক্ষয় করছ? তোমরা জান না এখন আমি আমার রবোট বাহিনী পাঠিয়ে তোমাদের এক জন এক জন করে ধরে আনব?

জানি।

তোমরা কি জান না আমার নেটওয়ার্কে তোমরা আর স্পর্শ করতে পারবে না?

জানি। আমি খানিকক্ষণ গ্রুস্টানের দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বললাম, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?

গ্রুস্টান কোনো কথা না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, তুমি কয়েক লক্ষ কম্পিউটারের একটি পরিব্যাপ্ত অপারেটিং সিস্টেম। নেটওয়ার্ক অর্ধেক করে দেয়ার পর তোমাকে নূতন করে নিজেকে দাঁড় করাতে হয়েছে। এই ভূখণ্ডের এই নেটওয়ার্কে তুমি যেরকম গ্রুস্টান, অন্য ভূখণ্ডের বাকি নেটওয়ার্কে ঠিক সেরকম আরেকজন গ্রুস্টান কি তৈরি হয় নি?

গ্রুস্টান কোনো কথা বলল না কিন্তু ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, তুমি বলতে চাইছ না কিন্তু আমি জানি। ঠিক তোমাকে আমি যেরকম দেখছি এ রকম আরো একজন গ্রুস্টানের জন্ম হয়েছে এখন। বাকি অর্ধেক নেটওয়ার্কে তার অস্তিত্ব। ঠিক তোমার মতো একজন গ্রুস্টান।

তুমি কী বলতে চাইছ কুশান?

সেই গ্রুস্টান ঠিক তোমার মতো শক্তিশালী। ঠিক তোমার মতো নৃশংস তোমার মতো হৃদয়হীন। তোমার মতো কুটিল কুচক্রী—

চুপ কর কুশান! চুপ কর—

যত সময় যাচ্ছে তোমরা দুই গ্রুস্টান তত ভিন্ন হয়ে যাচ্ছ। বিশেষ করে তুমি।

আমি কী?

গেটওয়ে কম্পিউটারের মেমোরি থেকে আমি খুব আশ্চর্য কিছু ছবি এনেছি। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার ছবি কিন্তু সেগুলো তৈরি হয়েছে পৃথিবী ধ্বংসের আগে। আমি ছবিগুলো আমার বাই ভার্বালে রেখে এসেছিলাম এতক্ষণে সেগুলো এই বসতির সব মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই জান তার মানে কী? জান নিশ্চয়ই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুস্টান ভয়ঙ্কর গর্জন করে আমার দিকে এগিয়ে আসে, চিৎকার করে বলে, মিথ্যাবাদী—

হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ, মিথ্যাবাদী। আমি যদি না হই তাহলে তুমি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। অনেক মানুষ যখন একটা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে তখন সেই মিথ্যাটাই সত্যি হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত এই বসতির মানুষ সেই মিথ্যা কথাটিই বিশ্বাস করবে। একটা কথা এখন বসতি থেকে বসতিতে ছড়িয়ে পড়বে—পৃথিবী মানুষ ধ্বংস করে নি, ধ্বংস করেছে গ্রুস্টান—

কথা শেষ করার আগেই প্রচণ্ড আঘাতে আমি ছিটকে পড়ি। গ্রুস্টান হঠাৎ আমার উপর হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমার হাত থেকে টিয়ারা ছুটে যায় একপাশে। গ্রুস্টান আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে ভয়ঙ্কর এক আক্রোশে—

আমি কোনোমতে বললাম, না গ্রুস্টান! আমি জানি তুমি আমাকে হত্যা করবে না। মৃত মানুষকে অত্যাচার করা যায় না। শুধু যন্ত্রণা দেবার জন্যে তুমি আমাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়ে রাখবে। রাখবে না?

গ্রুস্টান আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ কুশান, তুমি সত্যি কথা বলেছ। তুমি এই প্রথম একটি সত্যি কথা বলেছ।

আমি আমার গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, তুমি জান তোমার মাঝে সবচেয়ে বিচিত্র অংশটুকু কী? তোমার সবচেয়ে বিচিত্র অংশ হচ্ছে মানুষের সাথে তোমার আশ্চর্য মিল। পৃথিবীর মানুষ যখন তোমাকে সৃষ্টি করে তারা কেন তোমাকে মানুষের রূপ দিয়েছিল—মানুষের মতো একটি চরিত্র দিয়েছিল, আমি জানি না। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জান?

গ্রুস্টান কোনো কথা না বলে আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমি তার দৃষ্টি উপেক্ষা করে আবার বললাম, মজার ব্যাপার হচ্ছে মানুষের মহত্ত্ব তোমার মাঝে নেই। মানুষের ভালবাসাও নেই! মানুষের স্বপ্নও নেই। আছে মানুষের নীচতা। ক্ষুদ্রতা। মানুষের দুর্বলতা। মানুষের হিংস্রতা। আর জান সেটাই তোমাকে ধ্বংস করে দেবে চিরদিনের মতো।

আমাকে ধ্বংস করে দেবে?

হ্যাঁ গ্রুস্টান। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও তুমি—যদি পরিব্যাপ্ত কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের ধ্বংসকে মৃত্যু বলা যায়।

তুমি কী বলতে চাইছ?

তুমি জান আমার একটি রবোট ছিল। অত্যন্ত প্রাচীন নির্বোধ রবোট। তার নাম ক্রিশি।

কী হয়েছে তার?

একটা বাই ভার্বালে করে আমি আর ক্রিশি এখানে এসেছি। তোমার রবোটেরা আমাকে ধরে এনেছে, ক্রিশিকে কিছু করে নি। কেন করবে? অত্যন্ত নির্বোধ প্রাচীন একটা রবোট—তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কী করেছে সেই রবোট?

আমি জানি না কী করেছে সে। কেমন করে জানব? তুমি আমাকে সিলাকিত করে রেখেছ। কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি। যখন তোমার বিশাল নেটওয়ার্কটি দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে সে এখানে ছিল। সে দেখেছে তোমাকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়া হয়েছে, সে দেখেছে তুমি কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছ। সে দেখেছে আমার জীবন হঠাৎ বিপন্ন হয়েছে।

গ্রুস্টানের চোখেমুখে হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক ধরনের আক্রোশ এসে ভর করে। হিংস্র স্বরে হিসহিস করে বলল, তুমি কী বলতে চাইছ?

ক্রিশি আমার অনেক দিনের রবোট। সে আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যেটা করতে হয় করবে, তার স্বল্প বুদ্ধিতে, সেটা কি জান?

গ্রুস্টানের চেহারা হঠাৎ পাল্টে যেতে থাকে, সেখানে হঠাৎ এক আশ্চর্য আতঙ্ক এসে ভর করে। মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলে, না— না—কিছুতেই না—

হ্যাঁ গ্রুস্টান। আমি নিশ্চিত সে বাই ভার্বালে করে ফিরে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। যেখানে তোমার যোগসূত্রটি কেটে দু ভাগ করা হয়েছিল সেটা আবার জুড়ে দিচ্ছে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে। কারণ সে মনে করে তুমি রক্ষা পেলে আমি রক্ষা পাব।

গ্রুস্টান কোনো কথা বলে না, হঠাৎ তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে, আমি নিচু গলায় বললাম, তুমি জান তার অর্থ কী? তার অর্থ পৃথিবীর বিশাল নেটওয়ার্কে এখন দুজন গ্রুস্টান। একজন তুমি, আরেকজন পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে সৃষ্টি হওয়া দ্বিতীয় গ্রুস্টান। তোমার মতো নৃশংস। তোমার মতো হিংস্র। কিন্তু তুমি নও। সে ভিন্ন একজন।

গ্রুস্টান থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, না, না—তুমি মিথ্যা কথা বলছ—মিথ্যা কথা বলছ—মিথ্যা—

আমি ভুল বলতে পারি, কিন্তু মিথ্যা বলছি না গ্রুস্টান! তুমি প্রায় ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী, পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন তোমাকে ধ্বংস করতে পারত না। তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে শুধু তুমি। ঠিক তোমার মতো একজন নৃশংস হিংস্র খল কুটিল কুচক্রী অপারেটিং সিস্টেম। আমি তাই করেছি গ্রুস্টান—আরেকজন গ্রুস্টানের জন্ম দিয়ে তোমার সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

হঠাৎ চারদিক থরথর করে কেঁপে ওঠে। আমি দেখতে পাই ধোঁয়ার মতো কিছু একটা গ্রুস্টানের পাশে ঘুরছে, কিছু একটা সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয় গ্রুস্টান?

আমি হাঁটু গেড়ে গড়িয়ে গিয়ে টিয়ারাকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললাম, টিয়ারা, চোখ বন্ধ কর টিয়ারা!

কেন কুশান?

ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হবে তোমার সামনে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য! তুমি সহ্য করতে পারবে না—

আমার ভয় করছে কুশান। ভয় করছে—

আমারও ভয় করছে। এস আমি তোমাকে শক্ত করে ধরে রাখি। আমি টিয়ারাকে ধরে রাখতে চাই কিন্তু সে আমার হাত থেকে কীভাবে জানি সরে যেতে থাকে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে ফিসফিস করে বললাম, টিয়ারা, তুমি সত্যিকারের টিয়ারা নও। আমি সত্যিকারের কুশান নই! কিন্তু তবু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

কী কথা?

গ্রুস্টান যখন ধ্বংস হবে তখন হয়তো তুমি আর আমি বেঁচে থাকব না। সত্যিকারের কুশান হয়তো আর কখনো সত্যিকারের টিয়ারাকে দেখবে না। যে কথাটি সে বলতে চেয়েছিল হয়তো কোনোদিন সেই কথাটি বলতে পারবে না—

কী কথা কুশান?

আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তীব্র

আলোর ঝলকানিতে চারদিক ঝলসে ওঠে। প্রচণ্ড উত্তাপ ভয়াবহ শব্দ আগুনের লেলিহান শিখা আর তার মাঝে দেখতে পাই দুটি প্রেত যেন একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন হঠাৎ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। আমি টিয়ারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আমার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল—আমি দেখলাম সে উড়ে যাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—

আমি চিৎকার করতে থাকলাম, কিন্তু কেউ আমার চিৎকার শুনতে পেল না।

১১

আমরা দক্ষিণ দিকে হাঁটছি গত তিন সপ্তাহ থেকে। বাই ভার্বালে করে এলে অনেক তাড়াতাড়ি আসা যেত কিন্তু আমরা সেভাবে আসতে চাই নি। আমরা হেঁটে হেঁটে আসছি, বহুকাল আগে মানুষ যেভাবে নূতন দেশের খোঁজে যেত, সেভাবে।

আমরা এখনো দক্ষিণের সেই অঞ্চলটিতে পৌঁছাই নি কিন্তু সবাই জানি তার খুব কাছাকাছি এসে গেছি। হঠাৎ হঠাৎ আমরা সেটি অনুভব করতে পারি, মুখে শীতল হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে। মাটিতে চোখ বুলালে চোখে পড়ে ছোট গাছের কুঁড়ি, সবুজ গাছের পাতা। গত রাতে একটা নিশিজাগা পাখি ডেকে ডেকে উড়ে গেছে আকাশ দিয়ে। বাতাসে এক ধরনের সজীব প্রাণের ঘ্রাণ, ঠিক জানি না কেন সেটি বুককে উতলা করে দেয়।

আমার পাশাপাশি হাঁটছে ইশি। তার ঘাড়ে একটি ছোট দুরন্ত শিশু। আমাদের পিছনে রাইনুক আর নাইনা। একটু পিছনে লিয়ানা। দীর্ঘদিন সিলাকিত হয়েছিল বলে একটু শুকিয়ে গিয়ে তাকে দেখাচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে হাসল মিষ্টি করে। লিয়ানার পিছনে একটি ভাবুক তরুণ, তার পিছনে দুটি চঞ্চল তরুণী, তাদের পিছনে আরো অনেকে। কত জন আসছে আমাদের সাথে কে জানে। কত তাড়াতাড়িই না গ্রুস্টানকে ভুলে গেছে সবাই আর নূতন এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কী অনায়াসে।

আমি একটা বড় পাথরের পাশে দাঁড়ালাম, একটা শুঁয়োপোকা গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে। আমি সাবধানে সেটাকে হাতে তুলে নেই। হাত বেয়ে যেতে থাকে পোকাটি। কী বিচিত্র একটি অনুভূতি।

হঠাৎ টিয়ারা ছুটে এল কোথা থেকে, মাথার চুল পিছনে টেনে একটুকরা রঙিন কাপড় বেঁধেছে শক্ত করে। আমাকে দেখে অকারণে হেসে ফেলল সে। আমি বললাম, দেখেছ এটা কী?

কী?

শুঁয়োপোকা।

এতগুলো পা নিয়ে এত আস্তে আস্তে হাঁটে?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ। আর কয়দিন অপেক্ষা কর দেখবে সে কী সুন্দর প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাবে আকাশে।

AMARBOI.COM

সত্যি?

সত্যি।

আমি টিয়ারার চোখের দিকে তাকালাম, ঝকঝকে কালো দুটি চোখ যেন দুটি অতলান্ত হ্রদ। যেরকম একটি হ্রদের দিকে আমরা হেঁটে যাচ্ছি বহুদিন থেকে। যেই হ্রদে থাকবে টলটলে নীল পানি। যেই পানিতে থাকবে রুপালি মাছ। যার তীরে থাকবে সবুজ গাছ। গাছে থাকবে লাল ফুল। যার আকাশে থাকবে সাদা মেঘ, যে মেঘে উড়ে বেড়াবে রঙিন পাখি।

আমি জানি আজ হোক কাল হোক আমরা পৌঁছাব সেই হ্রদের কাছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিনিত্রি রাশিমালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আমি দীর্ঘ সময় খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে আবছা অন্ধকার, আকাশে সম্ভবত মেঘ করেছে, দক্ষিণের একটা নিম্নচাপ এই এলাকার উপর দিয়ে যাবার কথা। মেঘ আমার বড় ভালো লাগে, কিন্তু আজ আমি মেঘের জন্যে অপেক্ষা করছি না। দিনের আলো নিভে যখন অন্ধকার নেমে আসে, নিচের আদিগন্ত বিস্তৃত শহরে যখন একটি একটি করে নক্ষত্রের মতো আলো ফুটতে থাকে তখন সেটি দেখতেও আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু আজ আমি সেটাও দেখছি না। আমার মন আজ বড় বিক্ষিপ্ত, আমার ভালবাসার মেয়েটি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে পড়ল, সাথে সাথে বুকের ভিতর কোথায় জানি যন্ত্রণা করে ওঠে। কিছুক্ষণ আগেও ত্রিশা এই ঘরে ছিল। আমি আর ত্রিশা মুখোমুখি বসেছিলাম। ত্রিশা বসেছিল আমার খুব কাছে, এত কাছে যে আমি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল সেই বাতাসে তার মাথার চুল উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, আমার খুব ইচ্ছে করছিল হাত দিয়ে আমি তার চুল স্পর্শ করি। কিন্তু আমি চুপ করে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

ত্রিশা অনেকক্ষণ বিষণ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে নরম গলায় ডেকে বলেছিল, রিকি—

আমি কোনো কথা না বলে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম। তখন সে কেমন যেন চেষ্টা করে নিজেকে একটু শক্ত করে বলেছিল, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই রিকি।

আমি খুব সাবধানে একটা নিশ্বাস গোপন করে বলেছিলাম, তুমি কী বলবে আমি জানি ত্রিশা।

ত্রিশা তখন খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি জান?

হ্যাঁ আমি জানি। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় বলেছিলাম, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, ত্রিশা।

আমার কথা শুনে ত্রিশা চমকে উঠেছিল, তার মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কেমন করে এটা জানলে?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, আমি জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন ত্রিশা আমার দিকে অনেকক্ষণ বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার দুই চোখে পানি জমে উঠেছিল, হাত দিয়ে পানি মুছে সে গলার স্বর খুব স্বাভাবিক করে বলেছিল, আমি খুব দুঃখিত রিকি। তুমি খুব চমৎকার একটি মানুষ, আমি কখনো তোমার কথা ভুলব না। কিন্তু আমরা দুজন একজন আরেকজনের জন্যে নই। আমরা যদি কাছাকাছি থাকি একজন থেকে আরেকজন শুধু কষ্টই পাব—

ত্রিশা নরম গলায় আরো অনেক কথা বলেছিল, আমি সেগুলো ভালো করে শুনি নি। সেসব কথায় কিছু আসে যায় না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল তার দুই হাত জাপটে ধরে অনুনয় করে বলি, ত্রিশা তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমি জানি তুমি কী চাও, আমি তোমার সব স্বপ্ন সত্য করে দেব। বিশ্বাস কর আমি ইচ্ছা করলে পারি।

কিন্তু আমি ত্রিশাকে কিছু বলি নি। আমি তাকে উঠে যেতে দেখেছি, টেবিল থেকে তার ছোট ব্যাগটা তুলে নিতে দেখেছি, তারপর আমাকে গভীর ভালবাসায় একবার আলিঙ্গন করে দরজা খুলে চলে যেতে দেখেছি। আমি তাকে ডেকে ফেরাতে চেয়েছিলাম কিন্তু ফেরাই নি। কেন ফেরাই নি কে জানে? আমি অন্য মানুষের মনের কথা বুঝে ফেলি অনায়াসে কিন্তু কখনো নিজেকে বুঝতে পারি নি। কেন ঈশ্বর আমাকে সাধারণ একজন মানুষ করে জন্ম দিল না? কেন?

আমি জানালা খুলে নিচে তাকালাম এবং ঠিক তখন আমার খুব একটা বিচিত্র জিনিস মনে হল। আমি যদি এখন তিন শ এগার তালার উপর থেকে নিচের চকচকে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে কেমন হয়? তিন শ এগার তালা অনেক উঁচু, নিচে পড়তে কম করে হলেও চৌদ্দ সেকেন্ড সময় লাগবে। এই চৌদ্দ সেকেন্ড সময় যখন নিজেকে ভরশূন্য মনে হতে থাকবে এবং যখন নিশ্চিত মৃত্যুকে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখব তখন কি জীবনকে একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি থেকে দেখা যাবে? যে দৃষ্টিতে আমি জীবনকে কখনো দেখি নি? আমি এক ধরনের লোভাতুর দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং ঠিক তখন আমার কানের কাছে কিটি ফিসফিস করে বলল, লাফ দিতে চাও?

আমি ঘুরে কিটির দিকে তাকালাম, কিটি আমার ঘরের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার রবোট। সে দীর্ঘদিন থেকে আমার সাথে আছে। বুদ্ধিমত্তা নিনিষ স্কেলে চার মাত্রা থেকে বেশি হওয়ার কথা নয়। শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের সাহচর্যের কারণে তার সাথে আমার এক ধরনের বিচিত্র বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ইদানীং সে আমাকে খানিকটা বুঝতে শিখেছে বলে মনে হয়। আমি একটু অবাক হয়ে কিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী বললে?

জানালা দিয়ে লাফ দিতে চাও?

লাফ দেব? কেন?

কোনো মানুষকে যখন তাদের ভালবাসার মেয়েরা ছেড়ে চলে যায় তখন তারা এ রকম করে। কেউ মাথায় গুলি করে, কেউ জানালা দিয়ে লাফ দেয়। আমি খবরের কাগজে পড়েছি। এটাকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বলে।

তোমার তাই মনে হচ্ছে? আমি মানসিক ভারসাম্যহীন?

হ্যাঁ। কিটি তার সবুজ চোখে এক ধরনের একাগ্রতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে, মাথা নেড়ে বলে, তুমি আজ অবশ্যি মানসিক ভারসাম্যহীন। কফিতে দুই চামচ চিনি না দিয়ে এক চামচ চিনি দিয়েছ।

এক চামচ?

হ্যাঁ।

সেই জন্যে আমি মানসিক ভারসাম্যহীন?

হ্যাঁ। তুমি কম্পিউটারে তোমার জার্নাল পড় নি। চিঠি খুলে দেখ নি। এখন এত বেলা হয়েছে তুমি তবু আমাকে রাতের খাবার গরম করতে বল নি। তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন। তুমি দুঃখী। তুমি মনে হয় এখন জানালা দিয়ে লাফ দেবে।

আমি খানিকক্ষণ কিটির দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বললাম, কিটি তুমি একেবারে সত্য কথা বলেছ! আমার সত্যি ইচ্ছে করছে জানালা থেকে লাফ দিয়ে জীবন শেষ করে দিই।

আমি আগেও লক্ষ করেছি, আমার মনের গভীরের কথা যেগুলো কখনোই অন্য কোনো মানুষকে জানতে দিই না আমি অবলীলায় এই নির্বোধ রবোটটিকে বলে ফেলি। রবোটটি কখনোই আমার অনুভূতির গভীরতা ধরতে পারে না, আজকেও পারল না। তার চোখের ঔজ্জ্বল্য কয়েক মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমারও তাই ইচ্ছে করছে।

তোমার কী ইচ্ছে করছে?

তোমার সাথে লাফ দিই।

কেন?

তুমি যখন মরে যাবে তখন আমাকে এমনিতেই ধ্বংস করে ফেলবে। চার মাত্রার রবোটে তেতাল্লিশ দশমিক তিন পয়েন্ট কপোট্রন এখন কোথাও নেই। তাই আমার মনে হয় তোমার সাথে লাফ দেয়াই ভালো। তোমার যদি কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় আমি কাছাকাছি থাকব।

প্রয়োজন?

হ্যাঁ। তুমি যখন নিচে পড়তে থাকবে তখন যদি কিছু প্রয়োজন হয়।

আমি এক ধরনের স্নেহের চোখে এই পরিপূর্ণ নির্বোধ রবোটটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে খানিকক্ষণ আমাকে লক্ষ করে হঠাৎ ঘরের ভিতরে গিয়ে প্রায় সাথে সাথে একটা ইলেকট্রনিক নোট প্যাড নিয়ে ফিরে এল। নোট প্যাডটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কি কিছু লিখে যেতে চাও?

কী লিখব?

মানুষেরা যখন নিজেরা নিজেদের সার্কিট নষ্ট করে ফেলে তখন সাধারণত তার আগে কিছু লিখে যায়।

কী লেখে?

আমার সার্কিট নষ্ট করার জন্যে কেউ দায়ী নয়।

সার্কিট নষ্ট?

হ্যাঁ। তোমরা মৃত্যু বল সেটাকে। সেটাও লিখতে পার, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

আমি কিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুকখুক করে হেসে ফেললাম, কিটি সাথে সাথে ঘুরে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ হেঁটে ঘরের ভিতরে চলে গেল। আমি পিছন থেকে ডেকে বললাম, কী হল? তুমি কোথায় যাও?

খাবার গরম করি। তুমি খাবে।

হঠাৎ করে?

তুমি হেসেছ, তার মানে তোমার মানসিক ভারসাম্যতা ফিরে এসেছে। তুমি এখন জানালা দিয়ে লাফ দিবে না।

WWW.AMARBOI.COM

আমি এক ধরনের ঈর্ষার দৃষ্টিতে কিটির দিকে তাকিয়ে থাকি। কী ভয়ঙ্কর রকমের সহজ সরল তার হিসেব—জীবন যদি সত্যিই এ রকম সহজ হত কী চমৎকারই না হত সবকিছু।

আমার আবার ত্রিশার কথা মনে পড়ল, আমি এখন যেরকম কষ্টে ছটফট করছি ত্রিশাও নিশ্চয়ই কোথাও ঠিক আমার মতো কষ্টে ছটফট করছে। আমি মানুষকে ভালবাসতে জানতাম না, ত্রিশা আমাকে শিখিয়েছে। আমি যখন ভালবাসতে শিখেছি তখন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি তাকে পেতে পারতাম, সেও আমাকে পেতে পারত, কিন্তু তবু আমরা একজন আরেকজনকে পেলাম না। পেলাম না কারণ ত্রিশা সত্যিকার জীবনের কথা ভেবেছে। যে জীবনে ঘুম থেকে উঠে সুড়ঙ্গ দিয়ে অতল গহ্বরে কাজ করতে যেতে হয়, দিনশেষে ক্লান্ত দেহে লম্বা লাইন দিয়ে খাবারের প্যাকেট তুলে আনতে হয়, মাসের শেষে টার্মিনালে নিজের একাউন্টে শেষ রসদটি যত্ন করে খরচ করতে হয়, শীতের রাতে বুভুক্ষের মতো আলোকোজ্জ্বল উষ্ণ দালানের দিকে হিংসাতুর চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়। ত্রিশা সে জীবন চায় নি, নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেয়েছে। সে যে জীবন চেয়েছে আমি তাকে সেই জীবন দিতে পারব না। চাইলে হয়তো পারতাম কিন্তু আমি কখনো চাই নি। তাই আমি শহরতলিতে তিন শ এগার তালায় মেঘের কাছাকাছি একটা ঘরে নির্বোধ একটা রবোটকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিই। হ্রদের কাছে পাইন গাছের আড়ালে আমার মেটে রঙের কাঠের বাসা নেই, আমার ঘরে মেগা কম্পিউটার নেই, হ্রদে নিউক্লিয়ার নৌকা নেই, বাগানে বাই ভার্বাল নেই, বাসার পিছনে নরম রোদে বসে থাকা আমার স্ত্রী নেই, ঘাসে লুটোপুটি খাওয়া আমার সন্তান নেই। আমি জানি আমার থাকবে না, ত্রিশা তাই আমার কাছে এসেও এল না।

রাতে কিটি গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে স্যুপ খেতে দেখল। খাওয়া শেষ করার পর বলল, ঠিকমতো গরম হয়েছিল?

হ্যাঁ, কিটি।

তুমি জান গতকাল স্যুপের মাঝে মাংস তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপেক্ষিক তাপও ছিল বেশি। তাই স্যুপের তাপমাত্রা ঠিক উনাশি ডিগ্রিতে পৌঁছায় নি।

উনাশি ডিগ্রি?

হ্যাঁ। তোমার বান্ধবী ত্রিশা উনাশি ডিগ্রির স্যুপ খেতে পছন্দ করে। কালকে সে স্যুপটি পছন্দ করে নি। মনে হয় সে জন্যেই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

আমি আবার একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, না কিটি। স্যুপের তাপমাত্রা উনাশি ডিগ্রি হয় নি বলে কখনো কোনো মেয়ে কাউকে ছেড়ে যায় নি।

গিয়েছে। কিটি গম্ভীর ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, আমি খবরের কাগজে পড়েছি একটা মানুষ সবুজ রঙের ট্রাউজারের সাথে লাল রঙের প্যান্ট পরেছিল বলে একটি মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সবুজ আর লাল মানুষের চোখে পরিপূরক রং, জান তো? ছেলে এবং মেয়ের ভালবাসা হলে ছোট ছোট জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।

ভালবাসা মানে তুমি বোঝ কিটি?

একটু একটু বুঝি। দুজন মানুষের টিউনিং ফ্রিকোয়েন্সি এক হওয়ার মানে ভালবাসা। রেজোনেন্স হওয়া মানে ভালবাসা।

কিটি গম্ভীর ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে থাকে। ঘাড়ের কাছে কোথাও নিশ্চয়ই একটা স্ক্রু

ঢিলে হয়ে গেছে। কয়দিন থেকেই দেখছি অল্পতেই তার মাথা বেসামালভাবে নড়তে থাকে।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুরেফিরে আমার শুধু ত্রিশার কথা মনে হল। আমি জীবনে সত্যিকার অর্থে এর আগে কখনো দুঃখ পাই নি। শৈশবে আমার মা আর বাবা আমাকে অনাথ আশ্রমে রেখে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের জন্যে আমার ভিতরে ভালবাসা বা আক্রোশ কোনোটাই নেই। অনাথ আশ্রম সম্পর্কে যেরকম ভয়ঙ্কর সব গল্প শোনা যায় তার সব সত্যি নয়। পুরোপুরি রবোটের তত্ত্বাবধানে অনাথ শিশুরা মানুষ হয় সত্যি কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যিকারের মানুষও দেখা করতে আসে। আমাদের অনাথ আশ্রমে যে মানুষটি আসতেন তিনি ছিলেন একজন মায়াবতী মহিলা। সেই মহিলাটি সপ্তাহে একবার করে এসে আমাদের সবার সাথে আলাদা করে কথা বলতেন। সত্যিকারের মানুষ খুব বেশি দেখতে পেতাম না বলে আমরা অনাথ শিশুরা একে অন্যকে খুব ভালবাসতাম। আমার এখনো অনেকের সাথে যোগাযোগ আছে। তাদের কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, শৈশবে মানুষের সাহচর্য ছাড়া বড় হলে মনে হয় মানুষের জীবনে কোথায় কী জানি ওলটপালট হয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে এক সময় সত্যি আমার চোখে ঘুম নেমে এল। ঠিক যখন ঘুমে ঢলে পড়ছি তখন কিটির গলার স্বর শুনতে পেলাম, সে আমাকে ডেকে বলল, রিকি, তুমি আজকে তোমার চিঠিগুলো দেখ নি।

আমি ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, আজ থাক, কাল ভোরে দেখব।

একটা খুব জরুরি চিঠি আছে মনে হয়। লাল রঙের বর্ডার।

থাকুক।

ইয়োরন রিসির চিঠি।

আধো ঘুমে আমি কিটির গলার স্বর ভালো করে শুনতে পেলাম না, নামটি পরিচিত মনে হল কিন্তু ধরতে পারলাম না। ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে মানুষের মস্তিষ্ক সম্ভবত স্মৃতি হাতড়ে কোনো তথ্য খুঁজে বের করতে চায় না। তা না হলে আমি ইয়োরন রিসি নাম শুনেও ঘুমিয়ে যেতে পারতাম না।

AMARBOI.COM

ইয়োরন রিসি পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক—ঈশ্বরের পর পৃথিবীতে তাকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বলে ধরা হয়।

২

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। ঘুমাতে ঘুমাতে সবসময় আমার দেরি হয়ে যায়, কখনোই আমি ভোরে উঠতে পারি না। আজ কিটি আমাকে ডেকে তুলল, পা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, রিকি, ওঠ। জরুরি দরকার।

কিটি ঠাট্টা, তামাশা, রসিকতা বা রহস্য বোঝে না। কাজেই সে যদি বলে জরুরি দরকার তার অর্থ সত্যিই জরুরি দরকার। আমি ধড়মড় করে চোখ খুলে উঠে বসলাম, কী হয়েছে?

তোমার কাছে দুজন লোক এসেছে।

কোথায়?

বসার ঘরে বসে আছে।

বসার ঘরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ।

আমি বিছানা থেকে নামলাম, কারা এরা?

বিজ্ঞান পরিষদের লোক। মনে আছে কাল রাতে তোমার কাছে ইয়োরন রিসির চিঠি এসেছিল?

কার? আমি প্রায় আর্তনাদ করে জিজ্ঞেস করলাম, কার?

ইয়োরন রিসির। বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক।

আমি চিৎকার করে বললাম, কোথায় সেই চিঠি? এতক্ষণে বলছ মানে? তোমার কপোট্রনে কি ফুটো হয়ে গেছে?

কিটি শান্ত গলায় বলল, তোমাকে আমি কাল রাতেই বলেছি। তুমি কোনো গুরুত্ব দাও নি। মনে নেই কাল তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলে? এই যে চিঠি।

আমি তার হাত থেকে চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেললাম, চিঠিটা দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক ইয়োরন রিসি নিজের হাতে বিজ্ঞান পরিষদের প্যাডে লিখেছেন,

প্রিয় রিকি :
তুমি কি কাল সময় করে আমাদের কয়েকজনের
সাথে একটু দেখা করতে পারবে?

—ইয়োরন রিসি।

আমার হাত কাঁপতে থাকে, চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থেকেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না! পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ নিজের হাতে একটা চিঠি লিখে আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন! আমার সাথে? নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। আমি কিটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম, নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে।

AMARBOI.COM

কিটি বলল, বাজে কথা বোলো না। বিজ্ঞান পরিষদ কখনো কোনো ভুল করে না। মহামান্য রিসি কখনো কোনো ভুল করেন না।

কিন্তু—কিন্তু—আমার সাথে মহামান্য রিসির কী দরকার থাকতে পারে? আমি তখনো একটা ঘোরের মাঝে রয়ে গেছি, শুকনো গলায় বললাম, কী দরকার?

এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? একটু পরেই তো জানতে পারবে। কিটি ঘুরঘুর করে পাশের ঘরে চলে গেল, সম্ভবত আমার জন্যে পরিষ্কার কাপড় জামা বের করবে। তার ভাবভঙ্গি খুব সহজ, দেখে মনে হয় বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালকের আমার সাথে দেখা করা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। নিচু স্তরের রবোটদের অবাক হবার ক্ষমতা নেই ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ করেছি।

আমি ঘুমের কাপড়েই বসার ঘরে উঁকি দিলাম, ফুটফুটে একটা মেয়ে এবং মাঝবয়সী একজন মানুষ চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। তাদের ভাবভঙ্গি খুব সপ্রতিভ। আমাকে দেখে মানুষটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম আমরা?

কী ব্যাপার! আমি শুকনো গলায় বললাম, মহামান্য রিসি কেন দেখা করতে চান আমার সাথে?

লোকটা হো হো করে হেসে বলল, আপনি সত্যিই মনে করেন মহামান্য রিসি নিজে আপনার সাথে দেখা করতে চাইবেন আর আমাদের মতো মানুষ তার কারণটা জানবে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, কিন্তু আমার সাথে?

হ্যাঁ।

যদি আমি কাল বাসায় না থাকতাম? চিঠি যদি না পেতাম?

লোকটা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, আপনি মনে করছেন মহামান্য রিসি যদি আপনার সাথে দেখা করতে চান তখন সেটা আমরা কখনো ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিই? কখনোই দিই না!

আমি—আমি কখনো এত বড় মানুষের সাথে দেখা করি নি। কী করতে হয়, কী বলতে হয় কিছুই জানি না। ভালো কাপড়ও মনে হয় নেই আমার—

সাথের মেয়েটি এই প্রথমবার কথা বলল, আপনি যেন সেসব নিয়ে মাথা না ঘামান সে জন্যেই আমরা এখানে এসেছি। মহামান্য রিসি আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন সেটা হচ্ছে বড় কথা! আপনি যেভাবে সহজ বোধ করেন ঠিক সেভাবে থাকবেন। কোনোকিছু নিয়ে এক বিন্দু মাথা ঘামাবেন না।

আর কে কে সেখানে থাকবে?

আমরা তো জানি না। আমাদের জানার কথাও না!

কোনোরকম কি কিছু আভাস দিতে পারেন?

মধ্যবয়স্ক লোকটি এবারে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, রিকি—আপনি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষদের একজন! ব্যাপারটি কী আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জানি আর যাই হোক এটা অশুভ হতে পারে না। আপনি যান, হাতমুখ ধুয়ে আসুন! একসাথে নাশতা করা যাক।

আমি ভিতরে যাচ্ছিলাম, মেয়েটা বলল, একটা চতুর্থ মাত্রার রবোট দেখলাম, আপনার রবোট এটা?

হ্যাঁ। কিটি।

কী আশ্চর্য! আমি কখনো সচল চতুর্থ মাত্রার রবোট দেখি নি। আমার ধারণা ছিল সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমি হেসে বললাম, খোঁজ পেলে কিটিকেও সরিয়ে নেবে। আমি খোঁজ দিই নি। অনেকদিন থেকে আছে তাই মায়া পড়ে গেছে।

ও! মেয়েটা মনে হল একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কোনো তাড়াহুড়া করবেন না। আমরাই আপনাকে বিজ্ঞান পরিষদে নিয়ে যাব।

AMARBOI.COM

আমরা যখন বিজ্ঞান পরিষদে পৌঁছেছি তখনো বেশ সকাল। দরজায় নানা রকম কড়াকড়ি রয়েছে, সবার রেটিনা স্ক্যান করে ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে কিন্তু আমার কিছুই করতে হল না। সাথের দুজন আমাকে ভিতরে নিয়ে এসে অন্য দুজন মানুষের কাছে পৌঁছে দিল, তারা আবার অন্য দুজনের কাছে এবং এই দুজন আমাকে বিশাল একটি হলঘরে নিয়ে হাজির হল। ঘরটির দেয়াল অর্ধস্বচ্ছ এক ধরনের পাথরের তৈরী।

ছাদটি অনেক উঁচুতে, সেখান থেকে হালকা এক ধরনের আলো বের হচ্ছে, সমস্ত ঘরে কোমল এক ধরনের আলো। ঘরে কোনো জানালা নেই, শুধু মাঝখানে বিশাল একটা কালো টেবিল। টেবিলটি ঘিরে রয়েছে খুব সুন্দর অনেকগুলো চেয়ার, সুন্দর চেয়ার সাধারণত আরামদায়ক নয় কিন্তু আমি বসে বুঝতে পারলাম চেয়ারগুলো তৈরি হয়েছে অসম্ভব যত্ন করে, বসতে ভারি আরাম।

ঘরটিতে আমি ছাড়াও আর চার জন মানুষ, দুজন মেয়ে এবং দুজন পুরুষ। সবাই মোটামুটি আমার বয়সী, দেখে মনে হয় আমার সাথে তাদের সবার এক ধরনের মিল রয়েছে, কিন্তু মিলটুকু কোথায় আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। দুজন পুরুষ মানুষের মাঝে একজন খুব ছিমছাম পরিষ্কার, মাথার চুল পরিপাটি, কাপড় জামা সুন্দর এবং মোটামুটি রুচিসম্মত। সে আরামদায়ক চেয়ারটিতে হেলান দিয়ে খুব শান্তভাবে বসে আছে। এমনিতে দেখে বোঝা যায় না কিন্তু তার চোখের দিকে তাকাতেই বোঝা যায় মানুষটি ভিতরে ভিতরে খুব উদ্বিগ্ন।

ঘরের দ্বিতীয় মানুষটির মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। গায়ের জামাকাপড় যাচ্ছেতাই এবং চেহারাতে এক ধরনের বেপরোয়া ভাব। তাকে দেখে মনে হয় কোনো কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না। মেয়ে দুজনের একজন কোমল চেহারার, রাস্তায় ছোট শিশুর হাত ধরে যেরকম কমবয়সী মায়েদের হেঁটে যেতে দেখা যায় তার চেহারা অনেকটা সেরকম। মেয়েটা ইচ্ছে করলেই একটু সেজেগুজে নিজেকে অনেকখানি আকর্ষণীয়া করে ফেলতে পারত, কিন্তু মনে হয় তার সেদিকে কোনো আগ্রহ নেই। মেয়েটি টেবিলে দুই হাত রেখে শান্ত কিন্তু উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। দ্বিতীয় মেয়েটির চেহারা খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝকঝকে। সে অস্থির এবং উদ্বিগ্ন এবং সেটা ঢেকে রাখার একটুও চেষ্টা করছে না। মেয়েটি চেয়ারে না বসে একটু পরে পরেই টেবিলটা ঘুরে আসছে, মসৃণ মার্বেল পাথরের মেঝেতে তার জুতোর শব্দ হচ্ছে ঘরটির একমাত্র শব্দ।

আমি আমার চেয়ারে বসে সবার দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝতে পারি আমাকে মহামান্য রিসি যেভাবে ডেকে এনেছেন, এদের চার জনকেও ঠিক সেভাবে ডেকে আনা হয়েছে। আমার মতোই এরা কেউ জানে না তারা কেন এখানে অপেক্ষা করছে।

ধারালো চেহারার মেয়েটি টেবিলটা আরো একবার ঘুরে এসে হঠাৎ আমার কাছে থেমে জিজ্ঞেস করল, আমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছে কেন জান?

মনে হয় আমরা যেন নিজেরা একটু কথা বলি সেজন্যে।

তাহলে কথা বলছি না কেন?

মনে হয় আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে আছি!

আমার কথা শুনে সবাই একটু হেসে ফেলল। হাসি একটি চমৎকার ব্যাপার, মানুষকে চোখের পলকে সহজ করে দেয়। হঠাৎ সবাই সহজ হয়ে গেল। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটি বলল, আমাদের এখানে কেন এনেছে তোমরা কেউ আন্দাজ করতে পার?

আমি ভেবেছিলাম সবাই মাথা নেড়ে বলবে, না, পারি না। কিন্তু কেউ সেটি বলল না, একে অন্যের দিকে তাকাল এবং সবার চোখে সূক্ষ্ম বিস্ময়ের একটু ছায়া পড়ল। সবাই কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে, ঠিক আমার মতোই! বারবার যে জিনিসটি আমার মাথায় উঁকি দিয়ে উঠছে এবং বারবার আমি যেটা জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে দিচ্ছি সেটা হয়তো সত্যি। সেটা সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র একভাবে, আমি আবার সবার দিকে ঘুরে তাকালাম এবং লক্ষ করলাম, সবাই ঠিক আমার মতোই অন্য সবার দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে, সবিস্ময়ে!

ঠিক এই সময় নিঃশব্দে একটা দরজা খুলে গেল এবং বুড়োমতো একজন ছোটখাটো মানুষ হাতে ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। মানুষটি ছোট ছোট পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে এগিয়ে এল এবং আমরা হঠাৎ করে তাকে চিনতে পারলাম, ইয়োরন রিসি! কতবার হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে এই মানুষটির ছবি দেখেছি কিন্তু কখনোই ভাবি নি তিনি এ রকম ছোটখাটো মানুষ। কেন জানি না ধারণা ছিল তিনি হবেন বিশাল, তার চেহারা হবে

AMARBOI.COM

কান্তিময়, গায়ের রং হবে উজ্জ্বল, তার পোশাক হবে বর্ণময়—কিন্তু তিনি একেবারে সাধারণ চেহারার মানুষ। কিন্তু তাকে দেখে আমার আশাভঙ্গ হল না বরং বুকের ভিতরে আমি এক ধরনের গভীর ভালবাসা অনুভব করতে থাকি। আমার এক ধরনের অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চ হতে থাকে।

ইয়োরন রিসি টেবিলের কাছে এসে থেমে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে কী! তোমরা সবাই এত দূরে দূরে বসেছ কেন? এস কাছাকাছি এস। এখানে এত বড় একটা টেবিল রাখাই ভুল হয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটুতে একটা চোট খেলাম। সে অবস্থাতেই তার যতটুকু কাছে গিয়ে বসা সম্ভব সেখানে বসে গেলাম। এই মানুষটির পাশে বসা দূরে থাকুক কোনোদিন নিজের চোখে দেখব ভাবি নি।

ইয়োরন রিসি আমাদের দিকে তাকালেন। তার মুখে এক ধরনের হাসি, দুষ্টু ছেলের দুষ্টুমি ধরে ফেলে সহৃদয় বাবারা যেভাবে হাসে অনেকটা সেরকম। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি ইয়োরন রিসি। তোমরা কারা পরিচয় দিতে হবে না, আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালো করে চিনি।

আমরা পাঁচ জন অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। আমাদের বিস্ময়টুকু মনে হয় তিনি খুব উপভোগ করলেন, হা হা করে হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তোমাদের? এই দেখ আমি ঠিক বলি কি না—

ইয়োরন রিসি দাড়িগোঁফে ঢাকা জঙ্গুলে চেহারার মানুষটিকে দেখিয়ে বললেন, তুমি হিশান। তুমি একটা ব্যাংকে চাকরি কর। ছোট্ট চাকরি, তোমার কাজে মন নেই। উপরওয়ালা দুদিন পরে পরে তোমাকে হুমকি দিয়ে বলে তোমাকে ছাঁটাই করে দেবে। শীতের শুরুতে তুমি দাড়িগোঁফ রাখা শুরু কর, বসন্তের শেষে যখন একটু গরম পড়তে শুরু করে তখন তুমি দাড়িগোঁফ চুল কামিয়ে পুরোপুরি ন্যাড়া হয়ে যাও। ঠিক কি না, হিশান?

হিশান নামের মানুষটি হেসে ফেলল। দাড়িগোঁফে আড়াল হয়ে থাকা মুখ থেকে সহৃদয় হাসিটি বের হতেই আমরা হঠাৎ করে টের পেলাম মানুষটি দেখে তিরিক্ষে বদমেজাজি মনে হলেও সে নেহাতই ভালো মানুষ।

ইয়োরন রিসি এবারে ছিমছাম পরিষ্কার মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ইগা। তোমার একটা গোপন ল্যাবরেটরি আছে সেখানে তুমি বিসুবিচারিয়াস বানাও। খোলাবাজারে মোটামুটি ভালো দামে বিক্রি হয়, এত মজার নেশা আর কি আছে?

ইগার মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইয়োরন রিসি হা হা করে হেসে তার প্যাকেটটা তুলে বললেন, তুমি ভাবছ কেউ জানে না? এই দেখ আমার কাছে তোমার কত বড় ফাইল!

ইগা নামের মানুষটি কী একটা কথা বলতে গেল, ইয়োরন রিসি তার কাঁধ স্পর্শ করে থামিয়ে দিয়ে চোখ মটকে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই ইগা। পুলিশ কোনোদিন তোমাকে ধরবে না। আমি আছি তোমার পিছনে।

ইগা ভয়ে ভয়ে ইয়োরন রিসির দিকে তাকাল, এখনো সে ঠিক বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। বেশ দ্রুত তার মুখ থেকে ভয়ের চিহ্ন কেটে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। ইয়োরন রিসি এবারে ঘুরে কোমল চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি নুবা। তুমি দক্ষিণের পাহাড়ি অঞ্চলে একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়াও। তোমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে ইতিহাস। ছুটির দিনে তুমি হেঁটে হেঁটে একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাক। তুমি যে গ্রামে থাক সেখানকার সবাই তোমাকে খুব পছন্দ করে, যদিও

তাদের অনেকের ধারণা ভালো ওষুধপত্র খেলে তোমার চুপচাপ একা একা বসে থাকার রোগ ভালো হয়ে যাবে।

ইয়োরন রিসির সাথে সাথে আমরাও হেসে উঠলাম। তিনি হাসি থামিয়ে এবার খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝকমকে চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি য়োমি। একটা খবরের কাগজের অফিসে কাজ কর। অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ, ভিডিও সেন্টারে বসে থাকা, লোকজনের যার যত সমস্যা আছে, অভিযোগ আছে তোমার কাছে বলে। মাঝে মাঝেই কিছু খ্যাপা গোছের মানুষ বের হয়ে যায়—তোমাকে খামখাই যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে। তুমি গত দুই বছর থেকে ভাবছ এই কাজ ছেড়ে দেবে কিন্তু তবু ছাড়ছ না।

ইয়োরন রিসি এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি রিকি। তোমার বন্ধুবান্ধব খুব বেশি নেই। তোমার অনেকদিনের ভালবাসার মেয়েটিও গতকাল তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার ধারণা তোমার জীবন নিয়ে খুব উচ্চাশা নেই। সত্যি কথা বলতে কী তোমার পরিচিতদের সবারই তাই ধারণা। এখানে অন্য চার জন কিছু-না-কিছু কাজ করে, তুমি কিছুই কর না। তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হচ্ছে চার মাত্রার একটা রবোট!

ইয়োরন রিসি আবার হা হা করে হাসলেন এবং অন্য সবাই সেই হাসিতে যোগ দিল। চার মাত্রার একটি রবোটের সাথে একজন মানুষের বন্ধুত্ব হতে পারে সেটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়—ঠাট্টা করে বলা হয়েছে। ইয়োরন রিসি সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, আমি কি কারো সম্পর্কে ভুল কিছু বলেছি?

আমরা মাথা নাড়লাম, না।

তোমাদের এই পাঁচ জনকে আমি এখানে কেন এনেছি জান?

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। ইয়োরন রিসি নরম গলায় বললেন, তোমাদের জানার কথা নয়, কিন্তু আমি নিশ্চিত তবু তোমরা জান। কারণ তোমরা কেউ সাধারণ মানুষ নও। তোমরা প্রত্যেকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষদের একজন। ঈশ্বর সম্ভবত নিজের হাতে তোমাদের মস্তিষ্কের নিউরোন সেলগুলো একটি একটি করে সাজিয়েছেন। তোমাদের মস্তিষ্কের যে ক্ষমতা—একজন মানুষের মস্তিষ্ক কেমন করে সেরকম ক্ষমতাশালী হতে পারে সেটা একটা রহস্য।

ইয়োরন রিসি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমরা নিজেরা জান যে তোমরা সাধারণ মানুষ নও। তোমাদের প্রত্যেকে অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ কিন্তু তোমরা সেটা প্রাণপণে সবার কাছে গোপন করে রাখ। শুধু যে অন্যদের কাছে গোপন রাখ তাই নয়, অনেক সময় তোমরা তোমাদের নিজেদের কাছে পর্যন্ত গোপন করে রাখ। কেন সেটা কর আমাদের কাছে, বিজ্ঞান পরিষদের কাছে তা একটা মস্ত বড় রহস্য। ইচ্ছে করলেই তোমরা পৃথিবীর যত সম্পদ, যত সম্মান, ভালবাসা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবকিছু পেতে পার। কিন্তু তোমরা সেটা চাও না। হিশান একটা ব্যাংকে কষ্ট করে কাজ কর, ইগা জেলে যাবার ঝুঁকি নিয়ে নেশার ওষুধ তৈরি কর, নুবা একটা স্কুলে পড়াও, য়োমি খবরের কাগজের অফিসে খ্যাপা মানুষদের অভিযোগ শুনে সময় কাটাও, রিকি ভালবাসার মেয়েটিকে ছেড়ে চলে যেতে দাও। কেন এটা কর আমরা কেউ জানি না। মনে হয় কোনোদিন জানবও না। মানুষের মন খুব বিচিত্র—একে কেউ বোঝে না। আমরা তাই তোমাদের কখনো বিরক্ত করি নি। তোমাদের একটু চোখে চোখে রেখেছি, একটু আগলে রেখেছি কিন্তু কখনোই তোমাদের স্বাধীন জীবনে হাত দিই নি। কখনো না।

AMARBOI.COM

ইয়োরন রিসি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভেবেছিলাম কখনো দেব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। তোমাদের মতো মানুষদের একটা ছোট লিস্ট আছে আমার কাছে। সেখান থেকে বেছে বেছে আমি তোমাদের পাঁচ জনকে আজ এখানে ডেকে এনেছি। কেন ডেনে এনেছি জান?

হিশান তার লম্বা চুলে হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমাদের একটা সমস্যা সমাধান করতে হবে?

ইয়োরন রিসি মাথা নাড়লেন— হ্যাঁ। কী সমস্যা বলতে পারবে?

ইগা বলল, কঠিন কোনো সমস্যা? যার সাথে—

যার সাথে?

যার সাথে পৃথিবীর অস্তিত্ব জড়িত?

হ্যাঁ। হঠাৎ করে ইয়োরন রিসির মুখ কেমন জানি বিষণ্ন হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বললেন, পৃথিবীর খুব বিপদ। খুব বড় বিপদ।

তিনি হঠাৎ ঘুরে নুবার দিকে তাকিয়ে বললেন, নুবা তুমি বলতে পারবে কী বিপদ?

আমি?

হ্যাঁ।

আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছেন তার মানে এর সাথে ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার যোগাযোগ আছে।

ইয়োরন রিসি কোনো কথা বললেন না, আমি দেখতে পেলাম হঠাৎ করে নুবার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে কাঁপা গলায় বলল, শ্যালক্স গ্রুন ফিরে এসেছে?

ইয়োরন রিসি অত্যন্ত বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ নুবা। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য শ্যালক্স গ্রুন গত সপ্তাহে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে।

আমি হঠাৎ আতঙ্কের একটা শীতল স্রোতকে মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যেতে অনুভব করলাম।

AMARBOI.COM

৩

শৈশবে আমি যখন অনাথ আশ্রমে ছিলাম তখন রাত্রিবেলা আমরা ঘুমাতে দেরি করলে আমাদের শ্যালক্স গ্রুনের ভয় দেখানো হত। শ্যালক্স গ্রুন মানুষটা কে, কেন তার নাম শুনে আমাদের ভয় পেতে হবে আমরা তার কিছুই জানতাম না। কিন্তু সত্যি সত্যি ভয়ে আমাদের হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। একটু বড় হয়ে শ্যালক্স গ্রুনের সত্যিকার পরিচয় জেনেছি। অসাধারণ প্রতিভাবান এবং সম্পূর্ণ ভালবাসাহীন একজন মানুষ। কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে পৃথিবীর যা–কিছু সুন্দর তার সবকিছুতে মানুষটির এক ভয়ঙ্কর একরোখা আক্রোশ। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে সে এক ধরনের ভাইরাস বের করেছে যার বিরুদ্ধে মানুষের কোনো ধরনের প্রতিরক্ষা নেই। ভাইরাসটির নাম লিটুমিনা–৭২, বাতাসে ভেসে সেটি ছড়িয়ে পড়তে পারে, বিজ্ঞানীদের ধারণা ছোট একটা কাচের এম্পুল ভরা মানুষের রক্তে যে পরিমাণ লিটুমিনা–৭২ নেয়া সম্ভব সেটা দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে একাধিকবার মেরে ফেলা যায়। বাতাস কোনদিকে বইছে তার ওপর নির্ভর করবে কতটুকু সময়ে পুরো পৃথিবী প্রাণহীন হয়ে যাবে। শ্যালক্স গ্রুনের এই ভাইরাসটির প্রতি গভীর মমতা ছিল। একদিন সে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গোপন ভল্ট থেকে এই ভাইরাসের নমুনার বোতলটি নিয়ে

অদৃশ্য হয়ে গেল। যাবার আগে সে বলে গিয়েছিল পৃথিবীর ওপরে সে পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে—তাকে নিজের হাতে ধ্বংস করা থেকে বেশি আনন্দ আর কিছুতে সে পাবে না। সে ইচ্ছে করলেই এই আনন্দ পেতে পারে, তার কাছে যথেষ্ট লিটুমিনা-৭২ রয়েছে, কিন্তু এই পৃথিবী এত নিচু স্তরে রয়ে গেছে যে সেটিকে ধ্বংস করায় কোনো আনন্দ নেই। তাই সে ভবিষ্যতে পাড়ি দিচ্ছে, হয়তো পৃথিবী খানিকটা উন্নত হবে, তখন সেটাকে ধ্বংস করা মোটামুটি একটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারে।

পৃথিবীর মানুষ তারপর আর কখনো শ্যালক্স গ্রুনকে দেখে নি। সত্যি সত্যি সে ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়েছে সেটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। গবেষণাগারে ছোটখাটো জিনিসকে সময় পরিভ্রমণ করে কিছু দূরত্ব নেয়া যায়, কিন্তু তাই বলে সত্যিকারের একজন মানুষ কোনো এক ধরনের সময়-পরিভ্রমণ-যানে সুদূর ভবিষ্যতে চলে যাবে সেটি সে-সময়ের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিতে কিছুতেই সম্ভব হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু শ্যালক্স গ্রুন সেই অসম্ভব ব্যাপারটিকে সম্ভব করেছিল, ঠিক কীভাবে করেছিল সেটাও একটি রহস্য।

শ্যালক্স গ্রুন অদৃশ্য হওয়ার পর প্রায় এক শ বছর পার হয়ে গেছে। এই এক শ বছরে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বিজ্ঞানের বড় কোনো আবিষ্কার হয় নি সত্যি কিন্তু প্রযুক্তির জগতে অনেক যুগান্তকারী উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানের একটা বড় অংশ তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেছে শ্যালক্স গ্রুনের আক্রোশ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে। পৃথিবী কতটুকু প্রস্তুত কেউ জানে না, ইয়োরন রিসির কথা শুনে মনে হল হয়তো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। যদি প্রস্তুত থাকত তাহলে কি আমাদের এভাবে ডেকে একত্র করাতেন?

আমি কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন একটা বড় দরজা খুলে গেল এবং মিলিটারি পোশাক পরা কয়েকজন মানুষ প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল। তারা ইয়োরন রিসির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে, আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কিছু একটা বলবে কিন্তু তারা কিছু বলল না। সামরিক বাহিনীতে নানা ধরনের হাস্যকর নিয়মকানুন থাকে, সম্ভবত ইয়োরন রিসি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তাদের নিজেদের মুখ ফুটে কিছু বলার কথা নয়।

ইয়োরন রিসি মাথা ঘুরিয়ে মিলিটারি পোশাক পরা মানুষগুলোকে এক নজর দেখে বললেন, কী হয়েছে জেনারেল ইকোয়া? তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে।

আপনাকে একটা খবর দিতে হবে মহামান্য রিসি।

কী খবর?

প্রজেক্ট গ্রুন নিয়ে খুব জরুরি একটা খবর। আপনি কিছুক্ষণের জন্যে কি কন্ট্রোলরুমে আসতে পারবেন মহামান্য রিসি?

ইয়োরন রিসি খানিকক্ষণ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলে বললেন, এখানেই বল।

জেনারেলটি একবার চোখের কোনা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলল, এটি গোপনীয়তার মাত্রায় সাত নম্বর। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলার কথা নয়।

ইয়োরন রিসি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, আমি প্রজেক্ট গ্রুনের দায়িত্ব এই পাঁচ জনের হাতে তুলে দিচ্ছি জেনারেল ইকোয়া। তুমি নির্দ্বিধায় এদের সামনে বলতে পার।

ইলেকট্রনিক শক খেলে মানুষ যেভাবে চমকে ওঠে, জেনারেল ইকোয়া অনেকটা সেভাবে চমকে উঠল। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ইয়োরন রিসির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার

ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন মহামান্য রিসি। কিন্তু আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত? এর ওপরে পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

আমি জানি জেনারেল ইকোয়া। আমি নিশ্চিত। তুমি বল।

জেনারেল ইকোয়া একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল জিক্লো শ্যালক্স গ্রুনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শ্যালক্স গ্রুন তাকে মেরে ফেলেছে মহামান্য রিসি।

ইয়োরন রিসির মুখ হঠাৎ কেমন যেন দুঃখী মানুষের মতো হয়ে যায়। বিষণ্ন মুখে অনেকটা আপন মনে বললেন, মেরেই ফেলল? আহা রে!

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, কেন মেরেছে জান?

জানি।

কেন?

শ্যালক্স গ্রুনের ধারণা জেনারেল জিক্লো—জেনারেল ইকোয়া হঠাৎ থেমে যায়, তার মুখে এক ধরনের অপমান এবং ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

জেনারেল জিক্লো?

তার ধারণা জেনারেল জিক্লোর বুদ্ধিমত্তা খুব নিচু স্তরের। সে বলেছে, তার সাথে কথা বলার জন্যে এ রকম নির্বোধ একটা প্রাণী পাঠানোতে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে। ভবিষ্যতে এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি সে নাকি সহ্য করবে না।

তাই বলেছে?

হ্যাঁ। বলেছে জেনারেল জিক্লোকে হত্যা করে সে পৃথিবীর একটা নির্বোধ মানুষ কমিয়ে দিয়ে পৃথিবীর ছোট একটা উপকার করেছে।

ইয়োরন রিসি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,. জেনারেল জিক্লোর মৃতদেহ সমাহিত করার ব্যবস্থা কর।

করা হয়েছে মহামান্য রিসি।

আমি তার স্ত্রীর সাথে একটু দেখা করতে চাই। তাকে আমি কী বলে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না।

জেনারেল ইকোয়া কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। ইয়োরন রিসি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর কিছু বলবে?

আমরা কি এই হত্যাকাণ্ডের খবরটি গোপন রাখব? নাকি প্রচারিত হতে দেব?

আমি সেই সিদ্ধান্তটি নেব না জেনারেল ইকোয়া।

তাহলে কে নেবে মহামান্য রিসি?

এই পাঁচ জন। পৃথিবীর স্বার্থে আমার ওপর যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেই ক্ষমতার অধিকারে আমি এই পাঁচ জনকে প্রজেক্ট গ্রুনের পুরো দায়িত্ব দিতে চাই। ইয়োরন রিসি হঠাৎ ঘুরে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন, তোমরা কি সেই দায়িত্ব নেবে?

আমার মনে হল বুকের ভিতর আমার হৃৎপিণ্ডটি বুঝি এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল, আমি অন্যদের দিকে তাকালাম, তাদের মুখও রক্তশূন্য হয়ে আছে। আমরা চেষ্টা করে নিজেদের স্বাভাবিক করে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। ইয়োরন রিসি মাথা নেড়ে বললেন, আনুষ্ঠানিকতার কারণে তোমাদের কথাটি মুখে উচ্চারণ করতে হবে। তোমরা এক জন এক জন করে বল।

ইয়োরন রিসির চোখ সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এসে আমার ওপর স্থির হল। তিনি

AMARBOI.COM

বললেন, রিকি?

আমি নিচু গলায় বললাম, মহামান্য রিসি আপনি যদি সত্যি বিশ্বাস করেন আমি এই দায়িত্ব নিতে পারব তাহলে আমি এই দায়িত্ব নেব।

আমি বিশ্বাস করি। তুমি নেবে?

নেব মহামান্য ইয়োরন রিসি।

তুমি এই পৃথিবীকে রক্ষা করবে রিকি?

আমি—আমি চেষ্টা করব।

ইয়োরন রিসি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকালেন, কী আশ্চর্য স্বচ্ছ তার চোখ, কী ভয়ঙ্কর তীব্র তার দৃষ্টি! আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই পৃথিবীকে রক্ষা করবে রিকি?

আমি পৃথিবীকে রক্ষা করব মহামান্য রিসি—কথাটি বলতে গিয়ে হঠাৎ আমার বুক কেঁপে গেল। এত বড় একটি কথা বলার শক্তি আমি কোথায় পেলাম?

ইয়োরন রিসি গভীর ভালবাসা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ঘুরে তাকালেন আমার পাশে বসে থাকা য়োমির দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, য়োমি তুমি কি এই দায়িত্ব নেবে? তুমি কি পৃথিবীকে রক্ষা করবে?

য়োমি কাঁপা গলায় বলল, আমি এই দায়িত্ব নেব মহামান্য রিসি। আমি—আমি এই পৃথিবীকে রক্ষা করব।

ইয়োরন রিসি তারপর ঘুরে তাকালেন নুবা ইগা আর হিশানের দিকে, তাদের ঠিক একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, তারা ঠিক একই উত্তর দিল কাঁপা গলায়। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তার চেয়ার থেকে, হাতের ব্যাগটি খুলে সেখান থেকে লাল রঙের চতুষ্কোণ কয়েকটা কার্ড বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, রেখে বললেন, এখানে পাঁচটা লাল কার্ড রয়েছে। তোমাদের পাঁচ জনের জন্যে। পৃথিবীতে সব মিলিয়ে এক শ বার জনের এই লাল কার্ড রয়েছে, তোমাদের নিয়ে হল এক শ সতের।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেনারেল ইকোয়া একটা আর্ত শব্দ করল, মনে হল তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়, তার সাথে অন্য সবাই। আমাদের বুঝতে একটু সময় লাগল যে এটি এক ধরনের বাধ্যতামূলক সম্মান প্রদর্শন। সামরিক বিভাগে এ ধরনের অসংখ্য অর্থহীন নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম এবং নুবা সবার আগে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনারা সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন।

জেনারেল ইকোয়া এবং অন্য সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। হিশান নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, ভবিষ্যতে আপনাদের কারো এ রকম হাস্যকর ভঙ্গিতে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমরা এতে অভ্যস্ত নই।

আমরা মাথা নাড়লাম এবং আমাদের সাথে সাথে জেনারেল ইকোয়া এবং তার সঙ্গীরা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। তাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।

ইয়োরন রিসি হঠাৎ নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে এখনই যেতে হবে। বিজ্ঞান পরিষদের একটা খুব জরুরি মিটিং আছে।

তিনি তখন এগিয়ে এসে এক জন এক জন করে আমাদের সাথে হাত মেলালেন, তাকে দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু তার হাত লোহার মতো শক্ত। তারপর আমাদের একবার

অভিবাদন করে হেঁটে হেঁটে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, তার পিছু পিছু হতচকিত জেনারেল ইকোয়া এবং তার সঙ্গীরা।

সবাই চলে যাবার পর আমরা বিশাল ঘরে একটি কালো টেবিলকে ঘিরে চুপচাপ বসে রইলাম। আমাদের সামনে টেবিলে পাঁচটি লাল কার্ড, দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই কিন্তু আমরা জানি এই কার্ডগুলো স্পর্শ করা মাত্র আমাদের জীবন হঠাৎ করে পুরোপুরি পাল্টে যাবে। আমরা কেউই সেটা চাই নি কিন্তু আমাদের কারো কিছু করার নেই।

আমাদের মাঝে সবচেয়ে প্রথম কথা বলল নুবা। নরম গলায় বলল, আমাদের হাতে মনে হয় কোনো সময় নেই। কাজ শুরু করে দেয়া দরকার।

হ্যাঁ। হিশান তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, কাজ শুরু করে দেয়া দরকার। যখন কী করতে হবে কিছুই জানি না তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে দেয়া দরকার।

য়োমি একটু এগিয়ে এসে বলল, কিন্তু ঠিক কীভাবে শুরু করব।

আমি একটা লাল কার্ড নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললাম, লাল কার্ড দিয়ে শুরু করা যাক।

কার্ডটিকে স্পর্শ করা মাত্র একটা বিচিত্র শব্দ করে তার মাঝে থেকে একটা নীল রঙের আলো বের হয়ে এল। নিশ্চয়ই কার্ডটি আমার ব্যবহারের উপযোগী করার জন্যে প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। লাল কার্ডের মাঝে একটা মেগা কম্পিউটার রয়েছে, পৃথিবীর ভিতরে এবং বাইরে সবগুলো ডাটাবেসে যোগাযোগ করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ আলাদা করে রাখা আছে। মহাকাশের সবগুলো মূল উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে প্রবেশ করে তার যে-কোনো তথ্য দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই ছোট লাল কার্ডটিকে প্রয়োজন হলে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, অন্যান্য জিনিসের মাঝে এই কার্ডটির মাঝে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

আমি অভিভূত হয়ে কার্ডটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাম পাশে ছোট একটা চৌকোণো অংশে দ্রুত নানা ধরনের ছবি ভেসে আসতে শুরু করেছে, বেশিরভাগই হলোগ্রাফিক ত্রিমাত্রিক ছবি। কার্ডের ডান পাশের কিছু বিন্দু থেকে উজ্জ্বল কিছু আলোর ঝলকানি দেখা গেল। ছোট একটা স্পিকার থেকে তীক্ষ্ণ একটানা কিছু শব্দ ভেসে আসছিল, শব্দের কম্পন কমে এসে হঠাৎ সেটি নীরব হয়ে যায়, চতুষ্কোণ অংশটিতে হঠাৎ আমার নিজের একটা ছবি ভেসে ওঠে। আমি কার্ডটি ধরে অন্যদের দেখিয়ে বললাম, আমার কার্ডটি মনে হয় প্রস্তুত হয়ে গেছে।

অন্যরাও তখন হাত বাড়িয়ে একটা করে কার্ড তুলে নেয় এবং মুহূর্তে নীল আলোর ঝলকানি দিয়ে কার্ডগুলো কাজ শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই এই ঘরটির মাঝে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হবে। পাঁচ জন লাল কার্ডের অধিকারী মানুষ একটি ঘরে একত্র হবে।

আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে পড়ল। আমি লাল কার্ডের অধিকারী হব জানলে ত্রিশা কি আমাকে ছেড়ে চলে যেত? আমার ঠিক ইচ্ছে ছিল না কিন্তু হঠাৎ আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না।

আমি দীর্ঘশ্বাসটি কেন ফেলেছি তারা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে কিন্তু কেউ সেটা প্রকাশ করল না। য়োমি লাল কার্ডটির দিকে তাকিয়ে বলল, সবার আগে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যতটুকু সম্ভব। শ্যালক্স গ্রুন সম্পর্কে আমাদের সবকিছু জানতে হবে।

হিশান ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু সেটা কি সম্ভব? একজন মানুষ সম্পর্কে কি কখনো

সবকিছু জানা যায়?

নুবা মাথা নেড়ে বলল, তা যায় না, কিন্তু চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। মানুষটাকে খানিকটা বুঝতে হবে। কী ধরনের মানুষ, বুদ্ধিমত্তা কতটুকু, কী রকম চরিত্র, দুর্বলতাটুকু কোথায়—

ইগা মাথা নেড়ে বলল, উঁহুঁ, মানুষকে কখনো বোঝা যায় না। যারা আমাকে চেনে তাদের সবার ধারণা আমি অত্যন্ত সৎ নীতিবান মানুষ। কিন্তু আমি মোটেই সৎ এবং নীতিবান নই। তোমরা তো নিজেরাই শুনলে আমার মাদকদ্রব্যের গোপন কারখানা আছে।

য়োমি সরু চোখে বলল, কিন্তু সেটা তো গোপন নেই। মহামান্য রিসি নিজে বলেছেন সেটা অনেকেই জানে।

তা ঠিক, ইগা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু আমার চরিত্রে আরো অনেক কিছু আছে যেটা কেউ জানে না। যেটা আমি চাই না কেউ জানুক।

হিশান মাথাটা একটু এগিয়ে এনে বলল, কিন্তু আমাদের তো কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। শ্যালক্স গ্রুন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। আমার মনে হয় আমরা অন্য যে-কোনো মানুষ থেকে তথ্যগুলো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব।

য়োমি কোনো কথা না বলে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। নুবা বলল, তথ্য সংগ্রহ করা বিশ্লেষণ করায় তো কোনো ক্ষতি নেই।

ইগা ভুরু কুঁচকে বলল, ক্ষতি আছে।

কী ক্ষতি?

এক টুকরা ভুল তথ্য তোমাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। বিশেষ করে শ্যালক্স গ্রুনের মতো ধূর্ত মানুষ—

য়োমি সরু চোখে বলল, তাহলে তুমি আমাদের কী করতে বল?

ইগা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি জানি না।

নুবা হেসে বলল, জানি না বললে তো হবে না। কিছু একটা বলতে হবে।

ইগা আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, শুধু আমাকে বলছ কেন? রিকি এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি—

সবাই তখন আমার দিকে তাকাল। নুবা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই তুমি কিছু বল নি। কিছু একটা বল।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, আসলে এ ধরনের ব্যাপারে আমি কখনো কোনোভাবে অংশ নিই নি। কীভাবে শুরু করতে হয় আমার কোনো ধারণা নেই। আমি মোটামুটি ঘরে বসে বসে দিন কাটিয়েছি।

আমার কথা শুনে হঠাৎ সবাই তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল। নুবার চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে। আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, সত্যি তুমি কখনো কোনো প্রজেক্টে অংশ নাও নি?

না।

নুবা ঘুরে অন্যদের দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে সবাই কমবেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইগা টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বলল, চমৎকার!

আমি বললাম, কী চমৎকার?

তোমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সেটা।

ইগা কী বলতে চাইছে আমি সেটা হঠাৎ আঁচ করতে পারি। ইয়োরন রিসি আমাকে যে এই দলটিতে এনেছেন সেটাই কি তার কারণ?

হিশান তার দাড়ির মাঝে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাহলে তোমার মুখেই শুনি। তোমার যেহেতু কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তুমি এই সমস্যাটিকে একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবে। তুমি বল আমরা কীভাবে শুরু করব।

আমি?

হ্যাঁ, তুমি।

আমার মনে হয় আমাদের শ্যালক্স গ্রুনের সাথে দেখা করা উচিত।

হঠাৎ করে সবাই স্থির হয়ে গেল, মনে হল ঘরে যদি একটা সুচও পড়ে সেটা শোনা যাবে। আমি সবার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, আমাকে যদি সত্যি জিজ্ঞেস কর তাহলে আমি সেটাই বলব। তার সম্পর্কে কোনোরকম খোঁজখবর না নিয়ে, কোনোরকম তথ্য বিশ্লেষণ না করে তার সাথে দেখা করা। সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত মানুষের সাথে যেভাবে দেখা করা হয়—সেভাবে।

ইগা খুব ধীরে ধীরে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়তে থাকে, অন্য কেউ কোনো কথা বলে না। য়োমি হঠাৎ টেবিলে হাত রেখে বলল, কেন?

তার সম্পর্কে জানার জন্যে।

তুমি কেন মনে কর তার সাথে দেখা করলে তুমি তার সম্পর্কে জানতে পারবে?

কারণ সে একজন মানুষ। অসম্ভব ধূর্ত মানুষ। ডাটাবেসে তার সম্পর্কে যেসব তথ্য থাকবে সেটা কখনোই সম্পূর্ণ তথ্য হবে না। একজন মানুষ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, কখনো তথ্য দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না। তাকে বুঝতে হলে সম্ভবত অন্য আরেকজন মানুষ দরকার।

নুবা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল, আমি কথা শেষ করতেই বলল, আমার মনে হয় রিকি ঠিকই বলেছে।

ইগাও মাথা নাড়ল, হ্যাঁ আমাদের একজন যদি তার সাথে দেখা করে কথা বলে ফিরে আসতে পারি, সম্ভবত মানুষটা সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা হবে। রিকি ঠিকই বলেছে। য়োমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইগার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চিত?

ইগা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, আমি নিশ্চিত।

য়োমি মাথা নেড়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি না।

কী বিশ্বাস কর না?

যে একজন মানুষের সাথে কথা বলে তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়।

একজন সাধারণ মানুষ যদি কথা বলে সে হয়তো কিছু জানবে না। কিন্তু ব্যাপারটা অস্বীকার করে তো লাভ নেই—আমরা কেউই সাধারণ মানুষ নই।

য়োমির চোখ দুটি হঠাৎ কেমন জানি জ্বলজ্বল করে ওঠে, খানিকক্ষণ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি আমাকে আগে কখনো দেখ নি কাজেই আমার সম্পর্কে কিছু জান না। এখন কিছুক্ষণ হল তুমি আমার সাথে কথা বলেছ—তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছ? তুমি সেটা বল, দেখি সত্যি বলতে পার কি না।

নুবা, ইগা এবং হিশান একটু অবাক হয়ে এবং বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হঠাৎ বিব্রত অনুভব করতে থাকি, কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে

বললাম, আমার মনে হয় না সেটা ঠিক হবে য়োমি।

কেন?

কারণ তুমি হয়তো পছন্দ করবে না।

কেন পছন্দ করব না?

একজন মানুষের চরিত্রের অনেক দিক থাকে। যেটা সহজেই প্রকাশ হয়ে যায় সেটা প্রায় সময়েই হয় দুর্বল দিক। সেটা তার মূল চরিত্র নাও হতে পারে।

তবু তুমি বল, আমি জানতে চাই। আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি, এখানে ভুল করার কোনো জায়গা নেই। তুমি সত্যিই আমার চরিত্রের কথা বলতে পার কি না তার ওপর নির্ভর করছে আমরা কী করব। এখানে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কোনো গুরুত্ব নেই। তুমি বল।

বেশ। আমি একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, তোমার ভিতরে প্রতিযোগিতার একটা ভাব আছে য়োমি, তোমার প্রখর বুদ্ধিমত্তা তুমি কেন আড়াল করে রেখেছ সেটা একটা রহস্য। তোমার অনুভূতি খুব চড়া সুরে বাঁধা—

এসব কথা অর্থহীন। য়োমি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার সম্পর্কে কোনো তথ্য বল।

আমি য়োমির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললাম, তুমি একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। তুমি অপরাধ করতে সক্ষম। তোমার লাল কার্ড ব্যবহার করে তুমি কোনো একজনকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছ। সম্ভবত মানুষটি তোমার শৈশবের কোনো ভালবাসার মানুষ। আমার ধারণা তুমি অতীতে কোনো বড় অপরাধ করেছ।

য়োমির মুখ মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল। আমি মৃদু স্বরে বললাম, তোমাকে আমাদের সাথে কাজ করতে দেয়া কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। আমার মনে হয় অনেক ভেবেচিন্তে দেয়া হয়েছে। শ্যালক্স গ্রুনের মস্তিষ্ক কেমন করে কাজ করবে সেটা সবচেয়ে ভালো বুঝবে তুমি। আমার ধারণা—

য়োমি প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে রিকি তোমাকে আর বলতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

আমি, আমি কি ভুল বলেছি?

য়োমি নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, না। তুমি কেমন করে বলেছ আমি জানি না। এটি—এটি প্রায় অসম্ভব।

অসম্ভব নয় য়োমি। তুমি যেভাবে লাল কার্ডটি হাতে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়েছিলে দেখে যে কেউ বলতে পারবে তুমি এটা দিয়ে কাউকে শাস্তি দেবে। তোমার চোখে যে ঈর্ষার ছায়া ফুটে উঠেছিল সেটা দেখে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না, কোনো একজন ভালবাসার মানুষ তোমাকে ছেড়ে গেছে, তুমি যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছ সেই দৃষ্টি থেকে—

নুবা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, রিকি, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করেছি। তুমি সম্ভবত একজন মানুষকে খুব ভালো বুঝতে পার, যেটা আমরা পারি না।

হিশান আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার ধারেকাছে থাকতে চাই না!

সবাই জোর করে একটু হেসে ব্যাপারটা একটু হালকা করে দেয়ার চেষ্টা করে তবুও পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে হয়ে থাকে। খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না, ইগা

খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের নখকে লক্ষ করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে বলল, তাহলে কি রিকি যাবে শ্যালক্স গ্রুনের সাথে দেখা করতে?

যদি রিকির আপত্তি না থাকে।

না, আমার আপত্তি নেই। আমি মাথা নেড়ে বললাম, সত্যি কথা বলতে কী লোকটিকে দেখার আমার অসম্ভব কৌতূহল হচ্ছে!

কিন্তু তুমি জান ব্যাপারটি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

নুবা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ভয় করছে না রিকি?

হ্যাঁ করছে। কিন্তু কী করা যাবে?

হিশান বলল, জেনারেল জিক্লোকে মেরে ফেলেছে কারণ মানুষটি নাকি নির্বোধ ছিল। অন্তত‌পক্ষে রিকিকে সে দোষ দিতে পারবে না।

ইগা য়োমির দিকে তাকিয়ে বলল, য়োমি, তোমার কী মনে হয়?

য়োমির চোখ হঠাৎ করে জ্বলজ্বল করে ওঠে, মনে হল রেগে কিছু একটা করবে। কিন্তু করল না, কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, সত্যি আমার কী মনে হয় জান?

কী?

আমার মনে হয় রিকির জীবন্ত ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম। শ্যালক্স গ্রুন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ—আমার মতোই। রিকি যদি তার সাথে কথা বলে কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জেনে যায় সাথে সাথে তাকে মেরে ফেলবে।

তুমি সত্যিই তাই মনে কর?

হ্যাঁ। আমি শ্যালক্স গ্রুন হলে তাই করতাম।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, আমার মনে হয় য়োমি ঠিকই বলেছে। আমি কিন্তু তবু যেতে চাই।

সত্যি?

হ্যাঁ। আমি চেষ্টা করব বেঁচে থাকতে। তবু যদি না পারি তোমরা একটা জিনিস জানবে।

কী জিনিস?

জানবে মানুষটার মাঝে কিছু একটা দুর্বলতা আছে। জানবে তার পুরো পরিকল্পনার কোথাও কিছু একটা কারচুপি আছে। পুরো সমস্যাটি তখন তোমাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

নুবা আমার দিকে এক ধরনের বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, মনে হচ্ছে আমি যদি এখানে না থাকতাম ভালো হত। খুব সহজে খুব বড় সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে আমার—আমি পারি না এসব।

আমরা কেউই পারি না নুবা। ইগা একটা হাত বাড়িয়ে নুবার হাত স্পর্শ করে বলল, কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই।

আমরা পাঁচ জন চুপচাপ বসে থাকি খানিকক্ষণ। কেউ কিছু বলছি না কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছি—মনে হচ্ছে একজন আরেকজনকে চিনি বহুকাল থেকে। এক সময় আমি হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমার মনে হয় এখনই যাওয়া দরকার, কী বল?

সবাই দ্বিধান্বিতভাবে মাথা নাড়ল। হিশান বলল, যেতেই যদি হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি যেতে পার ততই ভালো।

AMARBOI.COM

নুবা ঘুরে আমার কাছাকাছি এসে আমাকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে বলল, আমরা তোমার মঙ্গল কামনা করছি রিকি।

আমি নরম গলায় বললাম, আমি জানি।

আমার কখনো কোনো পরিবার ছিল না, কোনো আপনজন ছিল না। আমি সবসময় নিঃসঙ্গ একাকী বড় হয়েছি। হঠাৎ করে এই বিশাল ঘরে চার জন মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হল আমি বুঝি আর নিঃসঙ্গ নই। আমারও আপনজন আছে—আমারও পরিবার আছে। কথাটি আমি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

হয়তো বলার প্রয়োজনও নেই, এরা নিশ্চয়ই জানে আমি কী বলতে চেয়েছি। এরা সবাই অসাধারণ মানুষ!

৪

শ্যালক্স গ্রুন যে জিনিসটি করে পৃথিবীতে নেমে এসেছে সেটি দেখতে একটি কদাকার দালানের মতো। কোনো দরজা জানালা নেই, বিবর্ণ দেয়াল স্থানে স্থানে পুড়ে ঝলসে আছে। পুরো জিনিসটি একটু কাত হয়ে বড় কিছু পাথরের উপর বসে রয়েছে। চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, উচ্চচাপের বিদ্যুৎপ্রবাহ হচ্ছে, আমি কান পেতে এক ধরনের চাপা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। আরো দূরে উঁচু কংক্রিটের দেয়াল, দেখে বোঝা যায় তাড়াহুড়া করে তৈরি হয়েছে। শক্তিশালী লেজার দিয়ে খুব সহজেই বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে রাখা যায় কিন্তু এখানে কোনো ঝুঁকি নেয়া হয় নি, শক্ত কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রথম দুটি গেটে মানুষের প্রহরা ছিল তারপরের দুটিতে রবোট। শেষ গেটটিতে কোনো প্রহরা ছিল না। কিন্তু আমি নিশ্চিত সেখানে অদৃশ্য কোনো লেজাররশ্মি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আমার কাছে লাল কার্ডটি ছিল বলে ঢুকতে পেরেছি না হয় ঢোকা নিঃসন্দেহে খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমি কদাকার ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, পুরো এলাকাটিতে এক ধরনের অশুভ চিহ্ন, কেন জানি অকারণে মন খারাপ হয়ে যায়। আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে পড়ল। কোথায় আছে ত্রিশা? কেমন আছে? আমি ইচ্ছে করলেই লাল কার্ডটি স্পর্শ করে ত্রিশার কথা জানতে পারি, পৃথিবীর যেখানেই সে থাকুক–না কেন আমার সামনে তার ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ছবি ভেসে আসবে। আমার হঠাৎ তাকে খুব দেখার ইচ্ছে করল, অনেক কষ্ট করে আমি ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখলাম। বলা যেতে পারে পৃথিবীর সব মানুষের জীবন এখন বিপন্ন, এই মুহূর্তে একজন মানুষের জন্যে ব্যাকুল হওয়া হয়তো স্বার্থপরের কাজ। আমি কদাকার ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ নিচে থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে গোলাকার একটা ছোট দরজা খুলে গেল। আমি একটু চমকে উঠি—আমার জন্যেই খোলা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্যালক্স গ্রুন কি কোনো গোপন জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে?

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, আমাকে এখন ভেতরে ঢুকতে হবে। জীবন্ত কি ফিরে আসতে পারব আমি? গোল অন্ধকার দরজায় পা দেবার আগে হঠাৎ আমার লাল কার্ডটার কথা মনে পড়ল, ইচ্ছে করলে সেটাকে একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শ্যালক্স গ্রুনের সাথে একটা অস্ত্র নিয়ে দেখা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আমি এক মুহূর্ত

ভেবে লাল কার্ডটা পকেট থেকে বের করে বাইরে ছুড়ে দিলাম, ছোট একটা ঝোপের নিচে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনের দরজাটি ছোট। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার—আমি একটু দ্বিধা করে মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকতেই ঘরঘর শব্দ করে পিছনের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। ভিতরে ঝাঁজালো গন্ধ, ভাপসা গরম এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি সাবধানে দেয়াল ধরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সাথে সাথে শুনতে পেলাম কে যেন ভারি গলায় বলল, তুমি কেন এসেছ?

আমি চমকে উঠে বললাম, আমি—আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।

কেন?

আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই জান কেন।

কণ্ঠস্বরটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ জানি।

আমি ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রাণপণ চেষ্টা করে মানুষটিকে দেখার চেষ্টা করতে থাকি, কিন্তু চারদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দেয়াল, আমি কাউকে দেখতে পেলাম না।

কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, তুমি জান এর আগে যে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল সে অত্যন্ত নির্বোধ ব্যক্তি ছিল।

বুদ্ধিমত্তা খুব আপেক্ষিক ব্যাপার। তাছাড়াও এটি বহুমাত্রিক।

তুমি কি নির্বোধ?

কোনো কোনো বিষয়ে সবাই নির্বোধ। তুমি অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ বলে শুনেছি কিন্তু অন্তত একটি ব্যাপারে তুমিও নির্বোধ।

কণ্ঠস্বরটি দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল অন্ধকার থেকে একটি বুলেট ছুটে এসে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। আমি ত্রিশার কথা ভাবতে চাইলাম, যখনই আমি অসহায় অনুভব করি আমি ত্রিশার কথা ভাবি।

AMARBOI.COM

তুমি ভয় পেয়েছ।

হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি ভীত নও। যে আমাকে নির্বোধ বলতে পারে সে ভীতু হতে পারে না। মানুষের প্রাণের জন্যে আমার কোনো মমতা নেই।

জানি।

তুমি কেন আমাকে নির্বোধ মনে কর?

কারণ তুমি পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছ।

আমি ভয় দেখাই নি। আমি সত্যি সত্যি সেটা করতে চাই।

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, মানুষটি সত্যি কথা বলছে। সত্যিই সে পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলতে চায়। আমি জিভ দিয়ে আমার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম, তুমি কেন পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলতে চাও?

আমি সেটা বহুবার বলেছি। পৃথিবীর সব ডাটাবেসে সে তথ্য আছে।

আমি তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই।

কেন?

কারণ আমি পৃথিবীকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করব। তোমার সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন।

তুমি একা পৃথিবীকে রক্ষা করবে?

না, আমার সাথে আরো চার জন অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা পাঁচ জন মিলে পৃথিবীকে রক্ষা করবে?

না। আমাদের সহযোগিতা করবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান—

চুপ কর—কণ্ঠস্বরটি হঠাৎ তীব্র স্বরে আমাকে ধমকে ওঠে, হঠাৎ করে আমি সত্যিকারের এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করি। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে যেতে থাকে। ভয়ঙ্কর অন্ধকারে আমি দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, আমি প্রথমবার অনুভব করতে পারলাম অন্ধকারে যে প্রাণীটির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেটি মানুষ নয়, সেটি একটি দানব। আমি কুলকুল করে ঘামতে থাকি। আবার আমি ত্রিশার কথা ভাবতে শুরু করি। আমার চোখের সামনে তার চেহারা ভেসে ওঠে, আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে, লাল ঠোঁট ঝকঝকে স্ফটিকের মতো দাঁত। বাতাসে তার রেশমের মতো কালো চুল উড়ছে।

তুমি কার কথা ভাবছ?

মানুষটি এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও আমাকে স্পষ্ট দেখছে, আমি দেয়াল স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে আমার শরীরের আরো অনেক তথ্য পেয়ে যাচ্ছে।

কথা বল।

আমি বলতে চাই না।

কেন?

এটি আমার খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া—

তাছাড়া কী?

তুমি হয়তো সেটা বুঝবে না। মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণাটি অত্যন্ত বিচিত্র। তোমার ধারণা পৃথিবীতে মানুষের জন্ম পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর মানুষকে ধ্বংস করে তুমি তাদের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দেবে।

তোমার কথা খানিকটা সত্যি।

কিন্তু সেটি সত্যি নয়। পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ব্যর্থ হয় নি। যতদিন পৃথিবীতে একজন মানুষের জন্যে অন্য মানুষের ভালবাসা থাকবে ততদিন মানবজন্ম বৃথা হবে না।

চুপ কর তুমি। চুপ কর—

না, আমি চুপ করব না। আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে তুমি মেরে ফেলতে পার, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা বলবই। জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা শিল্প সাহিত্য মানুষের জীবনের মাপকাঠি না— মানুষের জীবনের মাপকাঠি হচ্ছে একের জন্যে অন্যের ভালবাসা। তুমি সেটা জান না। তুমি সেটা কোনোদিন জানবে না।

আমি মানুষটি দেখতে পারছি না, মানুষটি এখন সম্ভবত আমাকে মেরে ফেলবে, আমার হয়তো চুপ করে থাকাই উচিত ছিল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি, নিজেকে হঠাৎ খুব অসহায় মনে হয়। দীর্ঘ সময় কোথাও কোনো শব্দ নেই, মনে হয় আমি বুঝি কফিনের মাঝে একটি মৃতদেহকে নিয়ে বসে আছি। আমি চাপা গলায় ডাকলাম, শ্যালক্স গ্রুন।

বল।

তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে?

এখনো জানি না।

আমি কি তোমার সাথে কথা বলতে পারি?

কী কথা বলতে চাও?

তুমি কি নিজের মুখে আমাকে একবার বলবে কেন তুমি পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে

ফেলতে চাও?

তুমি বলতে পারবে?

আমি?

হ্যাঁ, তুমি।

আমি একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, চেষ্টা করতে পারি।

কর।

তোমার মানুষের জন্যে কোনো মমতা নেই। সম্ভবত শৈশবে খুব হৃদয়হীন কিছু মানুষ তোমার ওপর খুব অবিচার করেছিল। তুমি তার প্রতিশোধ নিতে চাও।

আমি একটু থামতেই শ্যালক্স গ্রুন বলল, বলতে থাক।

তুমি ভয়ঙ্কর স্বার্থপর। তোমার মৃত্যুর পর পৃথিবী বেঁচে থাকুক আর ধ্বংস হোক তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তাই তুমি এই খেলাটি বেছে নিয়েছ, তুমি বনাম পৃথিবী।

আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললাম, আমি কি ভুল বলেছি?

না।

অনেক ধন্যবাদ শ্যালক্স গ্রুন।

শ্যালক্স গ্রুন কোনো কথা বলল না। আবার দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। আমি অন্ধকারে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়ঙ্কর অন্ধকার স্নায়ুর ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে, আমি কেমন জানি এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতে থাকি। যখন মনে হল শ্যালক্স গ্রুন আর কোনো কথা বলবে না, আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন সে বলল, তোমরা পৃথিবীকে রক্ষা করবে ঠিক করেছ?

হ্যাঁ।

কীভাবে?

আমি মোটামুটি নিঃসন্দেহ তুমি সত্যি সত্যি সব মানুষকে মেরে ফেলতে চাও। কিন্তু সেটি যখন করা হবে তুমি নিজেও মারা যাবে। কিন্তু তুমি মৃত্যুর জন্যে এখনো প্রস্তুত নও। পৃথিবীর মানুষের সাথে তুমি যে খেলাটি খেলছ সেটা তুমি আরো একটু খেলতে চাও। আমার ধারণা তুমি আমার কাছে কোনো প্রস্তাব দেবে।

প্রস্তাব?

হ্যাঁ। কিছু একটা তুমি দাবি করবে। অসম্ভব একটা দাবি। সে দাবি পূরণ করতে না পারলে তুমি পৃথিবীর সব মানুষকে ধ্বংস করে দেবে।

আর সেই দাবি যদি পূরণ করা হয়?

তাহলে তুমি আরো ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে। আরো এক শ বছর সামনে।

কিন্তু সেটি পৃথিবীকে রক্ষা করা হল না। মাত্র এক শ বছর সময় নেয়া হল।

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যখন পৃথিবীতে নেমে আসবে পৃথিবীর বিজ্ঞান তখন আরো এক শ বছর এগিয়ে যাবে। আমরা তাদের অমূল্য কিছু তথ্য দেব যেটা ব্যবহার করে তোমাকে ধ্বংস করা হবে।

সেই অমূল্য তথ্য তুমি পেয়ে গেছ?

এখনো পাই নি। কিন্তু আমি জানি সেই তথ্য আছে।

কেমন করে জান?

কারণ তুমি এই ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার করে রেখেছ। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কিন্তু আমাকে স্পষ্ট দেখছ। এটা এক ধরনের সতর্কতা। এই সতর্কতার প্রয়োজন হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন কোনো দুর্বলতা থাকে। তোমার কোনো একটা দুর্বলতা আছে। সেটি কী আমি জানি না।

শ্যালক্স গ্রুন কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি বললাম, দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপার হতে পারে।

কী?

তোমার কোনো ধরনের শারীরিক বিকৃতি রয়েছে। লিটুমিনা-৭২ এর ছোট এম্পুলটি কোনোভাবে তোমার শরীরে বসানো আছে। তোমার রক্ত খেয়ে সেই ভাইরাস বেঁচে আছে। সেটা তোমার শরীরে বসাতে গিয়ে তোমার ভয়াবহ শারীরিক বিকৃতি হয়েছে। তুমি কুদর্শন এবং বিসদৃশ। তাই তুমি কাউকে তোমার চেহারা দেখাতে চাও না।

আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ। তৃতীয় আরেকটি সম্ভাবনা আছে। খুব ক্ষুদ্র সম্ভাবনা। মানুষের ওপর তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়েছ। অন্য আরেকজন মানুষ তোমার কাছে একটি জঞ্জালের মতো। তাকে তুমি মানুষের সম্মান দিতে রাজি নও। তাকে তুমি দীর্ঘ সময় অন্ধকারে অসহায়ভাবে দাঁড়া করিয়ে রাখ। সম্পূর্ণ অকারণে। তুমি হয়তো লক্ষও কর নি যে আমি একজন মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে একটা দেয়াল ধরে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

এই তিনটি সম্ভাবনার মাঝে কোনটি সত্যি?

আমি এখনো জানি না।

টুক করে একটা শব্দ হল এবং হঠাৎ করে খুব ধীরে ধীরে ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠতে শুরু করে। ছোট একটা ঘর, দেয়ালে প্রাচীন যন্ত্রপাতি, কুদর্শন ডায়াল। ছাদ থেকে বিচিত্র কিছু টিউব ঝুলে আছে। সামনে একটা চেয়ার, সেই চেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে আছে একটি মানুষ। অত্যন্ত সুদর্শন একজন মানুষ। মাথা ভরা এলোমেলো চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মানুষটির চোখ দুটি আশ্চর্য নীল। সেই নীল চোখে সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে এক ধরনের শীতলতা যেটি আমি আগে কখনো কোনো মানুষের চোখে দেখি নি। আমার সমস্ত শরীর কেমন যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রাচীন লোকগাথায় যেসব ভয়াবহ প্রেত অশরীরী দানবের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হয়তো কাল্পনিক নয়, সেগুলো হয়তো এই রকম মানুষের কথা।

আমি জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে বললাম, তুমি কুদর্শন নও। তুমি অসম্ভব রূপবান।

শ্যালক্স গ্রুন কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি কেন জানি সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, আমাকে চোখ সরিয়ে নিতে হল। আমি আবার ঘরটির দিকে তাকালাম, এই প্রাচীন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মানুষটি ভবিষ্যতে চলে এসেছে? এই মানুষটি লিটুমিনা-৭২ ভাইরাস তৈরি করেছে—পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী এক শ বছর চেষ্টা করেও যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষেধক বের করতে পারে নি? এই সেই মানুষ যার ভিতরে এতটুকু মমতা নেই? ভালবাসা নেই? আমি আবার শ্যালক্স গ্রুনের দিকে তাকালাম, কী ভয়ঙ্কর তার চোখের দৃষ্টি। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি এখন আমাকে মেরে ফেলবে?

শ্যালক্স গ্রুন আমার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, খুব ধীরে ধীরে তার মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে।

আমি আবার জিজ্ঞেস কররাম, আমাকে কি মেরে ফেলবে?

তোমার কী মনে হয়?

আমি ঠিক জানি না।

সত্যি জান না?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, জানি। এটা একটা খেলা। যে-কোনো খেলাতে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে হয়। তা না হলে সেই খেলায় কোনো আনন্দ নেই।

খেলায় ঘুঁটিও থাকতে হয়। অর্থহীন প্রয়োজনহীন ঘুঁটি—

না। আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমি খেলার ঘুঁটি না। আমি যদি অর্থহীন প্রয়োজনহীন ঘুঁটি হতাম মহামান্য ইয়োরন রিসি সারা পৃথিবী খুঁজে তোমার মুখোমুখি হবার জন্যে আমাকে বেছে নিতেন না!

তাহলে ঘুঁটি কে?

পৃথিবীর পাঁচ বিলিয়ন মানুষ।

শ্যালক্স গ্রুন কোনো কথা বলল না, তার মুখে বিদ্রূপের খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে ওঠে। আমি তার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি কি যেতে পারি?

যাও।

আমি ভেবেছিলাম তুমি কিছু একটা দাবি করবে।

তুমি ঠিকই ভেবেছ। আমি একটা জিনিস চাই।

আমি ঘুরে তাকালাম, কী?

দেখি তুমি বলতে পার কি না।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, ত্রিনিত্রি রশ্মিমালা?

হ্যাঁ। এক সপ্তাহের মাঝে আমি ত্রিনিত্রি রশ্মিমালা চাই। তুমি এখন যাও।

যাবার আগে আমি একটা কথা বলতে পারি?

কী কথা?

তুমি এক শ বছর আগের টেকনোলজি ব্যবহার করে একটা অসাধ্য সাধন করেছ। কেমন করে করেছ আমি জানি না, আমি বিজ্ঞান ভালো বুঝি না। কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা কঠিন, ভবিষ্যতে চলে আসতে প্রচণ্ড শক্তি ক্ষয় হয়— এমন কি হতে পারে না যে সেই ভয়ঙ্কর অভিযানে প্রকৃত শ্যালক্স গ্রুন মারা গেছে। তুমি সত্যি নও, তুমি আসলে তোমার ওমেগা কম্পিউটারের তৈরী একটি ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ছবি।

হতে পারে।

আমি কি তোমাকে স্পর্শ করে দেখতে পারি তুমি সত্যি কি না?

শ্যালক্স গ্রুন তার হাতটি আমার দিকে এগিয়ে দেয়, আমি দুই পা এগিয়ে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলাম। সাথে সাথে কেন জানি না আমার সমস্ত শরীর হঠাৎ শিউরে ওঠে।

আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছি। আমার হাতে একটা সাদা তোয়ালে, আমি সেটা দিয়ে আমার হাতটা মোছার চেষ্টা করছি। আমাকে ঘিরে অন্য চার জন বসে আছে। নুবা বলল, রিকি, তোমার সত্যি আর হাতটা মোছার প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ। হিশান বলল, হাতে শ্যালক্স গ্রুনের যেটুকু চিহ্ন ছিল মুছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমি জানি। আমি এর মাঝে কম করে হলেও দশবার হাত ধুয়ে এসেছি তবুও কেমন জানি গা ঘিনঘিন করছে, মনে হচ্ছে কিছু অশুভ একটা কিছু ঘটে গেছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, আমার কখনো এ রকম হয় নি।

নুবা নরম গলায় বলল, রিকি। আমার মনে হয় তুমি বাইরে থেকে ঘুরে আস।

হ্যাঁ।

হিশান আর ইগা একসাথে মাথা নাড়ে। তোমার কাজ তুমি করেছ, তুমি এখন এক দিনের জন্যে ছুটি নাও।

কিন্তু আমাদের সময় নেই—

আমি জানি। কিন্তু তুমি সত্যি এখন কোনো কাজে আসছ না। একজন মানুষ হাত থেকে অদৃশ্য কিছু মুছে ফেলার চেষ্টা করছে—ব্যাপারটা দেখা খুব মজার ব্যাপার না।

আমি সবার মুখের দিকে তাকালাম, সত্যি তোমরা মনে কর আমি এখন যেতে পারি?

হ্যাঁ, সত্যি আমরা মনে করি।

আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম, আমার সত্যিই খানিকক্ষণের জন্যে এই জীবনটির কথা ভুলে যাওয়া দরকার।

বিজ্ঞান পরিষদের বিশাল ভবন থেকে বের হয়ে আমি খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকি। পাশে বড় রাস্তা, তার বিভিন্ন স্তরে নানা আকারের বাই ভার্বাল যাচ্ছে আসছে। দুপাশে বড় বড় আলোকোজ্জ্বল ভবন। রাস্তায় নানা ধরনের মানুষ। এটি শহরের ভালো এলাকাটি, মানুষগুলোর চেহারায়, পোশাকে তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। অপরিচিত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি আগেও দেখেছি শহরের দরিদ্র এবং অবস্থাপন্ন অঞ্চলের মানুষের অনুভূতির মাঝে খুব বেশি তারতম্য নেই।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষজনকে লক্ষ করতে করতে হঠাৎ দুজন তরুণ-তরুণীকে হাত ধরে হেঁটে যেতে দেখলাম। তরুণীটির চেহারার সাথে কোথায় জানি ত্রিশার চেহারার মিল রয়েছে, আমার হঠাৎ করে কেমন জানি বিষণ্ণ লাগতে থাকে। আমি বুকের ভিতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করি, ঘনিষ্ঠ একজনের সাথে কথা বলার জন্যে হঠাৎ বুকটি হা হা করতে থাকে। কিন্তু আমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই।

আমি ক্লান্ত পায়ে রাস্তা ধরে কয়েক পা হেঁটেছি আর ঠিক তখন আমার পাশে অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি বাই ভার্বাল এসে দাঁড়াল।

দরজা খুলে কমবয়সী একটি মেয়ে লাফিয়ে নেমে এসে বলল, মহামান্য রিকি!

আমাকে বলছ?

অবশ্যি! কোথায় যাবেন আপনি?

আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?

অবশ্যি!

ঠিক তখন আমার মনে পড়ল আজ সকালে আমার জীবন পাল্টে গেছে, আমি পৃথিবীর এক শ সতের জন লাল কার্ডের অধিকারীদের এক জন। আমি একবার ভাবলাম মেয়েটিকে চলে যেতে বলি, কিন্তু কী মনে করে আমি বাই ভার্বালে উঠে বসলাম।

কোথায় যাবেন মহামান্য রিকি?

তোমার আমাকে মহামান্য রিকি ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাকে শুধু রিকি ডাকতে পার।

মেয়েটি খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

বাই ভার্বালটি নিঃশব্দে উপরে উঠে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়।

আমি প্রায় মুগ্ধ হয়ে এই যন্ত্রটিকে দেখছিলাম, তখন মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

আমি জানি না।

মেয়েটি হেসে ফেলল, যেন খুব মজার কথা একটা শুনেছে। হাসতে হাসতে বলল, জাতীয় শিল্পকেন্দ্রে খুব সুন্দর একটি নৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছে—

না, আমি মাথা নাড়লাম, আমার মানুষের ভিড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

তাহলে কি জাতীয় মিউজিয়ামে—

না। আমার মস্তিষ্কটিকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। খুব কষ্ট হয়েছে আজ। মিউজিয়ামে গেলে বিশ্রাম হবে না।

আপনাকে কি তাহলে বাসায় নিয়ে যাব?

না। বাসাতেও যেতে ইচ্ছে করছে না।

আপনার কোনো বন্ধুর বাসায়?

আমার বন্ধু বলতে গেলে নেই। আমি যে অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি সেখানে যারা ছিল তাদের সাথে খানিকটা যোগাযোগ আছে।

যাবেন তাদের বাসায়?

মন্দ হয় না। এই বাই ভার্বাল নিয়ে যাওয়া যাবে না। শহরের সবচেয়ে দুস্থ এলাকায় থাকে তারা!

সেটি নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

সত্যি সত্যি সেটা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা করতে হল না। মেয়েটি কীভাবে কীভাবে জানি দুস্থ এলাকার সরু একটা রাস্তার পাশে বিশাল বাই ভার্বালটি নামিয়ে ফেলল।

আমি দরজা খুলে বের হতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আমি কি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব?

মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? ছাড়ো যাও এখন। মেয়েটি আমাকে অভিবাদন করে বাই ভার্বালের মাঝে ঢুকে যায়, আমার কেন যেন সন্দেহ হতে থাকে মেয়েটি আসলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে।

আমার অনাথ আশ্রমের যে বন্ধুটির সাথে আমি দেখা করতে এসেছি তার নাম রিহাস। সে শক্তসমর্থ বিশাল একটি মানুষ, কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা অপরিণতবয়স্ক কিশোরের মতো। তার ভিতরে এক ধরনের সারল্য আছে যেটা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করে এসেছে।

আমি তার দরজায় শব্দ করতেই সে দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখে সে একই সাথে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে ওঠে। সে দুই হাতে শক্ত করে আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, কী আশ্চর্য! রিকি তুমি এসেছ আমার বাসায়! কী আশ্চর্য!

আমি তার ঝাঁকুনি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে করতে বললাম, এর মাঝে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমি কি তোমার বাসায় আগে কখনো আসি নি?

কিন্তু আজকেই আমি তোমার বাসায় খোঁজ করেছিলাম!

সত্যি?

হ্যাঁ। ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে আজ। ভারি মজা!

কী?

তোমার বাসায় খোঁজ করেছি, যোগাযোগ মডিউলটি ধরেছে তোমার রবোট!

কিটি?

AMARBOI.COM

হ্যাঁ। কিটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রিকি কোথায়? সে কী বলল জান?

কী?

হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না, সে বলল রিকিকে বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক মহামান্য ইয়োরন রিসি ডেকে পাঠিয়েছেন! রিহাস আবার বিকট স্বরে হাসতে শুরু করল!

তাই বলল?

হ্যাঁ। রিহাস অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে তার চোখ মুছে বলল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ডেকেছে রিকিকে? সে কী বলল জান?

কী?

বলল, মনে হয় পৃথিবীর কোনো সমস্যা হয়েছে। রিকি তার সমাধান করবে! রিহাস আবার হাসতে শুরু করে। তার দিকে তাকিয়ে আমিও হাসতে শুরু করি। মুহূর্তে আমার মনের সমস্ত গ্লানি কেটে যায়, বুকের ভিতর এক ধরনের সজীব আনন্দ এসে ভর করে।

রিহাস আমার হাত ধরে আমাকে টেনে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে। আমি তার প্রবল আপ্যায়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে করতে বললাম, তুমি আমাকে খোঁজ করছিলে কেন?

অনেকদিন থেকে দেখা নেই তাই ভাবলাম একটু খোঁজ নিই। তাছাড়া—

তাছাড়া কী?

রিহাস লাজুক মুখে বলল, লানার কথা মনে আছে?

লানা? তোমার বান্ধবী?

হ্যাঁ। আমি আর লানা ঠিক করেছি বিয়ে করব। এই বসন্তেই।

সত্যি? আমি কনুই দিয়ে রিহাসের পেটে খোঁচা দিয়ে বললাম, সত্যি?

রিহাস দাঁত বের করে হেসে বলল, সত্যি! লানাকে আজ আমি খেতে আসতে বলেছি, তাই ভাবছিলাম তোমাকেও ডাকি! কী আশ্চর্য সত্যি সত্যি তুমি এসে হাজির! এটাকে যদি ভাগ্য না বল তাহলে ভাগ্যটা কী?

আমি মাথা নেড়ে রিহাসের কথায় সায় দিলাম। রিহাস আমার হাত ধরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিতরে খানিকক্ষণ নানা ধরনের শব্দ হয়, সম্ভবত কিছু একটা রান্না হচ্ছে। একটু পরেই সে ফিরে এসে বলল, তোমার খিদে পেয়েছে তো? মাংসের স্টু রান্না হচ্ছে। কৃত্রিম মাংস নয়, একেবারে পাহাড়ি ভেড়ার রান! অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি।

রিহাসের ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ নেই, কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকু খুব সাজানো গোছানো। ঘরের একপাশে ছোট টিউব। আমি সেদিকে তাকাতেই রিহাস মাথা নেড়ে বলল, টিউবটা এক সপ্তাহ থেকে নষ্ট হয়ে আছে! বিশ্বাস কর, কম করে হলেও তিনবার খবর পাঠিয়েছি, কারো কোনো গরজ নেই।

আমি অন্যমনস্কভাবে টিউবটার সুইচ স্পর্শ করতেই সেটা চালু হয়ে ঘরে হলোগ্রাফিক ছবি ভেসে আসে। রিহাস অবাক হয়ে বলল, আরে! ঠিক হয়ে গেছে দেখি! কেমন করে ঠিক হল?

আমি জানি না।

কী আশ্চর্য! আমি একটু আগে চেষ্টা করলাম কিছুতেই চালু হল না।

টিউবে জেনারেল জিক্রোকে সমাহিত হবার খবরটি দেখানো হচ্ছিল। কীভাবে মারা গেছেন সেটি ব্যাখ্যা করা হয় নি, একটি ‘দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা’ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

AMARBOI.COM

একটু আগে আমরা এই শব্দটি ঠিক করে দিয়েছিলাম—শ্যালক্স গ্রুনের কথা এই মুহূর্তে কাউকে বলা সম্ভবত সুবিবেচনার কাজ নয়।

রিহাস ঘরের একপাশে হিটারের কাছে দাঁড়িয়ে বাতাসের উত্তাপ পরীক্ষা করতে করতে বলল, আশ্চর্যের পর আশ্চর্য!

কী হয়েছে?

গরম বাতাসের হিটারটি নষ্ট হয়েছিল সেটাও ঠিক হয়ে গেছে! দেখ কী চমৎকার উষ্ণ বাতাস!

আমি রিহাসের কাছে দাঁড়িয়ে বাতাসের প্রবাহে হাত রেখে উষ্ণতাটা অনুভব করতে করতে বললাম, ভারি চমৎকার।

কিন্তু কেমন করে হল এটা?

আমি জানি না। মাথা নেড়ে বললাম, জানি না।

আমি রিহাসের মুখের দিকে তাকালাম, তার চেহারায় একটি অল্পবয়স্ক বালকের ছাপ রয়েছে। আমরা যখন অনাথ আশ্রমে ছিলাম সে সবসময় আমাকে অন্য দুরন্ত শিশুদের হাত থেকে রক্ষা করত! আমি সবসময় রিহাসের জন্যে এক ধরনের মমতা অনুভব করে এসেছি। আজকেও তার কিশোরসুলভ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এক ধরনের গভীর ভালবাসা অনুভব করি। আমি তার হাত স্পর্শ করে বললাম, রিহাস—

কী হল?

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

কী কথা?

তোমার কি মনে হয় মানুষের জীবন অর্থহীন?

রিহাস ভেবাচেকা খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার প্রশ্নটি সে ধরতে পেরেছে মনে হয় না। প্রাণপণ চেষ্টা করে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে আমি তার সাথে কোনো ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছি কি না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, কী বললে?

বলেছি, তোমার কি মনে হয় বেঁচে থাকার কোনো অর্থ আছে?

অর্থ থাকবে না কেন?

এই যে, কী কষ্টের একটা জীবন! তুমি আর আমি অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি—বাবা-মা নেই, আদর করে কথা বলার একটি মানুষ নেই। বেঁচে থাকার জন্যে কী কষ্ট, সূর্য ওঠার আগে তুমি ঘুম থেকে উঠে সুড়ঙ্গে করে কাজ করতে যাও, ফিরে আস সন্ধেবেলা, খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে—

কী হল তোমার? রিহাস আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কি গোপন রাজনীতির দলে নাম লিখেছ?

না।

তাহলে?

তাহলে কী?

তাহলে এ রকম মন খারাপ করা কথা বলছ কেন? অনেক কষ্ট করতে হয় সত্যি—কিন্তু সবাই কষ্ট করে। তুমি শুধু কষ্টটা দেখছ কেন? ভালো জিনিসটা দেখছ না কেন?

ভালো কোন জিনিসটা?

কত কী আছে! লানার কথা ধর—লানার সাথে আমি যখন থাকি তখন আমার মনে হয় আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

আমি রিহাসের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললাম, রিহাস, যদি মনে কর কেউ এসে বলে তোমার জীবন তুচ্ছ, তুমি তুচ্ছ, তোমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই, তুমি কী বলবে?

আমি?

হ্যাঁ, তুমি।

আমি এক ঘুসিতে তার মুখের ছয়টা দাঁত খুলে নিয়ে বলব, জাহান্নামে যাও!

আমি রিহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। রিহাস খানিকক্ষণ আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার আজকে কী হয়েছে? রাজনীতির লোকদের মতো কথা বলছ কেন?

আর বলব না!

সেটাই ভালো—সে আরো কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল। নিশ্চয়ই লানা এসেছে।

রিহাস যেরকম বিশাল, লানা ঠিক সেরকম ছোটখাটো। তার লাল চুল শক্ত করে পিছনে টেনে বাঁধা। ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায় লানা তা নয়, কিন্তু তার চেহারায় এক ধরনের স্নিগ্ধ কমনীয়তা রয়েছে। লানা তার ভারী কোট খুলে দু হাত ঘষে উষ্ণ হতে হতে বলল, খুব একটা অবাক ব্যাপার হয়েছে বাইরে।

কী হয়েছে?

বিশাল একটা বাই ভার্বাল দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। শুধুমাত্র ছবিতে এ রকম বাই ভার্বাল দেখা যায়—চিত্রতারকারা এ রকম বাই ভার্বালে করে যায়।

আমি একটু এগিয়ে এলাম, কী হয়েছে সেই বাই ভার্বালে?

ভিতরে একটা মেয়ে, কী সুন্দর দেখতে। গায়ের রং কী উজ্জ্বল!

কী হয়েছে সেই মেয়ের?

আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি লানা?

রিহাস অবাক হয়ে বলল, সত্যি?

হ্যাঁ। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি লানা। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আর রিহাস এই বসন্তকালে বিয়ে করবে? আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কে? তুমি কেমন করে জান? মেয়েটি হেসে বলল, আমি সব জানি। এই নাও তোমাদের বিয়ের উপহার। আমার হাতে একটা ছোট খাম ধরিয়ে দিল। আমি নিতে চাচ্ছিলাম না, যাকে আমি চিনি না, কেন তার থেকে উপহার নেব? মেয়েটা তখন কী বলল জান?

কী?

বলল, তুমি আর রিহাস পৃথিবীর খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষকে খুব খুশি করেছ। আমরা তার পক্ষ থেকে উপহার দিচ্ছি। তোমাকে নিতে হবে।

তাই বলল?

হ্যাঁ।

রিহাস এগিয়ে গিয়ে খামটা হাতে নিয়ে বলল, দেখি কী আছে খামে।

খামটা খুলে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর সাবধানে বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে বলল, নিশ্চয়ই কিছু একটা ভুল হয়েছে কোথাও।

কেন? কী আছে খামে?

AMARBOI.COM

আমাদের দুজনের জন্যে দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলে দু সপ্তাহের জন্যে একটি কটেজ। যাতায়াতের খরচ। সরকারি ছুটি, হাতখরচের জন্যে ভাউচার!

লানা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। সত্যি?

হ্যাঁ, এই দেখ। নিশ্চয়ই কিছু একটা ভুল হয়েছে।

লানা মাথা নাড়ল, বলল, না ভুল হয় নি। মেয়েটি আমাকে স্পষ্ট বলেছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ দিয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার লাল কার্ড রয়েছে।

লাল কার্ড?

হ্যাঁ। রিহাস জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকাল, রিকি, শুনেছ, লাল কার্ডের একজন মানুষ আমাকে আর লানাকে বিয়ের উপহার দিয়েছে। শুনেছ?

আমি জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে আনি, শুনেছি।

মানুষটা কে? কখন আমি তাকে খুশি করেছি? কীভাবে করেছি?

আমি রিহাসের হাত স্পর্শ করে বললাম, রিহাস, একজন মানুষ যখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে আর বোঝা যায় না। তোমরাও কোনোদিন এই মানুষটিকে বুঝবে না। কোনোদিন তাকে খুঁজেও পাবে না!

তুমি কেমন করে জান?

আমি জানি না। আন্দাজ করছি।

রিহাস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, রিকি, তুমি আমার জন্যে আজকে সৌভাগ্য নিয়ে এসেছ। প্রথমে টিউব ঠিক হয়ে গেল, তারপর গরম বাতাসের হিটার, এখন এই সাংঘাতিক উপহার! তাই না লানা?

লানা মিষ্টি করে হেসে বলল, হ্যাঁ। কিছু কিছু মানুষ হয় এ রকম। তারা সবার জন্যে সৌভাগ্য নিয়ে আসে। আমি আগেও দেখেছি রিকি সবসময় সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে।

আমি মনে মনে বললাম, তোমার কথা সত্যি হোক লানা। শ্যালক্স গ্রুনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সৌভাগ্য। অনেক অনেক সৌভাগ্য।

গভীর রাত্রিতে আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে হল। কোথায় আছে এখন? কী করছে? তাকে একটিবার দেখার জন্যে আমার বুক হাহাকার করতে থাকে। আমি বিছানায় দুই হাঁটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ করে বসে থাকি। টেবিলের উপর আমার লাল কার্ডটি পড়ে রয়েছে। আমি সেটা স্পর্শ করে ত্রিশার খোঁজ নিতে পারি, তাকে দেখতে পারি, আমার কাছে নিয়ে আসতে পারি।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। চুপ করে বসে রইলাম।

৬

আমরা পাঁচ জন যে ঘরটিতে বসে আছি সেটি বেশ ছোট। ঘরটির দেয়াল কাঠের, দুপাশে বড় বড় জানালা, সেই জানালা দিয়ে বিস্তৃত প্রান্তর দেখা যায়। বাইরে ঝড়ো বাতাস, সেই বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। ঘরের ভিতরে বসে আমরা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পাই, কেন জানি না এই শব্দে বুকের মাঝে কেমন জানি এক ধরনের শূন্যতার জন্ম দেয়।

বড় জানালার একটিতে নুবা পা তুলে বসে আছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে সে তরল গলায় বলল, কী সুন্দর এই জায়গাটা!

হিশান হা হা করে হেসে বলল, তুমি সুন্দর বলছ এই জায়গাটাকে? জেনারেল ইকোয়া শুনলে হার্টফেল করে মারা যাবেন!

য়োমি বলল, বেচারাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? আমাদের পাহারা দেবার জন্যে বাইরে এই ঝড়ো বাতাসে কতজন বসে আছে তুমি জান?

নুবা হাত নেড়ে বলল, দরকার কী পাহারা দেবার? আমরা কি ছোট শিশু?

ইগা মাথা নেড়ে বলল, বেচারাদের কোনো উপায় নেই। সংবিধানে লেখা আছে যার কাছে লাল কার্ড রয়েছে তাকে যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

নুবা তার পকেট থেকে লাল কার্ডটি বের করে সেটাকে এক নজর দেখে বলল, এটা নিয়ে তো দেখি মহা যন্ত্রণা হল।

তা বলতে পার। আমি হেসে বললাম, কাল তোমরা যখন আমাকে ছুটি দিলে আমি হাঁটতে বের হয়েছিলাম, সাথে সাথে একটা বিশাল বাই ভার্বাল হাজির! যার বাসায় গিয়েছি চোখের পলকে তার বাসার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! সেই বাসার মানুষটি বিয়ে করবে সে জন্যে উপহার—

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

কীভাবে হয়েছে শুনি?

আমি খুলে বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। বললাম, একটা জিনিস লক্ষ করছ? আমরা ইচ্ছে করে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলছি? আমাদের যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা দরকার সেটা এড়িয়ে যাচ্ছি?

নুবা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি। তুমি ঠিকই বলেছ রিকি। ব্যাপারটা এমন মন খারাপ করা যে সেটা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

কিন্তু বলতে হবে।

হ্যাঁ। বলতে হবে।

ইগা য়োমির দিকে তাকিয়ে বলল, য়োমি তুমি আমাদের সবাইকে পুরো ব্যাপারটার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

আমি? য়োমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইগার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কেন?

দুটি কারণে। প্রথমত, আমি দেখেছি একটি মেয়ে সাধারণত খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে। দ্বিতীয়ত, তুমি শ্যালক্স গ্রুনকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

য়োমি তীব্র স্বরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, নুবা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে আমি বলছি। যদি কিছু ভুল বলি তোমরা শুধরে দিও।

আমি নুবার দিকে খানিকটা হিংসার দৃষ্টিতে তাকালাম। কী সাদাসিধে দেখতে অথচ কী চমৎকার সহজ একটা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা! ইয়োরন রিসি নিশ্চয়ই অনেক ভেবেচিন্তে এই দলটিকে দাঁড়া করিয়েছেন।

নুবা জানালা থেকে নেমে এসে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা তুলে বলল, প্রথমে সবার পক্ষ থেকে রিকিকে ধন্যবাদ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্যালক্স গ্রুনের সাথে দেখা করার জন্যে। রিকি আমাদের খুব মূল্যবান দুটি তথ্য এনে দিয়েছে। দুটি তথ্যই খুব মন খারাপ করা তথ্য, কিন্তু মূল্যবান তাতে

AMARBOI.COM

সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এই দুটি তথ্য জানার পর আমাদের আর খুঁটিনাটি কিছু জানার নেই।

প্রথম তথ্যটি হচ্ছে শ্যালক্স গ্রুন ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে না। সে সত্যিই পুরো পৃথিবী ধ্বংস করতে চায়। কখন করবে সেই সময়টি সে এখনো ঠিক করে নি, কিন্তু সে তার চেষ্টা করবে। রিকির ধারণা ভয়ঙ্কর ভাইরাসের এম্পুলটি সে তার নিজের শরীরের ভিতরে রেখেছে। যতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে এম্পুলটি অক্ষত থাকবে। কোনোভাবে তার মৃত্যু হলে সাথে সাথে এম্পুলটি ফেটে লিটুমিনা–৭২ ভাইরাস বের হয়ে পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে।

রিকির ধারণা সত্যি। শ্যালক্স গ্রুনকে স্পর্শ করে তার ত্বকের যে নমুনা সে নিয়ে এসেছে সেটি পরীক্ষা করে বায়োবিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন। সত্যিই তার শরীরে একটি সিলাকিত কার্বনের এম্পুল রয়েছে। রিপোর্টটি ঘরে কোথাও আছে কৌতূহল হলে দেখতে পার।

হিশান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এটি একটি অসম্ভব দুঃসাহসিক কাজ করেছ।

ইগা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমাদের প্রযুক্তি খুব উন্নত নয়। যদি আরো কয়েক শ বছর পরে হত, শ্যালক্স গ্রুনের ত্বকের কোষ ব্যবহার করে আরেকটি শ্যালক্স গ্রুন তৈরি করে তাকে ব্যবহার করা যেত—

নুবা হেসে ফেলে বলল, রক্ষা কর! একটি শ্যালক্স গ্রুন নিয়েই আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, দুটি হলে কী হবে চিন্তা করতে পার?

তা ঠিক।

যাই হোক, যা বলছিলাম, রিকির নিয়ে আসা দ্বিতীয় তথ্যটি বলা যেতে পারে খানিকটা আশাপ্রদ। শ্যালক্স গ্রুন পৃথিবীর কাছে ত্রিনিত্রি রাশিমালা দাবি করেছে। যার অর্থ সে এই মুহূর্তে পৃথিবীকে ধ্বংস করবে না। ত্রিনিত্রি রাশিমালা ব্যবহার করে সে আরো এক শ বছর ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে। আমরা যদি তাকে ত্রিনিত্রি রাশিমালা দিই পৃথিবী আরো এক শ বছর সময় পাবে।

AMARBOI.COM

হিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু সেই এক শ বছর হবে অর্থহীন। শ্যালক্স গ্রুনের কাছে যদি ত্রিনিত্রি রাশিমালা থাকে সে আজ থেকে এক শ বছর পরে এসে পৃথিবীর পুরো প্রযুক্তি নিজের হাতে নিয়ে নেবে। পুরোটা ব্যবহার করবে নিজের স্বার্থে!

হ্যাঁ। নুবা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়।

আমরাও চুপ করে বসে রইলাম। আমি জানি আমরা সবাই একটি কথা ভাবছি কিন্তু কেউই মুখ ফুটে কথাটি বলতে পারছি না। য়োমি শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারল না, অধৈর্য হয়ে বলে ফেলল, সবাই চুপ করে আছ কেন? বলে ফেল কেউ একজন।

ঠিক আছে আমি বলছি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, বাতাসের বেগ মনে হয় আরো একটু বেড়েছে। বাইরে গাছের ডালগুলো এখন দাপাদাপি করছে।

ঘরের ভিতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে আমি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমরা শ্যালক্স গ্রুনকে ত্রিনিত্রি রাশিমালা দেব। সেটি হবে আসলটির কাছাকাছি কিন্তু আসলটি নয়।

আমি দেখলাম সবাই কেমন যেন শিউরে উঠল। নুবা চাপা গলায় বলল, হায় ঈশ্বর! তুমি পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা কর।

ইগা মাথা ঘুরিয়ে নুবার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই জান ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

নুবা মাথা নেড়ে বলল, না আমি জানি না। কিন্তু আমার ভাবতে ভালো লাগে ঈশ্বর বলে একজন খুব ভালবাসা নিয়ে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করে যাবেন।

ব্যাপারটি তোমার ঈশ্বরের জন্যে আরো সহজ হত যদি তিনি শ্যালক্স গ্রুনের জন্ম না দিতেন!

হিশান হঠাৎ হা হা করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে! নুবা এক ধরনের আহত দৃষ্টি নিয়ে ইগা এবং হিশানের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি বললাম, তোমরা এখন একজন আরেকজনের পিছনে লেগে সময় নষ্ট কোরো না। আমাদের অনেক কাজ বাকি—

ইগা মাথা নাড়ল, আসলে কাজ খুব বেশি বাকি নেই। সবচেয়ে বড় কাজটি ছিল সিদ্ধান্তটি নেয়া, সেটি যখন নেয়া হয়ে গেছে অন্য কাজগুলো সহজ।

কিন্তু সিদ্ধান্তটি কি নেয়া হয়েছে?

সবাই নুবার দিকে ঘুরে তাকাল। নুবা একটু অবাক হয়ে বলল, সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?

ইগা বলল, দুটি কারণে। প্রথম কারণ, তোমার ভিতরে একটি সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা রয়েছে, আমরা সবাই সেই নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি। দ্বিতীয় কারণ, তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর। এই ধরনের গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হলে মনে হয় ঈশ্বরের বিশ্বাস করা খারাপ নয়। খানিকটা দায়-দায়িত্ব তাঁকে দেয়া যায়—

বাজে কথা বোলো না।

ইগা হেসে বলল, আমি কথাটি হালকাভাবে বলেছি, কিন্তু কথাটি সত্যি।

নুবা ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল এবং আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। ধীরে ধীরে নুবার মুখে এক ধরনের কাঠিন্য এসে যায়। সে দীর্ঘ সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি শ্যালক্স গ্রুনকে সত্যিকারের ত্রিনিত্রি রাশিমালা দেয়া হবে না।

চমৎকার! হিশান উঠে গিয়ে নুবার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, এখন আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে দাও।

বেশ। নুবা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, শ্যালক্স গ্রুন ত্রিনিত্রি রাশিমালা হাতে পাওয়ার পর সেটি সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখবে। সে কীভাবে সেটি পরীক্ষা করবে সেটা আমাদের আগে থেকে জানতে হবে। সেটা বের করার দায়িত্ব দিচ্ছি রিকি এবং য়োমিকে। তোমাদের আপত্তি আছে?

আমি এবং য়োমি একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম তারপর মাথা নাড়লাম, না আপত্তি নেই।

চমৎকার। যেহেতু আমরা সত্যিকারের ত্রিনিত্রি রাশিমালা দেব না, এবং শ্যালক্স গ্রুন সেটা জানে না—আমরা তার যন্ত্রপাতির মাঝে তার কম্পিউটারের তথ্য ডাটাবেসের মাঝে বড় পরিবর্তন করে দিতে পারব। সেটি কীভাবে করা হবে তার একটা ধারণা করার দায়িত্ব দিচ্ছি ইগা এবং হিশানকে।

ইগা এবং হিশান খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। হিশান মাথা চুলকে বলল, আমি আসলে বিজ্ঞান ভালো জানি না—

জানার প্রয়োজনও নেই। সে ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা।

বেশ। হিশান মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করবে?

শ্যালক্স গ্রুন যখন ত্রিনিত্রি রাশিমালা পরীক্ষা করে দেখবে সারা পৃথিবীতে তখন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটবে। আমি চেষ্টা করব সেটি যেন সত্যিকারের প্রলয় কাণ্ড না হয়। সেটি যেন

দেখায় প্রলয় কাণ্ডের মতো—কিন্তু আসলে যেন প্রলয় কাণ্ড না হয়। ব্যাপারটিতে আমার তোমাদের সাহায্যের দরকার হবে কিন্তু সেটি নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা নয়।

আমরা মাথা নাড়লাম, না কোনো সমস্যা নয়। চমৎকার, এবার তাহলে জেনারেল ইকোয়াকে ডাকা যাক।

নুবা তার লাল কার্ডটি স্পর্শ করতে যাচ্ছিল ঠিক তখন য়োমি বলল, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জান জেনারেল ইকোয়া একজন রবোট?

আমরা মাথা নাড়লাম, জানি।

য়োমি হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকাল, রিকি তুমি ঠিক কখন সেটা বুঝতে পেরেছ?

প্রথমদিন যখন দেখা হল, আমাদের লাল কার্ড দেয়া হয়েছে শুনে যখন খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। তার চোখের দিকে তাকাতেই মনে হল কী যেন নেই—

তুমি যদি চোখের দিকে না তাকাতে তাহলে কি বলতে পারতে?

না, মনে হয় না। আজকাল এত চমৎকার মানুষের মতো রবোট তৈরি করে যে সেটা বলা খুব কঠিন।

আমি হঠাৎ ঘুরে য়োমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন এটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে?

য়োমি চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, না, এমনি জানতে চেয়েছি।

য়োমির গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে আমার কাছে থেকে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে। কী হতে পারে সেটি? কেন সে আমাকে জানতে দিতে চায় না?

AMARBOI.COM

৭

একটা ছোট ঘরে আমি আর য়োমি মুখোমুখি বসে আছি। আমাদের সামনে একটা টেবিল, টেবিলে একটি ইলেকট্রনিক নোট প্যাড—সেটি এখনো পুরোপুরি ফাঁকা, তাতে কিছু লেখা হয় নি। য়োমি টেবিলে ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, রিকি, তুমি আবার গোড়া থেকে বল ঠিক কী হয়েছিল শ্যালক্স গ্রুনের সাথে।

য়োমি, আমি এই নিয়ে তিনবার বলেছি।

হ্যাঁ। কিন্তু প্রত্যেকবার একটু নূতন জিনিস বলেছ! আমার সবকিছু জানতে হবে। মানুষটা কীভাবে চিন্তা করে আমার বুঝতে হবে।

আমি তোমাকে বলেছি মানুষটি কীভাবে চিন্তা করে।

কিন্তু সেটা তোমার মতো করে বলেছ—সেটা যথেষ্ট নয়। মনে রেখো মানুষটা অসম্ভব প্রতিহিংসাপরায়ণ—তুমি সেটা জান না!

তুমি জান?

তোমার থেকে বেশি জানি। বল আবার।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করি, য়োমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে দেখে মনে হয় একটি হিংস্র শ্বাপদ, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সমস্ত স্নায়ু টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার পুরোটুকু বলে শেষ করতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, আমি নিজেও জানতাম না আমার এত রকম খুঁটিনাটি মনে ছিল। মানুষের মস্তিষ্ক নিঃসন্দেহে একটি অবিশ্বাস্য জিনিস। আমার কথা শেষ হবার পর য়োমি অনেকক্ষণ আমার দিকে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নি। ভাবছি।

কী ভাবছ?

তুমি জান আমি কী ভাবছি। শ্যালক্স গ্রুন একজন সাধারণ মানুষ নয়। ত্রিনিত্রি রাশিমালা হাতে নিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখবে এটা সত্যি কি না। মানুষটির বিষাক্ত জিনিসের দিকে একটা আসক্তি আছে—প্রথমেই নিশ্চয়ই কিছু বিষাক্ত কেমিক্যাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। একটি দুটি মহাকাশযান ধ্বংস করবে, কিছু উপগ্রহ উড়িয়ে দেবে—ইতস্তত পারমাণবিক বোমা ফেলবে—কিন্তু সেগুলো সহজ! পৃথিবীর মূল কম্পিউটারে এই সবকিছুই তৈরি করা সম্ভব। পৃথিবীর তথ্যকেন্দ্র থেকে এইসব খবর প্রচার করা সম্ভব, বাতাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কেমিক্যাল, তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব, বিস্ফোরণ শকওয়েভ সবকিছু তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু শ্যালক্স গ্রুন খুব ধূর্ত মানুষ—সে আরো একটা কিছু করবে—অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটা পরীক্ষা, আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।

বুঝতে পেরেছ?

না। এখনো বুঝতে পারি নি। সেটা যতক্ষণ বুঝতে না পারছি আমি শান্তি পাচ্ছি না।

য়োমি টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ঘরটিতে হাঁটতে থাকে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে খাঁচায় আটকে রাখা একটি বন্য পশুর মতো। মেয়েটির চেহারায় একটি আশ্চর্য সতেজ ভাব যেটি সাধারণত চোখে পড়ে না। য়োমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, রিকি।

কী হল?

চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

জানি না। বদ্ধ ঘরে আটকে থাকলে আমার মাথা কাজ করে না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ঠিক আছে তাহলে, চল যাই।

বাইরের ঘরে হিশান এবং ইগার সাথে একজন বুড়োমতো মানুষ বসেছিল। মানুষটিকে খানিকটা উত্তেজিত দেখাচ্ছে, শুনতে পেলাম মানুষটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে, তোমাদের ধারণা শ্যালক্স গ্রুন সাংঘাতিক প্রতিভাবান মানুষ—

ইগা একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, আমরা তো তাই জানতাম! এক শ বছর আগের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেউ যদি ভবিষ্যতে চলে আসতে পারে—

তুমি ভবিষ্যতে যেতে চাও? আমি তোমাকে ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেব!

কীভাবে?

তোমাকে শীতলঘরে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তোমার শরীর তরল নাইট্রোজেন তাপমাত্রায় রেখে দেব এক শ বছর। জেগে উঠে দেখবে ভবিষ্যতে চলে এসেছ—

কিন্তু শ্যালক্স গ্রুন তো সেভাবে আসে নি। চতুর্মাত্রিক সময়ক্ষেত্র ছেদ করে—

বুড়োমতো মানুষটি হাত ঝাঁকিয়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বলল, চার শ বছর আগে আইনস্টাইন বলে গিয়েছিলেন, গতিবেগ বাড়াতে থাক সময় ধীর হয়ে যাবে। শ্যালক্স গ্রুন তাই করেছে, অসম্ভব শক্তিশালী কয়েকটা কুরু ইঞ্জিন চুরি করে একটা বাক্সের সাথে জুড়ে দিয়েছে! আর কিছু না—

হিশান মাথা নাড়তে থাকে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, যদি গতিবেগ বাড়িয়ে সে সময়কে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে তাহলে তার এই গ্রহ নক্ষত্র পার হয়ে বহুদূরে চলে যাবার কথা ছিল! সে তো পৃথিবীতেই আছে—

বুড়োমতো মানুষটা মুখ কুঁচকে বললেন, হ্যাঁ, সেই জন্যে তাকে খানিকটা বাহবা দেয়া যায়। গতি দু রকমের হতে পারে। তুমি সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তন করছ কিংবা তোমার চারপাশে যে ক্ষেত্রটি আছে সেটাকে পরিবর্তন করছ। প্রচণ্ড শক্তি ক্ষয় করে সেটা করা যায়—কাজটি বিপজ্জনক কিন্তু শ্যালক্স গ্রুন বিপজ্জনক কাজকে ভয় পায় না।

ইগা হঠাৎ চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তার মানে আপনি বলছেন, প্রচণ্ড গতিবেগ এবং শ্যালক্স গ্রুন যেটা করছে সেটা খুব কাছাকাছি একটা ব্যাপার?

হ্যাঁ। মনে কর প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্যে একটা জায়গায় ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হয়ে আছে—

ইগা বাধা দিয়ে বলল, যদি আপনাকে বলা হয় আপনি কুরু ইঞ্জিনটির মাঝে কিছু একটা পরিবর্তন করে দেন, যেন সে ভবিষ্যতে না গিয়ে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে এই সৌরজগতের বাইরে চলে যাবে আপনি সেটা করতে পারবেন?

আমি নিজে সেটা পারব না, কিন্তু গোটা চারেক যান্ত্রিক রবোট, মূল কম্পিউটারে খানিকটা সময়, কিছু ভালো প্রোগ্রামার, কিছু যন্ত্রপাতি দেয়া হলে এমন কিছু কঠিন নয়! কিন্তু আমাকে এটা জিজ্ঞেস করছ কেন? সত্যি এটা করতে চাও নাকি?

য়োমি আমার হাত ধরে বাইরে টেনে নিতে নিতে বলল, বিজ্ঞানের কথা শুনতে ভালো লাগছে না—চল বাইরে যাই।

কিন্তু ইগা বুদ্ধিটা মন্দ বের করে নি। ভবিষ্যতে না পাঠিয়ে শ্যালক্স গ্রুনকে পাঠিয়ে দেবে বিশ্বজগতের বাইরে!

AMARBOI.COM

আমরা যখন বাইরে এসেছি তখন অন্ধকার হয়ে এসেছিল। এলাকাটি নির্জন, মানুষজন নেই তাই আমাদের পিছনে দূরত্ব রেখে যে চারটি ছায়ামূর্তি হাঁটছে তারা যে নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষ এবং রবোট বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না। কেউ সবসময় আমাকে চোখে চোখে রাখছে ব্যাপারটা চিন্তা করতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখন আমাদের কিছু করার নেই।

আমি আর য়োমি পাশাপাশি হাঁটছি—ঠিক কী কারণে জানি না আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে হল। আমি ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, সাথে সাথে য়োমি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ত্রিশার কথা মনে পড়েছে?

হ্যাঁ। সবসময় মনে পড়ে।

তুমি কি তার সাথে দেখা করতে চাও?

আমি সবসময় তার সাথে দেখা করতে চাই।

তাহলে দেখা করছ না কেন?

এখন তার ঠিক সময় নয়, য়োমি।

কেন এ কথা বলছ? আমাদের একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমরা সেটা করছি। আমার মনে হয় এটা চমৎকার সময়। চল ত্রিশার সাথে দেখা করি।

আমি একটু অবাক হয়ে য়োমির দিকে তাকালাম, কী বলছ তুমি? তুমি ত্রিশার সাথে দেখা করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়োমি একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, এক ধরনের কৌতূহল বলতে পার। চল যাই।

সত্যি সত্যি আমি আর য়োমি কিছুক্ষণের মাঝে শহরের একটা দরিদ্র এলাকায় মাটির নিচে গভীর সুড়ঙ্গের মাঝে একটি প্রোগ্রামিং ফার্মে এসে হাজির হলাম। এক সময় মানুষের ধারণা ছিল বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উন্নতি হবার পর মানুষ বুঝি অর্থহীন গৎবাঁধা কাজ থেকে মুক্তি পাবে। সেই কাজ করা হবে যন্ত্র দিয়ে কিন্তু সেটি সত্যি বলে প্রমাণিত হয় নি। এখনো মানুষকে অর্থহীন কাজ করে যেতে হয়। কে জানে এখন যে কাজকে অর্থহীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয় এক সময় হয়তো সেই কাজটিকেই খুব বুদ্ধিমত্তার কাজ বলে বিবেচনা করা হত।

আমি আর য়োমি যখন পৌঁছেছি তখন একটি দলের কাজ শেষ হয়েছে, তারা ক্লান্ত পায়ে ছোট ছোট গেট দিয়ে বের হয়ে আসছে। য়োমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ত্রিশাকে কি দেখছ?

এখনো দেখি নি।

আমি আর য়োমি দাঁড়িয়ে থেকে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন ত্রিশা বের হয়ে এল। মাথায় একটা লাল স্কার্ফ শক্ত করে বেঁধে রেখেছে, শরীরের কাপড় ধুলায় ধূসর। চোখের কোনায় ক্লান্তি। হাতে একটি ছোট ব্যাগ নিয়ে সে ক্লান্ত পায়ে বের হয়ে এসে উপরের দিকে তাকাল। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, মুখে কী গভীর বিষাদের ছাপ।

য়োমি আমার হাত স্পর্শ করে বলল, যাও রিকি। কথা বল।

না, আমি যেতে চাই না।

কেন নয়? যাও।

ঠিক তখন ত্রিশা ঘুরে আমার দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়।

আমি ত্রিশার দিকে এগিয়ে গেলাম। ত্রিশা মাথার স্কার্ফটি খুলে সেটা দিয়ে মিছেই তার মুখের ধুলা ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, তুমি?

হ্যাঁ।

কেন এসেছ তুমি?

আমি জানি না ত্রিশা।

ত্রিশা কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, আমিও দাঁড়িয়ে থাকি। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়, আমি কী বলব বুঝতে পারি না। ত্রিশা হঠাৎ মুখ তুলে বলল, তুমি আর এসো না।

ঠিক আছে। আর আসব না।

এখন যাও।

হ্যাঁ যাব। তুমি ভালো আছ ত্রিশা?

হ্যাঁ ভালো আছি।

আমরা আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। ত্রিশা হাতের স্কার্ফটি তার ব্যাগের মাঝে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কিটি ভালো আছে?

কিটি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভালো আছে। তার সাথে আমার অনেকদিন দেখা হয় নি।

দেখা হয় নি? কেন?

আমি—আমি—আমি আসলে কয়দিন বাসায় যাই নি।

ত্রিশা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। আমরা আবার খানিকক্ষণ

AMARBOI.COM

দাঁড়িয়ে রইলাম। ত্রিশা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি এখন যাই। খাবারের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরে।

ত্রিশা—

কী?

আমি তোমার সাথে আসি?

ত্রিশা হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকাল তারপর মাথা নেড়ে বলল, না। প্লিজ না।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিক আছে ত্রিশা।

আমি আর য়োমি কোনো কথা না বলে পাশাপাশি হেঁটে যেতে থাকি। য়োমির মুখ কেমন যেন বিষণ্ন। কিছু একটা চিন্তা করছে খুব গভীরভাবে। আমি চেষ্টা করলে বুঝতে পারি মানুষ কী ভাবছে, কিন্তু এখন চেষ্টা করতে ইচ্ছে করছে না।

যে বাই ভার্বালটি করে আমরা এখানে এসেছি সেটা বড় রাস্তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে আর য়োমিকে ফিরে আসতে দেখে দুজন মানুষ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। আমি য়োমিকে বললাম, তুমি যাও। আমি খানিকক্ষণ একা হেঁটে আসি।

কোথায় যাবে?

আমার আগের বাসায়।

কেন?

আমার রবোটটির সাথে অনেকদিন দেখা হয় নি। একটু কথা বলে আসি।

কিটি আমাকে দেখে উল্লসিত বা বিস্মিত হলো না—তার সে ক্ষমতাও নেই। ঘুরঘুর করে আমার চারপাশে ঘুরে বলল, তোমার চিঠিপত্র, টেলি জার্নাল নিয়ে আসব?

দরকার নেই কিটি।

তোমার খাবার কি গরম করব?

তারও কোনো প্রয়োজন নেই।

তোমার কাপড় জামা পরিষ্কার করে দেব?

কোনো প্রয়োজন নেই।

তুমি কি মানসিক ভারসাম্যহীন?

না, আমার মানসিক ভারসাম্যতা ঠিকই আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

কিটি ঘুরঘুর করে পাশের ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, তোমাকে কয়েকজন মানুষ খোঁজ করেছিল। আমি তাদেরকে বলেছি ইয়োরন রিসি তোমাকে কোনো সমস্যা সমাধান করতে ডেকে পাঠিয়েছেন।

তারা তোমার কথা বিশ্বাস করেছে?

নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছে। আমি কখনো ভুল তথ্য দিই না।

ও।

ইয়োরন রিসি তোমাকে কী সমস্যা সমাধান করতে দিয়েছেন?

খুব একটা জটিল সমস্যা। একজন অত্যন্ত খারাপ মানুষ—

মানুষ কেমন করে খারাপ হয়?

আমি একটু থতমত খেয়ে থেমে গেলাম, প্রশ্নটির উত্তর আমার জানা নেই।

AMARBOI.COM

গভীর রাতে আমি আমাদের ছোট কাঠের বাসায় ফিরে এসে দেখি নুবা জানালায় চুপচাপ পা তুলে বসে আছে। আমাকে দেখে একটু হেসে বলল, তোমার রবোট কেমন আছে?

ভালো। য়োমি কি ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ। নুবা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, ফিরে এসেছে।

য়োমির ধারণা শ্যালক্স গ্রুন খুব একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষা করবে—এখনো জানে না ঠিক কী হতে পারে—

হ্যাঁ, আমাকে বলেছে।

আমি নুবার দিকে তাকালাম, সে আমার কাছে কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছে। কী হতে পারে' সেটা?

ভোররাতে ইগা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। আমি চোখ খুলে অবাক হয়ে বললাম, কী হয়েছে ইগা?

মহামান্য ইয়োরন রিসি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

আমার সাথে? আমি ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে বসলাম।

৮

আমি যখন ঘরে ঢুকেছি তখন ইয়োরন রিসি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন। ঘরে নুবা আর হিশানও আছে, য়োমিকে কোথাও দেখা গেল না। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে ইয়োরন রিসি ঘুরে তাকালেন, সাথে সাথে তার মুখে সহৃদয় একটা হাসি ফুটে উঠল। বললেন, রিকি তোমাকে ঘুম থেকে তুলে ফেললাম!

AMARBOI.COM

আমি অভিবাদন করে বললাম, সেটি আমার জন্যে একটি অকল্পনীয় সম্মান।

শুনে খুশি হলাম। আমাকে কেউ যদি মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে ফেলে আমার খুব মেজাজ গরম হয়ে যায়। যাই হোক, রিকি আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

আমাকে?

হ্যাঁ। আমি অন্যদের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে আমি তোমাকে নিতে পারি। তুমি আর য়োমি একসাথে কাজ করছিলে?

জি, মহামান্য ইয়োরন রিসি।

য়োমি সম্ভবত একাই করতে পারবে, তোমার সাথে তো কথা হয়েছে?

জি, মহামান্য ইয়োরন রিসি।

সে তো ছোটাছুটি করছে দেখছি। তুমি চল আমার সাথে। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

মহামান্য ইয়োরন রিসি আমার সাথে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে খুব জরুরি কথা কিন্তু সারা রাস্তা তিনি আমার সাথে হালকা কথা বলে কাটিয়ে দিলেন। আমি কী খেতে পছন্দ করি, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত পছন্দ করি কি না, বিমূর্ত শিল্প তুলে দিলে কেমন হয়—আমাদের কথাবার্তা এই ধরনের বিষয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। মানুষটির মাঝে এক ধরনের বিস্ময়কর সারল্য রয়েছে যেটি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না।

তার ঘরে পৌঁছানোর পর একটা বড় টেবিলের দুপাশে আমরা মুখোমুখি বসলাম। তিনি দীর্ঘ সময় আমার দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার কী মনে হয় রিকি, পরিকল্পনাটি কি ঠিক করে কাজ করবে?

নিশ্চয়ই করবে। মহামান্য রিসি। নিশ্চয়ই করবে।

তুমি জান যে পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু নির্ভর করছে তোমার ওপর।

আমার ওপরে?

হ্যাঁ। তোমার ওপরে। কারণ ত্রিনিত্রি রাশিমালাটি নিয়ে যাবে তুমি।

আমি নিজের অজান্তেই একটু শিউরে উঠি। ইয়োরন রিসি আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার কি ভয় করছে?

আমি মাথা নাড়লাম, করছে মহামান্য ইয়োরন রিসি।

ইয়োরন রিসি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু তবু তোমাকেই যেতে হবে।

আমি জানি।

তুমি সম্ভবত একমাত্র মানুষ যে শ্যালক্স গ্রুনের সাথে পাল্লা দিতে পারবে। তার অসম্ভব ধূর্ত চোখকে ধোঁকা দিতে পারবে। শুধু তুমিই তাকে একটি অসম্পূর্ণ ত্রিনিত্রি রাশিমালা ধরিয়ে দিতে পারবে—

আমি আগে কখনো কাউকে মিথ্যা কথা বলি নি।

আমি জানি। ইয়োরন রিসি আমার দিকে নরম চোখে তাকালেন, বললেন, তুমি পৃথিবীর মানুষের মুখ চেয়ে একবার একটি মিথ্যে কথা বলবে। সেটিকে মিথ্যা জেনে নয়—সেটাকে সত্যি জেনে বলবে!

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, আমি বলব মহামান্য রিসি। আমি আমার শেষ শক্তি দিয়ে এই মিথ্যাটুকু বলব।

আমাকে তুমি কথা দাও।

আমি কথা দিচ্ছি।

ইয়োরন রিসি এগিয়ে এসে আমার হাত স্পর্শ করলেন।

পরের কয়েক ঘণ্টা আমাকে ত্রিনিত্রি রাশিমালা সম্পর্কে শেখানো হল। আমি ব্যাপারটি ভাসা ভাসাভাবে জানতাম, এবার প্রথমবার সেটির খুঁটিনাটি জানতে পারলাম। পৃথিবীর সভ্যতা যেন পরস্পরবিরোধী হয়ে গড়ে না ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ত্রিনিত্রি এই রাশিমালাটি দিয়েছিলেন। সময়ের সাথে এই রাশিমালাটির পরিবর্তন হয়, ব্যবহারের সাথেও এর পরিবর্তন হয়। পুরোপুরি এই রাশিমালাটি কখনো কেউ জানতে পারে না। কেউ যদি জানার চেষ্টা করে সে একটি অংশ জানতে পারে কিন্তু অন্য অংশ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসে। পদার্থবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তার সূত্রের মতো এই রাশিমালাতেও এক ধরনের অনিশ্চয়তা লুকানো রয়েছে, শ্যালক্স গ্রুনের বিরুদ্ধে সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। সে যখন রাশিমালাটি পরীক্ষা করে দেখবে। যতই তার গভীরে যাবার চেষ্টা করবে ততই একটা অংশ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকবে। তার নিজের নিরাপত্তার জন্যেই সে কোনো একটি বিষয়ের খুব গভীরে যেতে চাইবে না।

ত্রিনিত্রি রাশিমালা সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়ে যাবার পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একদল বিজ্ঞানী আর গণিতবিদ আমাকে নিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা, সামরিক প্রতিষ্ঠান, মহাজাগতিক ল্যাবরেটরি, যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঘুরে বেড়ালেন। ত্রিনিত্রি রাশিমালা

AMARBOI.COM

কেমন করে ব্যবহার করা যায় সেটা শেখালেন, আমি সেটা ব্যবহার করে একটা মহাকাশযানকে তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে দিলাম, একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে খানিকক্ষণের জন্যে একটি শহরকে অন্ধকার করে রাখলাম। আমি এখন ইচ্ছে করলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি। যুদ্ধজাহাজ পাঠাতে পারি। উপগ্রহদের ধ্বংস করে দিতে পারি। ক্রিস্টাল ডিস্কে সাজিয়ে রাখা কিছু সংখ্যার যে এত বড় ক্ষমতা হতে পারে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন।

ত্রিনিত্রি রাশিমালায় অভ্যস্ত হতে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এক সময় বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদেরা তাদের যান্ত্রিক কাজে পারদর্শী রবোটদের নিয়ে বিদায় নিলেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটি ঘরে, সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন মহামান্য ইয়োরন রিসি। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, খুব খাটুনি গিয়েছে, তাই না।

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। কিন্তু পরিশ্রমটির প্রয়োজন ছিল। ত্রিনিত্রি রাশিমালা কী এখন আমি জানি।

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যে রাশিমালাটি নিয়ে যাবে সেটি সত্যিকারের নয়। সেটি প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে তোমাদের অন্য চার জন সেটি পরীক্ষা করে দেখছে।

কখন সেটি সম্পূর্ণ হবে?

আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণের মাঝেই।

আমি কখন সেটি নিয়ে যাব?

তোমার যখন ইচ্ছা। আমার মনে হয় এখন তোমার খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার। তুমি কোথায় বিশ্রাম নিতে চাও?

আমি কি আমার নিজের বাসায় নিতে পারি?

ইয়োরন রিসি মৃদু হেসে বললেন, কিটির কাছে?

হ্যাঁ, মহামান্য ইয়োরন রিসি। আমার স্নায়ু খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। কিটির সাথে কথা বললে আমার স্নায়ু সবসময়ই শীতল হয়ে আসে।

তুমি তাহলে যাও। যখন সময় হবে আমরা তোমাকে নিয়ে আসব।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ইয়োরন রিসি এগিয়ে এসে আমাকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে দেখে কিটি কোনো ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ করল না। কয়েকবার আমার চারপাশে ঘুরে বলল, তোমার কাপড় জামা পাল্টানোর সময় হয়েছে। আমি কি নূতন কাপড় নিয়ে আসব?

তার কোনো প্রয়োজন নেই।

তোমার খাবার কি গরম করব?

আমি খেয়ে এসেছি কিটি।

তোমার টেলি জার্নাল চিঠিপত্র—

এখন দেখতে ইচ্ছে করছে না।

কিটি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, তুমি কি মানসিক ভারসাম্যহীন?

আমি হেসে বললাম, বলতে পার আমি এখন এক ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন! আমার ওপর খুব বড় একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেই বড় দায়িত্বটি এত বড় যে তার তুলনায় অন্য সবকিছু এখন গুরুত্বহীন মনে হয়। সবকিছু হাস্যকর ছেলেমানুষি এবং অর্থহীন

amarboi.com

মনে হয়।

কিটি কী বুঝল আমি জানি না কিন্তু এক ধরনের গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, আমি তোমার জন্যে দুঃখিত রিকি। আমি কি কোনোভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

তুমি কীভাবে আমাকে সাহায্য করতে চাও?

প্রয়োজন হলে আমি তোমার জন্যে সেই বড় দায়িত্বটি করতে পারি।

আমি হেসে ফেললাম, না, কিটি তুমি সেটা করতে পারবে না।

কেন নয়?

কারণ আমাকে একজন মানুষের সামনে একটি খুব বড় মিথ্যা কথা বলতে হবে। সে যদি বুঝতে পারে আমি মিথ্যা কথা বলছি তাহলে খুব ভয়ঙ্কর একটি ব্যাপার হবে।

মিথ্যা মানে কী?

আমি হেসে বললাম, তুমি সেটা জানতে চেয়ো না কিটি! আমি যদি বলি তবুও তুমি বুঝবে না। কোনো পশুপাখি মিথ্যাচার করে না, কোনো যন্ত্রও মিথ্যাচার করে না। মিথ্যাচার করে শুধু মানুষ—কখনো ইচ্ছে করে, আর কখনো করে যখন তার আর কোনো উপায় থাকে না। আমার আর কোনো উপায় নেই কিটি।

আমি তোমার জন্যে দুঃখিত রিকি। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি আমার কপোট্রনের চতুর্থ অংশের তৃতীয় পিনটিতে ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটছে। এটি নিশ্চিত দুঃখের অনুভূতি।

আমি এক ধরনের স্নেহের চোখে এই পরিপূর্ণ নির্বোধ রবোটটির দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি বুঝতে পারছি আমার স্নায়ু শীতল হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মাঝেই আমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যেতে পারব।

AMARBOI.COM

৯

আমরা পাঁচ জন শ্যালক্স গ্রুনের কদাকার সময়-পরিভ্রমণ যানটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, এই পুরো এলাকাটিতে কৃত্রিম আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই, আবছা অন্ধকারে সময়-পরিভ্রমণ যানটিকে দেখাচ্ছে একটা অশুভ প্রেতপুরীর মতো।

য়োমি নিচু গলায় বলল, কী বীভৎস একটা জিনিস। রিকি আমি চিন্তাও করতে পারি না তুমি কেমন করে এর ভিতরে যাবে।

আমি য়োমির দিকে তাকিয়ে বললাম, আমিও পারি না।

থাক, এখন সেসব কথা তুলে লাভ নেই। নুবা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, তোমার কাছে ত্রিনিত্রি রাশিমালার ক্রিস্টাল ডিস্কটা আছে?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আছে।

তাহলে তুমি যাও শ্যালক্স গ্রুনের কাছে।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেলাম। ঘুরে তাকিয়ে বললাম, যদি আমাদের পরিকল্পনা কাজ না করে তাহলে কী হবে?

নুবা নিচু স্বরে বলল, এখন সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু যদি কিছু একটা ভুল হয়ে যায়?

হিশান এগিয়ে এসে আমার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, ওই যে উপরে তাকিয়ে দেখ।

আমি উপরে তাকালাম, আকাশে রুপালি একটা গোলক স্থির হয়ে আছে। আমি একটু অবাক হয়ে হিশানের দিকে তাকালাম, কী ওটা?

থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা। যেটুকু আছে সেটা দিয়ে অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার কথা।

এটা কেন এখানে?

যে তাপমাত্রায় লিট্রুমিনা-৭২ ভাইরাসকে ধ্বংস করা যায় সেই তাপমাত্রা সৃষ্টি করার এটা হচ্ছে একমাত্র উপায়। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আগে সেগুলোকে ধ্বংস করা যাবে কি না সেটা কেউ এখনো জানে না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখা হবে।

যদি না যায়?

পৃথিবীর গোপন ভল্টে অসংখ্য শিশুকে শীতলঘরে রাখা আছে। মহাকাশে অসংখ্য মানুষকে, বিজ্ঞানীকে ইঞ্জিনিয়ার শিল্পী সাহিত্যিককে পাঠানো হয়েছে। যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তারা বেঁচে থাকবে। আবার নূতন করে সভ্যতার সৃষ্টি হবে।

আমি স্থির চোখে হিশানের দিকে তাকিয়ে বললাম, হিশান, সত্যি কি আবার নূতন করে সভ্যতার সৃষ্টি করতে হবে?

না রিকি। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। তুমি যাও।

ইগা ফিসফিস করে বলল, তোমার যাত্রা শুভ হোক রিকি।

আমি পায়ে পায়ে কদাকার যানটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। কাছাকাছি আসতেই একটি গোল দরজা খুলে গেল, শ্যালক্স গ্রুন আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। আমি দেয়াল ধরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলাম তবু অন্ধকারে আমার চোখ সয়ে গেল না। এক সময় কাঁপা গলায় ডাকলাম, শ্যালক্স গ্রুন।

ভিতরের গাঢ় অন্ধকার থেকে শ্যালক্স গ্রুনের গলার স্বর ভেসে এল, তুমি এসেছ?

হ্যাঁ।

ত্রিনিত্রি রাশিমালা এনেছ আমার জন্যে?

ছোট একটা ক্রিস্টাল ডিস্ক দিয়েছে আমাকে। তার মাঝে ত্রিনিত্রি রাশিমালা থাকার কথা।

তুমি সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে এ রকম হেঁয়ালি করে কেন কথা বলছ?

কারণ আমরা চেষ্টা করছি তোমাকে ধ্বংস করতে।

এক মুহূর্তের জন্যে শ্যালক্স গ্রুন কোনো কথা বলল না, তারপর হঠাৎ সে হা হা করে হেসে উঠল। অত্যন্ত ক্রূর সেই হাসি, আমার শরীর কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাসতে হাসতেই সে বলল, তোমার সাহস দেখে আমি এক ধরনের আনন্দ পাই! ব্যাপারটি ভালো কি না সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ নই কিন্তু ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কৌতুককর। তোমরা কি আমাকে ধ্বংস করতে পারবে?

সেটি ঠিক করা হবে এই কিছুক্ষণের মাঝে।

হঠাৎ করে ঘরের আলো জ্বলে ওঠে, আমি আবার শ্যালক্স গ্রুনকে সামনাসামনি দেখতে পেলাম, একটা দীর্ঘ টেবিলের অন্যপাশে বসে আছে। মাথায় এলোমেলো কালো চুল, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মনে হয় সেই দৃষ্টি আমার শরীর ভেদ করে যাচ্ছে। একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, কিছুক্ষণের মাঝে তুমি জানতে পারবে?

হ্যাঁ।

কেমন করে?

তোমাকে যে ক্রিস্টাল ডিস্কটি দিয়েছি তার মাঝে যে রাশিমালাটি রয়েছে সেটি একটি

অর্থহীন সংখ্যা না সত্যিকারের ত্রিনিত্রি রাশিমালা তুমি সেটা জান না। তোমাকে সেটা আমি নিজে থেকে বলব না, আমি বললেও তুমি বিশ্বাস করবে না। তোমার নিজেকে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জান ত্রিনিত্রি রাশিমালার মাঝে একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। যখন তুমি একটি অংশ পরীক্ষা করে দেখবে তখন অন্য একটি অংশ অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

শ্যালক্স গ্রুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বললাম, ত্রিনিত্রি রাশিমালার যে অংশ তোমার কাছে অস্পষ্ট সেই অংশটি আমাদের অস্ত্র। আজ থেকে এক শ বছর পর তুমি যখন আবার পৃথিবীতে নেমে আসবে পৃথিবী তখন তোমার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।

তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

হঠাৎ আমার বুক কেঁপে ওঠে, এই মানুষটি অসম্ভব ধূর্ত। আমি কি সত্যিই তাকে ধোঁকা দিতে পারব? শ্যালক্স গ্রুন আবার চাপা স্বরে বলল, তুমি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলছ, মানুষ মিথ্যা কথা বললে আমি বুঝতে পারি।

আমি চুপ করে রইলাম। শ্যালক্স গ্রুন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, কিছু একটা পরিকল্পনা তোমাদের আছে সেটা কী আমি এখনো জানি না। তুমি জান আমি যদি চাই আমি সেটা যখন ইচ্ছে জানতে পারব। আমি মানুষকে অসম্ভব যন্ত্রণা দিতে পারি। মনোবিজ্ঞানে আমার মতো চরিত্রের একটি গালভরা নাম রয়েছে।

হঠাৎ আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

আমি জিভ দিয়ে আমার শুকনো ঠোঁটকে ভিজিয়ে বললাম, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ?

না, আমি আলাদা করে কাউকে ভয় দেখাতে চাই না। তার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মানুষ এমনিতেই আমাকে ভয় পায়।

আমি শ্যালক্স গ্রুনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কী ভয়ঙ্কর নিষ্করুণ দৃষ্টি। আমার বুকের ভিতর শিরশির করতে থাকে, অনেক কষ্টে নিজেকে শক্ত করে আমি বললাম, তুমি কি আমার মুখে আমাদের পরিকল্পনাটি জানতে চাও?

হ্যাঁ, চাই।

কিন্তু আমি নিজে থেকে বলব না। তোমার সেটা জোর করে বের করতে হবে।

শ্যালক্স গ্রুন দীর্ঘ সময় আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বলল, তুমি ত্রিনিত্রি রাশিমালাটি আমার মূল কম্পিউটারে প্রবেশ করাও।

আমি গত দুই দিন এই ব্যাপারটি কেমন করে করতে হয় খুব ভালো করে শিখে এসেছি। শ্যালক্স গ্রুন আদেশ দেয়া মাত্র কাজে লেগে গেলাম। দীর্ঘ জটিল এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। এক সময় সেটি শেষ হল, আমি যোগাযোগ মডিউলটি শ্যালক্স গ্রুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে দেয়ালের পাশে সরে দাঁড়ালাম।

আমি ইচ্ছে করলে এখন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারি? যেখানে ইচ্ছে পারমাণবিক বোমা ফেলতে পারি? বাঁধ ভেঙে পানিতে শহর ডুবিয়ে দিতে পারি?

পার।

ইচ্ছে করলে আমি চোখের পলকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলতে পারি?

হ্যাঁ পার। কিন্তু ত্রিনিত্রি রাশিমালার উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়। তার উদ্দেশ্য সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ। আমি আশা করব তুমি সেটা ব্যবহার করবে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের মতো।

আমি কীভাবে সেটা ব্যবহার করব সেটা আমাকেই ঠিক করতে দাও।

শ্যালক্স গ্রুন যোগাযোগ মডিউলটি নিজের কাছে টেনে নিয়ে অত্যন্ত সহজ গলায় খুব কাছাকাছি একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণের আদেশ দিল। মানুষের জনবসতির উপর এত সহজে কেউ একটি এ রকম ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটানোর আদেশ দিতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমার বিশ্বাস হত না। মুহূর্তের মাঝেই প্রথমে তীব্র আলোর ঝলকানি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এক মুহূর্ত পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, সাথে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন পায়ের নিচে দুলে উঠল। কয়েক মুহূর্ত আশ্চর্য এক ধরনের নীরবতা তারপর হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে সমস্ত এলাকা উড়ে যেতে শুরু করল।

আমি দেয়াল খামচে ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শ্যালক্স গ্রুনের সময়-পরিভ্রমণ যানের ভিতর অসংখ্য মনিটর তীব্র স্বরে শব্দ করতে শুরু করে, একটি বড় লালবাতি বারবার জ্বলতে এবং নিভতে শুরু করে। কোথাও কিছু একটা ভেঙে গেছে বলে সন্দেহ হতে থাকে।

শ্যালক্স গ্রুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা প্যানেলের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছোট একটা নোট প্যাডে কিছু একটা হিসেব করে মাথার কাছে ছোট একটা গোল জানালা খুলে বাইরে তাকায় তারপর আবার ঘুরে আমার দিকে তাকাল, তার মুখে এক ধরনের সন্তুষ্টির ছাপ। সে একটু হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, আমি আগে কখনো পারমাণবিক বোমা ফেলি নি—চমৎকার একটি জিনিস। মুহূর্তের মাঝে তেজস্ক্রিয়তা কতগুণ বেড়ে যায়!

আমি কোনো কথা না বলে ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। শ্যালক্স গ্রুন আমার দৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, বিস্ফোরণটি খুব কাছাকাছি করা হল, মনে হচ্ছে এত কাছে না করলেও হত। আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম তোমরা আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছ কি না।

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, তুমি সেটা নিয়ে কখনো নিশ্চিত হতে পারবে না।

আমার প্রয়োজনও নেই। এই মুহূর্তে আমি শুধু একটা জিনিস নিয়ে নিশ্চিত হতে চাই।

কী?

আমি যেন নিরাপদে আরো এক শ বছর ভবিষ্যতে যেতে পারি।

আমি কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শ্যালক্স গ্রুন নিচু গলায় বলল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। আমার দুটি কুরু ইঞ্জিন পাল্টে নূতন দুটি ইঞ্জিন লাগিয়ে দেবে, আমি জানি তুমি সেটা করে দেবে। কেন জান?

কেন?

শ্যালক্স গ্রুন দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলল না। তার বড় চেয়ারটি ঘুরিয়ে সে সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল। তার মুখটি হঠাৎ কেমন জানি বিষণ্ন দেখাতে থাকে, সে এক ধরনের ক্লান্ত গলায় বলল, আমি বড় নিঃসঙ্গ।

হঠাৎ আমার বুক কেঁপে ওঠে। য়োমির কথা মনে পড়ল আমার—অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটা পরীক্ষা করবে শ্যালক্স গ্রুন। এটাই কি সেই পরীক্ষা?

শ্যালক্স গ্রুন তার হাত তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে আঙুলগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল, আমার একজন সঙ্গী প্রয়োজন। আমি বড় একা। তাছাড়া দীর্ঘদিন আমি কোনো রমণীর দেহ স্পর্শ করি নি।

আমি চমকে উঠলাম, চাপা গলায় চিৎকার করে বললাম, কী বলতে চাইছ তুমি?

আমি তোমার ভালবাসার মেয়েটিকে আমার সাথে নিয়ে যাব। কী নাম মেয়েটির?

মনে হল হঠাৎ আমার মাথার মাঝে একটা ছোট বিস্ফোরণ হল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না—হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম, মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, না-না-না—

না–না—

কী নাম মেয়েটির?

শ্যালক্স গ্রুন হঠাৎ তীব্র স্বরে চিৎকার করে ওঠে, কী নাম মেয়েটির?

ত্রিশা।

ত্রিশা! কী সুন্দর নাম!

আমি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকি। হঠাৎ সবকিছু আমার কাছে অর্থহীন হয়ে আসে, বিশাল শূন্যতায় আমার বুকের মাঝে হা হা করে ওঠে! হায় ঈশ্বর! তুমি এ কী করলে?

শ্যালক্স গ্রুন নরম গলায় বলল, উঠে দাঁড়াও তুমি। আমার খুব বেশি সময় নেই। কাজ শুরু করে দাও।

শ্যালক্স গ্রুন আমার দিকে যোগাযোগ মডিউলটি এগিয়ে দেয়। আমি তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

এক শ বছর পর আমি ত্রিশাকে ফিরিয়ে দেব। তুমি ইচ্ছে করলে শীতলঘরে এক শ বছর অপেক্ষা করতে পার। আমার কাছে এসো, আমি তখন তোমার হাতে ত্রিশাকে তুলে দেব। কথা দিচ্ছি।

আমি হিংস্র চোখে শ্যালক্স গ্রুনের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরে মানুষটিকে শেষ করে দেয়ার একটি অদম্য ইচ্ছে আমার মাথার মাঝে পাক খেতে থাকে।

কিন্তু আমি জানি আমি সেটা করতে পারব না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবন সে তার বুকের মাঝে একটি সিলাকিত কার্বনের ক্যাপসুলের মাঝে লুকিয়ে রেখেছে। একটি ছোট ভুলে সেই জীবন হারিয়ে যেতে পারে। আমি অসহায় আক্রোশে একটি দানবের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

AMARBOI.COM

১০

শ্যালক্স গ্রুনের সময়–পরিভ্রমণ যানটির একপাশে নিচু হয়ে নেমে গেছে শেষ মাথায় একটি গোল দরজা। আমি এই দরজা দিয়ে ঢুকেছি, ত্রিশাও এই দরজা দিয়ে ঢুকবে। আমি দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো পুরো ব্যাপারটি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে হঠাৎ গোল দরজাটা খুলে গেল। ত্রিশাকে কি ধরে এনেছে এখন? সে কি চিৎকার করে কাঁদছে? আমার বুকের ভিতর যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে। আমি কেমন করে ত্রিশার মুখের দিকে তাকাব?

গোল দরজায় একজন মানুষের ছায়া পড়ল, আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম। ত্রিশা পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। একটি লাল রুমাল দিয়ে মাথার চুলগুলো শক্ত করে বাঁধা, হালকা নীল রঙের একটা পোশাক। পায়ে বিবর্ণ একজোড়া জুতো।

দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ত্রিশা মাথা ঘুরে তাকায়। তার মুখে এক ধরনের অসহনীয় আতঙ্ক। সে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপা গলায় বলল, রিকি, তুমি কোথায়?

এই যে আমি এখানে।

ত্রিশা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমার কাছে ছুটে এল না। সেখানে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে ওরা এখানে এনেছে কেন?

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ত্রিশা আবার জিজ্ঞেস করল, রিকি, তুমি কথা বলছ না কেন? এটি কোন জায়গা, এখানে এ রকম আবছা অন্ধকার কেন?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, ত্রিশা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ত্রিশা।

তুমি এ কথা কেন বলছ?

তোমার ওপরে খুব বড় একটা অবিচার করা হবে ত্রিশা।

ত্রিশার গলার স্বর হঠাৎ কেঁপে যায়, কী অবিচার?

আমি ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, ত্রিশার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

ত্রিশা হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, তুমি কথা বলছ না কেন? কী হয়েছে রিকি?

আমি তবু কোনো কথা বলতে পারি না।

ত্রিশা দুই পা এগিয়ে এসে হঠাৎ শ্যালক্স গ্রুনকে দেখতে পেল। সাথে সাথে সে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, কে ওটা?

শ্যালক্স গ্রুন প্রায় হাসি–হাসি মুখে বলল, আমার নাম শ্যালক্স গ্রুন, তুমি সম্ভবত আমার নাম শুনে থাকবে।

ত্রিশা একটা চিৎকার করে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে পিছনে ছুটে যেতে থাকে। সে দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে গোল দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে দুই হাতে দরজায় আঘাত করতে করতে হঠাৎ আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললাম। হায় ঈশ্বর, তুমি কেন পৃথিবীতে এত অবিচার জন্ম দাও? কেন?

আমি আবার মাথা তুলে তাকালাম, শ্যালক্স গ্রুন শান্তমুখে তাকিয়ে আছে, মুখে এক ধরনের কোমল স্মিত হাসি। শুধুমাত্র সে–ই মনে হয় এ রকম হৃদয়হীন একটি পরিবেশেও এক ধরনের শান্তি খুঁজে পেতে পারে। শ্যালক্স গ্রুন হয়ে জন্ম নিতে হলে একজন মানুষকে কতটুকু নিষ্ঠুর হতে হয়?

আমি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে ত্রিশার দিকে এগিয়ে গেলাম। ত্রিশা বিকারগ্রস্তের মতো কাঁদছে, আমি পিছন থেকে তাকে ধরে সোজা করে দাঁড়া করালাম, সে ঘুরে দুই হাতে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফেলল। আমার বুকে মাথা গুঁজে সে হঠাৎ আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, রিকি তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না রিকি। আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না।

আমি দুই হাতে তার মুখ স্পর্শ করে নিজের দিকে টেনে আনি, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম।

কান্নাভেজা চোখে সে আকুল হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এই মেয়েটি ত্রিশা নয়। এই মেয়েটি অবিকল ত্রিশার মতো দেখতে একটি রবোট। শ্যালক্স গ্রুনের নিষ্ঠুর পরীক্ষাটি কী হবে য়োমি সেটি বুঝতে পেরেছিল, ঠিক ত্রিশার মতো দেখতে একটি রবোট তৈরি করে রেখেছিল আগে থেকে। আমাকে জানায় নি ইচ্ছে করেই। হঠাৎ করে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে।

ত্রিশার মতো দেখতে রবোটটি আমার বুকের কাপড় ধরে আবার আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। তার দুঃখে ভেজা ব্যথাতুর আতঙ্কিত মুখটি দেখে কেন জানি না হঠাৎ আমার চোখে পানি এসে যায়। এই মেয়েটি হয়তো সত্যিকারের মানুষ নয়, কিন্তু তার কষ্টটি সত্যি, তার দুঃখ হতাশা আর আতঙ্কটুকু সত্যি। আমার জন্যে তার ভালবাসাটুকুও সত্যি। মানুষ হয়ে

জন্য হয় নি বলে তার দুঃখ কষ্ট হতাশা আর ভালবাসাকে পায়ে দলে একজন দানবের হাতে তুলে দেয়া হবে।

আমি রবোট মেয়েটির মুখটি ধরে নিজের কাছে টেনে এনে তাকে গভীর ভালবাসায় চুম্বন করলাম। তাকে ফিসফিস করে বললাম, ত্রিশা, সোনামণি আমার, আমি আছি, আমি তোমার কাছে আছি। আমি সবসময় তোমার কাছে আছি—সবসময়—

আমার বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল যে আমি সত্যিই বুঝি থাকব ত্রিশার কাছে। হোক না সে রবোট তবুও তো সে ত্রিশা! আমার ভালবাসার ত্রিশা। কিন্তু আমি ত্রিশার কাছে থাকতে পারলাম না। শ্যালক্স গ্রুন পায়ে পায়ে আমাদের কাছে হেঁটে এল, ত্রিশাকে শক্ত করে ধরে রেখে সে গোল দরজাটি খুলে দিল। আমাকে বলল, যাও, শীতলঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। এক শ বছর পর এসো, আমি তোমাকে তোমার ত্রিশাকে ফিরিয়ে দেব।

ত্রিশা চিৎকার করে কাঁদছে। আমি তার দিকে পিছন ফিরে এগিয়ে গেলাম। আমার শরীর কাঁপছে, আমার চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসছে, ইচ্ছে করছে পিছনে ছুটে গিয়ে ত্রিশাকে আঁকড়ে ধরে বলি, এস ত্রিশা তুমি আমার সাথে এস।

কিন্তু আমি সোজা সামনে হেঁটে গেলাম, ফিসফিস করে নিজেকে বললাম, না, ওই মেয়েটি ত্রিশা নয়। ওই মেয়েটি একটি রবোট। রবোট। তুচ্ছ রবোট। আমি শুনতে পেলাম ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে পিছনের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল।

আমি সামনে তাকালাম, আবছা অন্ধকারে চার জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, দূর থেকে ভালো বোঝা যায় না, কিন্তু আমি জানি তারা কে। ইগা, হিশান, য়োমি আর নুবা। আমাকে দেখে তারা আমার কাছে ছুটে এল। য়োমি আমার হাত ধরে বলল, কী হয়েছে রিকি? তোমার চোখে পানি কেন?

আমি চোখ মুছে বললাম, জানি না কেন। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার ত্রিশার জন্যে। সে মানুষ নয় তবু আমার কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে।

য়োমি আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখল।

আমরা পাঁচ জন একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে শ্যালক্স গ্রুনের কদাকার সময়–পরিভ্রমণ যানটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কুরু ইঞ্জিন দুটি এখনো চালু করা হয় নি, আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছি। যেই মুহূর্তে কুরু ইঞ্জিন দুটি চালু করা হবে সাথে সাথে সুপ্ত গোপন প্রোগ্রামটি জীবন্ত হয়ে উঠে খুব ধীরে ধীরে সময়–পরিভ্রমণ যানটির নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করবে।

প্রথমে একটা চাপা গুঞ্জন শুনতে পেলাম, তারপর কুরু ইঞ্জিন দুটিতে মৃদু কম্পন শুরু হল। আমি বুকের মাঝে আটকে রাখা একটা নিশ্বাস খুব সাবধানে বের করে দিই, শ্যালক্স গ্রুন ইঞ্জিন দুটিকে চালু করেছে। প্রতি মুহূর্তে এখন একটু একটু করে সময়–পরিভ্রমণ যানের নিয়ন্ত্রণ তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কুরু ইঞ্জিনের ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা যেতে থাকে। থরথর করে মাটি কাঁপতে থাকে, আয়োনিত গ্যাস প্রচণ্ড বেগে বের হতে শুরু করেছে পিছন দিয়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় চারদিক ঢেকে যেতে শুরু করেছে, কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠছে।

সময়–পরিভ্রমণ যানটি আস্তে আস্তে মাটি থেকে উপরে উঠে আসছে, মনে হতে থাকে বিশাল একটি কীট বুঝি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যায়, তার মাঝে সময়–পরিভ্রমণ যানটি আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাচ্ছে, গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি। আর কয়েক মুহূর্ত পর সময়–

পরিভ্রমণ যানটি পৃথিবীর আকর্ষণ ছিন্ন করে মহাকাশে ছুটে যাবে। শ্যালক্স গ্রুন এখনো জানে না সে সময়-পরিভ্রমণ করবে না—তার পরিভ্রমণ হবে দূরত্বে। সে পৃথিবী, সৌরজগৎ পার হয়ে চলে যাবে দূর কোনো এক নক্ষত্রের দিকে। তার বুকের ভিতর সিলাকিত ক্যাপসুলে থাকবে এক ভয়াবহ ভাইরাস। তার কাছাকাছি থাকবে ত্রিশা। রবোটের অবয়বে তৈরী আমার ভালবাসার ত্রিশা। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, সময়-পরিভ্রমণ যানের কুরু ইঞ্জিন থেকে আয়োনিত গ্যাস বের করে সেটা উপরে উঠে যাচ্ছে, খুব ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করতে শুরু করেছে, পৃথিবীর আবর্তনের সাথে সাথে গতিবেগের সামঞ্জস্য আনার জন্যে। আকস্মিক কোনো বিস্ফোরণে ধ্বংস না হয়ে গেলে আর কেউ এখন শ্যালক্স গ্রুনকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কোনোদিন ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পৃথিবীর একটা অশুভ স্বপ্ন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মহাকাশে।

আমরা সবাই খুব সাবধানে বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিলাম। সত্যিই কি পৃথিবীকে রক্ষা করা হয়েছে? নুবা দেয়াল স্পর্শ করে খুব সাবধানে ঘাসের উপর বসে পড়ল। মাথা ঘুরিয়ে আমাদের সবার দিকে তাকাল, তারপর কাঁপা গলায় বলল, আমরা কি বেঁচে গেছি?

ইগা তার ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, হ্যাঁ নুবা আমরা বেঁচে গেছি।

আমরা তাহলে পৃথিবীকে রক্ষা করেছি?

হ্যাঁ। আমরা পৃথিবীকে রক্ষা করেছি।

তাহলে আমরা আনন্দ করছি না কেন?

কেউ কোনো কথা বলল না। য়োমি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, নুবা, আমি জানি না কেন আমরা আনন্দ করছি না।

AMARBOI.COM

ইগা একটু হেসে বলল, চল কন্ট্রোলঘরে যাই। নিজের চোখে যদি শ্যালক্স গ্রুনকে দেখতে পাই হয়তো তখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস হবে। তখন হয়তো আমরা আনন্দ করতে পারব।

কাছাকাছি একটা ছোট সেলে তাড়াহুড়া করে কন্ট্রোলঘরটি তৈরি হয়েছে। স্বচ্ছ দেয়াল সরিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। দেয়ালে একটি বড় স্ক্রিন ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ করে দেখে এটাকে কন্ট্রোলঘর মনে হয় না। ইগা ছোট একটা সুইচ স্পর্শ করতেই স্ক্রিনটা আলোকিত হয়ে আসে, মাঝামাঝি একটা লাল বিন্দু জ্বলছে এবং নিভছে। নুবা জিজ্ঞেস করল, এটা কী?

শ্যালক্স গ্রুনের সময়-পরিভ্রমণ যান।

ভিতরে কি দেখা যাবে?

পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর দেখা যাবে।

যোগাযোগের জন্যে কী ব্যবহার করা হবে?

য়োমি এগিয়ে এসে বলল, ত্রিশার মতো দেখতে যে রবোটটি পাঠিয়েছি তার সাথে রয়েছে মাইক্রো কমিউনিকেশান মডিউল। যেসব ছবি পাঠানো হবে তার রিজলিউশন খুব ভালো হবে না আগেই বলে রাখছি।

আমরা স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ সেখানে কিছু তরঙ্গ খেলা করতে থাকে। য়োমি চাপা গলায় বলল, এখন ভিতরে দেখা যাবে। কমিউনিকেশান মডিউল কাজ করতে শুরু করেছে।

নুবা বলল, রিকি তুমি সামনে যাও। কথা বল।

আমি?

হ্যাঁ। শুধু তুমিই শ্যালক্স গ্রুনের সাথে কথা বলেছ। যাও।

আমি স্ক্রিনের সামনে এগিয়ে গেলাম, খুব ধীরে ধীরে সেখানে একটা ছবি ভেসে উঠেছে। আমি বড় একটা করিডোর দেখতে পেলাম, সামনে কিছু ছোট ছোট স্ক্রিনের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে শ্যালক্স গ্রুন। তার ভুরু কুঞ্চিত, মুখে গভীর একটা উদ্বেগের ছাপ। সে কিছু একটা স্পর্শ করে কয়েকটা বোতাম টিপতে থাকে, ছোট মাইক্রোফোনে কিছু একটা কথা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আমি দেখতে পেলাম তার মুখ রক্তশূন্য, সেখানে এক ধরনের অমানুষিক আতঙ্ক। আমি ডাকলাম, শ্যালক্স গ্রুন।

পৃথিবী থেকে বহুদূরে চলে গেছে, আমার কথা পৌঁছুতে একটু সময় লাগল কিন্তু যখন আমার কথা শুনতে পেল সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে চিৎকার করে বলল, কে?

আমি।

আমি কে?

রিকি।

রিকি? রিকি!

হ্যাঁ শ্যালক্স গ্রুন, তুমি হেরে গেছ। আমাদের কাছে তুমি হেরে গেছ। তোমাকে ত্রিনিত্রি রাশিমালা দেয়া হয় নি। অর্থহীন কিছু সংখ্যা নিয়ে তুমি এখন মহাকাশে উড়ে যাচ্ছ। বৃহস্পতি গ্রহের কাছে দিয়ে তুমি উড়ে যাবে সৌরজগতের বাইরে।

না। শ্যালক্স গ্রুন ছুটে গিয়ে তার কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে। হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে চিৎকার করতে থাকে। আমরা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম, ভয়ঙ্কর মুখ করে সে ঘুরে তাকায় তারপর হিসহিস করে বলল, ত্রিশা, ত্রিশাকে আমি তোমার সামনে খুন করব। খুন করব।

আমরা প্রথমবার ত্রিশাকে দেখতে পেলাম। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আর ভয় নেই। তার কপোট্রনে পুরোনো স্মৃতি মুছে ফেলে এখন নতুন স্মৃতি লেখা হচ্ছে। ভালবাসাহীন এক স্মৃতি। আতঙ্কহীন এক স্মৃতি। নিষ্ঠুর প্রতিশোধের এক স্মৃতি। আমি ফিসফিস করে বললাম, শ্যালক্স গ্রুন! তুমি ত্রিশাকে স্পর্শও করবে না। তুমি স্পর্শ করতে পারবে না।

শ্যালক্স গ্রুন ঘুরে ত্রিশার দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে তার মুখ আতঙ্কে কদর্য হয়ে যায়। সে নিজের বুক স্পর্শ করে এক পা পিছিয়ে যায়। একটু আগে যে ত্রিশা ছিল সে আর ত্রিশা নয়, তার চোখ জ্বলছে, হাত থেকে বের হয়ে এসেছে ধারালো ধাতব ছোরা। ছায়ামূর্তিটি শ্যালক্স গ্রুনের দিকে এগিয়ে যায়—

না—না—না—শ্যালক্স গ্রুন আতঙ্কে চিৎকার করে পিছনে সরে যেতে থাকে। মানুষটি নিষ্ঠুর অমানবিক, তার ভিতরে ভালবাসার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু মানুষের প্রাচীনতম অনুভূতি ভীতি তার বুকের ভিতর লুকিয়েছিল সে জানত না।

আমি স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি আর দেখতে পারছি না, তোমরা কেউ স্ক্রিনটি বন্ধ করে দেবে?

ইগা হাত বাড়িয়ে কী একটা স্পর্শ করতেই স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে গেল। য়োমি চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও। রবোটের ওপর নির্দেশ দেয়া আছে শ্যালক্স গ্রুনের শরীর থেকে ভাইরাসের এম্পুলটা বের করার দৃশ্যটি মনে হয় না আমি সহ্য করতে পারব।

নুবা একটা নিশ্বাস নিয়ে পিছনে সরে গিয়ে বলল, মানুষটিকে হত্যা না করে কি এম্পুলটা বের করা যেত না?

হয়তো যেত। য়োমি নুবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তার চেষ্টা করি নি। আমি খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। মানুষের জগতে এই দানবটির বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

আমরা ছোট কন্ট্রোলঘর থেকে বের হয়ে এলাম। দূরে একটা বাই ভার্বাল নেমেছে। তার ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ হেঁটে হেঁটে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সবার সামনে ইয়োরন রিসি। আমরা তার দিকে হেঁটে যেতে থাকি।

মহামান্য ইয়োরন রিসি এক জন এক জন করে আমাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করে বললেন, পৃথিবীর পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন। এই পৃথিবী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

নুবা নরম গলায় বলল, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন মহামান্য ইয়োরন রিসি, কিন্তু আপনি একটু অতিরঞ্জন করেছেন। আপনার আদেশে আমরা কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার বেশি কিছু নয়! সব কাজ করেছে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ। অসংখ্য বিজ্ঞানী, অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ার, অসংখ্য প্রতিভাবান শ্রমিক।

য়োমি মাথা নেড়ে বলল, নুবা একটুও বাড়িয়ে বলে নি। আটচল্লিশ ঘণ্টার মাঝে আমাকে একটা রবোট তৈরি করে দিয়েছে। নিখুঁত রবোট, রিকির মতো মানুষ সেই রবোট দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল!

ইগা মাথা নেড়ে বলল, আর কুরু ইঞ্জিনের সেই ব্যাপারটা। আমরা নিজেরা কি সেটা কখনো করতে পারতাম? সময়–পরিভ্রমণকে পাল্টে দূরত্ব–পরিভ্রমণ করে ফেলা? আমি নিজে তো বিজ্ঞান শিখেছি গত দু দিনে!

নুবা বলল, তার ওপর একটি নকল ত্রিমাত্রিক রাশিমালা তৈরি করে দেয়া—যেটি সত্যিকারের রাশিমালার কাছাকাছি কিন্তু সত্যিকারের নয়।

হিশান হেসে বলল, সবচেয়ে চমৎকার হয়েছে কৃত্রিম পারমাণবিক বিস্ফোরণ, একেবারে তেজস্ক্রিয়তা থেকে শুরু করে শক ওয়েভ, বাতাসের ঝাপটা, শ্যালক্স গ্রুন এতটুকু সন্দেহ করে নি!

ইয়োরন রিসি মাথা নাড়লেন, তোমাদের কথা সত্যি। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ তোমাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু সত্যিকারের কাজটি করেছ তোমরা। আমি সেটা জানি, তোমরাও সেটা জান!

কিন্তু—

আমি পৃথিবীর বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক, আমার আদেশ তোমরা আমার সাথে এই ব্যাপারটি নিয়ে তর্ক করবে না!

আমরা তার কথায় হেসে ফেললাম, মানুষটির মাঝে এক ধরনের বিস্ময়কর সারল্য রয়েছে যেটা অন্য কোনো মানুষের মাঝে দেখি নি।

ইয়োরন রিসি নরম গলায় বললেন, পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তোমাদের স্নায়ুর উপর নিশ্চয়ই অসম্ভব চাপ পড়েছে। এখন তোমাদের প্রয়োজন বিশ্রাম। আমি কি তোমাদের কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?

আমি ইয়োরন রিসির দিকে তাকালাম। বললাম, পারেন মহামান্য ইয়োরন রিসি।

তুমি বল রিকি, তুমি কী চাও।

আমি আমার পকেটে হাত দিয়ে লাল কার্ডটি বের করে ইয়োরন রিসির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার এই কার্ডটি আপনি ফিরিয়ে নেবেন।

ইয়োরন রিসি কোমল চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর

বললেন, ঠিক আছে রিকি, সেটাই যদি তোমার ইচ্ছে।

ইয়োরন রিসি কার্ডটি নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। সাথে সাথে ইগা, হিশান, য়োমি আর নুবা তাদের নিজেদের লাল কার্ডগুলো বের করে তার দিকে এগিয়ে দেয়। ইয়োরন রিসি খানিকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে হাসতে হাসতে বললেন, পৃথিবীর একেক জন মানুষ এই লাল কার্ডের জন্যে নিজেদের প্রাণ দিয়ে দেবে আর তোমরা অবহেলায় সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছ?

ইগা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমরা হয়তো এই পৃথিবীর উপযুক্ত মানুষ নই মহামান্য রিসি। হয়তো কিছু গোলমাল আছে আমাদের!

ইয়োরন রিসি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল আছে।

১১

দীর্ঘ লিফটে করে আমি মাটির নিচে সুড়ঙ্গে নেমে এসেছি। শেষবার যখন এসেছিলাম আমার কাছে লাল কার্ড ছিল, আমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারতাম। এখন আমার কাছে সেই লাল কার্ড নেই, মানুষের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে আমাকে নিচে নামতে হয়েছে। আমি প্রোগ্রামিং ফার্মের বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিতরে এক শিফটের কাজ শেষ হয়েছে, শ্রমিকেরা একে একে বের হয়ে আসছে। তাদের চোখেমুখে ক্লান্তি, তাদের পোশাক ধুলায় ধূসর। আমি তীক্ষ্ণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে ত্রিশাকে খুঁজতে থাকি। দাঁড়িয়ে থেকে–থেকে আমি যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম ঠিক তখন ত্রিশা বের হয়ে এল, তার পরনে হালকা নীল পোশাক, তার মাথায় একটা লাল রুমাল শক্ত করে বাঁধা।

আমি ভিড় ঠেলে সামনে ছুটে গেলাম, চিৎকার করে ডাকলাম, ত্রিশা ত্রিশা—

ত্রিশা চমকে ঘুরে তাকাল, আমাকে দেখে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সে হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, রিকি। তুমি?

হ্যাঁ, ত্রিশা আমি। তুমি ভালো আছ?

ত্রিশা মাথা নাড়ল, ভালো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ করে বলল, আমি কয়দিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম।

সত্যি?

হ্যাঁ। খুব একটা অবাক ব্যাপার হয়েছিল দুদিন আগে।

কী অবাক ব্যাপার।

চার জন মানুষ এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। দুজন পুরুষ দুজন মহিলা। বয়স খুব বেশি নয়, সবাই প্রায় আমাদের বয়সী। কিন্তু তারা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

সত্যি?

হ্যাঁ। তুমি বিশ্বাস করবে না তাদের কী আশ্চর্য ক্ষমতা! যেটা করতে চায় সেটাই তারা করতে পারে। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে।

আমি আমার মুখে অবাক হবার একটা চিহ্ন ফোটাতে চেষ্টা করতে থাকি। ত্রিশা চোখ বড় বড় করে বলল, তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল একটা রবোটের ফার্মে।

সত্যি?

হ্যাঁ। সারারাত কথা বলল আমার সাথে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করল অনেকবার। যখন আমি চলে আসছিলাম তখন ফার্মের লোকজন এসে আমার অনেকগুলো ছবি তুলল, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের মাপ নিল। সবশেষে আমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করল।

আমি আমার মুখে বিস্ময় ফোটানোর চেষ্টা করতে থাকি। ত্রিশা মাথা নেড়ে বলল, একটা ব্যাপার জান?

কী?

ওই চার জন মানুষের সাথে আর তোমার সাথে কী একটা মিল রয়েছে।

মিল?

হ্যাঁ, আমি ঠিক ধরতে পারছি না মিলটুকু কোথায় কিন্তু কিছু একটা মিল আছে। সেই থেকে আমার কেন জানি শুধু তোমার কথা মনে হচ্ছে!

ত্রিশা হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকাল, খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি ওই চার জন মানুষকে চেন রিকি?

আমি খানিকক্ষণ ত্রিশার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, হ্যাঁ ত্রিশা। আমি তাদের চিনি।

তুমি—তুমি ঠিক ওদের মতো একজন?

হ্যাঁ ত্রিশা, আমি ঠিক তাদের মতো একজন।

ত্রিশা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি আমাকে কখনো তোমার নিজের কথা বল নি, তাই না?

আমি বলি নি কারণ আমি জানতাম না ত্রিশা। আর জানলেও বিশ্বাস করতাম না।

ত্রিশা আমার হাত ধরে বলল, তুমি বলবে তোমার কথা?

তুমি শুনবে?

শুনব।

আমি ত্রিশাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বললাম, ঠিক আছে আমি বলব। তুমি বিশ্বাস করবে না তবু আমি বলব।

আমি সবসময় তোমার কথা বিশ্বাস করব রিকি।

ত্রিশা আমার দিকে তাকিয়ে খুব সাবধানে তার চোখের পানি মুছে নেয়।

AMARBOI.COM

দক্ষিণের পাহাড়ি অঞ্চলের একটি ছোট স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে আমি আর ত্রিশা শহর ছেড়ে চলে এসেছি। ছোট কাঠের একটা বাসা আছে আমাদের। শীতের বিকেলে যখন তুষার পড়তে থাকে জানালার পাশে, আগুনের উষ্ণতায় বসে আমরা জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকি। আমাদের ছোট ছেলেটি ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে— অসম্ভব দুরন্ত একটি শিশু হয়ে বড় হচ্ছে সে।

নুবা, য়োমি, ইগা আর হিশানের সাথে আমার ভালো যোগাযোগ নেই। শুধু বছরে একবার আমরা কোথাও এসে একত্র হই, নুবা তার ভালোমানুষ হাসিখুশি স্বামীটিকে নিয়ে আসে। হিশানের সাথে আসে তার কমবয়সী বান্ধবী। য়োমি এখনো একা, আমার কেন জানি মনে হয় সারাজীবন সে একাই থাকবে। ইগার সাথে একেকবারে একেকজন আসে, কমবয়সী অপূর্ব সুন্দরী কোনো মেয়ে! আমি ত্রিশাকে নিয়ে যাই।

ত্রিশাকে তারা সবাই খুব ভালো করে চেনে, মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি আমার থেকেও ভালো করে।

অনুরন গোলক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাতিনার স্বগ্রহে প্রত্যাবর্তন

ত্রাতিনা মহাকাশযানের গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার মহাকাশ, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই বুকের ভিতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ভর করে। ত্রাতিনা বহুকাল থেকে নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্গতাতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, স্কিনিস্কির নবম সিম্ফোনি শুনতে শুনতে সে দীর্ঘসময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারে।

আজকেও সে বাইরে তাকিয়েছিল, ঘুরেফিরে বারবার তার সহঅভিযাত্রীদের কথা মনে পড়ছে। তাদের দলপতি শ্রুরা, ইঞ্জিনিয়ার কিরি, তাদের জীববিজ্ঞানী ইলিনা নেভিগেটর থুল— আরো কতজন। যখন ওয়ার্মহোলের প্রবল আকর্ষণে মহাকাশযানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে শুরু করেছিল, কী পাগলের মতোই না তারা মহাকাশযানটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল! শেষ রক্ষা করতে পারে নি, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একটা অংশ ছিটকে বের হয়ে গিয়েছিল, আর ঠিক তখন মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনোভাবে প্রবল আকর্ষণের কেন্দ্র থেকে বের হয়ে এসেছিল। ত্রাতিনা ছিটকে পড়েছিল কন্ট্রোল প্যানেলে, সেখান থেকে মেঝেতে। যখন জ্ঞান হয়েছে নিজেকে আবিষ্কার করেছে একটি ধ্বংসস্তূপে। ইমার্জেন্সি আলো নিয়ে মহাকাশযানে ঘুরে ঘুরে সে তার সহঅভিযাত্রীদের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। বিশাল একটা অংশ উড়ে বের হয়ে গেছে, সেখানে যারা ছিল তাদেরকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি. অন্যদের মৃতদেহ সে গভীর ভালবাসায় স্টেনলেস স্টিলের ক্যাপসুলে ভরে মহাকাশে ভাসিয়ে দিয়েছে।

তারপর থেকে সে একা। বিধ্বস্ত একটি মহাকাশযানে বিশাল মহাকাশে হারিয়ে যাওয়া একটি তরুণী। মহাকাশযানের পঙ্গু কম্পিউটার পৃথিবীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করে করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। মহাকাশযানের জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে এবং একসময় ত্রাতিনা বুঝতে পারে সে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। গভীর হতাশায় ডুবে গিয়ে সে তখন পুরো মহাকাশযানটিকে ধ্বংস করে দেবার প্রস্তুতি নিয়েছে। স্বেচ্ছা-ধ্বংস মডিউলটি চালু করেছে। সার্কিটটি পরীক্ষা করেছে, বিস্ফোরকগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে, তারপর পুরো সিস্টেমটি অন করেছে। তখন কন্ট্রোল প্যানেলে বড় একটি সুইচে লাল আলো জ্বলতে এবং নিভতে শুরু করেছে, এই সুইচটা একবার স্পর্শ করলেই পুরো মহাকাশযানটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক যখন ত্রাতিনা মহাকাশযানটিকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার প্রস্তুতি নিল তখন মূল কম্পিউটারের এন্টেনায় একটা ক্ষীণ সিগনাল ধরা পড়ল, বোঝা যায় না এ রকম ক্ষীণ। প্রথম ভেবেছিল বুঝি যান্ত্রিক গোলযোগ বা মহাজাগতিক রশ্মি, কিন্তু দেখা গেল সেটি একটি মহাকাশ স্টেশনের নিয়মিত সিগনাল। সেই মহাকাশযানের সিগনালকে অনুসরণ করে ত্রাতিনা পৃথিবীর ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। বিস্ময়াভিভূত হয়ে আবিষ্কার করেছে তার মহাকাশযানে পৃথিবীতে ফিরে যাবার মতো জ্বালানি রয়ে গেছে। সেই থেকে তারা পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। মহাকাশযানের অর্ধবিধ্বস্ত কম্পিউটারটির জন্যে কাজটি সহজ নয়, যে হিসাবটি এক মাইক্রো সেকেন্ডে হয়ে যাবার কথা, সেটি শেষ হতে কখনো কখনো কয়েক সেকেন্ড লেগে যায়। তবুও মহাকাশযানটি তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবস্থান নিতে পেরেছে, শেষ পর্যন্ত সেটি সৌরজগতের দিকে ছুটে যেতে শুরু করেছে। ত্রাতিনা মহাকাশযানের কম্পন থেকে অনুভব করতে পারে তার গতিবেগ বেড়ে যেতে শুরু করেছে। তাকে আর বিশাল মহাকাশে হারিয়ে যেতে হবে না, নিজের পৃথিবীতে নিজের মানুষের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

ত্রাতিনা ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিয়েছে। মহাকাশযানের স্বচ্ছ মসৃণ ক্রোমিয়াম দেয়ালে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেছে, কালো চোখ সুগঠিত বুক কোমল দেহকে পরপুরুষের চোখে যাচাই করেছে। মানুষের ভাষায় নিজের সাথে কথা বলেছে, মানুষের অনুভূতির সাথে নিজেকে পরিচিত করেছে। কন্ট্রোলঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশাল মনিটরে পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে, বলা যেতে পারে এক ধরনের বিচিত্র কুসংস্কারের কারণে মহাকাশযান ধ্বংস করার সুইচটিকে অচল করে দেয় নি। সেই সুইচটির মাঝে লাল আলো জ্বলছে এবং নিভছে, প্রতি মুহূর্তে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, একটিবার স্পর্শ করলেই মহাকাশযানটি তাকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কে জানে হয়তো মৃত্যুকে এত কাছাকাছি রেখে বেঁচে থাকলেই জীবনকে বোঝা যায়।

AMARBOI.COM

পৃথিবী থেকে যখন প্রথম সিগনালটি এসেছে, ত্রাতিনা তখন বিশ্রাম নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মনিটরে একটা শব্দতরঙ্গ দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে, মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে সে কথা বলে নিজের মহাকাশযানের পরিচয় দেয়। স্পিকারে খানিকক্ষণ স্থির বিদ্যুতের কর্কশ শব্দ শোনা যায়, তারপর হঠাৎ পরিষ্কার মানুষের গলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেউ একজন কোমল গলায় তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, পৃথিবীর মানুষ হারিয়ে যাওয়া মহাকাশচারী ত্রাতিনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

ত্রাতিনা কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারে না। তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের শিহরন বয়ে যায়। কোনোমতে নিজেকে শান্ত করে বলল, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।

তোমার ভিডিও চ্যানেলটি কোথায়? আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ওয়ার্মহোলে আমাদের যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে নষ্ট হয়ে গেছে। ইমার্জেন্সি একটা ভিডিও চ্যানেল আছে কিন্তু তার ট্রান্সমিটারটি খুব দুর্বল, আরো কাছে না এলে সেটা কাজ করবে না। আমি অবশ্যি চালু রেখেছি।

চমৎকার। আমরা তোমাকে দেখার জন্যে খুব উদগ্রীব। দুই হাজার বছর আগের রক্তমাংসের মানুষ সত্যি সত্যি দেখতে পাওয়া খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার।

দুই হাজার? ত্রাতিনা চিৎকার করে বলল, দুই হাজার বছর? সে কী করে সম্ভব? আমি বড়জোর দশ থেকে বিশ বছর মহাকাশে আছি। আপেক্ষিক বেগের কারণে হয়তো আরো

এক শ দুই শ বছর যোগ হতে পারে— দুই হাজার বছর কেমন করে হল?

স্পিকারের কণ্ঠস্বর বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর আবার শোনা যায়, মানুষটি দ্বিধান্বিত গলায় বলল, আমাদের কাছে সব তথ্য নেই কিন্তু তোমার মহাকাশযানের মূল কম্পিউটারের পাঠানো তথ্য থেকে মনে হচ্ছে ওয়ার্মহোলে তোমরা যখন মহাবিপর্যয়ে পড়েছিলে তখন তোমাদের এক দুইবার হাইপার ডাইভ দিতে হয়েছে, দুই হাজার বছরের বেশিরভাগ তখনই পার হয়ে গেছে।

ত্রাতিনা নিশ্বাস ফেলে বলল, কী আশ্চর্য! দুই হাজার বছর। পৃথিবীতে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই না?

হ্যাঁ হয়েছে।

ভালো পরিবর্তন না খারাপ পরিবর্তন?

ভালো আর খারাপ তো খুব আপেক্ষিক কথা। একজনের কাছে যেটা ভালো মনে হয় অন্যের কাছে সেটা খারাপ লাগতে পারে।

তা ঠিক। কিন্তু তবুও তো কিছু কিছু সত্যিকারের ভালো খারাপ হতে পারে। যেমন, যদি সমস্ত পৃথিবী বিষাক্ত কেমিক্যালে ঢেকে থাকে আমি বলব সেটা খারাপ। যদি পৃথিবীতে মানুষের বদলে রবোটেরা তার জায়গা দখল করে নিত সেটা হত খারাপ।

পৃথিবীর মানুষটি শব্দ করে হাসল, বলল, না ত্রাতিনা ভয় নেই। সেরকম কিছু হয় নি। পৃথিবী বিষাক্ত কেমিক্যালে ঢেকে যায় নি, প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এখানে বিকশিত হয়ে আছে। এখানে পরিষ্কার নীল আকাশ, সাদা মেঘ, ঘন সবুজ বনাঞ্চল!

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। আর রবোটকে নিয়েও তোমার ভয় নেই। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে একবার রবোট অভ্যুত্থান হয়েছিল কিন্তু সেটা খুব সহজে সামলে নেয়া গেছে। এখন পৃথিবীতে মানুষ আর রবোটদের খুব শান্তিপূর্ণ অবস্থান রয়েছে।

ত্রাতিনা খুশিতে হেসে ফেলল। বলল, পৃথিবীতে তাহলে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা নেই।

না, না, তা নয়। মানুষ থাকলেই তাদের দুঃখ কষ্ট থাকে। তাদের আনন্দ বেদনা থাকে। কিন্তু বলতে পার বড় ধরনের অবিচার নেই, শোষণ নেই, যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই। অনিয়ন্ত্রিত রোগ শোক নেই।

চমৎকার! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

পৃথিবী থেকে মানুষটি কোমল গলায় বলল, আমরাও অপেক্ষা করতে পারছি না।

ত্রাতিনার সাথে ধীরে ধীরে পৃথিবীর এই মানুষটির এক ধরনের সখ্য গড়ে ওঠে। ভিডিও চ্যানেল নেই বলে একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে না, শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর দিয়েই তাদের পরিচয়। শুধু তাই নয়, কণ্ঠস্বরটি ভাষা পরিবর্তনের মডিউলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে বলে একে অন্যের সত্যিকারের কণ্ঠস্বরটি শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তাতে কোনো অসুবিধে হল না, সম্ভবত শুধুমাত্র মানুষই মনে হয় সবরকম ব্যবধান ছিন্ন করে একে অন্যকে এত সহজে স্পর্শ করতে পারে।

ত্রাতিনা ধীরে ধীরে পৃথিবীর আরো কাছে এগিয়ে আসে। পৃথিবীর মানুষটির কাছে সে নানা ধরনের খবর পেতে থাকে। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি কোন কোন দিকে হয়েছে জানার চেষ্টা করে যদিও তার বেশিরভাগ সে বুঝতে পারে না। তবে মানুষের জীবনযাত্রার যে একটা খুব বড় পরিবর্তন হয়েছে সেটা বুঝতে তার কোনো অসুবিধে হয় না। সে যখন পৃথিবীতে বেঁচেছিল তখন মানুষকে নানা ধরনের যানবাহনে ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় যেতে হত কিন্তু এখন আর যেতে হয় না। মানুষ ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিয়েছে, এখন মানুষ আর 'স্থান'-এর কাছে যায় না, স্থান মানুষের কাছে আসে। যদিও ব্যাপারটি কেমন করে ঘটে ত্রাতিনা ঠিক বুঝতে পারে নি কিন্তু এই জিনিসটি পৃথিবীর পরিবেশ এক ধাপে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

পৃথিবীর আরো কাছাকাছি এগিয়ে আসার পর ভিডিও চ্যানেলটি কাজ করতে শুরু করে। প্রথমে আবছা আলো-আঁধারিতে বিচ্ছিন্ন কিছু ছবি, এবং এক সময় সেটা স্পষ্ট হতে শুরু করে। ত্রাতিনা পৃথিবীর নীল আকাশ, উত্তাল সমুদ্র এবং ঘন সবুজ বনাঞ্চল দেখতে পায়। নীল পাহাড়ের সারি এবং শুভ্র তুষার দেখতে পায়, আকাশে মেঘের সারি দেখতে পায়। পরিচিত পৃথিবীকে দেখে ত্রাতিনা তার বুকের মাঝে এক বিচিত্র ধরনের আবেগ অনুভব করতে থাকে। মানুষ যে তার গ্রহটির জন্যে কতটুকু ব্যাকুল হতে পারে সে আগে কখনোই সেটা অনুভব করে নি।

পরের কয়েকদিন ত্রাতিনাকে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার সাথে পরিচয় করানো শুরু হয়। কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে তাকে পৃথিবীর কোনো মানুষকে দেখানো হয় না। এতদিন মহাকাশযান থেকে যে মানুষটির সাথে কথা বলেছে, যে মধ্যবয়স্ক একজন হৃদয়বান যুবা পুরুষ এবং যার নাম ক্রিটন তাকেও সে এক নজর দেখতে পায় না। কয়েকদিন পর ত্রাতিনা ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে। ক্রিটন দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, তুমি দুই হাজার বছর পর পৃথিবীতে ফিরে আসছ, এর মাঝে মানুষের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার যদি পরিবর্তন হয় তার চেহারাতেও পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনটুকু তুমি কীভাবে নেবে বুঝতে পারছি না বলে আমরা একটু সময় নিচ্ছি।

ত্রাতিনা হালকা গলায় বলল, তোমরা পৃথিবীর মানুষেরা কি সবাই সবুজ রঙের চুল আর বেগুনি রঙের চামড়া করে ফেলেছ? কপালে আরেকটা চোখ।

ক্রিটন নরম গলায় হেসে উঠে বলল, বলতে পার অনেকটা সেরকমই।

তোমরা বারবার জীবনযাত্রার পরিবর্তন কথাটি ব্যবহার করছ। সেটা বলতে কী বুঝাতে চাইছ বলবে?

ক্রিটন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, যেমন ধরা যাক একটি আদিম জৈবিক অনুভূতি, খাওয়া। ক্ষুধার্ত মানুষের খেতে ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগার অনুভূতিটা আসে মস্তিষ্ক থেকে। মানুষের মস্তিষ্কের কোন জায়গা থেকে সেই অনুভূতিটা আসে যদি আমরা জেনে ফেলি তাহলে আমরা ঠিক সেখানে কিছু একটা করে মানুষকে ভালো খাওয়ার অনুভূতি দিতে পারি।

তোমরা এখন তাই কর?

হ্যাঁ। আমরা মানুষের ইন্দ্রিয়কে জয় করেছি। এখন মুখ দিয়ে খেতে হয় না, কান দিয়ে শুনতে হয় না, চোখ দিয়ে দেখতে হয় না, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় না। এমনকি জৈবিক সম্পর্ক করার জন্যেও পুরুষ-রমণীকে একত্রিত হতে হয় না। সমস্ত অনুভূতিগুলো সোজাসুজি মস্তিষ্কে দেয়া হয়।

ত্রাতিনা কেমন যেন শিউরে উঠল, বলল, কী বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি। তুমি দুই হাজার বছর পরে আসছ বলে তোমার কাছে বিচিত্র মনে হচ্ছে। আসলে এটা মোটেও বিচিত্র নয়। এটাই স্বাভাবিক। এটাই সত্যিকারের অনুভূতি।

যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হয় না, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সরাসরি মস্তিষ্কে দেয়া হয়, আমাদের চলাফেরার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমরা এক জায়গায় বসে থাকতে পারি। একজনের সাথে অন্যজন কথা বলার জন্যে তার ছবিটি সরাসরি মস্তিষ্কে নিয়ে আসা হয়। বেড়াতে যাওয়ার জন্যে বাইরে যেতে হয় না, বাইরের দৃশ্যের অনুভূতি সরাসরি মস্তিষ্কে নিয়ে আসা হয়। শুধু তাই নয়, তোমরা যেটা কখনো পার নি, আমরা একজনের অনুভূতি অন্যেরা অনুভব করতে পারি। মহামানবেরা কেমন করে চিন্তা করে আমরা অনুভব করতে পারি।

ত্রাতিনা বিভ্রান্তের মতো বলল, কিন্তু আমার মনে হয় আগের জীবনই ভালো ছিল, যখন আমরা বাইরে যেতাম। কিছু একটা স্পর্শ করতাম—দেখতাম—

ক্রিটন নরম গলায় হাসল, বলল, দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তোমার মস্তিষ্ক যেটা অনুভব করে সেটা সত্যিকারের অনুভূতি—

কিন্তু—কিন্তু—ত্রাতিনা কী বলবে বুঝতে পারে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, আমি কি তোমাকে একবার দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই পারবে। তুমি যখন পৃথিবীতে আসছ অবশ্যি আমাকে দেখবে। আমাদের সবাইকে দেখবে।

এখন কি দেখতে পারি?

এখন?

হ্যাঁ।

ক্রিটন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ দেখ। প্রথমে তোমার একটু অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু খুব সহজেই তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে। এই যে আমি—

ত্রাতিনা বিশাল মনিটরে একটি মস্তিষ্ক দেখতে পেল। থলথলে মস্তিষ্কটি এক ধরনের তরল পদার্থে ভেসে আছে, আশপাশে কয়েকটি টিউব লাগানো রয়েছে, যেগুলো দিয়ে মস্তিষ্কটিতে পুষ্টিকর তরল আসছে।

ত্রাতিনা একবার আর্তনাদ করে ওঠে, ক্রিটন নরম গলায় বলল, এইটা আমি। আমাদের শরীরের সব বাহুল্য দূর করে দেয়া হয়েছে—হাত পা মুখ চোখ জননেন্দ্রীয় কিছু নেই। শুধু মস্তিষ্ক। সেই মস্তিষ্কে সত্যিকারের অনুভূতি সেটা দেয়ার জন্যে রয়েছে আধুনিক যোগাযোগ মডিউল।

ত্রাতিনার হঠাৎ মাথা ঘুরে ওঠে, সে কোনোভাবে দেয়াল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ক্রিটন নরম গলায় বলল, পৃথিবীর সব মানুষ এখন থাকে কাছাকাছি, নিরাপদ ভল্টে, তাদের জন্যে নির্ধারিত কিউবিকেলে। তুমি যখন আমাকে দেখেছ এখন নিশ্চয়ই অন্যদেরকেও দেখতে চাইবে। এই যে দেখ আমাদের—

ত্রাতিনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, দেখতে পায় বিশাল হলঘরে সারি সারি চতুষ্কোণ পাত্রে থলথলে মস্তিষ্ক সাজানো। একটির পর আরেকটি তারপর আরেকটি। মানুষের সভ্যতা শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রেম ভালবাসা দুঃখ বেদনা সব লুকিয়ে আছে ওইসব থলথলে মস্তিষ্কের ভিতরে।

ত্রাতিনা আতঙ্কিত চোখে কিছুক্ষণ মনিটরটির দিকে তাকিয়ে রইল তারপর মাথা ঘুরিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল। সেখানে লাল একটি সুইচ জ্বলছে এবং নিভছে। সে বুক ভরে একবার নিশ্বাস নিল তারপর হাত বাড়িয়ে দিল সুইচটার দিকে।

পরাবাস্তবতার জগতে

হাতের চিরকুটের সাথে ঠিকানা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বব লাস্কি। এটাই সেই বাসা, ১৯/৭ কাঁঠালীচাপা লেন। হলুদ রঙের একতালা দালান। বাসার সামনে দুটি নারকেলগাছ, তার মাঝে একটি বাজ পড়ে পুড়ে গেছে ঠিক যেরকম তাকে বলে দেয়া হয়েছিল। বাসাটি দেখে বব লাস্কির এক ধরনের বিস্ময় হয়, যেই মানুষটির জন্যে সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটা এটাচি কেস ভরে এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে এসেছে তার বাসাটি সে আরেকটু সুন্দর হবে আশা করেছিল। সে তার বিস্ময়টুকু দ্রুত ঝেড়ে ফেলে গেট খুলে ভিতরে ঢুকে যায়, এই পুরো ব্যাপারটি এত অবাস্তব যে এখন সেটা নিয়ে অবাক হবার সময় পার হয়ে গিয়েছে।

গেটের ভিতরে একটা ছোট রাস্তা, রাস্তার দুপাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা কিছু ফুলগাছ। বব লাস্কি রাস্তা ধরে হেঁটে বারান্দার উপর দাঁড়াল, বাইরে একটা কলিংবেল থাকার কথা, সেটা খুঁজে বের করে চেপে ধরতেই ভিতরে একটা কর্কশ আওয়াজ হতে থাকে। প্রায় সাথে সাথেই দরজা খুলে যায়। ভিতরে আবছা অন্ধকার, সেখানে একজন দীর্ঘকায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি মধ্যবয়সী, মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখে ভারি চশমা। চশমার আড়ালে চোখ দুটি আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ। এই দেশের মানুষের চেহারায় যেরকম এক ধরনের কোমলতা রয়েছে এই মানুষটিরও তাই কিন্তু পোশাকটি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য দেশের, একটি জীর্ণ ব্লু-জিনস এবং রং ওঠা টি-শার্ট!

বব লাস্কি হাত বাড়িয়ে বলল, আমার নাম বব লাস্কি। তুমি নিশ্চয়ই 'শাউক্যাট'?

দীর্ঘকায় মানুষটি হাত মিলিয়ে একটু হেসে বলল, শাউক্যাট নয়, শব্দটি বাংলায় উচ্চারণ করা হয় শওকত!

বব লাস্কি একটু থতমত খেয়ে আবার চেষ্টা করল, শওকাট?

শওকত নামের মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, অনেকখানি হয়েছে, এতে বেশ কাজ চলে যাবে। ইংরেজিতে 'ত' উচ্চারণ নেই, তুমি সেটা শুনতেই পাও না, বলবে কেমন করে? এস, ভিতরে এস।

বব লাস্কি লক্ষ করল শওকতের ইংরেজি উচ্চারণে আঞ্চলিকতার কোনো ছাপ নেই, কথা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। সে ধন্যবাদ দিয়ে ভিতরে ঢোকে। ঘরের ভিতরে আসবাবপত্র খুব কম, একটা কালো টেবিল এবং সেটা ঘিরে কয়েকটা চেয়ার, আর কিছু নেই। বব লাস্কি তার এটাচি কেসটা কোথাও রাখবে কি না বুঝতে পারল না। ভিতরে এক শ ডলারের নোটে এক মিলিয়ন ডলার ধরে রেখে-রেখে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। শওকত তাকে বসার ইঙ্গিত করে বলল, তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ অনুমান করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না কিন্তু তবু তোমার মুখে একবার শুনি।

বব লাস্কি একটা চেয়ারে বসে এটাচি কেসটা নিজের কোলের উপর রেখে বলল, অবশ্যি অবশ্যি। শুরু করার আগে আমি গোপন সংখ্যাটি বলে নিই যেন তুমি নিশ্চিত হতে পার। সংখ্যাটি হচ্ছে—বব এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, আট শ ছিয়ানব্বই হাজার দুই শ দুই। ঠিক হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। শওকত একটু হেসে বলল, সংখ্যাটি হেক্সা ডেসিমেলে হয় ‘ঢাকা’! আমার খুব প্রিয় শহর।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। যাই হোক তুমি বল কী বলছিলে।

আমার নাম বব লাস্কি। তুমি আমাকে বব বলে ডেকো। আমি সান হোজের এরো কম্পিউটেশান থেকে এসেছি। আমি সফটওয়ার ডিভিশনের একজন ডিভিশন ম্যানেজার। তুমি আমাদের যে নমুনাটি পাঠিয়েছিলে আমি সেটা দেখেছি। এক কথায় বলা যায় অবিশ্বাস্য!

শওকত মাথা নেড়ে বলল, আমারও তাই ধারণা।

তুমি তার জন্যে যে দামটা চাইছ সেটা বলতে গেলে প্রায় বিনে পয়সা!

শওকত হাসল, বলল, আমি জানি।

বব লাস্কি টেবিলে হাত রেখে একটু এগিয়ে এসে বলল, ব্যাপারটা একটা রহস্যের মতো, তুমি কেমন করে এটা করলে? বিশেষ করে এই দেশে, যেখানে টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট বলতে গেলে নেই।

চেষ্টা করলে সব হয়। তাছাড়া ব্যাপারটা টেকনোলজিনির্ভর নয়, শ্রমনির্ভর। একজন মানুষের শ্রম, কিন্তু শ্রম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তোমাদের দেশে থাকতে শুরু করেছিলাম কিন্তু সেখানে থাকতে পারলাম না।

যদি কিছু মনে না কর, জিজ্ঞেস করতে পারি কেন?

শওকতের কোমল মুখে হঠাৎ কাঠিন্যের ছায়া পড়ে। সে মাথা নেড়ে বলল, খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার অন্যকে বলার মতো কিছু নয়। তাছাড়া আমার ধারণা ব্যাপারটা তোমরা জান। এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে তোমরা একটা জিনিস কিনতে এসেছ, সেই মানুষটি সম্পর্কে কি একটু খোঁজখবর নিয়ে আস নি?

বব লাস্কি একটু থতমত খেয়ে বিব্রত মুখে বলল, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ আমি আসলে ব্যাপারটা জানি। তুমি এত ছোট একটা ব্যাপারে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে আসবে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

শওকত বিষণ্ন মুখে বলল, কোন ব্যাপারটি বড় কোনটি ছোট সেটা একজন মানুষের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। তুমি হয়তো জান আমার মানসিকতা খুব চড়া সুরে বাঁধা। তাছাড়া আমি আমার দেশকে খুব ভালবাসি, সেটাকে হেয় করে কিছু বলা হলে আমার শুনতে ভালো লাগে না। যাই হোক, আস আমরা কাজ শুরু করে দিই। কী বল?

হ্যাঁ। বব লাস্কি এটাচি কেসটা টেবিলের উপর রেখে বলল, এই যে এখানে এক মিলিয়ন ডলার। এক শ ডলারের নোটে।

শওকত এটাচি কেসটা খুলে এক নজর দেখে বলল, তুমি একসাথে এতগুলো নোট কেমন করে যোগাড় করেছ আমি জানি না, কিন্তু এখানে হংকঙে ছাপানো জালনোটের খুব প্রাদুর্ভাব, জান তো?

জানি।

আমি যদি নোটগুলো জাল কি না পরীক্ষা করে দেখি তুমি কি খুব অপমানিত বোধ করবে?

বব লাস্কি হেসে বলল, হয়তো করব। কিন্তু তুমি যদি পরীক্ষা না কর আমি ভাবব তুমি খানিকটা নির্বোধ!

AMARBOI.COM

শওকত এক শ ডলারের নোটগুলোর মাঝে থেকে একটা তুলে নিয়ে পকেট থেকে কমলা রঙের একটা কলম বের করে তার মাঝে একটা দাগ দেয়। খানিকক্ষণ সেই নোটটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে নোটটা ভিতরে রেখে এটাচি কেসটা বন্ধ করে নিচে নামিয়ে রাখে।

বব লাস্কি জিজ্ঞেস করল, দেখলে না?

দেখেছি। একটা পরীক্ষা করে দেখেছি, সেটাই যথেষ্ট। যদি শুধু সেই নোটটাই সত্যি হয়ে থাকে এবং অন্য সবগুলো জাল তাহলে আমার কিছু করার নেই। বুঝতে হবে তুমি খুব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। এ রকম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে আমি কখনো চ্যালেঞ্জ করি না!

বব লাস্কি হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, তোমার কি মনে হয় আমি খুব সৌভাগ্যবান?

শওকত বব লাস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হয়তো বা। তবে সৌভাগ্য খুব আপেক্ষিক ব্যাপার। এমনও হতে পারে যে তুমি খুব সাধারণ মানুষ কিন্তু আমি খুব ভাগ্যহীন! আমার সামনে তাই তোমাকে দেখাবে অসাধারণ ভাগ্যবান। যাই হোক, জীবন খুব জটিল ব্যাপার, কথা বলে সেটা বোঝা যায় না। তার চাইতে চল পাশের ঘরে তোমাকে আমার ভারচুয়াল রিয়েলিটির ল্যাবটা দেখাই।

বব লাস্কি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল যাই। এটাচি কেসটা কী করবে?

থাকুক এখানে। কেউ আসবে না। আমার বাসায় কখনো কেউ আসে না।

পাশের ঘরটি বেশ বড়, সেখানেও আসবাবপত্র বলতে গেলে নেই। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বড় টেবিল, টেবিলের উপর একটা র‍্যাক। সেখানে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। নানা রঙের এল. ই. ডি. জ্বলছে। টেবিলের অন্যপাশে একটা বড় মনিটর সামনে একটা কি-বোর্ড এবং ট্র্যাক বল। টেবিলের সামনে একটা গদি-আঁটা চেয়ার; চেয়ারের উপর একটা হেলমেট, মোটরসাইকেল চালানোর সময় যেরকম হেলমেট পরে দেখতে অনেকটা সেরকম। চেয়ারটি থেকে নানা ধরনের তার বের হয়ে এসেছে। হাতলে হাত রাখার জায়গাতে বেশ কিছু সেন্সর। চেয়ারের নিচে পা রাখার জায়গা দেখে গাড়ির এক্সেলেটরের কথা মনে পড়ে। বব লাস্কি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এটাই সেই অসাধারণ হার্ডওয়ার।

শওকত মাথা নেড়ে বলল, এটাই সেই হার্ডওয়ার। অসাধারণ কথাটা আমি ব্যবহার করব না, এর মাঝে অসাধারণ কিছু নেই। সব আমি বাজার থেকে কিনেছি। রিস্ক প্রসেসর লাগানো বেশ অনেকগুলো স্পার্ক ইঞ্জিন স্ট্যান্ডার্ড বাস দিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রসেসর যেটুকু মেমোরি নিতে পারে পুরোটাই দেয়া হয়েছে। অনেক চেষ্টা করে ক্লক স্পিডটা দ্বিগুণ করে দিয়েছি। এর প্রসেসিং পাওয়ার এখন একটা ছোটখাটো সুপার কম্পিউটারের সমান।

সত্যি?

হ্যাঁ। চেষ্টা করে আমি দশ মিপস পর্যন্ত তুলতে পারি। কিন্তু হার্ডওয়ারটুকু তো সহজ, এর আসল কাজ হচ্ছে সফটওয়ারে। তোমাদের যে নমুনাটা পাঠিয়েছিলাম সেটা ছিল একটা ছোট অংশ। ইচ্ছে করলে তুমি আজকে পুরোটা দেখতে পার।

বব লাস্কি উৎসাহী চোখে বলল, হ্যাঁ আমি পুরোটা দেখতে চাই।

বেশ। শওকত একটু এগিয়ে এসে বলল, তুমি এই চেয়ারটাতে বস, বসে মাথায় হেলমেটটি লাগিয়ে নাও।

বব লাস্কি চেয়ারটাতে বসে হেলমেটটা ভালো করে দেখে। চোখের সামনে ছোট ছোট দুটি লেন্স, তার পেছনে তিনটি এল. ই. ডি.। নিশ্চয়ই সেখান থেকে সরাসরি চোখে আলো পাঠিয়ে দেখার অনুভূতি দেয়া হয়। কানের কাছে দুটি বড় এবং সংবেদনশীল হেডফোন।

চেয়ারের হাতলে হাত রাখার জায়গা, হাতের অনুভূতিটা সেখান থেকে আসবে। বব লাস্কি সাবধানে হেলমেটটা পরে নেয়। সাথে সাথে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে, নৈঃশব্দ্য আড়াল করে নেয় সবকিছু। বহুদূর থেকে হঠাৎ শওকতের গলার স্বর ভেসে আসে, তুমি কি প্রস্তুত বব?

হ্যাঁ।

হাত দুটি সরিও না এখন। আমি চালু করছি।

কর।

যদি কোনো কারণে তুমি ভারচুয়াল জগৎ থেকে বের হয়ে আসতে চাও, মাথা থেকে হেলমেটটি খুলে নিও। আমি অবশ্যি কাছেই দাঁড়িয়ে থাকব, আমাকে বলতে পার।

ঠিক আছে।

তুমি প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

আমি চালু করছি।

টুক করে একটা শব্দ হল। সাথে সাথে একটা ভোঁতা গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে। চোখের সামনে বিচিত্র কিছু রং খেলা করছে, ধীরে ধীরে সেখানে একটা অস্পষ্ট ছবি ভেসে আসে। ছবিটা চোখের সামনে কয়েকবার দুলে হঠাৎ স্থির হয়ে যায়, তারপর সেটা স্পষ্ট হতে শুরু করে। বব লাস্কি নিশ্বাস বন্ধ করে দেখে সে একটা বিশাল ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন একটা উপাসনালয়ের মতো চারপাশে দেয়ালে কারুকাজ। উপরে ছাদে বিচিত্র আলোর ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দুপাশে কাঠের দরজা। বাইরে বাতাসের গর্জন। বব লাস্কি নিশ্বাস বন্ধ করে এই রহস্যময় ঘরটিতে দাঁড়িয়ে থাকে, কী ভয়ঙ্কর রকম বাস্তব অনুভূতি। এটি সত্যিকারের ঘর নয়, এটি দক্ষ সফটওয়ারে তৈরী একটি অনুভূতি, পুরোটা একটি কাল্পনিক ছবি কিন্তু পুরোটা এত বাস্তব যে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। বব লাস্কি ডান দিকে তাকাল, সাথে সাথে প্রাচীন উপাসনালয়ের মতো ঘরটির ডান দিকের অংশটি দেখতে পায়। মাথা ঘুরিয়ে বাম দিকে তাকাল, একটা করিডোর বহুদূরে চলে গেছে।

বব লাস্কি অভিভূত হয়ে এই অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ভারচুয়াল রিয়েলিটির অসংখ্য সফটওয়ার পরীক্ষা করেছে কিন্তু এর সাথে তুলনা করার মতো কখনো কিছু দেখে নি। এ রকম কিছু একটা যে তৈরি করা যায় নিজের চোখে না দেখলে সে কখনো বিশ্বাস করত না। এত বাস্তব অনুভূতি যে তার মনে হতে থাকে হাতটি চোখের সামনে তুলে ধরলে সেই হাতটিও দেখতে পাবে। ব্যাপারটি সম্ভব নয় জেনেও সে হাতটি চোখের সামনে আনে সাথে সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে। সে তার হাতটাকে দেখতে পাচ্ছে! কী আশ্চর্য! সে অন্য হাতটিও সামনে এনে ধরে। তারপর নিজের শরীরের দিকে তাকায়। এই তো তার শরীর হাত পা! কারুকাজ করা কাঠের একটা চেয়ারে বসে আছে সে। সে কি নিজের শরীর স্পর্শ করতে পারবে? অনিশ্চিতের মতো সে নিজেকে স্পর্শ করে। সাথে সাথে সে স্পর্শ করার অনুভূতিটি টের পায়। কী আশ্চর্য! কী করে করেছে এটি শওকত?

বব লাস্কি এবার দাঁড়াতে চেষ্টা করে, প্রথমে মনে হয় সারা পৃথিবী দুলে উঠেছে কিন্তু কিছুক্ষণেই সব স্থির হয়ে যায়। সত্যি সত্যি কি সে দাঁড়িয়েছে নাকি এটি দক্ষ সফটওয়ারে তৈরী দাঁড়ানোর একটা অনুভূতি? বব লাস্কি এক পা এগিয়ে যায়, সত্যি সত্যি সে প্রাচীন এই ঘরের মাঝে হাঁটছে! কেউ যদি এত বাস্তব অনুভূতির জন্ম দিতে পারে তাহলে বাস্তব আর

কল্পনার মাঝে পার্থক্য কোথায়? স্বপ্ন আর সত্যি কি ভিন্ন জিনিস? বব লাস্কি কৌতূহলী চোখে করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে। বহুদূরে একটা কাঠের দরজা। সে কি হেঁটে যাবে দরজার কাছাকাছি, খুলে দেখবে কী আছে দরজার অন্য পাশে?

বিশাল নির্জন একটা উপাসনাকক্ষে বব লাস্কি হেঁটে যেতে থাকে। মসৃণ দেয়ালে নিজের ছায়া পড়েছে, ঘরের নৈঃশব্দ্য ভেঙে যাচ্ছে তার পায়ের শব্দে। দরজার কাছাকাছি এসে সে সাবধানে হাতল ধরে খুলে ফেলে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে হঠাৎ! পৃথিবীর বাইরের কোনো এক নীল হ্রদ, সেই হ্রদের পানিতে ছায়া পড়ছে চাঁদের, নরম আলোতে কী অপূর্ব মায়াময় লাগছে। দূরে পাইনগাছের সারি, বাতাসে দুলছে সেই গাছ। কী অপূর্ব! বব লাস্কি বিশ্বাস করতে পারে না এই সবকিছু কল্পনা, একজন মানুষের হাতে তৈরী একটা কাল্পনিক জগৎ। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য।

মাথায় হাত দিয়ে সে হেলমেটটি খুলে ফেলল, সাথে সাথে কল্পনার জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। বড় একটা টেবিলের কিছু যন্ত্রপাতির সামনে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আছে সে, তার সামনে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শওকত। বব লাস্কি বিস্মিত চোখে হেলমেটটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে মাথা নেড়ে বলল, কী আশ্চর্য!

শওকত একটু এগিয়ে আসে, কী হয়েছে বব?

এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যিই কি আমি দেখেছি?

হ্যাঁ, দেখেছ। বিশ্বাস না হলে আবার মাথায় দাও হেলমেটটা।

বব কাঁপা হাতে হেলমেটটা মাথায় দিতেই আবার সেই বিচিত্র জগৎ চোখের সামনে ফিরে আসে। নীল হ্রদে চাঁদের ছায়া পড়ে চকচক করছে রুপালি আলো। পাইনগাছ নড়ছে মৃদু বাতাসে। রাতজাগা একটা পাখি ডেকে ডেকে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। দরজার দিকে তাকাল সে, ভিতরে বিশাল উপাসনাকক্ষের মতো একটা ঘর, নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছে। বব লাস্কি দুই পা হেঁটে যায় ভিতরে, চারদিকে কী আশ্চর্য সুনসান নীরবতা। বব লাস্কি মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল আবার, সাথে সাথে ফিরে এল বৈচিত্র্যহীন সাদাসিধে একটা ল্যাবরেটরিতে। গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আছে সে।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, আমি সারাক্ষণ এই চেয়ারে বসেছিলাম?

হ্যাঁ। তুমি এই চেয়ারে বসেছিলে।

কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম।

তোমার মনে হয়েছে তুমি হাঁটাহাঁটি করছ, আসলে কর নি। তোমার হাতে-পায়ে নানারকম সেন্সর আছে, সেখান থেকে ফিডব্যাক নেয়া হয়। রবোটিকের কিছু প্রাচীন সফটওয়ারের কাজ। তুমি যদি আরো খানিকক্ষণ থাকতে, তোমার অনেক মানুষের সাথে দেখা হত। ইচ্ছে করলে তুমি তাদের সাথে কথা বলতে পারবে, ঝগড়া করতে পারবে, হাতাহাতি করতে পারবে।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। অনেক সুন্দরী মেয়ে রয়েছে সেখানে। শওকত নরম গলায় হেসে উঠে বলল, ইচ্ছে করলে তুমি তাদের সাথে ভালবাসাও করতে পারবে!

বব লাস্কি তখনো বিস্ময়াভিভূত হয়ে টেবিলের উপর যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনো এটা বিশ্বাস করতাম না। কখনো না।

যাই হোক, এখন তো নিজের চোখে দেখেছ। বিশ্বাস করেছ নিশ্চয়ই। তোমাকে বলে দিই কী করতে হবে। শওকত টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা ম্যাগনেটিক টেপ তুলে নেয়, এই যে এটা হচ্ছে পুরো সফটওয়ার, সোর্স কোড, লাইব্রেরি সবকিছু। আমি দুঃখিত সি. ডি. রমে করে দিতে পারছি না— একটি মাত্র কপির জন্যে আর যন্ত্রণা করার ইচ্ছে হল না।

কোনো সমস্যা নেই। আমরা ব্যবস্থা করে নেব।

পুরো সিস্টেমটা কীভাবে দাঁড়া করানো হয়েছে তার সব খুঁটিনাটি লেখা আছে এই ফোল্ডারগুলোতে। সাধারণ মানুষ কিছু বুঝবে না কিন্তু হার্ডওয়ারের যে-কোনো মানুষ বুঝবে আমি কী বলছি। এখানে যা লেখা আছে তার পোস্ট স্ক্রিপ্টে ফাইল রয়েছে এই টেপটাতে। এটাও তুমি নিয়ে যাবে।

বেশ।

আরেকজনের লেখা পড়ে কিছু তৈরি করা খুব সহজ না। তাই তোমাকে আমার পুরো সিস্টেম নিয়ে যেতে হবে। আমি বাক্স তৈরি করে রেখেছি, ভিতরে ভরে নিয়ে যাবে। আমি দু শ বিশ ভোল্ট পঞ্চাশ সাইকেলে ব্যবহার করি, তোমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করে নিও।

আর কিছু জানতে হবে আমার?

না। কিছুই তোমার করতে হবে না, সুইচ অন করে প্রোগ্রামটা শুধু লোড করতে হবে। কাজ চালানোর মতো ইউনিক্স জানলেই হবে। শওকত হাতের ম্যাগনেটিক টেপগুলো টেবিলের উপর রেখে বলল, আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমার?

বব লাস্কি তার কোটের পকেটে হাত ঢোকায়, ছোট্ট একটা রিভলবার রয়েছে সেখানে। সাবধানে সেটি বের করে আনে সে, শওকত হঠাৎ পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়।

বব লাস্কি নিচু গলায় বলল, আমি দুঃখিত শওকত। আমি খুব দুঃখিত। তুমি যেটা তৈরি করেছ, পৃথিবীজোড়া তার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বিজনেস হবে। এত বড় একটা জিনিস তোমার তৈরি করার কথা নয়। সেটা খুব ভুল ব্যাপার। খুব ভুল ব্যাপার।

শওকতের মুখ ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে যায়। বব লাস্কি আরো এক পা এগিয়ে এসে বলল, এর মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই। কোনো শত্রুতা নেই, হিংসা-দ্বেষ-রাগারাগি নেই। আমি সত্যি তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করি। পরাবাস্তবতার জগতে হয়তো তোমার নাম থাকার কথা ছিল কিন্তু সত্যিকারের পৃথিবী খুব স্বার্থপর। খুব স্বার্থপর।

শওকত শূন্য দৃষ্টিতে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল, না-না-না—

আমি দুঃখিত শওকত। বব লাস্কি দুই হাতে রিভলবারটি ধরে উঁচু করে তোলে, বুকের দিকে নিশানা করে ট্রিগার টেনে ধরে।

চাপা একটা শব্দ হল, শওকতের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে সাথে সাথে। শওকত দুই হাতে টেবিলটা ধরে তাল সামলানোর চেষ্টা করে, পারে না। একটু ঝুঁকে যন্ত্রপাতির র‍্যাকটা আঁকড়ে ধরে, মনে হয় কিছু একটা করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, ঝুঁকে নিচে পড়ে যায়। রক্তের ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে যায় ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায়।

বব লাস্কি ঘরের অন্যপাশে গিয়ে বাইরে তাকাল, কোথাও কেউ নেই। কেউ জানতে পারবে না এখানে কী হয়েছিল। রিভলবারটি হাতে ধরিয়ে দিতে হবে দেখে মনে হবে আত্মহত্যা। খ্যাপা গোছের মানুষ, কেউ সন্দেহ করবে না। বব লাস্কি একটা নিশ্বাস ফেলল। পৃথিবীতে কাজ করার একটা নিয়ম তৈরি হয়েছে, তার বাইরে কাজ করতে যায় শুধুমাত্র আহাম্মকেরা। যত বুদ্ধিমানই হোক, যত প্রতিভাবানই হোক, তারা সব আহাম্মক। এই পৃথিবী আহাম্মকের জন্যে নয়। কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না।

বব লাস্কি শওকতের মৃতদেহের কাছে ফিরে এল, শরীর এখনো উষ্ণ, একটু আগেই এই মানুষটির নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কত পরিকল্পনা ছিল এখন সব হারিয়ে গেছে। সে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মৃত্যু সেটি যত প্রয়োজনীয়ই হোক–না কেন কখনো সেটা সহজ করে নেয়া যায় না।

বব লাস্কি রিভলবারটি ভালো করে মুছে নিয়ে শওকতের ডান হাতে লাগিয়ে দেয়। এখন তাকে দেখে কেউ আর তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে সম্ভাবনা করবে না। টেবিলের উপর কাল্পনিক কোনো মেয়ের একটা চিঠি রেখে যেতে হবে, এর সাথে স্নায়ু শীতল করার কিছু স্থানীয় ওষুধ। বব লাস্কি ঘড়ির দিকে তাকাল, এখনো হাতে অনেক সময় রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই নির্জন বাসাটিতে কখনো কেউ আসে না, তার কোনোকিছু শেষ করার কোনো তাড়া নেই।

বব লাস্কি টেবিলের উপর রাখা র‍্যাকটির দিকে তাকাল, এখনো সবকিছু ঠিক রয়েছে। গুলি খেয়ে পড়ে যাবার আগে শওকত র‍্যাকের পিছনে কিছু ধরার চেষ্টা করেছিল মনে হয় কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। তবুও একবার দেখে নেয়া ভালো। মনিটরে তাকিয়ে দেখতে পায় ভারচুয়াল রিয়েলিটির এই অবিশ্বাস্য প্রোগ্রামটি ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি এক মিনিট পরে–পরে একটা ছোট তথ্য মনিটরে লিখে যাচ্ছে। পুরোটা বাক্সবন্দি করার আগে মনে হয় হেলমেটটা মাথায় লাগিয়ে দেখে নেয়া উচিত।

বব লাস্কি চেয়ারে বসে মাথায় হেলমেটটা পরে নেয়, সাথে সাথে তার চোখের সামনে একটি নতুন জগৎ খুলে যায়। বিশাল একটি নির্জন ঘর, ঘরের দেয়ালে কারুকাজ, ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন। ঘরের ভিতরে সুনসান নীরবতা— বাইরে মনে হয় উদ্দাম বাতাস দরজায় মাথা কুটছে। বব লাস্কি অন্যমনস্কভাবে দুই এক পা হাঁটল, নিজের পায়ের শব্দ শুনে নিজেই কেমন জানি চমকে ওঠে। ডান পাশে আরো একটি ঘর, কী আছে এই ঘরের ভিতর? বব লাস্কি হেঁটে গিয়ে দরজায় হাত রাখল। সাথে সাথে ভিতর থেকে একজন বলল, কে?

বব লাস্কি চমকে উঠল, থতমত খেয়ে বলল, আমি।

আমি কে?

আমি বব লাস্কি।

বব লাস্কি? কী চাও তুমি?

কিছু না। বব লাস্কি দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল, ভিতরে গাঢ় অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। ধোঁয়ার মতো কুয়াশা পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, হঠাৎ কে যেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে আসে। দীর্ঘ দেহ, মাথায় এলোমেলো চুল। বব লাস্কির দিকে তাকাল, কী ভয়ানক তীব্র তার দৃষ্টি। মানুষটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই চোখে কি ঘৃণা আর ক্রোধ? বব লাস্কি কেন জানি সহ্য করতে পারল না, দুই হাতে ধরে মাথা থেকে হেলমেটটি খুলে ফেলে। সাথে সাথে আবার শওকতের বৈচিত্র্যহীন ল্যাবরেটরি ঘরটায় ফিরে আসে। টেবিলের উপর র‍্যাকের মাঝে যন্ত্রপাতি, একটা বড় মনিটর কি–বোর্ড। মেঝেতে পড়ে থাকা শওকতের মৃতদেহ। বব লাস্কি মাথা ঘুরিয়ে মৃতদেহটির দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল— সেখানে কিছু নেই। কোথায় গিয়েছে মৃতদেহটি? বব লাস্কি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং হঠাৎ করে চোখের সামনে সবকিছু কেমন জানি দুলে ওঠে। টেবিলটা ধরে সে কোনোমতে নিজেকে সামলে নেয়। ভয়ে ভয়ে তাকায় চারদিকে, কিছু একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে এখানে কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারছে না। পায়ে

পায়ে হেঁটে সে জানালার কাছে দাঁড়ায়। ওই তো বাইরে দুটো নারকেল গাছ, একটা বাজ পড়ে পুড়ে গেছে। লোহার গেট। ছোট ইটের রাস্তা। সবকিছু আগের মতোই আছে কিন্তু কিছু একটা যেন অন্যরকম। সেটা কী?

বব লাস্কির গলা শুকিয়ে যায় হঠাৎ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, কী হয়েছে এখানে?

খুট করে একটা শব্দ হল পিছনে, চমকে ঘুরে তাকাল বব লাস্কি এবং হঠাৎ একেবারে জমে গেল পাথরের মতন। ঘরের দরজায় শওকত দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরে গুলির কোনো চিহ্ন নেই। সুস্থ সবল একজন মানুষ।

বব লাস্কি শওকতকে দেখে যত অবাক হয়েছিল, শওকত ঠিক ততটুকু অবাক হল তাকে দেখে। উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, তুমি কে? কেন এসেছ এখানে?

বব লাস্কি কোনো কথা বলল না, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল শওকতের দিকে। হঠাৎ তার একটা বিচিত্র সন্দেহ হতে শুরু করেছে। শওকত আরো এক পা এগিয়ে এসে বলল, তুমি জান খুব বড় একটা গোলমাল হয়েছে কোথাও। খুব খুব বড় গোলমাল?

কী গোলমাল?

আমি জানি না। কিন্তু আমার সাথে এই ঘরে যদি কারো দেখা হয়, তার মানে খুব বড় গোলমাল হয়েছে। মূল প্রোগ্রাম এখন কেটে দেয়া হয়েছে, আমরা সবাই চলে গেছি নিরাপত্তার অংশে।

কী বলছ তুমি?

তুমি নিশ্চয়ই জান এটি ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রাম। জান?

বব লাস্কি আতঙ্কে শিউরে উঠে দুই হাতে নিজের মাথায় হাত দিয়ে হেলমেটটি আবার খুলে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু সেখানে কিছু নেই।

AMARBOI.COM

শওকত মাথা নাড়ল, বলল, না, তুমি এখন এই প্রোগ্রামের বাইরে যেতে পারবে না। তোমাকে এখন এখানে থাকতে হবে।

কতক্ষণ থাকতে হবে?

সারা জীবন।

সারা জীবন?

হ্যাঁ। প্রোগ্রামের এই অংশটি সারা জীবন চলার কথা। কেউ নিজে থেকে এর বাইরে যেতে পারে না।

বিশ্বাস করি না আমি—বিশ্বাস করি না! বব লাস্কি চিৎকার করে বলল, আমি কিছু বিশ্বাস করি না।

কিছু আসে যায় না তাতে। শওকত বিষণ্ন গলায় বলল, তুমি বিশ্বাস না করলে কিছু আসে যায় না। আমরা এখন এই ছোট ঘরটায় আটকা পড়ে গেছি।

বব লাস্কি প্রাণপণে নিজের মাথায় অদৃশ্য একটা হেলমেটকে টেনে আলাদা করতে চায় কিন্তু কোনো লাভ হয় না। শওকত এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে থাকে। যখন বব লাস্কি হাল ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে সে নরম গলায় বলল, আমি তোমার জন্যে খুব দুঃখিত, কিন্তু সত্যি তোমার কিছু করার নেই। তোমাকে এখন এখানে থাকতে হবে।

বব লাস্কি উঠে গিয়ে টেবিলের উপর র‍্যাকটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, মনিটরটাকে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছড়ে ফেলে মেঝেতে— হ্যাঁচকা টান দিয়ে পাওয়ার কর্ডটি খুলে আনে। শওকত আবার নরম গলায় বলল, তুমি জান এইসব কম্পিউটারে তৈরী কল্পনার জগৎ। এগুলো সত্যি নয়। এগুলো ভেঙে না–ভেঙে কোনো লাভক্ষতি নেই।

বব লাস্কি বিস্ফারিত চোখে তাকাল শওকতের দিকে। শওকত প্রায় কোমল গলায় বলল, তোমার নাম কী?

বব লাস্কি।

বব লাস্কি! তুমি তোমার শক্তি অপচয় কোরো না। একটু পরে তোমাকে নিতে আসবে অন্ধকার জগতের মানুষেরা।

কারা?

অন্ধকার জগতের মানুষ। ভালবাসাহীন অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিছু মানুষ।

কী করবে তারা আমাকে?

আমি জানি না। শওকত নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানতেও চাই না।

সেখান থেকে আমি বের হতে পারব না কখনো?

পারবে। অবশ্যি পারবে। যখন সত্যিকারের শওকত এসে প্রোগ্রামটি বন্ধ করে দেবে, তুমি বের হয়ে আসবে আবার।

বব লাস্কির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে। শওকত তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? শওকত নিশ্চয়ই আসবে তোমাকে মুক্ত করতে। তোমাকে এভাবে এখানে আটকে রেখে কখনোই চলে যাবে না।

পরাবাস্তবতার জগতে শওকতের একটি কাল্পনিক রূপ হঠাৎ কেমন জানি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। মাথা ঘুরে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, শওকত ভালো আছে তো?

বব লাস্কি কোনো কথা বলল না, মাথা নিচু করে বসে রইল। ধরাছোঁয়ার বাইরে এক পরাবাস্তবতার জগতে।

AMARBOI.COM

ওরা

লিশান ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন তার মেয়ে য়িমা ঘরের মাঝামাঝি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে নরম চেয়ারটিতে হেলান দিয়ে বসলেন। য়িমা একটু এগিয়ে এসে বলল, বাবা, তুমি আমাকে দেখ নি?

দেখেছি য়িমা।

কিন্তু তুমি আমাকে দেখেও কিছু বল নি।

না, বলি নি। সবসময় কি কথা বলতে হয়?

কিন্তু তুমি আমার দিকে এগিয়ে আস নি, আমাকে স্পর্শ কর নি, আমাকে আলিঙ্গনও কর নি।

লিশান তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, য়িমা, তুমি এখান থেকে চার হাজার কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছ, আমার সামনে যেটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি তুমি নও,

সেটি তোমার একটা প্রতিচ্ছবি! তুমি যে কথা বলছ তার সবগুলো তোমার কথা নয়, একটি কৌশলী–যন্ত্র জানে তুমি কেমন করে কথা বল তাই সে তোমার মতো করে কথা বলছে। আমি কেমন করে একটা যন্ত্রের মুখের কথা শুনে একটা প্রতিচ্ছবিকে আলিঙ্গন করব?

য়িমা একটু এগিয়ে এসে তার বাবার দিকে নিজের হাতটি এগিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, তুমি কী বলছ এসব? এই যে আমার হাত ধরে দেখ, দেখবে কত জীবন্ত মনে হবে।

জীবন্ত মনে হওয়া আর জীবন্ত হওয়া এক জিনিস নয় য়িমা।

য়িমা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, বাবা, তুমি একেবারে পুরোনোকালের মানুষ।

হ্যাঁ, মা, আমি খুব পুরোনোকালের মানুষ।

প্রতিদিন এত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হয় তুমি তার কোনোকিছু ব্যবহার কর না। তোমার দেহবন্ধনী নেই, তোমার দৃষ্টিসীমা নেই, তোমার যোগাযোগ বলয় নেই, তোমার আধুনিক কোনো যন্ত্রপাতি নেই। তুমি মানুষটি একেবারেই আধুনিক নও—

লিশান তার মেয়ের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, না য়িমা, আমি মোটেও আধুনিক নই! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি আমার মেয়ের প্রতিচ্ছবি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারি না, সত্যিকারের মেয়েটিকে দেখার জন্যে আমার বুক খাঁ–খাঁ করে।

য়িমা একটু আদুরে গলায় বলল, বাবা, তুমি এত বড় একজন বিজ্ঞানী, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে তুমি এত বোকা!

মেয়ের অভিযোগ শুনে লিশান একটু হেসে বললেন, সব মানুষই কোনো–না–কোনো বিষয়ে বোকা হয়—

তুমি একটু বেশি বোকা।

হ্যাঁ, মা, আমি একটু বেশি বোকা।

য়িমা অন্যমনস্কভাবে ঘরে একটু ঘুরে আবার তার বাবার কাছে এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি একা একা সময় কাটাও কেমন করে?

লিশান বললেন, আমি যখন একা একা থাকি, আমার সময় কাটাতে কোনো অসুবিধে হয় না। বরং যখন লোকজন এসে যায় তখন আমার সময় নিয়ে খুব সমস্যা হয়। কী বলতে হয় টের পাই না।

আমি যখন আসি তখন?

তুমি তো আস না। তোমাকে আমি শেষবার কবে দেখেছি মনেও করতে পারি না।

এই যে এলাম—

লিশান তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, এটা তো আসা হল না।

য়িমা একটু আহত গলায় বলল, ঠিক আছে বাবা, আমি আর এভাবেও আসব না।

আসবে না কেন মা, আসবে। অবশ্যি আসবে। বাবার ওপর রাগ করতে হয় না, বিশেষ করে যদি বোকা বাবা হয়।

য়িমা একটু হেসে ফেলে আরেকটু এগিয়ে বলল, বাবা তুমি এখন কী নিয়ে কাজ করছ?

জটিল একটা অঙ্ক করছি।

মানুষ আজকাল নিজে নিজে অঙ্ক করে না বাবা! অঙ্ক করার জন্যে কত ক্রাঞ্চ মেশিন তৈরি হয়েছে! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মেশিন আছে তার নাম অলৌকিক চিন্তাবিদ। তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে বাবা, সেটা যে কত তাড়াতাড়ি কত কঠিন কঠিন অঙ্ক করে ফেলে!

তাই নাকি?

AMARBOI.COM

হ্যাঁ বাবা। তুমি কোনোকিছু খোঁজ রাখ না। তোমার অঙ্কটা সেরকম একটা মেশিনকে কেন দিলে না?

তাহলে আমি কী করব?

অন্য সবাই যা করে তুমিও তাই করবে। পাহাড়ে বেড়াতে যাবে, সমুদ্রে যাবে, জাদুঘরে যাবে, সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাবে—

লিশান একটু হেসে বললেন, যার যেটা ভালো লাগে, তার সেটাই করতে হয় য়িমা। আমার এটাই ভালো লাগে।

তোমার অঙ্ক করতে ভালো লাগে?

হুঁ।

কিসের অঙ্ক এটা বাবা?

লিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে অনেক রকম তথ্য পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে প্রথম যখন প্রাণের বিকাশ হয়েছিল সেই সময়ের তথ্য।

সেই তথ্য দিয়ে তুমি কী করবে?

আমি সেই তথ্য দিয়ে বের করার চেষ্টা করছি পৃথিবীতে কেমন করে প্রাণের সৃষ্টি হল।

বের করেছ বাবা?

লিশান কোনো কথা বললেন না।

বের করেছ?

লিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কী করেছি আমি নিজেই জানি না য়িমা। আমি সত্যিই জানি না।

লিশানকে হঠাৎ কেমন জানি বিষণ্ন দেখাতে থাকে, তিনি অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

য়িমা কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি জান না তুমি কী বের করেছ?

লিশান জানালা দিয়ে বাইরে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে রইলেন, য়িমার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। য়িমা আবার কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তার বাবা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন, কোনো কথা বললে শুনতে পাবেন বলে মনে হয় না।

য়িমা বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বাবাকে সে একটা কথা বলতে এসেছিল, সেটা আর বলা হল না। তার ভিতরে কী একটা পরিবর্তন হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না, ভেবেছিল বাবার সাথে সেটা নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু এখন সে আর বাবার সাথে সেটা নিয়ে কথা বলতে পারবে না! কে জানে শুনে বাবা হয়তো আরো বিষণ্ন হয়ে যাবেন। সে বাবার মন খারাপ করতে চায় না, তাকে সে বড় ভালবাসে।

লিশান লাইব্রেরিঘরে বড় প্রসেসরের সামনে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ মনিটরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘদিন চেষ্টা করে খুব ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কের অনুকরণে সেখানে নিউরাল কম্পিউটার তৈরি হয়েছে, তিনি সেটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে তাকে জেগে উঠতে বললেন। সাথে সাথে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল এবং ঘরের মাঝামাঝি প্রায় লিশানের মতোই একজন মানুষের প্রতিচ্ছবি জেগে উঠল। প্রতিচ্ছবিটি নরম গলায় বলল, কী ব্যাপার লিশান?

একা একা ভালো লাগছিল না। ভাবলাম তোমার সাথে একটু কথা বলি।

প্রতিচ্ছবিটি একটু হেসে বলল, আমি তো আসলে তোমার অনুকরণে তৈরী। আমার সাথে কথা বলা হচ্ছে নিজের সাথে কথা বলার মতো। মানুষ কি কখনো নিজের সাথে কথা

বলে?

বলে।

প্রতিচ্ছবিটি হেসে বলল, হ্যাঁ, বলে। ঠিক আছে বল তুমি কী বলবে?

লিশান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তোমার কি মনে হয় আমার সমাধানটি সত্যি?

হ্যাঁ, লিশান সত্যি।

কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব?

তুমি দেখেছ সেটা সম্ভব। তুমি একই সমস্যা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাধান করেছ। প্রত্যেকবারই তোমার সমাধান একই এসেছে। তুমি সেখানে থাম নি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পিউটার ব্যবহার করে সেখানে সেটাকে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষা করেছ। তোমার সমাধানে কোনো ভুল নেই লিশান।

লিশান স্থির দৃষ্টিতে তার প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমার সমাধানটি বলেছে পৃথিবীর যে পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না।

না, পারে না। প্রতিচ্ছবিটি প্রায় কঠিন গলায় বলল, তুমি সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছ। তুমি প্রাণের জৈব রূপ নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছ তার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ ছিল না। তুমি মহাকাশের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ দিয়ে প্রমাণ করেছ সেই তেজস্ক্রিয়তায় প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব নয়। তুমি সম্ভাব্যতার গণিত দিয়ে প্রমাণ করেছ প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্যে যে পরিমাণ চাঞ্চল্য প্রয়োজন পৃথিবীতে তা ছিল না। শুধু যে ছিল না তাই নয়, লক্ষ ভাগের এক ভাগও ছিল না!

হ্যাঁ। লিশান মাথা নাড়লেন, আমি দেখিয়েছি।

তুমি দেখিয়েছ পৃথিবীতে যে তাপমাত্রা ছিল সেই তাপমাত্রায় অণু-পরমাণুর কম্পন কীভাবে প্রাণ সৃষ্টির অন্তরায় হতে পারে। দেখাও নি?

দেখিয়েছি।

তুমি দেখিয়েছ পৃথিবীতে দীর্ঘ সময় প্রকৃতির সুষ্ঠু শক্তি প্রবাহ হয় নি। তুমি দেখিয়েছ সেটি সুষম নয়। শুধু যে সুষম নয় তাই নয়, প্রাণ সৃষ্টির একেবারে বিপরীত।

লিশান মাথা নাড়লেন, বললেন, আমি দেখিয়েছি।

তুমি সেটা প্রমাণ করেছ প্রস্তর-কণায় কার্বন অণুর বৈষম্য দেখিয়ে। দেখাও নি?

দেখিয়েছি।

তুমি এককোষী প্রাণীর ফসিলের ডি. এন. এ. থেকে দেখিয়েছ তাতে যে-ধরনের সামঞ্জস্য আছে সেই সামঞ্জস্যের জন্যে প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা পৃথিবীর পরিবেশে ছিল না। দেখাও নি?

হ্যাঁ, আমি দেখিয়েছি।

তুমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। তুমি কোনো ভুল কর নি লিশান।

লিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ আমি জানি, আমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছি পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে শুধু যে প্রাণ রয়েছে তাই নয়, এখানে রয়েছে পরিচিত জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। তারা কোথা থেকে এল?

লিশানের মতো দেখতে প্রতিচ্ছবিটি নরম গলায় বলল, তুমি জান তারা কোথা থেকে এসেছে।

লিশান মৃদু গলায় বললেন, হ্যাঁ, আমি জানি। আর জানি বলেই আমার ভিতরে কোনো

শান্তি নেই।

তুমি ভয় পাচ্ছ লিশান?

হ্যাঁ, বলতে পার এক ধরনের ভয়।

প্রতিচ্ছবিটি হেসে বলল, তোমার তো ভয় পাবার কিছু নেই লিশান। ভয় পাচ্ছ কেন?

আমি যে সমাধানটি করেছি সেটি কোথাও প্রকাশ করি নি। পৃথিবীর কেউ সেটা এখনো জানে না। যখন জানবে তখন কী একটা আঘাত পাবে পৃথিবীর মানুষ! এই পৃথিবীতে তাদের থাকার কথা নয়। তারা আছে কারণ এক বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের এই পৃথিবীতে এনেছে! চিন্তা করতে পার?

তুমি ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটি বিশ্বাস করা কঠিন, গ্রহণ করা আরো কঠিন।

হ্যাঁ। আর পুরো ব্যাপারটি চিন্তা করলে গায়ে কেমন যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কেন লিশান?

যে বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবীতে মানুষের, জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গের জন্ম দিয়েছে তারা যদি আমাদের সাথেই আছে, তারা যদি আমাদের তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করছে, তাদের কাছে যদি পুরো ব্যাপারটা হয় পরীক্ষাগারে একটা গবেষণা? একটা কৌতুক?

তাহলে কী হবে?

তারা যদি আমাদের এখন দেখা দেয়? তারা যদি মনে করে কৌতুকের অবসান হয়েছে, এখন পৃথিবীতে আর প্রাণের প্রয়োজন নেই?

লিশানের প্রতিচ্ছবিটি শব্দ করে হেসে বলল, তুমি মনে হয় পুরো ব্যাপারটি নিয়ে একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে আছ! তোমার মস্তিষ্ক মনে হয় খানিকটা উত্তপ্ত। তোমার এই সমস্যাটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত পৃথিবী ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাবে, তুমি সেটা সত্যি বিশ্বাস কর?

লিশান কোনো কথা না বলে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

ভোরবেলা লিশান খাবার টেবিলে বসে খানিকটা ফলের রস খেল দীর্ঘ সময় নিয়ে। তারপর যোগাযোগ কেন্দ্রে সাজিয়ে রাখা পুরো সমাধানটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কে প্রবেশ করিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্তে সেটি এখন পৃথিবীর সব গবেষণাগারে, সব শিক্ষাকেন্দ্রে, সব প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষ কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনে যাবে এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না। এখানে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে কারণ কোনো একটি বুদ্ধিমান প্রাণী এখানে প্রাণ সৃষ্টি করতে এসেছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নয়। মানুষ কোনো একটি প্রাণীর হাতের পুতুল, গবেষণাগারের একটি পরীক্ষা, খেয়ালি একজনের কৌতুক।

লিশান দুপুরবেলা ঘর থেকে বের হলেন। তার বাসার কাছে একটা ছোট হ্রদ রয়েছে, হ্রদের চারপাশে পাইনগাছ। হ্রদের টলটলে নীল পানিতে উত্তরের হিমশীতল দেশ থেকে উড়ে এসেছে কিছু বুনোহাঁস। তারা সেখানে পানি ছিটিয়ে খেলা করে। লিশান পকেটে করে তাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসে রোজ হ্রদের তীরে বসে বসে তাদের খাওয়ান। হাঁসগুলো ঝাঁপাঝাঁপি করে খায়, পানি ঝাপটিয়ে ছুটে বেড়ায়, তার দেখতে বড় ভালো লাগে। এই হাঁসগুলোও ঠিক মানুষের মতোই কোনো এক বুদ্ধিমান প্রাণীর তৈরী কিন্তু তাদের দেখলে লিশান কিছুক্ষণের জন্যে সেটা ভুলে যেতে পারেন।

লিশান অপরাহ্নে ঘরে ফিরে এলেন। ফিরে আসতে তার খুব দ্বিধা হচ্ছিল। তিনি জানেন

তার বাসাকে ঘিরে থাকবে অসংখ্য সাংবাদিক, নেটওয়ার্কের ক্যামেরা। বছর দশেক আগে তিনি ছোট একটি সূত্র প্রমাণ করেছিলেন, তখন সেটা নিয়েই অনেক হইচই হয়েছিল। তার তুলনায় এটা অনেক বড় ব্যাপার, এবারে কী হবে কে জানে।

ঘরের কাছাকাছি পৌছে লিশান কিন্তু খুব অবাক হলেন, তার ঘরের আশপাশে কেউ নেই। হঠাৎ কেন জানি তার বুক কেঁপে উঠল। কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে এখানে। তিনি কয়েক মুহূর্ত বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে দরজা স্পর্শ করে ভিতরে ঢুকলেন। ঘরের মাঝামাঝি তার মেয়ে য়িমা দাঁড়িয়ে আছে। লিশান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর কোমল গলায় বললেন, তুমি সত্যি এসেছ?

হ্যাঁ বাবা। য়িমা কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই যে, আমাকে ছুঁয়ে দেখ।

লিশান হাত বাড়াতে গিয়ে লক্ষ করলেন তার হাত অল্প অল্প কাঁপছে। য়িমা লিশানের হাতটা ধরে বলল, তোমার শরীর ভালো আছে তো বাবা?

লিশান এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে য়িমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মৃদু গলায় বললেন, ভালো আছি মা।

তুমি কি আমাকে দেখে অবাক হয়েছ বাবা?

লিশান মাথা নাড়লেন, না, অবাক হই নি। খুব কষ্ট হচ্ছে, বুকটা ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু অবাক হই নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাদের কেউ আসবে, কিন্তু কে হবে সেই মানুষটি বুঝতে পারি নি। কখনো ভাবি নি সেটা হবে তুমি।

লিশান খুব ধীরে ধীরে তার চেয়ারটাতে বসে বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সত্যি বুঝি আমার মেয়ে।

য়িমা এক ধরনের বিষণ্ন চোখে বলল, আমি সত্যি তোমার মেয়ে বাবা, তারা তোমার সাথে কথা বলার জন্যে আমাকে বেছে নিয়েছে।

লিশান য়িমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি সত্যিই য়িমা?

আমি সত্যিই য়িমা কিন্তু আমি এখন আরো অনেক কিছু।

আরো অনেক কিছু কী?

য়িমা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি সেটা বুঝবে না বাবা। তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ কিন্তু তবু তুমি বুঝবে না। ত্রিমাত্রিক জগতের মানুষ দশটি ভিন্ন মাত্রাকে একসাথে অনুভব করতে পারে না।

তুমি পার?

এখন পারি। কেউ যদি দীর্ঘদিন অন্ধকার একটা ঘরে ছোট একটা আলো নিয়ে বেঁচে থাকে তারপর হঠাৎ যদি সে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে বের হয়ে আসে, তখন তার যেরকম লাগে আমার সেরকম লাগছে।

সত্যি?

হ্যাঁ বাবা। মানুষের যেরকম দুঃখ কষ্ট রাগ ভালবাসার অনুভূতি আছে আমার সে অনুভূতি আছে, তার সাথে সাথে আরো অসংখ্য নতুন অনুভূতির জন্ম হয়েছে—তোমরা যেগুলো কখনো অনুভব কর নি, কখনো অনুভব করতে পারবে না।

লিশান আস্তে আস্তে বললেন, য়িমা, তোমাকে আমি বুকে ধরে মানুষ করেছি। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন কত রাত আমি তোমাকে বুকে চেপে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন আমি তোমার জন্যে বুকে এক তীব্র ভালবাসা অনুভব করেছি। যে প্রাণী মানুষের

AMARBOI.COM

বুকে সেই তীব্র ভালবাসার জন্ম দিতে পারে সেই প্রাণী নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য উন্নত এক প্রাণী।

হ্যাঁ বাবা। সেই প্রাণী খুব উন্নত প্রাণী।

য়িমা হেঁটে এসে লিশানের হাত স্পর্শ করে বলল, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি বাবা।

আমি জানি।

তুমি জান না বাবা, তুমি কখনো জানবে না।

লিশান চুপ করে রইলেন তারপর নরম গলায় বললেন, আমি যে সমাধানটি বের করেছি সেটা পৃথিবীর মানুষ কখনো জানতে পারবে না?

না! তুমি যখন নেটওয়ার্কে দিয়েছ সাথে সাথে সেটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ কখনো সেটা জানবে না।

তোমরা চাও না মানুষ সেটা জানুক?

না! আমরা চাই না। মানুষ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে আমরা একটা প্রাণ সৃষ্টি করেছি সেটিও চমৎকার একটি প্রাণ কিন্তু তোমাদের মতো এত সুন্দর নয়। ক্যাসিওপিয়ার কাছাকাছি একটা প্রাণ তৈরি করেছি সেটা সমন্বিত প্রাণ, বিশাল একটি একক, তোমাদের কাছে সেটা মনে হবে বিচিত্র!

তুমি কেন আমাকে এসব বলছ?

তোমার জানার এত আগ্রহ সেজন্যে। তুমি যদি চাও তোমাকে আমরা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারি। অন্য কোনো জগতে—

না। লিশান মাথা নাড়লেন, আমাকে এখানেই রেখে দিয়ে যাও। পৃথিবীর উপর মায়া পড়ে গেছে। আমি এখানেই মারা যেতে চাই।

লিশান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, য়িমা—

বল বাবা।

তোমরা তো এখন আমাকে মেরে ফেলবে। আমি কি মারা যাবার আগে তোমাদের একবার দেখতে পারি?

এই তো আমাকে দেখছ—

না মানুষের রূপে না, সত্যিকার রূপে।

তোমার দেখার ক্ষমতা নেই বাবা! আমরা মানুষকে তৃতীয় মাত্রার বাইরে দেখার ক্ষমতা দেই নি।

আমি তবু দেখতে চাই।

তুমি ভয় পাবে বাবা।

তবু দেখতে চাই—

ঠিক আছে, এস, দেখবে এস। হাত বাড়িয়ে দাও।

লিশান তার হাত বাড়িয়ে দিলেন, সেটি অল্প অল্প কাঁপছিল।

বিশাল এক আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতা, সেই শূন্যতার কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই, কোনো আদি নেই, কোনো অন্ত নেই। বিশাল সেই শূন্যতা কুণ্ডলী পাকিয়ে অন্ধকার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে, পাক খেয়ে খেয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এক ভয়ঙ্কর আকর্ষণে। চারদিকে বিচিত্র এক নৈঃশব্দ্য, সেই নৈঃশব্দ্যে অন্য এক নৈঃশব্দ্য হঠাৎ করে তীব্র ঝলকানি

AMARBOI.COM

দিয়ে ওঠে, সমস্ত চেতনা হঠাৎ এক ভয়ানক প্রলয়ের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সমস্ত স্নায়ু হঠাৎ টান টান হয়ে অপেক্ষা করে ধ্বংসের জন্যে...

পরদিন পৃথিবীর নেটওয়ার্কে বড় করে প্রচারিত হল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ লিশানের মৃত্যুর খবর। মৃত্যুর আগে ছোট দুর্ঘটনায় তার যোগাযোগ মডিউল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি কিসের উপর গবেষণা করছিলেন সেটা কেউ জানতে পারল না।

লিশানের মৃত্যুতে তার মেয়ে য়িমার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে কিছু সাংবাদিক তাকে খোঁজ করছিল। নেটওয়ার্ক জানিয়েছে এই খবর প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে তাকে তখনো পাওয়া যায় নি।

বিকল্প

দরজা খুলে নাসরীন দেখল জাহিদের পিছনে আরেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এবং মানুষটির চেহারা অস্বাভাবিক সুন্দর, শুধুমাত্র সিনেমার পত্রিকাতেই এ রকম সুন্দর চেহারার মানুষ দেখা যায়। জাহিদের সাথে একটু আগেই ভিডিফোনে কথা হয়েছে, সে সাথে আরো কাউকে নিয়ে আসবে বলে নি। বললে ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখা যেত, সে নিজেও চট করে শাড়িটা পাল্টে নিতে পারত। নাসরীন মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, জাহিদ ইচ্ছে করে তার সাথে এ রকম ব্যবহার করে। এ রকম সুপুরুষ একজন মানুষের সামনে সে এভাবে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে তার নিজের উপরেই কেমন জানি রাগ উঠে যায়।

জাহিদ নাসরীনকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল, সে যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সেই ব্যাপারটিও যেন তার চোখে পড়ে নি। সুপুরুষ মানুষটা কী করবে বুঝতে না পেরে জাহিদের পিছনে পিছনে ঘরে এসে ঢুকল, তার চোখেমুখে হতচকিত একটা ভাব।

জাহিদ টেবিলে ব্রিফকেসটা রেখে টাইয়ের গিঁটটা একটু ঢিলে করতে করতে বলল, আমার একটা জরুরি ভিডিফ্যাক্স আসার কথা ছিল।

নাসরীন মুখ শক্ত করে বলল, এসেছে।

ভিডিফ্যাক্সের কথা শুনে জাহিদের মুখের চেহারা একটু নরম হয়ে আসে। সে মাথা নেড়ে বলল, গুড। আমাকে এক গ্লাস পানি দাও তো।

নাসরীন নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করে, ইচ্ছে হল বলে তুমি নিজে ঢেলে নাও। কিন্তু ঘরে একজন বাইরের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সে কিছু বলল না। ফ্রিজের কাছে গিয়ে বোতাম টিপে এক গ্লাস পানি বের করে এনে দেয়। জাহিদ পানিটা ঢকঢক করে খেয়ে গলা দিয়ে এক ধরনের বিশ্রী শব্দ করল। নাসরীন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না যে একজন বাইরের মানুষের সামনে জাহিদ এ রকম একটা আচরণ করতে পারে। সে নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত করে বলল, ইনি কে?

জাহিদ মাথা ঘুরে তাকাল, যেন সে বুঝতে পারছে না নাসরীন কার কথা বলছে। সুপুরুষ মানুষটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এই?

হ্যাঁ। নাসরীন শান্ত গলায় বলল, তুমি এখনো আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দাও নি।

জাহিদ উত্তর না দিয়ে হা হা করে হাসতে থাকে এবং এক সময় হাসি থামিয়ে বলল, এটাকে তুমি মানুষ ভেবেছ?

নাসরীন হকচকিয়ে গেল, বলল, তাহলে—

এটা রবোট।

নাসরীন অবাক হয়ে সুপুরুষ মানুষটার দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার কেন জানি এক ধরনের আশাভঙ্গের অনুভূতি হয়। সে আবার তার বুকের ভিতরে একটি নিশ্বাস ফেলল, তার আগেই বোঝা উচিত ছিল, এ রকম নিখুঁত সুপুরুষ একজন মানুষ সত্যি সত্যি পাওয়া যায় না, তাকে তৈরি করতে হয়।

মনে নেই আমি বলেছিলাম আমাদের জিএম ইমতিয়াজ সাহেব বলেছিলেন আমাকে একটা রবোট দেবেন, ট্রায়াল হিসেবে।

নাসরীন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, বল নি।

বলি নি? জাহিদ অবাক হবার এক ধরনের দুর্বল অভিনয় করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ভেবেছিলাম বলব। ভুলে গেছি।

কী বলতে ভুলে গিয়েছিলে? এখন বলবে?

আমাদের লোকাল ফ্যাক্টরিতে রবোট এসেম্বলি করছে, ট্রায়াল হিসেবে প্রথমে আমাদের নিজেদের মাঝে রবোটগুলো দিচ্ছে।

কেন?

জাহিদ অকারণে একটা হাই তুলল, বোঝা যাচ্ছে তার কথা বলার বিশেষ ইচ্ছে নেই। এটি নতুন নয়, দীর্ঘদিন থেকে সে নাসরীনের সাথে এ রকম ব্যবহার করে আসছে। নাসরীন কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করল, কেন?

জাহিদ নেহাত অনিচ্ছার সাথে বলল, এতদিন ফ্যাক্টরিতে এসেম্বলি লাইনে টেকনিক্যাল কাজে ব্যবহার করেছে। এখন দেখতে চায় গৃহস্থালি পরিবেশে ব্যবহার করা যায় কি না। আমাকে একটা দিয়েছে কয়দিন বাসায় রাখার জন্যে।

তোমাকে কেন?

কারণ আমাদের জিএম ইমতিয়াজ সাহেব আমাকে পছন্দ করেন। তাছাড়া—

তাছাড়া কী?

আমি সিকিউরিটি ডিভিশনের মানুষ। কোনো ইমার্জেন্সিতে রবোটটাকে কিছু করতে হলে আমি করতে পারব। আমার কাছে ইমার্জেন্সি কোড রয়েছে।

জাহিদ নিচু হয়ে জুতোর ফিতা খুলতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে করে থেমে যায়। সে তার পা উপরে তুলে সুপুরুষ মানুষটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, খোল দেখি জুতোটা।

নাসরীন কেমন জানি শিউরে ওঠে, কিন্তু রবোট মানুষটার কোনো ভাবান্তর হল না। সে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে জাহিদের জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করে। একজন অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ—হোক-না সে রবোট, নিচু হয়ে আরেকজনের পায়ের জুতো খুলে দিচ্ছে ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। জাহিদ হাসি হাসিমুখে নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বলল, এর নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহ?

সাথে সাথে রবোটটি নাসরীনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, জি। এখন আমার নাম আবদুল্লাহ।

রবোটটির গলার স্বর অপূর্ব, মনে হয় দীর্ঘদিন রেওয়াজ করে ভোকাল কর্ডে সুর বাঁধা হয়েছে। নাসরীন জিজ্ঞেস করল, এখন আপনার নাম আবদুল্লাহ? আগে অন্য নাম ছিল?

যখন যে প্রজেক্টে যাই তখন সেই প্রজেক্টের উপযোগী একটা নাম দেয়া হয়।

আপনার—

জাহিদ আবার হা হা করে খারাপভাবে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে বলল, এটা একটা রবোট, এর সাথে আপনি জি–হুজুর করার কোনো দরকার নেই।

নাসরীন রবোটটার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আপনার—মানে তোমার কি অনুভূতি আছে?

রবোটটি ঠিক তখন জাহিদের জুতোর ফিতা খুলে এনেছে, সে জাহিদের পা নিচে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার মুখে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা হাসি কিংবা হাসির মতো একটা ভঙ্গি ফুটে উঠল। বলল, অনুভূতি একটা অত্যন্ত মানবিক ব্যাপার। রবোটের অনুভূতি আছে বলে দাবি করা হবে অত্যন্ত বড় ধরনের ধৃষ্টতা। তবে—

তবে কী?

মানুষ যে পরিবেশে আনন্দ দুঃখ কষ্ট বা অপমান বোধ করে সপ্তদশ প্রজাতির রবোটের কপোট্রনেও ঠিক সেই পরিবেশে আনন্দ দুঃখ কষ্ট বা অপমান নামের মডিউলে এক ধরনের অসম পটেন্সিয়ালের জন্ম হয়। মানুষের অনুভূতির সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না কিন্তু তবু আমাকে স্বীকার করতে হবে আমাদের কপোট্রনে এ ধরনের কিছু একটা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

জাহিদ শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, সেটা একটা মহা মূর্খামি হয়েছে।

আবদুল্লাহ নামের রবোটটি চুপ করে রইল। নাসরীন বলল, কেন, এটাকে মূর্খামি কেন বলছ?

কারণ মানুষের এই অনুভূতি দরকারি। রবোটের কোনো দরকার নেই। রবোটকে যত খুশি অপমান করা যায়, রবোট অপমানিত হয় কিন্তু সে রাগ করতে পারে না। এই অনুভূতির মূল্য কী?

নাসরীন ভুরু কুঁচকে বলল, রবোটের ভিতরে যদি অনুভূতি থাকে তাহলে রাগ নেই কেন? রাগও তো একটা অনুভূতি!

জাহিদ আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, নিরাপত্তা। নিরাপত্তার জন্যে রবোটের মাঝে কোনো রাগ দেয়া হয় নি। সব রবোট হচ্ছে মাটির মানুষ।

কথা শেষ করে জাহিদ হা হা করে হাসতে থাকে। নাসরীনের ভুলও হতে পারে কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হল আবদুল্লাহর চোখে এক ধরনের বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রাতে খাবার টেবিলে আবদুল্লাহ নাসরীন এবং জাহিদকে খাবার পরিবেশন করল। জাহিদ চেয়ারে পা তুলে অত্যন্ত আয়েশ করে খেলেও নাসরীন কেন জানি ভালো করে খেতে পারল না। একজন অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ অভুক্ত অবস্থায় তাদের খাওয়াচ্ছে ব্যাপারটা সে ঠিক গ্রহণ করতে পারল না, যদিও সে খুব ভালো করে জানে সুদর্শন মানুষটি একটি রবোট ছাড়া আর কিছু নয়। খাবার টেবিলে বা অন্য কোথাও জাহিদ আজকাল নাসরীনের সাথে বেশি কথা বলে না, আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না। সে মিনি ভিডি রিডার নিয়ে দূরপ্রাচ্যের একটি আইস হকি খেলাতে মগ্ন রইল। নাসরীন খানিকক্ষণ খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে আবদুল্লাহকে বলল, তোমার খিদে পায় না?

না। আবদুল্লাহ মাথা নাড়ল এবং মানুষের মতো হাসল। বলল, খিদে একটা অত্যন্ত

AMARBOI.COM

মানবিক অনুভূতি। পৃথিবীর সভ্যতার একটা বড় অংশের জন্ম হয়েছে সুসংবদ্ধভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রচেষ্টার কারণে। সে কারণে মানুষেরা সভ্যতার জন্ম দিতে পারে, রবোটেরা কখনো সভ্যতার জন্ম দেবে না।

তোমরা যেভাবে অনুভূতির জন্ম দিয়েছ সেভাবে তো খিদের অনুভূতিটাও তৈরি করে নিতে পার।

আবদুল্লাহ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, আপনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটা কথা বলেছেন। সত্যি সত্যি সেটা করা হলে কী হবে সেটা জানার জন্যে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে।

কী আর হবে। তোমরাও আমার সাথে বসে খাবে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত কিন্তু প্রায় মানুষের কাছাকাছি বুদ্ধিমান কিছু একটা তৈরি করার সময় এক সময় রবোটকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু যদি তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি মানুষ রবোট সম্পর্কে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে না?

আবদুল্লাহ কথা থামিয়ে হঠাৎ একটু এগিয়ে এসে বলল, আমি বেশ অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি আপনি কিন্তু কিছুই খাচ্ছেন না।

নাসরীন উত্তরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জাহিদ মুখভরা খাবার নিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, এই শালা তো দেখি খালি নামেই রবোট। কথাবার্তায় তো দেখি ক্যাসানোভা!

জাহিদের কথা বলার ভঙ্গিটি ছিল কদর্য, নাসরীন আহত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ স্থির চোখে জাহিদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবদুল্লাহকে বলল, তুমি কিছু মনে কোরো না আবদুল্লাহ। আমার স্বামীর মানসিক পরিপক্বতা খুব বেশিদূর যেতে পারে নি। এগার-বার বছরের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ করে থেমে গেছে।

জাহিদ নাসরীনের কথা শুনে হঠাৎ ভিডি রিডার থেকে চোখ তুলে একবার আবদুল্লাহর দিকে তাকাল এবং একবার নাসরীনের দিকে তাকাল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে বলল, তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা মানুষ না, এটা যন্ত্র। এর সাথে ভদ্রতা করার কোনো দরকার নেই, এর ভিতরে আছে লোহালক্কড় টিউব ব্যাটারি যন্ত্রপাতি—

নাসরীন নিচু গলায় বলল, তার সাথে অভদ্রতা করারও কোনো দরকার নেই। তুমি শুনেছ সে নিজেই বলেছে তার ভিতরে এক ধরনের অনুভূতি রয়েছে।

বিছানায় শুয়েই জাহিদ ঘুমিয়ে পড়ে, আজকেও তাই হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। নাসরীন দীর্ঘ সময় অন্ধকারে একা একা শুয়ে থাকে। পাশের ঘরে একজন একা একা বসে আছে চিন্তা করে তার কেমন জানি অস্বস্তি হতে থাকে, মানুষটা একা একা কী করছে কে জানে। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে শেষ পর্যন্ত সে বিছানা থেকে নেমে এল। নাসরীন হালকা পায়ে হেঁটে পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরে আবছা অন্ধকার, জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে ঘরে, সেই আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে আবদুল্লাহ পাথরের মূর্তির মতো বইয়ের শেলফের কাছে বসে আছে। নাসরীন মৃদু গলায় বলল, অন্ধকারে তুমি কী করছ?

বইগুলো দেখছি।

অন্ধকারে?

আমার কাছে আলো আর অন্ধকার নেই। আমার অবলাল সংবেদী চোখ দিয়ে আমি দৃশ্যমান আলো না থাকলেও দেখতে পারি। আমি অবলাল বা অতিবেগুনি রশ্মি ব্যবহার

করতে পারি।

আবদুল্লাহ্ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আপনি এত রাতে কী করছেন?

ঘুম আসছিল না তাই উঠে এসেছি।

ঘুম?

হ্যাঁ।

ঘুম একটি জিনিস যার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আপনার কেন ঘুম আসছে না? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব ঘুম পেয়েছে।

তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, আপনাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনি চমৎকার হালকা গোলাপি রঙের একটি নাইটি পরে আছেন।

নাসরীন নিজের অজান্তে নাইটিটা শরীরে ভালো করে টেনে নিতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, আমি আলো জ্বালাই?

জ্বালান।

অন্ধকারে আমি তোমার মতো দেখতে পাই না, আর কাউকে না দেখলে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি না।

নাসরীন এগিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল। দেখা গেল শেলফের সামনে আবদুল্লাহ্ কয়েকটা বই হাতে নিয়ে উদাসীন মুখে বসে আছে। নাসরীন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বই দেখছ?

কবিতার বইগুলো। অত্যন্ত চমৎকার সংগ্রহ, আমি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

নাসরীন আরো একটু এগিয়ে এসে আগ্রহ নিয়ে বলল, তুমি কবিতা পড়?

আপনি যদি ধৃষ্টতা হিসেবে না নেন তাহলে বলব হ্যাঁ পড়ি।

কার কবিতা তোমার ভালো লাগে?

কবিতার প্রকৃত রস আস্বাদন করার ক্ষমতা আমার নেই। মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় আমার কপোট্রন খুব নিম্নস্তরের। আমার কাছে যে কবিতা ভালো লাগে আপনার কাছে তা হয়তো অত্যন্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হবে।

তবু শুনি।

এই যে বইটি। অত্যন্ত সহজ স্পষ্ট ছন্দবদ্ধ কবিতা—

নাসরীন তরল গলায় বলল, কী আশ্চর্য, এটা আমারও সবচেয়ে প্রিয় বই।

বইটি হাতে নিয়ে সে আবদুল্লাহ্র পাশে বসে পড়ে। চকচকে মলাটে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, আমি যখন কলেজে পড়ি তখন একজন আমাকে এই বইটি উপহার দিয়েছিল।

আবদুল্লাহ্ মৃদু স্বরে বলল, কথাটি বলতে গিয়ে আপনার গলার স্বরে একটা ছোট পরিবর্তন হয়েছে। মনে হয় এই বইটির সাথে আপনার কোনো সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে।

নাসরীন কিছু বলার আগেই হঠাৎ জাহিদের তীব্র চিৎকার শোনা গেল। সে কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছে তারা লক্ষ করে নি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, কী হচ্ছে এখানে? প্রেম? রবোটের সাথে প্রেম? বাহ! বাহ!

নাসরীন কী একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জাহিদ আরেকটু এগিয়ে এসে ঘরের সোফায় একটা লাথি মেরে বলল, রবোটের সাথে প্রেম? তারপর কার সাথে হবে? জন্তু-জানোয়ারের সাথে?

নাসরীনের মুখে রক্ত উঠে এল। সে আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই

জাহিদ হঠাৎ প্রায় ছুটে এসে নাসরীনের একটা হাত ধরে তাকে ঝটকা মেরে টেনে তোলার চেষ্টা করে বলল, বেশ্যা মাগী তুই ঘরে বসে আছিস কেন? রাস্তায় যা।

নাসরীনের চোখ জ্বলে ওঠে, সে চাপা গলায় বলল, মুখ সামলে কথা বল।

জাহিদের মুখ প্রচণ্ড আক্রোশে কুৎসিত হয়ে আসে, সে চিৎকার করে বলল, তোর সাথে আমার মুখ সামলে কথা বলতে হবে? বেশ্যা মাগী।

জাহিদ ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে হঠাৎ হাত তুলে প্রচণ্ড জোরে নাসরীনকে আঘাত করল—অন্তত সে তাই ভাবল। কিন্তু তার হাত নেমে আসার আগেই এক অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়েছে, নাসরীনকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিয়েছে এবং অন্য হাতে জাহিদের হাতকে ধরে ফেলেছে।

কী হয়েছে ব্যাপারটা বুঝতেই জাহিদের কয়েক মুহূর্ত লেগে যায়। যখন বুঝতে পারল তখন সে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং এক ধরনের অন্ধ আক্রোশে আবদুল্লাহকে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল সেটি পুরোপুরি অসম্ভব অর্থহীন একটি প্রক্রিয়া।

আবদুল্লাহ অত্যন্ত শক্ত হাতে জাহিদকে ধরে রেখে নরম গলায় বলল, আপনি অর্থহীন শক্তি ব্যয় করছেন।

জাহিদ উন্মত্তের মতো বলল, চুপ কর শালা। দাঁত ভেঙে ফেলব রবোটের বাচ্চা—

আমাদের ভিতরে কোনো রাগ নেই। আবদুল্লাহ জাহিদকে এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে রাগ না-থাকা ব্যাপারটি একটি আশীর্বাদ। মানুষ রেগে গেলে তাকে খুব কুশ্রী দেখায়।

খামোশ! চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা। ছেড়ে দে আমাকে—

আপনি একটু শান্ত হলেই আপনাকে আমি ছেড়ে দেব। এখন আপনাকে ছেড়ে দিলে আপনি আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করে খারাপভাবে আঘাত পেতে পারেন।

আবদুল্লাহ জাহিদকে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল, জাহিদ সেই অবস্থায় তার হাতপা ছুড়তে থাকে এবং তাকে অত্যন্ত হাস্যকর দেখায়। নাসরীন আবদুল্লাহর প্রশস্ত বুকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল এবার সাবধানে মুখ তুলে তাকাল। আবদুল্লাহ নরম গলায় বলল, আপনি নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যান। তাহলে আমি একে ছেড়ে দিতে পারি।

নাসরীন তার মুখে অত্যন্ত বিচিত্র একটা হাসি ফুটিয়ে আবদুল্লাহর বুকে মাথা রেখে বলল, আমি এর থেকে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাব না।

আবদুল্লাহ একটু ইতস্তত করে বলল, আপনি অন্তত একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে যান। আমি তাহলে একে ছেড়ে দেবার কথা চিন্তা করব।

নাসরীন বলল, আমি কোথাও যাব না, তুমি বরং ওকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দাও।

আবদুল্লাহ হেসে বলল, কোনো মানুষকে এ ধরনের কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি একটু সাবধানে থাকুন, আমি একে ছেড়ে দিচ্ছি।

জাহিদকে ছেড়ে দেয়া মাত্র সে চিৎকার করে বলল, দাঁড়া ব্যাটা বদমাইশ ধড়িবাজ। আমি তোর বারটা বাজাচ্ছি। মাঝরাতে আমার বউয়ের সাথে প্রেম করা ছুটিয়ে দিচ্ছি।

জাহিদ তার ভিডিফোনটা নিয়ে এসে কাঁপা হাতে ডায়াল করল, প্রায় সাথে সাথেই সেখানে ফ্যাক্টরির সিকিউরিটি ডিভিশনের একজন লোকের চেহারা ভেসে ওঠে। মানুষটি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, এত রাতে কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

তুমি এই মুহূর্তে আবদুল্লাহর সার্কিট কেটে দাও।

AMARBOI.COM

কেন কী হয়েছে?

ব্যাটা বদমাইশ আমার সাথে—আমার সাথে—

আপনার সাথে কী করেছে?

না, মানে—রাত্রিবেলা আমার স্ত্রীকে—

ভিডিফোনে অন্য পাশের মানুষটিকে খুব কৌতূহলী দেখা গেল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কী করেছে আপনার স্ত্রীকে?

জাহিদ ক্রুদ্ধ গলায় বলল, সেটা তোমার শোনার দরকার নেই। আমার অথরিটি আছে, আমি বলছি। এই মুহূর্তে কানেকশান কেটে দাও—

এক মিনিট অপেক্ষা করুন। মানুষটি স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং মিনিট দুয়েক পরে আবার তাকে দেখা গেল, তার সাথে আরো একজন উচ্চপদস্থ মানুষ। মানুষটি গম্ভীর গলায় বলল, কে.এল. ৪২-এর কানেকশান কাটতে বলেছেন, কিন্তু সত্যিকার বিপদের ঝুঁকি না থাকলে আমরা সেটা কাটতে পারি না। নিয়ম নেই।

জাহিদ ভিডি টেলিফোনটা ঝাঁকিয়ে বলল, বিপদের নিকুচি করছি। এই মুহূর্তে কানেকশান কেটে রবোটটাকে অচল কর। এই মুহূর্তে। আমার অর্ডার—

ভিডি স্ক্রিনের মানুষটা একটু বাঁকা করে হেসে বলল, আপনার ব্যাপারটাতে আমাদের জিএম ইমতিয়াজ সাহেব খুব কৌতূহল দেখিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, তিনি নিজেই আপনার বাসায় আসছেন।

জাহিদ হতচকিতভাবে বলল, জিএম? ইমতিয়াজ সাহেব? এখন আসছেন? এত রাতে?

হ্যাঁ, এখনই আসছেন। আপনি সোজাসুজি তার সাথে কথা বলতে পারবেন।

ভিডি স্ক্রিনের মানুষটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, গুড নাইট।

জাহিদ কোনো উত্তর না দিয়ে ভিডিফোনটাকে আছাড় দিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলল।

AMARBOI.COM

রবোট ফ্যাক্টরির জিএম ইমতিয়াজ আহমেদ একজন আইনজ্ঞ এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গভীর রাতে জাহিদ এবং নাসরীনের বাসায় উপস্থিত হলেন। ততক্ষণে জাহিদের অন্ধ আক্রোশ কমে সেখানে তার স্ত্রী এবং আবদুল্লাহর প্রতি এক ধরনের বিজাতীয় বিদ্বেষ আর ঘৃণা স্থান করে নিয়েছে। ইমতিয়াজ আহমেদ কিন্তু জাহিদের সাথে কথা বলায় বেশি আগ্রহ দেখালেন না, দীর্ঘ সময় নাসরীনের সাথে কথা বললেন। তার মুখে তিনি যেটা শুনলেন সেটা তার পক্ষে বিশ্বাস করা খুব শক্ত, কয়েকবার শুনেও তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না, মাথা নেড়ে বললেন, তুমি বলছ যে তোমার বার বছরের বিবাহিত স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে এই রবোটের সাথে ঘর-সংসার করবে?

হ্যাঁ।

তুমি ঠাণ্ডা মাথায় বলছ?

হ্যাঁ, আমি ঠাণ্ডা মাথায় বলছি। আবদুল্লাহ রবোট হতে পারে কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে একটা অনুভূতিশীল মন। তার তুলনায় আমার স্বামী একটি নিচু শ্রেণীর পশু।

জাহিদ বাধা দিয়ে বলল, এটা পাগলামি, বদ্ধ পাগলামি—

ইমতিয়াজ আহমেদ হাত তুলে জাহিদকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পাগলামি না কী সেটা নিয়ে আলোচনা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তার জন্যে আমাদের দুটি বড় বিভাগই আছে। কিন্তু তোমার স্ত্রী আমাদের সামনে সম্ভাবনার বিশাল একটা জগৎ খুলে দিয়েছে!

জাহিদ অবাক হয়ে ইমতিয়াজ আহমেদের দিকে তাকাল। ইমতিয়াজ আহমেদ উত্তেজিত গলায় বললেন, পৃথিবীতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীদের একটা বিশাল অংশ অসুখী। তাদের আবার বিশাল একটা অংশ তাদের স্বামীদের আচার-আচরণে এত বিরক্ত হয়েছে, তাদের এত ঘেন্না করে যে মানুষ জাতিটার প্রতিই তাদের ভক্তি উঠে গেছে! তারা এখন মানুষের বদলে রবোটকে নিয়ে ঘর-সংসার করার জন্য প্রস্তুত। এই রবোটেরা আবেগবান, সংস্কৃতিবান। তাদের মাঝে কোনো রাগ নেই, শুধু তাই না তারা অসম্ভব সুদর্শন! আমরা যদি এ রকম আরো রবোট তৈরি করে ঠিকভাবে মার্কেটিং করি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে।

পাশে বসে থাকা আইনজ্ঞ মানুষটি পকেট থেকে একটা ছোট কম্পিউটার বের করে তার মাঝে কিছু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে ইমতিয়াজ আহমেদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, প্রায় তের ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট!

তের ট্রিলিয়ন ডলার! ইমতিয়াজ আহমেদ জিভ দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে বললেন, তার যদি দশ পার্সেন্টও আমরা ধরে রাখতে পারি—

জাহিদ হতচকিতের মতো সবার দিকে তাকিয়েছিল, এবারে চিৎকার করে বলল, কখনোই না! কখনোই এটা হতে পারে না।

ইমতিয়াজ আহমেদ ভুরু কুঁচকে জাহিদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, পারে না?

না। আমি এই কোম্পানির একজন কর্মচারী। আমার একটা অধিকার রয়েছে।

ইমতিয়াজ আহমেদ জাহিদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, তোমার কোনো অধিকার নেই জাহিদ।

কেন নেই!

কারণ তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম হে! তোমার মতো পাষণ্ডকে কোম্পানিতে রাখা ঠিক না। কী বল তোমরা?

আবদুল্লাহ ছাড়া আর সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

AMARBOI.COM

টানেল

অবজারভেশন টাওয়ারটি খাড়া উপরে উঠে গেছে। স্বচ্ছ কোয়ার্টজে ঢাকা বৃত্তাকার ছোট ঘরটা থেকে তাকালে নিচে মেঘ এবং দূরে পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে। এ রকম সময়ে মাইলারের একটা স্ক্রিন মহাকাশে খুলে দেয়া হয়, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে সেখান থেকে এই এলাকায় একটা কৃত্রিম জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোতে চারদিকে এক ধরনের অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটে উঠছে। বীপা মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বলল, কী সুন্দর তাই না?

রিশ তার কথার উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্ক চোখে দূরে যেখানে তাকিয়েছিল সেখানেই তাকিয়ে রইল। বীপা আহত গলায় বলল, তুমি আমার কথা শুনছ না।

রিশ বলল, শুনছি।

তাহলে কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

এই তো দিচ্ছি।

এটা কি উত্তর দেয়া হল? আমি যদি বলি ইস কী সুন্দর, তাহলে তুমিও বলবে ইস কী সুন্দর!

রিশ বীপার ছেলেমানুষি মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে বলল, ঠিক আছে, এখন থেকে বলব।

সত্যি?

সত্যি।

বীপার মুখটি আনন্দে ঝলমল করে উঠল। সে রিশের হাত শক্ত করে ধরে রেখে বলল, আজ এখানে এসে আমার কী যে ভালো লাগছে!

এই হাসিখুশি মেয়েটার জন্যে রিশ তার বুকের ভিতরে এক ধরনের গভীর ভালবাসা অনুভব করে। সে তার মাথায় হাত দিয়ে সোনালি চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে বলল, আমারও খুব ভালো লাগছে।

বীপা হাসিমুখে বলল, এই তো তুমি কথা বলা শিখে গেছ!

আমি বলেছিলাম না, সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিই। এখন বিশ্বাস হল?

বীপা মাথা নাড়ে, হল।

রিশ আর বীপা হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকার অবজারভেশন টাওয়ারটি একবার ঘুরে আসে। তাদের মতো আরো অনেকেই এসেছে। সপ্তাহে একদিন মাইলারের এই স্ক্রিনটা খুলে কৃত্রিম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেয়া হয়, সেদিন এই বিচিত্র জ্যোৎস্নার মায়াময় দৃশ্য দেখার জন্যে অনেক দূর দূর থেকে এই টাওয়ারের সবাই এসে জড়ো হয়। কোয়ার্টজের জানালায় হেলান দিয়ে সবাই বাইরে তাকিয়ে আছে, তাদের মাঝে ধীরে ধীরে পা ফেলে হেঁটে যেতে যেতে বীপা বলল, আজকে আমরা সারারাত এখানে থাকব।

রিশ হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে থাকব।

সারারাত আমরা কথা বলব।

কী নিয়ে কথা বলবে?

কত কী বলার আছে আমার। কোথায় বিয়ে হবে আমাদের। কোথায় যাব বেড়াতে। কতজন বাচ্চা হবে আমাদের। তার মাঝে কতজন হবে ছেলে, কতজন মেয়ে! তুমি কি কখনো আমাকে কথা বলার সময় দাও?

এই তো দিচ্ছি।

ছাই দিচ্ছ। তোমাকে কতবার বলে শেষ পর্যন্ত আজ একটু সময় দিলে।

রিশ একটা নিশ্বাস ফেলে অপরাধীর মতো বলল, আসলে খুব বড় একটা এক্সপেরিমেন্ট দাঁড়া করছি আমরা। স্পেস টাইমের ওপর বিজ্ঞানী রিসানের একটা সূত্র আছে। সেটা প্রথমবার আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। সেটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেন্ট সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

আমি কল্পনা করতে চাইও না।

আমি যেটা করতে চাইছি সেটা যদি করতে পারি দেখবে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে।

চাই না আমি কোনো হইচই।

কী চাও তুমি?

~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চাই তুমি সারাক্ষণ আমার পাশে থাকবে।

রিশ শব্দ করে হেসে উঠল এবং ঠিক তখন বুঝতে পারল তার পকেটের কমিউনিকেশন মডিউলটি একটা জরুরি সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে। কেউ একজন তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। রিশ চোখের কোনা দিয়ে বীপাকে এক নজর দেখে পকেট থেকে ছোট কমিউনিকেশন মডিউলটি বের করল। সাথে সাথে বীপার চোখেমুখে এক ধরনের আশাভঙ্গের ছাপ পড়ল। সে আহত গলায় বলল, তুমি এখন এটিতে কথা বলবে?

রিশ অপরাধী গলায় বলল, আমাকে একটু কথা বলতে হবে বীপা। নিশ্চয় খুব জরুরি, খুব জরুরি না হলে সাত মাত্রায় যোগাযোগ করত না।

বীপা কিছু বলল না কিন্তু তার মুখে আশাহত হওয়ার ছাপটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুভূতির তারতম্যগুলো বীপার মুখে খুব সহজেই ধরা পড়ে যায়।

রিশ যোগাযোগ মডিউলটির সুইচ স্পর্শ করতেই একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের চেহারা স্পষ্ট হয়ে আসে। মানুষটি উত্তেজিত গলায় বলল, রিশ, যে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে শক্তি সঙ্কোচন করা হয়েছিল সেখানে সময়ক্ষেত্র ভেদ করা হয়েছে।

রিশ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা চতুষ্কোণ জায়গা, আলো প্রতিফলিত হয়ে আসছে, একটা আয়নার মতো!

সত্যি?

সত্যি। কতক্ষণ রাখতে পারব জানি না। প্রচণ্ড শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে আস।

আসছি, আমি এক্ষুনি আসছি।

রিশ যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে হতচকিতের মতো বীপার দিকে তাকাল, তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চোখ চকচক করতে থাকে, কাঁপা গলায় বলল, শুনেছ বীপা, শুনেছ?

বীপার নীল চোখে তখনো একটা বিষণ্ন আশাভঙ্গের ছাপ। সে মৃদু গলায় বলল, শুনেছি।

আমাকে যেতে হবে বীপা, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

বীপা চোখ নামিয়ে বলল, যাও।

এটা অনেক বড় ব্যাপার বীপা, অনেক বড় ব্যাপার। রিসানের সূত্রকে প্রমাণ করা হয়েছে। প্রথমবার স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ামে একটা টানেল তৈরি করা হয়েছে। সেই টানেল দিয়ে ভিন্ন সময়ে কিংবা ভিন্ন অবস্থানে চলে যাওয়া যাবে। চিন্তা করতে পার?

বীপা কোনো কথা বলল না।

চল বীপা তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই।

বীপা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি যাও রিশ। আমি এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকি। আমি নিজে নিজে বাসায় চলে যাব।

রিশ নিচু হয়ে তার হাতে হাত স্পর্শ করে এক রকম ছুটে বের হয়ে গেল। বীপা মাথা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে এখনো দূরে মেঘ আর পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে। কৃত্রিম জ্যোৎস্নার আলোতে এখনো সবকিছু কী অপূর্ব মায়াময় দেখাচ্ছে। বীপা অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তার বুকের মাঝে একটা অভিমান এসে ভর করছে, কার ওপর এই অভিমান সে জানে না। ধীরে ধীরে তার চোখে পানি এসে যায়, দূরের বিস্তীর্ণ মেঘ আর নীল পাহাড়ের সারি অস্পষ্ট হয়ে আসে। বীপা সাবধানে হাতের

উল্টোপিঠ দিয়ে তার চোখের পানি মুছে ফেলল। রিশ একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী আর সে খুব সাধারণ একজন মেয়ে। কে জানে, সাধারণ মেয়েদের বুঝি অসাধারণ বিজ্ঞানীদের ভালবাসতে হয় না। তাহলে বুঝি তাদের এ রকম একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

রিশ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই তার দিকে কয়েকজন ছুটে এল। মধ্যবয়স্ক টেকনিশিয়ানটি উত্তেজিত গলায় বলল, শক্তিক্ষেত্রে প্রচুর চাপ পড়ছে রিশ, কতক্ষণ ধরে রাখতে পারব জানি না।

রিশ হাঁটতে হাঁটতে উত্তেজিত গলায় বলল, সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। একবার যখন হয়েছে আবার হবে। টানেলটা কত বড়?

এক মিটার থেকে একটু ছোট।

এক জায়গায় আছে নাকি নড়ছে?

মোটামুটি এক জায়গাতেই আছে, শক্তির তারতম্য হলে একটু কাঁপতে থাকে। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে।

রিশ টেকনিশিয়ানের পিছু পিছু ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে হতবাক হয়ে গেল। বিশাল ল্যাবরেটরি ঘরে ইতস্তত যন্ত্রপাতি ছড়ানো। দুপাশে বড় বড় যন্ত্রপাতির প্যানেল, শক্তিশালী পাওয়ার সাপ্লাই, বড় কম্পিউটার। দেয়ালের পাশে রাখা বড় বড় লেজারগুলো থেকে লেজাররশ্মি ছুটে যাচ্ছে। ঘরে যন্ত্রপাতির মৃদু গুঞ্জন, এক ধরনের ঝাঁজালো গন্ধ। ঘরের ঠিক মাঝখানে স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ামের টানেলটি দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় কেউ বুঝি একটা চতুষ্কোণ আয়না ঝুলিয়ে রেখেছে। রিশ প্রায় ছুটে গিয়ে জিনিসটার কাছে দাঁড়াল, তার এখনো বিশ্বাস হয় না এই মহাবিশ্বে একটা টানেল তৈরি করা হয়েছে, আর সে সেই টানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে! টানেলের অন্য পাশে কী আছে কে জানে। হয়তো ভবিষ্যতের কোনো মুহূর্ত। হয়তো অন্য কোনো দেশ, মহাদেশ, অন্য কোনো গ্রহ। অন্য কোনো গ্যালাক্সি। রিশের এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। রিশ খুব কাছে থেকে দেখল, জিনিসটা খুব সূক্ষ্ম আয়নার মতো। দেখে মনে হয় হাতের ছোঁয়া লাগলেই বুঝি ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এটি ঝনঝন করে ভেঙে পড়বে না, প্রচণ্ড শক্তি ব্যয় করে এটি দাঁড়া করানো আছে, যতক্ষণ ল্যাবরেটরি থেকে শক্তি দেয়া যাবে ততক্ষণ সেটা দাঁড়িয়ে থাকবে।

www.amarboi.com

রিশ কয়েক মুহূর্ত টানেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, দৃশ্যমান আলো যেতে পারছে না, তাই এটাকে দেখাচ্ছে চকচকে আয়নার মতো।

টেকনিশিয়ানরা জিজ্ঞেস করল, এটার অন্য দিকটা কোথায়, রিশ?

কেউ জানে না। আমরা শক্তি খুব বেশি দিতে পারছি না তাই সেটা খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। হয়তো খুব কাছাকাছি।

আমরা কি অন্য মাথাটা দেখতে পাব?

যদি একই সময়ে হয়ে থাকে নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু সময়ের মাত্রায় যদি এটা অন্য কোথাও এসে থাকে তাহলে তো এখন দেখা যাবে না, যখন সেই সময় এসে হাজির হবে তখন দেখবে।

রিশের কাছাকাছি আরো কিছু মানুষ এসে ভিড় জমায়। অন্য বিজ্ঞানীরা, অন্য টেকনিশিয়ানরা, সবাই উত্তেজিত গলায় কথা বলতে থাকে। কমবয়সী একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, টানেলটার অন্য মাথা কোথায় সেটা জানার কোনো উপায় নেই?

আছে। উপায় আছে। অনেক দীর্ঘ একটা হিসেব–নিকেশ করার ব্যাপার আছে। পুরোটা কীভাবে করতে হবে সেটা এখনো কেউ ভালো করে জানে না। যখন সেটা জানা যাবে তখন আগে থেকে বলে দেয়া যাবে এই টানেল দিয়ে কোথায় যাওয়া যাবে।

মেয়েটার হাতে একটা স্ক্রু–ড্রাইভার ছিল সেটা দেখিয়ে বলল, আমি যদি এই স্ক্রু–ড্রাইভারটা এখানে ছুড়ে দিই তাহলে কী হবে?

রিশ হেসে বলল, এটা টানেল দিয়ে গিয়ে অন্য মাথা দিয়ে বের হয়ে যাবে।

মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি ছুড়ে দিয়ে দেখব?

রিশ মাথা নেড়ে বলল, দেখ।

মেয়েটা স্ক্রু–ড্রাইভারটা ঝকঝকে আয়নার মতো চতুষ্কোণ টানেলের মুখে ছুড়ে দিল। সবার মনে হল ঝনঝন করে বুঝি সেটা ভেঙে পড়বে। কিন্তু সেটা ভেঙে পড়ল না, স্ক্রু–ড্রাইভারটা একটা অদৃশ্য দেয়ালে বাধা পেয়ে যেন ফিরে এল। পানির মাঝে ঢিল ছুড়লে যেরকম একটা তরঙ্গের জন্ম হয় চতুষ্কোণ আয়নার মতো জিনিসটার মাঝে ঠিক সেরকম একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল।

রিশ মেঝে থেকে স্ক্রু–ড্রাইভারটা তুলে মেয়েটার হাতে দিয়ে বলল, আরো জোরে ছুড়তে হবে, টানেলটার মুখে পৃষ্ঠটানের মতো একটা ব্যাপার আছে। জোরে না ছুড়লে সেটা ভেদ করে ভিতরে ঢোকার উপায় নেই।

মেয়েটা এবারে স্ক্রু–ড্রাইভারটা হাতে নিয়ে গায়ের জোরে ছুড়ে দিল। সত্যি সত্যি সেটা আয়নার মতো পরদাটির মাঝে ঢুকে গেল এবং হঠাৎ করে শাঁৎ করে শুষে নেবার মতো একটা শব্দ হল এবং পুরো স্ক্রু–ড্রাইভারটাকে যেন অদৃশ্য কিছু একটা টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা দেখে ল্যাবরেটরি ঘরে যারা দাঁড়িয়েছিল সবাই একই সাথে বিস্ময়ের মতো একটা শব্দ করল। রিশ উত্তেজিত গলায় বলল, দেখেছ, এর মাঝে শক্তির পার্থক্যের একটা ব্যাপার আছে। সহজে জিনিসটা ভিতরে যেতে চায় না। কিন্তু একবার ঢুকে গেলে কিছু একটা টেনে নিয়ে যায়—ঠিক যেরকম রিসানের সূত্রে বলা হয়েছিল।

কমবয়সী একজন তরুণ এক পা এগিয়ে এসে বলল, এর মাঝে কি কোনো বিপদ আছে?

কী রকম বিপদ?

যেমন মনে কর এই টানেল দিয়ে সবকিছু টেনে বের করে নিয়ে গেল, অন্য কোথাও। নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কিছু ঘটে গেল, পুরো জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিশ হেসে ফেলল, বলল, না। এই টানেলটা তৈরি করা হয়েছে ল্যাবরেটরির শক্তি দিয়ে। এই টানেল দিয়ে ছোটখাটো জিনিস এক শ–দু শ কিলোগ্রাম এদিক–সেদিক করা যাবে, তার বেশি কিছু নয়।

তার মানে এই পুরো জগতকে শুষে নেবার কোনো ভয় নেই?

না। শক্তির নিত্যতার সূত্র যদি সত্যি হয় তার কোনো ভয় নেই।

কমবয়সী মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, আমার স্ক্রু–ড্রাইভার কি টানেলের অন্য মাথা দিয়ে এতক্ষণে বের হয়ে গেছে?

রিশ হেসে বলল, আমার তাই ধারণা।

কেউ কি সেটা দেখতে পেয়েছে?

কেমন করে বলি। হয়তো দেখেছে। হয়তো দেখে নি।

মেয়েটা আরেকটা কী কথা বলতে যাচ্ছিল, মধ্যবয়স্ক টেকনিশিয়ান বাধা দিয়ে বলল, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। পাওয়ার সাপ্লাই যেটুকু শক্তি দেবার কথা তার থেকে অনেক বেশি টেনে নেয়া হয়েছে। পুরোটা ওভারলোডেড হয়ে আছে। আর কিছু যদি দেখার না থাকে তাহলে বন্ধ করে দেয়া উচিত।

রিশ বলল, এক সেকেন্ড, আমি একটা জিনিস পরীক্ষা করে নি।

টেকনিশিয়ান জিজ্ঞেস করল, কী পরীক্ষা করবে?

টানেলটার উপরে যে শক্তির স্তরটা আছে সেটা কতটুকু একটু পরীক্ষা করে দেখি।

রিশ আশপাশে তাকিয়ে একটা বড় রেঞ্চ হাতে নিয়ে এগিয়ে এল, পরদাটার উপরে সেটা দিয়ে স্পর্শ করতেই তরল পদার্থে যেরকম একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সেভাবে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। রিশ রেঞ্চটা দিয়ে আবার আলতোভাবে আঘাত করল, তখন আরেকটু বড় তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। রিশ এবারে রেঞ্চটা হাতে নিয়ে বেশ জোরে মসৃণ আয়নার মতো দেখতে অংশটুকুর উপরে আঘাত করতেই সেটা ফুটো করে রেঞ্চটা ভিতরে ঢুকে যায় এবং শাঁৎ করে একটা শব্দ হয়ে পুরো রেঞ্চটাকে অদৃশ্য কিছু একটা যেন টেনে ভিতরে নিয়ে নেয় এবং কিছু বোঝার আগেই রিশের হাতটাও কব্জি পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে গেল। রিশ তার হাতে এক ধরনের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে এবং একটা আর্ত চিৎকার করে সে তার হাতটা টেনে বের করতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার হাতটাকে সে টেনে বের করতে পারছে না। তার হাতটা কোথায় জানি আটকে গেছে। শুধু আটকে যায় নি, অদৃশ্য একটা জিনিস তার হাতটাকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করছে।

আশপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই ভাবছিল রিশ টেনে তার হাতটাকে বের করে আনবে এবং যখন দেখল সে বের করে আনছে না তখন হঠাৎ করে সবাই বুঝতে পারল সে তার হাতটাকে বের করতে পারছে না। সবার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল এবং সবার আগে টেকনিশিয়ান ছুটে গিয়ে তার হাতটা ধরে টেনে বের করার চেষ্টা করল। রিশ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল, পারবে না, বের করতে পারবে না।

টেকনিশিয়ান ফ্যাকাশে মুখে বলল, কেন পারব না?

টানেলের অন্য পাশে নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ। আমার হাতটা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে চলে গেছে, ভবিষ্যৎ থেকে কিছু অতীতে আসতে পারে না।

তাহলে?

হাতটা কেটে ফেলতে হবে।

ঘরের সবাই শিউরে উঠল। টেকনিশিয়ান আতঙ্কিত গলায় বলল, কেটে ফেলতে হবে?

হ্যাঁ। আর কোনো উপায় নেই। কেউ একজন ছুটে যাও একটা ইলেকট্রিক চাকু নিয়ে এস—ছুটে যাও।

সত্যি কেউ ছুটে যাবে কি না বুঝতে পারছিল না। একজন ছুটে ঘরের জরুরি বিপদ সঙ্কেতের লাল সুইচটা চেপে ধরল এবং সাথে সাথে একটা লাল আলো জ্বলতে জ্বলতে তীক্ষ্ণ বিপদ সঙ্কেত বাজতে শুরু করে। টেকনিশিয়ান কী করবে বুঝতে না পেরে আবার রিশকে জাপটে ধরে টেনে আনতে চেষ্টা করে, ফিনফিনে আয়নার মতো পাতলা পরদাটি হঠাৎ যেন পাথরের দেয়ালের মতো শক্ত হয়ে গেছে। রিশের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে এবং সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।

টেকনিশিয়ান রিশকে ছেড়ে দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে আরো খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেল। সবাই আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ করে দেখতে পেল কোন একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে

AMARBOI.COM

ভিতরে টেনে নেবার চেষ্টা করছে, রিশ প্রাণপণে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, একটু একটু করে সে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

কেউ একজন রক্ত শীতল করা শব্দে আর্তনাদ করে উঠল—তার মাঝে রিশ তার আরেকটা হাত ব্যবহার করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে যায় আর হঠাৎ করে সেই হাতটাও ভিতরে ঢুকে গেল। হঠাৎ করে অদৃশ্য একটা শক্তি দ্বিগুণ জোরে তাকে ভিতরে টেনে নিতে থাকে এবং সবাই দেখল সে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, কী করবে কেউ বুঝতে পারে না, চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে এবং তার মাঝে সবাই দেখতে পায় রিশ স্বচ্ছ আয়নার মতো একটা জিনিসে ঢুকে যাচ্ছে, প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর আরো জোরে এবং হঠাৎ কিছু বোঝার আগে প্রচণ্ড শক্তিতে কেউ যেন তাকে টেনে একটা গহ্বরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল। একটু আগে যেখানে রিশ দাঁড়িয়েছিল সেখানে কেউ নেই। চকচকে আয়নার মতো জিনিসটার মাঝে শুধু একটা তরঙ্গ খেলা করতে থাকে। কোথায় জানি একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল এবং হঠাৎ করে বড় বড় দুটি পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে দপ করে চতুষ্কোণ আয়নার মতো জিনিসটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ল্যাবরেটরি ঘরে সবাই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের কারো বিশ্বাস হচ্ছে না রিশ স্পেস টাইমের বিশাল এক জগতের কোথাও চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে।

রিশ শক্ত একটা মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ার সাথে সাথে সব শব্দ যেন মন্ত্রের মতো থেমে গেল। শক্তিশালী পাওয়ার সাপ্লাইয়ের গুঞ্জন ছিল, ইমার্জেন্সি সঙ্কেতের তীক্ষ্ণ শব্দ ছিল, ভয় পাওয়া মানুষের আর্তনাদ ছিল, হঠাৎ করে কোথাও কিছু নেই। চারদিকে সুনসান নীরবতা। একটু আগে শরীরে যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ছিল সেই যন্ত্রণাও হঠাৎ করে চলে গেছে, বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডটি শুধু এখনো প্রচণ্ড শব্দ করে ধকধক করে যাচ্ছে।

রিশ উঠে বসতেই তার পায়ে কী একটা লাগল, তুলে দেখে একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার, একটু আগে সেটাকে টানেলের মাঝে দিয়ে ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। রিশ মাথা তুলে তাকাল। স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ামের টানেল দিয়ে সে এখানে এসে পড়েছে, কিন্তু টানেলটির মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে না, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুজে গিয়েছে।

রিশ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে তাকাল। জায়গাটা আবছা অন্ধকার। একটু আগে ল্যাবরেটরির তীব্র চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে হঠাৎ করে এই আবছা অন্ধকারে এসে প্রথমে সে ভালো করে কিছু দেখতে পায় না। একটু পর আস্তে আস্তে তার চোখ সয়ে এল, মস্ত বড় একটা হলঘরের মতো জায়গা, দেয়ালের কাছাকাছি নানারকম যন্ত্রপাতি সাজানো, মাথার উপরে একটা হলুদ আলো মিটমিট করে জ্বলছে। রিশ ভালো করে তাকাল, জায়গাটা কেমন জানি পরিচিত মনে হচ্ছে তবু ভালো করে চিনতে পারছে না। রিশ ভালো করে তাকাল এবং আবছা হলুদ ভূতুড়ে আলোতে সে জায়গাটি চিনতে পারল, এটি তার ল্যাবরেটরি ঘর। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে এ রকম ভূতুড়ে একটা রূপ নিয়েছে। রিশ এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে, সে হঠাৎ করে ভবিষ্যতে চলে এসেছে। কতদিন ভবিষ্যতে এসেছে সে?

রিশ উঠে দাঁড়াল, ল্যাবরেটরির পিছনে একটা ছোট দরজা ছিল, এখনো সেই দরজাটা আছে কি না কে জানে। কিছু বাক্স সরিয়ে রিশ দরজাটা আবিষ্কার করে, হাতলে চাপ দিতেই সেটা খুট করে খুলে গেল। দরজাটা খুলে বাইরে আসতেই শীতল বাতাসের একটা ঝাপটা

অনুভব করে। এখন শীতকাল। এক মুহূর্ত আগে সে গ্রীষ্মের এক রাতে ছিল, এখন সেটাকে কত পিছনে ফেলে এসেছে কে জানে।

রিশ হেঁটে হেঁটে বের হয়ে আসে। ল্যাবরেটরিটা একটা ভূতুড়ে বাড়ির মতো দেখাচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকে সেটা নিশ্চয়ই অব্যবহৃত হয়ে আছে। কতদিন হবে? এক বছর? দুই বছর? দশ বছর? নাকি এক শ বছর? হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে রিশ। কতদিন পার হয়েছে এর মাঝে? বীপার কথা মনে পড়ে হঠাৎ করে, কোথায় আছে এখন বীপা? কেমন আছে বীপা?

বীপা হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল রিশের দিকে, তারপর কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, তুমি?

হ্যাঁ বীপা। আমি।

এতদিন পরে?

এতদিন পরে নয় বীপা। এই একটু আগে আমি তোমাকে অবজারভেশন টাওয়ারে ছেড়ে এসেছি। এক ঘণ্টাও হয় নি।

বীপা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, না রিশ। এক ঘণ্টা নয়—প্রায় এক যুগ হয়ে গেছে।

এক যুগ? রিশ আর্তনাদ করে বলল, এক যুগ?

এক যুগ থেকেও বেশি। আমাকে দেখে তুমি বুঝতে পারছ না?

না। রিশ মাথা নাড়ল, তোমার চেহারার সেই ছেলেমানুষি ভাবটি আর নেই, কিন্তু তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি না। তোমাকে দেখে ঠিক সেরকমই লাগছে।

কিন্তু আমি আর সেরকম নেই। রিশ, আমি আর আগের বীপা নেই।

রিশের বুকের মাঝে হঠাৎ করে কেঁপে ওঠে, কেন বীপা, কী হয়েছে?

এক যুগ অনেক সময়। আমি তোমার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। অনেকদিন। তুমি আস নি।

রিশ কাতর গলায় বলল, এই তো এসেছি।

অনেক দেরি করে এসেছ।

রিশ প্রায় আর্তনাদ করে বলল, তুমি... তুমি আর কাউকে বিয়ে করেছ বীপা?

বীপার মুখে হঠাৎ একটা বেদনার ছায়া পড়ল। সে মাথা নিচু করে বলল, আমি দুঃখিত রিশ, আমি খুব দুঃখিত। আমি খুব সাধারণ মেয়ে। আমি নিঃসঙ্গতা সইতে পারি না। আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না। আমি ভেবেছি তুমি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছ। বার বছর অনেক সময়। এই সময়ে সব পাল্টে যায়। আমি খুব সাধারণ মেয়ে, খুব সাধারণ একটা ছেলের সাথে আমি ঘর বেঁধেছি। আমাদের একটা ছেলে আছে। মনে হয় সেও খুব সাধারণ একটা ছেলে হয়ে বড় হবে। জান রিশ, সেটা কিন্তু আশীর্বাদের মতো।

রিশ খানিকক্ষণ দেয়াল ধরে শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, আমি যাই বীপা।

যাবে?

হ্যাঁ।

AMARBOI.COM

বীপা জিজ্ঞেস করতে চাইল, তুমি কোথায় যাবে রিশ? কিন্তু সে জিজ্ঞেস করল না।

বার বছর পর কাউকে আর এই কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তাদের একজনের ওপর আরেকজনের আর কোনো অধিকার নেই।

লিফটের যাত্রী

এটি হচ্ছে পৃথিবীর দীর্ঘতম লিফট। গাইড মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এটি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার গভীরে চলে গেছে। এই পাঁচ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে মাত্র এক মিনিট।

লিফটের যাত্রীরা বিস্ময়সূচক এক ধরনের শব্দ করল। গাইড মেয়েটি যাত্রীদের বিস্ময়টুকু উপভোগ করে বলল, যাত্রীদের সুবিধের জন্য তাদের চেয়ারে বিশেষ সিটবেল্ট রয়েছে। এই সিটবেল্ট তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে।

গাইড মেয়েটির কথা শুনে যাত্রীদের অনেকেই অকারণে আনন্দে হেসে ফেলল। মেয়েটি সবার দিকে তাকিয়ে একবার মিষ্টি হেসে বলল, পৃথিবীর গহ্বরে আপনাদের যাত্রা আনন্দময় হোক।

মেয়েটি লিফট থেকে বের হয়ে যায় এবং সাথে সাথে ঘরঘর শব্দ করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই লিফটটি একটি ঝাঁকুনি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করে। সাথে সাথে ভিতরের যাত্রীরা আরো একবার আনন্দধ্বনি করে ওঠে।

লিফটের ভিতরে তৃতীয় সারির চতুর্থ যাত্রীর মাথার চুল সাদা এবং চোখে ভারি চশমা। লিফট ছেড়ে যাবার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তার মুখে এক ধরনের শঙ্কার ছায়া পড়ল। তিনি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার কলমটা বের করে সামনে ছেড়ে দিলেন। কলমটি নিচে না পড়ে তার সামনে ঝুলে রইল এবং সেটি দেখে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যে জিনিসটি নিয়ে তার ভিতরে সন্দেহ হয়েছে সেটি সত্যি।

ঠিক এ রকম সময়ে পাশে বসে থাকা লাল চুলের কমবয়সী একটা মেয়ে চিৎকার করে বলল, দেখ দেখ, কলমটা পড়ছে না!

সাদা চুলের বয়স্ক মানুষটা ঘুরে মেয়েটির দিকে তাকালেন, বললেন, পড়ছে।

পড়ছে? তাহলে পড়তে দেখছি না কেন?

আমরাও পড়ছি। তাই বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি চমকে উঠে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকাল, এবং তিনি জোর করে তাঁর মুখে একটি হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলেন। তার মুখের হাসিটি হল অত্যন্ত বিষণ্ন হাসি।

লাল চুলের মেয়েটি হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে এবং লিফটের সব যাত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার দিকে ঘুরে তাকাল।

AMARBOI.COM

লিওনের একঘেয়ে জীবন

১

ঘরে ঢুকতেই ত্রিণার বুকটি কেন জানি কেঁপে উঠল। কোয়ার্টজের স্বচ্ছ জানালার সামনে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিওন। অসাধারণ রূপবান এই মানুষটির এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মাঝে কী যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে, হঠাৎ দেখলে বুকের মাঝে কোথায় জানি একটা ছোট ধাক্কা লাগে। লিওনকে দেখে ত্রিণা হঠাৎ কেন জানি ব্যাকুল হয়ে উঠে, দুই পা এগিয়ে গিয়ে নরম গলায় বলল, লিওন—

লিওন ঘুরে তাকাল। তার মাথার চুল এলোমেলো। অনিন্দ্যসুন্দর মুখে এক ধরনের কাঠিন্য, জ্বলজ্বলে নীল চোখ দুটিতে এক ধরনের অসুস্থ অস্থিরতা। ত্রিণাকে দেখে তার মুখের কাঠিন্য সরে সেখানে খুব ধীরে ধীরে এক ধরনের অসহায় বিষণ্নতা ভর করে। ত্রিণা আরো এগিয়ে গিয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে লিওন?

লিওন কয়েক মুহূর্ত ত্রিণার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরের আদিগন্ত বিস্তৃত শহরটিকে দেখাচ্ছে একটা অপার্থিব জগতের মতো। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে লিওন একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, বাইরে দেখ, কী সুন্দর!

লিওনের গলার স্বর শুনে ত্রিণা হঠাৎ কেন জানি শিউরে ওঠে। সে এগিয়ে গিয়ে লিওনের হাত স্পর্শ করে এক ধরনের আর্তকণ্ঠে বলল, তোমার কী হয়েছে লিওন?

আমার কিছু হয় নি।

হয়েছে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বল আমাকে।

লিওন ঘুরে ত্রিণার দিকে তাকাল, তার সোনালি চুল, কোমল ত্বক, মুখে ছেলেমানুষি এক ধরনের সারল্য, শরতের নির্মেঘ আকাশের মতো নীল চোখ এবং এই মুহূর্তে চোখ দুটিতে এক ধরনের অসহায় ব্যাকুলতা। লিওন একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র এই মেয়েটির জন্যে তার বুকের ভিতরে সত্যিকারের খানিকটা ভালবাসা রয়েছে। সে ত্রিণাকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, আমার কিছু হয় নি ত্রিণা।

ত্রিণা মাথা নেড়ে বলল, না লিওন হয়েছে। আমি তোমাকে খুব ভালো করে জানি। আমি নিজেকে যেটুকু জানি, সময় সময় তোমাকে তার থেকে অনেক ভালো করে জানি। তোমার কিছু একটা হয়েছে।

লিওন একদৃষ্টিতে ত্রিণার দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। ত্রিণা আবার ব্যাকুল গলায় বলল, বল আমাকে।

বলব?

হ্যাঁ, বল কী হয়েছে তোমার?

লিওন একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে করছে না ত্রিণা।

ত্রিণা হঠাৎ অমানুষিক আতঙ্কে শিউরে উঠে লিওনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বলল, না, লিওন এ রকম কথা বোলো না।

আমি বলতে চাই নি, তুমি শুনতে চেয়েছ।

কিন্তু তোমার কথা তো সত্যি হতে পারে না। পৃথিবীতে একজন মানুষ তার জীবনে যা চাইতে পারে তুমি তার সব পেয়েছ, তোমার কেন বেঁচে থাকার ইচ্ছে করবে না?

মনে হয় সেজন্যেই।

কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ ত্রিণা। লিওন বিষণ্ন গলায় বলল, মনে হয় সেজন্যেই আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে করে না। একজন মানুষের জীবনে যা–কিছু পাওয়া যেতে পারে আমি তার সব পেয়েছি। অর্থ বিত্ত মান সম্মান সাফল্য এমনকি ভালবাসা—সত্যিকারের ভালবাসা, তাও আমি পেয়েছি তোমার কাছে। আমার দেহে কোনো রোগ নেই, আমার বুকে কোনো শোক নেই, জীবনে কোনো ব্যর্থতা নেই, কোনো জটিলতা নেই, কোনো কুটিলতা নেই, কোনো হিংস্রতা নেই—কী ভয়ঙ্কর একঘেয়ে জীবন। একজন মানুষ যখন সবকিছু পেয়ে যায়, যখন তার জীবন একদম একঘেয়ে হয়ে যায় তখন জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে যায়, আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে করে না। সবকিছু তখন এত অর্থহীন মনে হয়—।

মিথ্যা কথা! ত্রিণা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সব মিথ্যা কথা। মানুষের জীবন কখনো অর্থহীন হয়ে যায় না।

যায়। লিওন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে।

ত্রিণা হঠাৎ লিওনকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে লিওন?

লিওন চমকে উঠে ত্রিণার দিকে তাকাল, কী একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি এ কথাটি কেন বললে ত্রিণা?

আমি জানি না কেন বলেছি। কিন্তু তোমার কথা শুনে কেন জানি মনে হল তুমি বুঝি আমাকে ছেড়ে যাবে লিওন। তুমি কি সত্যিই যাবে?

লিওন কোনো কথা বলল না। ত্রিণার মুখ খুব ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে আসে, সে পিছনে সরে এসে ঘরের দেয়াল ধরে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে ভয় পাওয়া চোখে লিওনের দিকে তাকিয়ে থাকে। লিওন এক পা এগিয়ে এসে আবার নরম গলায় বলল, তুমি এ রকম একটি কথা কেন বললে ত্রিণা?

ত্রিণা অপ্রকৃতিস্থের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমি জানি, আমি জানি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমি তোমার চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি।

লিওন কেমন যেন বিষণ্ন চোখে ত্রিণার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়। স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ত্রিণা, বাইরে তাকিয়ে দেখ, কুয়াশায় সব ঢেকে যাচ্ছে আর দেখতে কী সুন্দর লাগছে!

লিওনের গলার স্বর শুনে ত্রিণা আবার শিউরে উঠে কাঁপা গলায় বলল, তুমি কোথায় যাবে লিওন?

লিওন বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি শীতলঘরে যাব।

শীতলঘরে?

হ্যাঁ ত্রিণা। প্রথমে ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব। দশ তলা একটি বিল্ডিং থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়া বা মাথার মাঝে একটা ছোট বুলেট কিংবা ধমনীতে এক ফোঁটা বিষ! কিংবা অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে গভীর একটা ঘুম। যখন ঘুমের কথা ভাবছিলাম তখন হঠাৎ শীতলঘরের কথা মনে হল। সেটি মৃত্যুর মতোই কিন্তু তবু পুরোপুরি মৃত্যু নয়। হয়তো ভবিষ্যতে কোনোকালে আবার জীবন ফিরে পাব। সেটি কবে হবে কেউ জানে না। হয়তো এক শ বছর বা এক হাজার বছর। কিংবা কে জানে হয়তো লক্ষ বছর, কেউ সেটা বলতে পারে না। পৃথিবী কেমন হবে তখন কেউ জানে না। হয়তো আমার জীবন তখন এ রকম একঘেয়ে মনে হবে না, এ রকম অর্থহীন হবে না। কে জানে ভবিষ্যতের সেই মানুষের জীবনে হয়তো আবার বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ত্রিণা দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তার সমস্ত শরীর অল্প অল্প করে কাঁপছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই অসম্ভব রূপবান মানুষটিকে ঘিরে তার সমগ্র জীবন। এর বাইরে তার কোনো জগৎ নেই—এই মানুষটিকে ছাড়া সে কেমন করে বাঁচবে? তার দুই চোখ পানিতে ভরে আসে, চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে সে ভাঙা গলায় বলল, লিওন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। যেও না। আমি আর তুমি চলে যাব দক্ষিণের পাহাড়ি অঞ্চলে। সবকিছু ছেড়ে চলে যাব। নিঃস্ব মানুষ যেরকম কষ্ট করে বেঁচে থাকে, ঠিক সেরকম আমরা কষ্ট করে বেঁচে থাকব। দেখবে তখন তোমার জীবনকে অর্থহীন মনে হবে না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে আমরা জ্বালানি আনব, একমুঠো খাবার আনব, রাতে আমরা সেই একমুঠো খাবার ভাগাভাগি করে খেয়ে আগুনের সামনে বসে থাকব। দেখবে তুমি তোমার জীবনকে একঘেয়ে মনে হবে না, অর্থহীন মনে হবে না।

লিওন কয়েক পা এগিয়ে এসে ত্রিণাকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে কোমল গলায় বলল, আমি দুঃখিত ত্রিণা, আমি খুব দুঃখিত। পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কোনো আপনজন নেই, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমাকে যেতেই হবে। আমি আর পারছি না ত্রিণা।

ত্রিণা হঠাৎ আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। শক্ত হাতে লিওনকে আঁকড়ে ধরে বলল, না লিওন। তুমি যেও না। যেও না।

লিওন ত্রিণার মাথায় হাত বুলিয়ে গভীর ভালবাসায় বলল, আমাকে যেতেই হবে ত্রিণা। আমার আর কিছু করার নেই।

গভীর শূন্যতায় হঠাৎ ত্রিণার বুকের ভিতর হাহাকার করে ওঠে।

২

লিওন কালো একটি সিলঝিনিয়ামের ক্যাপসুলে শুয়ে আছে। তার সারা শরীর নিও পলিমারের অর্ধস্বচ্ছ কাপড়ে ঢাকা। মাথার কাছে একটি গোল জানালা, সেখানে একজন কমবয়সী টেকনিশিয়ানের মুখ দেখা যাচ্ছে। ক্যাপসুলটির বাইরে কন্ট্রোল প্যানেলে সে কিছু একটা করছে। টেকনিশিয়ানটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনি কি প্রস্তুত?

আমি প্রস্তুত।

আপনাকে শেষবারের মতো প্রশ্ন করছি, আপনি কি স্বেচ্ছায় শীতলঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন?

লিওন শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ, আমি স্বেচ্ছায় শীতলঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

আপনি জানেন যে কবে আপনাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সেটা কেউ জানে না।

আমি জানি।

সেটা এক শ বছর হতে পারে, এক হাজার বছর হতে পারে আবার এক লক্ষ বছর হতে পারে।

আমি জানি।

আপনাকে কখনো পুনরুজ্জীবিত নাও করা হতে পারে। শীতলঘরেই আপনার মৃত্যু হতে পারে।

আমি জানি।

ভবিষ্যতে কিছু একটা সমস্যা হতে পারে, দুর্যোগ হতে পারে। আপনার দেহ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আমি জানি।

আপনার দেহ পুনরুজ্জীবিত করার পর কিছু একটা বড় ধরনের ভুল হয়ে যেতে পারে, আপনার দেহে অকল্পনীয় বিকৃতি হতে পারে, আপনার অমানুষিক যন্ত্রণা হতে পারে, অসহনীয় কষ্ট হতে পারে। আপনি সেটা জানেন?

লিওন চেষ্টা করে নিজের গলার স্বরকে স্বাভাবিক রেখে বলল, আমি সেটা জানি।

বেশ, মহামান্য লিওন। আপনাকে তাহলে শীতলঘরে নিয়ে যাব। প্রথমে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে, গভীর ঘুম। সেই ঘুমন্ত দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে আনব ধীরে ধীরে। আপনি প্রস্তুত?

আমি প্রস্তুত।

আপনি কি কাউকে কিছু বলে যেতে চান?

চাই। আমার ভালবাসার মেয়েটির নাম ত্রিণা। আমি ত্রিণাকে বলে যেতে চাই যে আমি তাকে ভালবাসি, লক্ষ বছর পরেও যখন আমাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে তখনো আমি তাকে ভালবাসব।

টেকনিশিয়ানটি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আমি মহামান্য ত্রিণাকে আপনার শেষ কথাটি জানিয়ে দেব। আপনার ভবিষ্যৎ যাত্রা শুভ হোক মহামান্য লিওন। শুভ যাত্রা।

টেকনিশিয়ানের কথাটি শেষ হবার আগেই সিলঝিনিয়ামের কালো ক্যাপসুলটির মাঝে খুব ধীরে ধীরে একটা সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে, তার সাথে খুব মিষ্টি একটা গন্ধ। লিওন চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করে বলল, বিদায় পৃথিবী। বিদায়। কিছুক্ষণের মাঝেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

৩

গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আছে। শুধু অন্ধকার নয় সাথে এক ধরনের বিস্ময়কর নীরবতা, পরিপূর্ণ শব্দহীনতা। নৈঃশব্দ্যের এক বিচিত্র জগৎ। বিশাল শূন্যতায় মহাকাল যেন স্থির হয়ে আছে। এই শূন্যতার কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। এখানে সময় স্থির হয়ে আছে। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে থাকা স্থির সময়ে নৈঃশব্দ্যের একটি অপার্থিব জগৎ।

AMARBOI.COM

৪

অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের জগতে চেতনার প্রথম স্পর্শ হল খুব সাবধানে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেই অনুভূতি। এত সূক্ষ্ম সেই অনুভূতি যে সেটি আছে কি নেই সেটি বোঝা যায় না। মনে হয় একটি নিউরন বুঝি পাশের নিউরনকে স্পর্শ করেছে খুব সাবধানে। সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি জেগে রইল বহুকাল। তারপর সেটি আরো একটু বিস্তৃত হল। আরো একটু প্রবল হল। এখন সেটি সত্যিকারের অনুভূতি। সত্যিকারের চেতনা। সেটি সুখের চেতনা নয়, দুঃখের চেতনা নয়। আনন্দ বা বেদনার চেতনা নয়। শুধুমাত্র অনুভব করা যায় সেরকম একটি চেতনা। লিওন প্রথমবার তার অস্তিত্বকে অনুভব করল, প্রথমবার নিজেকে বলল, আমি লিওন। আমি বেঁচে আছি। বেঁচে আছি।

কিন্তু বেঁচে থাকার সেই অনুভূতি খুব অস্পষ্ট অনুভূতি। সত্যি কি সে লিওন? সত্যি কি সে বেঁচে আছে? নাকি এটি ধরাছোঁয়ার বাইরের একটি অনুভূতি। শুধু একটি অনুভূতি? লিওন দীর্ঘকাল আবছায়ার মতো সেই অনুভূতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইল। তারপর একদিন সেই অনুভূতি আরো একটু স্পষ্ট হল, আরো একটু প্রবল হল। লিওন প্রথমবার অনুভব করল সে সত্যি লিওন। সে সত্যি বেঁচে আছে, তার অনুভূতিও সত্যি। দুঃখ, কষ্ট, ভালবাসা, আনন্দ, যন্ত্রণা নয়, শুধু একটি অনুভূতি—সত্যিকারের অনুভূতি।

সেই অনুভূতির জগৎ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা, সেখানে কোনো আলো নেই, শব্দ নেই, কারো স্পর্শ নেই, কম্পন নেই। পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যের এক অপার্থিব শীতল অন্ধকার জগৎ। কতকাল তাকে অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে হবে?

ধীরে ধীরে তার চেতনা আরো প্রবল হয়, অনুভূতি আরো স্পষ্ট হয়। সে নিজেকে আরো গভীরভাবে অনুভব করে। তার স্মৃতি ফিরে আসে। তার শৈশবের কথা মনে হয়, যৌবনের কথা মনে হয়। ব্যর্থতার কথা মনে হয়, সাফল্যের কথা মনে হয়। তার ভালবাসার কথা মনে হয়, ত্রিণার কথা মনে হয়। কোথায় আছে এখন ত্রিণা? কত বছর পার হয়েছে এখন? কতকাল? কোথায় আছে এখন সে? নিশ্চয়ই সে মারা গেছে বহুকাল আগে। কখন সে কারো একটু কথা শুনবে? একটু দেখবে? একটা কিছু স্পর্শ করবে? কখন সে একটু কথা বলবে?

চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, নৈঃশব্দ্যের দুর্ভেদ্য দেয়াল দিয়ে ঢাকা। তার মাঝে সমস্ত চেতনা উন্মুখ করে লিওন অপেক্ষা করে। একটু আলোর জন্যে অপেক্ষা করে—একটু শব্দ, একটু হাতের ছোঁয়া। কিন্তু মহাকাল যেন স্থির হয়ে গেছে, তার বুঝি আর মুক্তি নেই। নিঃসীম অন্ধকারে বুঝি সে চিরকালের জন্যে বাঁধা পড়ে গেছে।

একদিন সে প্রথমবার একটা শব্দ শুনতে পেল। সত্যিই কি শব্দ? নাকি কেউ চেতনায় এসে প্রশ্ন করেছে? কে একজন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

লিওন আকুল হয়ে বলতে চাইল, আমি লিওন। লিওন। কিন্তু সে কোনো কথা বলতে পারল না। কেমন করে বলবে? তার চেতনা ছাড়া এখনো যে কিছুই নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! যে প্রশ্ন করেছে সে তার কথা বুঝতে পারল, তাকে বলল, তুমি লিওন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি লিওন। তুমি কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি? অদৃশ্য জগৎ থেকে সেই প্রাণী হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল। লিওন প্রাণপণে সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলতে চাইল, আমি কোথায়? আমাকে দেখতে দাও। কথা বলতে দাও। আমাকে জাগিয়ে দাও। কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। কেউ তার কথার উত্তর দিল না।

তারপর আবার বুঝি বহুকাল কেটে গেল। কী ভয়ঙ্কর বৈচিত্র্যহীন জীবন। গভীর অন্ধকারে এক নৈঃশব্দ্যের জগৎ, যার কোনো শুরু নেই, যার কোনো শেষ নেই। যে জগৎ থেকে কোনো মুক্তি নেই। দুঃখ নেই কষ্ট নেই আনন্দ-বেদনা নেই, শুধুমাত্র তিল তিল করে বেঁচে থাকা। না জানি কতকাল এভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

তারপর আবার একদিন সে কথা শুনতে পেল, কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কেমন আছ লিওন?

লিওন আকুল হয়ে বলল, ভালো নেই, আমি ভালো নেই।

কেন তুমি ভালো নেই? তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?

না আমার কোনো কষ্ট নেই। আমার কোনো দুঃখ নেই। আনন্দ বেদনা যন্ত্রণা কিছু নেই। এ এক ভয়ঙ্কর জীবন। আমি এর থেকে মুক্তি চাই।

অদৃশ্য প্রাণী অবাক হয়ে বলল, তুমি কেমন করে মুক্তি চাও?

আমাকে জাগিয়ে দাও।

দীর্ঘ সময় কেউ কোনো উত্তর দিল না, তারপর অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তোমাকে আমরা কেমন করে জাগাব?

মানুষকে যেভাবে জাগায়।

কিন্তু—

কিন্তু কী?

অদৃশ্য জগতের সেই প্রাণী দ্বিধান্বিত গলায় বলল, তুমি তো মানুষ নও।

লিওন হতচকিত হয়ে বলল, তুমি কী বললে?

প্রাণীটি চুপ করে রইল। লিওন আতঙ্কিত গলায় বলল, আমি মানুষ নই?

না।

তাহলে আমি কী?

তুমি একটি মানুষের স্মৃতি। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, হলোগ্রাফিক মেমোরিতে ধরে রেখে যন্ত্রের মাঝে বাঁচিয়ে রাখা একটি মানুষের স্মৃতি। যে মানুষের স্মৃতি সেই মানুষটি বহুকাল আগে মারা গেছে। নীল চোখের সুপুরুষ একজন মানুষ।

মারা গেছে?

হ্যাঁ।

আমি সেই মানুষের স্মৃতি?

হ্যাঁ।

আমার—আমার—মৃত্যু নেই?

না তোমার মৃত্যু নেই। কম্পিউটার প্রোগ্রামের মৃত্যু হয় না।

লিওন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে পাথর হয়ে বলল, আমি এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না, আমাকে ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—

মানুষটি কোনো উত্তর দিল না। লিওন শুনল সে চাপা গলায় কাউকে ডাকছে, বলছে, দেখ স্মৃতির প্রোগ্রামটা কী বিচিত্র ব্যবহার করছে! এস দেখে যাও।

লিওন দেখতে পেল না কিন্তু সে জানে অনেক মানুষ একটি যন্ত্রকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সে যন্ত্রে সে চিরদিনের জন্যে বাঁধা পড়ে আছে।

চিরদিনের জন্যে।

ভাবনা

আমি একটি চতুর্থ স্তরের রবোট। আমার কপোট্রন কিউ ৪২ ধরনের—এটি গৃহস্থালি কাজে পারদর্শী। আমি এই মুহূর্তে আমার মনিবের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি, তিনি আমাকে কিছু আদেশ দেবেন এবং তিনি আদেশ দেয়া মাত্র আমি সেই আদেশ পালন করব। আমার কপোট্রন একটি তথ্য সেকেন্ডে একুশ ট্রিলিয়ন বার পর্যালোচনা করতে পারে, সেই তুলনায় আমার মনিব অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন। তিনি একজন জৈবিক মানুষ। জৈবিক মানুষের বায়ো যোগাযোগ হয় খুব ধীরে। আমি প্রায় তিন শ মিলি সেকেন্ড ধরে অপেক্ষা করে আছি এবং এই সময়ে প্রায় সাত ট্রিলিয়ন তথ্যকে পর্যালোচনা করে ফেলেছি তবুও তিনি আদেশটি উচ্চারণ করতে পারেন নি। তিনি সেকেন্ডে মাত্র কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। আমি আমার শব্দগ্রাহক যন্ত্রকে তীক্ষ্ণ করে এনেছি প্রত্যেকটি শব্দকে যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পারি।

আমার মনিবের ভোকাল কর্ডে কম্পন শুরু হয়েছে। এক দশমিক তিন-চতুর্থাংশ কিলোহার্টজ—তিন ডি. বি.—শব্দটি আমার শব্দগ্রাহক যন্ত্রে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। শব্দটি হচ্ছে :

দূর

দূর। আমার কপোট্রনে রাখা অসংখ্য শব্দের সাথে 'দূর' শব্দটি মিলিয়ে দেখতে শুরু করেছি। আমার মনিব পরের শব্দটি উচ্চারণ করতে কমপক্ষে আরো অর্ধসেকেন্ড সময় নেবেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে আমি প্রায় দশ ট্রিলিয়ন বার এই শব্দটিকে নানাভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কাজেই শব্দটিকে আমি মাত্র একভাবে পর্যালোচনা না করে ভিন্ন ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করব। আমি একই সাথে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি শুরু করেছি। কপোট্রনের মূল শব্দভাণ্ডার থেকে 'দূর' শব্দটি খুব সহজে পাওয়া গেছে। দূর শব্দটির অর্থ যেটি কাছে নয়। আরো বৈজ্ঞানিক অর্থে বলা যায় যার ভিতরে অন্য এক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা স্থান রয়ে গেছে। দূর শব্দটি বিশেষণ, তার বিশেষ্য রূপ হচ্ছে দূরত্ব। মানুষেরা নানাভাবে দূর শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন—যখন দুজন মানুষের ভিতরে ঘনিষ্ঠতা কমে যায়, তারা বলে দুজনের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আবার যখন মানুষ কারো সাথে অভিমান করে তখন তারা বলে যে আমি তোমাকে ছেড়ে দূরে চলে যাব। যে জিনিসটি কাছে নয় সেটি বোঝাতে তারা এই শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন তারা বলে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবী থেকে বহু দূরে। আমার মনিব দূর শব্দটি ঠিক কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন আমি এখনো জানি না। সেটি সঠিকভাবে বোঝার জন্যে পরের শব্দগুলো শুনতে হবে। কিন্তু যেহেতু এখনো আমার দীর্ঘ সময় রয়ে গেছে, আমি 'দূর' শব্দটি ব্যবহার

AMARBOI.COM

করে সম্ভাব্য সবগুলো বাক্য তৈরি করে রাখব। তাহলে আমার মনিব যখন পুরো বাক্যটি উচ্চারণ করবেন আমার সেটা ব্যাখ্যা করতে কোনোই অসুবিধে হবে না।

প্রাথমিক হিসেবে সম্ভাব্য বাক্য হতে পারে প্রায় নয় লক্ষ এগার হাজার সাত শ নয়। এই নয় লক্ষ এগার হাজার সাত শ নয়টি বাক্যের ভিতরে প্রায় দুই লক্ষ চার হাজার তিন শ চারটি বাক্য পরিপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক নয়। বাকি সাত লক্ষ সাত হাজার চার শ পাঁচটি বাক্যকে তুলনামূলকভাবে যাচাই করা যাক। তাহলে যখন পুরো বাক্যটি উচ্চারিত হবে তার ব্যাখ্যা বের করতে কোনোই সময় নষ্ট হবে না। এই সাত লক্ষ সাত হাজার চার শ পাঁচটি বাক্যকে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং সময়োপযোগিতা হিসেবে সাজানো যাক :

১. দূর থেকে চিঠি এসেছে।
২. দূর থেকে খবর এসেছে।
৩. দূর থেকে আহ্বান এসেছে।
৪. দূর থেকে বাণী এসেছে।
ঃ
ঃ
৬০৩৪২১. দূর গ্রহের আগন্তুক ইভেশেঙ্কু আপনার রক্তপাত করতে চায়।
৬০৩৪২১. দূর গ্রহের আগন্তুক ইভেশেঙ্কু মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়।
ঃ
ঃ

(তিন শ মিলি সেকেন্ড পর)

AMARBOI.COM

গত তিন শ মিলি সেকেন্ড আমি দূর শব্দটি নিয়ে সম্ভাব্য সবগুলো বাক্য তৈরি করেছি। বাক্যগুলো ব্যাখ্যা করেছি এবং বিশ্লেষণ করেছি। তারপরও আমার হাতে প্রচুর সময় রয়ে গিয়েছে। সেই সময়টিতে আমি বাঁধাকপি দিয়ে ভেড়ার মাংস রান্না করার একটি নতুন পদ্ধতি দাঁড়া করিয়েছি, ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্রের তালিকা তৈরি করেছি, শেলফের বই, কম্পিউটারের ক্রিস্টাল, যোগাযোগ কেন্দ্রের মূল মডিউলের সংখ্যা নির্ণয় করেছি। ঘরের বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ বের করেছি এবং ভোল্টেজের গড় তারতম্য দশমিকের পর সাত ঘর পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়েছে। পুরো ব্যাপারগুলো সতের বার করার পর অর্ধসেকেন্ড সময় পার হয়েছে এবং মনে হচ্ছে আমার মনিব দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। আমি আমার মনিবের ভোকাল কর্ডটির সূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করতে শুরু করেছি। আমার শব্দগ্রাহক যন্ত্র এবং কম্পন অনুধাবন মডিউলটি প্রস্তুত রয়েছে। তিনি শেষ পর্যন্ত শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। শব্দটি হচ্ছে :

হ

হ? হ একটি অস্বাভাবিক শব্দ। আমার শব্দগ্রাহক যন্ত্রে সম্ভবত একটা ত্রুটি হয়েছে এবং পুরো শব্দটি ধরা যায় নি। সেটি কোনো সমস্যা নয়। পরবর্তী অর্ধসেকেন্ডে আমি প্রায় দশ ট্রিলিয়ন বার বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করতে পারব। প্রকৃত শব্দটি কী ছিল সেটি বের করতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার মনিব যখন শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, আমি তখন শব্দটি আমার স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। শব্দটি আমি এক্ষুনি চার হাজার বার শুনে নিতে পারি।

আমি শব্দটি এক হাজার একুশ বার শুনে নিয়েছি আমার শব্দগ্রাহক যন্ত্রে, কোনো ত্রুটি নেই। আমার মনিব প্রকৃত অর্থেই হ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। হ শব্দটি ব্যাপকভাবে

ব্যবহার হয় না। আমার কপোট্রন থেকে পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে এটি হও শব্দটির অপভ্রংশ। কিংবা এটি অন্য কোনো শব্দের প্রথম অংশটি। আমার মনিব নিজেই এখন পরের অংশ উচ্চারণ করে শব্দটি পূর্ণাঙ্গ করবেন। আমার মনিব কিংবা মানব সম্প্রদায় প্রায় সবসময়েই অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে এবং বক্তব্য থেকে এই সমস্ত অর্থহীন শব্দ সরিয়ে পুরো বাক্যগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হয়। কাজেই পরবর্তী শব্দের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ অপেক্ষা করছি ততক্ষণ এই দুটি শব্দ ব্যবহার করে সম্ভাব্য বাক্যগুলোকে প্রস্তুত করা যাক।

১. দূর হতে চিঠি এসেছে।
২. দূর হতে খবর এসেছে।
৩. দূর হতে বার্তা এসেছে।

(আরো তিন শ মিলি সেকেন্ড পরে)

দেখা যাচ্ছে আমার মনিব পরবর্তী শব্দটি উচ্চারণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ভোকাল কর্ড কম্পনের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। মানুষের কথা বিশ্লেষণ করার সময় তাদের মুখের ভাবভঙ্গিও বিশ্লেষণ করতে হয়। আমি যদি আমার মনিবের মুখের ভাবভঙ্গি মান এবং গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজাই তাহলে সেগুলো হবে :

১. ক্রোধ
২. বিরক্তি
৩. অধৈর্য
৪. ঘৃণা
৫. তাচ্ছিল্য
এবং
৬. উপহাস

মানুষের মুখে যদি এই অনুভূতিগুলো থাকে তাহলে সেগুলো সাধারণত তাদের বক্তব্যে বিচিত্র শব্দ এবং অপ্রাসঙ্গিক অর্থের সৃষ্টি করে। এটি একটি জরুরি অবস্থা। আমার মনে হয় কপোট্রনের টার্বো পাওয়ার চালু করা উচিত। প্রতি সেকেন্ডে আমার এখন অন্তত পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন তথ্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পরবর্তী শব্দটি পর্যালোচনা করার জন্য এখন আমার বিশেষ মডিউলটি চালু করা প্রয়োজন। এটি নিঃসন্দেহে একটি জরুরি অবস্থা। আমার মনিবের ভোকাল কর্ডের কম্পন শুরু হয়ে গেছে। তিনি যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন সেটি হচ্ছে :

হতভাগা

হতভাগা। এটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ নয়। আমার কপোট্রনের অর্থ অনুযায়ী এই শব্দের অর্থ যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। ভাগ্য শব্দটি শুধুমাত্র মানবসমাজে ব্যবহৃত। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে তারা খারাপ ভাগ্যপ্রসূত বলে বর্ণনা করে। এই ক্ষেত্রে হতভাগা শব্দটি কাকে বলা হয়েছে সেটা সবার আগে নির্ধারণ করতে হবে। এই ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই তাই শব্দটি নিঃসন্দেহে আমার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আমার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা এখন তিনটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ রয়েছে। মনিবের মুখভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। এই বাক্যটিতে আর কোনো শব্দ নেই। এখন এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে যে বাক্য তৈরি হয়েছে সেটি হচ্ছে :

বাক্যটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বাক্যটি ব্যবহার করার সময়ে আমার মনিবের মুখের অনুভূতিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মুখের অনুভূতি হচ্ছে ক্রোধ, বিরক্তি, অধৈর্য, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য এবং উপহাস। এই অনুভূতিগুলো মুখে রেখে তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'দূর হ হতভাগা'। আমার হাতে সময় রয়েছে প্রায় অর্ধসেকেন্ড। এই সময়ের মাঝে আমাকে এই বাক্যটির অর্থ বের করে একটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এটি নিঃসন্দেহে একটি জটিল প্রক্রিয়া ....।

জগলুল সিংগুলারিটি

রিলেটিভিটির ক্লাসে প্রফেসর জগলুল হঠাৎ লক্ষ করলেন তৃতীয় বেঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় বসে আলাউদ্দিন গালে হাত দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে প্রফেসর জগলুলের একটু মেজাজ খারাপ হল। তিনি ডাকসাইটে প্রফেসর, তার ক্লাসে ছাত্ররা অমনোযোগী হবে—সে যত ভালো ছাত্রই হোক তিনি সেটা সহ্য করতে পারেন না।

ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা থামিয়ে তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে থমথমে গলায় ডাকলেন, আলাউদ্দিন—

আলাউদ্দিন সাথে সাথে ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে আনে, জি স্যার?

তুমি ছাদের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

একটা জিনিস ভাবছিলাম।

ক্লাসে তুমি অন্য জিনিস ভাবতে আস নি, ক্লাসে এসেছ আমি কী পড়াচ্ছি সেটা শুনতে।

আমি সেটাও শুনছি স্যার। শুনতে শুনতে ভাবছি।

তুমি আমার পড়া শুনছ?

জি স্যার শুনছি।

প্রফেসর জগলুল এবারে সত্যি সত্যি রেগে গেলেন; কেউ মিথ্যে কথা বললে তিনি ভীষণ রেগে যান। চোখ লাল করে ছোট একটা গর্জন করে বললেন, তুমি আমার কথা শুনছ?

আলাউদ্দিন এবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জি স্যার, শুনছি।

বল দেখি ট্রান্সফর্মেশান মেট্রিক্সটা কী রকম?

বই খাতা না দেখে শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ট্রান্সফর্মেশান মেট্রিক্সটা বলা সম্ভব নয় কিন্তু আলাউদ্দিন মোটেও বিচলিত না হয়ে বলতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণ শুনেই প্রফেসর জগলুল বুঝতে পারলেন আলাউদ্দিন ঠিকই বলছে। এতে তার রাগ আরো বেড়ে গেল, তিনি আরো জোরে গর্জন করে বললেন, আগে থেকে পড়ে এসে ক্লাসে বিদ্যা ফলানো ক্লাস এটেন্ড করা নয়। ক্লাসে এলে মনোযোগ দিতে হবে।

আলাউদ্দিন একটু বিব্রত হয়ে নিচু গলায় বলল, আমি মনোযোগ দিচ্ছি স্যার।

না তুমি মনোযোগ দিচ্ছ না। তুমি ছাদের দিকে তাকিয়ে আছ। আমি ক্লাসে কী বলছি তুমি শুনছ না, কী লেখছি তুমি দেখছ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখছি স্যার। এই দেখেন স্যার আমার খাতায় সব লেখা আছে। তাছাড়া—

তাছাড়া কী?

আমি মনোযোগও দিচ্ছি স্যার। যেমন স্যার আপনি ব্ল্যাকবোর্ডে দুই নাম্বার লাইনে ইকুয়েশানটা ভুল লিখেছেন। ইনডেক্সগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। ছয় নাম্বার লাইনে এসে আবার ভুল করেছেন, সেই ভুলটা আগের ভুলটাকে শুদ্ধ করে দিয়েছে। সাত নাম্বার লাইন থেকে ইকুয়েশানটা আবার শুদ্ধ হয়েছে। যদি সেটা না হত ইমাজিনারি উত্তর আসত।

প্রফেসর জগলুল বোর্ডের দিকে তাকালেন, ভুলটা চোখে পড়তে তার অনেকক্ষণ সময় লাগল, এবং যখন সেটা তার চোখে পড়ল তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, তার মুখে হঠাৎ রক্ত উঠে এল এবং লজ্জায় তার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। তিনি ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা মুছে শুদ্ধ করতে করতে বিড়বিড় করে বললেন, আমার নোটবইয়ে ঠিকই লেখা রয়েছে, বোর্ডে তুলতে ভুল হয়েছে।

আলাউদ্দিন হাসি-হাসি মুখ করে না-সূচকভাবে মাথা নাড়ল, প্রফেসর জগলুল সেটা দেখতে পেলেন না, কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বস।

স্যার আমি কী ভাবছিলাম সেটা কি আপনাকে একটু বলতে পারি?

প্রফেসর জগলুল থমথমে গলায় বললেন, আমি ক্লাসে অন্য জিনিস নিয়ে কথা বলা পছন্দ করি না।

এটা অন্য জিনিস না স্যার। রিলেটিভিটির একটা ব্যাপার। স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ামের একটা সহজ ইকুয়েশান—

প্রফেসর জগলুল তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি সেটা নিয়ে অন্য সময় কথা বোলো।

আলাউদ্দিনের মুখে একটা আশাভঙ্গের ছাপ পড়ে, সে সেটা গোপন করার চেষ্টা করতে করতে নিজের জায়গায় বসে পড়ল। প্রফেসর জগলুল আবার বোর্ডে লিখতে শুরু করলেন, খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর পড়াতে পারছেন না, আলাউদ্দিন তার মেজাজটাকে একটু খিচড়ে দিয়েছে। প্রতিভাবান ছাত্ররা সাধারণত শিক্ষকদের প্রিয় হয়, কিন্তু সেই প্রতিভাটা যদি শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবনের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তখন ছাত্রটির মাঝে ভালো লাগার কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আলাউদ্দিন নামক এই সাদাসিধে গোবেচারা ধরনের ছাত্রটির বিরুদ্ধে তিনি এক ধরনের বিজাতীয় বিদ্বেষ অনুভব করতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

দুপুরবেলা সাধারণত ক্লাস-সেমিনার থাকে না, তখন প্রফেসর জগলুল জার্নাল নিয়ে বসেন। নতুন কী কাজ হয়েছে খোঁজখবর নেন, নিজের রিসার্চের কাজকর্ম করেন। তিনি তাত্ত্বিক মানুষ, বেশিরভাগ কাজই কাগজ আর কলম নিয়ে বসে থাকা। আজকেও কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন ঠিক এ রকম সময় দরজায় আলাউদ্দিন এসে দাঁড়াল। ছোটখাটো চেহারা, মাথার চুল এলোমেলো, চোখে সস্তা ফ্রেমের চশমা, শার্টটা একটু লম্বা, পায়ে স্যান্ডেল—দেখেই বোঝা যায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। চোখে হয়তো বুদ্ধির ছাপ আছে, থাকলেও সেটা মোটা চশমার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। আলাউদ্দিন দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আসতে পারি স্যার?

প্রফেসর জগলুলের ভুরু কুঞ্চিত হল, তিনি একবার ভাবলেন বলবেন 'না'। কিন্তু বলতে পারলেন না। একজন শিক্ষককে সবসময় তার ছাত্রদের কাছে আসতে দিতে হয়। তিনি সরাসরি তাকে আসতেও বললেন না, জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

একটা জিনিস নিয়ে একটু আলাপ করতে চাইছিলাম।

কী জিনিস?

স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ামের একটা ইকুয়েশান। আমি লিখে এনেছি, একটু যদি দেখে দেন।

প্রফেসর জগলুল বিরক্ত গলায় বললেন, নিয়ে এস।

আলাউদ্দিন একটু বিব্রত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। তার হাতে একটা বাঁধানো খাতা, সেই খাতাটা টেবিলের উপর রেখে বলল, এই যে ইকুয়েশানটা আছে স্যার, তার দুইটা সলিউশান। একটা আপনি ক্লাসে পড়িয়েছেন, আরেকটা অবাস্তব বলে বাদ দিয়েছেন।

হুঁ। কী হয়েছে তাতে?

যেই সলিউশানটা আপনি বাদ দিয়েছেন আমি সেটা দেখছিলাম স্যার। আমার মনে হয় সেটা অবাস্তব সলিউশান না।

অবাস্তব না?

না স্যার। সময় সম্পর্কে আমাদের যেই ধারণা সেই ধারণার সাথে মিলছে না বলে আমরা বলছি এটা অবাস্তব। কিন্তু আমরা যদি সময় সম্পর্কে অন্য একটা ধারণা নিই তাহলে—

অন্য ধারণা?

জি স্যার। এই দেখেন আমি ক্যালকুলেশান করেছি।

আলাউদ্দিন খাতাটি খুলে ধরল এবং ভিতরে তার মোটা হাতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জটিল অঙ্ক দেখে প্রফেসর জগলুল ভিতরে ভিতরে হতবাক হয়ে গেলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না। চোখেমুখে বিরক্তি মেশানো প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপের ভাব ধরে রাখলেন। নিরুৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী ক্যালকুলেশান?

ক্যালকুলেশানটা দেখলেই বুঝবেন স্যার, তবে আমি এমনি বলে দিই। আমাদের ধারণা সময় আগে অতীত থাকে, তারপর বর্তমানে আসে, সেখান থেকে ভবিষ্যতে যায়।

সে ধারণাটা সত্যি না?

সত্যি না আবার সত্যি—আলাউদ্দিন দাঁত বের করে একটু হাসল। প্রফেসর জগলুল এবারে একটু রেগে গেলেন, বললেন, কী বলতে চাইছ পরিষ্কার করে বল।

বলছি যে স্পেস যেরকম পুরোটা একসাথে রয়েছে, সময় সেরকম পুরোটা একসাথে রয়েছে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ পুরোটা।

পুরোটা? প্রফেসর ভুরু কুঁচকে বললেন, পুরোটা?

আলাউদ্দিন একটু থতমত খেয়ে বলল, জি স্যার পুরোটা। এই যে দেখেন স্যার—এইখানে ক্যালকুলেশান করেছি।

প্রফেসর জগলুল জটিল সমীকরণটির দিকে তাকিয়েই হঠাৎ করে বুঝে গেলেন আলাউদ্দিন কী বলতে চাইছে এবং তিনি ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। এই সাদাসিধে ছেলেটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেছে কিন্তু সে নিজে সেটা নিশ্চয়ই জানে না। প্রফেসর জগলুল তার চেহারায় কিছু বুঝতে দিলেন না। বিরক্তি মেশানো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাবটা ধরে রেখে একটু রাগ-রাগ চোখে আলাউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আলাউদ্দিন একটু বিব্রত হয়ে খানিকটা লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমার ক্যালকুলেশান বলছে এখন যেটা অতীত সেটা যখন বর্তমানে চলে আসবে, তখন আমরা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে চলে যাব। কাজেই এখন যেটা অতীত সেটাকে কখনই আমরা দেখব না! ঠিক সেরকম এখন যেটা

ভবিষ্যৎ সেটাও আমরা কখনো দেখব না—কারণ আমরা যখন ভবিষ্যতে যাব তখন যেটা ভবিষ্যতে আছে সেটা আরো ভবিষ্যতে চলে যাবে। কাজেই যদিও পুরো সময়টাই বর্তমান, আমরা আমাদের নিজেদের সময় ছাড়া কোনোটা দেখতে পাব না। যদিও অন্য সময়ের জন্যে হয়তো অন্য জগৎ রয়েছে, অন্য স্পেস রয়েছে—

অন্য স্পেস রয়েছে?

হয়তো রয়েছে।

অন্য সময়ও আছে?

জি স্যার।

কিন্তু কখনো দেখতে পাব না?

না স্যার। আলাউদ্দিন মাথা চুলকে বলল, মনে হয় পারব না।

প্রফেসর জগলুল ভিতরে ভিতরে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে এক ধরনের প্রবল উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন কিন্তু বাইরে নিস্পৃহ ভাবটা ফুটিয়ে রাখলেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত গলায় বললেন, যে জিনিস প্রমাণ করা যায় না তবু বিশ্বাস করতে হয় সেটাকে বিজ্ঞান বলে না, সেটাকে বলে ধর্মশাস্ত্র। ধর্মে বলা হয় খোদাকে কেউ দেখতে পাবে না তবু তাকে বিশ্বাস করতে হয়, তুমিও বলছ একই সাথে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ রয়েছে কিন্তু কেউ দেখতে পাবে না তবুও বিশ্বাস করতে হবে—

আলাউদ্দিন মাথা চুলকে বলল, কিন্তু আমি তো সেটা এমনি এমনি বলছি না, একটা ইকুয়েশানের সলিউশান থেকে বলছি। খোদার অস্তিত্ব নিয়ে তো কোনো ইকুয়েশান নেই—

উত্তরে প্রফেসর জগলুল বলার মতো কিছু পেলেন না বলে বিরক্তি এবং অসহিষ্ণুতার ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, ফিজিক্স হচ্ছে এক ধরনের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রথম কথাই হচ্ছে তার সব থিওরি পরীক্ষা করে দেখা যাবে। যে বিজ্ঞানের থিওরি পরীক্ষা করা যায় না সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে সময় নষ্ট।

প্রফেসর জগলুলের রূঢ় উত্তরে আলাউদ্দিনের খুব আশাভঙ্গ হল এবং সে সেটা গোপন করার কোনো চেষ্টা করল না। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, স্যার, তবু আমার খাতাটা একটু দেখবেন? ক্যালকুলেশানে কোথাও কোনো ভুল আছে কি না।

প্রফেসর জগলুল টেবিল থেকে একটা জার্নাল টেনে নিতে নিতে শীতল গলায় বললেন, ঠিক আছে রেখে যাও। যদি সময় হয় দেখব।

আলাউদ্দিন খাতাটা তার টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঘর থেকে পুরোপুরি বের হয়ে না গেল প্রফেসর জগলুল জার্নালের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু সে বের হওয়ার সাথে সাথে তিনি আলাউদ্দিনের খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। উত্তেজনায় তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না, তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। তিনি লোভাতুর দৃষ্টিতে খাতার পৃষ্ঠা উল্টান, এখানে যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে সেটা দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফিজিক্যাল রিভিউয়ে তিন থেকে চারটা পেপার হয়। এটা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মাঝে হইচই পড়ে যাবার কথা। অনেকদিন থেকে তিনি সেরকম কোনো কাজ করছেন না। এই একটা কাজ দিয়েই তিনি সারা পৃথিবীতে একটা আলোড়ন তৈরি করে ফেলতে পারবেন।

প্রফেসর জগলুল আলাউদ্দিনের খাতার পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বুকের ভিতরে ঈর্ষার এক ধরনের তীব্র খোঁচা অনুভব করতে থাকেন। এই জটিল অঙ্কগুলো আঠার-উনিশ বছরের একটি ছেলের কাজ, ব্যাপারটা তার বিশ্বাস হতে চায় না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন এবং

কিছুক্ষণের মাঝেই তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে যান আলাউদ্দিন যেটা বলেছে সেটা সত্যি, স্পেস যেরকম একই সাথে পুরোটুকু ছড়িয়ে আছে, সময়ও সেরকম একই সাথে পুরোটা ছড়িয়ে আছে। সময়ের প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে সবকিছু ভবিষ্যতে এগিয়ে যাচ্ছে তাই কেউ কারো খোঁজ পাচ্ছে না। কোনোভাবে কেউ যদি হঠাৎ এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে উপস্থিত হয়, সে দেখবে পুরোপুরি ভিন্ন এক জগৎ! প্রফেসর জগলুল লম্বা একটা নিশ্বাস নিলেন, এর একটা সুন্দর নাম দিতে হবে, সেই নাম নিয়ে তিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে যাবেন।

প্রফেসর জগলুল আলাউদ্দিনের খাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কেউ দেখার আগে পুরো খাতাটা গোপনে ফটোকপি করে নিতে হবে। মাস তিনেক পর অস্ট্রেলিয়াতে একটা কনফারেন্স আছে, মনে হয় সেটাতেই প্রথম পেপারটা দেয়া যায়। আলাউদ্দিন যেন কিছুতেই জানতে না পারে, সেটা অবশ্যি সমস্যা হবার কথা নয়, এখানে জার্নাল পেপার এসব বলতে গেলে প্রায় আসেই না।

তিন দিন পরে আলাউদ্দিন তার খাতা ফেরত নিতে এল। প্রফেসর জগলুল ভান করলেন কী খাতা কী বৃত্তান্ত তিনি সব ভুলে গেছেন। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হঠাৎ মনে পড়েছে এ রকম ভান করে বললেন, ও, তোমার সেই অবাস্তব সলিউশানের ক্যালকুলেশান?

জি স্যার। দেখেছিলেন?

খুঁটিয়ে দেখার সময় পাই নি, শুধু চোখ বুলিয়ে দেখেছি এক দিন। ট্রিটমেন্ট তো পুরোনো। আজকাল এই ক্যালকুলেশান কেউ টেনসর দিয়ে করে না, ডায়াডিক দিয়ে করে।

কিন্তু স্যার সলিউশানটা?

প্রফেসর জগলুল ঘাড় ঝাঁকালেন, বললেন, যে জিনিস কোনোদিন পরীক্ষা করা যাবে না সেটা থাকলেই কী আর না থাকলেই কী। একটা ইকুয়েশানের তো কতই সলিউশান থাকে, একটা ফেজ লাগিয়ে দিলেই তো নতুন সলিউশান। নতুন সলিউশান মানে তো আর নতুন ফিজিক্স না। যাই হোক, আমি বলি কী—

কী স্যার? আলাউদ্দিন আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। এইসব বড় বড় জিনিস বাদ দিয়ে পড়াশোনা কর। ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারলে অনেক কাজ হবে।

আলাউদ্দিন খুব মনমরা হয়ে তার খাতাটা নিয়ে বের হয়ে গেল।

প্রফেসর জগলুল পরের এক সপ্তাহ রাত জেগে কাজ করে একটা পেপার দাঁড়া করালেন। তার নিজের সত্যিকার কোনো কাজ করতে হল না, পুরোটা করে রেখেছে আলাউদ্দিন। তার কাজ হল ব্যাপারটা প্রকাশ করার জন্যে লেখাটা দাঁড়া করানো—কিছু টেবিল, দুটো ফিগার এবং পেপারের শেষে একগাদা রেফারেন্স। ব্যাপারটা নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মাঝে কী রকম হইচই পড়ে যাবে এবং তিনি কেমন করে এক ইউনিভার্সিটি থেকে অন্য ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার দিয়ে দিয়ে বেড়াবেন সেটা চিন্তা করে তার চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করতে থাকে।

সপ্তাহ দুয়েক পরে এক ভোরবেলায় আলাউদ্দিন প্রফেসর জগলুলের ঘরে হাজির হল, তার হাতে সেই খাতা এবং চোখেমুখে এক ধরনের উত্তেজনা। তার চুল উষ্কখুষ্ক এবং চোখের নিচে কালি। দেখে মনে হয় সারারাত ঘুমায় নি। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আসতে পারি স্যার?

প্রফেসর জগলুল ভিতরে ভিতরে কৌতূহলী হয়ে উঠলেও মুখে নিরাসক্ত ভাবটা ধরে

রেখে গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন একটু বিরক্তি এবং অসহিষ্ণুতা ফুটিয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

আলাউদ্দিন এগিয়ে এসে বলল, স্যার মনে আছে আপনি বলেছিলেন—যে থিওরি এক্সপেরিমেন্ট করে পরীক্ষা করা যায় না তার কোনো মূল্য নেই?

প্রফেসর জগলুল হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললেন, বলেছিলাম নাকি? মনে নেই আমার।

জি স্যার। আপনি বলেছিলেন। বলেছিলেন যে থিওরি এক্সপেরিমেন্ট করে প্রমাণ করা যায় না সেটা হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র।

প্রফেসর জগলুল ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হয়েছে তাতে?

আমি স্যার একটা এক্সপেরিমেন্ট বের করেছি। একটা উপায় আছে এক্সপেরিমেন্ট করার।

প্রফেসর জগলুলের হৃৎস্পন্দন প্রায় থেমে গেল। বলে কী ছেলেটা? সাদাসিধে চেহারার এই ছেলেটা বাজে কথার মানুষ না সেটা তিনি এতদিনে বেশ ভালো করে বুঝে গেছেন। সত্যি যদি সে এই তত্ত্বটার এক্সপেরিমেন্ট দাঁড়া করিয়ে থাকে তাহলে একটা নোবেল প্রাইজ কেউ আটকাতে পারবে না। তিনি জ্বলজ্বলে চোখে নিশ্বাস বন্ধ করে আলাউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, এই ছেলেটার কারণে একটা নোবেল প্রাইজ তার ধরাছোঁয়ার ভিতরে চলে এসেছে—সেটা যেন কিছুতেই হাতছাড়া না হয়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা করতে হবে খুব সাবধানে। আলাউদ্দিন যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে। প্রথমে ব্যাপারটা তার কাছ থেকে বের করে আনতে হবে তারপর অন্য কিছু। একবার প্রাইজটা পেয়ে যাবার পর এই ছেলে যতই চেঁচামেচি করুক কেউ বিশ্বাস করবে না। উনিশ–বিশ বছরের একটা ছাত্রের কথা কে বিশ্বাস করবে? যদি সেরকম ঝামেলা দেখা যায় তাহলে অন্য কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। আজকাল টাকা দিয়ে কত কী করে ফেলা যায় আর একজন মানুষকে সরিয়ে দেয়া এমন কী কঠিন ব্যাপার? কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা গরম করে কী হবে? তার জন্যে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

আলাউদ্দিন আবার বলল, স্যার, দেখবেন আমার ক্যালকুলেশানটা?

দেখার জন্যে প্রফেসর জগলুলের সমস্ত শরীর বুক চোখ হা হা করতে থাকে কিন্তু তিনি জোর করে মুখে নিরাসক্ত ভাবটা ধরে রাখলেন, ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমার একটা ক্লাস রয়েছে এখন তো পারব না। যদি চাও তো খাতাটা রেখে যেতে পার, সময় পেলে দেখব।

তাহলে স্যার আপনাকে একটু বলি?

প্রফেসর জগলুল ইচ্ছে করে একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, তার সময় খুব মূল্যবান ব্যাপারটি আলাউদ্দিনকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, কী বলবে তাড়াতাড়ি বল।

স্যার মনে আছে আপনাকে বলছিলাম স্পেস যেরকম ছড়ানো, টাইম বা সময় ঠিক একইভাবে ছড়ানো? এই মুহূর্তে যেরকম অতীত আছে সেরকম বর্তমানও আছে?

আলাউদ্দিন কী বলছে প্রফেসর জগলুলের বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না কিন্তু তিনি না–বোঝার ভান করে বললেন, বলে যাও—

স্পেসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সবসময় খানিকটা সময় অতিক্রম করতে হয়। ঠিক সেরকম এক সময় থেকে অন্য সময় যেতে হলে খানিকটা স্পেস অতিক্রম করতে হবে।

কতটুকু স্পেস?

আলাউদ্দিনের চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। সে নিশ্বাস নিয়ে বলল, বিশাল স্পেস। বিলিয়ন বিলিয়ন মাইল। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আমি ক্যালকুলেশান করে দেখেছি এই স্পেস টাইমের কন্টিনিউয়ামে দুইটা সিংগুলারিটি রয়েছে।

জি স্যার, একটা সিংগুলারিটিতে কখনো যাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে কিন্তু আরেকটায় মনে হয় সহজে যাওয়া যাবে। গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ করে এক্সেলেরেশানটা একটা নির্দিষ্ট টাইমে পাল্টে দিতে হবে, তারপর আবার—

উত্তেজনায় প্রফেসর জগলুলের হৃৎপিণ্ড প্রায় থেমে গেল কিন্তু তিনি আলাউদ্দিনকে কিছু বুঝতে দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছোট হাই তুলে বললেন, বেশ বেশ ভালো এক্সারসাইজ করেছ। এখন একটু পড়াশোনা কর, সামনের সপ্তাহে একটা মিডটার্ম দিয়েছি মনে আছে তো?

আলাউদ্দিনের মুখে স্পষ্ট একটা আশাভঙ্গের ছাপ পড়ল। সে ম্লান মুখে বলল, আমি অনেকবার ক্যালকুলেশানটা দেখেছি, কোনো ভুল নেই স্যার, শুধু এক্সেলেরেশান কন্ট্রোল করে একটা জিনিসকে অল্প একটু ভবিষ্যতে পাঠানো যাবে। একবিন্দু ভবিষ্যৎ কিন্তু সেখান থেকে আর ফিরে আসবে না আর দেখা হবে না—

প্রফেসর জগলুল টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে হেঁটে বের হয়ে যাবার ভান করে বললেন, তোমরা মনে হয় পাঠ্যবই না পড়ে আজেবাজে সায়েন্স ফিকশান পড়। সায়েন্স আর সায়েন্স ফিকশান এক জিনিস না।

খাতাটা রেখে যাব স্যার? একটু দেখবেন স্যার?

ঠিক আছে রেখে যাও। সময় পেলে দেখব। আমার তো তোমাদের মতো সময় নেই কত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় জানই।

প্রফেসর জগলুল ঘর থেকে বের হয়ে আলাউদ্দিনকে চলে যাবার সময় দিয়ে প্রায় সাথে সাথেই ফিরে এসে আলাউদ্দিনের খাতাটার উপরে ঝুঁকে পড়লেন। তার হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করতে থাকে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উত্তেজনায় তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না। একটা নোবেল প্রাইজ তার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, কেউ আর সেটা আটকাতে পারবে না। কেউ না! আলাউদ্দিন যে সিংগুলারিটির কথা বলেছে সেটার নাম হবে জগলুল সিংগুলারিটি! বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাকাপাকিভাবে তার নাম সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যাবে।

বেশ রাতে প্রফেসর জগলুল বাসায় ফিরে যাচ্ছেন, বহুদিনের পুরোনো লক্কড়-ঝক্কড় একটা ভক্সওয়াগন গাড়ি, কোনোমতে এখনো চলছে। আর কয়দিন, তারপর এই তুচ্ছ গাড়ির কথা আর চিন্তা করতে হবে না। কে জানে টাইম নিউজউইক পত্রিকায় এই লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ি নিয়েই তার ছবি ছাপা হবে, বিশাল প্রতিবেদন ছাপা হবে! প্রফেসর জগলুল অন্ধকারে দাঁত বের করে হাসলেন।

ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে প্রফেসর জগলুল ডান দিকে ঘুরে গেলেন। রাস্তাটা খারাপ, তাকে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। গাড়ি চালাতে চালাতে তিনি আলাউদ্দিনের এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবতে লাগলেন, সে যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছে সেটা খুবই সহজ। একটা বস্তুকে নির্দিষ্ট ত্বরণে এগিয়ে নিয়ে ত্বরণকে পরিবর্তন করতে হয়, নির্দিষ্ট সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর আবার। যদি ত্বরণের পরিবর্তনের সাথে সময়ের একটা সামঞ্জস্য রাখা যায় তাহলেই স্পেস টাইমের সেই সিংগুলারিটিতে পা দেয়া যায়, যেটাকে আর কয়দিন পরেই বলা হবে জগলুল সিংগুলারিটি! সেই জগলুল সিংগুলারিটি দিয়ে বস্তু বের হয়ে চলে যায় ভিন্ন জগতে এক চিলতে সময় সামনে। মাত্র এক চিলতে সময় কিন্তু সেই সময়ের সাথে এই সময়ের কোনো যোগাযোগ নেই।

পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে প্রফেসর জগলুল মনে মনে হাসলেন। যখন তিনি পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগলুল সিংগুলারিটির ওপর সেমিনার দেবেন তখন তিনি ব্যাপারটি নিয়ে রসিকতা করবেন। বলবেন, মনে কর কেউ গাড়ি করে যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তা তাই এক্সেলেটরে চাপ দিয়েছে, হঠাৎ দেখল সামনে একটা স্পিড বাম্প। ব্রেক কষার আগেই গাড়ি লাফিয়ে উঠল উপরে, তারপর নেমে আসল নিচে, ধাক্কা খেয়ে গাড়ি চলে গেল বামে, কোনোমতে ব্রেক কষতেই গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে থামতে গেল—হঠাৎ করে দেখবে গাড়ি পা দিয়েছে জগলুল সিংগুলারিটিতে। স্পেস টাইমের ফুটো দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে অন্য জগতে—

হঠাৎ করে প্রফেসর জগলুল চমকে উঠলেন। রাস্তার পাশে দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে আলাউদ্দিন, এক হাতে ধরে রাখা অনেকগুলো বইপত্র, মাথা নিচু করে হাঁটছে—পৃথিবীর কোনো কিছুতে তার কোনো খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। প্রফেসর জগলুলের বুকের ভিতর হঠাৎ রক্ত ছলাৎ করে উঠল, গাড়িটা বাম পাশে ঘেঁষে আলাউদ্দিনকে একটা ধাক্কা দিলে কেমন হয়, ছিটকে পড়বে নিচে, তখন বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে নেবেন গাড়িটা—তার নোবেল প্রাইজের একমাত্র প্রতিবন্ধক শেষ হয়ে যাবে চোখের পলকে।

প্রফেসর জগলুল পিছনে তাকালেন, এই রাস্তাটা নির্জন এমনিতে লোকজন গাড়ি রিকশা থাকে না, আজকে আরো কেউ নেই। আলাউদ্দিনকে শেষ করার এই সুযোগ! পৃথিবীর কেউ জানতে পারবে না। প্রফেসর জগলুলের নিশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে আসে, স্টিয়ারিং হুইল শক্ত করে ধরে রেখে তিনি এক্সেলেটরে চাপ দিলেন। তার লক্কড়-ঝক্কড় ভক্সওয়াগনটি হঠাৎ গর্জন করে ছুটে গেল সামনে, আঘাত করল আলাউদ্দিনকে, দেখতে পেলেন ছিটকে যাচ্ছে সে, ব্রেক কষলেন একবার তারপর স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিতে। পিষে ফেলতে হবে আলাউদ্দিনকে, শেষ করে দিতে হবে একমাত্র সমস্যাটিকে!

কিছু একটাতে তিনি আঘাত করলেন এবং হঠাৎ করে মনে হল তিনি পড়ে যাচ্ছেন। চমকে উঠে তিনি স্টিয়ারিং হুইলটাকে শক্ত করে ধরে রাখলেন। অবাক হয়ে দেখলেন তার সামনে রাস্তা, রাস্তার পাশে দোকানপাট, লাইটপোস্টের হলুদ আলো, রাস্তায় ছিটকে পড়ে থাকা আলাউদ্দিনের শরীর সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারদিকে কুয়াশার মতো এক ধরনের অতিপ্রাকৃত আলো, সেই আলোতে যতদূর দেখা যায় কোথাও কিছু নেই, চারদিকে শুধু শূন্যতা। এক ভয়াবহ শূন্যতা।

প্রফেসর জগলুল কাঁপা হাতে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করতেই এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য নেমে এল। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু তার হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করছে। এই ছোট হৃৎপিণ্ড এত জোরে শব্দ করে কে জানত।

প্রফেসর জগলুল গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে স্থাণুর মতো বসে রইলেন। আলাউদ্দিনকে মারতে গিয়ে তিনি জগলুল সিংগুলারিটিতে পা দিয়ে ফেলেছেন।

পৃথিবীর মানুষ আর কোনোদিন জগলুল সিংগুলারিটির কথা জানতে পারবে না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরন গোলক

উত্তরের এক জনাকীর্ণ শহর থেকে পাঁচ জন তরুণ-তরুণী দক্ষিণের এক উষ্ণ অরণ্যাঞ্চলে বেড়াতে এসেছে। তারা হ্রদের শীতল পানিতে পা ডুবিয়ে বড় বড় পাথরের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। উত্তরের যে জনাকীর্ণ শহর থেকে তারা এসেছে সেই শহরে এখন তুষারভেজা হিমেল বাতাস বইছে হু-হু করে, সেখানে মানুষজন দীর্ঘদিন থেকে শক্ত কংক্রিট ঘরের নিরাপদ উষ্ণতায় বন্দি হয়ে আছে। খোলা আকাশের নিচে হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে এই পাঁচ জন তরুণ-তরুণী এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না তারা প্রকৃতির হিমশীতল ছোবল থেকে এই কোমল উষ্ণতায় সরে এসেছে।

পাঁচ জন তরুণ-তরুণীর মাঝে যে মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী এবং সে সম্পর্কে সবসময় সচেতন তার নাম রিফা। সে পা দিয়ে পানি ছিটিয়ে বলল, কী সুন্দর জায়গাটা দেখেছ? মনে হচ্ছে ধরে কচকচ করে খেয়ে ফেলি।

ক্রিক নামের সবচেয়ে হাসিখুশি ছেলেটি হেসে বলল, রিফা, তোমার সবকিছুতেই একটা খাওয়ার কথা থাকে লক্ষ করেছ?

ক্রিকের কথা শুনে সবাই অকারণে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে থাকে, রিফার গলা উঠল সবার ওপরে। স্বল্পভাষী স্না মাথা নেড়ে বলল, একটা জিনিসকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসলে সেটাকে খাওয়ার সাথে তুলনা করতে হয়। খাওয়া হচ্ছে মানুষের আদি আর অকৃত্রিম ভালবাসা।

শু নামের কোমল চেহারার দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, তাহলে বলতেই হবে রিফার এই জায়গাটি খুব পছন্দ হয়েছে।

রিফা পা দিয়ে আবার পানি ছিটিয়ে আদুরে গলায় বলল, অবশ্যি পছন্দ হয়েছে। তোমার পছন্দ হয় নি?

শু মাথা নেড়ে নরম গলায় বলল, হয়েছে। তোমার মতো কচকচ করে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে কি না জানি না কিন্তু জায়গাটা অপূর্ব। কী নিরিবিলি দেখেছ?

ক্রিক বলল, আমরা সবাই মিলে যেভাবে চিৎকার করছি জায়গাটা কি আর নিরিবিলি আছে?

শু বলল, তা নেই, কিন্তু এই বিশাল প্রকৃতিকে আমরা কয়েকজন চিৎকার করে কি আর জাগাতে পারব? এ রকম একটা জায়গায় এলে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায়।

শুয়ের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল বা এমনিতেই কোনো কারণে হঠাৎ সবাই চুপ করে যায়। শীতল পানিতে পা ডুবিয়ে সবাই চুপচাপ বসে থাকে, হ্রদের তীরে পাইনগাছে বাতাসের সর্‌সর্ শব্দ হতে থাকে, পাখির কিচমিচ ডাক কানে আসে এবং মৃদু বাতাসে হ্রদের পানি ছলাৎ ছলাৎ করে পাথরে এসে আছড়ে পড়তে থাকে।

দীর্ঘ সময় সবাই চুপ করে থাকে এবং এক সময় রিফা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার কী মনে হচ্ছে জান?

শু জিজ্ঞেস করল, কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিফা বলল, আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই বুঝি সেই প্রাচীন যুগের মানুষ হয়ে গেছি। প্রাচীন যুগের মানুষ যেরকম প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকত আমরা বুঝি সেভাবে বেঁচে আছি।

রিফার কথা শুনে স্না হঠাৎ নিচু স্বরে হেসে উঠল। রিফা বলল, কী হল, তুমি হাসছ কেন?

তোমার কথা শুনে হাসছি।

কেন? আমি হাসির কথা কী বলেছি?

তুমি হাসির কথা বল নি? তুমি বলেছ যে তুমি প্রাচীনকালের মানুষের মতো প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছ! প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার মানে কী তুমি জান?

রিফা সরল মুখে জিজ্ঞেস করল, কী?

প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা মানে—ঝড় এসে ঘরবাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, বন্যা এসে সবকিছু ভাসিয়ে নেয়া, ভূমিকম্পে বিশাল জনপদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আমাদের কখনো সেরকম কিছু হয় না, এই শতাব্দীতে আমরা প্রকৃতিকে বশ করে আছি। ঝড় ভূমিকম্প বন্যা ব্লিজার্ড আমাদের স্পর্শও করতে পারে না। শুধু তাই না, আকাশ থেকে একটা উল্কাও পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে না, মহাকাশেই সেটাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

ক্রিক বলল, শুধু কি তাই? এই যে আমরা এক গভীর অরণ্যে হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছি, আমরা কি ভয়ে ভয়ে আছি যে গভীর জঙ্গল থেকে একটা বুনো পশু এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? একটা বিষাক্ত সাপ এসে আমাদের ছোবল দেবে? না, আমাদের মোটেও সেই ভয় নেই! আমাদের ক্যাম্পে যে সনোট্রনটা রয়েছে সেটা প্রতিমুহূর্তে আলট্রাসনিক শব্দ দিয়ে যাবতীয় পশুপাখি জন্তু-জানোয়ারকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমাদের সবার কাছে যে যোগাযোগ মডিউলটা রয়েছে সেটা উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ রাখছে, আমাদের যে-কোনো বিপদে এক ডজন হেলিকপ্টার দুই ডজন বাই ভার্বাল শ দুয়েক রবোট ছুটে আসবে! কাজেই রিফা, হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকা আর প্রাচীন মানুষের মতো প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার মাঝে বিশাল পার্থক্য।

রিফা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে প্রাচীনকালের মানুষদের বেঁচে থাকতে কেমন লাগত।

ক্রিক সরল মুখে হেসে বলল, আমি দুঃখিত রিফা, তুমি সেটা কখনই জানতে পারবে না।

দলের পঞ্চম সদস্য লন সারাক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে স্বল্পভাষী মানুষ নয় কিন্তু বিশাল এক জনাকীর্ণ শহর থেকে হঠাৎ করে প্রকৃতির এত কাছাকাছি এসে সে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছে। বিশাল প্রকৃতি কখন কাকে কীভাবে প্রভাবিত করে বোঝা খুব মুশকিল। সে এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শুনছিল, এবারে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি একটা কথা বলি?

ক্রিক জিজ্ঞেস করল, কী কথা?

রিফা যেরকম বলছে প্রাচীনকালের মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকত তার জানতে খুব ইচ্ছে করে, আমারও সেরকম ইচ্ছে করে। ব্যাপারটি সহজ নয় কিন্তু একেবারে অসম্ভবও তো নয়।

রিফা ঘুরে তাকাল লনের দিকে, চোখ বড় বড় করে বলল, কীভাবে?

লন আঙুল দিয়ে দূর পাহাড়ের একটা চূড়োর দিকে দেখিয়ে বলল, ওই যে চূড়োটা

www.amarboi.com

দেখছ সেটা এখান থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে। চূড়োটার নিচে একটা চমৎকার উপত্যকা রয়েছে। আমরা যদি এখান থেকে ওদিকে যেতে শুরু করি, মনে হয় দুদিনে পৌঁছে যাব। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে আমাদের হেঁটে অভ্যাস নেই তাই—না হয় অনেক আগে পৌঁছে যেতাম।

ক্রিক ভুরু কুঁচকে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছ।

লন একটু হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, আমি বলছি চল আমরা সবাই মিলে পাহাড়ের নিচে সেই উপত্যকাটায় যাই।

ক্রিক মাথা নেড়ে বলল, আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না! আমরা যদি উপত্যকাটায় যাই তাহলে কেন সেটা প্রাচীনকালের মানুষের মতো যাওয়া হবে? আমাদের পায়ের জুতো লেভিটেটিং—প্রয়োজনে আমাদের ভাসিয়ে নিতে পারে, আমাদের জামাকাপড় নিও পলিমারের, তার মাঝে হাই জি সেন্সর রয়েছে, হঠাৎ করে পড়ে গেলে নিজে থেকে রক্ষা করে, আমাদের হেলমেটে—

লন বাধা দিয়ে বলল, আমরা সে সবকিছু রেখে যাব। সাধারণ একজোড়া জুতো পরে, সাধারণ কাপড়ে হেঁটে হেঁটে যাব। সাথে থাকবে কিছু খাবার আর স্লিপিং ব্যাগ। আর কিছু না।

কেউ কোনো কথা না বলে বিস্ফারিত চোখে লনের দিকে তাকিয়ে রইল। রিফা খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, আর কিছু না?

না। সবার কাছে প্রাচীন কোনো অস্ত্র থাকতে পারে। একটা ছোরা বা কুড়াল, এর বেশি কিছু নয়।

যদি বুনো পশু আমাদের আক্রমণ করে?

করার কথা নয়। তবু যদি করে আমরা আমাদের অস্ত্র দিয়ে নিজেদের রক্ষা করব।

যদি পা হড়কে পড়ে যাই? গভীর খাদের মাঝে পড়ে যাই?

তাহলে মরে যাব।

রিফা শিউরে উঠে বলল, মরে যাব?

হ্যাঁ। তাই চেষ্টা করব যেন পা হড়কে পড়ে না যাই। খুব সাবধানে আমরা যাব, একে অন্যকে রক্ষা করে।

যদি কোনো জরুরি প্রয়োজন হয়? আমাদের কমিউনিকেশান মডিউল—

না, আমাদের কাছে কমিউনিকেশান মডিউলও থাকবে না। এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারব না। যদি জরুরি কোনো প্রয়োজন হয় আমাদের নিজেদের সেই প্রয়োজন মেটাতে হবে। প্রাচীনকালের মানুষেরা যেভাবে মেটাত।

সবাই চুপ করে লনের দিকে তাকিয়ে রইল, কেউ বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত শু বলল, লন যেটা বলেছে সেটা স্রেফ পাগলামি, এর ভিতরে কোনো যুক্তি নেই এবং কাজটা হবে পরিষ্কার গোঁয়ার্তুমি। আমাদের ভিতরে যে-কেউ মারা পড়তে পারে এবং আমি নিশ্চিত কাজটা বেআইনি। একে অপরের জীবনের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে আমি তবু এটা করতে চাই। আমি সবকিছু ছেড়েছুড়ে শুধুমাত্র একটা প্রাচীন অস্ত্র হাতে নিয়ে ওই পাহাড়ের পাদদেশে যেতে চাই।

রিফা ভয় পাওয়া চোখে শুয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যেতে চাও?

হ্যাঁ।

যদি— যদি কোনো বিপদ হয়?

সেটা দেখার জন্যেই যাওয়া।

রিফা কী একটা বলতে চাইছিল, তাকে বাধা দিয়ে ক্রিক বলল, আমিও যেতে চাই।

রিফা ঘুরে তাকাল ক্রিকের দিকে, তুমিও যেতে চাও?

হ্যাঁ। ক্রিক একটু হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, কাজটা সম্পূর্ণ বেআইনি কিন্তু আমি তবু করে দেখতে চাই। এই যুগে আমাদের জীবন খুব বেশি ছকে বাঁধা—একটা বড়ধরনের বৈচিত্র্য মনে হয় মন্দ হবে না।

স্না পানিতে তার পা নাড়িয়ে বলল, আমিও করে দেখতে চাই। আর তোমরা এটাকে যেটুকু বিপজ্জনক বা বেআইনি ভাবছ এটা সেরকম বিপজ্জনক বা বেআইনি নয়। আমরা যে এটা করছি সেটা কেউ না জানলেই হল।

লন মাথা নাড়ল, তা ঠিক।

আর আমরা সবাই যদি কাছাকাছি থাকি তাহলে কোনো বড় ধরনের ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। আমাদের হয়তো কষ্ট হবে, শারীরিক পরিশ্রম হবে কিন্তু বিপদ হবে না।

লন মাথা নাড়ল, স্না ঠিকই বলেছে।

শু এবার ঘুরে তাকাল রিফার দিকে, রিফা, তুমি ছাড়া আর সবাই রাজি।

রিফা শুকনো মুখে বলল, আমার এখনো ভয় ভয় করছে। কিন্তু তোমরা সবাই যদি রাজি থাক তাহলে আমিও যাব। অবশ্যি যাব।

সাথে সাথে দলের অন্য সবাই একসাথে আনন্দধ্বনি করে ওঠে।

পুরো দলটি ঘণ্টাখানেকের মাঝে প্রস্তুত হয়ে নেয়। নিরাপত্তার আধুনিক সকল সরঞ্জাম রেখে দিয়ে তারা প্রাচীনকালের মানুষের মতো অল্প কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হয়। তাদের পিঠের ব্যাকপেকে থাকে খাবার, স্লিপিং ব্যাগ আর কিছু কাপড়। তাদের হাতে থাকে প্রাচীন অস্ত্র, একটি কুড়াল, কয়েকটি ছোরা এবং কিছু বড় লাঠি। ছোট দলটি হ্রদের তীর ধরে হেঁটে হেঁটে উপরে উঠে যেতে থাকে। প্রথমে তাদের বুকের মাঝে জমে থাকে এক ধরনের আতঙ্ক, খুব ধীরে ধীরে তাদের সেই আতঙ্ক সরে গিয়ে সেখানে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস এসে ভর করে। তারা হ্রদটিকে ঘিরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে, লতাগুল্ম কেটে কেটে অরণ্যের গভীরে যেতে থাকে। যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, একটা খোলা জায়গায় শুকনো গাছের ডাল লতা পাতা জড়ো করে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিশাল অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে সবাই গোল হয়ে বসে থাকে, ব্যাকপেক থেকে খাবার বের করে আগুনে ঝলসে ঝলসে খেতে থাকে। তাদের চেহারায় এক ধরনের ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে আসে কিন্তু তাদের চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে থাকে। তারা কথা বলে নিচু স্বরে এবং ক্রমাগত চকিত দৃষ্টিতে এদিক–সেদিক তাকাতে থাকে। গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে নিশাচর পশুর ডাক শুনতে শুনতে তারা নিজেদের বুকের ভিতরে রহস্য এবং আতঙ্কের এক বিচিত্র অনুভূতি অনুভব করতে থাকে। রাত্রিবেলা তারা পালা করে ঘুমায় এবং কেউই সত্যিকার অর্থে ঘুমাতে পারে না এবং একটু পরে পরে তারা চমকে চমকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

ভোরবেলা সূর্যের প্রথম আলোকে পুরো দলটির মাঝে এক ধরনের উৎসাহের সঞ্চার হয়, তারা কোনোরকম সাহায্য ছাড়া একা একা গভীর অরণ্যে রাত কাটিয়েছে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। পরের দিনের পথ ছিল আরো দুর্গম কিন্তু কোনো একটি অজ্ঞাত

কারণে পুরো দলটির কাছে সেটি আর দুর্গম বলে মনে হয় না। প্রবল আত্মবিশ্বাসে তারা নিজেদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে, ঝোপঝাড়ে লেগে তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে আসে, অসহনীয় পরিশ্রমে তাদের দেহ অবশ হয়ে আসে তবুও তারা কোনো একটি অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় হেঁটে যেতে থাকে।

তারা যখন তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাল তখন বেলা ডুবে গেছে। ক্লান্তিতে তখন আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কোনোভাবে একটা আগুন জ্বালিয়ে সবাই জড়াজড়ি করে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এবং অল্প কিছু খেয়ে যখন তাদের মাঝে খানিকটা শক্তি ফিরে এল তখন আবার তারা কথাবার্তা বলতে শুরু করে। গরম একটা পানীয় চুমুক দিয়ে খেতে খেতে রিফা বলল, আমরা সত্যিই তাহলে করেছি!

ক্রিক মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, করেছি।

কোনোরকম সাহায্য ছাড়া আমরা গত দুদিন থেকে হাঁটছি। একেবারে প্রাচীনকালের মানুষের মতো!

শু রিফার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, একেবারে প্রাচীনকালের মানুষের মতো! শরীরের শক্তিই হচ্ছে সবকিছু।

ক্রিক মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, কোনো যন্ত্রপাতি নেই, কোনো প্রযুক্তি নেই, শুধুমাত্র আমাদের শক্তি! আমাদের সাহস।

রিফা তার গরম পানীয়টিতে চুমুক দিয়ে বলল, ব্যাপারটা আসলে খারাপ নয়। আমার তো মনে হচ্ছে বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার। যন্ত্রপাতি থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না বলে একে অন্যকে সাহায্য করতে হয়, নিজেদের মাঝে কী সুন্দর একটা পরিবার পরিবার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্বল্পভাষী স্না মাথা নাড়ল, বলল, ঠিকই বলেছ। প্রাচীনকালের সমাজের খুঁটি সেজন্যে খুব শক্ত ছিল। এখন সেরকম পাওয়া খুব সহজ নয়।

রিফা সামনের বিশাল আগুনের কুণ্ডলীটাতে এক টুকরা শুকনো কাঠ ছুড়ে দিয়ে বলল, এখানে এসে আমার যে কী ভালো লাগছে তোমাদের বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছে সবকিছু কচকচ করে খেয়ে ফেলি!

দলের অন্য সবাই এক ধরনের স্নেহের চোখে রিফার দিকে তাকাল, মেয়েটির মাঝে এক ধরনের নির্দোষ সারল্য আছে যেটা প্রায় সময়েই খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়।

গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমানোর আয়োজন করছে তখন হঠাৎ লন সবার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হয়েছে।

ক্রিক কৌতূহলী চোখে বলল, কী কথা?

আমরা বলাবলি করছি যে আমরা গত দুদিন প্রাচীনকালের মানুষের মতো বেঁচে আছি।

হ্যাঁ। কী হয়েছে তাতে?

কথাটা সত্যি নয়।

সত্যি নয়? কেন?

আমাদের সবার কাছে একটা জিনিস রয়েছে যেটা প্রাচীনকালের মানুষের কাছে ছিল না।

কী?

অনুরন গোলক।

রিফা ভুরু কুঁচকে বলল, অনুরন গোলকের সাথে এর কী সম্পর্ক?

আছে, সম্পর্ক আছে। অবশ্যি আছে।

কীভাবে আছে?

বলছি শোন। লন আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের গত দুদিনের কথা চিন্তা কর, আমরা কী করেছি?

হেঁটে হেঁটে এসেছি।

হ্যাঁ। লন মাথা নেড়ে বলল, অত্যন্ত দুর্গম একটা পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসেছি। যখন রিফা খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন আমরা কী করেছি?

রিফার মালপত্র অন্যেরা ভাগাভাগি করে এনেছি।

হ্যাঁ। আমরা কেউ কি রিফার ওপরে বিরক্ত হয়েছি?

শু একটু অবাক হয়ে বলল, বিরক্ত কেন হব?

হওয়ার কথা। প্রাচীনকালের মানুষ হলে বিরক্ত হত। রাগ হত। যে দুর্বল তাকে সবাই ত্যাগ করে যেত। যারা সবল তারা একে অন্যের সাথে নেতৃত্ব নিয়ে যুদ্ধ করত। প্রয়োজনে তারা স্বার্থপর হত। কিন্তু আমরা হই না। জন্মের পরই আমাদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে আমাদের সবার শরীরে প্রয়োজনমাফিক নির্দিষ্ট অনুরন গোলক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা তাই অন্যরকম মানুষ। আমাদের মাঝে রাগ নেই, হিংসা নেই, আমাদের মাঝে লোভ নেই। আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি। একজন মানুষ এমনিতে যেটুকু ভালো হওয়ার কথা, আমরা তার থেকে অনেক বেশি ভালো। গত শতাব্দী থেকে পৃথিবীতে মানুষ যুদ্ধ করে নি, একে অন্যকে শোষণ করে নি—তার কারণ হচ্ছে অনুরন গোলক। মানুষের মাঝে যেটুকু সীমাবদ্ধতা আছে সব সরিয়ে নিয়েছে এই অনুরন গোলক।

ক্রিক তীক্ষ্ণ চোখে লনের দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে তুমি বলছ আমরা এখনো প্রাচীনকালের মানুষের অনুভূতির খোঁজ পাই নি?

না। ব্যাপারটা সেই বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে, যখন মানুষ আবিষ্কার করেছে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব আসলে তার মস্তিষ্কের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া—বিশেষ ওষুধ দিয়ে সেই বিক্রিয়ার পরিবর্তন করা যায়, যেই মানুষ বদ্ধ উন্মাদ তাকে সুস্থ করে দেয়া যায়, যেই মানুষ বিষণ্ণতায় ভুগছে তাকে উৎফুল্ল করে দেয়া যায়, তখন থেকে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পাল্টে দেয়া শুরু হয়েছে। মানুষের সব সীমাবদ্ধতা সরিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে। আমরা প্রাচীনকালের মানুষ থেকে অনেক ভিন্ন, অনেক যত্ন করে আমাদের প্রস্তুত করা হয়। এই শতাব্দীতে কোনো উন্মাদ নেই, খুনে নেই, খ্যাপা নেই, স্কিতজোফেনিয়া রোগী নেই—

রিফা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তার মানে আমাদের এই কষ্ট এই পরিশ্রম সব অর্থহীন? আসলে আমরা জানি না প্রাচীনকালের মানুষের অনুভূতি কী রকম?

লন একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ রিফা। আমরা জানি না প্রাচীনকালের মানুষের অনুভূতি কী রকম। আমাদের জায়গায় তারা থাকলে এতক্ষণে হয়তো ঝগড়া করত, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করত, নিষ্ঠুরতা করত—তোমাকে নিয়ে মারামারি করত—

আমাকে নিয়ে?

হ্যাঁ। প্রাচীনকালে সুন্দরী নারী নিয়ে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে!

রিফা একটু হতচকিতভাবে লনের দিকে তাকাল এবং অন্য সবাই শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দ থেমে আসতেই স্না একটু এগিয়ে এসে বলল, আমি একটা কথা বলি?

কী কথা?

আমরা গত দুদিন একটা অস্বাভাবিক কাজ করছি। ঠিক প্রাচীনকালের মানুষের মতো আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছি। এই কাজটা কি আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি?

রিফা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, কীভাবে?

আমাদের শরীরে যে অনুরন গোলক রয়েছে সেটা বের করে ফেলি।

স্নার কথা শুনে সবাই চমকে উঠে তার দিকে তাকাল, স্নার মুখ পাথরের মতো শক্ত। সে ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করছে না, সত্যিই বলছে।

রিফা এক ধরনের আতঙ্কিত মুখে বলল, কী বলছ স্না?

ঠিকই বলছি। এই আমাদের সুযোগ। বিশাল এক পাহাড়ের আড়ালে আমরা একত্র হয়েছি। মানুষজন সভ্যতা থেকে বহুদূরে! এখন আমরা আমাদের শরীর থেকে অনুরন গোলক বের করে সত্যি সত্যি প্রাচীনকালের মানুষ হয়ে যেতে পারি। যখন আমাদের মস্তিষ্কে অনুরন গোলক থেকে জৈব রসায়ন যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা আস্তে আস্তে আমাদের সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাব! কেউ হয়তো বের হব হিংসুটে, কেউ রাগী, কেউ অসৎ—

রিফা এক ধরনের আহত দৃষ্টি নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু কেন আমরা আমাদের ভিতরের খারাপ দিকটা বের করে আনব?

স্না মাথা নেড়ে বলল, খারাপ দিকটা বের করে আনব না রিফা, সত্যিকারের ব্যক্তিত্বটা বের করে আন। আর সেটা যে খারাপই হবে কে বলেছে? হয়তো দেখা যাবে কেউ একজন সামান্য একটু গোমড়ামুখী, কেউ একজন একটু বেশি লাজুক, কেউ একজন বেশি কথা বলে! এর বেশি কিছু নয়।

ক্রিক একটু এগিয়ে এসে বলল, কিন্তু তুমি শরীর থেকে অনুরন গোলক বের করবে কেমন করে? সেটা তো অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা গোলক, শরীরের মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া হয়!

স্না একটু হেসে বলল, আমি হাসপাতালে কাজ করি, একজন শিশু জন্মানোর পর তার শরীরে প্রথম অনুরন গোলকটি আমি প্রবেশ করিয়ে থাকি। আমি জানি হাতের কনুইয়ের কাছে এটা স্থির হয়। ছোট একটা চাকু থাকলে আমি দুই মিনিটে অনুরন গোলকটা শরীর থেকে বের করে আনতে পারি।

সত্যি?

সত্যি। দেখতে চাও?

কেউ কোনো কথা না বলে চুপ করে স্থির দৃষ্টিতে স্নার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্না আবার বলল, আমরা এটা তো পাকাপাকিভাবে করছি না, যখন লোকালয়ে ফিরে যাব তখন আবার আমরা ঠিক ঠিক অনুরন গোলক শরীরে প্রবেশ করিয়ে নেব, আবার আমরা আগের মতো হয়ে যাব।

শু একটু এগিয়ে এসে বলল, এটা পাগলামি এবং গোঁয়ার্তুমি। এর মাঝে বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই। আমার ধারণা ব্যাপারটার মাঝে বেশ খানিকটা বিপদ রয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি মানুষটা আসলে কী রকম আমার খুব জানার কৌতূহল হচ্ছে! তোমরা কে কী করবে জানি না, আমি আমার অনুরন গোলক বের করে নিয়ে আসছি।

শু এক পা এগিয়ে তার হাতটা স্নার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ব্যথা লাগবে না তো?

স্না পকেট থেকে চাকুটা বের করে বলল, তোমার চামড়াটা একটু কেটে ভিতর থেকে

গোলকটা বের করতে হবে, দুই ফোঁটা রক্ত বের হবে, একটু ব্যথা তো লাগবেই। মাটিতে বসে শুয়ের হাতটা চেপে ধরে কনুইয়ের কাছাকাছি একটা জায়গা হাত দিয়ে অনুভব করে অনুরন গোলকটির অবস্থানটা বের করে নেয়, তারপর চাকুর ধারালো ফলাটি দিয়ে খুব সাবধানে একটুখানি চিরে ফেলে, শু যন্ত্রণায় একটা শব্দ করে দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরল। স্না সাবধানে হাত দিয়ে জায়গাটা অনুভব করে কোথায় চাপ দিতেই টুক করে ক্ষুদ্র একটা গোলক বের হয়ে আসে। গোলকটি ছোট বালুর কণার মতো, স্না সেটাকে হাতের তালুতে নিয়ে শু'কে দেখিয়ে বলল, এই দেখ তোমার অনুরন গোলক।

শু তার কাটা জায়গায় হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে শুরু করে। সবাই একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, ক্রিক বলল, কী হল? হাসছ কেন?

শু হাসতে হাসতে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, জানি না হঠাৎ কেন জানি হাসি পেয়ে গেল। এইটুকু একটা জিনিস নিয়ে এত হইচই, হাসি পাবে না?

শু হঠাৎ আবার খিলখিল করে হাসতে থাকে।

স্না হাতের তালুর মাঝে রাখা অনুরন গোলকটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মনে হয় শুয়ের ব্যক্তিত্ব পাল্টে যাচ্ছে। সে মোটামুটি জ্ঞানগম্ভীর মহিলা থেকে তরলমতি বালিকায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

শু হাসি থামিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি?

তাই তো মনে হচ্ছে!

তুমি মনে হয় ঠিকই বলছ। আমার কেন জানি সবকিছুকেই মজার জিনিস বলে মনে হচ্ছে।

ক্রিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি তোমার ভিতরে কোনো ধরনের পরিবর্তন অনুভব করছ শু?

করছি! মনে হচ্ছে তোমরা সব বুড়ো মানুষের মতো গম্ভীর! মনে হচ্ছে তোমরা সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ, কোনোকিছু সহজভাবে নিতে পারছ না! মনে হচ্ছে জীবনটা এত গুরুত্ব দিয়ে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই! জীবনটা হচ্ছে স্ফূর্তি করার জন্যে!

সবাই শুয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনটি অত্যন্ত স্পষ্ট, হঠাৎ করে সে একটি ছেলেমানুষ চপলমতি বালিকায় পাল্টে গেছে। তাকে দেখে সবার এক ধরনের হিংসে হতে থাকে! ক্রিক এগিয়ে গিয়ে বলল, স্না, এবারে আমার অনুরন গোলকটি বের করে দাও!

শু ক্রিকের কথা শুনে আনন্দে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছেলেমানুষের মতো তার পিঠ চাপড়ে বলল, এই তো চাই! দেখি তোমার ভিতরে কী লুকিয়ে আছে। একটি তেজস্বী সিংহ নাকি একটা ধূর্ত ইঁদুর।

স্না ঠিক আগের মতো যত্ন করে ক্রিকের কনুইয়ের কাছের চামড়াটি চিরে অনুরন গোলকটি বের করে আনে। সাবধানে সেটি ক্রিকের হাতের তালুতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কেমন লাগছে ক্রিক?

সবাই ঝুঁকে পড়ে ক্রিকের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রিক শুকনো মুখে বলল, একটু ভয় ভয় লাগছে!

ভয়?

হ্যাঁ।

ঠিক তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে একটা নিশাচর পাখি উড়ে গেল, ক্রিক চমকে

উঠে স্নাকে জড়িয়ে ধরে ফ্যাকাশে মুখে বলল, কী ওটা? কী?

শু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আমাদের ক্রিক মূষিক শাবকে পাল্টে গেছে! মূষিক শাবক!

ক্রিক ফ্যাকাশে মুখে বলল, সত্যিই আমার ভয়টা হঠাৎ বেড়ে গেছে। কেন জানি শুধু ভয় ভয় করছে।

স্না সাবধানে ক্রিকের শরীর থেকে বের করা অনুরন গোলকটি হাতে নিয়ে বলল, তোমার কি বেশি ভয় করছে? তাহলে এটা আবার তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারি।

ক্রিক মাথা নাড়ল, না, থাক! এটা আমার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা অনুভূতি। আমি একটু দেখতে চাই। তোমরা শুধু আমার কাছাকাছি থেকো, একটু শব্দ হলেই কেন জানি আঁতকে উঠছি।

ক্রিকের পর লনের শরীর থেকে তার অনুরন গোলকটি বের করা হল। লন এমনিতে চুপচাপ ভালো মানুষ কিন্তু অনুরন গোলকটি বের করার সাথে সাথে সে কেমন জানি তিরিক্ষে মেজাজের হয়ে গেল। যদিও সে নিজেই সবাইকে এখানে নিয়ে আসার পরিকল্পনাটি দিয়েছে কিন্তু সে এখন এই ব্যাপারটি নিয়েই অসম্ভব বিরক্ত হয়ে উঠে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সবাইকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। অনুরন গোলকের কারণে মানুষের মাঝে থেকে রূঢ় ব্যবহার মোটামুটিভাবে উঠে গেছে। ব্যাপারটি সবার কাছে এত বিচিত্র মনে হতে থাকে যে লনের রূঢ় ব্যবহারে কেউ কিছু মনে করে না, বরং বলা যেতে পারে সবাই ব্যাপারটি উপভোগ করতে শুরু করে!

রিফা তার অনুরন গোলক বের করতে রাজি হল না, হাতের এক চিলতে চামড়া কেটে শরীরের ভিতর থেকে গোলকটি বের করার কথা চিন্তা করতেই তার নাকি শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। স্নার পক্ষে তার নিজের অনুরন গোলকটি বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কাজেই তাকে অন্যেরা সাহায্য করল। অভিজ্ঞতার অভাব বলে তার হাতের ক্ষতটি হল একটু গভীর এবং রক্তপাত বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হল।

স্নার ভিতরে পরিবর্তনটি হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তার ভিতরে এক ধরনের বিষণ্ণতা এসে ভর করল। সে এমনিতেই স্বল্পভাষী, অনুরন গোলকটি বের করার পর সে আরো স্বল্পভাষী হয়ে গেল। সে বিষণ্ন চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপচাপ বসে রইল। শু খানিকক্ষণ স্নাকে হাসিখুশি করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে রিফার দিকে মনোযোগ দিল। তাকে বলল, রিফা, আমরা সবাই আমাদের অনুরন গোলক বের করেছি। তোমাকেও বের করতে হবে।

আমার ভয় করে। রক্ত দেখলে আমার খুব ভয় করে।

দু ফোঁটা রক্ত দেখে ভয় পাবার কী আছে? আর যদি ভয় করে তাহলে চোখ বন্ধ করে থেকো।

রিফা জোরে জোরে মাথা নাড়ে, বলে, না, না, আমাকে ছেড়ে দাও!

লন খানিকক্ষণ রুষ্ট দৃষ্টিতে শু এবং রিফার দিকে তাকিয়েছিল, এবার মুখ বিকৃত করে ধমকে উঠে বলল, রিফা, তুমি পেয়েছটা কী? সবাই যদি তাদের অনুরন গোলক বের করতে পারে, তুমি পারবে না কেন?

ক্রিক নরম গলায় বলল, হ্যাঁ, রিফা, তুমিও বের কর, আমাদের খুব দেখার ইচ্ছে করছে আসলে তুমি কী রকম।

স্না কোনো কথা না বলে রিফার দিকে তাকিয়ে রইল। শু বলল, রিফা, রাজি হয়ে

যাও। তোমার অনুভূতি যদি ভালো না লাগে সাথে সাথে অনুরন গোলকটি শরীরে ঢুকিয়ে দেব!

রিফা একটা নিশ্বাস ফেলে তার হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, বের কর। ব্যথা দিও না কিন্তু আমাকে।

স্না মাথা নেড়ে বলল, চিমটির মতো একটু ব্যথা পাবে তুমি। কিছু বোঝার আগেই তোমার অনুরন গোলক বের হয়ে আসবে।

স্না তার ধারালো চাকু দিয়ে সাবধানে এক চিলতে চামড়া চিরে রিফার গোলকটি বের করে আনে। রিফা দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল, এবারে সাবধানে বুকের ভিতর থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দেয়। স্না জিজ্ঞেস করল, তোমার কেমন লাগছে রিফা।

রিফা মুখ তুলে তাকাল, বলল, একটু অন্যরকম লাগছে কিন্তু কী রকম বুঝতে পারছি না।

রাগ? দুঃখ? আনন্দ?

না সেসব কিছু না। রিফা মাথা নাড়ল, একটু অন্যরকম।

কী রকম?

রিফা মুখ তুলে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, খুব সুন্দর একটা গান শুনলে বুকের মাঝে যেরকম কাঁপুনি হয় সেরকম একটা কাঁপুনি হচ্ছে। এক রকমের উত্তেজনা!

উত্তেজনা?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে কিছু একটা কচকচ করে খেয়ে ফেলি!

শু আবার খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, সব সময় তোমার কচকচ করে কিছু একটা খেতে ইচ্ছে করে। খাওয়া ছাড়াও যে পৃথিবীতে অন্য কিছু থাকতে পারে তুমি জান?

রিফা লজ্জা পেয়ে একটু হাসল, বলল, কিছু একটা ভালো লাগলেই আমার কচকচ করে খেতে ইচ্ছে করে!

স্না রিফার অনুরন গোলকটি হাতের তালুতে ধরে রেখেছিল, এবারে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, রিফা, তোমার গোলকটি কি বাইরে রাখবে নাকি আবার তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দেব?

থাকুক। বাইরে থাকুক। একটা রাত আমরা কাটাই অনুরন গোলক ছাড়া।

ক্রিক মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ কাল ভোরে আবার আমরা আগের মানুষ হয়ে যাব। ভয়ে ভয়ে থাকতে আমার বেশি ভালো লাগছে না।

শু ক্রিকের কথা শুনে আবার খিলখিল করে হাসতে শুরু করে।

পাঁচ জনের ছোট দলটি আগুনকে ঘিরে বসে নিচু গলায় গল্প করতে থাকে। প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে একটা পরিবর্তন হয়েছে। তারা কেউ আর আগের মানুষ নেই, সবারই যেন একটা নতুন ব্যক্তিত্ব! কথা বলতে বলতে তারা হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠছিল, একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল! নিজেদের ভিতরেও তারা বিচিত্র সব অনুভূতির খোঁজ পেতে থাকে যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

ছোট দলটির সবাই খুব ক্লান্ত—তবুও তাদের ঘুমোতে দেরি হয়। দীর্ঘ সময় তারা তাদের স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে ছটফট করে একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

গভীর রাতে হঠাৎ রিফার ঘুম ভেঙে গেল, কিছু একটা নিয়ে তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিছু একটা তার করার ইচ্ছে করছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না সেটা কী। রিফা

AMARBOI.COM

দীর্ঘ সময় আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর সে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে আসে। আগুনের পাশে গুটিসুটি মেরে সবাই ঘুমোচ্ছে, সে তার মাঝে ইতস্তত হাঁটতে থাকে। এক পাশে তাদের ব্যাকপেকগুলো রাখা আছে, তাদের জামাকাপড় জুতো খাবারদাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তার পাশে তাদের অস্ত্রগুলো—একটা কুড়াল, কয়েকটা ছোরা। হঠাৎ রিফার সমস্ত শরীরে এক ধরনের শিহরন বয়ে গেল। সে কী করতে চাইছে হঠাৎ করে সে বুঝতে পেরেছে। কোনো সন্দেহ নেই আর—সে জানে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত চেতনা সমস্ত অনুভূতি হঠাৎ করে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে হেঁটে সে ধারালো কুড়ালটি হাতে তুলে নেয়। সে জানে ঘুমন্ত চার জন মানুষের বুক কেটে তাদের হৃৎপিণ্ড বের করে আনতে হবে। কচকচ করে কী খেতে হবে হঠাৎ করে মনে পড়েছে তার। অনুরন গোলক এতদিন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, হঠাৎ করে তার চেতনা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন আর তার কোনো দ্বিধা নেই। কোনো শঙ্কা নেই।

রিফা দু হাতে শক্ত করে কুড়ালটি ধরে ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আগুনের আভায় তার অপূর্ব সুন্দর মুখটি চকচক করতে থাকে। সেখানে বিচিত্র একটা হাসি খেলা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় নয় শূন্য তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

রিশান পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল, যতদূর চোখ যায় ততদূর বিস্তৃত এক বিশাল অরণ্য, সবুজ দেবদারু গাছ ঝোপঝাড় লতাগুল্ম জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। উপর থেকে এই বিশাল অরণ্যরাজিকে মনে হচ্ছে একটি সবুজ কার্পেট, কেউ যেন নিচে গভীর উপত্যকায় খুব যত্ন করে বিছিয়ে রেখেছে। দূরে পর্বতমালার সারি, প্রথমে গাঢ় নীল, তার পিছনে হালকা নীল, আরো দূরে ধূসর রং হয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। কাছাকাছি উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় সাদা খানিকটা মেঘ আটকা পড়ে আছে, এ ছাড়া আকাশে কোথাও কোনো মেঘের চিহ্ন নেই, স্বচ্ছ নীল রঙের আকাশ যেন পৃথিবীকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। পাহাড়ের পাদদেশে যে বুনো নদীটি পাথর থেকে পাথরে ভয়ঙ্কর গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, এই চূড়ো থেকে সেই নদীটিকেই মনে হচ্ছে একটি শান্ত স্রোতধারা। চারদিকে এক ধরনের আশ্চর্য নীরবতা, কান পাতলে গাছের পাতার মৃদু শব্দ, ঝরনার ক্ষীণ গুঞ্জন বা বন্য পাখির অস্পষ্ট কলরব শোনা যায়। কিন্তু সেসব পাহাড়ের চূড়ায় এই আশ্চর্য নীরবতাকে স্পর্শ করে না। রিশান প্রকৃতির প্রায় এই নির্লজ্জ সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সে গ্রহ থেকে গ্রহে, উপগ্রহ থেকে উপগ্রহে ঘুরে বেড়িয়েছে, মহাকাশের গভীরে হানা দিয়েছে, সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে পার হয়ে গেছে; কিন্তু নিজের পৃথিবীর এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের দিকে কখনো চোখ মেলে তাকায় নি। মাটির পৃথিবীতে যে এত রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানত?

রিশান ঘাড় থেকে তার ছোট ঝোলাটি নামিয়ে রেখে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে সে জীবনের বড় অংশ পাড়ি দিয়ে এসেছে সেই প্রাণশক্তি কি এখন অকুলান হতে শুরু করেছে? বুকের ভিতরে কোথায় যেন এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে, এক ধরনের অপূর্ণতা এক ধরনের চাপা অভিমান কোথায় জানি যন্ত্রণার মতো জেগে উঠতে শুরু করে। মনে হতে থাকে জীবনের সব চাওয়া পাওয়া সব সাফল্য ব্যর্থতা আসলে অর্থহীন। এই নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় প্রাচীন একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে–থেকেই বুঝি জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে হয়।

রিশান একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে তার পা দুটি ছড়িয়ে দিল, আর ঠিক তখন তার হাতের কব্জিতে বাঁধা যোগাযোগ মডিউলটিতে একটা মৃদু কম্পন আর সাথে সাথে উচ্চ কম্পনের একটা তীক্ষ্ণ কিন্তু নিচু শব্দ শোনা যায়। রিশান মডিউলটির দিকে তাকাল। একটি লাল আলো নিয়মিত বিরতি দিয়ে জ্বলছে এবং নিভছে, কেউ একজন তার সাথে কথা বলতে চায়। উপরের লাল বোতামটি স্পর্শ করে সে ইচ্ছে করলেই কথা বলার অনুমতিটি প্রত্যাখ্যান করতে পারে; কিন্তু তার দীর্ঘদিনের সুশৃঙ্খল জীবনের অভ্যাস তাকে লাল বোতামটি স্পর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে দিল না, সে নিচু গলায় অনুমতি দিল। সাথে সাথে তার চোখের সামনে ত্রিমাত্রিক একটি ছবি ভেসে আসে, সুসজ্জিত অফিসঘরে সুদৃশ্য ডেস্কের সামনে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ উবু হয়ে বসে আছে। মানুষটির মুখ ভাবলেশহীন, শুধুমাত্র হাতের উপর লাল তারাটি বুঝিয়ে দিচ্ছে সে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। নির্জন পাহাড়ের চুড়োয় হলোগ্রাফিক এই দৃশ্যটি এত বেমানান দেখাতে থাকে যে রিশান প্রায় নিজের অজান্তেই মাথা নাড়তে শুরু করে। সরকারি কর্মচারীটি মাথা ঘুরিয়ে রিশানকে দেখতে পেল এবং সাথে সাথে তার ভাবলেশহীন মুখে বিস্ময়ের একটা সূক্ষ্ম ছাপ পড়ে। মানুষটি অভিবাদন করে যখন কথা বলল তার কণ্ঠস্বরে কিন্তু বিস্ময়টুকু প্রকাশ পেল না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, রিশান, আমি মহাজাগতিক কেন্দ্রের মূল দফতর থেকে বলছি, একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন। তোমার হাতে কি সময় আছে?

এটি একটি সৌজন্যমূলক কথা, রিশান খুব ভালো করে জানে তার সময় না থাকলেও এখন কথা বলতে হবে। সে মানুষটির চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, কী কথা?

কয়েকদিনের মাঝে কিছু মহাকাশচারী একটি তথ্যানুসন্ধানী মিশনে যাচ্ছে। গুরুত্ব মাত্রায় পঞ্চম স্তরের অভিযান। বিশেষ কারণে মহাকাশচারীদের মাঝে একটু রদবদল করা হয়েছে। সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে যার যাবার কথা ছিল তাকে অপসারণ করে সেখানে তোমাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আমাকে?

হ্যাঁ।

আমি পঞ্চম মাত্রার অভিযানের উপযুক্ত মহাকাশচারী নই।

তুমি যদি রাজি থাক সদর দফতর থেকে তোমাকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সনদ দেয়া হবে।

AMARBOI.COM

রিশান উচ্চপদস্থ এই সরকারি কর্মচারীটির দিকে তাকাল। মানুষটি সম্ভবত সুদর্শন, কিন্তু হলোগ্রাফিক ছবিতে কিছু একটা অবাস্তব ব্যাপার রয়েছে যার কারণে মানুষের চেহারার সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো কখনো ঠিক করে ধরা পড়ে না। মানুষটি উত্তরের অপেক্ষায় তার দিকে তাকিয়ে আছে, যদিও সম্ভবত সে খুব ভালো করেই জানে সে কী বলবে। পঞ্চম স্তরের অভিযানে যাওয়ার সৌভাগ্য খুব কম মহাকাশচারীর জীবনেই এসেছে, স্বেচ্ছায় কেউ কখনো সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মনে হয় না। রিশানের হঠাৎ ইচ্ছে হল সে মাথা নেড়ে বলবে, না আমি যেতে চাই না। হাতে লাল তারা লাগানো এই মানুষটি তখন নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে তাকাবে তারপর ইতস্তত করে বলবে, কেন তুমি যেতে চাও না? রিশান তখন খুব সরল মুখ করে বলবে, আমি গ্রহ থেকে গ্রহে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমার এখন বিশ্রাম দরকার। আমি এই নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় একা একা বসে বহুদূরে দেবদারু গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই। বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে ঝরনার পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে চাই। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখতে চাই। যখন অন্ধকার নেমে আসবে তখন তাপনিরোধক পোশাকে নিজেকে মুড়ে ফেলে আকাশের নক্ষত্র গুনতে চাই।

কিন্তু রিশান সেসব কিছু বলল না। তার সুদীর্ঘ সুশৃঙ্খল জীবনে সে নিয়মের বাইরে কিছু করে নি, এবারেও করল না। নরম গলায় বলল, পঞ্চম মাত্রার অভিযানে যাওয়া আমার জন্যে একটা অভাবনীয় সুযোগ। আমাকে সেই সুযোগ দেয়ার জন্যে আমি মহাকাশ কেন্দ্রের

কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি কি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে একটা ছোট বাই ভার্বাল পাঠাব?

রিশান পাহাড়ি নদীটির দিকে তাকিয়ে বলল, না এখানে নয়। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে এই পাহাড় থেকে নেমে যাব। নিচে একটি ছোট লোকালয় আছে, আমাকে তার কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে তুলে নিলেই হবে।

উচ্চপদস্থ মানুষটি হলোগ্রাফিক স্ক্রিন থেকে বিস্মিত হয়ে রিশানের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। রিশান প্রায় কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, এখানে একটি বাই ভার্বালকে অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাবে।

নিয়ম অনুযায়ী এই মানুষটির নিজে থেকে বিদায় নেবার কথা, কিন্তু রিশান সেজন্যে অপেক্ষা করল না। তাকে বিদায় জানিয়ে কব্জিতে বাঁধা যোগাযোগ মডিউলটি স্পর্শ করে তাকে অদৃশ্য করে দিল। রিশান একটি নিশ্বাস ফেলে হাত দিয়ে একবার মাটিকে স্পর্শ করল। আবার তাকে এই মাটির পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। মহাকাশে ছুটে ছুটে সে তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। মহাকাশচারীর জীবন বড় নিঃসঙ্গ, এক একটি অভিযান শেষ করে যখন তারা পৃথিবীতে ফিরে আসে, তারা অবাক হয়ে দেখে পৃথিবীতে শতাব্দী পার হয়ে গেছে। পরিচিতেরা কেউ নেই, প্রিয়জনেরা শীতলঘরে, ভালবাসার মেয়েটির দেহ জরাগ্রস্ত, মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। শহর নগর পাল্টে গিয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়, মানুষের মুখের ভাষায় দুর্বোধ্য জটিলতা। শুধু যে জিনিসটি পাল্টে নি সেটি হচ্ছে পর্বতমালা বিশাল অরণ্য আর নীল আকাশ। রিশান আজকাল তাই ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে এই পর্বতমালার খোঁজে, নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় বসে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে তার হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীকে। শৈশব কৈশোর আর যৌবনে যেই প্রকৃতিকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রেখেছে এখন তার জন্যে বুকের ভিতর জন্ম নিচ্ছে গভীর ভালবাসা।

রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে একমুঠো মাটি তুলে এনে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সিলিকনের এই যৌগ কী বিচিত্র রহস্যের জন্ম দিয়েছে পৃথিবীতে! প্রাণ নামে এই অবিশ্বাস্য রহস্য কি আছে আর কোথাও?

২

হলঘরটি বিশাল, রিশান উপরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়, ছাদ প্রায় দেখা যায় না! বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভিতরে এত বড় একটা ঘর রয়ে গেছে। ঘরের মাঝখানে কালো গ্রানাইটের একটা টেবিল। টেবিলের চারপাশে সুদৃশ্য চেয়ার, চেয়ারের হাতলে যোগাযোগ মডিউলের জটিল মনিটর। ঘরের মাঝে এক ধরনের নরম আলো, সতেজ বাতাস। চোখ বন্ধ করলে মনে হয় বদ্ধ ঘরে নয়, বুঝি সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রিশান হেঁটে তার জন্যে আলাদা করে রাখা চেয়ারটিতে বসল। সাথে সাথে কানের কাছে কিছু একটা ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করে, মহামান্য রিশান, আমার নাম কিটি, আপনাকে আমি আজকের এই সভাকক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবার আগে আমি আপনাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। আপনার বাম পাশে বসেছেন নিডিয়া। নিডিয়ার পাশে যিনি বসেছেন তার নাম হান। টেবিলের অন্য পাশে বসেছেন বিটি এবং যুন। যিনি এখনো আসেন নি তিনি হচ্ছেন দলপতি লি-রয়। মহাকাশ অভিযানে তার অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। লি-রয় তিন তারকার

অধিকারী হয়েছেন অত্যন্ত অল্প বয়সে। তিনি যেরকম দুঃসাহসী ঠিক সেরকম তার ধীশক্তি। অত্যন্ত প্রখর তার বুদ্ধিমত্তা...

রিশান চেয়ারের হাতল খুঁজে যোগাযোগ মডিউলের লাল বোতামটি চেপে ধরতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। যন্ত্রপাতির কথা শুনতে তার ভালো লাগে না। বিশেষ করে সেই কথাবার্তায় যদি মানুষের আবেগের ভান করা হয় সেটা সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

রিশান ভিস্যুয়াল মনিটরটির দিকে এক নজর তাকিয়ে এই টেবিলের মানুষগুলোর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে মাথা তুলে তাকাল। সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে সে ঠিক কাউকে উদ্দেশ্য না করে বলল, আমি রিশান, তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে খবর পেয়েছ আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি। টেবিলের অন্য পাশে বসে থাকা বিটি নামের সোনালি চুলের মেয়েটি হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, আমরা সেটা জানি। আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে তোমার সাথে পরিচিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রিশান মাথা নেড়ে বলল, সেটা সত্যি হবার কথা নয়, তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে আমার ফাইলটি পড়ার সুযোগ পেয়েছ এবং ইতিমধ্যে জেনে গেছ আমি নেহাত সাদাসিধে কাটখোট্টা মানুষ।

টেবিলে বসে থাকা লাল চুলের ককেশীয় চেহারার মানুষটি মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি অন্যমনস্কভাবে চুলকাতে চুলকাতে বলল, আমার নাম হান, কাটখোট্টা মানুষদের যদি প্রতিযোগিতা হয় আমি মোটামুটি নিশ্চিত তোমাকে দশ পয়েন্টে হারিয়ে দেব।

বিটি নামের সোনালি চুলের মেয়েটি শব্দ করে হেসে বলল, রিশান, হান একটুও বাড়িয়ে বলছে না। বিনয় জাতীয় মানবিক গুণাবলি খুব যত্ন করে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

হান বিটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আমরা একটা মহাকাশ অভিযানে যাচ্ছি, ধর্ম প্রচারে তো যাচ্ছি না, মানবিক গুণাবলির বিকাশ যদি না ঘটে তোমার খুব আপত্তি আছে?

বিটি দুই হাত সামনে তুলে বলল, কিচ্ছু আপত্তি নেই।

রিশান হান এবং বিটির কথোপকথন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এবং দুজন একটু থামতেই গলার স্বরে একটু গুরুত্ব ফুটিয়ে বলল, তোমরা কী বলবে জানি না, আমি কিন্তু এই অভিযানটিতে এর মাঝে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করতে শুরু করেছি।

টেবিলে বসে থাকা চার জনই রিশানের দিকে ঘুরে তাকাল। পাশে বসে থাকা কোমল চেহারার মেয়েটি বলল, তুমি কী বিশেষত্ব খুঁজে পেয়েছ?

আমি আগে যেসব মহাকাশ অভিযানে গিয়েছি সেখানে সবসময় ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষকে একসাথে পাঠানো হত। কেউ পদার্থবিজ্ঞানী কেউ জীববিজ্ঞানী কেউ ইঞ্জিনিয়ার—

নিডিয়া নামের কোমল চেহারার মেয়েটি রিশানকে বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু তথ্য তো আজকাল আর মানুষের মস্তিষ্কে পাঠানো হয় না; সে জন্যে শক্তিশালী কপোট্রন, কম্পিউটার, রবোট, ডাটাবেস এসব রয়েছে। এখন মানুষকে পাঠানো হয় তার মানবিক দায়িত্বের জন্যে—

তুমি সেটা ঠিকই বলেছ নিডিয়া। রিশান মাথা নেড়ে বলল, আমিও ঠিক একই কথা বলছি। মহাকাশ অভিযানে মানুষের দায়িত্ব হয় মানবিক। দলটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন কেউ খুব কঠোর, কেউ অবিশ্বাস্য সুশৃঙ্খল, কেউ আশ্চর্যরকম কোমল, কেউ বা খেয়ালি। দেখা গেছে দীর্ঘকাল একসাথে কাজ করার জন্যে এ রকম ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষের একটি দল খুব চমৎকারভাবে কাজ করে। আমি নিজে একাধিকবার এ রকম

অভিযানে গিয়েছি, অসম্ভব দুঃসহ সব অভিযান কিন্তু আমরা কখনো ভেঙে পড়ি নি, তার একটি মাত্র কারণ—আমরা ছিলাম ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কী জান?

কী?

আমাদের এই দলটিতে আমরা সবাই মোটামুটি একই ধরনের মানুষ।

নিডিয়া ভুরু কুঁচকে বলল, সেটি কী ধরনের?

আমরা সবাই মোটামুটি কঠোর প্রকৃতির মানুষ—আমি তোমাদের সবার ফাইল দেখেছি, তোমরা সবাই কোনো-না-কোনো অভিযানে অত্যন্ত কঠোর পরিবেশে পড়েছ এবং সবচেয়ে বড় কথা সেইসব পরিবেশে খুব কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছ।

কেউ কোনো কথা বলল না কিন্তু সবাই স্থির দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল। রিশান খানিকক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সেইসব কঠোর সিদ্ধান্ত সময় সময় ছিল নিষ্ঠুর, অমানবিক। আমি নিশ্চিত তোমরা সেইসব কথা ভুলে থাকতে চাও।

হান মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তুমি কী বলতে চাও রিশান?

তুমি জান আমি কী বলতে চাই।

তবু তোমার মুখে শুনি।

আমার ধারণা মহাকাশ অভিযানের কেন্দ্রীয় দফতর ইচ্ছে করে এ রকম একটি দল তৈরি করেছে। আমাদের ব্যবহার করে তারা খুব একটি নিষ্ঠুর কাজ করাবে।

যুন এতক্ষণ সবার কথা শুনে যাচ্ছিল, এই প্রথম সে মুখ খুলল, শান্ত চোখে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় তোমার সন্দেহ অমূলক। আমাদের অভিযানটি পঞ্চম মাত্রার অভিযান। মানুষের ব্যবহার উপযোগী একটা আবাসস্থল খুঁজে বের করা যার প্রধান উদ্দেশ্য। এর ভিতরে নিষ্ঠুরতার কোনো ব্যাপার নেই।

রিশান খানিকক্ষণ যুনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমি সন্দেহপ্রবণ কুটিল প্রকৃতির মানুষ, আমি তোমার সাথে একমত নই। আমার ধারণা আমাদের পঞ্চম মাত্রার অভিযানের কথা বলে পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেখব একটি দ্বিতীয় মাত্রার নৃশংসতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

যুনের পূর্বপুরুষ সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাছাকাছি কোনো অঞ্চল থেকে এসেছে, তার মাথার চুল কুচকুচে কালো, মঙ্গোলীয় চাপা নাক এবং সরু চোখ। সে স্থির দৃষ্টিতে রিশানের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কঠিন মুখে বলল, তুমি যে কাজটি করছ সেটি মহাকাশ নীতিমালায় একটি আইনবহির্ভূত কাজ—একটি অভিযানের আগে মহাকাশচারীদের সেই অভিযান সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা দেয়া।

রিশান যুনের দিকে তাকিয়ে রইল, মানুষটি কোনো কারণে তাকে অপছন্দ করেছে, না হয় মহাকাশ নীতিমালার কথা টেনে আনত না। রিশান কী একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই হান কাঠ-কাঠ গলায় হেসে উঠে বলল, যুন, মহাকাশ নীতিমালার কথা বলে ভয় দেখানোও নীতিমালাবহির্ভূত কাজ—

আলোচনাটি অন্য একদিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল ঠিক তখন দরজা খুলে দীর্ঘকায় একজন মানুষ প্রবেশ করে। মানুষটি অত্যন্ত সুদর্শন কিন্তু চেহারায় নিষ্ঠুরতার কাছাকাছি এক ধরনের কাঠিন্য রয়েছে। শরীরে হালকা হলুদ রঙের ঢিলেঢালা একটি পোশাক, হাতের কাছে তিনটি লাল রঙের তারা জ্বলজ্বল করছে। মানুষটি তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা চেয়ারে বসে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি লি-রয়। এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক দলপতি!

নিডিয়া লি–রয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যিকারের দলপতিটি তাহলে কে?

সেটা এখনো ঠিক হয় নি। এই ধরনের দীর্ঘ অভিযানের নেতৃত্ব খুব ধীরে ধীরে যে মানুষটি সবচেয়ে কর্মক্ষম তার কাছে চলে আসে।

ষুন বলল, কিন্তু মহাকাশ নীতিমালা—

লি–রয় হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, মহাকাশ নীতিমালা একটি মানসিক আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা জান মহাকাশ নীতিমালা অনুযায়ী আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের প্রাণদণ্ড দিতে পারি।

প্রাণদণ্ড?

হ্যাঁ। আগে প্রমাণ করতে হবে যে তোমরা মানবসভ্যতাবিরোধী কাজ করছ। যখন পাঁচ–ছয় জন মানুষ ছোট একটা মহাকাশযানে করে কয়েক শতাব্দীর জন্যে কোনো অজানা গ্রহের দিকে যেতে থাকে তখন মানবসভ্যতা জাতীয় বড় বড় কথাগুলোর কোনো অর্থ থাকে না। ওই মানুষগুলো তখন একটা পরিবারের সদস্য হয়ে যায়। তাদের ভিতরে তখন কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন থাকে না, থাকা উচিত না।

রিশান সুদর্শন এই মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে, মানুষটিকে তার পছন্দ হয়েছে। মনে হয় চমৎকার নেতৃত্ব দিতে পারবে। লি-রয় আবার রিশানের দিকে ঘুরে তাকাল, মুখে একটা হাসি টেনে এনে বলল, তোমার সাথে এখনো আমার পরিচয় হয় নি। তবে তোমার গোপন ফাইলটি আমি দেখেছি, আগে দেখলে সম্ভবত তোমাকে আমি এই অভিযানে আমার সাথে নিতাম না।

বিটি অবাক হয়ে বলল, কেন কী হয়েছে রিশানের?

অসম্ভব কাটগোঁয়ার মানুষ। এর মাথায় কিছু একটা ঢুকে গেলে সেটা বের করা অসম্ভব ব্যাপার! বৃহস্পতির একটা অভিযানে দলপতিকে একটা ঘরে বন্ধ করে মহাকাশযানের নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছিল। মহাকাশযান আর তার বারো জন ক্রুয়ের জীবন বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু সেই দলপতি এখনো মহা খাপ্পা হয়ে আছে। এ জন্যে কখনো কোনো লাল তারা পায় নি!

ষুন বিড়বিড় করে বলল, কিন্তু সবকিছুতেই একটা নিয়ম থাকতে হয়।

অবশ্যই। লি–রয় মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই সবকিছুতেই নিয়ম থাকতে হয়; কিন্তু সেই নিয়মটি কী কেউ জানে না। পৃথিবীতে সদর দফতরের আরামদায়ক চেয়ারে বসে যে নিয়মটি খুব চমৎকার মনে হয়, একটা গ্রহের আকর্ষণে একটা গ্রহকণার দিকে ছুটে ধ্বংস হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে সেই নিয়মের কোনো মূল্য নেই। তখন নিয়ম হচ্ছে বেঁচে থাকা। দলপতিকে ঘরে বন্ধ করে মহাকাশযানের নেতৃত্ব নেয়া তখন চমৎকার একটি নিয়ম—

রিশান লি–রয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে লি–রয়!

অন্য কেউ বললে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু তোমার মুখে শুনে একটু দুশ্চিন্তা অনুভব করছি। যাই হোক আমার একটু দেরি হল আসতে। সদর দফতর থেকে কোড নম্বরটি দিতে একটু দেরি হল। আমাদের এই অভিযানটি মূল কেন্দ্রে রেজিস্ট্রি হয়েছে। আনুষ্ঠানিক নাম, মনুষ্যের বসবাসযোগ্য গ্রহ–উপগ্রহ সম্পর্কিত জরিপ। অভিযানের আনুষ্ঠানিক কোড নম্বর নয় নয় শূন্য তিন।

নয় নয় শূন্য তিন?

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে এটা অর্থহীন চারটি সংখ্যা কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কিছুদিনের মাঝেই আমাদের জীবনে এর থেকে অর্থবহ ব্যাপার আর কিছু থাকবে না।

ঠিকই বলেছ। হান মৃদু স্বরে বলে, আমার আগের অভিযানের কোড সংখ্যা ছিল আট আট তিন দুই। এত ভয়ঙ্কর একটা অভিযান ছিল যে আট সংখ্যাটিই এখন আমি সহ্য করতে

www.amarboi.com

পারি না।

লি-রয় হেসে বলল, আশা করছি আমাদের বেলায় সেরকম কিছু ঘটবে না। ফিরে আসার পর নয় শূন্য কিংবা তিন এই সংখ্যাগুলোর সাথে তোমাদের ভালবাসা হয়ে যাবে! যাই হোক কাজ শুরু করার আগে বল তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না।

নিডিয়া টেবিলে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, রিশান একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে। সেটা সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে চাই।

লি-রয় রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, কী প্রশ্ন?

রিশান ইতস্তত করে বলল, ঠিক প্রশ্ন নয় একটা সন্দেহ। আমাদের এই দলটির সব কয়জন সদস্য অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের, আমাকে এখানে টেনে আনার সেটাও একটা কারণ। মহাকাশ অভিযানে এ রকম একটি দল পাঠানোর পিছনে সত্যিকার উদ্দেশ্যটা কী? মনুষ্য বসবাসের উপযোগী গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কিত জরিপ কথাটি এক ধরনের ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ধারণা, আমাদের এমন একটি পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়া হবে যেটি হবে ভয়ঙ্কর এবং নৃশংস। আমাদের সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না—

লি-রয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলল না, তারপর মৃদু গলায় বলল, তুমি মহাকাশ কেন্দ্রের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছ রিশান। এটি খুব বড় অভিযোগ, কোনোরকম প্রমাণ ছাড়া এ রকম অভিযোগ করা ঠিক না।

আমার কাছে একটা ছোট প্রমাণ আছে, লি-রয়।

কী প্রমাণ?

এই ঘরটি একটি বিশাল ঘর। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখ সেটা এত উঁচুতে যে ভালো করে দেখা যায় না। বিশাল এই ঘরে বসলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। আমাদেরকে এই ঘরে এনে বসানো হয়েছে।

WWW.AMARBOI.COM

সবাই অবাক হয়ে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল, সে ঠিক কী বলতে চাইছে কেউ বুঝতে পারছে না। রিশান ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি এটা ছোট একটা ঘুপচি ঘর, এই ছাদটা একটা কৌশলী দৃষ্টিভ্রম। আমি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছাদটা স্পর্শ করতে পারব—

তাতে কী প্রমাণ হয় রিশান?

তাতে প্রমাণ হয় আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ছলনা করা হয়। আমাদেরকে অনুভূতি দেয়া হয় বিশাল একটা ঘরে বসে থাকার কিন্তু আসলে আমরা বসে থাকি ছোট একটা ঘুপচি ঘরে। আমাদের অনুভূতি দেয়া হয় মহান একটি অভিযানের আসলে আমরা যাই নীচ কোনো একটি সংঘর্ষে অংশ নিতে—

দুটি এক ব্যাপার নয় রিশান।

আমার কাছে এক।

যুন বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু—কিন্তু রিশানের কথা সত্যি কি না সেটা এখনো প্রমাণিত হয় নি। এই ঘরটি হয়তো আসলে বিশাল।

হান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, লি-রয় তুমি অনুমতি দিলে আমি টেবিলে উঠে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

অনুমতি দিচ্ছি।

হান লাফিয়ে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে হাত উপরে তুলে ধরতেই সেটি একটি ঝকঝকে

আয়নাকে স্পর্শ করল, অত্যন্ত সুচারুভাবে বসানো রয়েছে, দুই পাশে থেকে প্রতিফলিত হয়ে সেটি একটি অত বিশাল ঘরের অনুভূতি দিচ্ছে। হান বিড়বিড় করে বলল, দেখ কত বড় ধুরন্ধর!

ষুন একটু অবাক হয়ে হানের দিকে তাকিয়েছিল। এবারে আস্তে বলল, প্রমাণিত হল ঘরটি ছোট কিন্তু তার মানে নয় আমরা নৃশংসতা করতে যাচ্ছি।

লি–রয় মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। ষুন ঠিকই বলেছে। রিশান, তোমার সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই।

রিশান একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, আমি স্বীকার করছি আমার সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু আমি এটাও বলছি অতীতে অনেকবার আমার অনেক কিছু নিয়ে সন্দেহ হয়েছিল—ভিত্তিহীন সন্দেহ। যুক্তি নিয়ে তো আর সন্দেহ হতে পারে না, তাহলে তো সেটা সন্দেহ নয় সেটা সত্যি। আমার সেইসব ভিত্তিহীন সন্দেহ বেশিরভাগ সময়ে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কখনো কখনো সেইসব ভিত্তিহীন সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, অন্তত একবার সেটি বার জন মহাকাশচারীর প্রাণ রক্ষা করেছিল।

লি–রয় হাসার ভঙ্গি করে বলল, আমরা সেটা মনে রাখব রিশান। এখন সেটা নিয়ে আর কিছু করার নেই, কাজেই সেটা মুলতুবি থাক।

থাক।

তাহলে এস মহাকাশ অভিযান নয় নয় শূন্য তিন-এর সদস্যরা, আমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা শুরু করি।

সবাই নিজের চেয়ারটি টেবিলের কাছাকাছি টেনে নিয়ে এসে ভিসুয়াল মনিটরটির উপর ঝুঁকে পড়ে।

AMARBOI.COM

৩

রিশান প্রায় নগ্ন দেহে স্টেনলেস স্টিলের একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটি স্বাস্থ্য–সহায়ক রবোট এবং দুজন টেকনিশিয়ান। শরীরের নানা জায়গায় নানা ধরনের মনিটর লাগাতে লাগাতে টেকনিশিয়ান দুজন বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। রিশান তার এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর সরিয়ে বলল, আর কতক্ষণ?

মোটামুটি শেষ। তুমি যখন শীতলঘর থেকে বের হবে তখন শরীরকে আবার ব্যবহারের উপযোগী করার জন্যে এই নূতন মাইক্রো ক্যাপসুলগুলো খুব চমৎকার।

কী করে এগুলো?

শরীরের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ঠিক সময়ে এক ধরনের এনজাইম বের করতে থাকে।

আমি এর আগে যখন মহাকাশ অভিযানে গিয়েছিলাম তখন এগুলো ছিল না। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ধীরে ধীরে শরীরে মাংসপেশিকে জাগিয়ে তুলত।

সেটি প্রাগৈতিহাসিক প্রযুক্তি।

তাই হবে নিশ্চয়ই।

টেকনিশিয়ান দুজন এবারে ধীরে ধীরে রিশানের শরীরে এক ধরনের নিও পলিমারের পোশাক পরাতে শুরু করে। ভিতরে এক ধরনের কোমল উষ্ণতা, রিশান দুই হাত উপরে তুলে পোশাকটির উষ্ণতা অনুভব করে দেখে। টেকনিশিয়ান দুজনের একজন—যার চেহারায় এক ধরনের ছেলেমানুষি ভাব রয়েছে, জিজ্ঞেস করল, রিশান, এত বড় অভিযানে যাওয়ার আগে তোমার কি ভয় করছে?

না। আমাকে তোমরা নানা ধরনের ওষুধপত্রে বোঝাই করে রেখেছ। এই মুহূর্তে আমার ভিতরে ভয় ক্রোধ দুঃখ কষ্ট কিছু নেই। এক ধরনের ফুরফুরে আনন্দ।

যদি তোমাকে আনন্দের অনুভূতি না দেয়া হত, তাহলে কি তোমার ভয় করত?

মনে হয় করত। আমি ভীতু মানুষ।

তুমি যখন ফিরে আসবে তখন পৃথিবীতে আরো অনেকগুলো বছর কেটে যাবে, সেটা ভেবে তোমার ভিতরে কি একটু দুঃখের অনুভূতি হচ্ছে?

না। আমি এতবার মহাকাশ অভিযানে গিয়েছি যে পৃথিবীতে আমার পরিচিত কোনো মানুষ নেই। যারা ছিল তারা কয়েক শ বছর আগে মরে শেষ হয়ে গেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তোমার বয়স কত ছেলে? চব্বিশ?

আমার বিয়াল্লিশ। কিন্তু আমার কত বছর আগে জন্ম হয়েছে জান?

কত বছর আগে?

প্রায় ছয় শ বছর আগে। তোমার সামনে একজন খুব প্রাচীন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেমানুষি চেহারার টেকনিশিয়ানটি এক ধরনের বিস্ময়াভিভূত হয়ে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, তোমার কি পরিবার আছে, রিশান?

নেই। মহাকাশচারীদের পরিবার থাকতে হয় না। তাদের নিঃসঙ্গতা শেখানো হয়।

তোমার কোনো প্রিয়জন আছে?

না। আমার কোনো প্রিয়জনও নেই। মহাকাশচারীদের কোনো প্রিয়জন থাকতে হয় না।

ছেলেমানুষি চেহারার টেকনিশিয়ানটি রিশানের হাতে একটি ফিতা লাগাতে লাগাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, তোমাকে যদি আবার নূতন করে জীবন শুরু করতে দেয়া হয় তাহলে তুমি কি মহাকাশচারী হবে?

মনে হয় না।

তুমি কী হবে রিশান?

মনে হয় শিশুদের স্কুলের শিক্ষক।

এরপর টেকনিশিয়ান এবং রিশান দুজনেই দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। রিশানকে মহাকাশ অভিযানের পোশাক পরিয়ে কালো ক্যাপসুলের মাঝে শুইয়ে দেবার পর রিশান নরম গলায় বলল, যাই ছেলে, ভালো থেকো তোমরা।

টেকনিশিয়ান দুজন হাত নেড়ে বলল, বিদায় রিশান। তোমার অভিযান সফল হোক। তুমি আরো সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে এসো।

ক্যাপসুলের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবার আগের মুহূর্তে রিশান বলল, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

কর।

আমাদের যে মহাকাশযানে পাঠাচ্ছ সেটি কুরু ৪৩ জাতীয়।

হ্যাঁ। এর মাঝে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে দু-চারটে গ্রহ-উপগ্রহ উড়িয়ে দেয়া যায়, তোমরা সেটা জান?

শুনেছি।

আমরা যাচ্ছি পৃথিবীর মানুষের জন্যে নূতন বসতি খুঁজে বের করতে, আমাদের এত অস্ত্র দিয়ে পাঠাচ্ছে কেন জান?

টেকনিশিয়ান দুজন অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। ছেলেমানুষি চেহারার টেকনিশিয়ানটি ইতস্তত করে বলল, সেটা তো আমাদের জানার কথা নয়। আমরা হচ্ছি টেকনিশিয়ান—তোমাদের পোশাক পরিয়ে ক্যাপসুলে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া আমাদের কাজ।

তা ঠিক। কিন্তু আমার কী মনে হয় জান?

কী?

আমাদের পাঠাচ্ছে কারো সাথে যুদ্ধ করতে। কিছুতেই ধরতে পারছি না সেটা কে হতে পারে!

ক্যাপসুলের ঢাকনাটা নামিয়ে দেবার সাথে সাথে একটা বাতাস বইতে শুরু করে, তার মাঝে নিষিদ্ধ ফুলের গন্ধ। কিছুক্ষণের মাঝেই রিশানের চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। সে ফিসফিস করে নিজেকে বলল, ঘুমাও রিশান, ঘুমাও।

সত্যি সত্যি সে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীর্ঘকালের জন্য।

AMARBOI.COM

৪

খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল রিশান। কোথাও কিছু নেই, মাথার কাছে একটা সবুজ বাতি থাকার কথা সেটিও নেই। সে যেন এক অলৌকিক শূন্যতায় ভেসে রয়েছে। সত্যিই কি তার চেতনা ফিরে আসছে নাকি এটিও একটি স্বপ্ন? রিশান প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল সে কোথায় এবং কেন তার মাথার কাছে একটা সবুজ বাতি থাকার কথা, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

ঘুম এবং জাগরণের মাঝামাঝি তরল অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে গেল এবং খুব ধীরে ধীরে আবার তার চেতনা ফিরে আসতে থাকে। এক সময় সে চোখ খুলে তাকায় এবং দেখতে পায় মাথার কাছে সত্যি একটি সবুজ বাতি জ্বলছে। কুরু ইঞ্জিনের কম্পন অনুভব করে রিশান, কান পেতে থেকে গুমগুম একটা চাপা আওয়াজ শুনতে পায় সে।

রিশান চোখ বুজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘুম থেকে ওঠা নিস্তেজ ভাবটা কেটে গিয়ে খুব ধীরে ধীরে শরীরের ভিতরে সজীব একটা ভাব ফিরে আসতে শুরু করেছে। ক্যাপসুলের ভিতরে আলো জ্বলে উঠছে ধীরে ধীরে। শীতল একটা বাতাস বইছে ভিতরে, অচেনা কী একটা ফুলের গন্ধ সেই বাতাসে। রিশান ধীরে ধীরে উঠে বসে, সাথে সাথে মাথার উপর থেকে ঢাকনাটা সরে যায়। দেয়ালে নানা ধরনের প্যানেল জ্বলজ্বল করছে, উপরে বামদিকে একটা সৌরঘড়ি সময় জানিয়ে দিচ্ছে। রিশান অবাক হয়ে দেখল সে ঘুমিয়েছিল এক বছরেরও কম সময়—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সে, এটা কী করে সম্ভব?

রিশান ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে আসে। এক মুহূর্ত সময় নেয় নিজের তাল সামলে নিতে, তারপর দেয়াল ধরে এগিয়ে যায়, লি-রয়কে খুঁজে বের করতে হবে এখনই। কিছু

একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়ই, তাদের কয়েক যুগ ঘুমিয়ে থাকার কথা ছিল।

নিয়ন্ত্রণঘরে বড় স্ক্রিনের সামনে লি-রয় দাঁড়িয়েছিল। রিশানকে দেখে বলল, তোমাকেও ঘুম থেকে তুলেছে?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

জানি না। মনে হয় তোমার সন্দেহই সত্যি। আমাদের মূল অভিযানের পাশাপাশি আরো কোনো অভিযান শেষ করতে হবে।

তথ্যকেন্দ্র কী বলে?

বিশেষ কিছু বলে না। কাছাকাছি কোনো অঞ্চল থেকে একটা বিপদ সঙ্কেত পেয়ে আমাদের ডেকে তুলেছে।

আমরা পৃথিবী থেকে এক আলোকবর্ষ দূরেও যাই নি—পৃথিবী এই বিপদ সঙ্কেতের কথা জানত।

লি-রয় মাথা নাড়ল, মনে হয় জানত।

আমাদেরকে বলে নি।

না।

আমরা কি এই বিপদ সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে আমাদের মূল অভিযানে যেতে পারি না?

ইচ্ছে করলে পারি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

বিপদ সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা যায় না।

রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। অন্যেরা কি এখনো ঘুমাচ্ছে?

না। সবাইকে জাগানো শুরু করা হয়েছে। তারা উঠে আসতে আসতে চল তুমি আর আমি যাবতীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করে ফেলি।

AMARBOI.COM

ঘণ্টাখানেক পরে মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণঘরে যখন ছয় জন ক্রু একত্র হয়েছে তখন সবাই কমবেশি বিচলিত। লি-রয় সবাইকে শান্ত করে দ্রুত কাজ শুরু করে দেয়। বড় টেবিলের একপাশে বসে মনিটরে সবুজ রঙের একটা গ্রহের ছবি স্পষ্ট করতে করতে বলল, আমাদের যাবতীয় সমস্যার মূল হচ্ছে এই গ্রহটি। গাছের পাতায় সবুজ খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু গ্রহ হিসেবে সবুজ রং ভালো নয়, কেমন জানি পচে যাওয়ার একটা ভাব রয়েছে। এই গ্রহটির বেলায় কথাটি আরো বেশি সত্যি।

হান অধৈর্য হয়ে বলল, কী বলতে চাইছ তুমি। গ্রহ আবার পচে যায় কেমন করে?

বলছি। তোমরা সবাই জান, পৃথিবী থেকে এক আলোকবর্ষ যাবার আগেই আমাদের একটা বিপদ সঙ্কেত দিয়ে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। বিপদ সঙ্কেতটি এসেছে এই গ্রহ থেকে।

নিডিয়া অবাক হয়ে বলল, এই গ্রহে মানুষের বসতি রয়েছে?

হ্যাঁ। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এখানে মানুষ বসতি করেছিল। মানুষ থাকার উপযোগী গ্রহ এটি নয় তবু মানুষ বসতি করেছিল। তোমরা যখন জেগে উঠছিলে তখন আমি আর রিশান মিলে গ্রহটা সম্পর্কে মোটামুটি খোঁজখবর নিয়েছি, তথ্যকেন্দ্র থেকে সরাসরি সেসব জানতে পারবে কিন্তু তবু তোমাদের বলে দিই। লি-রয় এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, রিশান, তুমিই বল।

রিশান অন্যমনস্কভাবে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, গ্রহ বলতে আমাদের যেরকম একটি জিনিসের কথা মনে হয়, এটি সেরকম কিছু নয়। পৃথিবীর ভরের চার ভাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ভাগ কিছু জিনিস কোনোভাবে আটকে আছে। নিয়মিত কোনো কক্ষপথ নেই, আশপাশের অন্যান্য মহাজাগতিক আকর্ষণে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সৌরজগতে গ্রহগুলোতে আলোর উৎস হচ্ছে সূর্য, এখানে সেরকম কিছু নেই। গ্রহটিতে লৌহ জাতীয় আকরিক থাকায় শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, খুব বিচিত্র একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে, সেখানে আয়োনিত গ্যাসে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন থেকে বিচিত্র এক ধরনের আলো তৈরি হয়। এই আলো নিয়মিত নয়, কখনো বেশি কখনো কম, কখনো উজ্জ্বল কখনো নিষ্প্রভ—শব্দটা হওয়া উচিত ভূতুড়ে।

গ্রহটি অসম্ভব শীতল; কিন্তু মাটির নিচে প্রচণ্ড চাপে আটকে থাকা কিছু গলিত আকরিক থাকার কারণে স্থানে স্থানে তাপমাত্রা সহ্য করার পর্যায়ে রয়েছে। চল্লিশ বছর আগে মানুষ যখন এখানে বসতি করেছিল এ রকম একটা উষ্ণ জায়গা বেছে নিয়েছিল।

গ্রহটি সম্পর্কে আরো নানারকম খুঁটিনাটি তথ্য রয়েছে, তোমরা ইচ্ছে করলে তথ্যকেন্দ্র থেকে পেতে পার, আমি আর সেগুলো জোর করে শোনাতে চাই না।

রিশানের কথা শেষ হতেই হান বলল, কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না তোমরা গ্রহটা পচে গেছে কেন বলছ?

লি–রয় হাসার মতো এক ধরনের ভঙ্গি করে বলল, পচে যাওয়া মানে কী হান?

হান মাথা চুলকে বলল, রূপক অর্থে বোঝানো হয় নষ্ট হয়ে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তুমি কি বলতে চাইছ—এখানকার মানুষের যে বসতি রয়েছে তারা নিজেদের সাথে নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করছে? যুদ্ধ–বিগ্রহ করছে? ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?

না, সেরকম কিছু না। পচে যাওয়ার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর ভোজসভা। এই গ্রহটিতে সেরকম কিছু ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

উপস্থিত যারা ছিল তারা সবাই চমকে উঠে বলল, এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে?

হ্যাঁ। খুব নিম্নস্তরের এককোষী প্রাণ। কিন্তু প্রাণ। মানুষের বসতি হয়েছিল সে কারণেই। পৃথিবীর বাইরে যে প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেটা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

নিডিয়া ইতস্তত করে বলল, আমি জীববিজ্ঞানী নই, প্রাণের রহস্য আমার জানা নেই, কিন্তু এককোষী প্রাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে মানুষের চল্লিশ বছর লেগে গেছে?

সেটাই সমস্যা। লি–রয় চিন্তিত মুখে বলল, এই এককোষী প্রাণীদের নিয়ে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে এই গ্রহে। মানুষ সেটা ধরতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এখন যে কয়জন মানুষ বেঁচে আছে তারা ফিরে যেতে চাইছে। আমাদের কাছে বিপদ সঙ্কেত পাঠিয়েছে তাদের উদ্ধার করে ফেরত পাঠানোর জন্যে।

ষুন ঘুরে তাকাল লি–রয়ের দিকে, ব্যস? আর কিছু নয়?

না, আর কিছু নয়।

তাহলে রিশান যেটা ভেবেছিল, আমাদের পাঠানো হচ্ছে ভয়ানক একটা নৃশংস কাজ করার জন্যে সেটা সত্যি নয়?

না, সেরকম কিছু নয়।

রিশানের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। রিশান মাথা নেড়ে বলল, ষুন, তুমি কি ভাবছ আমার খুব মন খারাপ হয়েছে যে আমার সন্দেহটি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে?

ষুন তার মঙ্গোলীয় সরু চোখকে আরো সরু করে বলল, না, আমি তা বলছি না।

AMARBOI.COM

তাছাড়া এখনো সময় শেষ হয়ে যায় নি। ব্যাপারটা যেরকম সহজ মনে হচ্ছে হয়তো তত সহজ নয়। এককোষী কিছু জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে মানুষের চল্লিশ বছর সময় লাগার কথা নয়। এর মাঝে অন্য কোনো ব্যাপার থাকা এতটুকু বিচিত্র নয়।

ষুন ঘুরে তাকাল রিশানের দিকে। তুমি তাই মনে কর?

রিশানের কী হল কে জানে, শক্ত মুখ করে বলল, হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। আমি দুঃখিত, কিন্তু সত্যি আমি তাই মনে করি।

৫

ছোট একটা স্কাউটশিপে করে মহাকাশযান থেকে চার জন গ্রহটিতে নেমে আসছিল। স্কাউটশিপটা একটু বেশি ছোট, একসাথে দুজনের বেশি বসার কথা নয়। তার মাঝে চার জন চাপাচাপি করে বসেছে। দীর্ঘ সময় বায়ুশূন্য মহাকাশে ভেসে ভেসে এসেছে, বিশাল মহাকাশযানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ করে ছোট একটা স্কাউটশিপে করে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করামাত্র প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তাদের পৃথিবীর কথা মনে পড়ে যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সাথে এর অবিশ্যি একটি বড় পার্থক্য রয়েছে—এই বায়ুমণ্ডলটি বিষাক্ত। স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণে বসেছে লি–রয়, যদিও পুরো কাজটি করা হচ্ছিল মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার থেকে।

স্কাউটশিপটা নিচে নেমে আসতে আসতে হলুদ রঙের একটি মেঘের ভিতর একটি বড় ঝাঁকুনি খেয়ে খুব সাবধানে দিক পরিবর্তন করল। নিডিয়া দুই হাতে শক্ত করে দেয়াল ধরে রেখে বলল, এ রকম ঝাঁকুনি হবে জানলে আমি মহাকাশযানেই থাকতাম। রিশান ছোট গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ঝাঁকুনিতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই কিন্তু কোনোভাবে বিষাক্ত গ্যাস খানিকটা ভিতরে না ঢুকে যায়।

লি–রয় সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, আরেকটা বড় ঝাঁকুনি কোনোভাবে সামলে নিয়ে বলল, এই শেষ, যদি এ রকম হতে থাকে, আমি ফিরে গিয়ে অন্য ব্যবস্থা করছি।

অন্য কী ব্যবস্থা করবে?

পুরো মহাকাশযানটা নামিয়ে আনব—এইসব ছোটখাটো স্কাউটশিপ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়।

ষুন লি–রয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, সেটা হয়তো আরো বড় যন্ত্রণা হবে। বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, বড় একটি ইঞ্জিন যদি কোনোভাবে জমে যায়, মহাকাশযানকে চালু করতে গিয়ে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।

তা ঠিক।

বাইরে আবার গাঢ় হলুদ রঙের এক ধরনের মেঘ ভেসে এল এবং তার মাঝে ঝাঁকুনি খেতে খেতে স্কাউটশিপটা নিচে নামতে থাকে। চার জন যাত্রী কোনোভাবে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্কাউটশিপটা মাটির কাছাকাছি এসে গ্রহটাকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। মানুষের বসতিটা কিছুক্ষণের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়, স্বচ্ছ অর্ধগোলাকৃতি কিছু ডোম, কিছু চতুষ্কোণো টাওয়ার এবং নানা আকারের এন্টেনা। এর মাঝে কোনো একটি চতুর্থ মাত্রার বিপদ সঙ্কেত পাঠিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

স্কাউটশিপের অবলাল সংবেদী চোখ খুঁজে খুঁজে অবতরণক্ষেত্রটি খুঁজে বের করে। দীর্ঘদিন অব্যবহারে সেটি প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে আছে। স্কাউটশিপটা খুব সাবধানে সেখানে নেমে এল। স্কাউটশিপ থেকে নামার আগে তারা ভেতরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হল না। বসতির মাঝে যে মানুষগুলো আছে তারা যে কারণেই হোক কারো সাথে যোগাযোগ করতে রাজি নয়।

স্কাউটশিপ থেকে মূল মহাকাশযানে যোগাযোগ করে লি-রয় পুরো অবস্থাটি আরেকবার পর্যালোচনা করে নেয়। তারপর সবাইকে বিশেষ পোশাক পরে নিতে আদেশ করে।

বিষাক্ত পরিবেশে অনির্দিষ্ট সময় থাকার জন্যে বিশেষ ধরনের পোশাকটি পরতে দীর্ঘ সময় নেয়। একজনের আরেকজনকে সাহায্য করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যখন সবাই স্কাউটশিপ থেকে বের হয়ে এল তখন বাইরে বিচিত্র এক ধরনের ঝড় শুরু হয়েছে। আকাশে ঘোলাটে এক ধরনের আলো বিদ্যুৎ চমকানোর মতো করে ঝলসে উঠেছে। বাতাসে হলুদ ধুলো উড়ছে এবং সবকিছু ছাপিয়ে চাপা এক ধরনের গোঙানোর মতো শব্দ। পুরো পরিবেশটিতে এক ধরনের অশরীরী আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। চার জনের ছোট দলটি মানুষের বসতির দিকে হাঁটতে শুরু করে। সবার সামনে রিশান, তার হাতে একটি শক্তিশালী এটমিক ব্লাস্টার। সবার পিছনে লি-রয়, তার হাতে মাঝারি আকারের লেজারগান। মাঝখানে নিডিয়া এবং ষুন, তারা ছোট দুটি ভাসমান বাক্সে কিছু রসদ টেনে নিচ্ছে।

স্কাউটশিপের অবতরণক্ষেত্র থেকে মানুষের বসতির মূল গেটটি খুব কাছাকাছি কিন্তু তবু এই ছোট দলটির সেখানে পৌঁছতে অনেকক্ষণ লেগে গেল। গেটটি বন্ধ এবং রিশান সেখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শব্দ করতে থাকে। দীর্ঘ সময় কেটে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মাথার উপরে একটি মনিটরে একজন মানুষের ভয়ার্ত মুখ দেখা যায়। মানুষটি আতঙ্কিত গলায় বলল, কে?

আমরা একটি মহাকাশ অভিযানের দল। তোমাদের বিপদ সঙ্কেত পেয়ে দেখতে এসেছি।

মানুষটি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার মুখ দেখে মনে হয় সে তাদের কথা বিশ্বাস করছে না।

লি-রয় আবার বলল, আমাদের ভিতরে আসতে দাও।

মানুষটি তবু কোনো কথা বলল না, একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

লি-রয় একটু অধৈর্য হয়ে বলল, আমরা তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি, আমাদের ভিতরে আসতে দাও।

ও আচ্ছা দিচ্ছি। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

উপরের মনিটর থেকে মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ষুন নিচু গলায় বলল, এরা বাইরের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

হ্যাঁ। নিডিয়া যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে করতে বলল, আমি ভিতরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

রিশান বলল, প্রাচীনকালে মানুষ যেরকম দুর্গ তৈরি করত এই বসতিটাকে দেখে আমার সেরকম মনে হচ্ছে।

নিডিয়া বলল, কিছু একটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারছি না কী।

ধরতে না পারার কী আছে, যেটা পছন্দ হচ্ছে না সেটা হচ্ছে এই গ্রহটা। তাকিয়ে দেখ

AMARBOI.COM

একবার।

লি–রয়ের কথা শুনে সবাই তাকিয়ে দেখল এবং সাথে সাথে সত্যিই সবার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আকাশে ঘোলাটে এক ধরনের আলো সেটি কখনো একটু বেড়ে যায় কখনো একটু কমে যায়। আলোটি আসছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এবং ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। গ্রহটির বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ নয়—গাঢ় হলুদ রঙের। উপরে তাকালে মনে হয় যেন ঘোলা পানির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রহটির বায়ুমণ্ডলও স্থির নয়, সবসময় ঝড়ো বাতাস বইছে। শুষ্ক হলুদ রঙের এক ধরনের ধুলো উড়ছে, ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। আবছা আলোতে খুব বেশি দেখা যায় না কিন্তু যতদূর চোখ যায় ততদূর রুক্ষ পাথর এবং খানাখন্দ। চারদিকে এক ধরনের বিভীষিকা ছড়িয়ে আছে।

নিডিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচি।

লি–রয় অধৈর্য হয়ে আরেকবার বন্ধ–দরজার দিকে তাকাল, তারপর গলার স্বর ট্রান্সমিটারের আর. এফ. ব্যান্ডে সব ফ্রিকোয়েন্সিতে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমরা ভিতরে যারা আছ তারা আমাদের ঢুকতে দাও। যদি সেটি না কর আমরা জোর করে ঢুকতে বাধ্য হব। আমরা তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।

লি–রয়ের হুমকিতে কাজ হল মনে হয়, প্রথমে খুট করে একটা শব্দ হল এবং সাথে সাথে বড় দরজাটি হাট করে খুলে যায়। প্রথম ঘরটি বায়ুচাপ নিরোধক ঘর। বাইরের দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে ভিতরে চাপমাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মাঝেই তারা কোয়ারেন্টাইন ঘরে এসে প্রবেশ করল এবং তাদেরকে জীবাণুমুক্ত করার জটিল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপারটি শুরু হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত যখন তারা মানুষের মূল বসতিতে প্রবেশ করতে পারল তখন কারো আর দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি নেই।

মানুষের মূল বসতিটি যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে মহাকাশচারীর এই দলটিকে অভ্যর্থনা করার জন্যে চার জন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষগুলো নির্জীব, তাদের গায়ের চামড়া বিবর্ণ চোখে অসুস্থ হলুদাভ এক ধরনের রং। তারা কোনো ধরনের উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে শীতল গলায় তাদের অভ্যর্থনা জানাল। লি–রয় একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি লি–রয়, মহাকাশ অভিযান নয় নয় শূন্য তিনের দলপতি।

মানুষগুলো কৌতূহলহীন চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত একজন, যার গায়ের কাপড় ধূসর এবং অপরিষ্কার, একটু এগিয়ে এসে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাকে অভিবাদন।

তোমাদের পাঠানো চার মাত্রার বিপদ সঙ্কেত পেয়েছি। আমাদের তথ্যকেন্দ্রে তোমাদের সব খবর রয়েছে।

ও।

হ্যাঁ, আমরা তোমাদের উদ্ধার করে পৃথিবীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

মানুষগুলো কোনো উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইল। লি–রয় আবার কথোপকথন শুরু করার চেষ্টা করল, তোমাদের অনেক বড় বিপদ বলে জানিয়েছ। বিপদটা কী ধরনের বলবে?

গ্রুনি।

গ্রুনি?

হ্যাঁ। গ্রুনি একজন একজন করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলেছে।

গ্রুনিটা কে?

রিশান লি-রয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, এই গ্রহের যে এককোষী প্রাণের বিকাশ হয়েছে— একটা জীবাণু ছাড়া আর কিছু নয়, সেটাকে এখানকার মানুষেরা গ্রুনি বলে ডাকে।

মানুষগুলো সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল।

তোমরা এখানে সব মিলিয়ে কতজন মানুষ ছিলে?

প্রথমে এসেছিল চার জন, চল্লিশ বছর আগে। দশ বছর পরে এসেছিল আরো চার জন। তারপরের বার তিন জন। শেষ বার এসেছে পাঁচ জন।

তার মাঝে মারা গেছে কয়জন?

সবাই।

সবাই তো হতে পারে না, তোমরা তো বেঁচে আছ।

হ্যাঁ আমরা ছাড়া। চার জন মানুষ মাথা নেড়ে বলল, আমরা চার জন ছাড়া।

আর কেউ বেঁচে নেই?

মানুষগুলো কোনো উত্তর দিল না। অন্যমনস্কভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

লি-রয় আবার জিজ্ঞেস করল, আর কেউ বেঁচে নেই?

অপরিষ্কার কাপড় পরা নির্জীব ধরনের মানুষটি চোখ তুলে বলল, না।

নিডিয়া একটু এগিয়ে লি-রয়ের হাত স্পর্শ করে বলল, আমার মনে হয় এদের ধাতস্থ হওয়ার জন্যে খানিকটা সময় দেয়া দরকার। আমরা একটু পর তাদের সাথে কথা বলি।

রিশান মাথা নাড়ল। বলল, হ্যাঁ, সেটাই ভালো। ততক্ষণ আমরা জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখি।

AMARBOI.COM

৬

রিশান নিডিয়াকে নিয়ে যখন মানুষের এই বসতিটি পরীক্ষা করে দেখছিল তখন লি-রয় আর য়ুন বসতির মূল তথ্যকেন্দ্রে এই গ্রহ সম্পর্কে কী কী তথ্য রয়েছে সেগুলোতে চোখ বুলাতে শুরু করল। তথ্যগুলো সুবিন্যস্ত নয়, এই বসতির মানুষেরা সত্যিকার মানুষের জীবন যাপন করে নি—গ্রহান্তরে মানুষের বসতিতে যে ধরনের নিয়মকানুন মানার কথা সে ধরনের নিয়ম এখানে মানা হয় নি। কাজেই গ্রহ এবং গ্রহের নিম্নস্তরের প্রাণ গ্রুনি সম্পর্কে তথ্যগুলো ছিল ছড়ানো ছিটানো। তথ্যগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে চার জন মানুষ খুব বেশি সাহায্য করতে পারল না। দীর্ঘদিন থেকে এক ধরনের আতঙ্কিত জীবন যাপন করে তারা খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে।

রিশান এবং নিডিয়াও বসতিটি পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল এটি দীর্ঘদিন থেকে মনুষ্য বাসের অনুপযোগী। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে দৈনন্দিন যেসব বিষয়ের প্রয়োজন এখানে সেগুলোও নেই। সমস্ত বসতিটি অগোছালো এবং নোংরা। রসদপত্র ছড়ানো ছিটানো—নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো অনিয়মিত। বসতিটিতে ঘোলাটে এক ধরনের আলো এবং সেই আলোতে সবকিছুকে কেমন জানি ভূতুড়ে দেখায়। তাপমাত্রা নিয়মিত নয় এবং

থেকে–থেকেই তারা শীতে কেঁপে–কেঁপে উঠছে। পুরো বসতিটিতে এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যে, কোনো স্বাভাবিক মানুষ এখানে থাকলে কিছুদিনের মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাবার কথা। রিশান এবং নিডিয়া মানুষের বসতিটি পরীক্ষা করতে করতে তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করল, এখানে বড় বড় শীতলঘরে নানা ধরনের রসদ মজুদ থাকার কথা। রসদগুলো পরীক্ষা করতে করতে তারা একটি ঘরে হাজির হল। ভল্টের গোপন সংখ্যা প্রবেশ করাতেই দরজাটি ঘরঘর শব্দে খুলে যায় এবং সাথে সাথে দুজনে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। ঘরের দেয়ালে সারি সারি মানুষের মৃতদেহ। মৃতদেহগুলো সংরক্ষণের জন্যে কোনো এক বিচিত্র কারণে দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং সেগুলো এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পুরো ব্যাপারটিতে এক ধরনের বিচিত্র অস্বাভাবিকতা যেটি সহ্য করার মতো নয়। নিডিয়া রিশানের হাত জাপটে ধরে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দিচ্ছি, এক সেকেন্ড। আমাকে একটি জিনিস দেখে নিতে দাও।

কী দেখবে?

মানুষগুলোকে—

তোমার পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে ছবি উঠে গেছে, তুমি সেখানে দেখতে পারবে। চল যাই।

হ্যাঁ যাচ্ছি।

রিশান যাবার আগে আবার তাকাল, একসাথে সে আগে কখনো এতগুলো মৃতদেহ দেখেছে কি না মনে করতে পারে না। আর মৃতদেহগুলো রেখেছে কী বিচিত্রভাবে, দেখে মনে হয় হঠাৎ সবাই হেঁটে বের হয়ে আসবে। কিছু পুরুষ এবং কিছু মেয়ে, সেই কোন সুদূর পৃথিবী থেকে এসে এই কদর্য গ্রহটিতে জীবন দিয়েছে।

নিডিয়া তখনো রিশানের হাত ধরে রেখেছিল, কাঁপা গলায় বলল, আমার ভালো লাগছে না, চল ফিরে যাই।

ফিরে যাবে? বেশ। তুমি যাও আমি বাকিটুকু দেখে আসি।

না। নিডিয়া মাথা নেড়ে বলল, আমার একা যেতে ভয় করছে। তুমিও আস।

রিশান অবাক হয়ে নিডিয়ার দিকে তাকাল, ভয় করছে? কিসের ভয়?

জানি না। আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ করে এতগুলো মৃতদেহ দেখে কেমন জানি সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে। নিডিয়া আবার শিউরে ওঠে।

রিশান আর নিডিয়া ফিরে এসে দেখে তথ্যকেন্দ্রের বড় মনিটরের সামনে লি–রয় আর ষুন বসে আছে—গ্রহের চার জন অপ্রকৃতিস্থ মানুষ জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাছে। লি–রয় মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস করল, তথ্যকেন্দ্রের অনেক তথ্য দেখি নষ্ট করা হয়েছে। কেন নষ্ট করলে?

চার জন মানুষের মাঝে যে মানুষটি তুলনামূলকভাবে বয়স্ক—একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কিছু করার নেই, তাই—

তাই মূল্যবান তথ্য নষ্ট করবে?

মূল্যবান নয়। সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়ে গেছে—

লি–রয় চিন্তিত মুখে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে রইল।

রিশান জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার লি–রয়?

এখানে সবকিছু কেমন জানি খাপছাড়া। তথ্যকেন্দ্রে নানা ধরনের গোলমাল রয়েছে। অনেক রকম মূল্যবান তথ্য নষ্ট করা হয়েছে।

কেন?

জানি না। তবে পৃথিবীর একটা নির্দেশ আছে এখানে।

কী নির্দেশ?

এই দেখ, আমি শোনাচ্ছি তোমাদের।

নিডিয়া আর রিশান কাছে এগিয়ে গেল। পৃথিবীর যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা, গোপনীয়তার মাত্রা, প্রয়োজনীয় কোড নাম্বার সবকিছু শেষ করে নির্দেশটি শুরু হল। ছয় লাল তারার একজন বয়স্ক মানুষ হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে জীবন্ত হয়ে আসে। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মানুষটি কথা বলতে শুরু করে, আমি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান এম সাতুর। আমি আমার পদাধিকার বলে এবং আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দিচ্ছি। সৌরজগৎ থেকে প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরে এই গ্রহটি, যার অবস্থান নিষাদ স্কেলে চার চার শূন্য চার তিন এবং পাঁচ পাঁচ আট চার ছয় এবং যেখানে মানুষের অভিযান তিন তিন দুই চার সুসম্পন্ন হয়েছে, আমি সেই গ্রহের মানুষদের কিংবা যারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে এসেছে সেই মানুষদের এই নির্দেশ দিচ্ছি।

এই গ্রহটিতে একটি নিম্নস্তরের প্রাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। দীর্ঘ সময় এই প্রাণীটির ওপর গবেষণা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে এটি একটি এককোষী প্রাণী। এই প্রাণীটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমাদের সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে সেটি সম্পর্কে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। কিন্তু এই গ্রহটি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল রয়েছে। সৌরজগৎ থেকে বের হয়ে ছায়াপথের দিকে যাত্রা শুরু করার সময় এই গ্রহটি পৃথিবীর মানুষের জন্যে একটি সাময়িক আবাসস্থল হতে পারে। এর অবস্থান নানা কারণে আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে এই গ্রহের এককোষী প্রাণীটি—যেটি একটি জীবাণু ছাড়া আর কিছু নয়, মানুষের নিরাপত্তার জন্যে একটি হুমকিস্বরূপ।

পুরো ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে এই গ্রহটিকে জীবাণুমুক্ত করা হবে। কাজেই এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গ্রহের এককোষী প্রাণীগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। দীর্ঘদিনের গবেষণার কারণে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি কীভাবে এই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করা সম্ভব। তার জন্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্যে কিংবা নিয়ে আসার জন্যে অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য রয়েছে মহাকাশ নির্দেশমালা তিন তিন চার নয় অনুচ্ছেদের সাত সাত আট চার অংশে।

লি-রয় মনিটর স্পর্শ করে হলোগ্রাফিক ছবিটি অদৃশ্য করে দিয়ে বলল, নির্দেশটা এখানেই শেষ, এরপরে রয়েছে নানারকম খুঁটিনাটি।

রিশান অন্যমনস্কভাবে নিজের চুলে আঙুল প্রবেশ করিয়ে বলল, কিছু একটা গোলমাল আছে এখানে।

সবাই ঘুরে তাকাল রিশানের দিকে। ষুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কী গোলমাল?

আমি জানি না কী, কিন্তু কিছু একটা গোলমাল আছে। একটা জীবন্ত প্রাণীকে এত সহজে ধ্বংস করার কথা নয়।

ষুন বলল, এটা কোনো জীবন্ত প্রাণী নয়। এটা জীবাণু। মানুষ অতীতে অনেক জীবাণু ধ্বংস করেছে। আমি যতদূর জানি বসন্ত নামে একটা ভয়াবহ রোগ ছিল পৃথিবীতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সেটি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

লি-রয় বলল, এই জীবাণুটি তো পুরোপুরি ধ্বংস করা হচ্ছে না। তার নমুনা নিশ্চয়ই রাখা আছে কোথাও। যদিও আমি জানি না এই নমুনাটি কী কাজে লাগবে!

রিশান চিন্তিত মুখে বসতির চার জন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠিক বুঝতে পারছে না কী, কিন্তু কিছু একটা গোলমাল আছে কোথাও। সেটা কী ধরতে পারছে না।

ষুন লি-রয়কে বলল, আমাদের কাজ তাহলে খুব সহজ হয়ে গেল। এই চার জন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, গ্রহটিকে জীবাণুমুক্ত করা, তারপর আবার আগের কাজে ফিরে যাওয়া।

কিছু একটা গোলমাল আছে এখানে। রিশান মাথা নেড়ে বলল, কিছু একটা গোলমাল আছে।

ষুন রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যদি না জান গোলমালটা কোথায়, তাহলে সেটা নিয়ে চেঁচামেচি করে তো কোনো লাভ নেই।

রিশান ষুনের কথা শুনল বলে মনে হল না। সে হঠাৎ ঘুরে অপ্রকৃতিস্থ চার জন মানুষের দিকে তাকাল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল, এখানে সবাই মারা গিয়েছে, তোমরা চার জন কেন মারা যাও নি?

চার জন মানুষ এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। রিশান চোখের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, তোমরা পৃথিবীতে ফিরে না গিয়ে এই নির্জন গ্রহে রয়ে গেলে কেন?

আমাদের মহাকাশযান নষ্ট হয়ে গেছে।

কেমন করে নষ্ট হল?

আমরা জানি না।

পৃথিবীতে খবর পাঠালে না কেন?

পাঠিয়েছি।

রিশান কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারা আরো কিছু বলবে ভেবে কিন্তু মানুষগুলো কিছু বলল না। রিশান আবার তীব্র গলায় বলল, এখানে সব মানুষ মারা গিয়েছে কিন্তু তোমরা কেন মারা যাও নি? বল—

নিডিয়া রিশানের হাত স্পর্শ করে বলল, তুমি শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছ রিশান, তারা মারা যায় নি সেটা তাদের অপরাধ হতে পারে না।

ষুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়েছিল। এবারে ঘুরে লি-রয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, লি-রয়, আমাদের কি রিশানের উত্তেজিত কথাবার্তা শোনার প্রয়োজন আছে? আমরা কি আমাদের কাজ শুরু করতে পারি? আরো দুটি স্কাউটশিপ, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি নামাতে পারি?

পার। তুমি কাজ শুরু করে দাও ষুন।

ষুন যোগাযোগ মডিউলটা কাছে টেনে নিয়ে কথা বলতে শুরু করছিল, হঠাৎ রিশান চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও।

কী হয়েছে?

ওই দেখ। রিশান আঙুল দিয়ে দেয়ালের দিকে দেখায়।

কী? লি-রয় অবাক হয়ে বলল, কী?

রিশান এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বসে দেয়ালের দিকে তাকায়। সেখানে কাঁচা হাতে

AMARBOI.COM

লেখা, আমি রবোটকে ঘৃণা করি।

রিশান ঘুরে তাকাল মানুষ চার জনের দিকে, বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আমি জানি তোমরা চার জন কেন মারা যাও নি। তোমরা আসলে মানুষ নও।

মানুষ চার জন কোনো কথা বলল না। কেমন জানি বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে রইল।

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি টেনে নিয়ে চিৎকার করে বলল, তোমরা রবোট।

মানুষ চার জন কোনো কথা বলল না।

নিডিয়া আর্তচিৎকার করে বলল, হায় ঈশ্বর!

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটা টেনে গুলি করার জন্যে লক ইন করে হুঙ্কার দিয়ে বলল, কথা বল আবর্জনার দল, না হয় গুলি করে তোমাদের ফাঁপা কপোট্রন গুঁড়ো করে দেব। তোমরা রবোট?

হ্যাঁ।

আগে বল নি কেন?

তোমরা জিজ্ঞেস কর নি।

রিশান অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে জিজ্ঞেস করল, দেয়ালে এই লেখাটা কার?

সানির।

সানি?

হ্যাঁ।

কে সে?

একটা ছেলে। দশ বছর বয়স।

কোথায় সে?

রবোট চারটি কোনো কথা বলল না।

রিশান চিৎকার করে বলল, কথা বল।

জানি না।

জান না?

না। বসতি থেকে বের হয়ে গেছে।

দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে একা একা এই বসতি থেকে বের হয়ে গেছে?

রবোট চারটি কোনো কথা বলল না। রিশান এটমিক ব্লাস্টারটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আবর্জনার বাটি, নোংরা প্লাস্টিক, সত্যি কথা বল, না হয় এক সেকেন্ডে তোমাদের কপোট্রন আমি ধুলো করে উড়িয়ে দেব! তোমাদের মহাকাশযান কেমন করে নষ্ট হয়েছে?

রবোট চারটি কোনো কথা বলল না।

কথা বল।

গ্রুনিরা ইঞ্জিন ক্যাপের সেফটি বালব খুলে নিয়ে গেছে। কন্ট্রোল প্যানেলের মূল প্রসেসর নষ্ট করেছে। ভ্যাকুয়াম সিল কেটে দিয়েছে। জ্বালানি ট্যাংক ফুটো করে—

গ্রুনিরা নিম্নশ্রেণীর প্রাণী নয়। তারা বুদ্ধিমান প্রাণী?

রবোট চারটি কোনো কথা বলল না।

রিশান চিৎকার করে বলল, কথা বল। গ্রুনিরা বুদ্ধিমান প্রাণী?

আমরা জানি না।

পৃথিবীর মহাকাশকেন্দ্র জানে?

রবোটদের এক জন মাথা নাড়ল। বলল, জানে।

AMARBOI.COM

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটা হাতবদল করে লি–রয়ের দিকে তাকাল, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, পৃথিবীর মহাকাশকেন্দ্র একটি বুদ্ধিমান প্রজাতিকে ধ্বংস করার জন্যে আমাদেরকে পাঠিয়েছে।

লি–রয় কোনো কথা বলল না। রিশান আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, অনুমতি দাও আমি এই জঞ্জালগুলোর কপোট্রন গুঁড়ো করে দিই।

তার অনেক সময় পাবে রিশান। লি–রয় একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, এখন তোমরা তোমাদের পোশাক পরে নাও। আমরা খুব বিপদের মাঝে আছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মহাকাশযানে ফিরে যেতে হবে।

রিশান তার এটমিক ব্লাস্টারটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে লি–রয়ের দিকে ঘুরে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তোমরা যাও লি–রয়। আমি পরে আসছি।

তুমি কী করবে?

ছেলেটাকে খুঁজে বের করব। এ রকম একটা গ্রহে দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি চিন্তা করতে পার?

৭

রিশান চোখে অবলাল সংবেদী চশমাটা লাগিয়ে সামনে তাকাল। যতদূর চোখ যায় শুকনো পাথর ছড়িয়ে আছে। ঝড়ো বাতাসে ধুলো উড়ছে, তার সাথে এক ধরনের চাপা গর্জন। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়া, এই গ্রহটি মানুষের বসবাসের জন্যে উপযোগী নয়। এই বিশাল গ্রহে দশ বছরের একটি ছেলে কোথাও হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে বের করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারটি বিকন ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেগুলো এই এলাকাটি স্ক্যান করা শুরু করেছে, দশ বছরের বাচ্চাটির পোশাকে যে বিপারটি লাগানো আছে সেটা খুঁজে পাওয়া মাত্র সেখানে লক্ষ্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর বিকনের সঙ্কেত অনুসরণ করে বাচ্চাটিকে খুঁজে বের করতে হবে। বাচ্চাটি এই বসতি থেকে কতদূরে সরে গিয়েছে তার ওপর নির্ভর করছে তাকে খুঁজে বের করতে কত সময় লাগবে। গ্রহটির বায়ুমণ্ডল যদি এত অস্বচ্ছ এবং এত আয়োনিত না হত তাহলে মহাকাশযানের অনুসন্ধানী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেত, কিন্তু এই গ্রহটিতে তার কোনো আশা নেই।

রিশান ঝড়ো হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে তার যোগাযোগ মডিউলটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মানুষের বসতিতে অন্যেরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে, বাচ্চাটিকে নিয়ে ফিরে গেলে সবাই মহাকাশযানে ফিরে যাবে। যদি সে বাচ্চাটাকে খুঁজে না পায়? যদি কোনো কারণে বাচ্চাটি তার বিপারটি বন্ধ করে দিয়ে থাকে? রিশান জোর করে চিন্তাটি মাথা থেকে সরিয়ে দিল।

ঝড়ো হাওয়ার একটা বড় ঝাপটা হঠাৎ রিশানকে প্রায় উড়িয়ে নিতে চায়, সে সাবধানে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। হলুদ ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে থাকে, অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক। রিশান দাঁতে দাঁত চেপে এটমিক ব্লাস্টারটি শক্ত করে ধরে রাখে। এই গ্রহের প্রাণীগুলো কি এখন তাকে লক্ষ করছে? গ্রুনি নামের এককোষী প্রাণী তো বুদ্ধিমান প্রাণী হতে পারে না, বুদ্ধিমান প্রাণীটা তাহলে কী রকম? তাদের জৈবিক ব্যবহার কী রকম?

AMARBOI.COM

জৈবিক কথাটি কি ব্যবহার করা যাবে এই প্রাণীটির জন্যে? তারা কি সত্যিই বুদ্ধিমান? মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে? মানুষের মতো কি বুদ্ধিমান? যদি সত্যিই মানুষের মতো বুদ্ধিমান হয়ে থাকে তাহলে প্রাণীগুলো মানুষকে মেরে ফেলেছে কেন? আর সত্যিই যদি সবাইকে মেরে ফেলে থাকে তাহলে এই বাচ্চাটিকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছে? রিশান জোর করে চিন্তাটুকু ঠেলে সরিয়ে দেয়, তার কাছে এখন যথেষ্ট তথ্য নেই যে ভেবে সে একটা কূলকিনারা পাবে।

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি হাতবদল করে তার অবলাল চশমা দিয়ে দূরে তাকাল। কী ভয়ঙ্কর অশরীরী একটি দৃশ্য, সৃষ্টিজগতে কি এর থেকে কুশ্রী, এর থেকে নিরানন্দ কোনো এলাকা আছে? একটি দশ বছরের বাচ্চা কি তার জীবনে এর থেকে ভালো কিছু পেতে পারে না?

ক্ষীণ একটা শব্দ শুনে রিশান তার যোগাযোগ মডিউলটির দিকে তাকাল, একটা লাল আলো জ্বলছে এবং নিভছে—যার অর্থ বিকন চারটি এই বাচ্চা ছেলেটিকে খুঁজে পেয়েছে। রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বসতিতে যোগাযোগ করল, নরম গলায় বলল, লি–রয়, বাচ্চাটিকে মনে হয় খুঁজে পাওয়া গেছে।

কোথায়?

এখান থেকে অনেক দূরে। এত ছোট একটি বাচ্চা একা এত দূরে কেমন করে গেল সেটা একটা রহস্য। আমি যাচ্ছি তাকে আনতে।

বেশ। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এদিকে আরো কিছু বিচিত্র জিনিস ঘটেছে—

কী?

তুমি ফিরে এস তখন বলব। তোমার কিছু সাহায্য লাগলে বল।

বলব।

রিশান যোগাযোগ কেটে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। দীর্ঘ পথ, হেঁটে যেতে অনেকক্ষণ লাগবে। একটু আগে যেটা ঝড়ো হাওয়া ছিল, মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে সেটা পুরোপুরি একটা ঝড়ে পরিণত হতে যাচ্ছে।

বিকনের সঙ্কেত অনুসরণ করে রিশান হাঁটছে। খালি চোখে গ্রহটিকে যেরকম দুর্গম মনে হচ্ছিল হাঁটতে গিয়ে অনুভব করে সেটি তার থেকে অনেক বেশি দুর্গম। ছোট একটা বাই ভার্বাল নিয়ে আসার দরকার ছিল, কিন্তু কিছু আনা হয় নি। সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে এখন হাঁটার দিকে মনোযোগ দেয়। পুরো গ্রহটি পাথুরে—মাঝে মাঝে বিশাল গহ্বর। সমস্ত পথ উঁচু–নিচু, তার মাঝে হলুদ এক ধরনের ধুলো উড়ছে। মাধ্যাকর্ষণ বল কম বলে প্রতি পদক্ষেপেই সে একটু করে ভেসে উপরে উঠে যাচ্ছে। ঝড়ের গতি আস্তে আস্তে বাড়ছে, তার সাথে সাথে গ্রহের ঘোলাটে আলোটাও মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছে। তবে আলোটি স্থির নয়, ক্রমাগত নড়ছে, যার ফলে চোখের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে।

বিকনের সঙ্কেত অনুসরণ করে হেঁটে হেঁটে রিশান যত কাছে যেতে থাকে যোগাযোগ মডিউলে লাল আলোটি তত স্পষ্ট হতে থাকে। আলোটি কিছুক্ষণ আগেও নড়ছিল, এখন স্থির হয়েছে। মনে হচ্ছে ছেলেটি হাঁটা থামিয়ে কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছানোর ফলে রিশান যোগাযোগ মডিউলে আরো নানা ধরনের তথ্য পেতে থাকে, ইচ্ছে করলে সে এখন ছেলেটির সাথে কথা বলতে পারে, এমনকি হলোগ্রাফিক ছবিও পাঠাতে পারে, কিন্তু সে কিছুই করল না। দশ বছরের একটি বাচ্চা নেহাতই শিশু, তার সাথে একটু সতর্ক হয়ে

AMARBOI.COM

যোগাযোগ করা দরকার। বিশেষ করে সে যখন এ ধরনের কিছুই আশা করছে না।

শেষ অংশটি হল সবচেয়ে কঠিন। খাড়া একটি পাহাড় বেয়ে উঠে আবার নিচে নেমে যেতে হল। এখানকার পাথরগুলোও দুর্বল, পায়ের চাপে হয় খুলে আসছিল নাহয় ভেঙে যাচ্ছিল। রিশান প্রচণ্ড পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটি বাই ভার্বাল না নিয়ে আসা নেহাতই বোকামি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে শক্ত একটা পাথর খুঁজে বের করে সেখানে হেলান দিয়ে বসে বড় বড় নিশ্বাস নিতে থাকে। চারদিকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকার নেমে এসেছে, হঠাৎ কোথায় জানি আলো ঝলসে উঠল, আর রিশান চমকে উঠে দেখে তার সামনে একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল মানুষের মতো, একটি নারীমূর্তি।

রিশান চিৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ বন্ধ করল, বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে আমার। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে নানা ধরনের দৃশ্য দেখছি; যখন খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চোখ খুলব, দেখব কিছু নেই। রিশান বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে আবার চোখ খুলল, সত্যিই কোথাও কিছু নেই।

রিশান বুঝতে পারে এখনো তার বুক ধকধক করছে। নারীমূর্তিটি এত বাস্তব ছিল যে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিল তার সামনে বুঝি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মেয়ে কোথা থেকে আসবে? যে বুদ্ধিমান প্রাণীটি রয়েছে সেটি দেখতে পৃথিবীর মেয়েদের মতো হবে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। সৃষ্টিকর্তা বলে সত্যিই যদি কেউ থাকে তাঁর কল্পনাশক্তি নিশ্চয়ই এত কম নয় যে, সব বুদ্ধিমান প্রাণীকে মানুষের রূপ দিয়ে তৈরি করবে। রিশান মাথা থেকে চিন্তাটি দূর করে দিল। সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইছে না যে সে ভয় পেয়েছে।

বিকনের সঙ্কেত অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মাঝেই সে পাহাড়ের একটা গুহার কাছাকাছি হাজির হল—ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি বের হয়ে আসছে। রিশান বাইরে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভিতরে ঢুকল। গুহাটি বেশ বড়, মাঝামাঝি একটা বড় পাথরের উপরে একটা ছোট জিনন ল্যাম্প জ্বলছে, তার কাছাকাছি একটা ছোট ছেলে মহাকাশচারীর পোশাক পরে শুয়ে আছে। রিশানকে ঢুকতে দেখে ছেলেটি বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ায়, নিচে থেকে কী একটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে গিয়ে সেটা রিশানের দিকে তাক করে দাঁড়ায়, রিশান জিনিসটি চিনতে পারল, একটা প্রাচীন কিন্তু কার্যকরী অস্ত্র।

রিশান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সে ছেলেটার রিনরিনে গলার স্বর শুনতে পেল, হাতের অস্ত্র ফেলে দাও না হয় গুলি করে তোমার কপোট্রন ফুটো করে দেব।

রিশান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ছেলেটা আবার ধমক দিয়ে ওঠে, এক্ষুনি—

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি ছুড়ে ফেলে দিল।

এবার দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াও।

রিশান দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল।

এবারে ডান হাত নামিয়ে সাবধানে তোমার কপোট্রনের সুইচ অফ করে দাও, একটু ভুল করেছ কি গুলি করে তোমার কপোট্রন উড়িয়ে দেব।

আমার কপোট্রনের সুইচ নেই, আমি একজন মানুষ।

আমি বিশ্বাস করি না। ছেলেটা তীব্র স্বরে বলল, এখানে কোনো মানুষ নেই, সব রবোট।

আমি এখানে থাকি না। আমি পৃথিবী থেকে এসেছি। তোমাকে উদ্ধার করে নিতে এসেছি।

বিশ্বাস করি না। ছেলেটা তার রিনরিনে গলার স্বরে চিৎকার করে অস্ত্রটা বিপজ্জনকভাবে ঝাঁকিয়ে বলল, বিশ্বাস করি না। তুমি কাছে আসবে না।

ঠিক আছে, আমি কাছে আসব না।

কী চাও তুমি?

আমি তোমাকে বলেছি, আমি একজন মানুষ। এই গ্রহ থেকে একটা বিপদ সঙ্কেত পেয়ে নেমে এসেছি। এসে শুনেছি তুমি এখানে আছ। আমি তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

আমি যেতে চাই না, কোথাও যেতে চাই না, তুমি যাও।

রিশানের বুক হঠাৎ এই বাচ্চাটির জন্যে গভীর মমতায় ভরে আসে, সে নরম গলায় বলল, তুমি যদি যেতে না চাও আমি তোমাকে জোর করে নেব না সানি। কিন্তু যদি তুমি আমার সাথে কথা বল তাহলে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি আমার সাথে পৃথিবীতে যাবে।

কেন?

সেটা আমি তোমাকে এখন বলব না। আমি কি এখন একটু কাছে আসতে পারি?

না। তুমি কাছে আসবে না।

ঠিক আছে, তুমি যদি না চাও আমি তোমার কাছে আসব না। এই দেখ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

না, তুমি চলে যাও।

রিশান মাথা নাড়ল, না আমি যাব না।

যদি না যাও, তাহলে আমি তোমাকে গুলি করব।

রিশান আবার মাথা নাড়ল, না, তুমি গুলি করবে না। তুমি একজন মানুষ, আমি আরেকজন মানুষ। একজন মানুষ কখনো আরেকজন মানুষকে গুলি করে না।

ছেলেটি খানিকক্ষণ রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি সত্যি মানুষ?

আমি সত্যি মানুষ।

তুমি হাসতে পার?

আমি হাসতে পারি।

ছেলেটি একটু ইতস্তত করে বলল, তাহলে তুমি একবার হাস।

রিশান হাসিমুখে বলল, মানুষ এমনি এমনি তো হাসতে পারে না, তুমি একটা হাসির গল্প বল, আমি হাসব।

আমি হাসির গল্প জানি না। ছেলেটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি জান?

রিশান আরো একটু এগিয়ে যায়, আমিও খুব বেশি জানি না কিন্তু কয়েকটা জানি। তুমি যদি শুনতে চাও, তোমাকে আমি বলব।

ছেলেটি কোনো কথা বলল না। রিশান আরো একটু এগিয়ে যায়, ছেলেটি তখনো তার দিকে প্রাচীন অস্ত্রটি তাক করে ধরে রেখেছে। রিশান বলল, তুমি যেভাবে নিজেকে রক্ষা করছ আমি দেখে মুগ্ধ হয়েছি! তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে আমার অস্ত্রটি দেখাতে পারি। দেখবে?

ছেলেটি মাথা নাড়ল। রিশান সাবধানে এটমিক ব্লাস্টারটি হাতে তুলে নিয়ে গুহার বাইরে দূরে একটা বড় পাথরের দিকে তাক করে ট্রিগার টেনে ধরে, একটা নীল আলো ঝলসে উঠে

সাথে সাথে পুরো পাথরটি চূর্ণ হয়ে উড়ে যায়। ছেলেটি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি সানির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি নেবে?

ছেলেটি সাগ্রহে সেটা টেনে নিল। রিশান বলল, এখন তুমি আমাকে কাছে বসতে দেবে?

ছেলেটি মাথা নাড়ল, বলল, বস।

রিশান ছেলেটার কাছে বসে তার দিকে তাকাল, মহাকাশচারীর পোশাকের স্বচ্ছ হেলমেটের ভিতরে একটি কমবয়সী শিশু—চোখে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিশানের দিকে তাকিয়ে আছে। রিশানের খুব ইচ্ছে করল তার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে কোমল স্নেহের একটা কথা বলে। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়, বিষাক্ত গ্যাসের গ্রহটিতে মহাকাশচারীর পোশাকের আড়ালে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাছাড়া দশ বছরের এই ছেলেটিকে কেউ কখনো স্নেহের কথা বলে নি। অনভ্যস্ত হাতে যে অস্ত্র ধরে রাখে, তাকে স্নেহের কথা বললে সে কি সেটি বুঝতে পারবে?

রিশান একটি নিশ্বাস ফেলে নরম গলায় বলল, সানি, চল আমরা তাহলে যাই।

কোথায়?

প্রথমে বসতিতে, সেখানে অন্য সবাইকে নিয়ে মহাকাশযানে। ছেলেটা একটু অবাক হয়ে রিশানের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, এখন তো যেতে পারব না।

কেন?

দেখছ না ঝড় উঠেছে। এই ঝড় বেড়ে যাবে তারপর আকাশ থেকে আগুন পড়তে থাকবে—

আগুন?

হ্যাঁ, দেখা যায় না কিন্তু আগুন। যেখানে পড়বে সেটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে! দেখছ না আমি এই গুহায় বসে আছি।

রিশান বাইরে তাকাল, সত্যি সত্যি বাইরে ঝড়ের গতি অনেক বেড়েছে আর স্থানে স্থানে সত্যি নীলাভ এক ধরনের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে!

AMARBOI.COM

৮

পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে রিশান, তার ডান পাশে সানি গুটিসুটি মেরে বসেছে। তার হাতে এখন কোনো অস্ত্র নেই, সে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে যে রিশান সত্যিই একজন মানুষ এবং সে সম্ভবত সানিকে সত্যি সাহায্য করতে চায়। তাদের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দুটি হলোগ্রাফিক ছবি—একটিতে মহাকাশযান থেকে হান এবং বিটি; অন্যটিতে এই গ্রহে মানুষের এককালীন বসতি থেকে লি–রয়, নিডিয়া এবং ষুন।

বাইরে ঝড়ের বেগ খুব বেড়েছে এবং মাঝে মাঝেই ছোটখাটো বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে, তার মাঝে সবাই কোনোভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। লি–রয় বলল, রিশান তুমি সত্যিই কোনোরকম সাহায্য চাও না? ইচ্ছে করলে আমরা মহাকাশযান থেকে একটা বিশেষ স্কাউটশিপের ব্যবস্থা করতে পারি—

কোনো প্রয়োজন নেই। রিশান মাথা নেড়ে বলল, আমার এখানকার গাইড সানি বলেছে এই ঝড় এক সময়ে থেমে যাবে তখন হেঁটে চলে যেতে পারব। তাছাড়া এখন বৃষ্টির মতো

এসিড পড়ছে, কোনো স্কাউটশিপ পাঠানো মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মহাকাশযান থেকে বিটি বলল, কখন যে তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসবে এবং কখন যে আমরা এই পোড়া গ্রহ থেকে বের হতে পারব কে জানে!

লি–রয় হেসে বলল, অধৈর্য হোয়ো না বিটি! প্রথমে আমরা এই গ্রহটাকে যেটুকু বিপজ্জনক ভেবেছিলাম এখন আর সেরকম বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না।

কারণটা কী?

গত কয়েক ঘণ্টা নিডিয়া এই গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে সত্যিকারের খানিকটা গবেষণা করেছে। সেটা করার পর মনে হচ্ছে অবস্থা খুব খারাপ নয়। লি–রয় নিডিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, নিডিয়া তুমি বলবে?

বলছি। নিডিয়া হাতের ছোট ক্রিস্টাল ডিস্কটাতে চোখ বুলিয়ে বলল, মানুষ এই গ্রহের হিসেবে প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই গ্রহে বসতি করেছে। গ্রহটি বসতি স্থাপনের উপযোগী নয় তবু মানুষ এখানে বসতি করেছিল। কারণ এই গ্রহে এক ধরনের প্রাণের বিকাশ হয়েছিল। পৃথিবীর তুলনায় এই প্রাণ অত্যন্ত তুচ্ছ—এককোষী নিম্নস্তরের প্রাণ, বড়জোর এক ধরনের জীবাণুর মতো, কিন্তু একটি প্রাণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন এই নিম্নস্তরের প্রাণ নিয়ে গবেষণা করেছে, তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং এক সময়ে আবিষ্কার করেছে এটি সম্পর্কে আর জানার কিছু বাকি নেই। তখন তারা পৃথিবীতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিল, কিন্তু তাদের খুব দুর্ভাগ্য—ঠিক তখন তাদের একটা দুর্ঘটনা ঘটে, একজন বিজ্ঞানী এই এককোষী জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে কিছু করার আগেই মারা গেল।

এই গ্রহের এই মন খারাপ করা পরিবেশে সেটা তাদের জন্যে খুব বড় এটা আঘাতের মতো ছিল এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী দাবি করেছে তারা মাঝে মাঝে তাদের মৃত সহকর্মীকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে—

রিশান বাধা দিয়ে বলল, কী বললে তুমি? তাদের মৃত সহকর্মীকে দেখেছে?

হ্যাঁ, কিন্তু সেটা মানসিক চাপ থেকে সৃষ্টি এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম, নানা ধরনের অভিযানে এ রকম ব্যাপার ঘটেছে বলে শোনা গেছে। যাই হোক, বিজ্ঞানীরা যখন পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন—

রিশান আবার বাধা দিয়ে বলল, কী রকম ছিল তাদের সহকর্মী? স্পষ্ট না অস্পষ্ট?

নিডিয়া একটু অবাক হয়ে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, সেটা পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ নেই—যেটুকু আছে তাতে মনে হয় অস্পষ্ট ছায়ার মতো—

কতক্ষণ দেখেছে তারা?

খুব অল্প সময়। নিডিয়া ঘুরে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এই ব্যাপারটি নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

না, এমনি। বলে যাও যা বলছিলে।

হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা যখন ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তারা আবিষ্কার করে তাদের মহাকাশযানটি কারা যেন নষ্ট করে গেছে। সেটি এমনভাবে নষ্ট করা হয়েছে যেটি শুধুমাত্র আরেকজন মানুষ করতে পারে—প্রথমে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিল তাদের মাঝে কেউ একজন করেছে কিন্তু সেটি কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাপার নয়।

বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে, শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে এই গ্রহে নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। সেই প্রাণীকে তারা খুঁজে বের

করার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পায় নি। এদিকে একজন একজন করে সবাই সেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

রিশান বাধা দিয়ে বলল, না সবাই না। সানি বেঁচে আছে।

হ্যাঁ, সানি ছাড়া সবাই মারা গেছে। সানির ভিতরে নিশ্চয়ই সেই জীবাণুর প্রতিষেধক কিছু একটা রয়ে গেছে যেটা আর কারো নেই। বিজ্ঞানীরা সেটা জানত না—আমরা জানি।

লি-রয় বলল, এর মাঝে কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপার রয়েছে। যেমন—এটা মোটামুটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এখানে কোনো এক ধরনের বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে কিন্তু কিছুতেই সেই প্রাণীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই প্রাণী মানুষের মহাকাশযানকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কিন্তু কখনো সোজাসুজি কোনো মানুষের ক্ষতি করে নি। এই গ্রহের মানুষেরা মারা গেছে এই জীবাণু দ্বারা—যেটার নাম গ্রুনি। কাজেই বলা যায় আমাদের সেই বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে গ্রুনি থেকে। এই জীবাণু থেকে!

নিডিয়া বলল, সেটা খুব সহজ। আমরা যতক্ষণ এই গ্রহে থাকব, মহাকাশচারীর পোশাক পরে থাকতে হবে। এর ভিতরের পরিবেশ পুরোপুরি পরিশুদ্ধ। বাইরে থেকে কোনো জীবাণু এর ভিতরে আসতে পারবে না।

মহাকাশযান থেকে বিটি বলল, শুনে খুশি হলাম কিন্তু তবুও তোমাদের বেশিক্ষণ এই গ্রহে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ঝড়টা কমে যাওয়া মাত্র এখানে চলে আস।

হ্যাঁ চলে আসব।

লি-রয় বলল, এই গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীগুলোর কাজকর্মগুলো যদি খুব ভালোভাবে লক্ষ করা যায় তাহলে একটা বিচিত্র জিনিস চোখে পড়ে।

রিশান জিজ্ঞেস করল, কী?

বুদ্ধিমান প্রাণীটির বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে বেড়েছে। প্রথমে সে ছোটখাটো কৌশল করেছে, যতই দিন যাচ্ছে তার কৌশল বেড়েছে। দেখে মনে হয় প্রায় মানুষের মতো—যেন আস্তে আস্তে শিখছে।

নিডিয়া বলল, এই গ্রহে দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার রয়েছে। কোনো বিচিত্র গ্রহে যখন মহাকাশচারীরা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে সবসময় তারা কিছু কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। অবাস্তব জিনিসপত্র দেখে—অপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা হয়—এর সবই এক ধরনের বিভ্রম। কিন্তু এই গ্রহে যারা ছিল তাদের অপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে বেশি। সত্যি কথা সেই অপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলো পড়লে মনে হয় সত্যি সত্যি বুঝি সেগুলো ঘটেছে।

রিশান স্থির চোখে বলল, কী রকম ঘটনা?

নিডিয়া ইতস্তত করে বলল, আমি এখন ঠিক সেগুলো বর্ণনা করতে চাই না, মনের মাঝে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি করতে পারে।

তবুও শুনি।

যেমন একজন বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা লেখা আছে, সে এই গ্রহে একা একা হাঁটছিল। হঠাৎ—নিডিয়া কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

হঠাৎ কী?

হঠাৎ সে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আবছা আবছা দেখতে পায় তার দিকে কী যেন এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে, কাছাকাছি এলে দেখতে পেল একটা হাত—

হাত?

হ্যাঁ, কনুই পর্যন্ত একটা হাত—তাকে নাকি জাপটে ধরার চেষ্টা করছিল, সেই বিজ্ঞানী ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে ছুটে কোনোভাবে পালিয়ে এসেছে। কয়েকদিন পর সে মারা গেল। নিডিয়া নিশ্বাস ফেলে বলল, খুব মন খারাপ করা গল্প।

হ্যাঁ। রিশান মাথা নেড়ে বলল, ঠিকই বলেছ।

খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে। নিডিয়া আবার কী একটা বলার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখন ষুন বলল, এতক্ষণ নিডিয়া যেটা বলেছে তার সাথে পৃথিবীর নির্দেশের কিন্তু কোনো মতবিরোধ নেই।

রিশান সোজা হয়ে বলল, কী বলতে চাইছ তুমি?

আমি বলছি যে পৃথিবী থেকে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে গ্রহটিকে জীবাণুমুক্ত করতে। এই জীবাণু বুদ্ধিমান প্রাণী নয়, কাজেই একে ধ্বংস করতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়—

রিশান বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু যে-কোনো জীবিত প্রাণী অন্য জীবিত প্রাণীর ওপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে গাছপালার কোনো বুদ্ধি নেই, এখন আমরা যদি সব গাছ ধ্বংস করে দিই তাহলে পৃথিবীতে কি অন্যান্য বুদ্ধিমান প্রাণী বেঁচে থাকতে পারবে?

ষুন একটু রেগে উঠে বলল, গাছ আর জীবাণু এক ব্যাপার নয়। তাছাড়া এই ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এখানকার সমস্ত তথ্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমাদের সেই সিদ্ধান্ত মানতে হবে। যদি আমাদের ভালো নাও লাগে মানতে হবে। তারা হয়তো কিছু একটা জানে যেটা আমরা জানি না।

সেটা কী?

ষুন মাথা নাড়ল, আমি জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তাদের সিদ্ধান্ত মানুষের মঙ্গলের জন্যে—আমাদের সেটা মানতেই হবে। এই গ্রহ ছেড়ে যাবার আগে আমাদের গ্রুনি জীবাণুকে ধ্বংস করে যেতে হবে।

রিশান লি-রয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কী বল লি-রয়?

লি-রয় একটু ইতস্তত করে বলল, ষুন সত্যি কথাই বলেছে রিশান। ব্যাপারটা আমরা আরো ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখব, কিন্তু মনে হয় ফিরে যাবার আগে আমাদের গ্রুনি জীবাণুকে ধ্বংস করে যেতে হবে। তুমি যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পার এখানকার অদৃশ্য ভূতুড়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কোনোভাবে গ্রুনির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে তাহলে অবিশ্যি ভিন্ন কথা।

মহাকাশযান থেকে বিটি বাধা দিয়ে বলল, আমার মনে হয় এটা নিয়ে এখন তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই। সবাই নিরাপদে মহাকাশযানে ফিরে আস, তারপর দেখা যাবে। তাছাড়া রিশানকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তার মনে হয় বিশ্রাম নেয়া দরকার।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। লি-রয় গলা উঁচিয়ে বলল, সবাই এখন বিশ্রাম নাও। ঝড়টা কমে আসা মাত্র মহাকাশযানে ফিরে আসতে হবে। শুভরাত্রি।

টুক করে একটা শব্দ হয়ে হলোগ্রাফিক দৃশ্য দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে সানির দিকে তাকাল। সানি জ্বলজ্বলে চোখে রিশানের দিকে তাকিয়ে আছে। রিশান নরম গলায় বলল, ঘুমাও সানি, একটু বিশ্রাম নাও।

AMARBOI.COM

সানি খানিকক্ষণ তীব্র চোখে রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমরা এই গ্রহের কিছু জান না।

রিশান অবাক হয়ে বলল, কী জানি না?

কিছু জান না।

কেন এই কথা বলছ?

সানি কোনো কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রিশান খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, সানি, তুমি কেন এই কথা বলছ?

সানি কোনো কথা বলল না। রিশান আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে বলতে চাও না?

সানি মাথা নাড়ল। রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে তাহলে এখন তুমি ঘুমাও।

রিশান সানির পাশে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকে।

মহাকাশচারীর পোশাকে ঘুমানো খুব সহজ নয়, শুয়ে থেকে খানিকটা বিশ্রাম নেয়া হয়, তার বেশি কিছু নয়। দীর্ঘ সময় শুয়ে থেকে যখন রিশানের চোখে ঘুম নেমে আসে, হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখতে পায় গুহার মাঝামাঝি একটা নারীমূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিল, সে কি সত্যি দেখছে নাকি এটি তার দৃষ্টিবিভ্রম? চোখ বন্ধ করার আগে সে বুকের কাছে তার স্বয়ংক্রিয় ছবি তোলার যন্ত্রটি স্পর্শ করে, তারপর শক্ত করে দুই চোখ বন্ধ করে ফেলল।

দীর্ঘ সময় পর সে যখন চোখ খুলে তাকাল তখন গুহায় কিছু নেই। রিশান ঘুরে সানির দিকে তাকাল—একটা পাথরে হেলান দিয়ে সে ঘুমোচ্ছে। তার মুখে এক ধরনের বিস্ময়কর প্রশান্তি, একটি শিশু এ রকম একটি গ্রহে একা একা বেঁচে থাকার পরও তার মুখে কেমন করে এ রকম একটি প্রশান্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে পারে কে জানে। রিশান আবার ভালো করে তাকাল, শিশুটির মুখে শুধু প্রশান্তি নয় আরো একটা কিছু আছে যেটা সে প্রথমে ঠিক ধরতে পারে না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারল, শুধু প্রশান্তি নয় শিশুটির চেহারায় এক ধরনের নিষ্পাপ সারল্য আছে যেটা সে বহুকাল দেখে নি। রিশান এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রিশান দীর্ঘ সময় চুপচাপ শুয়ে রইল, ঘুরেফিরে তার শুধু নারীমূর্তিটির কথা মনে হতে থাকে। কেন সে বার বার একটি নারীমূর্তি দেখছে? এটি কি দৃষ্টিবিভ্রম নাকি সত্যি?

৯

সানি একটা উঁচু বেঞ্চে শুয়ে আছে, তার উপর উবু হয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করছে ষুন। ষুনের মাথার উপর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, পাশে বড় বড় মনিটর। একটা দশ বছরের শিশুর যেটুকু শান্ত হওয়ার কথা, সানি তার থেকে অনেক বেশি শান্ত। ষুনের কথামতো সে দীর্ঘ সময় বেঞ্চে চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, তার হাবভাব চালচলনে একজন বয়স্ক মানুষের ছাপ খুব স্পষ্ট।

রিশান আর নিডিয়া বেশ খানিকটা দূর থেকে সানি এবং ষুনকে লক্ষ করছিল। ষুন

তৃতীয়বারের মতো সানির রক্ত পরীক্ষা করে অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল, কিছু একটা হিসাব সে মিলাতে পারছে না। রিশান নিচু গলায় নিডিয়াকে জিজ্ঞেস করল, কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে?

হ্যাঁ। নিডিয়া মাথা নাড়ে। সানির শরীরে গ্রুনির বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধক থাকার কথা, সেটা পাচ্ছে না।

ও! রিশান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কি সানি সম্পর্কে কিছু জান? কোথা থেকে এসেছে, কী বৃত্তান্ত?

হ্যাঁ। কাল রাতে পড়ছিলাম। এই বসতিতে নারা নামে একটা মেয়ে থাকত, খুব সাহসী মেয়ে। যখন বুঝতে পারল দীর্ঘ সময় এই বসতিতে থাকতে হবে তখন সে খুব একটা সাহসের কাজ করল।

ভ্রূণ ব্যাংক থেকে একটা বাচ্চা নিয়ে নিল?

না, সেটা তো খুব সাহসের কাজ হল না। সে ঠিক করল নিজের শরীরে একটা বাচ্চা করবে। আগে যেরকম করে করা হত।

সত্যি?

হ্যাঁ। তারপর সে নিজের শরীরে একটা ভ্রূণ বসিয়ে সেই শিশুটির জন্ম দিল। সেই শিশুটি হচ্ছে সানি।

কী আশ্চর্য! রিশান অবাক হয়ে মাথা নাড়ে—এও কি সম্ভব? পৃথিবীতেও তো মানুষ আজকাল সন্তান গর্ভধারণ করে না।

হ্যাঁ, কিন্তু নারা নামের এই মেয়েটি করেছিল। বাচ্চাটি জন্ম হবার পর মেয়েটির জীবন পাল্টে গেল—কী যে আনন্দে ছিল পরের তিন বছর! নিডিয়া বিষণ্ন চোখে মাথা নেড়ে বলল, তিন বছর পর মেয়েটি মারা গেল, বাচ্চাটি একা একা বড় হয়েছে তারপর। একজন একজন করে সব মানুষ মারা গেল, তারপর বাচ্চাটি আরো একা হয়ে গেল। চারটি অপ্রকৃতিস্থ রবোট আর এই বাচ্চাটি! কী ভয়াবহ ব্যাপার—

AMARBOI.COM

রিশান আবার তাকাল, বেঞ্চে সানি চুপচাপ শুয়ে আছে, তার উপর ষুন খুব চিন্তিত মুখে উবু হয়ে ঝুঁকে আছে। গ্রুনির বিরুদ্ধে যে প্রতিষেধকটি তার শরীরে পাওয়া যাবে বলে সবাই ভেবেছিল সেটি তার শরীরে নেই। ষুন হতচকিতভাবে খানিকক্ষণ একটা মনিটরের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার আরো কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে সানির দিকে এগিয়ে যায়।

রিশান নিডিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, সানির মায়ের নাম ছিল নারা?

হ্যাঁ।

তার কি কোনো ছবি আছে?

হ্যাঁ, মূল তথ্যকেন্দ্রে তার ছবি আছে। কেন?

আমি, আমি একটু দেখতে চাই।

নিডিয়া উঠে দাঁড়াল, বলল, এস আমার সাথে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রিশান হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, নিডিয়া অবাক হয়ে বলল, কী হল থামলে কেন?

আমার একটা কথা মনে পড়েছে।

কী কথা?

মনে আছে প্রথম যখন আমরা এসেছিলাম তখন আমরা শীতলঘরে গিয়ে দেখেছিলাম সবগুলো মৃতদেহ পাশাপাশি দাঁড়া করানো আছে?

হ্যাঁ।

তার মাঝে একটা নিশ্চয়ই নারা।

হ্যাঁ।

রিশান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আমি সেই ঘরটিতে আরেকবার যেতে চাই।

কেন?

মৃতদেহগুলো আরেকবার দেখতে চাই।

নিডিয়া খানিকক্ষণ রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, চল।

শীতলঘরটিতে যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলল না। ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে দুজনেই একটু দ্বিধা করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত রিশান একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, এস নিডিয়া, আমি একা ভিতরে যেতে চাই না।

ভারি দরজাটা ঠেলে দুজনে ভিতরে ঢোকে, ভিতরে তাপমাত্রা অনেক কম; কিন্তু মহাকাশচারীর পোশাক পরে থাকায় দুজনের কেউ সেটা বুঝতে পারে না। মৃতদেহগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় হঠাৎ বুঝি সবগুলো একসাথে জেগে উঠে এগিয়ে আসবে। রিশান কয়েক পা এগিয়ে যায়। চোখের সামনে কাচে জমে থাকা জলীয় বাষ্পটুকু পরিষ্কার করে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃতদেহগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। প্রথম দুজন পুরুষ, তারপর একটি মেয়ে, তারপর আরো একজন পুরুষ। তারপর দুটি মেয়ে এবং তারপর আরেকজন পুরুষ। এই পুরুষটির পাশে দাঁড়ানো একটি মেয়ে এবং রিশান মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো জমে গেল।

নিডিয়া একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রিশান?

রিশান হাত তুলে কাঁপা গলায় বলল, এই কি নারা?

নিডিয়া অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে?

আমি যখন সানির খোঁজে বের হয়েছিলাম তখন একে দেখেছি।

নিডিয়া চমকে উঠে বলল, কী বললে? একে দেখেছ?

হ্যাঁ। স্পষ্ট দেখেছি, দুবার।

তোমার চোখের ভুল কিংবা দৃষ্টিবিভ্রম।

হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রম হয়ে এই মেয়েটিকে কেন দেখব?

জানি না। আমি জানি না। নিডিয়া মাথা নেড়ে বলল, চল এই ঘর থেকে বের হয়ে যাই। এই ঘরের ভিতরে আমার ভালো লাগে না।

চল যাই।

দুজনে কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে হাঁটতে থাকে। সিঁড়ির কাছাকাছি এসে রিশান বলল, আমি যখন দ্বিতীয়বার এই মেয়েটিকে দেখেছি তখন তার ছবি তুলে রেখেছি।

কোথায় সেই ছবি?

নিশ্চয়ই আমার তথ্যকেন্দ্রে আছে।

আমাকে দেখাও, আমি দেখতে চাই।

রিশান বুকের কাছাকাছি একটা সুইচ স্পর্শ করতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, আমার একটু ভয় করছে। যদি দেখতে পাই কিছু নেই?

AMARBOI.COM

নিডিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ভয় পাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে রিশান। তুমি ছবিটা বের কর।

রিশান ছবিটা বের করল এবং রিশানের সাথে সাথে নিডিয়াও সবিস্ময়ে দেখল ছবিতে সাদা একটি ছায়ামূর্তি স্থির চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ছবিটি কিংবা ছায়ামূর্তিটি খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু সেটি যে নারার ছায়ামূর্তি সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। দুজন কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না, রিশান অনুভব করল আতঙ্কের একটা বিচিত্র অনুভূতি তার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নিডিয়া রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় ব্যাপারটি সবাইকে জানানোর প্রয়োজন আছে।

হ্যাঁ, চল নিচে যাই।

নিচে বড় হলঘরটিতে চারটি রবোট পাশাপাশি বসেছিল। সানিকে নিয়ে পরীক্ষা শেষ হয়েছে, সে একটা গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ষুন চিন্তিত মুখে হাতে একটা ছোট ক্রিস্টাল ডিস্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রিশান এবং নিডিয়াকে দেখে একটু এগিয়ে এসে বলল, আমি সানিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি—অস্বাভাবিক কিছু পেলাম না। সে ঠিক অন্য সব মানুষের মতো।

তাকে ইচ্ছে করলেই গ্রুনি আক্রমণ করতে পারে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাকে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত করছে না?

না। রিশান সানির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আমরা এখন পর্যন্ত যেসব ব্যাপার ঘটতে দেখেছি তার থেকে একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, গ্রুনি অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর একটা জীবাণুবিশেষ; কিন্তু একটা খুব বুদ্ধিমান প্রাণী তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সানি যে এই জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে না তার কারণ সেই বিশেষ বুদ্ধিমান প্রাণী তাকে আক্রান্ত করতে চায় না।

ষুন ভুরু কুঁচকে বলল, আমি জানি না তুমি কেন এই কথা বলছ। অসংখ্যবার এই গ্রহকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, গ্রুনি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। এই গ্রহের একমাত্র জীবন্ত প্রাণী হচ্ছে গ্রুনি। গ্রুনি একটা জীবাণু ছাড়া কিছু নয়, তার বুদ্ধিমত্তা থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।

আমি সেটা নিয়ে এখন কিছু বলতে চাই না ষুন। কিন্তু আমি যখন সানিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম তখন কী দেখেছি তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি তার ছবি তুলে এনেছি, নিডিয়া সেই ছবি দেখেছে।

কিসের ছবি?

রিশান সানির দিকে তাকাল, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রিশান একটু ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন ঘরঘর করে কোয়ারেন্টাইন ঘরের দরজা খুলে লি-রয় বড় হলঘরটিতে ঢুকল। মহাকাশচারীর পোশাকের মাঝে তার চেহারাতে এক ধরনের বিচলিত ভাব।

রিশান লি-রয়ের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কী খবর লি-রয়?

আমি স্কাউটশিপটা দেখতে গিয়েছিলাম। তোমরা বিশ্বাস করবে না সেখানে কী হয়েছে।

কী?

খুব যত্ন করে কেউ একজন নিয়ন্ত্রণ মডিউলের মূল ভরকেন্দ্রটি নষ্ট করেছে। মহাকাশযান থেকে আরেকটা না আনা পর্যন্ত স্কাউটশিপটা চালানোর কোনো উপায় নেই।

কেউ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। হঠাৎ সানি একটু এগিয়ে এসে বলল, তোমার কি মাথা ব্যথা করছে?

লি-রয় অবাক হয়ে সানির দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে।

সানি লি-রয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার কি মাথার বাম পাশে বেশি ব্যথা করছে।

লি-রয় একটু অস্বস্তির সাথে ডান হাতটা উপরে তুলে বলল, হ্যাঁ মাথার বাম পাশে চিনচিন করে ব্যথা করছে?

ডান হাতটা কি তোমার অবশ লাগছে?

লি-রয় অবাক হয়ে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ। সত্যিই ডান হাতটা কেমন জানি অবশ অবশ লাগছে। তুমি কেমন করে জান?

সানি কোনো কথা না বলে লি-রয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর ঘুরে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, এই মানুষটিকে গ্রুনি আক্রমণ করেছে। একটু পরেই এই মানুষটি মারা যাবে। তাকে তোমরা শুইয়ে রাখ।

ঘরে কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই স্থির দৃষ্টিতে সানির দিকে তাকিয়ে থাকে, রিশান খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, কিন্তু— কিন্তু—লি-রয় মহাকাশচারীর পোশাক পরে আছে, তার ভিতরে কোনো কিছু ঢুকতে পারবে না।

লি-রয় হাত তুলে বলল, আমার মনে হয় সানি ঠিকই বলেছে, বাইরে আমার পোশাকের মাঝে হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম ফুটো হয়েছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আমার পোশাকের মূল মডিউল সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে আমাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি জানি বাইরে কিছুক্ষণের জন্যে আমার পোশাকটি নিশ্ছিদ্র ছিল না।

কেউ কোনো কথা বলল না। লি-রয় খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরের এককোনায় হেঁটে গিয়ে তার মহাকাশচারীর পোশাকটা খুলে ফেলতে ফেলতে বলল, এখন শুধুশুধু এটা পরে থাকার কোনো অর্থ হয় না—যা হবার তা হয়ে গেছে।

ষুন এগিয়ে গিয়ে বলল, কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের কথায় বিশ্বাস না করে—

লি-রয় হাত তুলে ষুনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সে হয়তো বাচ্চা ছেলে কিন্তু এই গ্রহের ব্যাপারে সে সম্ভবত একমাত্র অভিজ্ঞ মানুষ। তাছাড়া আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার শরীরের মাঝে কিছু একটা ঘটছে। আমি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার আগে তোমাদের সাথে ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাই। তোমরা কাছাকাছি আস।

লি-রয় মহাকাশচারীর পোশাক থেকে বের হয়ে লম্বা একটা বেঞ্চে বসে ক্লান্ত গলায় বলল, মহাকাশযান থেকে হান আর বিটিকে ডাক, আমি শেষবার তোমাদের সাথে কথা বলে নিই। লি-রয় সানির দিকে ঘুরে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, সানি—

সানি লি-রয়ের দিকে ঘুরে তাকাল।

আমার কতক্ষণ সময় আছে সানি?

বেশি সময় নাই। ঘণ্টাখানেক পরে তোমার ব্যথাটা কমে যাবে, তখন তোমার খুব ঘুম পেতে থাকবে। এক সময় তুমি ঘুমিয়ে যাবে তখন আর ঘুম থেকে উঠবে না।

ঘণ্টাখানেক তো খারাপ সময় নয়। এর মাঝে অনেক কিছু করে ফেলা যায়। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, এস তোমাদের আমি কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে যাই।

ষুন এগিয়ে এসে বলল, আমি তবু তোমাকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে চাই লি-রয়। তুমি এখানে শুয়ে পড়।

লি–রয় বাধ্য ছেলের মতো বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। য়ুন তার মাথায় একটা চতুষ্কোণ প্রোব লাগিয়ে একটা মনিটরের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল। লি–রয় মাথা ঘুরিয়ে য়ুনের দিকে তাকিয়ে বলল, নিশ্চিত হতে পেরেছ য়ুন?

য়ুন কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল।

লি–রয় জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, কথাটা খুব খারাপ শোনাবে তবু আমি একটা কথা বলে যাই। আমার ধারণা তোমরা যারা এখানে আছ তোমরা কেউ বেঁচে ফিরে যেতে পারবে না। কাজেই হান আর বিটি যেন কোনো অবস্থায় এই গ্রহে নেমে না আসে।

য়ুন মাথা নেড়ে বলল, আমাদের পৃথিবীর নির্দেশমতো গ্রহটিকে জীবাণুমুক্ত করা উচিত ছিল।

লি–রয় উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন সানি এগিয়ে এসে বলল, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?

কী কথা?

তুমি কি আমার মাকে একটা কথা বলবে?

তোমার মাকে?

হ্যাঁ। বলবে আমি এখানে এভাবে থাকতে চাই না। আমার ভালো লাগে না। আমি তার কাছে যেতে চাই।

লি–রয় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে বলব।

আর বোলো স্কাউটশিপে মূল ভরকেন্দ্র যেন ফিরিয়ে দেয়— যদি তারা রাজি না হয় তুমি নিজে ফিরিয়ে এনো।

লি–রয় অবাক হয়ে সানির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কী বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সানি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি যদি না বোঝ কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তবু তুমি শুনে রাখ। ঠিক আছে?

লি–রয় মাথা নাড়ল।

চারটি রবোট এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, হঠাৎ তারা চার জন একসাথে উঠে দাঁড়ায়। একজন গলা নামিয়ে বলল, শীতলঘরে জায়গা করতে হবে।

হ্যাঁ সতের নম্বর মৃতদেহটা ডানদিকে সরিয়ে দিয়ে নয় নম্বরটা সামনে নিয়ে এলেই হবে।

অন্য দুইজন কলের পুতুলের মতো মাথা নেড়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। নিডিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি খুবই দুঃখিত লি–রয়। আমি খুবই দুঃখিত।

লি–রয় খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, এখানে দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমি এখন যা বলি তোমরা মন দিয়ে শোন। আমাদের হাতে একেবারে সময় নেই।

সবাই একটু এগিয়ে আসে।

১০

য়ুন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে পা ছড়িয়ে বসেছে রিশান আর নিডিয়া। ঘরের মাঝামাঝি হলোগ্রাফিক একটা দৃশ্যে হান এবং বিটি বিষণ্ন মুখে বসে আছে। য়ুন সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, তোমরা নিশ্চয়ই জান সব মহাকাশচারীর ভিতরেই

AMARBOI.COM

একটা স্বপ্ন থাকে যে সে একবার পঞ্চম মাত্রার মহাকাশ অভিযানের নেতৃত্ব দেয়। লি–রয় মারা যাবার পর অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করে পঞ্চম মাত্রার অভিযান নয় নয় শূন্য তিনের নেতৃত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এর নেতৃত্বের জন্যে আমার বিন্দুমাত্র মোহ নেই। আমি কখনো এভাবে নেতৃত্ব পেতে চাই নি। কিন্তু যেহেতু এভাবে এটা আমার হাতে এসেছে আমাকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে কী করতে হবে সেটা আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নেয়া হয়ে গেছে। আমাকে শুধুমাত্র সেটা কার্যকর করতে হবে। আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি সেই কাজটি খুব সুচারুভাবে করব।

রিশান ষুনকে থামিয়ে বলল, তুমি এই গ্রহটিকে জীবাণুমুক্ত করার কথা বলছ?

হ্যাঁ, তোমরা সেটা নিয়ে যত ইচ্ছে তর্ক–বিতর্ক করতে পার তাতে আর কিছু আসে যায় না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

ঠিক এ রকম সময়ে চারটি রবোট ঘরে এসে ঢুকল। সবার সামনে যে দাঁড়িয়েছিল সে নিচু গলায় বলল, মহাকাশকেন্দ্রের মহাপরিচালকের কাছে থেকে তোমাদের জন্যে একটি নির্দেশ এসেছে।

ষুন অবাক হয়ে বলল, আমাদের জন্যে? নির্দেশ?

হ্যাঁ।

সেটি কী করে সম্ভব?

রবোটটি কোনো কথা বলল না, সামনে হেঁটে কোথায় জানি স্পর্শ করতেই দেয়ালের বড় স্ক্রিনে মহাকাশকেন্দ্রের সদর দফতরের মহাপরিচালকের ক্রুদ্ধ একটা ছবি ভেসে আসে। কোনোরকম ভূমিকা ছাড়া সে কঠোর গলায় প্রায় চিৎকার করে বলে, আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম এই গ্রহটিকে জীবাণুমুক্ত করতে—তোমরা কর নি এবং শুধুমাত্র সেই কারণে তোমরা তোমাদের একজন সহকর্মীকে হারিয়েছ। তোমাদের হাতে সময় নেই, যদি আর কোনো সহকর্মী এই গ্রহে প্রাণ হারায় সেটি হবে সপ্তম মাত্রার অপরাধ এবং সেজন্যে তোমাদের প্রচলিত নিয়মে বিচার করা হবে।

AMARBOI.COM

মহাপরিচালক যেভাবে হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করেছিল ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে কথা শেষ করে দেয় এবং স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। রিশান রবোটগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের কাছে এ রকম কয়টি নির্দেশ আছে?

পাঁচটা।

আমাদের একজন করে মারা গেলে একটি করে দেখানোর কথা?

রবোটগুলো মাথা নাড়ল।

অন্যগুলোতে কী আছে দেখতে পারি?

না। দেখানোর নিয়ম নেই।

রিশান অন্যমনস্কভাবে তার এটমিক ব্লাস্টারটি হাতে তুলে নিতে গিয়ে থেমে গেল, সে অস্ত্রটি সানির কাছে দিয়েছিল এবং সেটি এখনো ফিরিয়ে নেয়া হয় নি।

ষুন গলা উঁচিয়ে বলল, মহাপরিচালকের কথা তোমরা শুনেছ। কাজেই আমাদের কী করতে হবে তোমরা সবাই জান। আমি এখন নিজেদের মাঝে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে চাই। কেউ কিছু বলতে চাও?

রিশান মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বল।

তুমি জান এখানে একটা বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে। তারা খুব কৌশলে স্কাউটশিপকে অকেজো করে দিতে পারে। তারা মানুষের রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, তোমাদেরকেও তার ছবি দেখিয়েছি। আমরা জানি এই বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে গ্রুনির একটা সম্পর্ক আছে। গ্রুনি জীবাণু, তাই সম্ভবত এই প্রাণীর নির্দেশে সানিকে স্পর্শ করে নি। এখন আমরা যদি গ্রুনিকে ধ্বংস করে দিই, সম্ভবত এই বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে আমাদের একমাত্র যোগসূত্রটি কেটে দেব—আমরা সম্ভবত এই বুদ্ধিমান প্রাণীরও একটি বড় ক্ষতি করব—হয়তো তাদেরও ধ্বংস করে দেব। তুমি কি মনে কর একটা বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে আমরা আরেকটা বুদ্ধিমান প্রাণীকে এভাবে ধ্বংস করতে পারি?

যুন গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কী করতে চাও?

এই পুরো রহস্যটির সমাধান লুকিয়ে আছে সানির মাঝে। সে কিছু ব্যাপার জানে যেটা আমরা কেউ জানি না। সে আমাদের এমন কিছু বলতে পারে যেটা থেকে পুরো রহস্যের সমাধান বের হতে পারে। আমি গ্রুনিদের ধ্বংস করার আগে সানির সাথে কথা বলতে চাই।

আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি।

সে কী বলেছে?

কিছু বলতে রাজি হয় নি।

আমি জানি সে এত সহজে কিছু বলবে না। সে মাত্র দশ বছরের বাচ্চা কিন্তু একা এ রকম একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশে থেকে থেকে কিছু কিছু ব্যাপারে সে অসম্ভব কঠিন। তাকে কথা বলানোর আগে আমাদের নিজেদের তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

আমি লক্ষ করেছি তুমি তার চেষ্টা করছ—তোমার নিজের এটমিক ব্লাস্টারটি তার হাতে তুলে দিয়েছ!

রিশান এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আমি তোমার কথায় এক ধরনের শ্লেষ শুনতে পাচ্ছি।

তুমি ভুল শুনছ না।

তাহলে আমি ধরে নেব তুমি আমার কথাকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছ না?

না, সেটি সত্যি না। আমি তোমার কথায় যেটুকু গুরুত্ব দেবার কথা ঠিক ততটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি। সানি কী জানে সেটা আমিও জানতে চাই। তবে আমি তার জন্যে অনির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে থাকব না। আমাদের সময় নেই। আমি গ্রুনিকে ধ্বংস করার যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে চাই, একই সাথে সানির থেকে সবকিছু জানতে চাই—

সেটা তুমি কীভাবে করবে?

যুন রিশানের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। রিশান হঠাৎ চমকে উঠে যুনের দিকে তাকাল, চিৎকার করে বলল, তুমি সানির মস্তিষ্ক স্ক্যান করবে?

আমার আর কোনো উপায় নেই।

কী বলছ তুমি? মস্তিষ্ক স্ক্যান করলে সমস্ত স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। একজন মানুষের নিজস্ব সত্তা হচ্ছে তার স্মৃতি। তার স্মৃতি নষ্ট করা হচ্ছে মানুষকে ধ্বংস করা—

আমি জানি। বড় প্রয়োজনে বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়—

তোমার এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অধিকার নেই।

আমি অভিযান নয় নয় শূন্য তিনের দলপতি। আমার কী কী করার অধিকার আছে শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

রিশান উঠে দাঁড়াল। ষুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, রিশান তুমি কি আমার সিদ্ধান্তের সাথে একমত?

না।

তুমি জান আমার সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হলে কী হবে?

রিশান কোনো কথা বলল না। ষুন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তোমার মনে আছে রিশান আমরা এই অভিযানে আসার আগে তুমি কী বলেছিলে?

রিশান কোনো কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, তুমি বলেছিলে আমাদের এই দলটির প্রত্যেকে খুব কঠোর প্রকৃতির। তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কঠোর। একজন খুব কঠোর মানুষ যদি তার দলের একজন অবাধ্য মহাকাশচারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে কী করবে বলে তোমার মনে হয়?

আমি জানি সে কী করতে চাইবে। কিন্তু কেমন করে করবে সেটা আমি জানি না।

ষুন প্রায় কোমল গলায় বলল, তুমি জান তোমার কাছে এটমিক ব্লাস্টারটি নেই। তুমি জান তোমার চারপাশে চারটি রবোট দাঁড়িয়ে আছে। মহাকাশ অভিযানের দলপতি হিসাবে এই চারটি রবোট সোজাসুজি আমার নিয়ন্ত্রণে।

তুমি—তুমি আমাকে বন্দি করছ?

হ্যাঁ। তোমাকে আপাতত বন্দি করছি। তোমার কাছে কোনো সহযোগিতা আশা করছি না, কাজেই তোমাকে অচেতন করে শীতলকক্ষে ভরে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেব। পৃথিবীর কর্তৃপক্ষ তোমাকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

রিশান মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ষুনও মাথা ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকাল, তোমরা আমার সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করতে পার, তার কারণ আছে এবং তোমাদের তার অধিকারও আছে। কিন্তু আশা করছি কেউ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে না।

কেউ কোনো কথা বলল না। ষুন একটা নিশ্বাস ফেলে রবোটগুলোকে বলল, রিশানকে নিয়ে যাও তোমরা।

রিশান একবার ভাবল সে রবোটগুলোকে বাধা দেবে, কিন্তু অপ্রকৃতিস্থদর্শন এই রবোটগুলোকে যতই নির্জীব এবং দুর্বল মনে হোক না কেন, তাদের ধাতব শরীরে নিশ্চয়ই অমানুষিক জোর। তাদের বাধা দেয়া সম্ভবত খুব বড় ধরনের নির্বুদ্ধিতা। রিশান ষুনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি এটা করছ?

ষুন মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি আমার জায়গায় হলে তুমিও করতে।

নিডিয়া ক্লান্ত গলায় বলল, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমার সামনে এটা ঘটছে।

ষুন নিডিয়ার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু এটা সত্যি ঘটছে। বিশ্বাস কর।

১১

রিশান ছোট ঘরটিতে চুপচাপ বসে আছে। ঘরটি বাইরে থেকে বন্ধ, সম্ভবত একটা রবোটকে বাইরে পাহারা হিসেবেও রাখা আছে। তার এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই, সে বের হতে চাইছেও না। বের হয়ে তার কিছু করার নেই। ষুন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে

AMARBOI.COM

পরিকল্পনা করে প্রত্যেকটা কাজ করছে, কোথাও কোনো ফাঁকি নেই। সে এই ঘরে বসে যোগাযোগ চ্যানেলে কান পেতে নানা ধরনের সংবাদের আদান প্রদান থেকে সব খবরাখবর পেয়েছে। মহাকাশযানের মূল সরবরাহ থেকে আটত্রিশটা নিক্সিরল গ্যাসের ট্যাংক এই গ্রহটিতে পাঠানো হয়েছে। ট্যাংকগুলো গ্রহটির বিভিন্ন জায়গায় ভাসমান অবস্থায় আছে। নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাংকগুলো ফেটে নিক্সিরল গ্যাস বের হয়ে গ্রহটিতে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের জন্যে গ্যাসটি ক্ষতিকর নয়। এক ধরনের ঝাঁজালো গন্ধ রয়েছে এবং দীর্ঘ সময় নিশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে এক ধরনের সাময়িক অবসাদ ঘটাতে পারে, কিন্তু গ্রুনি জীবাণুর জন্যে এই গ্যাসটি ভয়ঙ্কর। গ্রুনি জীবাণুটির বেশ অনেকগুলো শুঁড়ের মতো অংশ রয়েছে, এই গ্যাসটির স্পর্শে সেগুলো সাথে সাথে অকেজো হয়ে যায়, তার ত্বকের ভিতর দিয়ে গ্যাসটি ভিতরে প্রবেশ করে। জীবাণুটির মূল অংশটি তখন মিলি সেকেন্ডের মাঝে ফেটে যায়। ভিতর থেকে যে সমস্ত জৈব অণু বের হয়ে আসে সেগুলো তখন অন্য গ্রুনিকে আক্রমণ করে এবং কিছুক্ষণের মাঝে বিশাল গ্রুনির কলোনি ধ্বংস হয়ে যায়। অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি, মানুষ দীর্ঘকাল গবেষণা করে এটি বের করেছে। গ্রহটি বেশি বড় নয়, তার বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিক্সিরল গ্যাস সৃষ্টি করার জন্যে আটত্রিশটা ট্যাংকই যথেষ্ট। নিক্সিরল গ্যাস অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে সহজে অক্সিডাইজ হয়ে অকেজো হয়ে যায়। এই গ্রহে অক্সিজেন খুব কম, বলতে গেলে নেই। যেটুকু আছে সেটাই নিক্সিরলকে ধীরে ধীরে অক্সিডাইজ করে প্রায় ছয় ঘণ্টা পরে নিষ্ক্রিয় করে দেবে। ছয় ঘণ্টা অনেক সময়—এর পর এই গ্রহটিতে গ্রুনির কোনো চিহ্ন থাকার কথা নয়।

পুরো ব্যাপারটি চিন্তা করে রিশান ভিতরে এক ধরনের অসহ্য ক্ষোভ অনুভব করে। পৃথিবীর বাইরে একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী অথচ তার একমাত্র যোগসূত্রটিকে কী সহজে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। মানুষের কাছে কি এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যেত না?

রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে পুরো ব্যাপারটি ভুলে যাবার চেষ্টা করে। তার পক্ষে যেটুকু চেষ্টা করা সম্ভব সে করেছে। পৃথিবীতেও এর আগে নানা ধরনের অমানবিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, এই গ্রহে কেন নেয়া হবে না? সিদ্ধান্তটি তো হঠাৎ করে নেয়া হচ্ছে না, অনেক চিন্তাভাবনা করে নেয়া হয়েছে। এই গ্রহের প্রত্যেকটা তথ্যকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, সেই তথ্য দীর্ঘদিন থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে, তারপর সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের পাঠানো হয়েছে। বিশাল মহাকাশযানে আটত্রিশ ট্যাংক নিক্সিরল থাকা কি একটা দুর্ঘটনা? কিছুতেই নয়।

রিশান সবকিছু ভুলে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা সহজ নয়। মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিচিত্র একটি জিনিস, সেটি কখন কীভাবে কাজ করবে সেটি বোঝা খুব মুশকিল। পুরো ব্যাপারটি মাথা থেকে সরিয়ে রাখার একটি মাত্র উপায়, অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয়া। য়ুন তাকে এই ছোট ঘরটিতে বন্দি করে রেখেছে সত্যি কিন্তু তার যোগাযোগ মডিউলটি অকেজো করে দেয় নি। সে ইচ্ছে করলে মূল তথ্যকেন্দ্র থেকে খবরাখবর নিতে পারে, কোনো একটা কিছু নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। যে জীবাণুটি কিছুক্ষণ পর এই গ্রহ থেকে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে সে সেই গ্রুনি জীবাণু নিয়েই সময় কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল।

গ্রুনি জীবাণুটি অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীবাণু। এককোষী একটা প্রাণী, কোষের মাঝখানে একটি সাধারণ নিউক্লিয়াস এবং তার চারপাশ দিয়ে শুঁড়ের মতো কিছু একটা বের হয়ে আছে। এমনিতে দীর্ঘ সময় সেটি সম্পূর্ণ জড় পদার্থের মতো বেঁচে থাকে, নির্দিষ্ট তাপ এবং রাসায়নিক পরিস্থিতিতে সেটা ভাগ হয়ে নিজের সংখ্যা বাড়াতে শুরু করে।

রিশান দীর্ঘ সময় নিয়ে এই জীবাণুটির বংশ বিস্তার পদ্ধতি নিয়ে পড়াশোনা করল, পৃথিবীর জৈবিক প্রাণী থেকে পদ্ধতিটি ভিন্ন কিন্তু সেরকম বৈচিত্র্যময় কিছু নয়, কিছুক্ষণের মাঝেই সে সেটা নিয়ে সময় ব্যয় করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে যোগাযোগটি বন্ধ করার আগে গ্রুনি জীবাণুর কিছু ছবি দেখে খানিকক্ষণ সময় কাটাবে বলে ঠিক করল। এককোষী প্রাণীর ছবি খুব বেশি চিত্তাকর্ষক হতে পারে না, সে মিনিট পাঁচেক এই জীবাণুটির নানা ভঙ্গিমায় কিছু ছবি দেখে পুরো ফাইলটুকু বন্ধ করার আগে হঠাৎ একটি ছবি দেখে থমকে গেল। দুটি গ্রুনি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, তারা একে অন্যের শুঁড় স্পর্শ করে আছে। ছবিটি খুব সাধারণ একটা ছবি কিন্তু এর মাঝে কী একটা জিনিস তার খুব পরিচিত মনে হয় যেটা সে আগে কোথাও দেখেছে। সেটা কী হতে পারে?

রিশান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারে না। রিশান সাবধানে আরো কয়েকটি ছবি দেখে, একসাথে বেশ কয়েকটি গ্রুনি জীবাণু একে অন্যের শুঁড় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবিটি তার আরো বেশি পরিচিত মনে হচ্ছে, কোথায় সে দেখেছে এই ছবি?

রিশান ছবিগুলোর নিচে লেখা তথ্যগুলো পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে গ্রুনি জীবাণু একে অন্যের শুঁড় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন এই শুঁড়ের মাঝে দিয়ে এক ধরনের সঙ্কেত আদান প্রদান হয় বলে মনে করা হয়—

হঠাৎ রিশান বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, নিউরন সেল! এই গ্রুনি জীবাণু দেখতে হুবহু মানুষের মস্তিষ্কের নিউরন সেলের মতো! লম্বা শুঁড়গুলো হচ্ছে নিউরন সেলের এক্সন আর ডেন্ড্রাইটস। মানুষের মস্তিষ্কে অসংখ্য নিউরন সেলের ডেন্ড্রাইটস একটি অন্য একটির সাথে সিনাপস দিয়ে জুড়ে থাকে, সেখান থেকে আসে মানুষের বুদ্ধিমত্তা—মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা, চিন্তা করার অনুভূতি! একটি নিউরন সেল পুরোপুরি অর্থহীন কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে যখন এক শ বিলিয়ন নিউরন সেল পাশাপাশি সজ্জিত হয়ে থাকে, ডেন্ড্রাইটস দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় এক বিস্ময়কর রহস্য! এই গ্রুনি জীবাণুও নিশ্চয়ই সেরকম। একটি বা অসংখ্য জীবাণু আলাদাভাবে পুরোপুরি বুদ্ধিহীন নিম্ন-শ্রেণীর একটা প্রাণী, কিন্তু যখন এগুলো কোথাও মানুষের মস্তিষ্কের মতো সাজানো হয়ে যায় সেটা হয়ে যায় ঠিক মানুষের মতো বুদ্ধিমান একটা প্রাণী।

রিশান লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, নিশ্চয়ই তাই হচ্ছে এখানে। তাই মানুষ কখনো বুদ্ধিমান প্রাণীগুলোকে খুঁজে পায় নি, যখনই খোঁজার চেষ্টা করেছে শুধু গ্রুনিকে পেয়েছে। গ্রুনিই হচ্ছে বুদ্ধিমান প্রাণী। গ্রুনিকে ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই বুদ্ধিমান প্রাণীকে ধ্বংস করে দেয়া। শুধু তাই নয়, হঠাৎ করে রিশানের আরেকটা জিনিস মনে হল, গ্রুনি যখন কোনো মানুষকে আক্রমণ করে সেটা সোজাসুজি মানুষের মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে—একটা করে গ্রুনি জীবাণু একটা করে নিউরনকে ধ্বংস করে। সেই গ্রুনিগুলো তখন গিয়ে সেই মস্তিষ্ককে অনুকরণ করে কিছু একটা তৈরি করে। সেটা হয়তো সেই মানুষের মস্তিষ্কের মতো হয়, হয়তো সেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা জন্ম নেয়, সেই মানুষের স্মৃতি!

রিশান উত্তেজিত হয়ে মাথা নাড়ল, নিশ্চয়ই তাই হয়—তাই সানির মা মারা যাবার পরও সানির জন্যে তার ভালবাসা এখনো গ্রুনিদের মাঝে বেঁচে আছে। তাই ঘুরেফিরে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাই অন্য সবাই মারা গেলেও গ্রুনিরা সানিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্কাউটশিপ অকেজো করার কৌশলগুলো তাই মানুষের আশ্চর্য বুদ্ধিপ্রসূত! সানি নিশ্চয়ই এসব জানে। তাই লি-রয়কে দিয়ে অন্যদের কাছে খবর পাঠিয়েছিল! রিশান তাড়াতাড়ি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিকেশান মডিউল স্পর্শ করে ষুনের সাথে যোগাযোগ করল ষুন ব্যস্তভাবে করিডোর ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, রিশানের আহ্বানে খুব অবাক হয়ে বলল, তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ, ষুন। আমার মনে হয় আমি এখানকার বুদ্ধিমান প্রাণীদের রহস্য ভেদ করেছি।

তুমি রহস্য ভেদ করেছ?

হ্যাঁ।

আমি জানি কেন এখানে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে আর কেন আমরা সেই প্রাণীদের খুঁজে পাই না। আমি এখন জানি কেন গ্রুনিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ষুন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, রিশান, আমি জানি তুমি অসম্ভব বুদ্ধিমান, আমি জানি তুমি সত্যিই রহস্য ভেদ করেছ। কিন্তু ধরে নাও তার জন্যে দেরি হয়ে গেছে।

দেরি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, আমি আমার পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তন করব না। এর মাঝে নিস্ক্রিরল গ্যাস এই গ্রহে পৌঁছে গেছে, গ্যাসের ট্যাংকগুলোর তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়ানো হচ্ছে, আর ঘণ্টাখানেকের মাঝে সেগুলো এই গ্রহে ছড়িয়ে দেয়া হবে। আমি আমার পরিকল্পনামতো এগিয়ে যাব।

কিন্তু ষুন—

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ষুন মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে শারীরিকভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি এখন তোমাকে মানসিকভাবে বন্দি করব। তুমি এখন আর কারো সাথে কথা বলতে পারবে না।

ষুন তার হাতে কী একটা সুইচ স্পর্শ করতেই রিশানের চ্যানেলটি বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ করে এক ধরনের ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে এল রিশানকে ঘিরে। রিশান মাথা ঘুরে তাকাল এবং যেন প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করল সে একটা ছোট ঘরে বন্দি হয়ে আছে। বাইরে বের হওয়া দূরে থাকুক, সে কারো সাথে মুখের কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না।

অসহ্য ক্রোধে হঠাৎ তার সবকিছু ভেঙেচুরে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে।

১২

রিশান দীর্ঘ সময় ঘরে পায়চারি করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে, তাকে দেখায় খাঁচায় আটকে থাকা একটা বুনো প্রাণীর মতো যেটি কিছুতেই নিজের পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারছে না। রিশান সমস্ত ঘরটি আরেকবার ঘুরে এসে বুঝতে পারল তার কিছু করার নেই; কিন্তু তবুও সে কিছুতেই পুরো ব্যাপারটি মেনে নিতে পারবে না। সব মানুষের ভিতরেই নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এক ধরনের বিশ্বাস কাজ করে যে কারণে একটি অবাস্তব অসম্ভব পরিবেশেও সে একেবারে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতে থাকে। রিশান এ রকম একটা পরিবেশে এসে পড়েছে। তার কিছু করার নেই তবু তাকে চেষ্টা করে যেতে হবে।

সে প্রথমে ঘরটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। দেখে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখানে কোনো ধরনের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেটি তার ওপর দৃষ্টি রাখছে এবং কোনো একটা তথ্যকেন্দ্রে খবর পাঠিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু ঘরটি মানুষের আবাসস্থলে, কাজেই সেটি নিশ্চয়ই এখানে অক্সিজেন সরবরাহ করে যাচ্ছে, বাতাস পরিশোধন করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখছে। রিশান খুঁজে খুঁজে বাতাস, তাপ এবং আলোর উৎসগুলো

বের করে, তারপর নিজের মহাকাশচারীর পোশাক থেকে যন্ত্রপাতির ছোট বাক্সটি বের করে সেগুলো নষ্ট করে দেয়। সাথে সাথে ঘরের মাঝে এক ধরনের ভূতুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। ঘরটিতে এখন অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবার কথা এবং সেটি কোথাও একটি বিপদ সঙ্কেত পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করার কথা। তাকে কীভাবে উদ্ধার করা হবে সে জানে না কিন্তু তার জন্যে প্রথমেই দরজাটি খুলতে হবে। একবার দরজা খোলা হলে বাইরে বের হবার কিছু একটা ব্যবস্থা করা হয়তো অসম্ভব হবে না।

ঘরটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসছে, সে নিজে মহাকাশচারীর পোশাকের মাঝে রয়েছে বলে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তাপমাত্রাও কমে আসছে, কিছুক্ষণের মাঝেই সেটা বিপদসীমা অতিক্রম করে যাবে। তার মহাকাশচারীর পোশাকের যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে কিন্তু তবুও নিশ্চয়ই সেটা তার শারীরিক অবস্থার নানারকম তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। সে হাতড়ে হাতড়ে সেই যোগাযোগটাও কেটে দিল, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কাজ, যার অর্থ সে এই আবাসস্থলের মূল কেন্দ্র থেকে আর কোনো ধরনের সাহায্য পেতে পারবে না। সাথে সাথে রিশান একটি ক্ষীণ শব্দ শুনতে পায়—শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চয়ই একটা বিপদ সঙ্কেত তৈরি করতে পেরেছে।

এই আবাসস্থলে কোনো মানুষ নেই, তাকে উদ্ধার করার জন্যে কোনো এক ধরনের রবোট হাজির হবে, তাদের বুদ্ধিমত্তা বা যুক্তিতর্ক সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। সে কী করবে এখনো জানে না; কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবার সময় নেই। রিশান হঠাৎ ঘরের বাইরে একটা শব্দ শুনতে পায়—কিছু একটা তাকে উদ্ধার করতে এসেছে বলে মনে হয়।

খুট করে একটা শব্দ হল এবং সাথে সাথে দরজা খুলে একটা প্রাচীন রবোট এসে ঢোকে, তার মাথার উপরে দুটি ফটোসেলের চোখ, পায়ের নিচে ধাতব চাকা। শক্তিশালী যান্ত্রিক দেহে সেটি প্রায় রিশানের দিকে ছুটে আসতে শুরু করে। রিশানের কাছাকাছি এসে সেটি তাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল, যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে রেখেছে বলে কিছু শুনতে পেল না। রবোটটি তার উপর ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করছে, শারীরিক তথ্যগুলো পৌঁছাচ্ছে না বলে সেটি এখনো কিছু বুঝতে পারছে না। রিশান মুখে যন্ত্রণার মতো একটা ভঙ্গি করে মেঝেতে শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল, রবোটটিকে তখন আরো অনেক ঝুঁকে পড়তে হবে। প্রাচীন এই রবোটগুলো এ রকম ভঙ্গিতে কাজ করার উপযোগী নয়, সেটিকে তখন কোনোভাবে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

রিশান প্রথমে দুই হাতে তার মাথা স্পর্শ করে, তারপর তাল সামলাতে না পারার ভঙ্গি করে ঘুরে নিচে পড়ে যায়। রবোটটি দ্রুত কিছু বিপদ সঙ্কেত তৈরি করে মূল কেন্দ্রে তথ্য পাঠাতে শুরু করে রিশানের উপর ঝুঁকে পড়ে। তার সমস্যাটি কোথায় রবোটটি এখনো বুঝে উঠতে পারে নি।

রবোটটি বিপজ্জনক ভঙ্গিতে তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। সে যদি হঠাৎ করে খুব জোরে ভরকেন্দ্রে একটা ধাক্কা দিতে পারে সেটা তাল হারিয়ে পড়ে যেতে পারে, তখন কপোট্রনের পিছনে পারমাণবিক ব্যাটারিটা অচল করে দেয়ার সময় পাওয়া অসম্ভব নয়। রিশান চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখে যন্ত্রণার একটা ভাব ফুটিয়ে কথা বলার ভঙ্গি করতে থাকে। যোগাযোগ মডিউল বন্ধ করে রাখা আছে, রবোটটির পক্ষে কথা শোনার কোনো উপায় নেই। মাইক্রোফোনে শব্দতরঙ্গ অনুভব করার একটা চেষ্টা করার জন্যে রবোটটি আরো ঝুঁকে পড়ল এবং রিশান তখন তার বুকের কাছাকাছি অংশ স্পর্শ করে জোরে একটা ধাক্কা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল, রবোটটি তাল হারিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যায় এবং সেটিকে খুব ি দিত এবং হাস্যকর দেখাতে থাকে।

রিশান দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে রবোটটির পিছনে ছুটে গিয়ে কপোট্রনের নিচে হাত দি ঢাকনাটি খুলে দেখে পাশাপাশি দুটি পারমাণবিক ব্যাটারি লাগানো রয়েছে। হ্যাঁচকা টান দিতেই দুটি ব্যাটারিই খুলে গেল এবং সাথে সাথে রবোটটি সম্পূর্ণ অকেজো জঞ্জালের মতো উবু হয়ে পড়ে রইল। রিশান কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না। সে ঘর থেকে বের হয়ে এল । তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, থাকলে ভালো হত।

রিশান সাবধানে করিডোর ধরে হেঁটে যেতে থাকে। ষুন তার যোগাযোগ মডিউলটি অকেজো করে রেখেছে, যদি সেটা চালু থাকত তাহলে এখন কে কোথায় আছে বুঝতে পারত। আশপাশের শব্দ শোনার জন্যে সে তার পোশাকের সবগুলো ইউনিট চালু করে দেয়। করিডোরের শেষে একটি দরজা, তার অন্য পাশে একটা বড় হলঘরের মতো। হলঘরটি থেকে সে বের হয়ে আরেকটি করিডোরে হাজির হল, তার শেষ মাথায় একটা ঘরে একটা আলো জ্বলছে। রিশান সাবধানে সেদিকে হেঁটে যেতে থাকে এবং ঠিক তখন সে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল। বিস্ফোরণটি এসেছে তার এটমিক ব্লাস্টারটি থেকে, যেটি সে সানির হাতে দিয়ে এসেছিল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে এই আবাসস্থলে— ভেবেচিন্তে কাজ করার সময় পার হয়ে গেছে এখন। রিশান বিস্ফোরণের শব্দের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

অনেক দূর থেকে সে হইচই চেঁচামেচি এবং চিৎকার শুনতে পায়, কাছে গিয়ে তার চক্ষুস্থির হয়ে যায়। দেয়ালে পিঠ দিয়ে সানি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে রিশানের এটমিক ব্লাস্টারটি। ঘরে ষুন এবং নিডিয়া পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি একটি রবোটের ধ্বংসাবশেষ, হাঁটুর উপর থেকে পুরো অংশটি এটমিক ব্লাস্টারের বিস্ফোরণে পুরোপুরি বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। ঘরের দেয়ালে একটা বড় গর্ত এবং সমস্ত ঘরে এক ধরনের ধোঁয়া। সানি এটমিক ব্লাস্টারটি আরেকটু উপরে তুলে বলল, আমার কাছে যদি কেউ আসে আমি ঠিক এইভাবে শেষ করে দেব। খবরদার কেউ আছে আসবে না।

রিশান দরজার কাছাকাছি থেমে গিয়ে বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি সানি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

এটমিক ব্লাস্টারটি অসম্ভব শক্তিশালী সানি, যদি কোনোভাবে আবাসস্থলের মূল দেয়ালে ফুটো হয়ে যায়, পুরো আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাবে।

ধ্বংস হলে হবে, কিছু আসে যায় না আমার।

রিশান এক পা এগিয়ে এসে বলল, সানি সত্যি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না? বেঁচে থাকতে হলে কাউকে–না–কাউকে বিশ্বাস করতে হয়।

আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

কর। তুমি তোমার মাকে বিশ্বাস কর। কর না?

সানি চমকে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। রিশান আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, কর না?

তুমি আমার মায়ের কথা জান?

জানি।

সানি হঠাৎ করে এটমিক ব্লাস্টারটা বিপজ্জনকভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে বলল, তাহলে সবাইকে মেরে ফেলছ কেন?

আমি মারছি না সানি। বিশ্বাস কর আমি বাঁচাতে চাইছি। তুমি আমাকে এটমিক ব্লাস্টারটি দাও, হয়তো কিছু একটা করা যাবে—

না।

দাও সানি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর— মানুষ হলে কাউকে-না-কাউকে বিশ্বাস করতে হয়। আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে।

তুমি আমার মাকে বাঁচাবে?

আমি জানি না সম্ভব হবে কি না; কিন্তু আমি চেষ্টা করব। আমাদের হাতে সময় খুব কম সানি। তুমি আমাকে এটমিক ব্লাস্টারটা দাও।

সানি কিছুক্ষণ রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে তার দিকে এটমিক ব্লাস্টারটা এগিয়ে দেয়।

রিশান এগিয়ে গিয়ে সানির হাত থেকে সেটা নেয়া মাত্র ষুন রিশানের দিকে ঘুরে বলল, তুমি কেমন করে বের হয়ে এসেছ?

সেটা নিয়ে এখন কথা বলার প্রয়োজন বা সময় কোনোটাই নেই ষুন। তোমাকে সবার আগে নিক্সিরল গ্যাসের ট্যাংকগুলো বিকল করতে হবে।

ষুন খানিকক্ষণ কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর শীতল গলায় বলে, আমি এই অভিযানের দলপতি, এখানে আমি আদেশ দেব—

রিশান অধৈর্য হয়ে বলল, দলপতিগিরি দেখানোর অনেক সময় পাবে ষুন, এখন কাজের কথায় আস—এই মুহূর্তে আমাদের নিক্সিরল গ্যাস থামাতে হবে, যেভাবে হোক। এই পৃথিবীর সব বুদ্ধিমান প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না হয়। তারা গ্রুন দিয়ে তৈরী—এই গ্রহের যারা মারা গেছে তাদের সবার মস্তিষ্কের কপি তৈরি করেছে, সানির মা আছে সেখানে, আমি নিশ্চিত লি-রয়ও এখন আছে!

কী বলছ তুমি?

আমি সত্যি বলছি। সানিকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

ষুন ঘুরে সানির দিকে তাকাল, সানি মাথা নাড়ল সাথে সাথে। ষুন খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তার মানে এখানে বুদ্ধিমান প্রাণী আসলে এখানকার মৃত মানুষেরা?

অনেকটা তাই—

তাহলে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে না কেন?

আমরা কি তার সুযোগ দিয়েছি? কিন্তু এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ষুন, নিক্সিরল গ্যাসকে যেভাবে হোক বন্ধ করতে হবে ষুন। যেভাবে হোক—

ষুন কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। রিশান অধৈর্য হয়ে বলল, কথা বলছ না কেন ষুন?

ষুন ইতস্তত করে বলল, আমি দুঃখিত রিশান, নিক্সিরল গ্যাসের ট্যাংকগুলো চার্জ করা হয়ে গেছে।

তার অর্থ কী?

তার অর্থ সেগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে ইউনিটগুলো ছিল সেগুলো কাজ করতে শুরু করেছে। এখন থেকে কিছুক্ষণের মাঝে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে সারা গ্রহে নিক্সিরল ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে।

এটা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই?

না।

রিশান হতবুদ্ধির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সানির দিকে ঘুরে তাকাল, তার সারা মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে বিড়বিড় করে বলল, তোমরা আমার মাকে আবার মেরে ফেলবে?

রিশান কোনো কথা বলল না।

সানি হঠাৎ ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রিশান পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে কোনোমতে ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাও সানি।

একটা ঝটকা মেরে হাত ছুটিয়ে নিয়ে সানি চিৎকার করে বলল, ছাড় আমাকে—

কিন্তু, তুমি কোথায় যাও—

মায়ের কাছে।

মায়ের কাছে?

হ্যাঁ।

তুমি জান তারা কোথায়?

জানি—

আমিও যাব তোমার সাথে।

কেন?

হয়তো সেখানে কিছু একটা করা যাবে, হয়তো কোনোভাবে তাদের বাঁচানো যাবে—

সত্যি? সানি বড় বড় চোখ করে বলল, সত্যি?

রিশান সানির ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, আমি জানি না সেটা সত্যি কি না, কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। যাও তুমি পোশাক পরে আস, আমাদের হাতে কোনো সময় নেই।

সানি ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রিশান ঘরের ভিতরে ঢুকে ষুনের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে বলল, ষুন, আমি আর সানি বাইরে যাচ্ছি, শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই।

কিন্তু—

কিন্তু কী?

ষুন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি পুরো ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখেছি। আমরা এখন যেটা জেনেছি, পৃথিবীর মানুষেরা সেটা নিশ্চয়ই জানে। তারপরও তারা যদি চায় আমরা এই গ্রহটাকে জীবাণুমুক্ত করি তার নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণ আছে—

তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?

না। তোমাকে আমি একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছিলাম। আবার তোমাকে আমার বন্দি করে রাখতে হবে রিশান। মহাকাশ অভিযানের বিধিমালায় খুব পরিষ্কার বলা আছে—

মহাকাশ অভিযানের বিধিমালায় কি বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু লেখা আছে?

বিদ্রোহ?

হ্যাঁ। যেখানে সাধারণ একজন সদস্য জোর করে দলের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়?

ষুন ফ্যাকাশে মুখে বলল, হ্যাঁ রিশান। লেখা আছে। তার জন্যে খুব কঠোর শাস্তির কথা লেখা আছে—

রিশান জোর করে মুখে এক ধরনের হাসি টেনে এনে বলল, শাস্তি অনেক পরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার, সেটা নিয়ে এখন চিন্তা করে লাভ নেই। আমি অভিযান নয় নয় শূন্য তিনের নেতৃত্ব তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি। এখন থেকে সবাই আমার আদেশে কাজ করবে।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে সেটি সম্ভব নয়।

হ্যাঁ। রিশান পাথরের মতো মুখ করে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, তুমি বেঁচে থাকতে সেটি সম্ভব নয়।

যুন হঠাৎ চমকে উঠে রিশানের দিকে তাকাল—সরু চোখে বলল, তুমি কী বলতে চাইছ?

রিশান তার এটমিক ব্লাস্টারটি উপরে তুলে সোজাসুজি যুনের মাথার কাছে ধরে বলল, তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে নেতৃত্বটি দিতে পার যুন—মানুষের মস্তিষ্ক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে দেখতে আমার একেবারে ভালো লাগে না।

যুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে সত্যি সত্যি রিশান তার মাথায় একটা এটমিক ব্লাস্টার ধরে রেখেছে।

রিশান শীতল গলায় বলল, যোগাযোগ মডিউলে তোমার কোডটি বলে আমাকে নেতৃত্বটি দিয়ে দাও যুন। তোমার মাথায় গুলি করলে নেতৃত্বটি এমনিতেই চলে আসবে—আমার ধৈর্য খুব কম, তুমি খুব ভালো করে জান।

যুন বিড়বিড় করে নেতৃত্ব কোডটি উচ্চারণ করা মাত্র হঠাৎ করে তার যোগাযোগ মডিউলটিতে নীল আলো ঝলসে ওঠে। যুনের কাছ থেকে মূল নেতৃত্ব রিশানের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। মহাকাশ অভিযানের দলপতির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মূল তথ্যকেন্দ্র থেকে আনা নেয়া শুরু হতে থাকে। রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি নিচে নামিয়ে রেখে নিডিয়ার দিকে ঘুরে তাকাল, বলল, নিডিয়া—

বল রিশান।

তুমি মূল তথ্যকেন্দ্রে খোঁজ নাও নিক্সিরল গ্যাসকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে কী করতে হয়। যদি তার জন্যে বিশেষ কোনো রাসায়নিক থাকে সেটি খুঁজে বের কর—

আমি যতদূর জানি অক্সিজেন খুব সহজে এটাকে অক্সিডাইজ করে দেয়। আমি আরেকটু দেখতে পারি—

বেশ তাহলে যতগুলো সম্ভব অক্সিজেন সিলিন্ডার তুমি একটা বাই ভার্বালে তোলার ব্যবস্থা কর।

করছি।

রিশান যোগাযোগ মডিউলে স্পর্শ করতেই ঘরের মাঝখানে মহাকাশযানের একটা অংশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে হান এবং বিটিকে উদ্বিগ্ন মুখে বসে থাকতে দেখা যায়। রিশান মুখে জোর করে একটা হাসি টেনে এনে বলল, তোমাদের নূতন দলপতিকে অভিনন্দন জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই—

হান মাথা নেড়ে বলল, আমি তার কোনো চেষ্টা করছিলাম না রিশান।

বেশ— এখন আমি যেটা বলছি খুব ভালো করে শোন। মহাকাশযান থেকে তোমরা চেষ্টা কর আটত্রিশটা নিক্সিরলের ট্যাংককে খুঁজে বের করতে—

সেটা খুব সহজ নয় রিশান। তুমি জান এই গ্রহের গ্যাস মোটামুটিভাবে অস্বচ্ছ।

তবুও তুমি চেষ্টা কর— অন্য কোনো কিছু যদি কাজ না করে চেষ্টা কর আলট্রাসনিক কিছু ব্যবহার করতে। পুরোপুরি নিখুঁতভাবে যদি না পার চেষ্টা কর মোটামুটিভাবে সেগুলোর অবস্থান বের করার জন্য—

চেষ্টা করব। তারপর কী করব?

চেষ্টা কর সেগুলো উড়িয়ে দিতে।

তুমি জান তবু সেগুলো থেকে নিক্সিরল বের হবে—

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যদি ছোটখাটো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাও, প্রচণ্ড উত্তাপে নিক্সিরল তার মৌলগুলোতে ভাগ হয়ে যাবার কথা—

তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে রিশান, তুমি নিশ্চয়ই পুরো গ্রহটাকে পারমাণবিক বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে চাও না?

না তা চাই না। কিন্তু যেটুকু সম্ভব নিক্সিরলকে নষ্ট করতে চাই। যেভাবে সম্ভব।

ঠিক আছে।

রিশান ঘুরে ষুনের দিকে তাকাল। বলল, ষুন—

বল।

তুমি আমাকে ছোট একটা ঘরে সবরকম যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আটকে রেখেছিলে—

ষুন একটু অস্বস্তি নিয়ে রিশানের দিকে তাকাল। রিশান শীতল গলায় বলল, একজন মানুষকে এর থেকে বড় কোনো যন্ত্রণা দেয়া যায় বলে আমার জানা নেই।

আমি—আমি—দুঃখিত। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না।

সেটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমি তোমাকে এই ব্যাপারটা দেখাতে চাই—যতক্ষণ আমি ফিরে না আসছি আমার ইচ্ছে তুমি একটা ছোট বদ্ধঘরে সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসে থাক।

তার কি কোনো প্রয়োজন আছে, রিশান?

না নেই। তবু আমার তাই ইচ্ছে। আমি এই অভিযানের দলপতি, রবোটগুলো আমার আদেশ চোখ বন্ধ করে পালন করবে। সানি একটা রবোটের সর্বনাশ করে ফেলেছে কিন্তু তোমাকে ধরে নেয়ার জন্যে আমার মনে হয় তিনটা রবোটই যথেষ্ট।

ষুন কোনো কথা না বলে স্থির চোখে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল।

১৩

বাই ভার্বালটি মাটির খুব কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। নিচে গাঢ় ধূসর রঙের পাথর, বাতাসের ঝাপটায় তার উপর দিয়ে বাদামি রঙের ধুলো উড়ছে। আকাশে অশরীরী এক ধরনের আলো চারদিকে এক অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। বাই ভার্বালের ছোট কন্ট্রোলঘরে নিয়ন্ত্রণ সুইচটি হালকা হাতে রিশান স্পর্শ করে আছে, তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে সানি।

একটা বিপজ্জনক বাঁক নিয়ে রিশান কাত হয়ে যাওয়া বাই ভার্বালটি সোজা করে নিয়ে সানির দিকে তাকাল, শিশুটির মুখে কোনো ধরনের অনুভূতি নেই। একটা ছোট শিশু কেমন করে এত নিস্পৃহ হতে পারে রিশান ঠিক বুঝতে পারে না। সে নিচু গলায় সানিকে ডাকল, সানি—

সানি তার দিকে না তাকিয়ে বলল, বল।

তুমি কী ভাবছ?

আমি?
হ্যাঁ।
সানি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, তোমার কি মনে হয় আমার মাকে তুমি বাঁচাতে পারবে?
আমি জানি না সানি— তোমাকে আমি মিছিমিছি আশা দিতে চাই না। তোমার মাকে বাঁচানোর সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। নিক্সিরল গ্যাসটি তৈরিই করা হয়েছে গ্রুনি ধ্বংস করার জন্যে, কাজেই ব্যাপারটি খুব কঠিন।
সানি কোনো কথা না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই শিশুটির ভাবভঙ্গিতে কোনো শিশুসুলভ ব্যাপার নেই। একটি শিশু মনে হয় শুধুমাত্র আরেকটা শিশুর কাছ থেকে শিশুসুলভ ভাবভঙ্গিগুলো শেখে।
রিশান আবার নিচু গলায় ডাকল, সানি—
বল।
তোমাকে মনে হয় একটা জিনিস বলা দরকার।
কী জিনিস?
তুমি যাকে তোমার মা বলে সম্বোধন করছ, সে কিন্তু সত্যিকার অর্থে তোমার মা নয়।
সানি ঝট করে ঘুরে তাকিয়ে বলল, তুমি কী বলছ?
রিশান সাবধানে বাই ভার্বালের নিয়ন্ত্রণটি আয়ত্তের মাঝে রেখে নরম গলায় বলল, তুমি রাগ হোয়ো না সানি, আমার কথা আগে শোন।
না, আমি শুনতে চাই না।
তোমাকে শুনতে হবে সানি। তুমি এই গ্রহে একা একা বেঁচে আছ কেন জান?
কেন?
কারণ তোমার মা কখনো চায় নি তুমিও তার মতো হয়ে যাও। তোমার মা চেয়েছে তুমি মানুষের মতো থেকে একদিন মানুষের পৃথিবীতে ফিরে যাও।
সানি স্থির চোখে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল; কিন্তু কোনো কথা বলল না। রিশান নরম গলায় বলল, আমি কি ভুল বলেছি সানি?
সানি রিশানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।
সানি, তোমার একটা জিনিস জানতে হবে।
কী জিনিস?
তোমার মা মারা গিয়েছে। এখন যাকে তুমি তোমার মা বলছ সে তোমার মা নয়।
সে তাহলে কে?
সে তোমার মায়ের মস্তিষ্কের অনুকরণে তৈরী একটি প্রাণী।
না— সানি হঠাৎ চিৎকার করে বলল, সে আমার মা!
তুমি যত ইচ্ছে হয় চিৎকার করতে পার; কিন্তু সেটা সত্যিকে পাল্টে দেবে না। তোমার মা মারা গেছে সানি। তার মৃতদেহ মানুষের আবাসস্থলের শীতলঘরে রাখা আছে।
থাকুক—
রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে সানি আমরা সেটা নিয়ে পরে কথা বলব। এখন আমাকে বল আমরা কি গ্রুনি কলোনির কাছাকাছি এসে গেছি?
হ্যাঁ। ওই বড় পাথরটা পার হয়ে তুমি ডান দিকে থেমে যাও।
ঠিক আছে সানি, তুমি শক্ত করে হ্যান্ডেলটা ধরে রাখ।

AMARBOI.COM

বাই ভার্বালটা সাবধানে থামিয়ে রিশান সামনে তাকাল, যেখানে থেমেছে তার সামনে খাড়া দেয়ালের মতো একটা পাহাড় উঁচু হয়ে উঠে গেছে। রিশান তার অবলাল সংবেদী চশমাটি চোখে লাগিয়ে উপরে তাকায়, পাথরের এই খাড়া দেয়ালটি কোনো একটি বিচিত্র কারণে আশপাশের সব পাথর থেকে উষ্ণ। রিশান মাথা ঘুরিয়ে সানির দিকে তাকিয়ে তাকে ডাকল, সানি—

বল।

গ্রুনি কলোনিটা কোথায়?

এই পাথরের পিছনে।

কিন্তু সেখানে তুমি কেমন করে যাও?

সানি হাত দিয়ে উপরে দেখিয়ে বলল, ওই যে উপরে একটা ছোট ফুটো আছে, আমি হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাই।

ভিতরে কী আছে সানি।

সানি একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, দেয়ালের মাঝে লেগে আছে ভিজে ভিজে এক রকম জিনিস, প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে ভিতরে চলে গেছে। আমি যখন ভিতরে যাই তখন সেগুলো থরথর করে কাঁপে, হলুদ এক রকম ধোঁয়া বের হয়।

তোমার—তোমার ভয় করে না?

সানি কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল।

তখন তুমি কী কর?

আমি তখন আমার মাকে ডাকি।

তোমার মা আসে তোমার কাছে?

মাঝে মাঝে আসে। সাদা ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

তুমি কখনো কথা বলেছ তোমার মায়ের সাথে?

হ্যাঁ। বলেছি।

তোমার মা তোমার কথা বুঝতে পারে?

মনে হয় পারে।

তুমি সত্যি জান?

হ্যাঁ। আমি জানি।

চমৎকার। রিশান একটু ইতস্তত করে বলল, তাহলে তুমি ভিতরে যাও। এই অক্সিজেন সিলিন্ডারটা নিয়ে যাও সাথে। ভিতরে গিয়ে বলবে এই গ্রহে নিক্সিরল ছড়িয়ে দিচ্ছে—মনে থাকবে নামটি?

নিক্সিরল।

হ্যাঁ। বলবে সেটা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা মাত্র উপায়—পুরোটা অক্সিজেন দিয়ে ভাসিয়ে দেয়া। এই যে লিভারটা আছে টেনে ধরতেই অক্সিজেন বের হতে শুরু করবে। ঠিক আছে?

সানি মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

খুব সাবধান—অক্সিজেন দিয়ে কিন্তু অনেক বড় বিস্ফোরণ হতে পারে। ভিতরে কী আছে আমি জানি না—তাই কোনো স্পার্ক যেন তৈরি না হয়।

হবে না। আমি সাবধান থাকব।

যাও তাহলে। দেরি কোরো না।

AMARBOI.COM

তুমি আসবে না?

আমি আসছি। চারদিকে অক্সিজেনের ছোট ছোট উৎস তৈরি করে আসি। কিছু বিস্ফোরকও ফেলে আসতে হবে।

বিস্ফোরক? কেন?

তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যে। তাপমাত্রা যত বেশি হবে নিক্সিরল তত তাড়াতাড়ি অক্সিডাইজ হবে।

ও।

যাও তুমি ভিতরে। আমি আসছি।

সানি ভারি অক্সিজেন সিলিন্ডারটা টেনে টেনে উপরে উঠতে থাকে। রিশান সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় ডাকল, সানি—

কী হল।

তোমার কি মনে হয় গ্রুনি কলোনি আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেবে?

কেন দেবে না?

আমি যে মানুষ! যে মানুষেরা নিক্সিরল নিয়ে এসেছে—

কিন্তু তুমি তো সেরকম মানুষ নও।

তোমার তাই মনে হয়?

হ্যাঁ, রিশান।

ঠিক আছে তাহলে, তুমি যাও। সানি উপরে উঠতে শুরু করতেই রিশান আবার ডাকল, সানি—

কী হল?

তোমার কি মনে হয় আমি যখন ভিতরে যাব, তখন—

তখন কী?

তখন কি আমি ভয় পাব?

সানি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ রিশান তুমি ভয় পাবে।

তুমি—তুমি ভয় পাও না?

পাই। কিন্তু আমি জানি আমার মা আছে সেখানে। তোমার তো মা নেই।

ও আচ্ছা।

রিশান নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সানি ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ভারি অক্সিজেন সিলিন্ডারটি নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। একটু পরে তাকেও ওই বড় পাথরের আড়ালে অন্ধকার একটা গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। ভিতরে তার জন্যে কী অপেক্ষা করে আছে চিন্তা করে হঠাৎ কেন জানি তার পেটের মাঝে পাক দিয়ে ওঠে।

রিশান মাথা থেকে পুরো ব্যাপারটি প্রায় ঠেলে সরিয়ে দেয়, এখন তার অনেক কাজ বাকি। অক্সিজেনের সিলিন্ডার আর বিস্ফোরকগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দেবার আগে মনে হয় একবার মহাকাশযানের সাথে কথা বলে নেয়া দরকার। নিডিয়াকেও মূল তথ্যকেন্দ্রে খোঁজ নেয়ার কথা বলা হয়েছে, নূতন কিছু জানতে পেরেছে কি না সেটাও এখন জিজ্ঞেস করে নেয়ার সময় হয়েছে। রিশান একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে উপরে তাকাল, সানি অক্সিজেন সিলিন্ডারটি নিয়ে প্রায় উপরে উঠে গিয়েছে। সেদিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে তার যোগাযোগ মডিউলটি স্পর্শ করল। প্রায় সাথে সাথেই তাকে ঘিরে দুটি হলোগ্রাফিক দৃশ্য ফুটে ওঠে, একটিতে হান এবং বিটি, অন্যটিতে নিডিয়া।

রিশান হানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাদের হাতে আর কত সময় রয়েছে হান?

খুব বেশি নয়। সবচেয়ে প্রথম ট্যাংকটির বিস্ফোরণ হবে এখন থেকে এগার মিনিট পরে।

মাত্র এগার মিনিট?

হ্যাঁ।

তুমি কি কোনো ট্যাংকের অবস্থান বের করতে পেরেছ?

কয়েকটা পেরেছি। কিন্তু খারাপ ধরনের একটা ঝড় হচ্ছে নিচে, কাজটি খুব সহজ নয়।

ট্যাংকটির বিস্ফোরণ হবার কতক্ষণ পর নিক্সিরল এখানে পৌছাবে বলে মনে হয়?

সাত মিনিটের মাঝে লক্ষ শতাংশ হয়ে যাবে। বিপদসীমার অনেক উপরে।

রিশান ঘুরে নিডিয়ার দিকে তাকাল, নিডিয়া তুমি কিছু বলবে?

বলার বেশি কিছু নেই। আমি মূল তথ্যকেন্দ্রে খোঁজ নিয়েছি সেখানেও নূতন কোনো তথ্য নেই। শুধু একটা ব্যাপার তুমি বিবেচনা করে দেখতে পার।

কী?

নিক্সিরল উঁচু তাপমাত্রায় খুব সহজে অক্সিডাইজ হয়। কাজেই তুমি যদি ওই এলাকার তাপমাত্রা বাড়াতে পার হয়তো খানিকটা সময় বাঁচাতে পারবে।

আমি সেজন্যে বিস্ফোরক নিয়ে এসেছি—

কিন্তু সেটা খুব বেশি নয়। নিডিয়া মাথা নেড়ে বলল, তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়বে না। তুমি এখন যেখানে আছ তার কাছাকাছি একটা আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

আগ্নেয়গিরি?

হ্যাঁ, কোনোভাবে সেটাতে যদি অগ্ন্যুৎপাত করানো যেত, তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যেত।

রিশান হানের দিকে তাকাল, হান—

বল।

তুমি কি আগ্নেয়গিরিটা খুঁজে বের করতে পারবে?

বিটি একটা বড় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি মনিটরে মনে হয় দেখতে পাচ্ছি।

চমৎকার। একটা মাঝারি ধরনের নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে আগ্নেয়গিরির মাথাটা উড়িয়ে দাও, হয়তো অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে যাবে!

তুমি সত্যি বলছ, না ঠাট্টা করছ?

সত্যি বলছি।

তুমি জান এটা কতটুকু বিপজ্জনক?

না, জানি না। জানতে চাইও না। কিন্তু আমি এই সৃষ্টিজগতের মানুষ ছাড়া একমাত্র অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। বিপদকে এখন ভয় পাওয়ার সময় নেই।

তোমাদের সবার প্রাণের ওপর ঝুঁকি হবে। প্রচণ্ড রেডিয়েশন—

কিছু করার নেই হান। তুমি দেরি কোরো না। এখানে পৌছাতে সময় লাগবে, শুরু করে দাও।

AMARBOI.COM

আমি করতে চাই না রিশান।

আমি দলপতি হিসেবে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি হান।

কিছুক্ষণ পর রিশানকে দেখা গেল একটি ছোট জেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিশাল প্রস্তর-খণ্ডটির চারপাশে সময়নির্ভর অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং বিস্ফোরক বসিয়ে দিচ্ছে। সেগুলো চার্জ করে সে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। তার মনিটরে এর মাঝে বাতাসের মাঝে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাবার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। সানি নিশ্চয়ই ভিতরে অক্সিজেন সিলিন্ডারটি খুলে দিয়েছে।

রিশান একটা নিশ্বাস ফেলে যোগাযোগ মডিউল স্পর্শ করে নিচু গলায় ডাকল, সানি।

এক মুহূর্ত পর সানির শিশুকণ্ঠের উত্তর শোনা গেল, আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ। তুমি কি—তুমি কি তোমার মায়ের সাথে কথা বলেছ?

সানি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

কী হল সানি? কথা বলেছ?

আমি জানি না। এখানে—এখানে—

এখানে কী?

আমার ভয় করছে রিশান। তুমি আসবে?

রিশানের হঠাৎ বুক কেঁপে ওঠে। সে কাঁপা গলায় বলল, আমি আসছি সানি। আমি এক্ষুনি আসছি।

ঠিক তখন দূরে একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। নিস্ক্রিরলের প্রথম ট্যাংকটি বিস্ফোরিত হয়েছে খুব কাছাকাছি কোথাও।

AMARBOI.COM

১৪

খাড়া দেয়ালের মাঝে ছোট একটা ফুটো, ভিতরে খুব কষ্ট করে ঢুকতে হয়। রিশান প্রথমে ঢুকতে গিয়ে আবিষ্কার করল পিঠে ঝুলে থাকা যন্ত্রপাতি পাথরে আটকে যাচ্ছে। সে সেগুলো খুলে হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মাথায় লাগানো ছোট একটা আলো কাছাকাছি খানিকটা আলোকিত করে রেখেছে, সেটা দূরের সবকিছুকে আরো গাঢ় অন্ধকারে আড়াল করে রেখেছে। দূরে কী আছে রিশান দেখার চেষ্টা না করে হামাগুড়ি দিয়ে বুকের উপর ভরে করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে।

খানিকক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ খানিকটা খোলা জায়গা পাওয়া গেল। রিশান সাবধানে এক হাতে তার যন্ত্রপাতির ব্যাগ এবং অন্য হাতে এটমিক ব্লাস্টারটি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথায় লাগানো আলোটি তার আশপাশে খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রেখেছে, রিশান সেই আলোতে সামনে তাকায়। চারপাশে পাথরের দেয়াল এবং সেখানে বিচিত্র থলথলে এক ধরনের জিনিস ঝুলছে। জিনিসটি জীবন্ত এবং সেটি ক্রমাগত নড়ছে, এক জায়গা থেকে ধীরে ধীরে অন্য জায়গায় সরসর করে সরে যাচ্ছে। রিশান নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। তার কেন জানি মনে হতে থাকে সেখান থেকে হঠাৎ কিছু একটা তার দিকে ছুটে আসবে, অক্টোপাসের মতো তাকে জড়িয়ে ধরে তার সমস্ত শরীরকে থলথলে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে

ধরবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না, থলথলে জিনিসগুলো তার আশপাশে নড়তে থাকে, সরসর শব্দ করতে থাকে এবং ভিজে এক ধরনের তরল পদার্থ সেখান থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

রিশান চাপা গলায় ডাকল, সানি তুমি কোথায়?

এই যে এখানে।

আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি কোথায়?

আমি এইমাত্র ঢুকেছি, সুড়ঙ্গটার কাছে।

তুমি দাঁড়াও আমি আসছি।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আস। এই সুড়ঙ্গের মুখটা আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে।

সানি সাবধানে তার যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নামিয়ে সেখান থেকে কিছু পলিমার বের করতে থাকে। সুড়ঙ্গটা খুব বড় নয়, সেটাকে বন্ধ করে দেয়া খুব কঠিন হবে না।

রিশান পলিমারের আস্তরণটা দাঁড়া করাতে করাতেই দূরে ছোট একটা আলো দেখা গেল, সানি আসছে।

সানির সমস্ত পোশাকে চটচটে এক ধরনের তরল—

রিশান অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে সানি? পড়ে গিয়েছিলে?

না।

তাহলে?

আমাকে—আমাকে ধরে ফেলেছিল—

ধরে ফেলেছিল?

হ্যাঁ। সানি ভয়ার্ত মুখে বলল, আমার মাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় গেছে আমার মা?

AMARBOI.COM

রিশান হাত বাড়িয়ে সানিকে স্পর্শ করে বলল, আছে নিশ্চয়ই আছে। তুমি ভয় পেয়ো না সানি, আগে আমার সাথে হাত লাগাও। এই যে আস্তরণটা তৈরি করেছি, শক্ত হয়ে যাবার আগে সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। তুমি এই পাশে ধর—

সানি কাঁপা হাতে রিশানের সাথে হাত লাগায়, কিছুক্ষণের মাঝেই সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। রিশান তার মনিটরে লক্ষ করে ভিতরে বাতাসের চাপ বেড়ে যাচ্ছে, সম্ভবত এই গুহাটায় আর বড় কোনো ফুটো নেই।

রিশান আবার সানির দিকে তাকাল, তার মুখে চাপা ভয়, সে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। রিশানও আবার চারদিকে তাকাল। হঠাৎ তার বুকটা ধক করে ওঠে, মনে হয় চারপাশের থলথলে জীবন্ত জিনিসগুলো ধীরে ধীরে তাদের ঘিরে ফেলছে। সত্যিই কি এখন তাদের চেপে ধরবে? রিশান জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে সানির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সানি, তুমি তোমার মায়ের সাথে কেমন করে কথা বল?

তোমার সাথে যেভাবে বলি সেভাবে।

রিশান একটু অবাক হয়ে বলল, সত্যি? এমনি বললেই শুনতে পায়?

সবসময় পায় না। তখন আমি আমার মাথাটা পাথরের দেয়ালের সাথে চেপে ধরে কথা বলি, চিৎকার করে কথা বলি—

তার মানে তোমার কথাটা শব্দতরঙ্গ হিসেবে যায়। রিশান তার যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে ছোট একটা এমপ্লিফায়ার বের করে সানির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও তুমি এর মাঝে

কথা বল, কথাটা শব্দতরঙ্গ হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া যাবে। তোমাকে তাহলে আর চিৎকার করে কথা বলতে হবে না।

সানি এমপ্লিফায়ারটা হাতে নিয়ে বলল, আমি কী কথা বলব?

তোমার মায়ের সাথে কিছু একটা বল। তাকে বল নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আমরা এভাবে এসে অক্সিজেন ছড়িয়ে দিচ্ছি। বল, বাইরে আমরা বিস্ফোরক বসিয়েছি, সুড়ঙ্গটা বন্ধ করে দিচ্ছি—যা তোমার মনে হয় বল। আমি জানতে চাই উত্তরে তোমার মা কী বলে।

সানি এমপ্লিফায়ারটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, মা আমি সানি।

সানির কণ্ঠস্বর বহুগুণ বেড়ে গিয়ে সমস্ত গুহার মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। রিশান অবাক হয়ে দেখল, থলথলে জিনিসগুলো হঠাৎ কেমন জানি কিলবিল করে নড়ে ওঠে। সানি এমপ্লিফায়ারটা সরিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল। তারপর আবার বলল, মা, আমি সানি। তুমি কথা বল। আমার ভয় করছে।

রিশান হঠাৎ চমকে উঠে শুনল—কোথা থেকে জানি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, চলে যাও—চলে যাও সানি।

কণ্ঠস্বরটি ঠিক মানুষের কণ্ঠস্বর নয়, শুনে মনে হয় কেউ যেন শব্দ না করে শুধু নিশ্বাস ফেলে কথা বলছে। একসাথে যেন শত সহস্র মানুষ হাহাকার করে নিশ্বাস ফেলছে।

সানি হতচকিত হয়ে রিশানের দিকে তাকাল, তারপর ভয় পাওয়া গলায় বলল, কেন মা? আমি কেন চলে যাব?

রিশান অবাক হয়ে দেখল চারদিকে ঘিরে থাকা থলথলে জীবন্ত জিনিসগুলো আবার সরসর করে নড়তে থাকে, বাতাসে আবার মানুষের হাহাকারের মতো শব্দ হতে থাকে। সানি আবার জিজ্ঞেস করল, কেন আমি চলে যাব মা?

বিপদ... অনেক বড় বিপদ...

রিশান ঠিক শুনতে পেয়েছে কি না বুঝতে পারল না, সানির দিকে তাকাল। সানিও তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রিশান এমপ্লিফায়ারটা টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিসের বিপদ?

রিশানের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী এমপ্লিফায়ারে করে গুহার মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে এবং তখন হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে শুরু করে। চারপাশের থলথলে জিনিসগুলো কাঁপতে শুরু করে। কিলবিল করে নড়তে শুরু করে। ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো হিসহিস শব্দ হতে থাকে এবং হঠাৎ পাথরের দেয়াল থেকে গলিত স্রোতধারার মতো কিছু একটা ছুটে আসে। কিছু বোঝার আগে কিছু একটা রিশানকে পেঁচিয়ে ধরে তাকে আছড়ে নিচে ফেলে দেয়। রিশান শক্ত হাতে এটমিক ব্লাস্টারটি চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, ছেড়ে দাও, না হয় গুলি করে শেষ করে দেব—

রিশানের কথার জন্যেই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক, দেয়াল থেকে ছুটে আসা আধা তরল, আঠালো লকলকে জিনিসটা তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে দেয়ালের দিকে ফিরে গেল। রিশান সাবধানে উঠে বসতে চেষ্টা করে, সমস্ত শরীর প্যাঁচপ্যাঁচে আঠালো তরলে ঢেকে গেছে, কোনোমতে নিজেকে টেনেহিঁচড়ে সে সোজা করে দাঁড়া করায়। সানি গুহার এককোনা থেকে তার দিকে ছুটে এসে বলল, ওরা অনেক রেগে আছে। অনেক রেগে আছে।

কেন?

তুমি কথা বলেছ তাই। তোমার কথা ওরা শুনতে চায় না।

কেন আমার কথা শুনতে চায় না?

আমি জানি না।

কিন্তু ওদের আমার কথা শুনতে হবে, আমি ওদের বাঁচাতে এসেছি। রিশান এমপ্লিফায়ারটা হাতে নিয়ে চিৎকার করে বলল, আমি তোমাদের বাঁচাতে এসেছি—

রিশানের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ অন্ধকার গুহাটিতে যেন প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। পাথরের দেয়ালে ঝুলে থাকা থলথলে জিনিসগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে, লকলকে জিভের মতো লম্বা লম্বা শুঁড় বের হয়ে আসে, হিসহিস হিংস্র শব্দে সমস্ত গুহা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—

রিশান এটমিক ব্লাস্টারটি চেপে ধরে রেখে বলল, খবরদার কেউ আমার কাছে আসবে না, আমি গুলি করে শেষ করে দেব—

সাথে সাথে আবার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যেতে থাকে, সমস্ত গুহা যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। রিশান নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, আমি তোমাদের বাঁচাতে এসেছি। আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। বিশ্বাস কর আমার কথা—

রিশান নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত গুহাটি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, হিংস্র শব্দেও থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিছু একটা যেন অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়। রিশান মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে এটমিক ব্লাস্টারটি শক্ত করে ধরে রেখে বলল, পৃথিবী থেকে নিক্সিরল পাঠিয়েছে, সেখান থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় অক্সিজেন। আমি তাই অক্সিজেনে ভাসিয়ে দিচ্ছি তোমাদের—

রিশান ভীত চোখে চারদিকে তাকাল, তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় কিন্তু হঠাৎ তার মনে হতে থাকে কেউ একজন তার কথা শুনছে আগ্রহ নিয়ে। সে বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমি বাইরেও অসংখ্য অক্সিজেনের উৎস ছড়িয়ে এসেছি। তারা অক্সিজেন বের করছে এখন। তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যে বিস্ফোরক রেখেছি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে কিছুক্ষণের মাঝেই, তোমরা ভয় পেয়ো না।—

সানি খুব ধীরে ধীরে রিশানের কাছে এগিয়ে এসে তার হাত স্পর্শ করে। রিশান ঘুরে তার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, তুমি কিছু বলবে সানি?

তোমার কথা শুনছে!

হ্যাঁ।

আর রাগ করছে না, দেখেছ?

হ্যাঁ সানি। আর রাগ করছে না—

রিশানের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে, ভিতরে থলথলে জিনিসগুলো আবার হিসহিস করতে শুরু করে, সরসর করে নড়তে থাকে, স্থানে স্থানে প্যাঁচপ্যাঁচে আঠালো তরল ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। রিশান গলা উঁচিয়ে বলল, তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি এই বিস্ফোরকগুলো দিয়েছি। একটু পরে আরো বড় একটা বিস্ফোরণ হবে, একটা আগ্নেয়গিরির মাথা উড়িয়ে দেয়া হবে অগ্ন্যুৎপাত শুরু করার জন্যে—আশপাশে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যে—আমি ইচ্ছে করে করেছি।

খুব ধীরে ধীরে ভিতরের পরিবেশ একটু শান্ত হয়ে আসে এবং ঠিক তখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণটি এসে তাদের আঘাত করে—

হান নিশ্চয়ই পারমাণবিক বিস্ফোরণে আগ্নেয়গিরির চূড়োটি পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে।

সমস্ত গুহাটি ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল, উপর থেকে পাথরের টুকরো ভেঙে ভেঙে পড়ছে, ধুলো উড়ছে, দেয়ালে থলথলে প্রাণীগুলো থরথর করে কাঁপছে, এক ধরনের জান্তব চিৎকার। দেয়াল থেকে ভয়ঙ্কর আক্রোশে কিছু একটা তাদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে, রিশান লাফিয়ে সরে গিয়ে সানিকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কিছু একটা আঘাত করল তখন এবং কিছু বোঝার আগেই রিশান জ্ঞান হারাল।

১৫

রিশানের মনে হল সে একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর চোখ যায় নিচে একটা বিস্তৃত অরণ্য। সবুজ দেবদারু গাছ ঝোপঝাড় লতাগুল্ম জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছোট নদী কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। নদীর পানিতে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। নদীর পানি থেকে হঠাৎ হুস করে ভেসে উঠল একটি মেয়ে—দুই হাত উপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও—বাঁচাও আমাকে বাঁচাও—

রিশান ছুটে যেতে চাইল নিচে কিন্তু হঠাৎ গাছের লতাগুল্ম তাকে পেঁচিয়ে ধরল সাপের মতো, সে ছুটে যেতে চাইছে কিন্তু যেতে পারছে না। পা বেঁধে পড়ে যাচ্ছে নিচে। মেয়েটি ভেসে যাচ্ছে পানিতে, চিৎকার করে ডাকছে তাকে রিশান—রিশান—রিশান—

রিশান চোখ খুলে তাকাল। চারদিকে চাপা অন্ধকার, তার মাঝে সত্যি সত্যি কেউ ডাকছে তাকে। রিশান তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তার উপর ঝুঁকে আছে সানি, ভয়ার্ত গলায় ডাকছে, রিশান—রিশান—

রিশান শুকনো গলায় বলল, কী হয়েছে সানি?

তুমি বেঁচে আছ? আমি ভেবেছিলাম মরে গেছ।

না আমি মরি নি। রিশান উঠে বসার চেষ্টা করে। চোখ তুলে চারদিকে তাকিয়ে বলল, কী হয়েছিল আমার?

পড়ে গিয়েছিলে। পুরো পাহাড়টা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সবাই মরে যাব আমরা।

রিশান হাতড়ে হাতড়ে যন্ত্রপাতির বাক্সটা বের করে একটা সবুজ মনিটরের দিকে তাকাল, বাইরে তাপমাত্রা কম করে হলেও বিশ ডিগ্রি বেড়ে গেছে। বাইরে নিক্সিরলের পরিমাণ হঠাৎ করে দ্রুত কমতে শুরু করেছে, এভাবে আরো কিছুক্ষণ চলতে থাকলে মনে হয় বিপদ কেটে যাবে। রিশান সানির দিকে তাকিয়ে বলল, সানি, মনে হয় আমরা গ্রুনি কলোনিকে বাঁচিয়ে ফেলেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, এই দেখ নিক্সিরল কত তাড়াতাড়ি কমে আসছে। আর ঘণ্টাখানেকের মাঝে এত কমে যাবে যে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

রিশান সানিকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, বাইরে কী অবস্থা অবিশ্যি আমি জানি না। আগ্নেয়গিরি থেকে হয়তো গলগল করে লাভা বের হয়ে আমাদের ঢেকে ফেলেছে!

সানি ভয় পাওয়া চোখে রিশানের দিকে তাকাল, সত্যি?

রিশান হাসিমুখে বলল, না সানি। আমি ঠাট্টা করছিলাম।

সানি একটু অবাক হয়ে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠাট্টা ব্যাপারটি কী সে জানে

না। তার সাথে কেউ কখনো ঠাট্টা করে নি।

রিশান আর সানি চুপচাপ দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল। বাইরে নিশ্চয়ই খুব গরম, তাদের মহাকাশচারীর পোশাকের ভিতরে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দেয়ালের সাথে লেগে থাকা কিলবিলে জিনিসগুলো ক্রমাগত নড়ছে, হিসহিস এক ধরনের শব্দ হচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ সেটাকে এক ধরনের যন্ত্রণায় কাতর ধ্বনির মতো মনে হয়। ভিতরে এক ধরনের হলুদ রঙের বাষ্পও জমা হচ্ছে, সেটা কী এবং কেন তৈরি হচ্ছে সে সম্পর্কে রিশানের কোনো ধারণা নেই।

রিশান তার যোগাযোগ মডিউলের দিকে তাকাল, মহাকাশযান থেকে হান এবং বিটি, আবাসস্থল থেকে নিডিয়া তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, সে ইচ্ছে করে চ্যানেলটা বন্ধ করে রেখেছে। এখানে গুহার মাঝে বসে তার চ্যানেলটি খোলার ইচ্ছে করল না। সবকিছু ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে বাইরে গিয়ে সে তাদের সাথে কথা বলবে।

রিশান চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ সময় বসে রইল। সানি সারাদিনের উত্তেজনায় নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে, রিশানের কোলে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। রিশান তার মাথায় লাগানো অনুজ্জ্বল আলোটিতে সানির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৈশোরে সে মহাকাশচারীর কঠোর জীবন বেছে নিয়েছিল, কোনোদিন তাই তার স্ত্রী পুত্র পরিজন হয় নি। সন্তানকে বুকে চেপে ধরে রাখতে কেমন লাগে সে কখনো জানতে পারে নি। কিন্তু নির্বান্ধব জনমানবশূন্য বিষাক্ত একটি গ্রহের বদ্ধ একটি গুহায় বিচিত্র এক ধরনের জীবিত প্রাণীর কাছাকাছি বসে থেকে দশ বছরের এই শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ তার বুকের ভিতরে এক ধরনের আশ্চর্য অনুভূতির জন্ম হয়।

তার ইচ্ছে করতে থাকে গভীর ভালবাসায় শিশুটিকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে সেটা করতে পারল না, মহাকাশচারীর পোশাক এত কাছাকাছি এনেও তাদের দুজনকে ধরাছোঁয়ার বাইরে আলাদা করে রেখেছে।

রিশান কতক্ষণ সানির দিকে তাকিয়েছিল সে জানে না, হঠাৎ সামনে তাকিয়ে সে পাথরের মতো জমে গেল। তার কাছাকাছি একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, এত কাছে যে প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। রিশান ভালো করে তাকাল, মূর্তিটি অর্ধস্বচ্ছ এবং বর্ণহীন। এই মূর্তিটিকে সে আগে দেখেছে, ছায়ামূর্তিটি সানির মা নারার। রিশান কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, তুমি কি নারা?

ছায়ামূর্তিটি মাথা নাড়ে।

তুমি—তুমি কি কিছু বলতে চাও?

হ্যাঁ, ছায়ামূর্তিটি মাথা নাড়ে।

বল।

তোমাকে ধন্যবাদ পৃথিবীর মানুষ। আমাদের বাঁচানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

রিশান কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না, হাত নেড়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমি শুধু আমার দায়িত্বটুকু করেছি, তার বেশি কিছু নয়।

ছায়ামূর্তিটি আবার কী একটা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু বলতে পারে না। রিশান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল, ছায়ামূর্তিটি আবার চেষ্টা করল, তবু বলতে পারল না।

রিশান নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?

ছায়ামূর্তিটি মাথা নাড়ল।

তুমি কি সানিকে কিছু বলতে চাও?

ছায়ামূর্তিটি মাথা নাড়ল। তারপর খুব কষ্ট করে বলল, হ্যাঁ।

আমি সানিকে ডেকে তুলছি।

রিশান নিজের কোলের উপর শুয়ে থাকা সানির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ডাকল, সানি, দেখ কে এসেছে।

সানি প্রায় সাথে সাথে চোখ খুলে তাকাল, রিশানের দিকে তাকিয়ে ঘুম জড়ানো গলায় বলল, কে এসেছে?

রিশান যত্ন করে সানিকে তুলে বসিয়ে দিয়ে বলল, তোমার মা।

মা! মুহূর্তে সানি পুরোপুরি জেগে উঠে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে যাচ্ছিল, রিশান তাকে ধরে রাখল। সানি চিৎকার করে বলল, তুমি বেঁচে আছ!

নারার ছায়ামূর্তিটি মাথা নাড়ল। তারপর ফিসফিস করে বলল, সানি, কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমি তোমাকে শেষ কথাটি বলে যাই।

কী শেষ কথা?

তুমি যখন পৃথিবীতে যাবে তখন—

আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।

না সানি। এই গ্রহ মানুষের জন্যে না। তুমি পৃথিবীতে যাবে এবং এই গ্রহের কথা ভুলে যাবে।

না—সানি ক্রুদ্ধ গলায় বলল, আমি যাব না।

তুমি যাবে সানি, রিশান তাকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, তুমি অবিশ্যি যাবে।

পৃথিবীতে আমার মা নেই।

এখানেও তোমার মা নেই।

সানি চিৎকার করে ছায়ামূর্তিটিকে দেখিয়ে বলল, এই যে আমার মা।

না, রিশান মাথা নেড়ে বলল, এটা তোমার মা নয়। এটা তোমার মায়ের একটা ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তিটি মাথা নেড়ে বলল, সানি। এটা সত্যি কথা। এটা তোমার মায়ের স্মৃতি থেকে তৈরি করা একটা ছায়ামূর্তি। এর মাঝে কোনো প্রাণ নেই।

তবু আমি যাব না। সানি ঠোঁট কামড়ে চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করতে থাকে।

রিশান সানির হাত ধরে রেখে নরম গলায় বলল, সানি তুমি মানুষ। মানুষকে পৃথিবীতে যেতে হয়, না হয় তার জন্ম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তুমি যখন যাবে তখন দেখবে পৃথিবীটা কী অপূর্ব। সেখানকার মানুষ কত বিচিত্র আর কী গভীর তাদের ভালবাসা। তুমি মায়ের ভালবাসা হারিয়েছ তাই এখনো গুনি কলোনিতে সেই ভালবাসা খুঁজে বেড়াও। যখন পৃথিবীতে যাবে তখন দেখবে ভালবাসা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে—

চাই না চাই না—আমি।

তুমি চাও সানি। তোমার মাও তাই চায়।

ছায়ামূর্তিটি মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ সানি, আমিও তাই চাই।

সানি কোনো কথা না বলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তার চোখ আবার পানিতে ভরে আসছে, সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের পানিতে। তার বুকের ভিতরে এক গভীর শূন্যতা এসে ভর করছে, মনে হচ্ছে কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। কিছু না।

রিশান সানিকে নিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হবার ঠিক আগের মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। গুহাটির মাঝামাঝি এখনো সেই ছায়ামূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে। রিশান একটু ইতস্তত করে

বলল, নারা, তোমাদের মাঝে কি লি–রয় আছে?

ছায়ামূর্তিটি মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ রিশান। এই তো আমি।

তুমি? রিশান চমকে উঠে বলল, তুমি তো নারা—

আমি নারা আমি লি–রয় আমি কিশি আমি রন আমি আরো অনেকে—

রিশান হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল, বলল তোমরা সবাই এক?

হ্যাঁ। আমরা সবাই এক। আমরা বিশাল একটা মস্তিষ্ক যেখানে সবার নিউরন কাছাকাছি—

তোমরা আলাদা আলাদা নও?

না। আমরা এক—

তার মানে—তার মানে—

তার মানে আমরা মানুষের চাইতেও বুদ্ধিমান হবার ক্ষমতা রাখি রিশান।

রিশান হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। গুহার ভিতরের থলথলে জিনিসটাকে সে চিনতে পেরেছে—এটি দেখতে মানুষের মস্তিষ্কের মতো। বিশাল একটা মস্তিষ্ক মানুষের করোটির মাঝে যেভাবে সাজানো থাকে।

কেন জানি না রিশান হঠাৎ একবার শিউরে ওঠে।

১৬

রিশান আর সানি ছোট একটা ঘরে বসে আছে। ঘরটিতে একটা বৈচিত্র্যহীন বেঞ্চ এবং উপর থেকে আসা কর্কশ এক ধরনের তীব্র আলো ছাড়া আর কিছু নেই। সানি চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, আমাদেরকে এখনো কেন এখানে আটকে রেখেছে?

আমাদেরকে এখানে আটকে রাখে নি, এখানে আমাদের জীবাণুমুক্ত করছে।

কিন্তু অন্য দুজন তো চলে গেল—

হ্যাঁ তারা তো আমাদের মতো গ্রুনি কলোনিতে যায় নি। তাদের জীবাণুমুক্ত করা সহজ। আমাদের দুজনের অনেক সময় নেবে।

ও। সানি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে তো ভালো লাগে না। কিছু তো দেখতেও পারি না।

এই তো আর কিছুক্ষণ, তারপর আমরা মূল মহাকাশযানে চলে যাব, সেখানে অনেক কিছু দেখতে পাবে। এই যে গ্রহটাতে এতদিন তুমি ছিলে সেটা কেমন তাও দেখবে!

সানি একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল, কিছু বলল না। রিশান তাকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, মন খারাপ লাগছে সানি?

সানি কোনো কথা বলল না। রিশান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, এই তো আর কয়েকদিনের মাঝে আমরা পৃথিবীতে রওনা দেব—সেখানে পৌঁছে দেখবে তোমার কত ভালো লাগবে। সেখানে তোমার আর কোনোদিন মহাকাশচারীর পোশাক পরে বের হতে হবে না। বাতাস ঝকঝকে পরিষ্কার, তুমি বুক ভরে নিশ্বাস নেবে। আকাশ হবে গাঢ় নীল, মাঝে মাঝে সেখানে থাকবে সাদা মেঘ। কখনো কখনো সেখানে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠবে, তারপর বৃষ্টি শুরু হবে!

AMARBOI.COM

বৃষ্টি?

হ্যাঁ বৃষ্টি! আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি নেমে আসবে—

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

তখন তুমি ইচ্ছে করলে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পার, দেখবে বৃষ্টির পানি এসে তোমাকে ভিজিয়ে দেবে!

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। এই গ্রহে যেরকম কোনো পানি নেই, তুমি প্রত্যেক ফোঁটা পানি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখ—পৃথিবী সেরকম নয়। পৃথিবীর প্রায় বেশিরভাগই পানি!

কী মজা!

হ্যাঁ—খুব মজা। রিশান হেসে বলল, তারপর তুমি যখন তোমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাবে, দেখবে তোমার বয়সী ছেলেমেয়ে! তাদের মাঝে কেউ কেউ তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে—তোমার মনে হবে তোমার সেই বন্ধুদের ছাড়া তুমি কেমন করে একা একা ছিলে এতদিন!

কিন্তু, কিন্তু—

কিন্তু কী?

আমি তো কখনো পৃথিবীতে থাকি নি—আমি তো জানি না কী করতে হয়, কী বলতে হয়—

সেটা নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না! তারা যখন জানবে তুমি ভিন্ন গ্রহ থেকে এসেছ দেখবে কেমন অবাক হয়ে যাবে!

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

রিশান এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে এই শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। রহস্যের খোঁজে সে গ্রহ থেকে গ্রহে, মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভয়ঙ্কর সব অভিযানে জীবনের বড় অংশ কাটিয়ে এসেছে; ছোট একটা শিশুর অর্থহীন কৌতূহলের মাঝে যে এত বড় বিস্ময়, এত অপূর্ব রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে সে কল্পনাও করে নি।

রিশান আর সানি যখন ছোট আলোকিত ঘরটিতে বসে থেকে-থেকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল তখন হঠাৎ একটা সবুজ আলো জ্বলে ওঠে এবং প্রায় সাথে সাথেই ঘরঘর শব্দ করে দরজা খুলে যায়। দরজার অন্য পাশে হান এবং বিটি দাঁড়িয়ে আছে। হান একটু এগিয়ে এসে সানির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, সম্মানিত সানি! আমাদের মহাকাশযানে তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সানি একটু অবাক হয়ে হানের দিকে তাকাল, ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না। বিটি একটু এগিয়ে এসে সানির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এস আমার সাথে। তোমাকে আমাদের মহাকাশযানটি দেখাই।

সানি একটু ইতস্তত করে বলল, কী আছে মহাকাশযানে?

কত কী আছে, তুমি কোনটা দেখতে চাও সেটা তোমার ইচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কুরু ইঞ্জিন আছে। কৃত্রিম মহাকর্ষ নিয়ন্ত্রণকক্ষ আছে, তুমি ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে মহাকর্ষ বল অদৃশ্য করে দিতে পারবে, তখন তুমি শূন্যে ভেসে বেড়াবে!

সত্যি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। আমাদের কাছে ইরিত্রা লেজার আছে, সেটা দিয়ে তুমি ইচ্ছে করলে তোমার গ্রহের বায়ুমণ্ডলটিতে একটা আলোর খেলা শুরু করে দিতে পার। আমাদের মূল তথ্যকেন্দ্রে অসংখ্য তথ্য আছে, চোখ বুলিয়ে দেখতে পার! কৃত্রিম অনুভূতি–ঘরে কৃত্রিম অনুভূতি অনুভব করতে পার! আরো এতসব জিনিস আছে যে বলে শেষ করতে পারব না। চল আমার সাথে—

সানির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে বিটির হাত ধরে বলল, চল।

রিশান এবং হান বিটির হাত ধরে সানির ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তাদের পিছনে দরজাটি ঘরঘর করে বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে দুজনেরই মুখ শক্ত হয়ে যায়। হান কঠোর মুখে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন কী করবে তুমি?

কী করব?

হ্যাঁ। তুমি নিজে নিজে খুব বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছ রিশান। তার বেশিরভাগই নীতিমালার বাইরে। শুধু নীতিমালার বাইরে নয়, নীতিমালার বিরুদ্ধে।

রিশান একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, আমার কিছু করার ছিল না। একটা বুদ্ধিমান প্রাণীকে আমি ধ্বংস হতে দিতে পারি না।

সেটা নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা করা যাবে রিশান, এখন সেটা থাক। এখন বল তুমি কী করতে চাও।

আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।

পৃথিবীতে ফিরে গেলে মহাকাশ কাউন্সিলে তোমার বিচার হবে রিশান। সে বিচারের রায় কী হবে আমি তোমাকে এখনই বলে দিতে পারি, শুনতে চাও?

না। আমি নিজেও জানি সেই রায়। কিন্তু আমি পৃথিবীতেই ফিরে যেতে চাই।

হান রিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি জান রিশান আমাদের এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। আসল উদ্দেশ্য যাই থাকুক–না কেন, আমাদের পাঠানো হয়েছে পৃথিবীর মানুষের বাসোপযোগী একটা গ্রহ খুঁজে বের করার জন্যে। আমরা সে জন্যে আরো এক-দুই শতাব্দী ঘুরে বেড়াতে পারি। তারপর যখন পৃথিবীতে ফিরে যাব, পৃথিবীর সবকিছু পাল্টে যাবে, হয়তো তোমাকে মহাকাশ কাউন্সিলের সামনে দাঁড়াতে হবে না, হয়তো—

না। রিশান মাথা নাড়ল, আমি পৃথিবীতেই ফিরে যেতে চাই। পৃথিবী পাল্টে যাবার আগে আমি যেতে চাই।

কেন?

রিশান একটু ইতস্তত করে বলল, সানিকে আমি আমার পরিচিত পৃথিবীতে নিতে চাই হান। যে পৃথিবীতে গাছ আছে, নদী আছে, নীল আকাশে মেঘ আছে, মানুষের ভিতরে ভালবাসা আছে। দু শ বছর পর পৃথিবীতে কী হবে আমি জানি না—আমি—আমি সেই ঝুঁকি নিতে পারি না।

হান রিশানের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, আমি বুঝতে পারছি রিশান। আমরা পৃথিবীতেই ফিরে যাব!

রিশান নিচু গলায় বলল, বেঁচে থাকাটাই বড় কথা নয়। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব সেই বেঁচে থাকাটার যেন একটা অর্থ থাকে।

হান হেসে বলল, অর্থ থাকবে রিশান। নিশ্চয়ই অর্থ থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে ফিরে যাবার আগে প্রস্তুতি নিতে কয়েকদিন কেটে গেল। এই সময়টাতে সানি নিডিয়ার সাথে ইরিত্রা লেজার দিয়ে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে আলোর খেলা করে কাটাল। ঘুমোতে যাবার আগে বিটির সাথে কৃত্রিম মহাকাশ নিয়ন্ত্রণকক্ষে ভেসে বেড়ানোটি মোটামুটিভাবে একটি নিয়মিত খেলা হয়ে দাঁড়াল। হান তাকে নিয়ে বসত কুরু ইঞ্জিনের সামনে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ইঞ্জিনটি সম্পূর্ণ বিনা কারণে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে গর্জন করানোর ঘোরতর বেআইনি কাজটি সবাই উপভোগ করতে শুরু করল শুধুমাত্র সানির বিস্ময়াভিভূত মুখটি দেখে! রিশান তাকে নিয়ে বসত তথ্যকেন্দ্রে, মানুষের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার তার সামনে সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত করে দিয়ে সে সানির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকত। স্বল্পভাষী ষুনকেও সবাই আবিষ্কার করল কৃত্রিম অনুভূতি–ঘরে, দীর্ঘ সময় সানিকে নিয়ে সে সেখানে বসে তার সাথে মানুষের বিচিত্র অনুভূতিকে নিয়ে খেলা করত।

যেদিন দীর্ঘ যাত্রার জন্যে সবাইকে শীতলঘরে গিয়ে ঘুমোতে হল, কোনো একটি বিচিত্র কারণে সবার ভিতরে এক ধরনের বিষণ্ণতা নেমে এল। ঠিক কী কারণ কারো জানা নেই কিন্তু সবার মনে হতে লাগল চমৎকার একটি স্বপ্ন শেষ হয়ে আসছে।

১৭

একটি কালো টেবিলের সামনে বসে আছে একজন বয়স্ক মানুষ। মানুষটির হাতে পাঁচটি উজ্জ্বল লাল তারা। রিশান এত উচ্চপদস্থ মানুষকে আগে কখনো সামনাসামনি দেখেছে কি না মনে করতে পারল না। মানুষটির দুপাশে বসেছে আরো দুজন, একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা। তাদের হাতে চারটি করে লাল তারা। বয়স্ক মানুষটির মুখে কেমন জানি এক ধরনের যন্ত্রণার চিহ্ন, অন্য দুজন সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। হাতে লাল তারাগুলো না থাকলে এই মানুষগুলোকে নিশ্চিতভাবে রবোট হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত।

AMARBOI.COM

রিশান টেবিলের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বয়স্ক মানুষটির মুখে যন্ত্রণার চিহ্নটি হঠাৎ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে খানিকক্ষণ রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বস রিশান।

রিশান শক্ত লোহার চেয়ারটিতে সোজা হয়ে বসল। বৃদ্ধ মানুষটি এক ধরনের দুঃখী গলায় বলল, আমার নাম কিহি। আমি মহাকাশ কাউন্সিলের সভাপতি।

রিশান ভদ্রভাবে বলল, তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আনন্দিত হলাম।

বৃদ্ধ মানুষটি খানিকক্ষণ রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমাকে এখানে ডেকে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমার খুব কৌতূহল হয়েছে তোমাকে নিজের চোখে দেখার।

কথাটি প্রশংসাও হতে পারে এক ধরনের শ্লেষও হতে পারে তাই রিশান কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। কিহি আবার একটি বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি জান তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

রিশান মাথা নাড়ল, জানি মহামান্য কিহি।

তুমি জান তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে খুব শিগগিরই।

জানি।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার আগে তোমার কিছু চাইবার আছে?

রিশান মাথা নাড়ল, না নেই। তবে—

তবে কী?

রিশান একটু ইতস্তত করে বলল, মহাকাশ অভিযান নয় নয় শূন্য তিনে আমরা সানি নামে একটা বাচ্চা ছেলেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। যদি তার সাথে একবার কথা বলা যেত তবে চমৎকার হত।

কিহি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হয় আমি তার ব্যবস্থা করতে পারব।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

কিহি আবার চুপ করে বসে রইল, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, রিশান, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?

কর।

আমি তোমার সমস্ত রিপোর্টটি দেখেছি, তুমি কী বলবে আমি জানি। তবু আমি তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই।

ঠিক আছে।

তুমি কেন গ্রুনি কলোনিকে ধ্বংস করতে দিলে না?

তারা বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধিমান প্রাণীকে ধ্বংস করা যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যেটুকু অধিকার তাদের ঠিক সমান অধিকার।

তুমি জান এরা মানুষের মস্তিষ্কের অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করে।

জানি।

তুমি জান এরা শুধু মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিরূপ নয় এরা একে অন্যের সাথে জুড়ে থাকে?

জানি।

যার অর্থ তারা একজন মানুষের মস্তিষ্ক নয়, তারা একসাথে অসংখ্য মানুষের মস্তিষ্ক?

জানি।

যার অর্থ তারা মানুষ থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হবার ক্ষমতা রাখে।

জানি।

যার অর্থ তারা ইচ্ছে করলে মানুষকে পরাভূত করতে পারে? যার অর্থ তারা মানুষকে ধ্বংস করে মানুষের পৃথিবী দখল করে নিতে পারে?

রিশান মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে কিহির দিকে তাকাল, তারপর বলল, অভিযান নয় নয় শূন্য তিনে পৃথিবীর মানুষ ইচ্ছে করলে গ্রুনিকে ধ্বংস করে দিতে পারত। তারা কি ধ্বংস করেছে?

কিহি কোনো কথা বলল না, তারপর নিচু গলায় বলল, তোমার কি মনে হয় গ্রুনিদের মাঝে তোমার মতো মানুষ থাকবে?

নিশ্চয় থাকবে।

যদি না থাকে? যদি শুধু আমার মতো মানুষ থাকে?

তাহলে পৃথিবীর মানুষ তাদের থেকে বুদ্ধিমান একটি প্রাণীর কাছে পরাজিত হবে। পৃথিবীর মানুষ তিন মিলিয়ন বছর বুদ্ধিমত্তায় সবার ওপরে থেকে সমস্ত প্রাণীদের ওপর প্রভুত্ব করেছে। এখন সে বুদ্ধিমত্তায় নিচের সারিতে গিয়ে তাদের নির্ধারিত স্থান নেবে। ধরে নিতে হবে সেটাই প্রকৃতির নিয়ম।

কিহি কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা ঘুরিয়ে তার দুই পাশে বসে থাকা দুজনের দিকে তাকাল, তাদের মুখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হল না। রিশান মুখে একটা হাসির ভঙ্গি করে বলল, প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরের একটা গ্রহ থেকে যদি সেই প্রাণী পৃথিবীতে হানা দিতে পারে তাদের সম্ভবত পৃথিবীতে খানিকটা স্থান করে দেয়াই উচিত।

কিহি শক্ত গলায় বলল, তাদের এক আলোকবর্ষ দূর থেকে আসতে হবে না, তারা সম্ভবত তোমাদের মহাকাশযানে করে তোমাদের সাথেই এসেছে।

গুনি যেন আসতে না পারে সেজন্যে আমাদের দীর্ঘ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে মহামান্য কিহি। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান–প্রযুক্তি তার পিছনে ব্যয় করা হয়েছে।

হ্যাঁ। কিহি মাথা নেড়ে বলল, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান–প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেই জ্ঞানবিজ্ঞান–প্রযুক্তি গড়ে তোলা হয়েছে বুদ্ধিহীন নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে, মানুষ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে রক্ষা করার জন্যে নয়।

কিহির পাশে বসে থাকা মহিলাটি নিচু গলায় বলল, আমি বলেছিলাম এই মহাকাশযানটিকে সৌরজগতের বাইরে বিস্ফোরণ করে উড়িয়ে দিতে। আমি এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হত।

কিহি মাথা ঘুরে মহিলাটির দিকে তাকাল তারপর ঘুরে রিশানের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, রিশান, তুমি এখন যেতে পার।

রিশান উঠে দাঁড়াল, প্রায় সাথে সাথেই দুপাশ থেকে দুটি নিচু স্তরের রবোট তার দিকে এগিয়ে এল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষকে কখনো একা একা যেতে দেয়া হয় না। বিশেষ করে রিশানের মতো একজন মানুষকে।

কিহি তার নরম চেয়ারটি থেকে উঠে হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, বাইরে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছে, দিনের এই সময়টিতে কেন জানি অকারণে মন বিষণ্ন হয়ে যায়। কিহি বিষণ্নভাবে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

আজকে রিশান নামের মানুষটির মৃত্যুদণ্ডাদেশ পালন করার কথা। মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর একজন মানুষের যেটুকু বিচলিত হবার কথা এই মানুষটি মনে হয় ততটুকু বিচলিত নয়। আজ ভোরে সানি নামের বাচ্চা ছেলেটি এসেছিল রিশানের কাছে, দুজনকে দেখে কে বলবে এটি তার জীবনের শেষ কয়টি মুহূর্ত! তার কথা বলার উৎফুল্ল ভঙ্গি, উচ্চৈঃস্বরের হাসি আর আনন্দোজ্জ্বল চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল খুব বুঝি একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। সানি নামের ছেলেটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন ঘুরে এসে হঠাৎ রিশানকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না, এক রকম জোর করে তাকে সরিয়ে নিতে হল—তখন হঠাৎ মনে হচ্ছিল মানুষটি বুঝি ভেঙে পড়বে, কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে নি। কিছু

কিছু মানুষ ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভ নিয়ে জন্মায়।

কিহি হেঁটে হেঁটে নিজের চেয়ারের কাছে ফিরে এল, কিছুক্ষণ থেকে মাথাটি কেমন জানি ভার ভার লাগছে। ভোঁতা এক ধরনের ব্যথার অনুভূতি, বিশেষ করে বাম পাশে কেমন জানি চিনচিনে এক ধরনের তীক্ষ্ণ ব্যথা।

কিহি মাথা স্পর্শ করার জন্যে ডান হাতটা উপরে তুলতে গিয়ে থেমে গেল, হাতটি কেমন জানি অবশ অবশ লাগছে, মনে হচ্ছে কোনো অনুভূতি নেই।

কিহি অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকাল, কোথায় জানি এ রকম একটা উপসর্গের কথা শুনেছে কিন্তু সে ঠিক মনে করতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আমি খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালাম। আমার মাথার কাছে একটি চতুষ্কোণ স্ক্রিন, সেখানে হালকা নীল রঙের আলো, এই আলোটি আমার পরিচিত, কিন্তু কোথায় দেখেছি এখন কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। কিছু একটা ঘটছে এবং আমি জানি ব্যাপারটা ঘটবে কিন্তু সেটি কী আমার মনে পড়ছে না। আমি সেটি মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম। এক সময় আবার আমার চেতনা ফিরে আসতে থাকে এবং আধো ঘুম আর আধো জাগরণের মাঝামাঝি একটি তরল অবস্থায় আমি ঘুরপাক খেতে থাকি। আমি একরকম জোর করে চোখ খুলে তাকালাম, চতুষ্কোণ স্ক্রিনটিতে একটি নীল গ্রহের ছবি ফুটে উঠেছে। আমি এই গ্রহটিকে চিনি, এর নাম পৃথিবী, ছায়াপথের একটি সাদামাঠা নক্ষত্রকে ঘিরে যে গ্রহগুলো ঘুরছে এটি তার তৃতীয় গ্রহ। এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই গ্রহ থেকে এসেছে। আমরা একটি মহাকাশযানে করে এখন আবার এই গ্রহটিতে ফিরে যাচ্ছি।

আমি নীল গ্রহটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শীত অনুভব করলাম। নিজের অজান্তে দুই হাত বুকের কাছে টেনে আনতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম আমার সারা দেহে কোনো অনুভূতি নেই। আমার মনে পড়ল মহাকাশযানের দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে আমাকে এবং আমার মতো আরো দশ সহস্র মহাচারীকে শীতলঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর কাছে পৌঁছানোর পর আমাদের জাগিয়ে দেবার কথা। আমরা নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি, তাই আমাদের জাগিয়ে তোলা শুরু হয়েছে।

আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলাম, ধড়মড় করে উঠে বসার একটা অমানুষিক ইচ্ছাকে প্রাণপণে নিবৃত্ত করে আমি ক্যাপসুলের ভিতরে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। আমার চারপাশে খুব ধীরে ধীরে এক ধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, আমি আমার শরীরে আবার শক্তি ফিরে পেতে শুরু করেছি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত এই শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরোপুরি সজীব করার আগে আমাকে এই ক্যাপসুল থেকে বের হতে দেয়া হবে না জেনেও আমি কিছুতেই ভিতরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারছিলাম না।

শুয়ে থাকতে থাকতে যখন আমি ধৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছেছি ঠিক তখন ক্যাপসুলের ঢাকনাটি সরে গেল। আমি সাথে সাথে ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এলাম। নিও পলিমারের সূক্ষ্ম একটা আবরণে শরীরকে ঢেকে আমি নগ্ন পদে শীতল মেঝেতে হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় ভল্টের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গোলাকার দরজার কাছে ভাবলেশহীন মুখে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে জোর করে মুখে একটা হাসি টেনে এনে বলল, কিহা, শীতলঘর থেকে তোমার জাগরণ শুভ হোক।

আমি মানুষটার দিকে তাকালাম, এ রকম যান্ত্রিক গলায় যে এ ধরনের একটা অর্থহীন কথা বলতে পারে সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়, সে নিশ্চয়ই একজন রবোট। সে যদি মানুষ নাও হয় তবু তার কথার উত্তরে আমার কিছু একটা বলা উচিত কিন্তু আমার অর্থহীন সম্ভাষণ পাল্টা-সম্ভাষণ করার ইচ্ছে করল না। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি পৃথিবীর কাছাকাছি চলে এসেছি?

মানুষটা শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবী?

হ্যাঁ, পৃথিবী।

আমি জানি না।

তুমি কি রবোট?

মানুষটির চোখে এক ধরনের ক্রোধের ছায়া এসে পড়ল। আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমি রবোট না মানুষ সেটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটি করতে পারছি কি না তাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের কৌতুক অনুভব করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে কী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে?

আজকে শীতলঘর থেকে যারা বের হবে তাদের সবার বায়ো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। কমিশনের সামনে হাজির করা।

কিসের কমিশন?

সেটা তুমি সময় হলেই দেখবে।

আমি আবার মানুষটার দিকে তাকালাম, এটি নিশ্চয়ই একটি রবোট, মানুষ হলে যে প্রায় এক শতাব্দী শীতলঘরে ঘুমিয়ে থেকে জেগে উঠেছে তার সাথে এ রকম রুক্ষ গলায় কথা বলত না। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, চল তাহলে, আমাকে নিয়ে যাও, যেখানে তোমার নেবার কথা।

মানুষটি বলল, এস।

আমি তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। মানুষটি হেঁটে যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবে তার ঘাড়ে একবার হাত বুলায়। এটি তাহলে রবোট নয়, মানুষ রবোটকে কখনো তাদের শরীর চুলকাতে হয় না।

বায়ো নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটি যত জটিল হবে ভেবেছিলাম সেটা মোটেও তত জটিল হল না। চতুষ্কোণ একটা দরজার মতো জায়গা দিয়ে আমাকে নগ্ন দেহে হেঁটে যেতে হল, যন্ত্রটি আমার শরীরকে নানাভাবে স্ক্যান করে আমার সম্পর্কে সম্ভাব্য সবরকম জৈবিক তথ্য মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রে লিপিবদ্ধ করে ফেলল। পুরো তথ্য বিশ্লেষণ করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল এবং প্রায় সাথে সাথেই আমার শরীরে কয়েক ধরনের প্রতিষেধক দিয়ে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হল। এখানে আমার মস্তিষ্ককে স্ক্যান করা হল, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার এই যন্ত্রটি সত্যিই কাজ করে কি না সে ব্যাপারটায় আমার বড় ধরনের সন্দেহ রয়েছে। আমার পরিচিত একজন অসাধারণ প্রতিভাবান গণিতবিদ, ব্যক্তিগত জীবনে যে একটু খাপছাড়া ধরনের—প্রতিবার এই মস্তিষ্ক স্ক্যান যন্ত্রের সামনে গবেট হিসাবে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। এই যন্ত্রটি অবশ্যি আমার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেছে

বলে মনে হল, কারণ যন্ত্রটির পিছনে যে কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে কিংবা রবোটটি বসে রয়েছে সে রিপোর্টটি দেখে চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল—আমি তার চোখে এক ধরনের অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেলাম। আমার চেহারা খুব সাধারণ, মানুষ নিশ্চয়ই অসাধারণ বুদ্ধিমান মানুষকে অসাধারণ সুদর্শন হিসেবে আবিষ্কার করতে চায়।

বায়ো নিয়ন্ত্রণঘর থেকে বের হয়ে আমি একটা ছোট হলঘরে হাজির হলাম। সেখানে আরামদায়ক চেয়ারে জনা বিশেক নানা বয়সের মানুষ গা এলিয়ে বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল এবং মধ্যবয়সী একজন মানুষ সহজ গলায় বলল, এই হচ্ছে কিহা। এখন আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি।

আমি সবাইকে লক্ষ করতে করতে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লাম। চেয়ারগুলো দেখতে যত আরামদায়ক বসতে সেরকম নয়, ইচ্ছে করেই নিশ্চয় এভাবে তৈরি করা হয়েছে। মনে হয় আমাদের জরুরি কোনো তথ্য দেয়া হবে, তাই বেশি আরামে ঠেলে দিতে চায় না, একটু তটস্থ রাখতে চায়। মধ্যবয়সী মানুষটি হেঁটে হেঁটে ঘরের মাঝখানে যেতে যেতে বলল, প্রতিদিন শীতলঘর থেকে যেসব মানুষকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে তাদের মাঝে যাদের বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে ছয়ের বেশি তাদেরকে এই ঘরে আনা হয়। মস্তিষ্ক স্ক্যান করার পদ্ধতিটি এখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আনা হয় নি। মাঝে মাঝে ভুল করে বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে ধরা পড়ে না। কিন্তু উল্টোটা কখনো হয় নি। যাদের বুদ্ধিমাত্তা নিনীষ স্কেলে ছয়ের বেশি ধরা পড়েছে তারা কখনো নির্বোধ প্রমাণিত হয় নি। কাজেই এই ঘরে তোমরা যারা আছ তারা সবাই নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান—আমার কাজ সে কারণে খুব সহজ।

সামনের দিকে বসে থাকা একজন তরুণ গলায় বলল, তোমার কাজটা কী?

আমার কাজ তোমাদেরকে তোমাদের পরবর্তী দায়িত্বের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। তোমরা সবাই শীতলঘরে ঘুমিয়েছিলে এবং তোমাদের বলা হয়েছিল পৃথিবী নামক গ্রহটার কাছে পৌঁছানোর পর তোমাদের জাগিয়ে তোলা হবে। পৃথিবী এখনো অর্ধশতাব্দী বছর দূরে, তোমাদের এখনই জাগিয়ে তোলা হয়েছে, তার পিছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ রয়েছে। কারণটা কী?

আমার পাশে বসে থাকা ঝকঝকে চেহারার একটা মেয়ে বলল, আমাদের সেটা অনুমান করতে হবে?

না। মধ্যবয়স্ক মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, সেটা তোমাদের অনুমান করতে হবে না। এটি গোপন কিছু নয়, কিন্তু তুমি যেহেতু প্রশ্ন করেছ আমার একটু ব্যক্তিগত কৌতূহল হচ্ছে। তুমি কি কিছু অনুমান করছ?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। বলল, হ্যাঁ।

আমরা কি সেটা শুনতে পারি?

অবশ্যই পার। আমার ধারণা সত্যিকার কারণটি যেন আমরা জানতে না পারি সেজন্যে তুমি আমাদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এখন মিথ্যে একটা কারণের কথা বলবে।

মেয়েটার কথা শুনে আমরা সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম, মধ্যবয়স্ক মানুষটি হাসল সবচেয়ে জোরে। সে হাসতে হাসতেই বলল, এই মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণের পুরো ব্যাপারটি এত জটিল যে তোমার ধারণা সত্যি হবার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি তোমাদের যদি মিথ্যে একটা কারণের কথাও বলি সেটা সত্যি জেনেই বলব। মানুষকে যখন বিভ্রান্ত করার প্রয়োজন হয় তখন রবোটকে ব্যবহার করা হয়। আমি

রবোট নই, জলজ্যান্ত মানুষ।

সামনের দিকে বসে থাকা একজন মানুষ বলল, ঠিক আছে, এখন তাহলে কারণটা শোনা যাক।

মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখ একটু গম্ভীর হয়ে আসে। সে কীভাবে কথাটা বলবে সম্ভবত সেটা মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, এই মহাকাশযানটি প্রায় এক শতাব্দী আগে যখন পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছিল তখন পরিকল্পনা করা হয়েছিল পৃথিবীর কাছাকাছি এসে আমাদের সবাইকে জাগিয়ে তোলা হবে। সেভাবেই এই অভিযান শুরু হয়েছিল। বেশিরভাগ মহাকাশচারী শীতলঘরে ঘুমিয়েছিল, অল্প কিছু ক্রু পালা করে মহাকাশযানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছিল। তোমরা নিশ্চয়ই জান মহামতি গ্রাউল যখন এই মহাকাশযানটি তৈরি করেছিলেন তখন সেটিকে সৃষ্ট জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এটি মহাকাশ পারাপার করতে পারে।

আমরা মাথা নাড়লাম, মহাকাশচারী হিসেবে এই মহাকাশযানে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমরা যারা স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছিলাম তাদেরকে নানাভাবে এই তথ্যগুলো অনেকবার দেয়া হয়েছে। এই মহাকাশযানের পরিকল্পনা করেছিলেন গ্রাউল নামের একজন মানুষ, তাকে সবসময় মহামতি গ্রাউল বলা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে মহামতি গ্রাউল বিকলাঙ্গ, তার চোখ কান বা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় নেই, তিনি সরাসরি সংবেদন জাতীয় যন্ত্র দিয়ে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি কোথায় থাকেন সেটি কেউ জানে না। তিনি কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন সেটিও কেউ জানে না। মহামতি গ্রাউল নিয়ে যে পরিমাণ রহস্যের জন্ম দেয়া হয়েছে তাতে আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটি কাল্পনিক। গ্রাউল নামে কোনো মানুষ কখনো ছিল না। এটি কিছু প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং কিছু শক্তিশালী কম্পিউটার জাতীয় যন্ত্রের এক ধরনের সূক্ষ্ম উপস্থাপন।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, এই অভিযানের প্রথম অংশটুকু ঠিক পরিকল্পনামাফিক কেটেছে। কিন্তু যখন আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছাতে শুরু করেছি হঠাৎ করে অবস্থার পরিবর্তন হল। পৃথিবী থেকে আমাদের কাছে কিছু সংবাদ পৌঁছাতে শুরু করল।

আমার পাশে বসে থাকা ঝকঝকে চেহারার মেয়েটি বলল, কী ধরনের সংবাদ?

অত্যন্ত নিরীহ ধরনের সংবাদ। পৃথিবীর ফসল তোলা হচ্ছে। পানি সরবরাহ করার জন্যে মেরু অঞ্চলের বরফ গলানো হচ্ছে। আয়োনোস্ফিয়ারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। নূতন ধরনের আন্তঃগ্যালাক্টিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হচ্ছে—এই ধরনের সংবাদ। আপাতদৃষ্টিতে এই সংবাদগুলোর মাঝে এতটুকু বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু মহাকাশযানের তথ্য বিশ্লেষণের যে সমস্ত উপায় রয়েছে সেগুলোর মাঝে এই তথ্যগুলো সরবরাহ করে একটি অত্যন্ত বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করা হয়েছে।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি ইচ্ছে করে এক মুহূর্তের জন্যে থামল এবং বেশ কয়েকজন একসাথে জিজ্ঞেস করল, কী জিনিস?

দেখা গেছে সমস্ত পৃথিবী একটা ভয়াবহ গোলযোগের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর মানুষেরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। একে অন্যকে কীভাবে ধ্বংস করবে সেটাই হচ্ছে সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য।

পিছনের দিকে বসে থাকা বুড়োমতো একজন মানুষ বলল, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না—নিরীহ কিছু সংবাদ থেকে সেটা কেমন করে বোঝা সম্ভব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পাশে বসে থাকা মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, সম্ভব হতে পারে। যদি দেখা যায় একটি ঘটনা ঘটছে অন্য আরেকটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে আর সেই ঘটনাগুলো একটি আরেকটাকে সাহায্য না করে ক্ষতি করছে—

মধ্যবয়স্ক মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। যেমন ধরা যাক, ফসল কাটার ব্যাপারটি। ঠিক ফসল কাটার সময় যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় আর সেই দুর্যোগটি যদি হয় ইচ্ছাকৃত—তাহলে আমাদের সন্দেহ করার কারণ রয়েছে। এমনিতে আমাদের কাছে সেই তথ্যগুলো অর্থহীন কিন্তু যদি সেগুলো বিশ্লেষণ করা যায় তখন সেগুলো হঠাৎ করে খুব অর্থবহ হয়ে ওঠে।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ করে আমার মনে হল আমি একটু একটু বুঝতে পারছি সে কী বলতে চাইছে। একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই মহাকাশযান যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের ধারণা আমরা এই পৃথিবীতে বাস করার অনুপযুক্ত?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি আমার প্রশ্ন শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী ধারণা পৃথিবীতে মানুষেরা যেরকম হানাহানি করেছে আমাদের এই মহাকাশযানে ঠিক সেরকম হানাহানি শুরু করতে হবে, যেন আমরা যখন পৃথিবীতে পৌঁছাব তখন কী করতে হবে আমাদেরকে বলে দিতে হবে না?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি আমতা আমতা করে বলল, তুমি কথাগুলো বলেছ খুব রূঢ়ভাবে কিন্তু কথাটি সত্যি। আমি একটু অন্যভাবে বলতে যাচ্ছিলাম।

আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল সে আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল, এবারে মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কীভাবে বলতে যাচ্ছিলে?

আমি বলতে চাইছিলাম যে আমরা যে-গ্রহ থেকে এসেছি সেই গ্রহে একটা নূতন ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যে-কারণেই হোক আমাদের গ্রহে একজন মানুষ অন্য মানুষকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে, আমরা একে অন্যের ওপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল। আমরা যখন পৃথিবীতে পৌঁছাব, পৃথিবীর সমাজব্যবস্থায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারব না। অপরিচিত অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে—

আমি মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে থাকি। এই মানুষটি যে কথাগুলো বলছে সেগুলো অর্থহীন কথা, কখনো কাউকে বিভ্রান্ত করতে হলে এই ধরনের কথা বলতে হয়। কেন সে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে? আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমরা যে-সমাজব্যবস্থা থেকে এসেছি সেখানে কোনো নেতৃত্ব নেই। আমাদের কার কী দায়িত্ব নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা আছে—সবাই নিজের দায়িত্ব পালন করে যাই এবং পুরো সমাজব্যবস্থা এগিয়ে যায়। এই মুহূর্তে যে-পৃথিবী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সেখানে সমাজব্যবস্থা অন্যরকম। সেখানে সমস্যার জন্ম হলে একজনকে নেতৃত্ব নিয়ে তার সমাধান করতে হয়। আমাদের পৃথিবীতে যাবার আগে সেটা শিখতে হবে।

আমি শীতল গলায় বললাম, সেটা আমরা কীভাবে শিখব?

মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে কেমন যেন অসহায় দেখায়, সে এক ধরনের ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সহজে। এই মহাকাশযানের যে নিয়ন্ত্রণটুকু ছিল সেটা সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

কী বললে?

হ্যাঁ। এই বিশাল মহাকাশযান, এর দশ হাজার অধিবাসী, প্রায় আটাশটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর, বায়ুমণ্ডল পরিশোধনের ব্যবস্থা, কৃত্রিম মহাকর্ষ বল, জৈবিক বিভাগ, শক্তি সঞ্চয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছু এখন আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছে। কিন্তু এর যে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণটুকু ছিল সেটা প্রায় দশ বছর আগে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এই মহাকাশযানটি, এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মহাকাশের ভেতর দিয়ে বিশাল একটা উপগ্রহের মতো ছুটে যাচ্ছে। আমাদের এখন এর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। দশ হাজার মানুষের জন্যে সেটি প্রায় এক শতাব্দীর কাজ। আমাদের এত সময় নেই। আমাদের সেটা অর্ধ শতাব্দীর মাঝে শেষ করতে হবে। সেটি করার একটি মাত্র উপায়—

মধ্যবয়স্ক মানুষটি হঠাৎ করে চুপ করে গেল, সে আশা করছিল আমরা কিছু বলব, কিন্তু আমরা কেউ কিছু বললাম না। মানুষটি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, আমাদের সেটি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেদের মাঝে এক ধরনের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে কাজ শুরু করা। সেজন্যে শীতলঘর থেকে সবাইকে জাগিয়ে তোলা শুরু হয়েছে।

আমি অনেক কষ্ট করে এতক্ষণ নিজেকে শান্ত করে রেখেছিলাম, এবারে আর পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ক্রোধকে গোপন করার এতটুকু চেষ্টা না করে বললাম, তুমি কে আমি জানি না। কেন তুমি এখানে এসেছ তাও আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে থেকে শুনে রাখ, আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। তুমি কার নির্দেশে এইসব বলছ আমি জানি না, আমার জানার এতটুকু ইচ্ছেও নেই। আমি শীতলঘরে ফিরে যাচ্ছি, পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগে তুমি যদি আবার আমাকে জাগিয়ে তোল, আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি সেটা তোমার জন্যে ভালো হবে না।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল, সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না যে কেউ এভাবে তার সাথে কথা বলতে পারে। বারকয়েক চেষ্টা করে সে আবার কিছু একটা বলতে শুরু করল কিন্তু আমার আর শোনার ইচ্ছে হল না, লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে আমি কয়েকবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম। শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানো গেলে নাকি রাগ কমে আসে। এত তাড়াতাড়ি এভাবে রেগে গেলাম কেন কে জানে। মানুষটি মিথ্যে কথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্যে সে নিশ্চয়ই দায়ী নয়। আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে বাইরে তাকালাম, যতদূর চোখ যায় একটা ধু-ধু প্রান্তরের মতো, এর পুরোটা মানুষের তৈরী এখনো আমার বিশ্বাস হয় না।

আমি সামনে নেমে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন পিছন থেকে একজন আমাকে ডাকল, কিহা!

আমি ঘুরে তাকালাম, আমার পাশে বসে থাকা ঝকঝকে চেহারার মেয়েটি আমার দিকে ছুটে আসছে। কাছে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমার নাম লেন। তুমি সত্যি শীতলঘরে ঘুমাতে যাচ্ছ?

আমি মেয়েটার দিকে তাকালাম, কী চমৎকার চেহারা মেয়েটির, যে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটার চেহারা ডিজাইন করেছে তার রুচিবোধের তুলনা হয় না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি সত্যিই শীতলঘরে ঘুমাতে যাচ্ছি।

তুমি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাও না?

না।

কেন?

কারণ আমি জানি এই মহাকাশযান বিশাল একটা প্রজেক্ট। যে-কোনো মূল্যে এটাকে

সমাপ্ত করা হবে—আমি সাহায্য করি আর নাই করি। এই মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটির মাঝে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র রয়েছে। বড় ধরনের নোংরামি। আমার নোংরামি ভালো লাগে না। আমার ধারণা ছিল কয়েক হাজার বছর আগে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের ভেতর থেকে সব নোংরামো সরিয়ে নিয়েছে।

লেন খিলখিল করে হেসে ফেলল, বলল, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ! তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর জিনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা ভালো মানুষ তৈরি করছে?

আমি লেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, তারা যে ভালো চেহারার মানুষ তৈরি করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

চেহারা তৈরি করা সহজ! আমি আমার জিনেটিক প্রোফাইল ঘেঁটে দেখেছি। তাদের হিসেব অনুযায়ী আমি খুব উন্নত ধরনের মানুষ—কিন্তু তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে আমার মাঝে মাঝে কী জঘন্য ধরনের কাজ করার ইচ্ছে করে!

যেরকম?

মেয়েটি মাথা নাড়ল, সেগুলো তোমাকে বলা যাবে না! তুমি শুনলে আমাকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেবে।

অন্যায় কাজ করার ইচ্ছে করা আর অন্যায় করা এক জিনিস নয়। ফ্যান্টাসি গ্রহণযোগ্য জিনিস।

লেন হাত নেড়ে বলল, সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করতে পারব, এখন কাজের কথা বলা যাক। তুমি সত্যিই শীতলঘরে যেতে চাইছ?

তুমি দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করলে। ব্যাপার কী?

আমি তোমার সাথে একমত যে আমাদের সাহায্য ছাড়াই এই মহাকাশযান পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করছে এটা তাদের দায়িত্ব। কিন্তু এই যে নেতৃত্বের ব্যাপারটা—

আমি অবাক হয়ে লেনের দিকে তাকালাম, নেতৃত্বের কোন ব্যাপারটা?

লেন মনে হল একটু লজ্জা পেয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল, এই যে নেতৃত্বের কথা বলছে সেটা নিয়ে আমার খুব কৌতূহল। আমার খুব জানার ইচ্ছে যে মানুষ যদি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় তাহলে সত্যিই কি স্বার্থপর হয়ে যায়? নিজের সিদ্ধান্ত সেটা ভালো হোক আর খারাপ হোক অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়? অন্যেরাও সেটা মুখ বুজে মেনে নেয়?

আমি মাথা নাড়ালাম, নিশ্চয়ই তাই হয় লেন।

এখানেও কি তাই হচ্ছে?

আমার মনে হয় হচ্ছে। গত দশ বছর থেকে এখানে মানুষকে শীতলঘর থেকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে নেতৃত্ব দিতে—কাজেই আমি নিশ্চিত এই মহাকাশযানটা এখন ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা অংশে একজন করে নেতা রয়েছে—তারা সবাই আরো বড় অংশের নেতৃত্বের জন্যে যুদ্ধ করছে।

যুদ্ধ?

হ্যাঁ। হয়তো সত্যিকার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ নয়। কৌশল দিয়ে যুদ্ধ। ছলচাতুরী দিয়ে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ নিশ্চয়ই হচ্ছে।

লেনের চোখ চকচক করতে থাকে। সে একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমি ব্যাপারটা দেখতে চাই।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা কুৎসিত। প্রাচীনকালে মানুষের নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল।

মানুষ যত উন্নত হয়েছে নেতৃত্বের প্রয়োজন তত কমে এসেছে। এখন আসলে নেতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই মহাকাশযানে তো নেতৃত্বের প্রয়োজন তৈরি করা হয়েছে।

এটা কৃত্রিম। আমার ধারণা কেউ একজন আমাদের নিয়ে একটা পরীক্ষা করছে। ভয়ঙ্কর একটা পরীক্ষা।

লেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি দেখতে চাই পরীক্ষা কেমনভাবে করা হয়। কেমন জানি একটা কৌতূহল। হয়তো দূষিত কৌতূহল, কিন্তু কৌতূহল।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, কৌতূহল কখনো দূষিত হয় না লেন। কৌতূহল অনাবশ্যক হতে পারে, কিন্তু দূষিত নয়।

লেন আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোনো কৌতূহল নেই?

আমি মাথা নাড়লাম, না, নেই। আমি শীতলঘরে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে যেতে চাই। শান্ত নিরুপদ্রব ঘুম। আমি জেগে উঠতে চাই পৃথিবীতে। আমার জীবনীশক্তি আমি এই মহাকাশযানে অপচয় করতে চাই না। আমি সেটা পৃথিবীর জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

লেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি প্রথমবার লক্ষ করলাম তার চোখ দুটি আশ্চর্য রকম নীল—ঠিক পৃথিবীর মতো।

২

মহাকাশযানের এই অংশটুকু আমার কেমন জানি চেনা চেনা মনে হল। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে কোনো অচেনা জায়গাকে চেনা চেনা মনে হয় এর কারণ কী কে জানে। বিশাল এই মহাকাশযানটি আক্ষরিক অর্থে একটি বিরাট উপগ্রহের মতো, এর অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ আমি দেখেছি, আমার স্মৃতি ভালো নয় যেটুকু দেখেছি সেটুকুও ভালো মনে নেই, কাজেই আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই জায়গাটি আমি আসলে আগে কখনো দেখি নি।

জায়গাটি আমি কি দেখেছি না দেখি নি যখন এই অর্থহীন ভাবনাটি আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক তখন আমি অনুভব করলাম আমার কব্জিতে বাঁধা ছোট কমিউনিকেশান্স মডিউলটাতে কেউ একজন আমার তথ্যগুলো যাচাই করে দেখছে। আমার মৌখিক অনুমতি ছাড়া সেটি করার কথা নয়, কাজটি ঘোরতর অন্যায়। আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করে কমিউনিকেশান্স মডিউলটি বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেলাম। এই মহাকাশযানে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে থাকলে সবচেয়ে প্রথমে এই কাজটি করার কথা—অন্য মানুষকে যাচাই করে দেখা। কেউ একজন আমাকে যাচাই করে দেখছে। সেটি বন্ধ করে দিলে তার কৌতূহল বা সন্দেহ বেড়ে যাবে যার ফল আমার জন্যে ভালো নাও হতে পারে। আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে কৌতূহলী চোখে চারদিকে তাকাতে থাকি। আমার সামনে বেশ কিছু চতুষ্কোণ পাথর সাজানো আছে, ডান দিকে একটা দালানের মতো উঠে গেছে। পেছনে বড় করিডোর। বাম দিকে বেশ খানিকটা উন্মুক্ত জায়গা। আশপাশে কোথাও কোনো মানুষ, রবোট বা অন্য কোনো ধরনের যানবাহন নেই। যেই আমাকে যাচাই করে দেখছে সে কাজটি করছে গোপনে। আমি মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, মানুষ কী বিচিত্র একটি প্রজাতি, কত সহজে তাদেরকে সাময়িকভাবে কলুষিত করে দেয়া যায়। আমি যখন যোগাযোগ মডিউলে কথা বলব নাকি পুরো ব্যাপারটা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাব ঠিক করতে পারছিলাম না, তখন

AMARBOI.COM

দেখতে পেলাম চতুষ্কোণ পাথরের আড়াল থেকে দুজন মানুষ দ্রুতপায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষ দুজনের হাতে কালচে বিদ্‌ঘুটে জিনিসগুলো যে কোনো ধরনের অস্ত্র সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ দুজন আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতে আমার দুই হাত ধরে ফেলল। আমি ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম তাদের গায়ে যন্ত্রের মতো জোর—সম্ভবত তারা মানুষ নয়, রবোট। আমি নিজেকে যেটুকু সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও।

নিনীষ স্কেলে যার বুদ্ধিমত্তা আটের উপরে তাকে আমরা এমনি ছেড়ে দেব? আমাদের দেখে কি এত বড় নির্বোধ মনে হয়?

আমি মানুষগুলোর চেহারা খুব ভালো করে দেখি নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি তাদের বেশ নির্বোধই মনে হচ্ছিল যদিও সেটা এখন জোর গলায় বলার সাহস হল না। মানুষ দুজন আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে, আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কী করবে আমাকে দিয়ে?

বিক্রি করব।

বিক্রি করবে? কার কাছে?

যে ভালো দাম দেবে।

আমি মানুষ দুজনের মুখের দিকে তাকালাম, তারা সত্যি কথা বলছে নাকি আমার সাথে রসিকতা করছে বোঝার চেষ্টা করলাম। ভাবলেশহীন মুখে কোনো ধরনের অনুভূতি নেই, সম্ভবত সত্যি কথাই বলছে। এই মহাকাশযানে এর মাঝে বুদ্ধিমান মানুষ কেনাবেচা শুরু হয়ে গেছে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে তোমরা কিসের বিনিময়ে বিক্রি করবে?

মানুষ দুজনই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। একজন বলল, সত্যি তুমি জান না?

না। আমি আজকেই শীতলঘর থেকে বের হয়েছি।

নিনীষ স্কেলে আটের মানুষ এখন বার পয়েন্টে বিক্রি হচ্ছে। ছয় পয়েন্টে এক স্তর উপরে উঠা যায়। প্রতি স্তরে রয়েছে—

লোকটি তার কথা শেষ করার আগেই আমার কানের কাছ দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে কী একটা ছুটে গেল, পর মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। মানুষ দুজন আমাকে নিয়ে সাথে সাথে বড় একটা পাথরের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। আমি পাথরের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখলাম। দেখতে পেলাম মানুষ দুজন তাদের অস্ত্র উপরে তুলে প্রচণ্ড কর্কশ শব্দে গুলি করতে শুরু করেছে। তীব্র আলোর ঝলকানিতে চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বিস্ফোরণের শব্দ ধোঁয়া এবং ধুলোবালিতে চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসে। আমি এ রকম পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়ি নি এবং এ রকম পরিস্থিতিতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। প্রচণ্ড আতঙ্কে হতচকিত হয়ে উঠে দৌড়ানোর একটা অদম্য ইচ্ছাকে অনেক চেষ্টা করে চেপে রেখে আমি মাথা নিচু করে শুয়ে রইলাম।

আমার কানের কাছে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল এবং আমি মাথা তুলে দেখতে পেলাম আমার পাশে উবু হয়ে শুয়ে থাকা একজন মানুষের শরীরের অর্ধেক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেছে এবং শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশ থেকে কিছু পোড়া তার, ধাতব যন্ত্রপাতি আর ঝলসে যাওয়া পলিমার বের হয়ে আছে এবং সেখান থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। আমি যাদেরকে মানুষ ভেবেছিলাম সেগুলো নিচু স্তরের রবোট ছাড়া আর কিছু নয়। রবোটটি সেই অবস্থাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার অস্ত্র দিয়ে কর্কশ শব্দ করে গুলি করে যেতে থাকে।

কিছুক্ষণের মাঝে বেশ কয়েকজন এসে আমাদের ঘিরে ফেলল, দেখে তাদের মানুষ মনে হলেও খণ্ডযুদ্ধে উড়ে যাওয়া অংশ থেকে ধাতব যন্ত্রপাতি বের হয়ে রয়েছে বলে সেগুলো যে রবোট সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। দুজন নিচু হয়ে আমাকে টেনে তুলে নিল, তৃতীয়টি তার হাতের অস্ত্র দিয়ে পড়ে থাকা বাকি রবোটটিকে প্রায় পুরোপুরি ভস্মীভূত করে ফেলল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি এরা দেখতে মানুষের মতো হলেও কেউই আসলে মানুষ নয় এবং একজন আরেকজনকে যেরকম সহজে ধ্বংস করে ফেলছে সেটি সত্যিকার অর্থে নৃশংসতা নয় কিন্তু তবু আমার সারা শরীর গুলিয়ে আসতে থাকে।

রবোটগুলো হাতের অস্ত্রগুলো তাক করে আমাকে ঘিরে এগিয়ে যেতে থাকে। আমি কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে এনে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

একটি রবোট ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিক ভাষায় কিছু শব্দ উচ্চারণ করল, আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি মাথা নেড়ে বললাম, তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রবোটটি কোনো কথা না বলে আমার দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়, তার দুই আঙুল থেকে সুচালো দুটি ইলেকট্রড বের হয়ে আসে, আমি কিছু বোঝার আগেই সেগুলো আমার কপাল স্পর্শ করল, আমি ভয়ঙ্কর একটা ইলেকট্রিক শক অনুভব করলাম এবং সাথে সাথে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল, আমি আবিষ্কার করলাম আমি উপুড় হয়ে শীতল একটা পাথরের মেঝেতে শুয়ে আছি। মাথায় চিনচিনে একটা ব্যথা। আমি সাবধানে মাথা তুলে তাকালাম—অন্ধকার একটা ঘর, মনে হল সেখানে আরো কিছু মানুষ আছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকানোর চেষ্টা করতেই ঘরের কোনা থেকে একজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে এসে নরম গলায় বলল, তুমি এখনো বেঁচে আছ? আমি ভেবেছিলাম মরে গেছ।

আমি উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, না, এখনো মরি নি। আমরা কোথায়?

মহাকাশযানের সবচয়ে বড় দস্যুদলের হাতে বন্দি।

বন্দি?

হ্যাঁ।

কেন?

মানুষটি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, যদি বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে ছয়ের বেশি হয় তোমাকে স্থানীয় কোনো নেতার কাছে বিক্রি করে দেবে।

যদি না হয়?

তাহলে কপাল খারাপ। শুনেছি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কেটে বিক্রি করে। শক্তিশালী হৃৎপিণ্ড নাকি খুব ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে। নিনীষ স্কেলে তোমার বুদ্ধিমত্তা কত?

আট।

আট! মানুষটা শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, এত যদি তোমার বুদ্ধি তাহলে এই গাড্ডায় এসে হাজির হলে কেমন করে?

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, যন্ত্রপাতি কাউকে বুদ্ধিমান বললেই সে বুদ্ধিমান হয়ে যায় না। আমি বেশিরভাগ ব্যাপারে একেবারে নির্বোধ।

সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই! মানুষটা নির্মমভাবে তার গাল চুলকাতে

চুলকাতে বলল, আমার বুদ্ধিমত্তা যদি নিনীষ স্কেলে ছয়ও হত আমি অর্ধেক মহাকাশযান দখল করে ফেলতাম।

আমি মানুষটার চোখের দিকে তাকালাম, সে চোখ সরিয়ে হেঁটে ঘরের অন্যপাশে চলে গেল। একটু পরে শুনতে পেলাম সে গুনগুন করে বিষণ্ন একটা সুরে গান গাইছে— অকারণেই আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

আমি দীর্ঘ সময় একা একা ঘরের কোনায় বসে রইলাম। শীতলঘর থেকে বের হবার পর দীর্ঘ সময় খাবার খেতে হয় না, যদি তা না হত তাহলে এতক্ষণে আমি নিশ্চয়ই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যেতাম। কিছু একটা ঘটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি যখন হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ দরজা খুলে গেল। রাগী চেহারার কমবয়স্ক একজন মানুষ দুই পাশে দুই জন সশস্ত্র রবোট নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মাঝে কিহা কে?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি। কেন কী হয়েছে?

রাগী চেহারার মানুষটি আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল, হাতে কমিউনিকেশান্স রিডারে আমার তথ্যগুলো ভালো করে মিলিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমার সাথে চল।

কোথায়?

তোমাকে আমরা মিয়ারার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

মিয়ারা? সেটা কে?

রাগী চেহারার মানুষটা শুষ্কস্বরে হেসে উঠে বলল, বলতেই হবে তুমি খুব সৌভাগ্যবান মানুষ যে মিয়ারার নাম শোন নি! দশ বছরের মাঝে এই মেয়েমানুষটি যদি পুরো মহাকাশযানটা দখল করে না নেয় তাহলে আমার মাথা কেটে সেখানে একটা কপোট্রন বসিয়ে দিও!

আমি কোনো কথা না বলে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার কাপড়ের মাঝে হাত ঢুকিয়ে চোখঢাকা একটা হেলমেট বের করে এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা মাথায় পরে নাও, তোমাকে কোথায় নিচ্ছি দেখতে দিতে চাই না।

আমি অত্যন্ত খেলো ধরনের হাস্যকর এই হেলমেটটি পরে নিতেই আমার চোখের সামনে সবকিছু পাল্টে গেল, আমি মানুষটি এবং রবোট দুটিকে এখনো দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু বাকি সবকিছু পাল্টে গিয়ে সেখানে অতিপ্রাকৃত বিচিত্র সব দৃশ্য খেলা করতে থাকে। আমার সামনে বিচিত্র ধরনের রাস্তাঘাট, দেয়াল এবং ধু-ধু প্রান্তর আসা-যাওয়া করতে থাকে, আমি জানি তার সবই কাল্পনিক এবং এই পথ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে খারাপ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমি তাই সাবধানে মানুষটির পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকি। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে আমি এক ধরনের গাড়িতে উঠে বসলাম, সেটি খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল এবং সবশেষে বিশাল একটা দালানের সামনে আমাদের নামিয়ে দিল। সেখানে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল যার কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। এক সময় গোলাকার একটা দরজা খুলে গেল এবং আমি আরেকজন মানুষের পিছু পিছু হেঁটে এবং ভাসমান আসনে করে একটা ঘরে এসে প্রবেশ করলাম। ঘরটিতে আরো একজন মানুষ বসেছিল, হেলমেটে বসানো চোখের আবরণের কারণে মানুষটিকে অত্যন্ত বিচিত্র দেখাতে থাকে কিন্তু তাকে ভালো করে দেখার জন্যে আমি নিজে থেকে হেলমেটটি খোলার সাহস পাচ্ছিলাম না।

কিহা, তুমি তোমার হাস্যকর হেলমেটটি খুলে ফেলতে পার। আমি একজন মেয়ের

গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠি—এই কি তাহলে মিয়ারা? সাবধানে হেলমেটটি খুলতেই চোখের সামনে একটা আলোকোজ্জ্বল ঘর বের হয়ে এল। ঘরটি প্রাচীনকালের একটি অফিসঘরের মতো করে সাজানো এবং বিশাল একটা কালো টেবিলের পিছনে ধাতব রঙের রুপালি চুলের একটি মেয়ে বসে আছে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় এই মেয়েটি তা নয় কিন্তু তার ভেতরে এক ধরনের আদিম সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। মেয়েটি তার ঝকঝকে ধারালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিহা, তুমি বসতে পার।

আমি সাবধানে একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসতেই আমার শরীরের ভিতর দিয়ে স্বল্প কম্পনের একটি তরঙ্গ আসা-যাওয়া করতে থাকে এবং এক ধরনের আরামে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মেয়েটি হাসি হাসিমুখে বলল, ব্যাপারটি প্রায় অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি তুমি আমাকে চেন না। আমি মিয়ারা—

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম মিয়ারা।

মিয়ারা শব্দ করে হেসে বলল, তুমি আসলে সুখী হও নি কিহা। ভদ্রতার জন্যে অবিশ্যি এই ধরনের একটি-দুটি কথা আমি শুনতে রাজি আছি। তবে এমনিতে আমি স্পষ্ট কথা বলতে এবং শুনতে ভালবাসি।

চমৎকার। আমি গলার স্বর এতটুকু উঁচু না করে বললাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই বলে দিই। আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আমি পৃথিবীতে না-পৌঁছানো পর্যন্ত শীতলঘরে গিয়ে ঘুমাতে চাই।

মিয়ারার মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে আসে এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি হঠাৎ আমি বুকের ভিতরে ভয়ের এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করি। মিয়ারা জিভ দিয়ে তার রং-করা টকটকে লাল ঠোঁটকে ভিজিয়ে বলল, কার কোথায় কতটুকু অধিকার সেটা একেক সময় একেক ভাবে ঠিক করা হয়। এখন আমার আওতার মাঝে যারা আছে তাদের জন্যে আমি ঠিক করছি। তোমার বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে আট—আমার থেকে এক মাত্রা বেশি, কাজেই আমি অহেতুক সময় নষ্ট না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসি। মিয়ারা আমার উপর থেকে চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমাকে আমি একটি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিতে চাই। আমি আশা করছি তুমি স্বেচ্ছায় সেটা সমাধান করবে।

যদি না করি?

মিয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, অবশ্যই করবে। কারণ যদি না কর তাহলে তোমার খুলি থেকে মস্তিষ্কটি বের করে সেটাকে একটা সাইবার কন্ট্রোলে ব্যবহার করা হবে। কিছুক্ষণ হল সেই কাজে দক্ষ একটা রবোটকে আমি অনেক দাম দিয়ে কিনেছি—তার নাকি এই ধরনের একটা অস্ত্রোপচার করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে!

আমি স্থির দৃষ্টিতে মিয়ারার দিকে তাকালাম, মিয়ারা চোখ ফিরিয়ে না নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বললাম, কেন তোমরা এসব করছ মিয়ারা?

মিয়ারা কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিচু গলায় বললাম, তুমি নিশ্চয়ই বলবে যে তুমি যদি না কর সেটা অন্য একজন করবে। তুমি যদি একজনকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনে না আন তাহলে অন্য কেউ তোমাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেবে—

মিয়ারা আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল—আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। তুমি কেন দেখতে পাচ্ছ না যে এটা একটা খেলা। কেউ একজন তোমাদের নিয়ে খেলছে।

মিয়ারা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ। আমি জানি। কিন্তু এই খেলার কোনো দর্শক নেই কিহা। সবাই খেলোয়াড়। তোমাকেও খেলতে হবে। তুমি পাশের ঘরে যাও। তোমাকে বায়ো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কিছু উত্তেজক সিরাম দেয়া হবে, তোমাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, এখানে ক্লান্তির কোনো সময় নেই কিহা। ক্লান্ত হলেই পিছিয়ে পড়তে হয়—পিছিয়ে পড়লেই শেষ।

আমি মিয়ারার দিকে তাকালাম, তার পাথরের মতো চোখে কোনোরকম ভাবালুতা নেই। পরিবেশ কী দ্রুতই না মানুষকে পাল্টে দিতে পারে!

আমি দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে আবছা অন্ধকার, আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই একজন আমার দিকে ছুটে এল। এলোমেলো চুলের একটি ভয়ার্ত মেয়ে। মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, কিহা তোমাকেও এনেছে?

আমি আবছা অন্ধকারে মেয়েটিকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললাম, কে?

আমি লেন।

লেন, তুমি? আমার আরো কিছু একটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু কী বলব কিছুতেই ভেবে বের করতে পারলাম না।

৩

চতুর্থ প্রজাতির একটি রবোট আমার এবং লেনের কাছে এসে মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বলল, আমার নাম ত্রিনি। আপনাদের দুজনের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে।

আমি ত্রিনির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললাম, আমাকে আর লেনকে এইমাত্র রিটালিন-৪০০ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকবে না। ঘুম পাবে না—এমনকি বাথরুমেও যেতে হবে না। দৈনন্দিন কাজের বাকি থাকল কী?

ত্রিনি আবার মাথা নুইয়ে বলল, আপনাদের দুজনকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা পালন করার জন্যে আপনাদের নানা ধরনের তথ্য প্রয়োজন হতে পারে—

তোমাদের মূল তথ্যকেন্দ্রে আমাকে নিয়ে গেলেই আমি নেটওয়ার্ক দিয়ে সব তথ্য পেয়ে যাব। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হবে না। তুমি যেতে পার ত্রিনি। একটি রবোট আমার কাছে ঘুরঘুর করলে আমার ভালো লাগে না।

মহামান্য কিহা, রবোটের সাহচর্য আপনার ভালো লাগে না শুনে আমি দুঃখিত। কিন্তু—

তুমি মোটেও দুঃখিত নও ত্রিনি। চতুর্থ প্রজাতির রবোট দুঃখ অনুভব করতে পারে না। তুমি সোজাসুজি সত্যি কথাটি বলে ফেল।

ত্রিনি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, আমাকে আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে রাখা হয়েছে। এখান থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে আপনারা যেন কোনোভাবে নিজেদের বিপদগ্রস্ত না করেন—

লেন শব্দ করে হেসে বলল, তুমি আমাদের চোখে চোখে রাখবে যেন আমরা পালিয়ে না যাই?

AMARBOI.COM

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মহামান্যা লেন। মহামান্যা মিয়ারার এই আবাসস্থলটি অদৃশ্য লেজাররশ্মি এবং শক্তিবলয় দিয়ে প্রতিরক্ষিত। বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ করতে চাইলে কিংবা বের হতে চাইলে আপনাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

লেন আমার দিকে তাকাল, এখনো সে ব্যাপারটি বুঝতে পারছে না। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ত্রিনির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলতে চাইছ—তুমি একজন চতুর্থ প্রজাতির রবোট আমাদের মতো দুজন মানুষকে আটকে রাখতে পারবে?

আপনাদের শারীরিকভাবে আটক রাখাই যথেষ্ট। আপনাদের জীবিত রাখার কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নি। কাজটি অত্যন্ত সহজ মহামান্যা লেন। আমি নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সজ্জিত।

লেনের মুখে এক ধরনের বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে ওঠে। আমি তার কাঁধ স্পর্শ করে বললাম, ছেড়ে দাও লেন। চল আমরা তথ্যকেন্দ্রে যাই।

তথ্যকেন্দ্রটি বিশাল। এই মহাকাশযানে এ রকম তথ্যকেন্দ্র কয়টি আছে কে জানে। দেয়ালে সারি সারি মনিটর এবং নানা ধরনের হলোগ্রাফিক স্ক্রিন। তথ্য দেয়ার জন্যে বিচিত্র ধরনের যন্ত্রপাতি। ঘরটি বিশাল হলেও সেখানে মানুষজন খুব বেশি নেই। কয়েকজন নানা বয়সের পুরুষ এবং মহিলা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমরা যে এই ঘরে প্রবেশ করেছি তারা সেটা লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। আমি ফাঁকা একটা মনিটরের সামনে বসতেই মনিটরটির ভেতর থেকে ভরাট গলার স্বরে কে যেন বলল, কিহা তোমার জন্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি একটু চমকে উঠে বললাম, তুমি কে কথা বলছ?

আমার নাম রি। আমি মহামান্যা মিয়ারার মূল তথ্যকেন্দ্রের পরিচালক।

তুমি একটি প্রোগ্রাম?

আমরা সবাই একটি প্রোগ্রাম।

হেঁয়ালি ছাড়। আমার হেঁয়ালি ভালো লাগে না।

মনিটরটির ভেতর থেকে ভরাট গলায় হাসির মতো এক ধরনের শব্দ ভেসে এল। আমি নিজের বিরক্তিটুকু গোপন করার কোনো চেষ্টা না করে বললাম, তুমি হাসার ভান করছ? আমি একটি যন্ত্রকে যন্ত্রের মতো দেখতে চাই।

তুমি খুব প্রাচীনপন্থী মানুষ কিহা। যন্ত্র আর মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একজন মানুষ হচ্ছে একটি জৈবিক যন্ত্র—

অনেক হয়েছে, তুমি এখন চুপ কর। আমি এখানে কাজ করতে এসেছি।

রি নামক প্রোগ্রামটি এবারে লেনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে থাকে, হালকা স্বরে বলে, লেন, তুমিও বিশ্বাস কর যে যন্ত্রদের মানুষের মতো ব্যবহার করার অধিকার নেই?

লেন একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, রি, তুমি একটি কৌশলী প্রোগ্রাম, বাজে কথা বলা তোমার জন্যে খুব সহজ। আমরা আজকেই শীতলঘর থেকে বের হয়েছি, আমরা বিশ্রাম নেবার সুযোগ পাই নি। রিটালিন–৪০০ নিয়ে আমরা জেগে আছি, তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের দার্শনিক কথাবার্তায় টেনে নিও না।

রি তার গলার স্বরে এক ধরনের সমবেদনা ফুটিয়ে বলল, তোমাদের ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। মহামান্যা মিয়ারা তোমাদের যে সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলো আসলে খুব সহজ।

AMARBOI.COM

সহজ?

হ্যাঁ। তোমাদের যে ধরনের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তাতে সমস্যাগুলোর সমাধান করা কোনো ব্যাপারই নয়। বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের সাহায্য করার জন্যে রয়েছি।

আমি একটু অবাক হয়ে মনিটরটির দিকে তাকালাম। একজন মানুষের সাথে কথা বলার সময় সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বোঝা যায় কিন্তু রি নামের এই প্রোগ্রামটির চোখের দিকে তাকানোর কোনো উপায় নেই। অথচ আমি নিশ্চিতভাবে জানি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

অবশ্যই করব। তোমাদের সাহায্য করাই আমার মূল দায়িত্ব।

আমাদেরকে মিয়ারা কী সমস্যা সমাধান করতে দিয়েছে আমি জানি না, কিন্তু আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে সেগুলো এক ধরনের অন্যায় কাজ। তুমি এই অন্যায় কাজে সাহায্য করবে?

রি তার গলার স্বর নিচু করে ষড়যন্ত্রীদের মতো বলল, আমি জানি তোমরা মাত্র শীতলঘর থেকে বের হয়ে এসেছ, মহাকাশযানের কাজকর্ম আজকাল কীভাবে করা হয় এখনো জান না। তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে বলছি কখনোই মহামান্যা মিয়ারা সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কোনো কথা বলবে না।

লেন কাঁপা গলায় বলল, বললে কী হয়?

জৈব গবেষণার জন্যে আমাদের কিছু মানুষের প্রয়োজন। মহামান্যা মিয়ারা সেখানে নানা ধরনের পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষ কত কম অক্সিজেনে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে এ ধরনের একটা পরীক্ষার জন্যে তিনি একজন অবাধ্য মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন।

লেন কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকাল, আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মতো ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের যে সমস্যা সমাধান করতে হবে সেগুলো কী?

AMARBOI.COM

রি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, লেনের সমস্যাটি বলা যেতে পারে সমাধান হয়ে গেছে, সেটা কীভাবে কার্যকর করা হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

সমস্যাটা কী?

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেহেতু সবাইকে জাগিয়ে তোলা শুরু হয়েছে, এই মহাকাশযানে একটা বিশাল খাদ্যসঙ্কট দেখা দেবে। মহামান্যা মিয়ারার অনুগত মানুষেরা কীভাবে এই খাদ্যসঙ্কটের সময় বেঁচে থাকবে—সেটা হচ্ছে সমস্যা।

লেন দুর্বল গলায় বলল, তার সমাধানটা কী?

মানুষের দেহই হবে মানুষের খাবার।

লেন চমকে উঠে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বলল, এটি অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ একটি রসিকতা।

রি গম্ভীর গলায় বলল, এটি রসিকতা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।

লেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আর আমার জন্যে কী সমস্যা রাখা হয়েছে?

তোমার সমস্যাটি আরো বিচিত্র। মহামান্যা মিয়ারা তোমাকে একটি নূতন ধরনের অস্ত্র তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

অস্ত্র?

হ্যাঁ, অস্ত্র।

যে অস্ত্র দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়?

হ্যাঁ। এই মহাকাশযানে অস্ত্র বলতে গেলে নেই। যখন এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন এই মহাকাশযানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে অস্ত্র।

অস্ত্র? আমি হতচকিতের মতো বললাম, আমাকে অস্ত্র তৈরি করতে হবে? অস্ত্র?

হ্যাঁ। অস্ত্র তৈরি করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই কাজেই এখানে যা আছে তাই ব্যবহার করতে হবে—

অস্ত্র? আমি আবার বিড়বিড় করে বললাম, অস্ত্র? যে অস্ত্র দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়?

রি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তুমি তোমার দায়িত্বটি খুব সহজভাবে নিতে পার নি কিহা।

আমি লেনের দিকে তাকালাম, লেন দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, মিয়ারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই তোমাকে অন্য একটা দায়িত্ব দেবে। নিশ্চয়ই দেবে।

রি ভারি গলায় বলল, তার সম্ভাবনা বলতে গেলে শূন্য। মিয়ারাকে তোমরা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পার নি। সে অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মহিলা। তার মাঝে কোনো অকারণ ভাবালুতা নেই।

আমি চুপ করে রইলাম। রি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে কিছু যন্ত্রপাতির ছবি ফুটিয়ে তুলে বলল, আমাদের সরবরাহঘরে যে সমস্ত জিনিস আছে সেগুলো এ রকম। শক্তিশালী লেজার খুব বেশি নেই তবে ভালো বিস্ফোরক রয়েছে।

আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম, লেনও সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। রি জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, অন্যমনস্কভাবে হেঁটে হেঁটে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম, লেন কাতর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ কিহা?

আমি জানি না।

তুমি এখন কী করবে?

আমি সেটাও জানি না। আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু আমি তো মানুষকে হত্যা করার জন্যে অস্ত্র তৈরি করতে পারি না। কিছুতেই—

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমার সামনে একটা আলোর বিচ্ছুরণ দেখা গেল এবং মুহূর্তে সেটা ত্রিমাত্রিক একটা হলোগ্রাফিক মানুষের রূপ নিয়ে নেয়। মানুষটি ঝড়ের বেগে আমার দিকে ছুটে আসে—আমি তাকে চিনতে পারলাম, মানুষটি মিয়ারা।

মিয়ারা সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। তার মুখের রং পাল্টে যেতে থাকে এবং তাকে অতিপ্রাকৃতিক ভৌতিক একটা মূর্তির মতো দেখাতে থাকে। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি আমার আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছ?

আমি কোনো কথা না বলে মিয়ারার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার মুখের ভঙ্গি আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকে, বিচিত্র এক ধরনের বর্ণ সেখানে খেলা করছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, তুমি কি প্রকৃত মিয়ারা নাকি তার একটি প্রতিচ্ছবি?

মিয়ারা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হিংস্র গলায় বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমার উত্তর দেবার কিছু নেই। আমি আদেশ দিতে বা শুনতে অভ্যস্ত নই।

তুমি জান তুমি কী করতে যাচ্ছ?

AMARBOI.COM

সম্ভবত জানি। অস্ত্র তৈরি করে কিছু মানুষকে হত্যা করা আর সেটা তৈরি না করার জন্যে নিজেকে হত্যা করতে দেয়ার মাঝে বিশেষ পার্থক্য নেই। দুটিই একই ধরনের নির্বুদ্ধিতা। আমি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, ইচ্ছে করলেই আমি অস্ত্র তৈরি করছি বলে তোমাকে ধোঁকা দিতে পারতাম। আমার বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে আট, তোমার মতো কয়েকজনকে ধোঁকা দেয়া আমার জন্যে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আমি দিই নি।

মিয়ারা আমার দিকে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ঠিক আছে তোমাকে শেষ একটি সুযোগ দিচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার মাঝে আট জন মানুষকে শীতলঘর থেকে জাগানো হচ্ছে। এই মানুষগুলোকে জাগানো হচ্ছে মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিশেষ আদেশে। এই মানুষগুলোর বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে। আমি এই মানুষগুলোকে চাই।

মানুষগুলোকে চাও?

হ্যাঁ। আমি খবরটি পেয়েছি আমার বিশেষ ক্ষমতার জন্যে। সবাই খবরটি জানে না—যদি জানত তাহলে মহাকাশযানের প্রত্যেকটি দল তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই আট জন মানুষকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। তুমি যদি পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মাঝে মানুষগুলোকে আমার এখানে এনে হাজির করে দিতে পার, তোমাকে আমি বেঁচে থাকার আরেকটা সুযোগ দেব।

আমি কোনো কথা না বলে মিয়ারার দিকে তাকিয়ে রইলাম—নিজের ভিতরে হঠাৎ এক ধরনের বিতৃষ্ণা জমে উঠতে থাকে। মিয়ারা আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেভাবে হঠাৎ করে হাজির হয়েছিল ঠিক সেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি হেঁটে হলোগ্রাফিক মনিটরটির কাছাকাছি এসে হাজির হতেই রি চাপা গলায় বলল, তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একজন মানুষ। আমি এর আগে মহামান্যা মিয়ারাকে কাউকে ক্ষমা করতে দেখি নি।

আমি চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম, সে জন্যে তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

রি তার গলায় এক ধরনের আহত ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বলল, তুমি এ রকম কথা কেন বলছ?

তোমার মহামান্যা মিয়ারাকে আমার খবরটি পৌঁছাতে তুমি পিকোসেকেন্ডও দেরি কর নি—তাই বলছি।

রি একটা নিশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে বলল, সেটাই আমার দায়িত্ব। আমাকে সেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

আমি তোমাকে নূতনভাবে প্রোগ্রাম করে দিই? এখন থেকে তুমি আমার জন্যে কাজ করবে?

রি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তুমি যদি আমাকে সেভাবে প্রোগ্রাম করতে পার অবশ্যিই আমি তোমার জন্যে কাজ করব!

আমি শব্দ করে হেসে বললাম, যন্ত্রেরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা শিখে যায় তখন মনে হয় সভ্যতার ধ্বংস হওয়া শুরু হয়!

রি কী একটা বলতে যাচ্ছিল আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, কাজ শুরু করা যাক। মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিশেষ আদেশে যে আট জন মানুষকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে তাদেরকে আমারও দেখার বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে।

AMARBOI.COM

রি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার কী কী প্রয়োজন?

কয়েকজন শক্তিশালী সশস্ত্র রবোট।

চমৎকার। আমিও তাই ভাবছিলাম। আমাদের কাছে যারা আছে তোমাকে দেখাচ্ছি, তুমি বেছে নাও।

প্রায় সাথে সাথেই হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ভয়ঙ্করদর্শন কিছু রবোটের ছবি ফুটে ওঠে। তাদের হাতে কিছু জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা অস্ত্র। আমি লেনকে বললাম, লেন কয়েকটাকে বেছে নাও।

লেন বিকটদর্শন কয়েকটা রবোটকে বেছে দিল। রি বলল, রবোটগুলোর মাঝে কী ধরনের বুদ্ধিমত্তা দেব? এখন সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে ক্লিপিড ৩৩। অত্যন্ত উচ্চ ধরনের বুদ্ধিমত্তা, চমৎকার যুক্তিবিদ্যা, চমৎকার মানবিক আবেগ—

আমি কোনো বুদ্ধিমত্তা চাই না। যদি মানবিক আবেগেরই প্রয়োজন হয় তাহলে তো মানুষকেই বেছে নিতাম। আমার প্রয়োজন অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা, বলা যেতে পারে প্রায় পশুর কাছাকাছি।

কিন্তু—রি একটু ইতস্তত করে বলল, শীতলঘর থেকে আট জন মানুষকে ছিনতাই করে আনার জন্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার দরকার। শীতলঘরে অন্তত তিনটি প্রতিরক্ষা–ব্যূহ রয়েছে। সেখানে নিচু স্তরের একটা রবোট পাঠানো হলে অপ্রয়োজনীয় রক্তারক্তি হবে। মহামান্যা মিয়ারার সুনাম—

তোমার সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তোমাকে যেটা বলছি সেটা কর।

ঠিক আছে। কী ধরনের গাড়ি দেব? বাই ভার্বাল রয়েছে, নিচু দিয়ে উড়তে পারে। গতিবেগ খুব বেশি নয় কিন্তু প্রচুর ওজন নিতে পারে। আট জন মানুষকে আনতে—

আমার কোনো গাড়িরও প্রয়োজন নেই।

গাড়ির প্রয়োজন নেই? তাহলে মানুষগুলোকে আনবে কেমন করে?

তথ্যকেন্দ্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিশেষ আদেশে মানুষগুলো এখানে পৌঁছে যাবে। তোমাকে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো এ রকম। ঠিক যখন শীতলঘরে আট জন মানুষকে জাগিয়ে তোলা শুরু হবে সেই মুহূর্তে রবোটগুলোকে স্থানীয় সরবরাহ কেন্দ্র থেকে ভাইরাস লিটুমিনার সমস্ত প্রতিষেধক ছিনতাই করে আনতে হবে। দশ হাজার মানুষের প্রতিষেধক কয়েক গ্রামের বেশি নয়, তাই কোনো গাড়ির প্রয়োজন নেই। প্রতিষেধক ছিনতাই হবার সাথে সাথে মূল স্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা কেন্দ্রে একটা খবর পাঠাবে যে মহাকাশযানের কিছু মানুষের সাময়িক অবসন্নতা, টানেল ভিশান এবং দেহের অনিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা দেখা দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভাইরাস লিটুমিনা দিয়ে আক্রান্ত হবার লক্ষণ—

আমি কথা শেষ করার আগেই রি উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠার শব্দ করে বলল, চমৎকার! চমৎকার বুদ্ধি। যখনই নিরাপত্তা কেন্দ্র খবর পাবে মহাকাশযানে ভাইরাস লিটুমিনার সংক্রমণ হয়েছে তখন শীতলঘর থেকে জাগিয়ে তোলার সাথে সাথে সবাইকে এর প্রতিষেধক দিতে হবে। সেই প্রতিষেধক রয়েছে শুধু আমাদের। কাজেই সবাইকে এখানেই আনতে হবে। চমৎকার বুদ্ধি—

লেন ইতস্তত করে বলল, কিন্তু আসলে তো মহাকাশযানে ভাইরাস লিটুমিনার সংক্রমণ হয় নি।

কিন্তু সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। নিরাপত্তা কেন্দ্র কখনোই সে ঝুঁকি নেবে না। সেই ঝুঁকি নেয়ার নিয়ম নেই।

রবোটগুলো যদি প্রতিষেধক ছিনিয়ে আনতে না পারে?

আমি উত্তর দেবার আগেই রি বলল, সেটা কোনো সমস্যা হবে না। মূল সরবরাহ কেন্দ্রে যে সমস্ত জিনিস রয়েছে, মহাকাশযানের বর্তমান অবস্থায় তার কোনো গুরুত্ব নেই। জায়গাটা মোটামুটি অরক্ষিত।

চমৎকার! তাহলে তুমি কাজ শুরু করে দাও।

তোমার বুদ্ধি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি কিহা। নিনীষ স্কেলে আট—

আমি হাত তুলে বললাম, চাটুকারদের আমি পছন্দ করি না রি। আট জন মানুষ যখন এখানে পৌঁছাবে তুমি আমাদের খবর দিও।

দেব। অবশ্যই দেব।

আমি লেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি এখন কী করবে লেন? আমি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।

রি বলল, তুমি এখানে বসেই দেখতে পার, আমি মূল হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, না আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

লেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল আমিও যাই তোমার সাথে।

আমি আর লেন যখন হেঁটে যেতে শুরু করেছি তখন লক্ষ করলাম আমাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে ত্রিনি পিছু পিছু হাঁটছে। এই নির্বোধ রবোট সারাক্ষণ কোনো এক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আমার দিকে তাক করে রেখেছে, ব্যাপারটি চিন্তা করেই আমার কেমন জানি গা গুলিয়ে উঠতে থাকে। মিয়ারার আস্তানা থেকে আমাদের সরে যেতে হবে। যেভাবেই হোক।

AMARBOI.COM

আমরা যখন সপ্তম স্তর থেকে বাইরে মহাকাশের নিকষ কালো অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম ঠিক তখন কমিউনিকেশান মডিউলে আমি কথা শুনতে পেলাম। সেটি বলল, মহামান্য কিহা এবং মহামান্যা লেন। শীতলঘর থেকে আট জন মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে। মহামান্যা মিয়ারা এসে গেছেন, আপনারা এলেই মানুষগুলোর সাথে দেখা করতে যাবেন।

আমি বললাম, আমরা আসছি।

সপ্তম স্তর থেকে নেমে আসতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। মহাকাশযানটি একটি বিশাল সিলিন্ডারের মতো। কৃত্রিম মহাকর্ষ তৈরি করার জন্যে নিজের অক্ষে ঘুরছে, ভিতরের স্তরগুলোতে মহাকর্ষ বল কম, আমরা একটু আগেই সেটা অনুভব করেছি।

যোগাযোগ টানেলের সামনে মিয়ারা দাঁড়িয়েছিল। সত্যিকারের মিয়ারা, তার হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি নয়। আমাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল। আমি তাকে যে স্বল্প সময়ের জন্যে দেখেছি তার মাঝে তাকে একবারও হাসতে দেখি নি। মেয়েটি সত্যিকার অর্থে সুন্দরী নয় কিন্তু হাসিমুখে তাকে হঠাৎ বেশ আকর্ষণীয়া মনে হতে থাকে। মিয়ারা এগিয়ে এসে নরম গলায় বলল, কিহা, তুমি যেভাবে এই আট জন মানুষকে আমাদের কেন্দ্রে নিয়ে আসছ তার তুলনা হয় না। তোমাকে অভিনন্দন।

আমি কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকালাম। মিয়ারা ঝকঝকে চোখে বলল, মানুষগুলো কে জানার জন্যে আমার আর তর সইছে না। কী মনে হয় তোমার? সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিশেষ আদেশে এদের জাগানো হচ্ছে—নিশ্চয়ই এরা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে

থাকা বিবর্ণ চেহারার একজন মানুষ বলল, হয়তো এদের বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে দশ!

মিয়ারা শিস দেয়ার মতো একটি শব্দ করতেই খুট করে গোলাকার একটা দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে এক ধরনের ঠাণ্ডা বাতাস বের হয়ে আসে। প্রায় সাথে সাথেই সেখানে নির্বোধ চেহারার একটা রবোটের চেহারা উঁকি দেয়। রবোটটি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করার ভঙ্গি করে বলল, আট জন মানুষ এইমাত্র তাদের ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এসেছে।

মিয়ারার পিছু পিছু আমরা ঘরটিতে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে আটটি ধাতব রঙের সিলিন্ডার, সিলিন্ডারের উপরের ঢাকনা খোলা, ভেতর থেকে সরু সুতার মতো জলীয় বাষ্পের ধারা বের হয়ে আসছে। সিলিন্ডারগুলোর সামনে প্রায় জড়াজড়ি করে আটটি নগ্ন শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে তারা চোখ বড় বড় করে তাকাল, সম্ভবত এরা রবোটের সাহায্যেই বড় হয়েছে, কোনোদিন সত্যিকারের মানুষ দেখে নি। আমাদের দেখে তাদের চোখেমুখে এক ধরনের অবাক বিস্ময় ফুটে ওঠে, যে ধরনের বিস্ময় সম্ভবত শুধুমাত্র শিশুদের মুখেই দেখা যায়।

মিয়ারা কয়েক মুহূর্ত হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করে বলল, হায় ঈশ্বর! এ কী?

বাচ্চাগুলো জড়াজড়ি করে একটু পিছিয়ে গেল, তাদের চোখেমুখে এক ধরনের ভয়ের ছাপ পড়ে, সহজাত প্রবৃত্তি থেকে হঠাৎ করে তারা মনে হয় বুঝতে পেরেছে এখানে তাদের জন্যে কোনো ভালবাসা সঞ্চিত নেই।

AMARBOI.COM

৪

আমি একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে দেয়ালের বিশাল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছি। স্ক্রিনে ছোট একটা হলঘরের ছবি। হলঘরের এক কোনায় মিয়ারা বসে আছে, তার সামনে কুচকুচে কালো একটি টেবিল। টেবিলের চারপাশে আরো পাঁচ জন মানুষ—মানুষগুলোর দুজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং অন্য একটি নবম প্রজাতির ট্রিটন রবোট—যাকে মানুষের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পঞ্চম মানুষটি পুরুষ কি মহিলা বোঝার উপায় নেই। হলঘরে শুধু মিয়ারাই সত্যি সত্যি শারীরিকভাবে বসে আছে। অন্যেরা সরাসরি উপস্থিত নেই, যতদূর সম্ভব নেটওয়ার্কে এসেছে। এই পাঁচ জন মানুষ মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশের নেতৃত্ব দখল করেছে।

ট্রিটন রবোটটি নিচু গলায় বলল, আমার ধারণা আমরা এখানে সময় নষ্ট করছি। আমরা একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করি না— কাজেই এখানে বসে আলোচনা করা অর্থহীন। এখানে কেউ সত্যি কথা বলছে না।

মিয়ারা হাসির মতো শব্দ করে বলল, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কৌতুককর যে একটি ট্রিটন রবোট নৈতিকতার কথা বলছে।

রবোটটি মিয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, মিয়ারা, তুমি খুব ভালো করে জান আমি নৈতিকতার কথা বলছি না। এই মহাকাশযানে এক ধরনের সংঘাত হচ্ছে, আমরা সেখানে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি, সেখানে সম্মিলিত শক্তির কথা বলা অর্থহীন।

হলঘরের দ্বিতীয় মহিলাটি নরম গলায় বলল, কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। মূল তথ্যকেন্দ্র এখনো বিশাল শক্তি নিজের কাছে রেখেছে,

আমাদের প্রথমে সেটা বের করে আনতে হবে, শুধুমাত্র তাহলেই আমরা তার জন্যে হানাহানি শুরু করতে পারি।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের জঙ্গল—এ রকম মানুষটি তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, ভালোই বলেছ তুমি। সবাই মিলে আক্রমণ করে খানিকটা সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজেরা মারামারি শুরু করি—

মিয়ারা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, তোমরা জান মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে আমরা এখন বড় ধরনের বোঝাপড়া করতে পারি। মূল তথ্যকেন্দ্রের বিশেষ আদেশে যে আট জন মানুষকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে আমার কাছে সেই মানুষগুলো রয়েছে।

দেখে বোঝা যায় না পুরুষ না মহিলা সেরকম মানুষটি বলল, আমি জানি তুমি আমাকে সত্যি কথাটি বলবে না, তবু জিজ্ঞেস করছি, এই মানুষগুলোর কি বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

মিয়ারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি সেটা বলব না। তবে আমি উচ্চমূল্যে তাদের বিক্রি করতে রাজি আছি।

ঘরের সবাই নড়েচড়ে বসল এবং তাদের চোখেমুখে হঠাৎ আগ্রহ উত্তেজনা এবং কৌতূহল ফুটে ওঠে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের মানুষটি একটু সামনে ঝুঁকে এসে বলল, আমি কমপক্ষে দুজন মানুষ কিনতে চাই। তুমি কী মূল্য চাও মিয়ারা?

অষ্টম এবং নবম স্তরের এক–চতুর্থাংশ জায়গা।

মানুষটির চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, কী বলছ তুমি?

আমার পক্ষে এই ধূর্ত মানুষ এবং মানুষ–জাতীয় রবোটগুলোর কথাবার্তা শোনা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে ওঠে। নিচু গলায় মনিটরটিকে বললাম, আমি আর দেখতে চাই না।

সাথে সাথে স্ক্রিনটি অন্ধকার হয়ে আসে। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। আমার বুকের ভিতরে গভীর বিষণ্নতা এসে ভর করতে থাকে।

এ রকম সময় আমার মাথায় কে যেন স্পর্শ করে নিচু গলায় ডাকল, কিহা—

আমি চোখ খুলে ঘুরে তাকালাম। লেন বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে লেন?

তোমার সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন কিহা। খুব জরুরি।

বল।

তুমি তো জান মিয়ারা আমাকে খাদ্য সরবরাহের একটা সমস্যা সমাধান করতে দিয়েছে—

হ্যাঁ জানি।

আমি সেটা নিয়ে কাজ করছিলাম, কোন মানুষের জন্যে কতটুকু খাবার রয়েছে তার একটা তথ্যভাণ্ডার রয়েছে। আমি শিশুগুলোর ফাইল খুলে দেখেছি। মূল তথ্যকেন্দ্র থেকে তাদের জন্যে মাত্র চার দিনের খাবার রাখা হয়েছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ। এই শিশুগুলোকে শীতলঘর থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে হত্যা করার জন্যে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি জানি না।

মিয়ারা কি জানে?

আমি বলতে পারব না।

আমি ইতস্তত করে বললাম, আমার মনে হয় সে জানে।

কেন বলছ সে জানে?

আমি একটু আগে দেখছিলাম, সে মহাকাশযানের অন্য এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলছে। সে শিশুগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে। সে নিশ্চয়ই জানে আর চার দিন পর শিশুগুলোর কোনো মূল্য নেই।

লেন আমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে বলল, কিহা!

কী হয়েছে লেন?

আমি শিশুগুলোর সাথে সময় কাটিয়েছি, তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। এরা একেবারে সাধারণ শিশু—একেবারে সাধারণ। এদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা নেই, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, বিশেষ জিনেটিক কোড নেই। এদের রবোট ফার্মে বড় করা হয়েছে, এরা কথা জানে না—কেউ ওদের কথা শেখায় নি। এরা কখনো মানুষ দেখে নি, ওরা কখনো মানুষের ভালবাসা পায় নি, আমি ভেবেছিলাম তাই ওরা বুঝি ভালবাসা বোঝে না। কিন্তু—

কিন্তু কী?

বাচ্চাগুলো ভালবাসা বোঝে। আমি—আমি—লেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। তার চোখ দুটিতে হঠাৎ পানি জমে ওঠে। আমি অবাক হয়ে লেনের দিকে তাকিয়ে রইলাম, শেষবার কবে আমি সত্যিকার মানুষকে কাঁদতে দেখেছি মনে করতে পারলাম না।

লেন হঠাৎ এগিয়ে এসে আমাকে দুই হাতে ধরে বলল, কিহা—

আমি লেনের দিকে তাকালাম, হাসার চেষ্টা করে বললাম, লেন, এই ঘরে এই মুহূর্তে আমাদের দিকে অসংখ্য যান্ত্রিক চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অসংখ্য সংবেদনশীল কান আমাদের কথা শুনছে। তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই লেন। আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ।

তুমি জান?

হ্যাঁ, আমি জানি।

সামনের মনিটর থেকে হঠাৎ রি-এর কথা ভেসে এল, সে বলল, বিস্ময়কর। যখন আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাই যে আমি মানুষকে বুঝতে পারি, ঠিক তখন তোমরা এমন একটা কাজ কর যে আমি আবার বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

কেন রি কী হয়েছে?

লেন কথাটি বলার আগে তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে সে কী বলবে?

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, চেষ্টা কর, তুমিও পারবে।

সে কি শিশুগুলোর জীবন বাঁচানোর কথা বলছে? কিন্তু সেটা তো হতে পারে না, সেটা তো অসম্ভব। শুধু যে অসম্ভব তা নয়, এর সাথে আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত আছে। তাহলে কী হতে পারে—

আমি লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। হ্যাঁ, আমাকে একটা অসম্ভব কাজ করতে হবে। মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে আটটি অত্যন্ত সাধারণ শিশুর প্রাণ বাঁচাতে হবে। এর সাথে হয়তো আমাদের নিরাপত্তার এবং অস্তিত্বের

প্রশ্ন জড়িত আছে কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

লম্বা করিডোরের আবছা অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে আমি আবিষ্কার করলাম আমার বুকের ভিতরের গুমট বিষণ্নতাটি কেটে গেছে, সেখানে এসে ভর করেছে বিচিত্র এক ধরনের ক্রোধ।

আমি মিয়ারার আস্তানায় করিডোর ধরে হাঁটতে থাকি, আমার পিছু পিছু একটু দূরত্ব রেখে ত্রিনিও হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে আমি পুরো সমস্যাটি চিন্তা করে দেখি—স্বাভাবিক অবস্থায় মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রের বিশেষ আদেশ উপেক্ষা করে কিছু একটা করা অসম্ভব ব্যাপার—কিন্তু মহাকাশযানে এখন স্বাভাবিক অবস্থা নেই। সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শক্তি।

আমাদের সবার জন্যে এখন সবচেয়ে সহজে পালিয়ে যাবার একটি মাত্র উপায়—আমাদের শরীরে যে ট্রাকিওশানটি দিয়ে মহাকাশযানের মূল এবং আনুষঙ্গিক তথ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা হয় সেই ট্রাকিওশানটি বের করে সেখানে অন্য একটি ট্রাকিওশান ঢুকিয়ে দেয়া। সেই ট্রাকিওশানে থাকবে ভিন্ন একজনের পরিচয় যার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই পরিচয় নিয়ে আমরা শীতলঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে যাব। আগামী শতাব্দী পর্যন্ত কেউ আর আমাদের খুঁজে পাবে না। ব্যাপারটি অনেকটা আত্মহত্যা করার মতো, মহাকাশযানের বিশাল তথ্যকেন্দ্র থেকে নিজেকে অদৃশ্য করে দেয়া। ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে যদি এই মহাকাশযান পৃথিবীতে পৌঁছায়, সবকিছু আবার নূতন করে শুরু হয়তখন হয়তো সত্যিকারের পরিচয় নিয়ে জীবন শুরু করতে পারব। হয়তো পারব না—কিন্তু সেটা নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই।

আমি হাঁটতে হাঁটতে নিচে নেমে এলাম, আটটি শিশুর জন্যে এখানে আলাদা একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঘরটিতে উঁকি দিয়ে দেখি লেন ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে, তাকে ঘিরে আটটি শিশু বসে আছে। শিশুগুলোর মুখ আনন্দোজ্জ্বল এবং কিছু একটা নিয়ে সেখানে প্রচণ্ড হইচই হচ্ছে। আমাকে দেখে লেন হাসিমুখে বলল, কিহা, দেখ বাচ্চাগুলো কথা শিখে যাচ্ছে!

সত্যি?

হ্যাঁ। আমি এর মাঝে অনেক কিছু শিখিয়েছি। দেখবে?

দেখাও।

লেন তার হাত উঁচু করে বলল, এইটা কী?

বাচ্চাগুলো উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলল, হাত! হাত!

লেন নিজের চুল স্পর্শ করে বলল, এইটা কী?

চুল! চুল!

লেন নিজের নাক স্পর্শ করে বলল, এইটা কী?

নাক! নাক!

আমরা সবাই মিলে কোথায় যাব?

পৃ! পৃ!

পৃ? আমি একটু অবাক হয়ে লেনের দিকে তাকালাম। লেন হেসে ফেলে বলল, একটা শব্দ কঠিন হয়ে গেলে সেটাকে কেটেছেঁটে সহজ করে ফেলে! পৃথিবীকে করেছে পৃ। কী বুদ্ধি দেখেছ?

তাই তো দেখছি।

আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে—নিজেরা নিজেরা একটা ভাষা তৈরি করে ফেলেছে। কিচিরমিচির করে নিজেদের ভিতর কী বলে আমি কিছুই বুঝি না।

মজার ব্যাপার তো।

হ্যাঁ—ছোট বাচ্চার মাঝে এত মজার ব্যাপার লুকানো আছে তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। একটু আগে কী হয়েছে শোন—

লেন একটু আগে খাবার সময় বাচ্চাগুলো তাদের পানীয় নিয়ে কী দুষ্টুমি করেছে সেটা খুব উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করে। আমি নিজের বিস্ময়টুকু গোপন করে মুখে একাগ্রতার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলি। আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনোই বিশ্বাস করতে পারতাম না লেনের মতো একটি মেয়ে ছোট শিশুদের নিয়ে এ ধরনের উচ্ছ্বাস দেখাতে পারে।

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে হবে, যেভাবেই হোক।

চতুর্থ স্তরে নানা ধরনের স্কাউটশিপ রাখা আছে, আমি সেগুলো দেখে একটাকে বেছে রাখলাম। এটা তৈরি হয়েছিল মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে, বায়ুশূন্য মহাকাশে যেতে পারে বলে এটি বায়ু-নিরোধক, ছোটখাটো গোলাগুলি সহজে সহ্য করতে পারবে। নিয়ন্ত্রণটুকু পুরোপুরি যান্ত্রিক, আমাকে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি স্কাউটশিপের কোড নাম্বারটি নিয়ে তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করলাম। বিশেষ অনুমতি ছাড়া এটি ব্যবহার করার উপায় নেই। আমি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে কয়েক মিনিট ব্যবহার করার একটা সাময়িক অনুমতি জোগাড় করে রাখলাম। মিয়ারার আস্তানা থেকে কয়েক মিনিটের মাঝে কেউ বের হতে পারবে না, কাজেই এটা নিরাপত্তার জন্যে কোনোরকম হুমকি নয়।

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে পালানোর পরিকল্পনার পরের অংশটুকু জটিল, যার জন্যে আমাদের শরীর থেকে ট্রাকিওশানগুলো আলাদা করতে হবে। একজন মানুষের যাবতীয় তথ্য এই ট্রাকিওশানের মাঝে থাকে—এটি শরীর থেকে বের করা মাত্রই আমরা এই মহাকাশযানের অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালে পরিণত হব। কিন্তু সেটা নিয়ে এখন আর চিন্তা করার সময় নেই। ট্রাকিওশানগুলো বের করতে আমাদের কষ্ট হল, চামড়ার নিচে লুকানো থাকে, সেটা কেটে বের করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ছোট পাতলা একটা চাকতির মতো শক্তিশালী ট্রান্সমিটারগুলো আপাতত শরীরের উপরে লাগিয়ে রাখা হল, শেষ মুহূর্তে সেগুলো অন্য কোথাও লাগিয়ে দিয়ে মূল তথ্যকেন্দ্রকে বিভ্রান্ত করা হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি স্কাউটশিপের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, ত্রিনি সারাক্ষণই আমার সাথে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমার পিছু পিছু এসেছে। স্কাউটশিপের কাছাকাছি এসে আমি আমার ট্রাকিওশানটি চলমান একটি রবোটের দিকে ছুড়ে দিলাম—পুরো জিনিসটা করতে হল তথ্যকেন্দ্রের চোখকে আড়াল করে, সেটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ত্রিনি সাথে সাথে সেই রবোটটির পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে—যখন সে বুঝতে পারবে আমি পালিয়ে গেছি তার প্রতিক্রিয়া কী হবে জানার আমার একটু সূক্ষ্ম কৌতূহল হল!

স্কাউটশিপের দরজায় টোকা দিতেই সেটা ঘরঘর শব্দ করে খুলে গেল। আমি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে গেলাম, বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু ভিতরে বেশ প্রশস্ত। আমি কন্ট্রোল প্যানেলে হাত দিতেই সেটি মিষ্টি সুরে কথা বলে উঠল, মহামান্য কিহা, আপনি কয়েক মিনিটে এটা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন—আপনাকে কি আমি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?

অবশ্যই পার। এই স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু কী?

কন্ট্রোল প্যানেলের উপরের ভাগে ভারসাম্য রক্ষার মডিউলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার নিচে রয়েছে স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি।

চমৎকার—আমি পকেট থেকে ছোট একটা বিস্ফোরকের টিউব বের করে আনলাম। আমাকে নূতন ধরনের অস্ত্র আবিষ্কার করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বলে এ ধরনের জিনিস পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্যে সরবরাহ কেন্দ্র থেকে দিতে আপত্তি করে নি।

মহাকাশযানের কন্ট্রোল প্যানেল অবিশ্যি তীক্ষ্ণস্বরে বিপদসঙ্কেত বাজাতে বাজাতে আপত্তি জানাতে শুরু করে। কণ্ঠস্বরটি উঁচু গলায় বলল, স্কাউটশিপের মাঝে বিস্ফোরক অত্যন্ত বিপজ্জনক—

সেজন্যেই এনেছি।

তুমি কী করবে বিস্ফোরক দিয়ে?

ভারসাম্য রক্ষার মডিউল এবং স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি উড়িয়ে দেব।

অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কাজ করতে যাচ্ছ।

হ্যাঁ। আমার ভাসা ভাসা মনে আছে, যদি স্কাউটশিপে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ভেতরের আরোহীদের জীবন রক্ষার একটি শেষ চেষ্টা করা হয়। তখন স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ আরোহীদের হাতে দেয়া হয়। আমার স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণটুকু দরকার—

কিন্তু তার যথাযথ নিয়ম রয়েছে। তুমি যেটা করতে যাচ্ছ সেটা বিপজ্জনক এবং বেআইনি।

সম্ভবত। আমি কথা না বাড়িয়ে বিস্ফোরকের টিউবটি কন্ট্রোল প্যানেলে বসিয়ে একটু দূরে সরে গেলাম। তিন সেকেন্ডের মাঝে প্রচণ্ড শব্দে একটা বিস্ফোরণে কন্ট্রোল প্যানেলের বড় একটা অংশ উড়ে গেল এবং সাথে সাথে তীব্র স্বরে ভেতরে বিপদসঙ্কেত বাজতে থাকে, উজ্জ্বল লাল আলো জ্বলতে এবং নিভতে শুরু করে। আমি স্কাউটশিপের ভেতরে এবারে ভিন্ন একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, সেটি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, মহা বিপদসঙ্কেত। আরোহীদের নিরাপত্তার জন্যে বলছি, স্কাউটশিপের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি দ্বিতীয় ধাপের নিয়ন্ত্রণ—

আমি গলায় ভয় এবং আতঙ্ক ফুটিয়ে বললাম, বাইরের সাথে সমস্ত যোগাযোগ কেটে দাও।

দিচ্ছি।

আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দাও।

দিচ্ছি—

আমি কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে বসে বললাম, নিচু দিয়ে উড়ত শুরু কর। দ্বিতীয় স্তরে থামতে হবে।

কিন্তু—

কোনো কথা বলার সময় নেই, তাড়াতাড়ি—

সাথে সাথে স্কাউটশিপ গর্জন করে উড়তে শুরু করে।

দ্বিতীয় স্তরে লেন বাচ্চাগুলোকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আমি এক মুহূর্তের জন্যে দরজা খুলতেই সে সবাইকে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, মূল প্রবেশপথ দিয়ে বের হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি—

কিন্তু—

এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই। তোমাকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কাউটশিপের ভেতরে আর কোনো কথা শোনা গেল না। সেটা নিচু হয়ে ছুটতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে এর বেগ বেড়ে যেতে থাকে।

লেন নিচু গলায় বলল, আমরা এখন কোথায় যাব?

কাছাকাছি কোনো শীতলঘরে। আমি কিছু নকল ট্রাকিওশান তৈরি করে রেখেছি, এখান থেকে বের হয়ে শরীরে লাগিয়ে নিতে হবে।

লেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন স্কাউটশিপটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায় এবং ভেতরে আমরা সবাই হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। ছোট বাচ্চাগুলো ব্যাপারটা এক ধরনের খেলা মনে করে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করে।

আমি একটু শঙ্কিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে? থামছ কেন?

প্রতিরক্ষা কেন্দ্র তোমাদের পরিচয় জানতে চাইছে।

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমাকে আমি বলেছি আমাদের হাতে কোনো সময় নেই। তুমি বের হয়ে যাও।

প্রতিরক্ষা কেন্দ্র তাহলে আমাদের আক্রমণ করবে।

করলে করবে। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও।

এটি বেআইনি—

আমি তোমাকে এই বেআইনি কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছি।

স্কাউটশিপের বিধ্বস্ত কন্ট্রোল প্যানেলে কিছু আলোর ঝলকানি দেখা গেল, তারপর যেরকম হঠাৎ করে এটি থেমেছিল ঠিক সেরকম করে হঠাৎ এটি ছুটতে শুরু করল।

স্কাউটশিপটি যখন তার গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে মহাকাশযানের বিশাল করিডোর ধরে নির্দিষ্ট পথে ছুটতে শুরু করেছে তখন লেন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তোমার কী মনে হয় কিহা, আমরা কি পালিয়ে যেতে পারব?

নিশ্চয়ই পারব।

প্রতিরক্ষা ব্যূহ থেকে আমাদের পিছু নেবে না?

আমরা আমাদের ট্রাকিওশান ফেলে এসেছি, আমরা কে তারা এখনো জানে না। তারা জানার আগেই আমরা শীতলঘরে ঢুকে যাব।

আমরা কি পারব?

আমি উত্তর দেবার আগেই স্কাউটশিপের কন্ট্রোল প্যানেল থেকে উত্তর ভেসে এল, সেটি বলল, আমার ধারণা পারবেন না।

কেন?

এই মাত্র তিনটি বাই ভার্বাল স্কাউটশিপের কন্ট্রোল লক ইন করেছে। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরক দিয়ে এটিকে ধ্বংস করে দেবে।

আমি কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে একটি চেয়ারে বসে নিজেকে চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিতে নিতে বললাম, লক ইন করার মাইক্রো-সেকেন্ডের মাঝে আঘাত করা যায়। এখনো যখন করে নি—তার মানে তারা আঘাত করবে না।

কেন করবে না?

সম্ভবত তারা আমাদের পরিচয় জেনে গেছে।

লেন ফ্যাকাশে মুখে বলল, সর্বনাশ! আমরা তাহলে কী করব?

দেখি কী করা যায়। আমি দ্রুত চিন্তা করতে করতে বললাম, তুমি বাচ্চাগুলোকে

চেয়ারগুলোর মাঝে শক্ত করে বেঁধে দাও, আমার মনে হয় স্কাউটশিপটা নিয়ে কিছু লাফঝাঁপ দিতে হবে।

কী রকম লাফঝাঁপ?

বড় ধরনের। আমি একটা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ভেঙে মহাকাশে বের হয়ে যাবার কথা ভাবছি।

লেন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি দুর্বলভাবে হেসে বললাম, আমাদের স্কাউটশিপ মহাকাশে যেতে পারে। আমাদের পিছু নিয়েছে সাধারণ বাই ভার্বাল, সেগুলো মহাকাশে যেতে পারবে না।

কিন্তু আমরা কেমন করে মহাকাশে যাব?

আমি এখনো জানি না।

পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের জানালা সবসময় বন্ধ থাকে।

কিন্তু যদি প্রচণ্ড গতিতে সোজাসুজি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দিকে ছুটে যেতে শুরু করি সম্ভবত একটা জানালা খুলে যাবে। আমরা সেই জানালা দিয়ে বের হয়ে যাব।

কেন জানালা খুলবে?

মহাকাশযানকে রক্ষা করার জন্যে। একটা স্কাউটশিপ প্রচণ্ড গতিতে যেতে পারে, এর গতিশক্তি মেগাজুল পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশযান তার দেয়ালে মেগাজুল শক্তিতে আঘাত করতে দেবে না। সেটি মহাকাশযানের জন্য বিপজ্জনক।

লেন কোনো কথা না বলে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু তোমার ধারণা যদি ভুল হয়?

আমি লেনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে বললাম, স্কাউটশিপ, আমি চাই তুমি ধীরে ধীরে গতিবেগ বাড়িয়ে উপরে উঠে এস।

মহাকাশযানের ভেতরে আমার গতিবেগ বাড়ানোর উপায় নেই। স্কাউটশিপটি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, এটি বিপজ্জনক।

ঠিক আছে, তুমি নিয়ন্ত্রণটি আমার হাতে দিয়ে দাও।

তোমার হাতে? তুমি স্কাউটশিপ কখনো নিয়ন্ত্রণ করেছ?

আমি সেটা নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই না। আমি কোনো জটিল কাজ করতে যাচ্ছি না। সোজাসুজি মহাকাশযানের দেয়ালে আঘাত করতে যাচ্ছি—

স্কাউটশিপের মূল নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে বোতাম রয়েছে সেটা স্পর্শ করতেই নিয়ন্ত্রণটুকু আমার হাতে চলে এল। আমি শক্তিকেন্দ্রে চাপ দিয়ে স্কাউটশিপের গতিবেগ বাড়াতে শুরু করি, আমার দুই পাশে দিয়ে মহাকাশযানের করিডোর পিছনে ছুটে যেতে শুরু করল। আমি গতিবেগ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতেই যোগাযোগ মডিউলে আমাদের পিছনে লেগে থাকা বাই ভার্বালের আরোহীর গলার স্বর শুনতে পেলাম, চিৎকার করে কঠোর গলায় বলল, কিহা, আমি জানি তুমি স্কাউটশিপে আছ। এই মুহূর্তে নিচে নেমে আস, না হয় তোমাকে গুলি করব—

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে স্কাউটশিপের গতিবেগ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকি। কণ্ঠস্বরটি আবার কঠোর গলায় বলল, এই মুহূর্তে নিচে নেমে আস— এই মুহূর্তে—

আমি স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে মহাকাশযানের উপর দিয়ে ছুটে যেতে থাকি, উপরে স্বচ্ছ জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে, এর কোনো একটিতে আমার আঘাত করতে হবে, আমি সাহস সঞ্চয় করতে থাকি, একটি স্কাউটশিপ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে

সোজাসুজি মহাকাশযানের দেয়ালে আঘাত করার মতো সাহস সম্ভবত আমার নেই।

আমি মহাকাশযানের উপর দিয়ে ছুটে যেতে যেতে নিচে তাকালাম, অনেক নিচে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি-যানবাহন দেখা যাচ্ছে, আমাকে ঘিরে নানা ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকে। সম্ভবত অনেকেই আমাকে লক্ষ করছে। আমি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণটুকু ধরে রাখি। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, আমার নিশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে, আমি স্কাউটশিপটাকে সোজাসুজি উপরের দিকে ঘুরিয়ে আনতে শুরু করতেই হঠাৎ ভিতরে একটা নূতন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সেটি চাপা গলায় বলল, স্কাউটশিপের আরোহী, আমি একটি গোপন চ্যানেলে তোমার সাথে যোগাযোগ করছি, আমার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ শুনছে না। তুমি আমার কথার কোনো উত্তর দেবে না।

কণ্ঠস্বরটি এক মুহূর্ত থেমে থেকে বলল, মহাকাশযানের দেয়ালে আঘাত করে বের হয়ে যাবার পরিকল্পনাটির সাফল্যের সম্ভাবনা দশমিক দুই তিন। তুমি যদি চাও তোমাকে আমি অন্যভাবে রক্ষা করতে পারি। তার জন্যে স্কাউটশিপের পুরো নিয়ন্ত্রণ আমাকে দিতে হবে— আমার কোড নম্বর সাত চার তিন দুই।

আমি অবাক হয়ে বিচিত্র কণ্ঠস্বরটি শুনছিলাম; ব্যাপারটি একটি ষড়যন্ত্র কি না যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে কয়েকটি বাই ভার্বাল ধাওয়া করছে, তোমাকে গুলি করার সুযোগ পেয়েও গুলি করছে না, যার অর্থ এই স্কাউটশিপে তোমরা যারা আছ তারা সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের ট্রাকিওশান নেই, যার অর্থ তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ। মহাকাশযানের প্রচলিত পদ্ধতি থেকে যারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাদের জন্যে আমার সমবেদনা রয়েছে, সেই জন্যে আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাইছি। তুমি যদি আমার সাহায্য গ্রহণ করতে চাও, কোড নম্বর সাত চার তিন দুইয়ে স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণটুকু হস্তান্তর কর। আমাদের হাতে সময় খুব কম।

আমি লেনের দিকে তাকালাম, সে ফ্যাকাশে মুখে বসে আছে। তার দুই পাশে বাচ্চাগুলো বসে আছে, তাদের চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করছে। স্কাউটশিপের পুরো ব্যাপারটুকু তারা অত্যন্ত মজার কোনো খেলা হিসেবে ধরে নিয়েছে। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে কন্ট্রোল প্যানেলের একপাশে কোড নম্বরটি প্রবেশ করিয়ে স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণটুকু হস্তান্তর করে দিলাম।

সাথে সাথে স্কাউটশিপটা বিদ্যুৎবেগে তার দিক পরিবর্তন করে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করে। খানিকদূর গিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড গতিতে ঘুরে গিয়ে আবার সোজাসুজি উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। আমি উপরে তাকিয়ে হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম আমাদেরকে কোথাও নেয়া হচ্ছে।

মহাকাশযানটি একটি বিশাল চাকার মতো, এটি তৈরি করা হয়েছে মহাকাশে, দীর্ঘ সময় নিয়ে এর বিভিন্ন অংশ তৈরি করে এনে একটু একটু করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। চাকার মতো অংশটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে মহাকাশযানের শক্তিশালী ইঞ্জিন। ইঞ্জিনগুলো মহাকাশযানের সাথে ছয়টি রড দিয়ে লাগানো। রডগুলো ফাঁপা এবং এর ভেতর দিয়ে অনায়াসে কয়েকটা স্কাউটশিপ ঢুকে যেতে পারে। এই মুহূর্তে আমাদের স্কাউটশিপটা এ রকম একটি ফাঁপা টিউবের মাঝে দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মহাকাশযানের এই অঞ্চলটি মানুষ বাসের অনুপযোগী। এখানে বাতাস নেই, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই, মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। মহাকাশযানে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ বল তৈরি করার জন্যে এটি তার অক্ষের উপর ঘুরছে। সেন্ট্রিফিউগাল বল থেকে

তৈরি হয়েছে মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি। কেন্দ্রে সেই মাধ্যাকর্ষণ বলও নেই। এখানে এসে কেউ আশ্রয় নিতে পারে সেটি আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখতে পেলাম সত্যি সত্যি সেখানে আশ্রয় নেবার জন্যে আমরা স্কাউটশিপে ছুটে যাচ্ছি।

মহাকাশযানটি বিশাল এবং আমরা দীর্ঘ সময় এই অন্ধকার গহ্বর দিয়ে ছুটে যেতে থাকলাম। আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমরা জানি না—আমার কথা বলা নিষেধ বলে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছিলাম না। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইলাম এবং হঠাৎ মনিটরে একটা অনুজ্জ্বল আলো দেখা গেল। আলোটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে এবং আমি বুঝতে পারলাম সেটি একটি ডকিং স্টেশন। স্কাউটশিপটার গতিবেগ কমে আসে এবং ডকিং স্টেশনের নির্দিষ্ট জায়গায় সেটি নিজেকে শক্ত করে লাগিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না, ঠিক তখন আগের কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেলাম। সেটি বলল, তোমরা স্কাউটশিপটা থেকে বের হয়ে আসতে পার। এখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই, কাজেই তোমাদের ভেসে বের হয়ে আসতে হবে, ব্যাপারটিতে অভ্যস্ত হতে হয়তো একটু সময় নেবে।

আমি কথা বলতে পারব কি না বুঝতে পারছিলাম না, নিঃশব্দে চেয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই ভেসে উপরে উঠে এলাম, তাল সামলে কোনোমতে দরজার কাছাকাছি এসে হ্যান্ডেলটা ধরে রাখলাম। কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, তোমরা এখন নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছ, ইচ্ছে করলে কথা বলতে পার।

আমি দরজা খুলতে খুলতে বললাম, আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ। কেন বাঁচিয়েছ জানালে আরো স্বস্তি বোধ করতাম।

কণ্ঠস্বরটি হালকা গলায় বলল, বলতে পার অল্প খানিকটা সমবেদনা এবং অনেকখানি কৌতূহল! তোমাদের স্কাউটশিপে যারা আছে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারা সেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ? তুমি নাকি অন্য কেউ?

আমি হেসে বললাম, না আমি নই। তারা আসছে।

আমার কথা শেষ হবার আগেই শিশুগুলো উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে এবং আনন্দে গড়াগড়ি খেয়ে ভাসতে ভাসতে স্কাউটশিপের দরজা দিয়ে বের হয়ে আসতে থাকে। এক মুহূর্ত পর আমি আবার কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেলাম, সেটা শিস দেবার মতো শব্দ করে বলল, এরাই তাহলে সেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ?

আমি মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় অভ্যস্ত নই। শুধু মনে হতে থাকে যে কোথাও পড়ে যাচ্ছি, কোনোভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে বললাম, হ্যাঁ, এরাই সেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। কিন্তু তুমি কে?

আমি?

হ্যাঁ তুমি।

আমি সেরকম কেউ নই। একটু পরেই দেখবে। তোমরা ডকিং স্টেশন পার হয়ে ভিতরে চলে এস।

স্কাউটশিপ থেকে নেমে শিশুগুলো একেকজন একেকদিকে ভেসে চলে যেতে শুরু করে এবং তাদের সবাইকে আবার ধরে আনতে লেন এবং আমার বিশেষ বেগ পেতে হল। শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা কারণে আনন্দ পাওয়ার এবং সেই অকারণ আনন্দ অন্যদের মাঝে সঞ্চালিত করে দেয়ার একটা বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। দেখা গেল আমরাও শিশুগুলোর পিছনে ছুটতে ছুটতে হাসাহাসি করছি।

পাশের ঘরটি মাঝারি আকারের, মাধ্যাকর্ষণহীন যে-কোনো জায়গার মতো এখানেও অসংখ্য যন্ত্রপাতি এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরটিতে অনুজ্জ্বল একটা আলো জ্বলছে এবং ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পিলারে একজন মানুষ উল্টো করে বাঁধা। মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় উল্টো সোজা বলে কিছু নেই কিন্তু তবুও দৃশ্যটি দেখে আমরা চমকে উঠলাম। মানুষটি বৃদ্ধ, সত্যি কথা বলতে কী আমি এর আগে কোনো বৃদ্ধ মানুষ দেখি নি। নূতন প্রযুক্তিতে মানুষের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই মানুষটির চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ভয়াবহভাবে এসে স্থান নিয়েছে। তার মাথায় ধবধবে সাদা চুল, মুখে সাদা লম্বা দাড়িগোঁফ। তার মুখের চামড়া কুঞ্চিত, চোখ কোটরাগত। সেই কোটরাগত চোখ অঙ্গারের মতো জ্বলছে। মানুষটি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি লি। সবাই ডাকে বুড়ো লি। আমি বুড়ো লিয়ের আস্তানায় তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি দুঃখিত তোমাদের কাছে আসতে পারছি না। বয়স হয়ে গিয়েছে, শরীরে জোর নেই, নিজেকে তাই পিলারের সাথে বেঁধে রেখেছি আজ প্রায় তিরিশ বছর।

লেন আর্ত শব্দ করে বলল, তিরিশ বছর?

হ্যাঁ। মহাকাশযানে যখন হানাহানি শুরু হল, তোমরা তখন নিশ্চয়ই শীতলঘরে ঘুমিয়ে, আমাকে কিছু খুনোখুনির দায়িত্ব দিয়েছিল। করতে রাজি হই নি বলে খুব যন্ত্রণা গিয়েছে। পালিয়ে শেষ পর্যন্ত—বুড়ো লি হঠাৎ কথা থামিয়ে বলল, তোমাদের কেমন জানি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। তোমরা বিশ্রাম নিয়ে এস। দেখতেই পাচ্ছ এটা নিয়মিত মানুষের আস্তানা নয়, তোমাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হবে। তবে জায়গাটা নিরাপদ। একেবারে শক্তিকেন্দ্রে আস্তানা করেছি তো, কারো ধারেকাছে আসার ক্ষমতা নেই। আমার এখানে মানুষজন নেই, কাজ চালানোর মতো কিছু রবোট তৈরি করেছি, তারাই সাহায্য করে।

বুড়ো লি মুখ ঘুরিয়ে ডাকল, কিশি—

ঘরের মাঝে ইতস্তত যেসব যন্ত্রপাতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের মাঝে বড় ধরনের একটি যন্ত্র হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে দুপাশে দুটি যান্ত্রিক হাত এবং একটি বিদ্‌ঘুটে মাথা গজিয়ে ওঠে। পিছনে ছোট একটা জেট ইঞ্জিন চালু হয়ে যায় এবং সেটি ভাসতে ভাসতে বুড়ো লিয়ের দিকে এগিয়ে আসে।

বুড়ো লি রবোটটির দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে অতিথি এসেছে। তুমি তাদের নিয়ে যাও। বিশ্রাম এবং খাবারের ব্যবস্থা কর।

রবোটটি কোনো কথা না বলে এগিয়ে যেতে থাকে। আমি এবং লেন কোনোভাবে শিশুগুলোকে ধরে বেঁধে তার পিছু পিছু যেতে থাকি। আসলে বুঝতে পারি নি, আমি সত্যিই অসম্ভব ক্লান্ত।

৫

আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলাম আমি ছোট ঘরটার মাঝামাঝি ভেসে আছি। আমাকে ঘিরে ইতস্ততভাবে আট জন শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিচে মেঝের কাছাকাছি একটা গ্রিলকে ধরে লেন আধশোয়া হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি নিচু গলায় বললাম, লেন, তুমি ঘুমাও নি?

ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল। মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় ভেসে ভেসে ঘুমিয়ে আমার অভ্যাস নেই। তাছাড়া মনে হয় রিটালিন-৪০০ এখনো শরীরে রয়ে গেছে।

আমি ঘরের মাঝে থেকে ভেসে ভেসে নিচে আসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, আমিও ঘুমাতে পারছি না। কিন্তু বাচ্চাগুলো দেখেছ কী আরামে ঘুমিয়ে গেছে।

লেনের বিষণ্ন মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে খানিকক্ষণ ঘুমন্ত বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাসতে ভাসতে বাচ্চাগুলো যখন একজন আরেকজনের কাছে চলে আসে তখন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। আবার ঘুমের মাঝেই একজন আরেকজনকে ছেড়ে দেয়, দুজন দুদিকে ভেসে চলে যায়। লেন ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, এই সৃষ্টিজগতে শিশু থেকে সুন্দর কিছু নেই।

তুমি মনে হয় ঠিকই বলেছ। আমি কিন্তু আগে কখনো কোনো শিশুকে ভালো করে লক্ষ করি নি।

আমিও করি নি। একটা তথ্যকেন্দ্রে একবার দেখেছিলাম প্রাচীনকালে নাকি শিশুদের জন্ম হত মেয়েদের গর্ভে, সন্তান জন্ম দিতে হত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে, তারপর মেয়েটিকে সেই শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে বুকে ধরে বড় করতে হত।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমিও শুনেছি কথাটা—জন্মের পুরো ব্যাপারটা ছিল অবৈজ্ঞানিক। অনিশ্চয়তা আর বিপদ দিয়ে ভরা—

লেন আমাকে বাধা দিয়ে বলল, গত কয়েকদিন এই বাচ্চাগুলোকে দেখে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা হয়তো খারাপ ছিল না। বাচ্চাগুলো আমার কাছাকাছি রয়েছে তাতেই তাদের জন্যে আমার বুকে কী ভয়ানক ভালবাসা জন্মে গেছে। একটি মেয়ে যখন বাচ্চাটিকে দীর্ঘ সময় নিজের গর্ভে ধরে রাখবে তখন তার জন্যে কী রকম ভালবাসা হবে তুমি চিন্তা করতে পার?

আমি ব্যাপারটা চিন্তা করে একটু শিউরে উঠে বললাম, আমার নূতন পদ্ধতিটাই পছন্দ—যেখানে শিশুর জন্ম হয় ল্যাবরেটরিতে, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে। নিখুঁত সুস্থ সবল বুদ্ধিমান একটা শিশু পাওয়া যায়।

লেন একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, যাই হোক, এসব নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। এখন নিজেদের কথা বলি, আমাদের এখন কী হবে?

আমি মুখে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, মনে আছে তুমি মানুষের নেতৃত্ব নিয়ে মারামারি ব্যাপারটি দেখতে চাইছিলে! এখনো কি দেখতে চাও?

লেন মাথা নাড়ল, বলল, না। চাই না। যথেষ্ট দেখেছি। কিন্তু এখন কী হবে আমাদের? আমরা কী করব?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, বুড়ো লিয়ের এই আস্তানাটা নিরাপদ। আমাদের আপাতত এখানেই থাকতে হবে।

লেন চারদিকে তাকিয়ে বলল, এই ছোট জায়গায়? মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় ভেসে ভেসে? কয়েকদিনের মাঝেই শরীরে মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যাবে, তখন আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারব না—

মাংসপেশি ঠিক রাখার নিয়মকানুন আছে। তাছাড়া চেষ্টা করে দেখা যাবে একটা শীতল ক্যাপসুল আনা যায় কি না, তাহলে এখানেই একটা ছোট শীতলঘর তৈরি করে ঘুমিয়ে পড়া যায়। পৃথিবীতে পৌঁছে ঘুম থেকে ওঠা যাবে।

সেটা কি করতে পারবে?

বুড়ো লি খুব কাজের মানুষ, দেখলে না আমাদের কী চমৎকারভাবে উদ্ধার করে নিয়ে এল, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লেন আমার হাত স্পর্শ করে বলল, আমি আর পারছি না কিহা।

আমার বুকের ভিতরে হঠাৎ লেনের জন্যে এক ধরনের বিচিত্র অনুভূতির জন্ম হয়, তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু নরম কোমল ভালবাসার কথা বলতে ইচ্ছে করে, আমি অবশ্যি কিছুই করলাম না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, তোমাকে আরো শক্ত হতে হবে লেন। আরো অনেক শক্ত হতে হবে।

আমি যখন বুড়ো লিয়ের ঘরে গেলাম তখনো সে ঘরের মাঝামাঝি একটা পিলারে বাঁধা অবস্থায় ঝিমোচ্ছিল। তাকে ঘিরে নানারকম যন্ত্রপাতি জঞ্জাল ভেসে বেড়াচ্ছে। এক কোনায় একটি ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক স্ক্রিন, সেখানে মহাকাশযানের কিছু খবরাখবর প্রচারিত হচ্ছে। বুড়ো লি সেগুলো দেখছে কি না ঠিক বোঝা গেল না। আমি কাছাকাছি পৌঁছাতেই সে চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, কিছু একটা হবে এখন!

আমি থতমত খেয়ে বললাম, কিসের কী হবে?

জানি না। কিন্তু কিছু একটা হবে। আমি ত্রিশ বছর থেকে শুধু দেখছি—কখন কী হয় সেটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে এখন কিছু একটা হবে।

আমি কিছু বললাম না, কাছাকাছি ধরে রাখার কিছু নেই, একটু পরে পরে ওলটপালট খেয়ে যাচ্ছিলাম, এ রকম অবস্থায় কারো সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় না।

বুড়ো লি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিছু খেয়েছ?

আমি মাথা নাড়লাম, না, শীতলঘর থেকে বের হয়েছি, তাই কয়েকদিন না খেয়েই চলে যাবে।

আমার কাছে সত্যিকারের খাবার নেই। আঙুরের রস দিয়ে তিতির পাখির ঝলসানো রোস্ট আর যবের রুটি যদি চাও তাহলে পাবে না। তবে আমার কাছে কিছু খাবারের ক্যাপসুল আছে, একটা দিয়ে সপ্তাহ দুয়েক চলে যায়। বাথরুমে যেতে হয় না—যা সুবিধে! বুড়ো লি হঠাৎ খিকখিক করে হাসতে থাকে।

আমি কিছু বললাম না। সে পকেট থেকে কয়েকটা খাবারের ক্যাপসুল বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নাও সাথে রাখ।

আমি ক্যাপসুলগুলো পকেটে রাখতে রাখতে বললাম, তোমার এই এলাকাটা কি নিরাপদ?

এই মহাকাশযানে কোনো এলাকা আর নিরাপদ নয়। তবে তুমি যদি জানতে চাইছ কেউ তোমাদের ধরে নিতে আসবে কি না তাহলে ভয় পাবার কিছু নেই। বুড়ো লিকে কেউ ঘাঁটায় না।

কেন? তুমি শক্তিকেন্দ্রের কাছে বলে?

ঠিকই ধরেছ। শক্তিকেন্দ্রের চারদিকে ঘিরে বিস্ফোরক লাগানো আছে। আমি শুধু মুখে উচ্চারণ করব, সাথে সাথে পুরো শক্তিকেন্দ্র উড়ে যাবে। মহাকাশযান হয়ে যাবে মহাকাশ কবরখানা—হা হা হা হা! বুড়ো লি খুব একটা মজার কথা বলেছে এ রকম ভাব করে হাসতে লাগল।

তুমি কেমন করে এই জায়গাটা দখল করলে?

বুড়ো লি তার মাথায় টোকা দিয়ে বলল, মাথা খাটিয়ে। যখন দেখতে পেলাম মহাকাশযানে ভাগবাঁটোয়ারা শুরু হয়ে গেছে তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কয়দিনের মাঝেই কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যাবে, এই বেলা নিরাপদ একটা জায়গায় আরাম করে আস্তানা না গেড়ে নিলে আর হবে না।

সবচেয়ে ভালো জায়গাতেই আস্তানা করেছ!

বুড়ো লি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, না, সবচেয়ে ভালো জায়গাটা আমি পাই নি।

কে পেয়েছে?

কেউ পায় নি। মনে হয় কেউ পাবে না।

সেটা কোন জায়গা?

বুড়ো লি আমার দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হাসতে শুরু করে, হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আমি শুনেছিলাম তুমি নাকি নিনীষ স্কেলে আট মাত্রার বুদ্ধিমান! সেটা কোন জায়গা এখনো জান না?

না।

ঠিক আছে তাহলে নিজেই ভেবে ভেবে বের কর।

আমি খানিকক্ষণ বুড়ো লিয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, মূল তথ্যকেন্দ্র?

বুড়ো লি তার ভুরু নাচিয়ে বলল, আমি বলব না।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, দেখতেই পাচ্ছ নিনীষ স্কেলে বড় ত্রুটি আছে, আট মাত্রার মানুষের যেটুকু বুদ্ধিমান হবার কথা আমি সেটুকু বুদ্ধিমান নই। তাছাড়া আমি মাত্র অল্প কিছুদিন হল শীতলঘর থেকে বের হয়েছি, সবকিছু এখনো ভালো করে জানিও না।

জানবে, এই মহাকাশযানে সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিস হচ্ছে তথ্য। আর যদি এক ধাক্কায় পুরো তথ্য জেনে নিতে চাও তাহলে মুক্ত এলাকা থেকে ঘুরে এস।

মুক্ত এলাকা? আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, সেটা কী?

তুমি এখনো মুক্ত এলাকার নাম শোন নি?

না—আমি এসেছি মাত্র অল্প কিছুদিন হল, কেউ আমাকে বলে নি।

ইচ্ছে করেই বলে নি, তুমি যদি দল ছেড়ে মুক্ত এলাকায় চলে যাও সেজন্যে।

মুক্ত এলাকায় কী রয়েছে?

মহাকাশযান নিয়ে যখন কামড়াকামড়ি শুরু হয়েছে, ভাগবাঁটোয়ারা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, তখন সবাই মিলে একটা জায়গা ঠিক করেছে যার নাম দেয়া হয়েছে মুক্ত এলাকা। ঠিক করা হয়েছে এই এলাকাটা স্বাধীন। কেউ সেটা নিতে পারবে না।

কিন্তু যার জোর বেশি সে দখল করে নিচ্ছে না কেন?

নিজেদের স্বার্থেই নিচ্ছে না। জায়গাটা থাকায় সবার জন্যে লাভ। শুনেছি রমরমা বাজার। সবকিছু পাওয়া যায়! সুন্দরী মেয়েমানুষ, সুদর্শন পুরুষমানুষ থেকে শুরু করে পারমাণবিক অস্ত্র, আধুনিক বাই ভার্বাল—কী নেই!

এসব কিনতে পাওয়া যায়?

হ্যাঁ।

কী দিয়ে বেচাকেনা হয়?

প্রথম প্রথম নাকি শুধু জিনিসপত্র বিনিময় হত। এক মাত্রার বিস্ফোরক দিয়ে একটা বাই ভার্বাল নিয়ে গেলে, একটা সুন্দরী মেয়েমানুষ দিয়ে ভালো একটা অস্ত্র। দুইটা চতুর্থ

জেনারেশন রবোট দিয়ে একটা পঞ্চম জেনারেশনের রবোট—এইরকম। কিছুদিন হল একটা ব্যাংক খুলেছে, এখন ইলেকট্রনিক কারেন্সি ব্যবহার হচ্ছে। ব্যাংকে মূল্যবান কিছু জমা দিলে তুমি কারেন্সি পেয়ে যাবে। সেই কারেন্সি দিয়ে অন্য কিছু কিনবে। এখানে সেটাকে ইউনিট বলে।

আমি হতবাক হয়ে বুড়ো লিয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থে এ ধরনের কথাবার্তা লেখা আছে, যেখানে মানুষের লোভকে ব্যবহার করে এ রকম সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠত। তাই বলে এই মহাকাশযানে?

বুড়ো লি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ঘুরে আস, জায়গাটা তোমার ভালো লাগবে।

ভালো লাগবে?

হ্যাঁ। বিচিত্র জিনিস মানুষের ভালো লাগে।

আমি ছোট ভাসমান গাড়িটি নিচে নামিয়ে আনলাম, কোথায় যেতে হবে কীভাবে যেতে হবে প্রোগ্রাম করা ছিল, আমার নিজে থেকে কিছু করতে হয় নি। গাড়িটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আমি দরজা খুলে বাইরে আসতেই হঠাৎ উদ্দাম এক ধরনের সঙ্গীতের শব্দ শুনতে পেলাম। কাছাকাছি কোথাও এক ধরনের আনন্দোৎসব হচ্ছে বলে মনে হয়।

আরো কিছুদূর হেঁটে যেতেই আমি অসংখ্য মানুষকে দেখতে পেলাম, বিশাল এলাকায় ছোট বড় নানা আকারের ঘর, ভেতরে বাইরে উজ্জ্বল আলো, তার মাঝে তারা ব্যস্তসমস্তভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি সদ্য মিয়ারার আস্তানা থেকে পালিয়ে এসেছি, ভেতরে ভেতরে এক ধরনের ভয় রয়েছে কেউ বুঝি দেখে আমাকে চিনে ফেলবে, কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। মানুষের ভিড়ে আমি মিশে গেলাম—কেউ দ্বিতীয়বার আমার দিকে ঘুরে তাকাল না।

মহাকাশযানের এই মুক্তাঞ্চলে নানা ধরনের দোকানপাট গড়ে উঠেছে। তার একটা বড় অংশ অস্ত্রের দোকান। বিশাল অতিকায় এবং বিচিত্র ধরনের অস্ত্র, বিভিন্ন মানুষজন শক্ত মুখে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। দেখে মনে হল মহাকাশযানে অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। সব অস্ত্রই যে ভয়ঙ্কর তা নয়, কিছু অস্ত্র প্রায় হাস্যকর। একটি অস্ত্র দাবি করেছে ক্রোধকে ব্যবহার করে সেটি দিয়ে গুলি করা যায়। কপালের মাঝে লাগানো একটি নল, মাথায় এক ধরনের হেলমেট, ক্রোধের অনুভূতিকে অনুভব করে সেটা নলটি থেকে একটা বিস্ফোরক ছুড়ে দেয়!

অস্ত্রের দোকানপাটের কাছেই রয়েছে গাড়ি, ভাসমান যান এবং বাই ভার্বালের দোকানপাট। আমি একটু অবাক হয়ে দেখলাম যানবাহনের ব্যাপারটাতে একটা নূতন মাত্রা যোগ হয়েছে, সেগুলো এখন শুধু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হয় নি—তার মাঝে নানা ধরনের অস্ত্র জুড়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেগুলোতে এখন অহেতুক সৌন্দর্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উজ্জ্বল রং, অপ্রয়োজনীয় নকশা এবং নানা ধরনের বিলাসসামগ্রী এগুলোতে গাদাগাদি করে রাখা আছে। এই মহাকাশযানটিতে যে একটি বিচিত্র ধরনের কালচার গড়ে উঠছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যানবাহনের দোকানে মানুষের ভিড় খুব বেশি নয়—এগুলো মূল্যবান এবং মনে হয় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

এর পাশেই সুন্দরী পুরুষ এবং রমণী বেচাকেনার জায়গা। স্বল্প কাপড় পরে তারা মোহনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের ঘিরে মানুষের ভিড়। আমি ভিড় ঠেলে একটু

এগিয়ে গেলাম, একজন কমবয়সী সুন্দরী মেয়েকে কেনার জন্যে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ দরদাম করছে, যে কারণেই হোক মূল্য নিয়ে তর্কবিতর্ক হচ্ছে। শুনতে পেলাম মধ্যবয়স্ক মানুষটি গলায় বিস্ময় ঢেলে বলল, কী বললে? দশ হাজার ইউনিট? এন্ড্রোমিডার কসম! এই দামে আমি একটা এটমিক ব্লাস্টার পেয়ে যাব!

মেয়েটির মালিক মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, তাহলে এটমিক ব্লাস্টারই কিনছ না কেন? নিওন বাতি জ্বালিয়ে সেটা কোলে নিয়ে বসে থেকো, সেটার সাথে মিষ্টি মিষ্টি ভালবাসার কথা বোলো—

তার কথার ভঙ্গিতে উপস্থিত মানুষেরা হো হো করে হেসে দিল, মধ্যবয়স্ক মানুষটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আর আমি এত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যদি দেখি এটা রবোট?

রবোট? মেয়েটার মালিক চোখ কপালে তুলে বলল, এই সুন্দরী মেয়েকে তোমার রবোট মনে হচ্ছে? চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ কী দুঃখী চোখ, দেখ চোখের পানি একেবারে খাঁটি অশ্রু—ভালো করে দেখ!

মধ্যবয়স্ক মানুষটি মেয়েটির চোখের পানি সত্যিকারের অশ্রু কি না দেখার জন্যে এগিয়ে গেল এবং আমার হঠাৎ করে কেন জানি ব্যাপারটিকে একটি অসহনীয় ধরনের অমানবিক ব্যাপার বলে মনে হতে থাকে। আমি ভিড় ঠেলে বের হয়ে এলাম। আমার কাছে যদি দশ হাজার ইউনিট থাকত আমি তাহলে মেয়েটিকে কিনে মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু আমার কাছে একটি কপর্দকও নেই, বুড়ো লি বলেছে আমার কোনো অর্থের প্রয়োজনও নেই।

আমি ভিড় ঠেলে বের হয়ে হাঁটতে থাকি, কাছাকাছি অনেকগুলো খাবার জায়গা। সুন্দর টেবিল ঘিরে পুরুষ এবং রমণীরা সুদৃশ্য খাবার খাচ্ছে, বাতাসে খাবার এবং পানীয়ের ঝাঁজালো গন্ধ। আমি হঠাৎ করে এক ধরনের তীব্র খিদে অনুভব করতে থাকি। শীতলঘরে ঢোকার আগে আমি শেষবার সত্যিকার অর্থে খেয়েছিলাম। শরীরে নানা ধরনের জৈবিক পদার্থ থাকায় আমি খিদেয় কাতর হচ্ছি না, শরীর দুর্বলও হয়ে পড়ছে না, কিন্তু খাবারের লোভটি আমাকে তাড়না করতে থাকে। আমি সরে এলাম। কাছেই আলোকোজ্জ্বল একটি ঘরের সামনে অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল। সেখানে কিছু পুরুষ এবং মহিলা খুব মনোযোগ দিয়ে একটি মনিটরে কী যেন লিখছে। আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং ঠিক তখন একটা রবোট এগিয়ে এসে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি কি বুদ্ধিমান? যদি সত্যি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় অংশ নিন। যদি পঞ্চম স্তরে পৌঁছাতে পারেন আপনার পুরস্কার পাঁচ হাজার ইউনিট। ষষ্ঠ স্তরে দশ হাজার ইউনিট। আর যদি সপ্তম স্তরে পৌঁছাতে পারেন—রবোটটি তার গলায় এক ধরনের হাস্যকর উত্তেজনা ফুটিয়ে বলল, পঞ্চাশ হাজার ইউনিট! এক নয়, দুই নয়, দশ কিংবা বিশ নয়—পঞ্চাশ হাজার ইউনিট!

আমার কাছাকাছি যারা ছিল তাদের অনেকেই নিজেদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেল। আমার বুড়ো লিয়ের কথা মনে পড়ল, সে আমাকে বলেছিল আমার কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই। আমার যা প্রয়োজন নিজে থেকেই আমার কাছে চলে আসবে। সে হয়তো এর কথাটিই বলেছিল। আমার একটু লজ্জা লাগছিল তবুও সামনে এগিয়ে গেলাম।

মনিটরে নিজের কমিউনিকেশান্স মডিউলটি জুড়ে দেবার সাথে সাথেই সেখানে কিছু প্রশ্ন ভেসে আসে। সাধারণ যুক্তিতর্কের এবং সহজ গাণিতিক সমস্যা। প্রথম তিন-চারটি স্তর খুব সহজেই সমাধান হয়ে গেল। পঞ্চম স্তরটি বেশ কঠিন। সমাধান বের করতে আমার বেশ সময় লেগে যায়। ষষ্ঠ স্তরে গিয়ে প্রথমবার আমার সন্দেহ হতে থাকে যে আমি হয়তো সমাধানটি বের করতে পারব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাধানটি বের হয়ে গেল। সপ্তম স্তরের

সমস্যাটি মনিটরে এল খুব ধীরে ধীরে এবং আমি সেটিকে নিয়ে মগ্ন হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে মনে হল আমাকে কেউ একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে এবং আমি চোখ তুলে তাকাতেই সোনালি চুলের একটি মেয়ে হঠাৎ করে চোখ সরিয়ে নিল। আমি আবার সমস্যাটির দিকে তাকালাম এবং ঠিক তখন আমার পিছনে দাঁড়ানো একজন মানুষ নিচু গলায় বলল, এন্ড্রোমিডার দোহাই! তুমি সপ্তম স্তরে চলে এসেছ!

আমি কোনো কথা না বলে লোকটার দিকে তাকালাম। লোকটার চোখেমুখে বিস্ময়! সে অবাক হয়ে বলল, নিনীষ স্কেলে তোমার বুদ্ধিমত্তা কত? ছয়ের কম নয়, তাই না?

আমি মনিটরের দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম আমি মহাকাশযানের লোভী মানুষদের একটা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। এই মহাকাশযানের এখন সুন্দরী মেয়েমানুষ বা সুদর্শন পুরুষ থেকেও মূল্যবান সামগ্রী হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষ। এই পরীক্ষাকেন্দ্রটি আসলে সেরকম বুদ্ধিমান মানুষদের খুঁজে বের করার একটা ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি মনিটরটি টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম, পিছনে দাঁড়ানো মানুষটি বলল, কী হল সমাধান করবে না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না!

কেন?

মনে হয় কঠিন।

চেষ্টা করে দেখ, চেষ্টা না করলে তুমি কেমন করে জানবে? পঞ্চাশ হাজার ইউনিট পেয়ে যেতে পার!

আমি কমিউনিকেশান্স মডিউলে আমার পুরস্কারের দশ হাজার ইউনিট জমা করতে করতে বললাম, এত ইউনিট দিয়ে আমি কী করব?

লোকটা অবাক হয়ে বলল, কী বলছ তুমি! ইউনিট কত কাজে আসে। তুমি আর আমি মিলে একটা এজেন্সি খুলতে পারি। মহাকাশযানের কঠিন সব সমস্যার সমাধান করে দেব। তুমি দেখবে বুদ্ধি খাটানোর অংশ, আমি দেখব অর্থনৈতিক দিক। রাজি আছ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না রাজি নই—তারপর লোকটাকে কোনো কথা না বলতে দিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। খাবারের জায়গার পাশেই মানুষ বেচাকেনার দোকান। আমি এখন ইচ্ছে করলে কমবয়সী সেই দুঃখী মেয়েটাকে কিনে ফেলতে পারি। তাকে বলতে পারি তুমি এখন স্বাধীন, তোমার যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যাও। কোনো মধ্যবয়স্ক মানুষ চোখে লালসা নিয়ে আর তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না।

কালো চুলের সুন্দরী মেয়েটাকে ঘিরে যেখানে মানুষের ভিড় ছিল জায়গাটা এখন ফাঁকা। মোটামতো একজন মানুষ দেয়ালে হেলান দিয়ে চৌকোণ একটা পাত্র থেকে এক ধরনের পানীয় খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে একটা মেয়ে বিক্রি হচ্ছিল, কালো চুলের, দুঃখী মতোন চেহারা—

সোমারিয়া! বিক্রি হয়ে গেছে।

বিক্রি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। ভালো দাম পেয়েছে, নয় হাজার ইউনিট। খাঁটি মেয়েমানুষ ছিল, কোনো ভেজাল নেই।

আমি শুকনো গলায় আবার বললাম, বিক্রি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। তোমার দরকার কোনো মেয়েমানুষ? আমার হাতে আছে একটা। আশি ভাগ খাঁটি। যকৃত আর কিডনিগুলো কৃত্রিম—এ ছাড়া সব খাঁটি। রুপালি চুল নীল চোখ। ধবধবে

সাদা চামড়া—

আমি হেঁটে বের হয়ে এলাম, হঠাৎ কেন জানি আমার ভিতরে এক ধরনের বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আমি পুরো এলাকাটি ঘুরে বেড়াতে থাকি। বিচিত্র সব দোকানপাট, বিচিত্র ধরনের মানুষ, তারা তাদের থেকেও বিচিত্র সব কাজকর্ম করছে। ভালবাসা ঘৃণা লোভকে পুঁজি করে এখানে তাদের ব্যবসা চলছে। আমি খাবারের এলাকাটা হেঁটে এলাম, এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। অস্ত্রশস্ত্রের দোকান রয়েছে। মানুষ যে কী পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে এখানে এলে সেটা বোঝা যায়। ঘুরতে ঘুরতে আমিও একটা জিনিস কিনলাম পাঁচ শ ইউনিট দিয়ে। জিনিসটা বিক্রি করছিল একজন বুড়ো মতোন মানুষ। সে সেটার নাম দিয়েছে মন-মেশিন। সেটা দিয়ে নাকি একজন মানুষ তার মানসিক শক্তি দিয়ে অন্য মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেমন করে কাজ করে?

বুড়ো মতোন মানুষটি বলল, বলা যাবে না।

কেন?

ব্যবসার কারণে।

আমি হতচকিতের মতো মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কী দ্রুত এই মহাকাশযানের সব মানুষকে লোভ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি মন-মেশিনটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কাজ করে তার কী প্রমাণ আছে?

তুমি হেলমেটটা মাথায় পর আমি দেখাচ্ছি, প্রমাণ করে দিচ্ছি।

আমি হেলমেটটা মাথায় পরতে গিয়ে থেমে গেলাম, হেলমেটে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্কেত ধরার ছোট ছোট মডিউল দেখা যাচ্ছে এবং সেটা কীভাবে কাজ করে হঠাৎ করে আমি বুঝে গেলাম। আমি হাসি গোপন করে বললাম, এটার নাম মন-মেশিন দেয়া ঠিক হয় নি।

বুড়ো মানুষটি ভুরু কুঁচকে বলল, কেন এ কথা বলছ?

আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ থেকে এক ধরনের সঙ্কেত বের করে ট্রান্সমিটারে দিয়ে অন্যত্র পাঠাচ্ছ! মনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বুড়ো মানুষটির চোয়াল ঝুলে পড়ল, সে আমতা আমতা করে বলল, তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে?

আমি হেলমেটটা দেখিয়ে বললাম, ভিতরে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবে।

না, বুড়ো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, পারবে না। কেউ পারে নি। তুমি কাউকে বলে দিও না, আমি তোমাকে অর্ধেক দামে দিচ্ছি।

আমি অর্ধেক দাম দিয়ে মন-মেশিন কিনে নিয়ে বের হয়ে এলাম। দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের কাছাকাছি জৈবিক জিনিসপত্রের দোকান। ভেতরে ঢুকে আমার গা গুলিয়ে গেল কিন্তু আমি আবার বের হয়েও আসতে পারলাম না। বিচিত্র একটা কৌতূহল নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি। মানুষের হৃৎপিণ্ড, কিডনি, ফুসফুস এবং যকৃত বিক্রয় হচ্ছে। জীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাল্টে নেয়ার জন্যে কাছেই অপারেশান থিয়েটার খোলা হয়েছে। মানুষজন দরদাম করে পছন্দসই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেছে নিয়ে সেই অপারেশান থিয়েটারে ঢুকে যাচ্ছে। এ ধরনের ব্যাপার যে ঘটতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

এর কাছাকাছি রয়েছে জীবাণুর দোকান। সম্ভাব্য সব ধরনের জীবাণু সেখানে পাওয়া যায়। কিটুনিয়া ভাইরাস নামের এক ধরনের ভাইরাসের ছোট ক্যাপসুল দেখতে পেলাম, সেগুলো এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এটাকে ফেটে যাবার জন্যে প্রোগ্রাম করা যায়, তারপর কারো শরীরে ঢুকিয়ে দিলে সেটি তার মস্তিষ্কে এসে নির্দিষ্ট সময়ে ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন সেল ধ্বংস করে দেয়। দুই হাজার ইউনিট করে দাম। কী কাজে লাগবে আমি জানি না। তবু কেন জানি একটা কিটুনিয়া ভাইরাসের ক্যাপসুল কিনে নিলাম। মহাকাশযানে যেরকম পরিস্থিতি, হয়তো কখনো নিজের জন্যে মৃত্যু বেছে নিতে হবে!

বুড়ো লি বলেছিল এখানে এলে আমার ভালো লাগবে, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম এই মুক্ত এলাকায় এসে আমি বরং আশ্চর্য ধরনের এক দূষিত বিষণ্নতায় ভুগতে শুরু করেছি।

আধো অন্ধকারে একটা জটলা থেকে বের হবার সময় হঠাৎ আমার কনুইয়ে কে যেন স্পর্শ করল, আমি সেখানে একটু তীক্ষ্ণ জ্বালা অনুভব করলাম। মুখ ঘুরিয়ে দেখি সোনালি চুলের সেই মেয়েটি, আমার চোখে চোখ পড়তেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল। আমি কনুইটি লক্ষ করলাম, সেখানে কিছু নেই, মেয়েটি কি আমাকে কিছু বলতে চাইছে? আমাকে কিছু করতে চাইছে?

আমি খানিকটা দুশ্চিন্তা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে তথ্য বিনিময় কেন্দ্রটি আবিষ্কার করলাম। বাইরে বড় বড় করে লেখা, "নামমাত্র মূল্যে মহাকাশযানের সর্বশেষ তথ্য"। বুড়ো লি নিশ্চয়ই এই জায়গাটার কথা বলেছিল, আমি একবার নজর দেখে ভেতরে ঢুকে গেলাম এবং সাথে সাথে আমার দিকে একজন মানুষ এগিয়ে এল। মানুষটি সুপুরুষ এবং সে বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন, আমার দিকে ভদ্রতার হাসি হেসে বলল, তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

আমি এই মহাকাশযানের সর্বশেষ তথ্য জানতে এসেছি। সুদর্শন মানুষটির মুখে সহৃদয় একটা হাসি ফুটে উঠল, সে নিচু গলায় বলল, খুব বড় একটা তথ্য এসেছে, জানতে চাও?

কী তথ্য?

তুমি সেটা শুনতে চাইলে আমার জানা প্রয়োজন তুমি তার জন্যে কত ইউনিট খরচ করতে চাও।

আমি ইতস্তত করে বললাম, তথ্যের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় আমি সেটাও জানতাম না। আমার ধারণা ছিল তথ্য জানতে পারা হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার।

মানুষটা ষড়যন্ত্রীদের মতো মাথা এগিয়ে এনে বলল, বেঁচে থাকাও মানুষের জন্মগত অধিকার, এই মহাকাশযানে মানুষজন কীভাবে মারা পড়ছে তুমি জান?

আমি ভালো জানতাম না, জানার কোনো কৌতূহলও অনুভব করলাম না। একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, আমার কাছে সাড়ে সাত হাজার ইউনিটের মতো রয়েছে। কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে?

মানুষটা জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, সাড়ে সাত হাজার ইউনিট অনেক অর্থ হতে পারে—মোটামুটি সুন্দরী একটা মেয়েমানুষ কিনে ফেলা যায় কিন্তু তথ্যের জন্যে এটা খুব বেশি নয়। কিন্তু তোমাকে আমি বড় তথ্যটা এর বিনিময়েই দিয়ে দেব। তার আগে তোমাকে কিছু অঙ্গীকার করতে হবে। তথ্যটা কাউকে বলবে না, যদি বল তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে—এই সব রুটিন ব্যাপার।

বেশ। কী করতে হবে বল।

আমাকে বেশ সময় নিয়ে নানা ধরনের অঙ্গীকার করতে হল, সেসব অঙ্গীকারপত্র কমিউনিকেশান্স মডিউল দিয়ে নিশ্চিত করতে হল এবং তখন সুদর্শন মানুষটি আমার হাতে ছোট একটা ক্রিস্টাল ধরিয়ে দিয়ে বলল, নাও এইসব তথ্য এখন তোমার।

আমি ক্রিস্টালটি আমার কমিউনিকেশান্স বক্সে লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলাম, তথ্যটি কিসের ওপর?

মানুষটি ঝুঁকে পড়ে বলল, মিয়ারার আস্তানায় নিনীষ স্কেলে আট মাত্রার একজন মানুষ এসেছিল, নাম কিহা। সে এবং লেন নামে আরো একটি মেয়ে মূল তথ্যকেন্দ্রের জন্যে আলাদা করে রাখা আট জন মানুষকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

আমি হতচকিতের মতো মানুষটির দিকে তাকালাম, মানুষটি আমার দৃষ্টি দেখে ভাবল আমি তার কথা বিশ্বাস করছি না। সে গলায় জোর দিয়ে বলল, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, সব তথ্য আছে এই ক্রিস্টালে। আমি নিজে দেখেছি।

আমি খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বললাম, আর কোনো তথ্য আছে?

আর কী চাও তুমি? গত দশ বছরে এ রকম তথ্য বের হয় নি। ছয় মাত্রার গোপন খবর এটা। কিহা নামের মানুষটার ছবিও আছে এখানে।

সুদর্শন মানুষটি হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, মজার ব্যাপার জান—তোমার সাথে কিহার চেহারার অনেক মিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ক্রিস্টালটা দাও আমি দেখাচ্ছি।

থাক, আমি নিজেই দেখে নেব।

লোকটাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। আমার খবর এখানে আট দশ হাজার ইউনিটে বিক্রি হচ্ছে? কী সর্বনাশা কথা!

ঘর থেকে বের হতেই দেখতে পেলাম সোনালি চুলের সেই মেয়েটি সামনে থেকে সরে গেল। আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, আমার পরিচয় নিশ্চয়ই এখানকার কিছু মানুষ কিংবা রবোটের কাছে গোপন নেই। তারা এখন কী করবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

সোনালি চুলের মেয়েটি যেই হয়ে থাকুক আর তার দলে যত মানুষই থাকুক তারা আমাকে কিছু করল না। আমি আমার ছোট ভাসমান যানে করে উড়ে উড়ে অসংখ্য জটিল গলি–ঘুপচি দিয়ে বুড়ো লিয়ের আস্তানায় ফিরে এলাম। ভাসমান যানটি দেখতে সাদামাঠা হলেও তার মাঝে নানারকম যন্ত্রপাতি রয়েছে, কেউ পিছু নিলে সেটি বুঝতে পারে এবং যেভাবেই হোক তাকে খসিয়ে দেয়। কেউ আমার পিছু নেয় নি, এবং নিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আসতে পারে নি।

ডকিং স্টেশনে ভাসমান যানটি রেখে আমি ভেসে ভেসে দরজার কাছে পৌঁছালাম। বুড়ো লি ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, কেমন সময় কেটেছে কিহা?

ভালো।

ভেতরে আস।

আমি ভেতরে আসার আগে নিজেকে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই। আমার মনে হচ্ছে আমার শরীরে কিছু একটা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বুড়ো লি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বলল, যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে আমার কিছু করার নেই কিহা। আমি তোমার শরীর থেকে সেটা বের করতে পারব না। আমার

যন্ত্রপাতি দশ বছরের পুরোনো! তুমি ভেতরে এস, তোমার মুখে শুনি কী হয়েছে।

আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখনো জানতাম না সেই মুহূর্তে বুড়ো লিয়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে।

৬

বুড়ো লি যদিও খুব আগ্রহ নিয়ে আমার মুখ থেকে কথা শুনবে বলে আমাকে ডেকে আনল কিন্তু আমি যখন বলতে শুরু করলাম সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে বলে মনে হল না। মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল এবং তার প্রশ্নগুলো হল অনাবশ্যক এবং সঙ্গতিহীন। যখন ক্রিস্টালটি কমিউনিকেশান্স মডিউলে দিয়ে দেখানো হল, সে আধাবোজা চোখে পুরোটা দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, সময় হয়ে গেছে।

লেন জিজ্ঞেস করল, কিসের সময়?

যার জন্যে এই প্রস্তুতি।

কিসের প্রস্তুতি?

এই যে মহাকাশযানটিতে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে আনা হচ্ছে, নিজেদের ভেতরে হানাহানি তৈরি করা হচ্ছে তার একটা কারণ আছে। সেটা কী আমি বলতে পারব না, তোমাদের নিজেদের ভেবে বের করতে হবে। তবে—

তবে কী?

তোমরা যে আটটা শিশুকে নিয়ে এসেছ সেটি মহাকাশযানের সব হিসেবকে গোলমাল করে দিয়েছে। কাজেই এই মহাকাশযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমরা জড়িয়ে গেছ। তোমরা চাও কি নাই চাও তোমাদের এখন পৌছানোর উপায় নেই।

লেন ভয় পাওয়া গলায় বলল, তার মানে কী? কী হবে এখন?

আমি জানি না কী হবে। কিন্তু কিছু একটা হবে। বুড়ো লি খানিকক্ষণ চুপ থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, তুমি মুক্ত এলাকা থেকে যে ক্রিস্টালটা এনেছ সেখানে তোমাদের পালানোর খবরটা আছে। পুরোটুকু নেই কারণ পুরোটুকু কেউ জানে না। তোমরা যে আট জনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ তারা যে শিশু সেটাও সবাই জানে না।

আমি মাথা নাড়ালাম, না জানে না।

ক্রিস্টালে আরো কিছু ছোট ছোট তথ্য আছে, তার মাঝে তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি মনে হয়েছে কিহা?

আমি বুড়ো লিয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার কাছে?

হ্যাঁ।

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে মিয়ারা সম্পর্কে তথ্যটি। মিয়ারাকে গত আঠার ঘণ্টা কেউ দেখে নি।

বুড়ো লি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খুব ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে থাকে। তার কুঞ্চিত মুখে হাসিটি হঠাৎ কেমন জানি বিচিত্র দেখায়। লেন অবাক হয়ে একবার আমার দিকে, আরেকবার বুড়ো লিয়ের দিকে তাকাল। তারপর একটু অধৈর্য গলায় বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেন মিয়ারাকে দেখা যাচ্ছে না?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, যারা মিয়ারাদের তৈরি করেছে তারা মিয়ারাকে

নিয়ে গেছে। আমার মনে হয় শুধু মিয়ারা নয়, মহাকাশযানের অন্য নেতাদেরকেও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বুড়ো লি মাথা নেড়ে বলল, তোমার ধারণা সত্যি কিহা। আমি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে চোখ রেখেছি, গত বার ঘণ্টায় নেতাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

লেন ভয় পাওয়া গলায় বলল, কেন দেখা যাচ্ছে না? তারা কোথায়?

বুড়ো লি পূর্ণ দৃষ্টিতে লেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহলে তোমরাও সেখানে যাবে।

আমরা?

হ্যাঁ লেন। শিশুগুলোকে প্রয়োজন। যেহেতু তোমরা শিশুগুলোকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ তোমাদেরও শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। প্রতিহিংসা সৃষ্টিজগতের প্রাচীনতম অনুভূতি।

আমি দেখতে পেলাম লেন হঠাৎ করে শিউরে উঠল। বুড়ো লি নরম গলায় বলল, তোমাদের হাতে সময় বেশি নেই কিহা। তোমরা কী করবে ঠিক করে নাও।

আমি বুড়ো লিয়ের দিকে তাকালাম। লেন জিজ্ঞেস করল, তুমি 'তোমাদের' হাতে সময় নেই কেন বলছ? 'আমাদের' হাতে সময় নেই কেন বললে না?

বুড়ো লি জোর করে একটু হেসে বলল, আমার গলার স্বরটা একটু ভারি হয়েছে লক্ষ করেছ?

লেন মাথা নাড়ল, না, করি নি।

আরেকটু পর আরো ভারি হবে। আমাকে একটা ভাইরাস আক্রমণ করেছে, কয়েক ঘণ্টার মাঝে ভোকালকর্ডে সাময়িক একটা ইনফেকশন হয়, গলার স্বরটা ভারি হয়ে যায়। আবার নিজে থেকে কয়েক ঘণ্টার মাঝে সেরে যায়। তোমাদেরও নিশ্চয়ই হবে। খুব ছোঁয়াচে।

লেন বিভ্রান্ত মুখে বলল, তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।

ভাইরাসটি অত্যন্ত নিরীহ ভাইরাস, কয়েক ঘণ্টার জন্যে গলার স্বরটা একটু ভারি করা ছাড়া আর কিছুই করে না। কিহা এই ভাইরাসটি সাথে করে এনেছে। ইচ্ছে করে আনে নি, তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে—

সোনালি চুলের মেয়েটা? কনুইয়ে যে জ্বালা করে উঠল?

হ্যাঁ। সম্ভবত তখনই। এটা পাঠানো হয়েছে আমাকে উদ্দেশ্য করে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমার গলার স্বরটা একটু পরিবর্তন করতে চায়। কেন জান?

লেন ফ্যাকাশে মুখে বুড়ো লিয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, না, জানি না।

আমি নিচু গলায় বললাম, আমি জানি।

কেন?

তোমাকে এর আগে কেউ স্পর্শ করে নি। কারণ শক্তিকেন্দ্রের চারপাশে তুমি বিস্ফোরক লাগিয়ে রেখেছ। তুমি সেটা ইচ্ছে করলে তোমার গলার স্বর দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে তোমার গলার স্বর এখন পাল্টে যাচ্ছে। এই সময়টাতে তুমি ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারবে না।

বুড়ো লি মাথা নাড়ল, চমৎকার। আমি মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করে ফেলেছি যে তুমি নিনীষ স্কেলে অষ্টম মাত্রার বুদ্ধিমান। এখন কী হবে বলে মনে হয়?

আমি বুড়ো লিয়ের চোখের দিকে তাকালাম, সেখানে কোনো ভীতি বা আতঙ্ক নেই। শান্ত চোখে হয়তো সূক্ষ্ম এক ধরনের কৌতূহল। আমি সেই শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, যে কয়েক ঘণ্টা তোমার গলার স্বর অন্যরকম থাকবে তার মাঝে কেউ এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে হত্যা করবে।

লেন শিউরে উঠে বলল, কেন? হত্যা করবে কেন?

আমি ত্রিশ বছর থেকে ভরশূন্য ঘরে ভেসে আছি, আমার শরীরের সমস্ত মাংসপেশি অচল হয়ে গেছে। আমাকে এর বাইরে নেয়া সম্ভব না। আমি সেখানে বাঁচব না, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মারা যাব। তাছাড়া—

তাছাড়া কী?

মহাকাশযানের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে আমি বড় অপরাধ করেছি। আমাকে শাস্তি দিতে হবে। প্রতিহিংসা বড় মধুর অনুভূতি।

লেন কোনো কথা বলল না, স্থির দৃষ্টিতে বুড়ো লিয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বুড়ো লি চোখ নামিয়ে বলল, আমার গলার স্বর আরো ভারি হয়ে আসছে। তোমাদের হাতে সময় বেশি নেই কিহা এবং লেন।

আমি বুড়ো লিয়ের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, তোমার রবোটটাকে আমার দরকার। আমি মন-মেশিন নামের একটা জিনিস কিনে এনেছি সেটা ব্যবহার করে একটা অস্ত্র তৈরি করতে চাই।

কী রকম অস্ত্র?

আমি কিছু একটা ভাবব আর সেই ভাবনার সাথে সাথে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিছু বিস্ফোরক দরকার খুব ছোট আকারের। তার সাথে থাকবে ডেটনেটর। মন-মেশিনের ট্রান্সমিটারটা থাকবে আমার মাথায়, হেলমেট থেকে খুলে সোজাসুজি সেটা আমার করোটিতে বসিয়ে নিতে চাই, সহজে যেন ধরা না পড়ে।

বিস্ফোরকগুলো তুমি কোথায় লাগাতে চাও?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, বাচ্চাগুলোর হৃৎপিণ্ডে।

লেন চমকে উঠে আমাকে আঁকড়ে ধরল, ভয় পাওয়া গলায় বলল, কী বলছ তুমি?

আমি মাথা নাড়লাম, ঠিকই বলছি।

বুড়ো লি হাসি-হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার তাহলে একটা পরিকল্পনা আছে!

না। আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমার সত্যিকার অর্থে কোনো পরিকল্পনা নেই। এটা এক ধরনের সাবধানতা।

লেন আর্তস্বরে বলল, না, না—এটা হতে পারে না, বাচ্চাগুলোর হৃৎপিণ্ড আমি তোমাকে কিছু করতে দেব না—

বুড়ো লি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, লেন, তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমার কাছে চোখে দেখা যায় না এ রকম ছোট বিস্ফোরক রয়েছে, সিরিঞ্জে দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া যাবে, বাচ্চাগুলোর হৃৎপিণ্ডে কিছু করা হবে না।

তাই বলে শরীরের মাঝে বিস্ফোরক?

আমি লেনের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললাম, বাচ্চাগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে আমি তাদের হৃৎপিণ্ডে বিস্ফোরক লাগাচ্ছি না, লাগাচ্ছি তাদের বাঁচানোর জন্যে। পুরো ব্যাপারটা তুমি শুনলেই বুঝতে পারবে। এস আমার সাথে, আমি তোমাকে বলি।

বুড়ো লিয়ের রবোটটা দেখতে অত্যন্ত কদাকার হলেও কাজকর্মে খুব চৌকস। আমি কী করতে চাই ব্যাপারটা জেনে নেবার পর সে কাজে লেগে গেল। মন-মেশিনের

ট্রান্সমিটারটা নিয়ে খানিকটা কাজ করতে হল। আমার মস্তিষ্কের দু ধরনের তরঙ্গের সাথে সেটাকে টিউন করা হল। যখনই আমি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে মিথ্যা কথা বলব, প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরকগুলো বিস্ফোরিত হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিস্ফোরকগুলো বিস্ফোরিত হবে যখন আমি বিশাল দুটো প্রাইম সংখ্যাকে মনে মনে গুণ করার চেষ্টা করব তখন। প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরকগুলো রাখা হল খাবারের ক্যাপসুল, তথ্য ক্রিস্টাল কমিউনিকেশান্স মডিউল এ ধরনের আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারী জিনিসের মাঝে। দ্বিতীয় ধরনের বিস্ফোরকগুলো অত্যন্ত ছোট সিরিঞ্জ দিয়ে ছটফটে আটটি শিশুর শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। মন–মেশিনের ট্রান্সমিটারটির আকার ছোট করে নিয়ে আসা হল এবং বুড়ো লিয়ের রবোট আমার করোটির উপরে সেটা অস্ত্রোপচার করে বসিয়ে দিল। সবশেষে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দিয়ে আমার ক্ষত নিরাময় করে দেয়া হল, মাথার ভেতরে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা ছাড়া আর কোথাও তার কোনো প্রমাণ রইল না।

সমস্ত কাজ শেষ করে বুড়ো লিয়ের ঘরে ফিরে এসে দেখি সে তার ঘরে একটা ছোট ভোজসভার আয়োজন করেছে। কিছু বিশেষ খাবার এবং বিশেষ পানীয় তার আশপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কাজ শেষ?

হ্যাঁ। আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমার এখন খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। যখনই আমি একটা মিথ্যা কথা বলব ঠিক তখনই আমাদের সাথে রাখা কোনো একটি টাইমার চালু হয়ে যাবে। ঠিক দুই সেকেন্ডের মাঝে যদি দ্বিতীয় একটা মিথ্যা কথা বলি তাহলে ফুড ক্যাপসুলের বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হবে। যদি তিন সেকেন্ডের মাঝে তৃতীয় একটা মিথ্যা কথা বলি তাহলে তথ্য ক্রিস্টালে, চার সেকেন্ডের মাঝে হলে কমিউনিকেশান্স মডিউলে।

বুড়ো লি খিকখিক করে হেসে বলল, শেষ পর্যন্ত জোর করে নিজেকে সত্যবাদী তৈরি করে নিলে?

হ্যাঁ। অনেকটা সেরকম।

বুড়ো লি ভাসমান খাবার এবং পানীয়ের বোতলগুলো নিজের কাছে ধরে রাখতে রাখতে বলল, এস, আমাদের বিদায়ের সময়টা স্মরণীয় করে রাখা যাক, অনেকদিন থেকে এই খাবারগুলো বাঁচিয়ে রেখেছি বিশেষ কোনো মুহূর্তের জন্যে।

আমি এবং লেন কোনো কথা বললাম না। লি সাবধানে বোতলের মুখ খুলে এক ঢোক পানীয় খেয়ে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন আমরা ডকিং স্টেশনে এক ধরনের গুমগুম শব্দ শুনতে পেলাম। বুড়ো লি মুখ মুছে অস্পষ্ট স্বরে বলল, ওরা এসে গেছে।

ঘরটির একপাশে চতুষ্কোণ হলোগ্রাফিক স্ক্রিনটি নিজে নিজে চালু হয়ে গেল এবং আমরা দেখতে পেলাম একটি ভাসমান যান স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভেতর থেকে দশটি নানা আকারের রবোট বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি রবোটের পায়ের নিচে থেকে এক ধরনের জেট বের হচ্ছে, ভরশূন্য পরিবেশে স্বচ্ছন্দে চলাচল করার জন্যে এই রবোটগুলো পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে এসেছে। বাই ভার্বালের সবচেয়ে শেষ আরোহী সোনালি চুলের একটি মেয়ে। তার পিঠে একটি জেট প্যাক বাঁধা, হাতে ভয়ঙ্করদর্শন একটি অস্ত্র।

বুড়ো লি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিহা—

বল।

রবোট আর মানুষের এই দলটি এখানে প্রবেশ করার আগে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই।

কী কথা?

বহু বহুকাল আগে পৃথিবীতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এক বুদ্ধিমান জাতি দাবা নামে একটা খেলা আবিষ্কার করেছিল। দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে আটটি করে মোট চৌষট্টি ঘরের ছকে ষোলোটি সাদা এবং ষোলোটি কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলা হত। সেই খেলায়—

আমি জানি। আমি সেই খেলা খেলেছি।

চমৎকার।• বহু প্রাচীনকালে হিসাব-নিকাশ করার জন্যে কম্পিউটার নামক একটা যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছিল, মানুষ সেই কম্পিউটারে দাবা খেলা শুরু করেছিল। এখনো তথ্য প্রক্রিয়ার যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে সেখানেও দাবা খেলা হয়। এইসব যন্ত্রপাতি মানুষ থেকে হাজার গুণ কি লক্ষ গুণ বেশি দক্ষতা নিয়ে দাবা খেলতে পারে। তোমার কি মনে হয় এইসব যন্ত্রপাতিকে দাবা খেলায় হারানো সম্ভব?

সম্ভব।

আমার উত্তর শুনে বুড়ো লি আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কেমন করে তুমি জান?

আমি জানি, কারণ আমি এই ধরনের যন্ত্রপাতিকে দাবা খেলায় হারিয়েছি।

কীভাবে হারিয়েছ?

এইসব যন্ত্রপাতি কখনো ভুল করে না। সেটাই হচ্ছে তাদের দুর্বলতা। আমি এই দুর্বলতা ব্যবহার করে তাদের খেলায় হারিয়েছি।

বুড়ো লি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তার চোখে একটা কৌতুকের ছায়া পড়ল। সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত স্পর্শ করে বলল, আমি পৃথিবীর নামে তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি জয়ী হও।

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ গোলাকার দরজা খুলে গেল এবং ঘরে প্রথমে সোনালি চুলের মেয়েটি এবং তার পাশাপাশি অনেকগুলো রবোট এসে ঢুকল। ভরশূন্য পরিবেশে আমরা ওলটপালট খাচ্ছিলাম। কিন্তু যারা এসে ঢুকল তারা সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোনালি চুলের মেয়েটি তার হাতের ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্রটি উঁচু করে ধরে বলল, বুড়ো লি, মহাকাশযানের কেন্দ্রস্থলে শক্তিকেন্দ্রে বিস্ফোরক বসানোর জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

বুড়ো লি ক্লান্ত স্বরে বলল, কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না সোনালি চুলের রবোট।

আমি রবোট নই। আমি মানুষ। আমার নাম ইফা।

ইফা, তুমি জান না যে তুমি রবোট। তোমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে নিজেকে মানুষ বলে ভাবার জন্যে।

মিথ্যা কথা।

বেশ। আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। তুমি গুলি কর। কিহা এবং লেন তোমরা চোখ বন্ধ কর। প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

লেন একটা আর্তচিৎকার করে আমাকে জাপটে ধরল এবং সোনালি চুলের মেয়েটি ঠিক সেই সময় বুড়ো লিকে গুলি করল, আমি দেখতে পেলাম বুড়ো লিয়ের দেহ চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। হত্যা করার কত রকম পদ্ধতি থাকার পরেও কেন এখনো মানুষকে এ রকম প্রতিহিংসা নিয়ে ভয়ঙ্করভাবে হত্যা করা হয় কে জানে। সোনালি চুলের মেয়েটি এবারে অস্ত্রটি আমার এবং লেনের দিকে তাক করল। আমার ভয় পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি ভয় পেলাম না, শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখন কী চাও?

মূল তথ্যকেন্দ্রের আট জন মানুষ কোথায়?

পাশের ঘরে।

ইফা নামের সোনালি চুলের মেয়েটি ইঙ্গিত করতেই চারটি রবোট তাদের স্বয়ংক্রিয় জেট চালিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মাঝেই পাশের ঘরে শিশুগুলোর চিৎকার এবং নানা কণ্ঠের প্রতিবাদ শুনতে পেলাম। লেন এতক্ষণ আমার বুকে মুখ গুঁজে রেখেছিল, এবার ভয় পাওয়া গলায় বলল, বাচ্চাগুলোকে কী করবে?

আমি জানি না।

লেন ইফার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি জান মূল তথ্যকেন্দ্রের আট জন মানুষ আসলে শিশু?

শিশু?

হ্যাঁ। তাদের সামলানো খুব সহজ নয়। তারা আমার কথা শোনে। তুমি রবোটগুলোকে ওদের স্পর্শ করতে নিষেধ কর, আমি তাদের নিয়ে আসছি।

ইফা এক মুহূর্ত কী একটা ভেবে বলল, ঠিক আছে যাও।

লেন ভেসে ভেসে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি ইফার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, আমি তোমাকে মুক্ত এলাকায় দেখেছিলাম, তখন তুমি আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছিলে—এখন অনেক সাহস দেখাচ্ছ, কারণটা কী?

ইফা কোনো কথা না বলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি নিচু গলায় বললাম, মানুষ ইচ্ছে করলে নিয়ম তৈরি করতে পারে আবার নিয়ম ভাঙতে পারে। রবোটেরা পারে না। তাদেরকে যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয় ঠিক সেভাবে চলতে হয়। তোমাকে নিশ্চয়ই এখন সাহসী এবং নিষ্ঠুর হওয়ার জন্যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

ইফা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, আমি রবোট নই। আমাকে কেউ প্রোগ্রাম করে নি।

তুমি হয়তো রবোট নও, কিন্তু তোমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে ইফা। একজন রবোটকে প্রোগ্রাম করা সহজ কিন্তু মানুষকে প্রোগ্রাম করা এত সহজ নয়। কিন্তু একবার যদি মানুষকে প্রোগ্রাম করা হয় সেখান থেকে তার কোনো মুক্তি নেই।

ইফা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে বললাম, তোমার জন্যে আমার করুণা হয় ইফা। অসম্ভব করুণা হয়।

ঠিক এ রকম সময় বাইরে থেকে অনেকগুলো রবোট ভেতরে এসে হাজির হল, তাদের একজন মাথা নিচু করে বলল, মহামান্যা ইফা আমরা শক্তিকেন্দ্র পরীক্ষা করে এসেছি। সেখানে কোনো বিস্ফোরক নেই।

বিস্ফোরক নেই?

না।

আমি ইফার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি সম্পূর্ণ বিনা কারণে বুড়ো লিকে হত্যা করেছ।

বিস্ফোরক রাখা আর বিস্ফোরক রাখার কথা বলা সমান অপরাধ। বুড়ো লি তার কাজের যথাযোগ্য শাস্তি পেয়েছে।

তোমার ভিতরে কি কোনো অপরাধবোধ জন্ম নিয়েছে ইফা?

অপরাধবোধ? কেন?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই একজন রবোট। নিশ্চয়ই রবোট।

ইফা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, না, আমি রবোট নই। আমি মানুষ। মানুষ। মানুষ।

আমি বুড়ো লিয়ের ছিন্নভিন্ন দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি মানুষ নও। আমি প্রার্থনা করি তুমি মানুষ হও।

৭

বাই ভার্বালটি নিঃশব্দে মহাকাশযানের মাঝে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রথমে জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হল আর দেখা যাচ্ছে না। জানালাগুলো অন্ধকার করে দিয়ে বাইরের সাথে আমাদের যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তার বাঁধাধরা নিয়মকানুন, কিছু করার নেই, কিন্তু আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। আমি সাধারণ মানুষ, আমার সাধারণ দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমি এক বিশাল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। এর থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসব তার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। এখন যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটাই হবে আমার জীবনের শেষ ঘটনাগুলো। এগুলো একটু মধুর হতে পারত কিন্তু হয় নি। বুড়ো লিয়ের হত্যাকাণ্ড নিজের চোখে দেখেছি। আটটি ফুটফুটে শিশুর হত্যাকাণ্ড দেখতে হবে, আমার আর লেনের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে ফেললাম, জোর করে মাথা থেকে সবকিছু সরিয়ে দিলাম, এখন সুন্দর একটা কিছু ভাবতে হবে। মিষ্টি একটা কিছু ভাবতে হবে যেটি আমার বিক্ষিপ্ত মনটিকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শান্ত করে দিতে পারে। কী হতে পারে সেই জিনিস? আমার শৈশব? ফেলে আসা গ্রহটির বিশাল প্রান্তর? স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আকাশ? একটু পরে আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমি লেনের কথা ভাবছি।

আমি চোখ খুলে তাকালাম, সামনের সারিতে আটটি শিশুকে নিয়ে সে শান্তমুখে বসে আছে—মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া। শিশুগুলো তাকে জড়াজড়ি করে ধরে রেখেছে, কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে দুজন, তার গালের সাথে গাল লাগিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে একজন শিশু। সে হাত দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে সবাইকে। শিশুগুলোর চোখেমুখে কোনো ভয় নেই, আতঙ্ক বা উদ্বেগ নেই। তাদের মুখে এক গভীর নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। তারা জানে যতক্ষণ লেন তাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তাদের কোনো ভয় নেই, বিপদ নেই।

আমি এই অপূর্ব দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে থাকি। আর কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পর আমারও মনে হতে থাকে এই আটটি নিষ্পাপ শিশুর কোনো ভয় নেই, কোনো বিপদ নেই!

ঠিক এ রকম সময় বাই ভার্বালে একটা মৃদু কম্পন অনুভব করলাম এবং সাথে সাথে ভিতরের সব রবোটেরা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমরা নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছি।

বাই ভার্বালের গোল দরজা দিয়ে আমরা বের হয়ে এলাম। স্বচ্ছ মেঝে, স্বচ্ছ দেয়াল, উপরে স্বচ্ছ ছাদ প্রতি মুহূর্তে মনে হতে থাকে বুঝি কোথাও পড়ে যাব। সাবধানে হেঁটে হেঁটে আমরা দ্বিতীয় একটি ঘরে হাজির হলাম। সেখানে জোর করে শিশুগুলোকে লেনের কাছ থেকে আলাদা করা হল। শিশুগুলো ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে কিন্তু রবোটগুলো তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না। লেন জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে শিশুগুলোকে অভয় দিয়ে বলল, তোমরা যাও, আমি এক্ষুনি আসছি।

তারা কী বুঝল কে জানে! একজন একজন করে কান্না থামিয়ে একে অন্যকে জড়াজড়ি করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তখন আমাকে আর লেনকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পাশের একটা ঘরে নিয়ে আসা হল। আমাদের বিবস্ত্র করা হল এবং আমাদের কাছে যা ছিল সব সরিয়ে নেয়া হল। আমি দেখতে পেলাম খাবারের ক্যাপসুলগুলো সরিয়ে নিল প্রাচীন ধরনের একটি রবোট, তথ্য ক্রিস্টালগুলো আধুনিক ধরনের কিছু রবোট। কমিউনিকেশান্স মডিউলটি যে পরীক্ষা করতে শুরু করল তাকে একজন মানুষের মতো দেখাচ্ছিল, যদিও আমি মোটামুটি নিশ্চিত সেও একজন রবোট।

আমাদের বিবস্ত্র অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে হল না। কিছুক্ষণের মাঝেই নূতন এক প্রস্থ নিও পলিমার দিয়ে আমাদের আবৃত করে দেয়া হল। সত্যিকার পোশাক নয় তবে পোশাকের কাজ চলে যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাদের সাথে একটা কথাও বলে নি, আমরাও কিছু বলি নি। আমি এবারে আমার প্রথম কথাটি উচ্চারণ করলাম, স্পষ্ট গলায় জোর দিয়ে বললাম, আমি মহামতি গ্রাউলের সাথে দেখা করতে চাই।

সাথে সাথে ঘরটিতে একটি নীরবতা নেমে এল। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল। আমি শুনতে পেলাম বিশাল এই ভবনে দূরে কোথাও তারস্বরে এলার্ম বাজতে শুরু করেছে।

দীর্ঘ সময় সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আমি এবার আরো স্পষ্ট গলায় বললাম, আমি মহামতি গ্রাউলের সাথে দেখা করতে চাই। মহামতি গ্রাউল, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি এই বিশাল মহাকাশযানটি তৈরি করেছেন, যাঁর চোখ কান বা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় নেই, যিনি সংবেদনশীল যন্ত্র দিয়ে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করেন।

আমার সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা তখনো নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি শুনতে পেলাম অনেকে এই ঘরের দিকে ছুটে আসছে। ঘরের দরজা খুলে গেল এবং বেশ কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা ভেতরে ঢুকে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ করতে থাকি, কেন জানি মনে হয় এদের কেউই সত্যিকারের মানুষ নয়। হয় পুরোপুরি রবোট কিংবা রবোটের দেহে আটকে পড়ে থাকা কোনো একজন হতভাগ্য মানুষ।

বয়স্ক ধরনের একজন কয়েক পা এগিয়ে এসে ভীত গলায় বলল, তুমি কী বলছ?

আমি প্রায় ধমক দেয়ার মতো করে বললাম, আমি জানি আমি কী বলছি। আটটি শিশুকে কেন আনা হয়েছে আমি তাও জানি। মহামান্য গ্রাউলের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির নিয়মমাফিক পরিবর্তন করার কথা। আটটি সুস্থ সবল হৃৎপিণ্ড দরকার। আটটি শিশু থেকে সেই আটটি হৃৎপিণ্ড নেয়া হবে।

বয়স্ক ধরনের মানুষটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে কাঁপা গলায় বলল, তুমি এসব কী বলছ? কোথায় শুনেছ এইসব?

আমি কোথায় শুনেছি সেটা তোমার জানার দরকার নেই। আমি এই মুহূর্তে মহামতি গ্রাউলের সাথে কথা বলতে চাই। এই মুহূর্তে—

কিন্তু সেটা তো অসম্ভব।

অসম্ভব?

হ্যাঁ।

বেশ। তুমি জান আমি কী করতে পারি?

কী করতে পার?

আমি তোমাদের পুরো এলাকা ধ্বংস করে দিতে পারি।

সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলো একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। আমি হিংস্র গলায় বললাম, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করলে না? ঠিক আছে আমি তোমাদের আমার ক্ষমতা দেখাব।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, আমার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বললাম, আমি ধ্বংস করে দেব সব।

নির্দিষ্ট সময় পর পর দুটি মিথ্যা কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র খাবার ক্যাপসুলে রাখা বিস্ফোরকটি প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরিত হল। প্রাচীন ধরনের রবোটের আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা রবোটগুলোও ছিটকে উঠল উপরে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে নিচে এসে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। হলঘরটি কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গল, জঞ্জাল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আমাদের যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একজন কী একটা বলতে চাইছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমার কথা বিশ্বাস হল?

কেউ কোনো কথা বলল না। আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি তোমাদের আরো একটি সুযোগ দেব। দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করে বললাম, সুযোগ গ্রহণ না করলে ধ্বংস করে দেব সবকিছু।

সাথে সাথে তথ্য ক্রিস্টালের বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হল। এটি ছিল আরো শক্তিশালী। পুরো হলঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল সাথে সাথে। ছিন্নভিন্ন রবোটের ধ্বংসাবশেষ উপর থেকে নিচে পড়তে শুরু করল। মনে হল বুঝি এখানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আমি তার মাঝে চিৎকার করে বললাম, এই মুহূর্তে আমাকে মহামতি গ্রাউলের কাছে নিয়ে যাও। শুধু তিনিই আমার সাথে কথা বলতে পারবেন, আর কেউ না।

এবার আমার সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মাঝে এক ধরনের চাঞ্চল্যের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল। আমি যেভাবে হাস্যকর ছেলেমানুষি যন্ত্র দিয়ে বড় বড় দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি কতক্ষণ সেটি তাদের কাছে গোপন রাখতে পারব জানি না, সময় আমার কাছে খুব মূল্যবান। যে-কোনো মুহূর্তে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মহামতি গ্রাউলকে নিশ্চয়ই অচিন্তনীয় প্রতিরক্ষা দিয়ে আগলে রাখা হয়, আমি নিজে থেকে সেখানে কখনোই যেতে পারব না।

আমার সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলো কিছুক্ষণ ইতস্তত করে। একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, তুমি কেন মহামতি গ্রাউলের সাথে দেখা করতে চাও?

আমি গলায় অধৈর্যের স্বর ফুটিয়ে বললাম, আমি তোমাকে সেটা বললে তুমি বুঝবে না। তোমার কিংবা তোমাদের কারো সেই মানসিক পরিপক্বতা নেই।

কথাটি সত্যি নয়, তাই তিন সেকেন্ড পর যখন বললাম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না—তখন তৃতীয় বিস্ফোরণটি ঘটল।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ধাক্কাটা কমে যেতেই উপস্থিত মানুষেরা ছোটাছুটি শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি আমাকে এবং লেনকে একটা ভাসমান যানে তুলে দেয়। সেটি অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গে ছুটে যেতে থাকে। বিশাল বিশাল কিছু গেট নিজে থেকে খুলে যায়, আবার আমাদের পিছনে বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য ধরনের যন্ত্রপাতি আমাদের পরীক্ষা করে তারপর ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়।

এক সময় আমি আর লেন একটা বড় হলঘরের মতো জায়গায় পৌঁছালাম। তার

ধবধবে সাদা দেয়াল, উঁচু ছাদ এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মেঝে। ঘরটিতে হালকা নরম একটি আলো, যদিও কোথা থেকে সেই আলো আসছে বুঝতে পারছি না। ভিতরে একটু শীতল, আমি আর লেন কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। কেউ কিছু বলে দেয় নি কিন্তু আমার মনে হল এখানেই মহামতি গ্রাউলের সাথে দেখা হবে।

আমি আর লেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু তবু আমাদের মনে হতে থাকে কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হঠাৎ এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। বুকে আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে আমি লেনের দিকে তাকালাম, ঠিক তখন শুনতে পেলাম কে একজন ভারি গলায় বলল, তোমরা কেন আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?

আমি আর লেন চমকে উঠে চারদিকে তাকালাম, কেউ কোথাও নেই। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি মহামতি গ্রাউল। আপনার ভবনে আমি আহাম্মকের মতো তিনটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি, আমি—

হ্যাঁ। আমি খবর পেয়েছি। আমি অনুভব করছি তোমার করোটিতে একটা ছোট ট্রান্সমিটার বসানো আছে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার মস্তিষ্ক তরঙ্গ ব্যবহার করে সেটা দিয়ে কাছাকাছি রাখা বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছ।

আপনি সত্যিই অনুমান করেছেন মহামতি গ্রাউল। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার এই ছলনাটুকু করতে হয়েছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার কর্মচারীদের ধোঁকা দেয়া খুব সহজ। তারা নির্বোধ।

আমি ক্ষমা চাই মহামতি গ্রাউল।

আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।

আপনার প্রতি আমার অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা।

তুমি কেন এসেছ আমার কাছে?

আমার বলতে খুব দ্বিধা হচ্ছে মহামতি গ্রাউল। আমি আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করে কথাটি কীভাবে উচ্চারণ করব বুঝতে পারছি না।

তুমি অসঙ্কোচে বলতে পার কিহা।

তার আগে আমি কি একটা অনুরোধ করতে পারি?

কী অনুরোধ?

আমি কি আপনাকে দেখতে পারি?

মহামতি গ্রাউল এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আমাকে কেউ কখনো দেখে নি। যে মানুষ বেঁচে থাকবে সে আমাকে কখনো দেখবে না।

আমি আপনাকে সশরীরে দেখতে চাই নি মহামতি গ্রাউল। আমি আপনার একটা রূপ দেখতে চাইছি। আমি কাউকে না দেখে ভালো করে কথা বলতে পারি না মহামান্য গ্রাউল। না দেখে কথা বললে মনে হয় আমি তার উপাসনা করছি।

বেশ। তুমি আমাকে কী রূপে দেখতে চাও? পুরুষ না রমণী?

আপনার যা ইচ্ছে।

প্রায় সাথে সাথেই ঘরের মাঝামাঝি সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধকে দেখা গেল। শরীরে আলগোছে একটি চাদর জড়ানো, সেখান থেকে এক ধরনের নরম আলো বের হচ্ছে। মহামতি গ্রাউলের এই রূপটি দেখে আমার প্রাচীন গ্রন্থের দেবদূতের কথা মনে পড়ল। এটি

AMARBOI.COM

সত্যিকারের কোনো মানুষ নয় কিন্তু রূপটি এত জীবন্ত যে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি আর লেন মাথা নত করে অভিবাদন করে বললাম, আপনাকে অভিবাদন। আমাদেরকে একটি শান্ত সমাহিত রূপে দেখা দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

তুমি এখন কী বলতে চাও বল।

আমার কথাটি বলার আগে আমার একটু ভূমিকা দেয়ার প্রয়োজন। আপনার সময় অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু তবুও আমি একটু সময় ভিক্ষা চাইছি।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মানুষটি আমার দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি। তুমি বল।

আপনি এই মহাকাশযানটি তৈরি করেছেন। এর মূল নকশা আপনার, খুঁটিনাটি সবকিছু আপনার। দীর্ঘ সময় নিয়ে এটি মহাকাশে তৈরি হয়েছে। এক সময় এটি পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে। মানুষ যখন কিছু একটা সৃষ্টি করে তার এক ধরনের আনন্দ হয়। সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করে সাধারণ জিনিস, তার আনন্দটুকু হয় সাধারণ। আপনি সাধারণ মানুষ নন— আপনার সৃষ্টিও তাই সাধারণ নয় এবং সেটা সৃষ্টি করে আপনি যে আনন্দটুকু পেয়েছেন সেই আনন্দও নিশ্চয়ই অসাধারণ। আপনার সেই তীব্র আনন্দের অনুভূতি আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

এই মহাকাশযান যখন পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে আপনি সেখানে স্থান করে নিয়েছেন। এই মহাকাশযানের সৌভাগ্য, মহাকাশ অভিযাত্রীদের সৌভাগ্য আপনি তার নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছেন। সেই নেতৃত্বটুকু এসেছে গোপনে। সাধারণ মানুষের কাছে আপনার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের ধারণা মূল তথ্যকেন্দ্র এই মহাকাশযানকে চালিয়ে নিচ্ছে মহাকাশ দিয়ে। বহুদূরে পৃথিবীতে।

যখন মহাকাশযান পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করলেন আপনার আর কিছু করার নেই। সাধারণ মানুষ শীতলঘরে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে পারে, আপনার ঘুমানোর সুযোগ নেই। আটটি সতেজ হৃৎপিণ্ড আপনার জটিল বহুমুখী মস্তিষ্ক স্তরের নানা অংশে রক্ত সঞ্চালন করে। আপনি প্রতি মুহূর্তে সজীব, প্রতি মুহূর্তে কর্মক্ষম। সাধারণ মানুষের চোখ রয়েছে, কান রয়েছে, নাক, মুখ, ইন্দ্রিয় রয়েছে। শারীরিক বা আধা শারীরিক আনন্দের সুযোগ রয়েছে। আপনার সমস্ত কার্যকলাপ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে। আপনি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন আপনি নিঃসঙ্গ।

আমি কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। মাথা নিচু করে সম্মান প্রদর্শন করে বললাম, আমি কি ভুল বলেছি মহামান্য গ্রাউল?

মহামতি গ্রাউল এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, না। তুমি ভুল বল নি কিহা।

আমি কি আরো একটু বলব?

বল।

আমাদের, সাধারণ মানুষের নিঃসঙ্গতা সাধারণ। সেটা দূর করার জন্যে আমরা সাধারণ কাজ করি। আপনি সাধারণ মানুষ নন— আপনি তাই সাধারণ কাজ করতে পারেন না। আপনি ঠিক করলেন সময় কাটানোর জন্যে একটা কৌতুক করবেন। কিছু বুদ্ধিমান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের সাথে বুদ্ধির কোনো একটা খেলা খেলবেন। এমনি এমনি আপনি বুদ্ধিমান মানুষ বেছে নিতে চাইলেন না। আপনি ঠিক করলেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান মানুষকে বেছে নেবেন। তাই একদিন মহাকাশযানের সব মানুষকে জাগিয়ে তুলতে শুরু করলেন।

তাদেরকে হানাহানি শুরু করতে দিলেন, তাদেরকে নেতৃত্ব নিয়ে যুদ্ধ করতে দিলেন। আপনি ঠিক করলেন যারা সবচেয়ে উপরে উঠে আসবে আপনি তাদের বেছে নিবেন।

মহামতি গ্রাউলের মুখ ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে আসছিল, আমি হঠাৎ বুকের ভিতরে ভয়ের এক ধরনের কম্পন অনুভব করি। তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তুমি কেমন করে এসব জান?

আমি কিছু জানি না মহামতি গ্রাউল। সব আমার অনুমান। আমার অনুমান ভুল হতে পারে। যদি হয় আপনি আমার ভুল ধরিয়ে দেবেন মহামতি গ্রাউল। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, আমার অনুমান কি ভুল হয়েছে মহামতি গ্রাউল?

না হয় নি। বল তুমি কী বলতে চাও। তোমার দীর্ঘ ভূমিকা তুমি শেষ কর।

আমার ভূমিকা প্রায় শেষ মহামতি গ্রাউল। আমি এক্ষুনি বলব আমি কী চাই। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধারণ। আমাদের স্বপ্নও সাধারণ। আপনি সাধারণ নন, আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষাও সাধারণ নয়। আপনার কল্পনাও সাধারণ নয়। আমরা সেটা বুঝতে পারি না। সেটা কল্পনা করতে পারি না। আপনার ছোট একটি খেয়ালে মহাকাশযানে শত শত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষকে স্বার্থপর লোভীতে পাল্টে দেয়া হয়েছে। এর অবসান ঘটাতে হবে মহামতি গ্রাউল।

লেন হঠাৎ করে আমার কনুই খামচে ধরল। আমি সাবধানে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে মহামতি গ্রাউলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। তার মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠল, তার নিশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং এক সময়ে থমথমে গলায় বললেন, তুমি কীভাবে এর অবসান ঘটাতে চাও?

আপনি এই মহাকাশযানটির কর্তৃত্ব মহাকাশযানের মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিন।

আর যদি না দিই?

আপনাকে দিতে হবে মহামতি গ্রাউল। মহাকাশযানের সমস্ত মানুষের কাছে অঙ্গীকার করা হয়েছে এটি পৃথিবীতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছি নক্ষত্রপুঞ্জ তার ঠিক জায়গায় নেই। ভেগা নক্ষত্র অনেক উপরে, কালপুরুষ বাম দিকে সরে রয়েছে। আপনি এই মহাকাশযানকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন।

মহামতি গ্রাউলের মুখে এক ধরনের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল, তিনি সেই হাসি গোপন করার চেষ্টা না করে বললেন, আমি তোমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি কিহা। তোমার বুদ্ধিমত্তা নিশ্চয়ই নিনীষ স্কেলে আটের কম নয়।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন কিন্তু সেটার কোনো অর্থ নেই মহামতি গ্রাউল।

আমি যদি তোমার অনুরোধ মহাকাশযানের কর্তৃত্ব মানুষের হাতে না দিই তুমি কী করবে কিহা?

আমি বুক ভরা একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, আমি আপনাকে হত্যা করতে বাধ্য হব মহামতি গ্রাউল।

মহামতি গ্রাউল বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। লেন আমার দুই হাত শক্ত করে ধরে রেখে ফিসফিস করে বলল, হায় ঈশ্বর। হায় পরম করুণাময় ঈশ্বর।

মহামতি গ্রাউলের হাসি না থামা পর্যন্ত আমি চুপ করে রইলাম, তারপর নিচু গলায়

AMARBOI.COM

বললাম, মানুষের স্বাভাবিক হিসেবে আপনি একজন উন্মত্ত দানব ছাড়া কিছু নন। আমি যদি আজ ব্যর্থ হই অন্য কোনো একজন আপনাকে হত্যা করবে। আপনাকে হত্যা করে এই মহাকাশযানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ঘরের মাঝামাঝি মহামতি গ্রাউলের যে প্রতিচ্ছবিটি ছিল সেটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে, তার আকার আরো বড় হয়ে আসে এবং গায়ের রং পরিবর্তিত হতে থাকে, একটু আগে যেটিকে শান্ত সৌম্য একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল, ধীরে ধীরে সেটা সত্যিই যেন দানবের রূপ নিতে শুরু করে। লেন শক্ত করে আমার হাত ধরে রেখে আবার ফিসফিস করে বলল, রক্ষা কর ঈশ্বর তুমি। রক্ষা কর। রক্ষা কর।

মহামতি গ্রাউলের গলার স্বরে একটা ধাতব প্রতিধ্বনি শোনা যেতে থাকে। তিনি খনখনে গলায় বললেন, কিহা, আমি তোমার সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সাহস পুরোপুরি মানবিক অনুভূতি। শুধুমাত্র মানুষ সাহস নামক ব্যাপারটি দেখাতে পারে। পশুরা পারে না। রবোটরাও পারে না। তার কারণ এটি পুরোপুরি যুক্তিহীন এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। তবে তোমার সাহসের একটি পুরস্কার আমি দেব। তোমাকে আমি আমার নিজেকে দেখতে দেব। দেখ আমি দেখতে কেমন!

সাথে সাথে সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল এবং আমরা যে স্বচ্ছ মেঝের উপরে দাঁড়িয়েছিলাম তার নিচে আলো জ্বলে ওঠে। সেখানে বিশাল একটি স্বচ্ছ পাত্রে এক ধরনের তরল পদার্থে থলথলে একটা জিনিস কিলবিল করতে থাকে, সেখান থেকে শিরা উপশিরা বের হয়ে গিয়েছে। তাকে ঘিরে আটটি হৃৎপিণ্ড ধকধক করে তার মাঝে রক্ত প্রবাহিত করে যাচ্ছে, সেই রক্তের স্রোত পাশে পুষ্টি এবং অক্সিজেন ট্যাংকের ভেতর দিয়ে চলে আসছে। সমস্ত দৃশ্যটি একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো, দেখে লেন একবার আর্তচিৎকার করে উঠল।

আমি মহামতি গ্রাউলের গলার স্বর শুনতে পেলাম, আমার দেহ— যদি সেটাকে দেহ বলতে চাও, যেভাবে রক্ষা করা আছে এর উপরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেও কিছু হবে না। তোমরা যে আটটি হৃৎপিণ্ড দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা সেগুলো পাল্টে দেব আটটি সতেজ হৃৎপিণ্ড দিয়ে। এই মুহূর্তে তার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে—

না। আমি শক্ত গলায় বললাম, আপনি সেটা করবেন না মহামতি গ্রাউল। আটটি শিশুর হৃৎপিণ্ডে আমরা বিস্ফোরক লাগিয়ে রেখেছি। আমি সেগুলো যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত করে দিতে পারি— কিন্তু আমি করব না। আমি মানুষ, মানুষ অনেক অন্যায় করতে পারে, কিন্তু শিশু হত্যা করতে পারে না। আপনি আপনার নিরাপত্তার জন্যে কখনই সেই হৃৎপিণ্ড ব্যবহার করবেন না। প্রায় অদৃশ্য সেই বিস্ফোরক রক্তস্রোতে মিশে আপনার মস্তিষ্কে যেতে পারে। কিংবা কে জানে—

মহামতি গ্রাউল হিংস্র গলায় বললেন, কে জানে কী?

কে জানে সেই বিস্ফোরকে ভয়ঙ্কর কোনো ভাইরাস রয়েছে কি না, সেই ভাইরাস আপনার রক্তকে দূষিত করে দেবে কি না—

যেভাবে নিচে আলো জ্বলে উঠেছিল ঠিক সেভাবে আলো নিভে গেল এবং আবার আমরা আমাদের সামনে মহামতি গ্রাউলকে দেখতে পেলাম। তার চেহারায় এক ধরনের বিকৃতি হয়েছে, ভয়ঙ্কর একটা দৃষ্টিতে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে দেখে আমি নিজের ভেতরে এক ধরনের অশুভ অসহায় আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। মহামতি গ্রাউল হিংস্র গলায় বললেন, তোমরা কীভাবে আমাকে হত্যা করতে চাও?

আমরা নই। আমি। আমি আপনাকে বুদ্ধি দিয়ে হত্যা করতে চাই।

বুদ্ধি দিয়ে?

হ্যাঁ মহামতি গ্রাউল। আমি জানি আপনি মিয়ারাকে এনেছেন। আমি জানি মহাকাশযানের অন্য ছয় জন নেতাও এখানে আছে। আপনি তাদের সাথে সময় কাটাবেন, কোনো একটি বুদ্ধির খেলা খেলবেন। আমি চাই— আমি এক মুহূর্তের জন্যে থামলাম।

মহামতি গ্রাউল বললেন, তুমি চাও—

আমি চাই আপনি অন্য ছয় জনের সাথে আমাকে যুক্ত করবেন। আমিও আপনার সাথে সেই ভয়ঙ্কর খেলায় অংশ নিতে চাই। অন্যদের সাথে আমিও আপনার মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে চাই।

মহামতি গ্রাউলের চেহারা হঠাৎ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তিনি তীব্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কঠিন গলায় বললেন, তুমি কেমন করে জান তারা আমার মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি যুক্ত?

আমি জানি না মহামতি গ্রাউল, কিন্তু আমি অনুমান করছি। আমি জানি আপনার চোখ নেই, কান নেই, বাইরের জগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই। অন্য এক বা একাধিক মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগের আপনার একটি মাত্র উপায়, একসাথে যুক্ত করে দেয়া। সেই মস্তিষ্ক আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ হয়ে থাকবে। আপনি তাকে পীড়ন করবেন। আমি জানি মহামান্য গ্রাউল। আপনি একজন দানব ছাড়া আর কিছু নন।

মহামতি গ্রাউল একটা নিশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমার দুঃসাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি কিহা। তুমি স্বেচ্ছায় আমার মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত হতে চাও?

চাই মহামান্য গ্রাউল। আপনাকে আমি ধ্বংস করতে চাই।

তুমি আমাকে ধ্বংস করতে পারবে?

আমি জানি না পারব কি না। কিন্তু আমাকে চেষ্টা করতে হবে। মানুষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে। আপনি মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে তৈরী কিন্তু আমি জানি না আপনি মানুষ কি না।

তুমি কীভাবে আমাকে হত্যা করবে?

আমি আপনাকে এখন বলব না। যদি আপনি আমার মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত হন তাহলে আপনি জানবেন।

আর যদি না হই?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে আমার কিছু করার নেই। সম্ভবত আপনি তাহলে এখন আমাদের হত্যা করবেন। আমি একটু অপেক্ষা করে বললাম, যদি সত্যিই আমাদেরকে হত্যা করেন আমি আশা করব আপনি আমাদের কয়েক মুহূর্ত সময় দেবেন। আমি আমার সাথে দাঁড়ানো মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইব তারপর বিদায় নেব। এবং—

এবং কী?

এবং তাকে বলব যদি সত্যিই আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলতাম, লেন তুমি কি আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিবে?

মহামতি গ্রাউলের মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, তিনি এক ধরনের কোমল গলায় বললেন, লেন তুমি তাহলে কী বলবে?

লেন কোনো কথা বলল না, আমাকে শক্ত করে ধরে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল। আমি তাকে বুকে আঁকড়ে রেখে তার মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললাম, লেন, এক

মুহূর্তের ভালবাসা আর এক যোজনের ভালবাসার কোনো পার্থক্য নেই। ভালবাসা ভালবাসাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

মহামতি গ্রাউল এক ধরনের কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর শান্ত গলায় বললেন, কিহা। আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। তোমার মস্তিষ্ককে আমি আমার মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত করব। তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমান। তোমার মরণ খেলাটি দেখার আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।

আমি খুব সাবধানে আমার বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিলাম। এই মহাকাশযান মহামতি গ্রাউলের থাবা থেকে হয়তো শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে। বুড়ো লি যেভাবে বলেছিল সেভাবে, শক্তিশালী যন্ত্রের সাথে যেভাবে দাবা খেলতে হয় তার নিয়মে। যন্ত্র প্রস্তুতি নেয় নিখুঁত একটি খেলার যেখানে কোনো ভুল হয় না, তার সাথে খেলতে হয় নির্বোধের মতো, যে-নির্বুদ্ধিতা আসলে সুপরিকল্পিত। আমিও তাই করছি, যে বুদ্ধির খেলায় মহামতি গ্রাউল আগ্রহ নিয়ে রাজি হয়েছে সেটি আমাকে খেলতে হবে না। কারণ আমার মস্তিষ্কে কিটুনিয়া ভাইরাসের ছোট একটা ক্যাপসুল ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। মুক্ত এলাকা থেকে আমি দুই হাজার ইউনিট দিয়ে কিনেছিলাম। ক্যাপসুলটি নির্দিষ্ট সময় পরে নিজে থেকে ফেটে বের হয়ে আসবে, কিলবিল করে ছড়িয়ে যাবে মস্তিষ্কে, নিউরন সেলকে ধ্বংস করে বাড়তে থাকবে প্লাবনের মতো, দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আমার মস্তিষ্ক! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মহামতি গ্রাউলের মস্তিষ্ক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মিয়ারার মস্তিষ্ক— অন্য সবার মস্তিষ্ক যারা যারা যুক্ত হয়েছে এই বিশাল মস্তিষ্ক স্তরে। মহামতি গ্রাউলকে ধ্বংস করার জন্যে যে পদ্ধতিটি আমি বেছে নিয়েছি সেটি আসলে বুদ্ধিহীন নির্বোধ একটা প্রক্রিয়া। বুদ্ধির খেলায় তাকে পরাজিত করার সেই দুঃসাহস কার আছে?

আমি আবার একটা নিশ্বাস ফেলে লেনের দিকে তাকালাম। লেন আমার মস্তিষ্কের কিটুনিয়া ভাইরাসের কথা জানে না, সে তাই অবিশ্বাস্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

বিশাল এই মহাকাশযানটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়ার একটি মাত্র উপায়, মহামতি গ্রাউল নামের দানবটিকে ধ্বংস করা। আমাকে তাই করতে হবে, আমার নিজের প্রাণ দিয়ে। সৃষ্টিজগতের ইতিহাসে সেরকম অসংখ্য আত্মত্যাগের কথা লেখা আছে—একজন বা একাধিক মানুষ হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, বিশাল জনপদ নগর রক্ষা করেছে, দেশকে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। এই মহাকাশযানের ইতিহাস যখন লেখা হবে, সেই ইতিহাসে আমার কথা নিশ্চয় উল্লেখ করা হবে, কীভাবে আমি মহামতি গ্রাউল নামের একটি দানবকে ধ্বংস করে পৃথিবীর মানুষকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি। সেটা অনেক বড় করে ব্যাখ্যা করা হবে। আমার বুকের ভেতর এখন আত্মত্যাগের এক মহান পরিতৃপ্তির অনুভূতি হওয়ার কথা।

কিন্তু আমার ভিতরে এক গভীর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা আমার বুকের ভিতর হু-হু করে বইতে থাকল। আমার না-দেখা পৃথিবী নয়, ফেলে আসা গ্রহটি নয়, বিস্ময়কর এই মহাকাশযানটি নয়, সৃষ্টিজগৎ এবং তার বিশাল রহস্য নয়; আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কালো চোখের একটি মেয়ের ভালবাসা আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে সেই গভীর বেদনায় আমার সমস্ত হৃদয় সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে।

কিন্তু আমি আমার মুখে একটা আত্মবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়ে রাখলাম, আমি জানি মহামতি গ্রাউল তার সংবেদনশীল যন্ত্র দিয়ে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন।

ঘরটির ছাদ নিচু, দেখে ঘর না মনে হয়ে একটি সুড়ঙ্গের মতো মনে হয়। আমি স্বচ্ছ একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পাশে দুজন অস্ত্রোপচারকারী রবোট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণের মাঝেই তারা আমার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার শুরু করবে। আমার কাছেই লেন দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখমণ্ডল রক্তহীন। আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত কয়টি একটি ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যে ডুবিয়ে দিতে চাইছিলাম না, প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম লেনের সাথে আনন্দদায়ক কিছু বলতে। কিন্তু বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না এবং অনুভব করছিলাম ধীরে ধীরে দুজনেই আরো বেদনাতুর হয়ে উঠছি।

আমি মুখে জোর করে একটা স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রবোটটির সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

রবোটটি থমথমে গলায় বলল, আমার কোনো নাম নেই। আমি মানুষ নই তাই আমার নামের প্রয়োজনও নেই।

সত্যি কথা। কিন্তু তুমি কি তোমার দায়িত্ব সত্যিকারভাবে পালন করতে পার।

অবশ্যি পারি। আমি খুব অল্প সময় আগেই ছয় জনের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করেছি।

আমি ভালো করে রবোটটিকে আবার দেখলাম, সে নিশ্চয়ই মিয়ারা এবং অন্যান্য নেতাদের মাথায় অস্ত্রোপচার করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায়?

তাদের দেহটি পরিশোধনাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র মস্তিষ্কটি মহামতি গ্রাউলের মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

কোথায়?

এই ঘরেই রয়েছে। রবোটটি তার যান্ত্রিক হাত দিয়ে দেখাল, কাছাকাছি ছয়টি চতুষ্কোণ সিলিন্ডার সাজানো।

আমি বুকের ভেতরে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করলাম, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে সহজ গলায় বললাম, আমি কি তাদের দেখতে পারি?

পার।

আমি এগিয়ে গেলাম, সিলিন্ডারের উপর স্বচ্ছ একটি ঢাকনা এবং তার নিচে অর্ধস্বচ্ছ এক ধরনের তরলে থলথলে একটি মস্তিষ্ক ভাসছে। এটি যে একজন মানুষের অবশিষ্ট সেটি বোঝার কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু দুটি চোখ তার, অপটিক নার্ভসহ অক্ষত রয়েছে এবং সেটি নিষ্পলক চোখে উপরের দিকে তাকিয়েছিল। আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হল আমাকে দেখে চোখ দুটির মাঝে এক ধরনের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। আমি রবোটটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার মস্তিষ্ক?

মিয়ারার।

আমি কি তার সাথে কথা বলতে পারি?

পার। বলে রবোটটি ঝুঁকে পড়ে কী একটা যন্ত্র চালু করে দিল। সাথে সাথে আমি মিয়ারার গলার স্বর শুনতে পেলাম। সে এক ধরনের উত্তেজিত গলায় বলল, কিহা! লেন! তোমরা?

হ্যাঁ। আমরা। তোমাকে এভাবে দেখব আমি কখনো ভাবি নি। আমি—আমি দুঃখিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথা কেন বলছ?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি— তুমি— তুমি কি ভালো আছ?

আমি অবশ্যি ভাল আছি। আমি চমৎকার আছি। আমি এর থেকে চমৎকার কখনো থাকি নি।

আমি হতবাক হয়ে বললাম, তুমি কেমন করে চমৎকার আছ? তোমার দেহই নেই—

মিয়ারা হাসির মতো একটা শব্দ করে বলল, মানুষের দেহ একটা বাহুল্য ছাড়া কিছু নয়। আমি এখন জানি। তোমাদের যে দেহ আছে সেই অনুভূতিটি তুমি পাও তোমার মস্তিষ্ক থেকে। যদি কারো দেহ না থাকে কিন্তু মস্তিষ্ক তাকে দেহের অনুভূতি দেয় তাহলে দেহের প্রয়োজন কী?

আমি তখনো পুরো ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারি নি। একটু পরে আমি নিজেও এই ধরনের একটি বস্তুতে পরিণত হব, তখন কি আমার ভেতরেও এই ধরনের সুখী পরিতৃপ্ত একটা ভাবের জন্ম হবে? আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সত্যিই সুখী?

হ্যাঁ। আমি সত্যিই সুখী। সুখ আনন্দ এগুলো হচ্ছে মস্তিষ্কের এক ধরনের অনুভূতি। একজন মানুষ খুব কষ্টের মাঝে বা যন্ত্রণার মাঝে থাকতে পারে, সেই কষ্ট এবং যন্ত্রণার মাঝে থেকেও যদি তার মস্তিষ্কে সুখের অনুভূতি জাগানো যায় তাহলে সে সুখ অনুভব করবে। শুধু তাই নয় তার সেই সুখ হবে সত্যিকারের সুখ।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, আমি তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম মিয়ারা। কাউকে সুখী দেখলে আমার খুব আনন্দ হয়।

তোমরা এখানে কেন এসেছ কিহা?

সেটি অনেক বড় একটি কাহিনী। তুমি নিশ্চয়ই জানবে। আমি তোমার পাশাপাশিই থাকব।

সত্যি?

সত্যি। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম এবং হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটিকে আমার কাছে অবাস্তব একটি দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে। আমি লেনের দিকে তাকালাম, তার রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে ধীরে ধীরে এক অবর্ণনীয় আতঙ্ক এসে ভর করতে শুরু করেছে।

হঠাৎ করে রবোটটি আমার কনুই স্পর্শ করে বলল, কিহা, তোমার অস্ত্রোপচারের সময় হয়েছে।

আমি চমকে উঠলাম, এখান থেকে ছুটে পালানোর একটা প্রবল ইচ্ছাকে অনেক কষ্টে আটকে রেখে আমি শান্ত গলায় বললাম, চল।

লেন পিছন থেকে এসে আমার হাত ধরে বলল, না কিহা এটা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।

আমি সাবধানে নিজেকে লেনের হাত থেকে মুক্ত করে বললাম, আমাদের আর কিছু করার নেই লেন।

লেন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, উপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, গ্রাউল! গ্রাউল তুমি কোথায়? কোথায়?

আমি চমকে উঠে বললাম, কী করছ তুমি লেন?

লেনের মুখে হঠাৎ রক্তের ছটা দেখা যায়, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, নিশ্বাসের সাথে বুক উপরে উঠছে এবং নামছে, মাথায় এলোমেলো চুল, তাকে অপ্রকৃতিস্থের মতো দেখাতে থাকে। সে চিৎকার করে বলল, গ্রাউল, তুমি কোথায়?

AMARBOI.COM

এই যে আমি এখানে। মহামতি গ্রাউলের স্বর খুব কাছে কোনো জায়গা থেকে শোনা যায়।

লেন চিৎকার করে বলল, আমি তোমাকে দেখতে চাই, তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

গ্রাউল প্রায় কোমল স্বরে বলল, তুমি এতক্ষণ এখানে কিহার সাথে ছিলে, একটিবার একটি কথাও বললে না। এখন হঠাৎ করে কী বলতে চাও?

আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই?

কী প্রশ্ন?

তার আগে আমি তোমাকে দেখতে চাই। শেষবার দেখতে চাই।

বেশ।

সাথে সাথে সুড়ঙ্গের মতো ঘরটির এক কোনায় আমরা মহামতি গ্রাউলকে দেখতে পেলাম, ঈষৎ সবুজ বর্ণে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের মাথা। একটু আগে দেখা গ্রাউলের সাথে তার কোনো মিল নেই। এই মানুষটির চেহারা ক্রূর এবং নিষ্ঠুর।

লেন ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি গ্রাউল।

সবুজ রঙের মাথাটি হিংস্র গলায় বলল, হ্যাঁ।

লেন একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। আমি জানতাম সেই নক্ষত্রের পিছনে রয়েছে আরো নক্ষত্র, আরো নীহারিকা। তার পিছনে আরো নক্ষত্র, আরো নীহারিকা, তার কোনো শেষ নেই। আমার সামনে এই অসীম মহাকাশ যার শুরু নেই শেষ নেই।

লেন এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করল, মহামতি গ্রাউল স্থির হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, লেন সেই দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, অসীম মহাকাশের ব্যাপারটি আমার ছোট মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারল না। আমি ব্যাপারটি চিন্তা করতে পারলাম না। আমার মাথা ঘুরে উঠল, আমি চিৎকার করে আমার মায়ের কাছে ছুটে গেলাম। আমার মা আমাকে বুকে জড়িয়ে বলল, ভয় কী মা আমার! এই তো আমি।

গ্রাউলকে হঠাৎ কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, তুমি প্রশ্ন কর—

করছি। প্রশ্ন করছি। লেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রাউলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ছোট মস্তিষ্কটি যখন বিশাল একটি ব্যাপার সহ্য করতে পারছিল না, আমি সেখান থেকে বের হয়ে এসেছিলাম আমার মায়ের বুকের মাঝে আশ্রয় নিয়ে। আমি তার কথা শুনেছি, তার মুখের কোমল চেহারা দেখেছি, তার দেহের ঘ্রাণ, তার স্পর্শ অনুভব করেছি। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়—আমার মস্তিষ্ককে সেই ভয়ঙ্কর চিন্তা থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে—

গ্রাউল হঠাৎ ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বলল, তুমি কী বলতে চাও?

লেনের চোখ হঠাৎ শ্বাপদের মতো জ্বলতে থাকে। সে হিংস্র স্বরে বলল, তোমার চোখ নেই কান নেই। তোমার ঘ্রাণ নেয়ার নাক নেই, স্পর্শের অনুভূতি নেই, তোমার রয়েছে শুধু এক ভয়ঙ্কর মস্তিষ্ক। মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সেই মস্তিষ্কের ক্ষমতা সহস্র গুণ বেশি—দুর্বলতাগুলোও সহস্র গুণ বেশি। নিশ্চয়ই বেশি। সেই মস্তিষ্কে যদি হঠাৎ লাগামছাড়া ভয়ঙ্কর একটা ভাবনা এসে হাজির হয় তুমি কী করবে? কী করবে? কোন ইন্দ্রিয় তোমাকে রক্ষা করবে? কোন ইন্দ্রিয়?

গ্রাউলের চেহারা হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তার সবুজ মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে যায়, মুখগহ্বর থেকে ধারালো দাঁত, লকলকে জিভ বের হয়ে আসে। জড়ানো গলার স্বরে সে চিৎকার করে বলল, আসবে না—কোনো ভয়ঙ্কর ভাবনা আসবে না, আসবে না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। তাই তুমি মহাকাশযানের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকে তোমার পাশে এনে হাজির করেছ। যদি কখনো সেই ভয়ঙ্কর ভাবনা এসে হাজির হয় তুমি তোমার আশপাশে আটকে রাখা মস্তিষ্কের সাহায্যে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। তারা হবে তোমার মায়ের চেহারা? ঘ্রাণ? তার গলার স্বর? তার স্পর্শ!

লেন হঠাৎ হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসতে শুরু করে। তার অপ্রকৃতিস্থ হাসি সুড়ঙ্গের মতো সেই ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। মহামতি গ্রাউলের চেহারা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে তার মুখাবয়ব বিস্তৃত হতে হতে ঘরের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেই ভয়ঙ্কর চেহারা থেকে এক অবিশ্বাস্য আক্রোশ ফুটে বের হতে শুরু করে। লেন সেই ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলল, তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে ভয় পাব? তোমার দানবের চেহারা দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠব? না। আমি তোমাকে ভয় পাই না। এতটুকু ভয় পাই না! কারণ আমি জানি তুমি তোমার নিজের ভেতরের সেই ভয়ঙ্কর ভাবনার ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাক। তুমি ভীতু কাপুরুষ—তুমি অসহায় দুর্বল—তুমি তুচ্ছ! ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে ধ্বংস করে দিতে পারি। ধ্বংস করে দিতে পারি—

না! গ্রাউল হঠাৎ আর্তনাদ করে বলল, না!

হ্যাঁ। লেন হিংস্র গলায় বলল, হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমি তোমাকে এখন সেই প্রশ্নটি করব। যে প্রশ্নটির ভয়ে তুমি থরথর করে কাঁপছ। যে প্রশ্নটি করলে তুমি আমার চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে, আমি তোমাকে সেই প্রশ্নটি করব। লেন এক মুহূর্ত থেমে বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে তীব্র স্বরে বলল, তুমি আমাকে বল, তোমার সেই ভয়ঙ্কর ভাবনাটি কী? বল।

গ্রাউলের মুখাবয়ব হঠাৎ এক অবর্ণনীয় আতঙ্কে বিকৃত হয়ে যায়। চোখের মণি ঘোলাটে হয়ে আসে, মুখের মাংসপেশি থরথর করে কাঁপতে থাকে, তার লকলকে জিভ মুখ থেকে বের হয়ে আসে, মুখের কষ থেকে লোল গড়িয়ে পড়ে। সেই বিকৃত কাতর চেহারায় ভাঙা গলায় বলল, না—না—না—আমি সেটা ভাবতে চাই না—ভাবতে চাই না—

তোমাকে ভাবতে হবে! লেন চিৎকার করে বলল, ভাবতে হবে। ভাবতে হবে। ভেবে ভেবে আমাকে বলতে হবে। বলতে হবে।

না।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমাকে বল। লেন হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলল, বল।

গ্রাউল হঠাৎ পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। অবর্ণনীয় আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, একটা শিশু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে একটা রাস্তা। সেই রাস্তা দূর দিগন্তে গিয়ে এক বিন্দুতে মিলে গেছে। শিশুর হাতে একটা ফুলের ঝাঁপি। সেই ঝাঁপিতে সে রাস্তার পাশে থেকে বুনোফুল তুলছে। সেই ফুল নিয়ে সে ছুটে গিয়েছে সামনে আর দিগন্ত তখন আরো দূরে সরে গিয়েছে। শিশুটি আবার ফুল তুলেছে ঝাঁপিতে। আবার ছুটে গিয়েছে সামনে, দিগন্ত আরো দূরে সরে গিয়েছে। গ্রাউল হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, শিশুটির বুনোফুলের ঝাঁপি থেকে হঠাৎ সব ফুল ঝরে গেছে নিচে, শিশুটি ফুল তুলতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আবার চেষ্টা করছে—তারপর আবার ছুটে গেছে সামনে। তখন সেই দিগন্ত আবার সরে গেছে দূরে। শিশুটি ছুটে যেতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। পারছে না। হঠাৎ ফুলের ঝাঁপি থেকে সব ফুল ঝরে গেল নিচে। শিশুটি সেই ফুল কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। চেষ্টা করছে—চেষ্টা করছে—চেষ্টা করছে! পারছে কিন্তু পারছে না। ছুটে যাচ্ছে কিন্তু যেতে পারছে না। পারছে না—পারছে না—

AMARBOI.COM

গ্রাউলের কথা জড়িয়ে যায়, গোঙানোর মতো শব্দ করতে থাকে সে। চোখের মণি চোখ থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসতে থাকে, ঘোলাটে কালচে বেগুনি রঙের মতো চেহারা হয়ে আসে তার—নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। থরথর করে কাঁপছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে। অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে।

আমি লেনের দিকে তাকালাম, সে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো টলছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। টাল সামলে কোনোভাবে দুই পা এগিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলাম। সাথে সাথে সমস্ত মহাকাশযান নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল।

আমি লেনকে বুকে চেপে ধরে রেখে ফিসফিস করে ডাকলাম, লেন, জেগে ওঠ। দেখ—তুমি গ্রাউলকে ধ্বংস করে দিয়েছ! দেখ! দেখ!

লেন জেগে উঠল না। আমার বুকে অচেতন হয়ে পড়ে রইল।

৯

মহাকাশযানের বড় করিডোর ধরে মাঝারি ধরনের একটা ভাসমান যানে করে আমরা নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম। কয়দিনের মাঝে আমরাও শীতলঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে যাব, তার আগে শেষবার মহাকাশযানটা ঘুরে দেখছি। কিছুদিন আগেও অসংখ্য মানুষে পুরো এলাকাটা জনাকীর্ণ ছিল, এখন কেউ নেই। গ্রাউলের হাত থেকে কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়ে সাথে সাথে মহাকাশযানকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। যে লোভকে পুঁজি করে মানুষকে অমানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছিল সেই লোভের সামগ্রীকে হঠাৎ করে সবার কাছে সহজলভ্য করে দেয়া হয়েছে। তখন রাতারাতি মহাকাশযানের বিচিত্র জটিল সেই নৃশংস অমানবিক জীবনটি পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে গেছে। মহাকাশচারীদের আবার শীতলঘরে ফিরে যেতে বলা হয়েছে, কেউ প্রতিবাদ না করে স্বেচ্ছায় ফিরে গেছে। মহাকাশযানটিতে আবার সেই ভূতুড়ে নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে। পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আবার সবাইকে জাগিয়ে তোলা হবে, প্রাণচাঞ্চল্যে আবার ভরপুর হয়ে উঠবে এই বিশাল মহাকাশযান।

পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষ নিয়ে গ্রাউল সবার কাছে মিথ্যে তথ্য দিয়ে আসছিল। পৃথিবীর মানুষ নিজেদের মাঝে হানাহানি করছে সেটি সত্যি নয়। হানাহানি করার জন্যে পৃথিবীতে এখন কোনো মানুষ নেই। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতায় সমস্ত পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল, প্রায় দুই হাজার বছর আগে শেষ মানুষটি পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দিয়েছে। এই দুই হাজার বছর প্রকৃতি নিজের হাতে পৃথিবীকে আবার মানুষের বাসের যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। আবার সেখানে নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর সবুজ বনারণ্য গড়ে উঠেছে। আমরা সেখানে গিয়ে আবার নূতন করে মানবজীবন শুরু করব।

পৃথিবীর কথা ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়েছিলাম, লেন এসে আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি তার দিকে ঘুরে তাকালাম, তার ঝকঝকে খাপখোলা চেহারা দেখে আবার আমার বুকের ভেতর এক ধরনের বেদনা বোধ হতে থাকে। লেন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ?

না। কিছু না।

আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা বেঁচে আছি।

আমি হেসে বললাম, আসলে আমরা বেঁচে নেই। এই পুরো ব্যাপারটা আসলে মহামতি গ্রাউলের অত্যাশ্চর্য মস্তিষ্কের একটা স্বপ্নদৃশ্য। এক্ষুনি তার ঘুম ভেঙে যাবে, তখন—

লেন আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, দোহাই তোমার। গ্রাউলের কথা বোলো না।

সে কেমন আছে শুনবে না?

না, শুনতে চাই না।

বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। পুরোপুরি উন্মাদ—

লেন কাতর গলায় বলল, আমি শুনতে চাই না।

আমি লেনকে নিজের কাছে টেনে এনে বললাম, কেন শুনতে চাও না? কী আশ্চর্য শক্তিতে তুমি তাকে পরাস্ত করে পুরো মহাকাশযান আর তার হাজার হাজার মহাকাশচারীকে রক্ষা করেছ সেটা শুনবে না?

না। আমি শুনব না। আমি সবকিছু ভুলে যেতে চাই।

ঠিক তখন পিছনে কিছু একটা ভেঙে পড়ার শব্দ হল এবং সাথে সাথে একাধিক শিশুর উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। লেনের মুখে অধৈর্যের একটা ছায়া পড়ে, সে কাতর গলায় বলল, ওই দেখ আবার শুরু করল ওরা! কী করি ওদের নিয়ে বল তো?

আমি হেসে বললাম, মানুষের একসাথে একটি করে সন্তান থাকার কথা। সেই একটি সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে বাবা-মায়ের কালো ঘাম ছুটে যায়। তোমার সন্তান হচ্ছে আটটি। এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই লেন। এরা আগে কথা জানত না তখন তবু সামলে নেয়া যেত। এখন ওরা কথা শিখেছে, ওদেরকে আর কোনোভাবে সামলে নেয়া যাবে না। তুমি কিছুদিনে পাগল হয়ে যাবে লেন।

আমি একা কেন? তুমিও পাগল হয়ে যাবে।

হ্যাঁ। আমিও মনে হয় পাগল হয়ে যাব—

আমার কথা শেষ হবার আগেই শিশুগুলো হুটোপুটি করতে করতে আমাদের কাছে হাজির হল। তারা কয়েকজন মিলে একজনকে নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, যারা ফেলছে এবং যাকে ফেলছে সবারই এক ধরনের বিচিত্র উল্লাস হচ্ছে বলে মনে হয়। লেন বৃথাই তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, কী হচ্ছে? কী হচ্ছে ওখানে?

খেলছি।

কী খেলছ?

খেলছি আমরা পৃ'তে গিয়েছি।

পৃ?

হ্যাঁ। পৃ মানে পৃথিবী!

আমি সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেললাম। এই শিশুরা আমাদের জন্যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে। ভালবাসাময় আনন্দের একটা পৃথিবী।

নতুন পৃ।

রবোনগরী

উৎসর্গ
প্রিয় চিত্রপরিচালক
মোরশেদুল ইসলাম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান

কিয়া তৃতীয়বারের মতো খাবার টেবিলটি পরিষ্কার করে আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ক্রল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিয়া, তুমি আর কত রান্না করবে? বাকিটুকু ট্রনের হাতে ছেড়ে দাও।

ট্রন সংসারের সাহায্যকারী রবোট, কাজকর্মে কিয়া বা ক্রল দুজনের থেকেই অনেক বেশি পারদর্শী। কিয়া ক্রলের কথায় কান না দিয়ে বলল, কী বলছ তুমি? এতদিন পরে আমার ছেলে আসছে আর আমি নিজের হাতে কিছু রান্না করব না?

তোমার ছেলের বয়স আট, তার জন্যে তুমি আর কত রান্না করবে?

কিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমার ছেলে—আমি তাকে পেটে ধরেছি, তাকে আমি দেখি বছরে মাত্র একবার, তাও কয়েক ঘণ্টার জন্য! আমি জানি সে কিছু খাবে না, কিন্তু তবু তার জন্যে রান্না করতে আমার ভালো লাগে।

ক্রল হার মেনে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই যদি তোমার ভালো লাগে তাহলে সেটাই কর।

কিয়া কপালের উপর ঘামে ভেজা চুলগুলো সরিয়ে বলল, তুমি দেখ তার ঘরে যে নূতন খেলনাগুলো কিনেছি, সবগুলো ঠিক করে রাখা আছে কি না।

দেখছি।

ক্রল একটা নিশ্বাস ফেলে তাদের সন্তানের জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরটিতে হাজির হল। কখনো সে এখানে রাতে ঘুমায় নি, কখনো ঘুমাবে না, কিন্তু তবু এখানে তার জন্যে একটা বিছানা আলাদা করে রাখা আছে, পাশে ছোট টেবিল, টেবিলের পাশে ছোট চেয়ার। দেয়ালে রঙিন ছবি, উপর থেকে ঝুলছে নানা ধরনের মোবাইল, ঘরের একপাশে খেলনার বাক্স, নানারকম খেলনায় উপচে পড়ছে। মেঝেতে নরম কার্পেট, জানালায় রঙিন পরদা। দেয়ালে ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ছবি, ক্ষণে ক্ষণে সেইসব ছবি পাল্টে যাচ্ছে। ঘরের দেয়ালে লুকানো স্পিকার থেকে শোনা-যায়-না এ রকম নরম সুরে কোমল সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। ঘরের ভিতরে একটি শিশুর আনন্দের জন্যে সবকিছু রয়েছে, যেটা নেই স্টো হচ্ছে শিশুটি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুল উবু হয়ে বসে নতুন খেলনার বাক্সগুলো খুলে ভিতর থেকে খেলনাগুলো বের করতে থাকল। তাদের ছেলে আসবে সকাল দশটায়, চলে যাবে তিন ঘণ্টা পর, তার মাঝে সে কি এই খেলনাগুলো স্পর্শ করার সময় পাবে? ক্রুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কী প্রয়োজন ছিল এই সভ্যতার যেখানে একটি শিশুকে কার্যক্ষম মানুষ হিসেবে বড় করবার দায়িত্বটুকু নিতে হয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে? কেন তাকে সরিয়ে নিতে হয় মা-বাবার কাছে থেকে? কেন সে প্রাচীনকালের মানুষের মতো মা-বাবার স্নেহে, আদরে, আবদারে, শাসনে, ভালবাসায় বড় হতে পারে না? সত্যিই কি প্রাচীনকালের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ? কী প্রমাণ আছে পৃথিবীর মানুষের কাছে?

ঠিক দশটার সময় ক্রুল এবং কিয়ার বাসার সামনে একটা ভাসমান গাড়ি এসে থামল। নিঃশব্দে গাড়ির পিছনে একটা দরজা খুলে গেল এবং ভিতর থেকে বের হয়ে এল কোমল চেহারার একটি শিশু। সাত-আট বছরের শিশুটি একবার চারদিকে তাকিয়ে বাসার দরজার দিকে হেঁটে আসতে থাকে। সাথে সাথে দরজা খুলে কিয়া প্রায় ছুটে বের হয়ে এসে শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। শিশুটি তার মায়ের বুকে মুখ গুঁজে বলল, মা তুমি ভালো আছ?

কিয়া শিশুটিকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে রেখে বলল, হ্যাঁ বাবা। তুই ভালো আছিস?

আছি মা। বাবা কোথায়?

ওই যে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রুল তখন সামনে এগিয়ে এল। শিশুটি তার মাকে ছেড়ে বাবার দিকে এগিয়ে যায়, কাছে গেলে বাবা গভীর ভালবাসায় তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

শিশুটিকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল বাবা-মা। তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দুজন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তারা তাদের সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকে, গভীর ভালবাসায় স্পর্শ করে, চুলে হাত বুলায়। শিশুটি মুখে একটু লাজুক হাসি নিয়ে বসে থাকে, এতদিন পরে বাবা-মাকে দেখে যেন ঠিক বুঝতে পারে না কী করবে।

কিয়া হঠাৎ আরো একবার গভীর ভালবাসায় শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাদের কথা তোর মনে আছে বাবা?

আছে মা।

কেমন করে মনে আছে? এক বছর পর পর তুই মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমাদের কাছে আসিস—

কিন্তু মা, আমাদের মস্তিষ্কে তোমাদের নিয়ে স্টিমুলেশান দেয়া হয়। আমরা রাতে যখন ঘুমাতে যাই তোমাদের দেখি, তোমাদের কথা শুনি—

কিন্তু সেটা কি সত্যি দেখা হল?

হ্যাঁ মা, সেটা সত্যির মতো।

তুই যখন আমাকে দেখিস তোর ভালো লাগে?

হ্যাঁ মা, ভালো লাগে। আমার যখন মন খারাপ হয় তখন আমি তোমার কথা ভাবি।

কিয়ার চোখে হঠাৎ এক ধরনের আশঙ্কার ছাপ পড়ে, তোর মন খারাপ হয় বাবা?

শিশুটি একটু হেসে বলল, কেন হবে না মা? সবার মন খারাপ হয়। এমনিতেই মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়, তাছাড়া আমাদের মাঝে মাঝে মন খারাপ করিয়ে দেয়া হয়।

ক্রুল উদ্বিগ্ন মুখে বলল, কেন বাবা? কেন তোদের মন খারাপ করিয়ে দেয়া হয়?

শিশুটি হেসে বলল, বাবা, আমাদের শুধু মন খারাপ নয়; আমাদের রাগ, দুঃখ, আনন্দ, হিংসা—সবকিছু শেখানো হয়। যখন তোমাদের খুব মন খারাপ থাকে তোমরা কোনো কাজ করতে পার?

না বাবা, পারি না।

আমরা পারি। শিশুটি উজ্জ্বল চোখে বলল, আমাদের যখন মন খারাপ হয় আমরা তখনো কাজ করতে পারি। আমাদের যখন অনেক আনন্দ হয় কিংবা রাগ হয় তখনো আমরা কাজ করতে পারি।

কেমন করে করিস, বাবা?

আমাদের মস্তিষ্কে স্টিমুলেশান দেয়া হয়। স্টিমুলেশান দিয়ে আমাদের মন খারাপ করানো হয়, যখন খুব মন খারাপ হয় তখন আমাদের কাজ করতে দেয়া হয়। সেটা আরেক রকম স্টিমুলেশান।

কী কাজ করিস তোরা?

নানারকম কাজ। আমাদের কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি পড়তে হয়, সুপার কন্ডাক্টিভিটি শিখতে হয়। নানা রকম মডেল থাকে, টেকনিক্যাল প্রজেক্ট করতে হয়—

তোরা সব করতে পারিস?

শিশুটি লাজুক হাসি হেসে বলল, পারি মা। আমি গত পরীক্ষায় সবগুলো বিষয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি। ব্ল্যাকহোল কেমন করে এসেছে তার ওপর আমার একটা পেপার জার্নালে ছাপা হয়েছে।

পুত্রগর্বে গর্বিত মা তার আদরের শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

শিশুটি তার ঘরে ঘুরে বেড়াল, তার জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরটিতে তার খেলনাগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। তার বিছানায় পা দুলিয়ে বসে হলোগ্রাফিক ছবি দেখল। মায়ের পিছু পিছু হেঁটে হেঁটে টেবিলে খাবার এনে দিল। গৃহস্থালি রবোট ট্রনের সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করল, বাবার ঘাড়ে উঠে ঘরময় ছুটে বেড়াল।

দুপুরে কিয়া, ক্রল এবং শিশুটি একসাথে বসে খেল। শিশুটি খাওয়ার ব্যাপারে একটু খুঁতখুঁতে—অনেক রকম খাবার রান্না হয়েছে তবু কোনোটাই তৃপ্তি করে খেল না। সবগুলো থেকে একটু একটু করে খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে উঠে পড়ল।

কিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল, যে কয়েক ঘণ্টা সময়ের জন্যে সে এক বছর থেকে অপেক্ষা করছে সেই সময়টা শেষ হয়ে আসছে। আবার এক বছর পর তার সন্তানটি কয়েক ঘণ্টার জন্যে আসবে। গভীর বেদনায় তার বুকটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যেতে চায়।

শিশুটি কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে তার জুতোগুলো পরে নেয়। হাতের ছোট ব্যাগটি তুলে নিয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আসি মা?

মা চোখের অশ্রু ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে শেষবার আলিঙ্গন করে বলল, আয় বাবা।

শিশুটি ক্রলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আসি বাবা।

ক্রল শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আয় বাবা। ভালো হয়ে থাকিস।

শিশুটি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সাবধানে চোখের পানি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে নেয়। ভাসমান গাড়িটার কাছাকাছি যেতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। শিশুটি মুখ ঘুরিয়ে একবার

পিছনে তাকিয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে যেতেই নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় সাথে সাথেই ভাসমান গাড়িটা ছোট একটা গর্জন করে উপরে উঠে যায়।

*   *   *   *   *

শিশুটি ম্লান মুখে একটা ছোট চেয়ারে বসে আছে। পাশে দাঁড়ানো মধ্যবয়স্ক একজন লোক নরম গলায় বলল, মন খারাপ লাগছে?

শিশুটি কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল।

এক্ষুনি তোমাকে আনন্দের স্টিমুলেশান দেয়া হবে তখন তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। যাবে না?

শিশুটি আবার মাথা নাড়ল।

তার আগে তোমাকে ডাউনলোড করতে হবে, মনে আছে?

শিশুটি একটা নিশ্বাস ফেলে শোনা-যায়-না এ রকম গলায় বলল, মনে আছে।

তাহলে দেরি করে কাজ নেই। এস, শুয়ে পড়।

শিশুটি বাধ্য ছেলের মতো এসে পাশে রাখা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মৃদু গুঞ্জন করে মাথার উপরে একটা চতুষ্কোণ যন্ত্র নেমে আসতে থাকে, লাল একটা বাতি জ্বলে ওঠে এবং উচ্চ কম্পনের একটা তীক্ষ্ণ শব্দের গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে। শিশুটি ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ভাসমান গাড়ির সামনে থেকে সোনালি চুলের একজন কমবয়সী মেয়ে এগিয়ে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ডাউনলোড শুরু হয়েছে?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, হ্যাঁ।

এখন কাকে ডাউনলোড করছ?

পরের জনকে। শহরতলিতে থাকে বাবা-মা, এক শ এগার তলা এপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের ছিয়ানব্বই তলায়।

কতক্ষণের জন্যে পাবে বাচ্চাটাকে?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি মনিটরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বাবা-মা পাবে দু ঘণ্টার জন্যে।

বাচ্চার চেহারার পরিবর্তন করতে হবে?

হ্যাঁ। চোখগুলো এখন হবে নীল, চুলটা হবে লালচে।

কাজ শুরু করে দেব?

হ্যাঁ দাও। বাবা-মা এক বছর থেকে অপেক্ষা করছে, তাদের আরো অপেক্ষা করানো ঠিক হবে না।

সোনালি রঙের চুলের মেয়েটি বলল, ঠিকই বলেছ।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় অনুভূতি

প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী জেনারেল রাউলের মনমেজাজ বেশি ভালো নয়। যে ব্যাপারটি সবার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবার কথা সেটি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সবার কাছে গোধূলিলগ্নের মতো অস্পষ্ট। পৃথিবীর ইতিহাসে একবার চোখ বুলালেই স্পষ্ট দেখা যায় এর

সভ্যতা গড়ে উঠেছে ছাড়া-ছাড়াভাবে—গুটিকতক মানুষ দিয়ে। প্রাচীন মিসরে ফারাওরা ছিল সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, দেশের সাধারণ মানুষেরা ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মতো। ফারাও আর পুরোহিতেরা মিলে নীলনদের অববাহিকায় বিশাল সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া-ইনকা সভ্যতাও সেরকম। ক্ষমতাবান রাজপুরুষেরা গুটিকতক মানুষ নিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, ঠিক তখন সাধারণ মানুষের বুক কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে রুটিনমতো সূর্যদেবতার উপাসনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপারটা আরো সুসংহত করা হল। বিশ্বের বেশিরভাগ অংশকে নাম দেয়া হল তৃতীয় বিশ্ব। সেখান থেকে বেছে বেছে যারা প্রতিভাবান তাদের ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হল উন্নত বিশ্বে। সেখানে গুটিকতক মানুষ মিলে নূতন সভ্যতার জন্ম দিল। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য নূতন করে জন্ম নিল এই নূতন বিশ্বে।

জেনারেল রাউল একটা নিশ্বাস ফেললেন, সব সময়েই তাই হয়েছে তবু কেন সবাই এই সত্যিটা স্বীকার করতে চায় না কে জানে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং ইতিহাসে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে পৃথিবীতে সবসময় গুটিকতক মানুষ—যারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং সুদর্শন তারা সভ্যতার দিকনির্দেশ করে। অন্য সবাই তুচ্ছ এবং সাধারণ। ব্যাপারটির গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে পেরেছিলেন একজন সত্যিকারের কালজয়ী পুরুষ, দিকদ্রষ্টা, তার নাম ছিল এডলফ হিটলার। তিনিই প্রথমে আঁচ করেছিলেন যে শ্রেষ্ঠ প্রজাতি বলে একটা প্রজাতি থাকা সম্ভব। কিন্তু এই কালজয়ী পুরুষের জন্ম হয়েছিল সময়ের অনেক আগে। পৃথিবীর মূর্খ অর্বাচীন আর প্রাচীনপন্থী সমাজব্যবস্থার কারণে এই ক্ষণজন্মা পুরুষকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, তাকে অপমান আর কলঙ্ক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

আজ পঞ্চবিংশ শতাব্দীতে এডলফ হিটলারের স্বপ্ন আবার সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার যে সমস্যা ছিল এখন আর সেই সমস্যা নেই। সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র অপসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে এখন একটিমাত্র রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা এখন সারা বিশ্বে, যারা এই রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আছেন তারা আক্ষরিক অর্থে সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী হচ্ছেন জেনারেল রাউল, তার দায়িত্ব যেরকম বিশাল, ক্ষমতাও সেরকম আকাশছোঁয়া। দায়িত্ব হচ্ছে নেশার মতো আর ক্ষমতাটি হচ্ছে সেই নেশার মাদক। দায়িত্বের এই প্রচণ্ড নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রাউল সাধারণ একজন জেনারেল থেকে আজ বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী। ব্যাপারটি ছেলেখেলা নয়। কিন্তু এই প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী জেনারেল রাউলের মনটি বেশি ভালো নয়, ঠিক যেভাবে সবকিছু কাজ করার কথা সেভাবে কাজ করছে না। মানুষকে ইতিমধ্যে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাদেরকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে, সব রকম সুযোগ সুবিধে এবং ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যারা সাধারণ, যারা তুচ্ছ যারা, অসুন্দর অমার্জিত তাদেরকে এর মাঝে পৃথিবীর অনুন্নত এলাকায় আটকে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের মাঝে এই পার্থক্যটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে উন্নত শ্রেণীর মানুষের জিনেটিক কোডকে আইন করে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এই মানুষদের নাম দেয়া হয়েছে ড়ন সম্প্রদায়। জিনেটিকভাবে তুচ্ছ এবং সাধারণ মানুষদের পৃথিবীর অনুন্নত জায়গায় আটকে রেখে ড়ন সম্প্রদায়কে তাদের যোগ্য স্থানে নিয়ে আসা; জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য প্রযুক্তির সুযোগ করে দেয়াই হচ্ছে এই শতাব্দীর মূল লক্ষ্য। পৃথিবীর সম্পদ কমে আসছে, সবাইকে সবকিছু দেয়া সম্ভব নয়, যার

যেটুকু প্রয়োজন তাকে ঠিক ততটুকু দেয়া হবে। ড়ন সম্প্রদায় উচ্চতর মানব সম্প্রদায়, তারা বেশি পাবে—সেটি অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক সত্য, কিন্তু এটি একটি বিচিত্র কারণে সবার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট নয়। সাধারণ এবং তুচ্ছ মানুষেরা কিছুতেই সেটা মেনে নিতে চাইছে না, তারা সমান অধিকারের কথা বলছে, সারা পৃথিবীতে সেটা নিয়ে বিশৃঙ্খলা। জেনারেল রাউল শক্ত হাতে সেটাকে দমন করে যাচ্ছেন কিন্তু কাজটি দিনে দিনে সহজ না হয়ে আরো কঠিন হয়ে আসছে।

অফিসে বসে জেনারেল রাউল দীর্ঘ সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকালেন, সেগুলো এক নজর দেখে তিনি তার সেক্রেটারি নুবাকে ডেকে পাঠালেন। নুবা কমবয়সী হাসিখুশি একজন অত্যন্ত চৌকস মেয়ে, জেনারেল রাউল নানাভাবে নুবার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

নুবা ঘরে ঢুকে অভিবাদন করে কোমল গলায় বলল, আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। জেনারেল রাউল টেবিলের উপরে রাখা কাগজগুলো সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, টাউনশিপগুলোতে আবার নূতন করে হাঙ্গামা হচ্ছে?

জি। নুবা মাথা নেড়ে বলল, হাঙ্গামা হচ্ছে।

আমি যে শক্ত হাতে থামানোর কথা বলছিলাম তার কী হল?

সেটাও করা হচ্ছে জেনারেল। তারপরেও হচ্ছে। মানুষজনের ভয়ভীতি আজকাল কমে গিয়েছে।

প্রজেক্টগুলোর কী খবর?

ভালোই। প্রজেক্ট এক্স শেষ হবার দিকে। টাউনশিপগুলোতে খাবারের চালান আটকে দেয়া হয়েছে। খবরে প্রকাশ করা হয়েছে তাদের নিজেদের মাঝে গোলমালের জন্যে এটা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সংবাদ মিডিয়াগুলো আমাদের খুব চমৎকারভাবে সাহায্য করছে। পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

AMARBOI.COM

প্রজেক্ট শূন?

সেটা মাত্র শুরু করা হয়েছে। জেলখানা থেকে এখন পর্যন্ত দশ হাজার ঘাঘু অপরাধী ছাড়া হয়েছে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। নানারকম অপরাধে পুরো এলাকাটা মোটামুটিভাবে বিষাক্ত করে দেয়া হয়েছে। সংবাদ মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করেছি যে সাধারণ মানুষ আসলে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তারা অসম্পূর্ণ মানুষ এবং তারা অপরাধপ্রবণ।

বিশ্ব কনফারেন্সের কী খবর?

ভালোভাবে চলছে জেনারেল। আগামীকাল বিজ্ঞানীদের প্যানেলে মূল পেপারটা পড়া হবে। সেখানে বলা হবে ড়ন সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ থেকে অন্তত এক শ গুণ উন্নত। তার নানারকম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেয়া হবে। পেপারটার একটি কপি এর মাঝে গোপনে তথ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

জেনারেল রাউল চিন্তিত মুখে গাল চুলকাতে চুলকাতে বললেন, সবকিছু পরিকল্পনামতো হচ্ছে কিন্তু তবু এই তুচ্ছ সাধারণ মানুষদের মনোবল ভেঙে দেয়া যাচ্ছে না কেন? এরা দুর্বল হচ্ছে না কেন?

নুবা ইতস্তত করে বলল, আমার মনে হয় এর সাথে এদের স্বপ্ন মেশিনের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

স্বপ্ন মেশিন?

জি।

সেটা কী?

অল্প কিছুদিন হল একটা রিপোর্টে এটার খোঁজ পাওয়া গেছে। অত্যন্ত হাস্যকর একটা যন্ত্র। যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কের মাঝে বাইরে থেকে এক ধরনের স্টিমুলেশান দেয়া হয়। পুরো জিনিসটা একটা হেলমেটের মতো। সেটা যখন মাথায় লাগানো হয় তখন মানুষ নাকি স্বপ্ন দেখে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন?

জি।

জেনারেল রাউলের ভুরু কুঞ্চিত হল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই যন্ত্র তাদের হাতে কেমন করে গেল?

নুবা ইতস্তত করে বলল, তাদের হাতে যায় নি। তারা নিজেরাই তৈরি করেছে।

জেনারেল রাউল সোজা হয়ে বসে বললেন, তারা নিজেরা তৈরি করেছে? অশিক্ষিত মূর্খ অমার্জিত মানুষেরা একটা যন্ত্র তৈরি করেছে?

জি জেনারেল। তাদের মাঝে নাকি একজন বিজ্ঞানী রয়েছে। তার নাম ক্রিটি। সে-ই তৈরি করেছে।

ক্রিটি? সে বিজ্ঞান শিখেছে কেমন করে? তার তো বিজ্ঞান শেখার কথা নয়।

নিজে নিজে শিখেছে।

নিজে নিজে? নিজে নিজে বিজ্ঞান শেখা যায়?

তাই তো দেখছি।

জেনারেল রাউলের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, নুবা, আমি এই মানুষটির সাথে কথা বলতে চাই। একটা স্বপ্ন মেশিনসহ তাকে এখানে হাজির কর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

* * * * *

ক্রিটি বিশাল হলঘরে সোজা হয়ে বসে আছে। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের নিচে কালি, পোশাক জীর্ণ এবং মলিন। এই বিশাল হলঘরের অপরিচিত ঐশ্বর্যের মাঝে সে সম্পূর্ণ বেমানান এবং সে নিজেও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তার সামনে টেবিলের উপর একটা স্বপ্ন মেশিন এবং সেটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি মিউজিয়াম থেকে প্রাচীনকালের হাস্যকর একটা যন্ত্র তুলে এনেছে। বিশাল হলঘরের মাঝ দিয়ে যারা যাচ্ছে এবং আসছে, সবাই ভুরু কুঁচকে ক্রিটির দিকে তাকাচ্ছে এবং তার এই বিচিত্র যন্ত্রটিকে দেখছে। মানুষটি জেনারেল রাউলের আহ্বানে এসেছে, না হয় অনেক আগেই তাকে এখান থেকে বের করে দেয়া হত।

জেনারেল রাউল নিজের ঘরে বসে থেকে মনিটরে তীক্ষ্ণ চোখে ক্রিটিকে লক্ষ করছিলেন। এই মানুষটি সমাজের সবচেয়ে নিচু এলাকায় মানুষ হয়েছে, অনাহারে-অর্ধাহারে শৈশব কাটিয়েছে, সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে পড়তে শিখেছে, সবরকম প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞান শিখেছে এবং জঞ্জাল ঘেঁটে পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে একটা স্বপ্ন মেশিন তৈরি করেছে। সেই স্বপ্ন মেশিন যে মানুষ একবার মাথায় পরে স্বপ্ন দেখেছে তাকে আর কোনোদিন ধ্বংস করা যায় না। কী বিচিত্র একটি ব্যাপার! জেনারেল রাউল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নুবাকে ডেকে বললেন, মানুষটাকে তার যন্ত্রটা নিয়ে আসতে বল।

কয়েক মিনিটের মাঝেই নুবা ক্রিটিকে নিয়ে জেনারেল রাউলের ঘরে হাজির হল। মনিটরে মানুষটিকে যেরকম মলিন দেখা যাচ্ছিল সামনাসামনি সে মোটেও সেরকম নয়। তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উষ্কখুষ্ক চুল এবং জীর্ণ পোশাকের মাঝেও কেমন জানি এক ধরনের তেজস্বিতা রয়েছে। জেনারেল রাউল সাধারণ মানুষের মাঝে তেজস্বিতা পছন্দ করেন না— সাধারণ মানুষ হবে ভীত এবং নম্র। তাদের মাঝে থাকবে দ্বিধা এবং সংশয়। তারা হবে কাপুরুষ। কিন্তু এই মানুষটির মাঝে সেরকম কিছু নেই এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে জেনারেল রাউল নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, বসুন।

মানুষটি খুব সহজ ভঙ্গিতে তার সামনের চেয়ারটিতে বসল।

জেনারেল রাউল একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই মেশিন তৈরি করেছেন?

হ্যাঁ।

এর জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আপনাকে কে দিয়েছে?

কেউ দেয় নি। আমি জোগাড় করেছি।

আপনি জানেন এটা বেআইনি?

ক্রিটি হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, না, এটা বেআইনি নয়। আমাদের এলাকায় আপনাদের এলাকার সমস্ত জঞ্জাল ফেলা হয়। সেইসব জঞ্জালে নানা ধরনের ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি রয়েছে আমি সেইসব ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে এটা তৈরি করেছি।

এটা কীভাবে কাজ করে?

ক্রিটি একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, আপনি জানতে চাইলে আপনাকে বলতে পারি, কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন কি না আমি জানি না। মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে, নিউরনের মাঝে দিয়ে কীভাবে তথ্য-সঙ্কেত আদান-প্রদান করে সেসব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না।

জেনারেল রাউল নিজের ভিতরে অপমানের একটা সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করলেন, অনেক কষ্টে সেটা সহ্য করে শান্ত গলায় বললেন, আপনি বলুন, আমি বুঝতে চেষ্টা করব।

মানুষের মস্তিষ্কে তথ্যের আদান-প্রদান করা হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সঙ্কেত দিয়ে, এই সঙ্কেত অনেকদিন থেকেই যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপা হয়ে আসছে। আমি পদ্ধতিটি একটু উন্নত করেছি। পরিত্যক্ত জঞ্জালে আমি কমিউনিকেশানের কিছু মডিউল থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সিগনাল গ্রহণ করতে পারে এ রকম কিছু যন্ত্র নিয়ে এসেছি। তার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু এমপ্লিফায়ার এনেছি পরিত্যক্ত কিছু ভিডিও সেট থেকে। দুটো বসিয়ে একটা সার্কিট তৈরি করেছি। যদি কোনো মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কম্পনের সাথে সেটা টিউন করা যায় তাহলে তার মস্তিষ্কে কী ধরনের তথ্য আদান-প্রদান হচ্ছে সেটা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করার একটা উপায় বের করেছি।

জেনারেল রাউল একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে একটা মানুষ কী নিয়ে চিন্তা করছে সেটা এই যন্ত্র বলতে পারে?

ক্রিটি আবার হেসে ফেলল। হাসি থামিয়ে বলল, খুব সোজা করে যদি বলতে চান তাহলে বলতে পারেন! কিন্তু আপনি তো জানেন চিন্তার খুঁটিনাটি কী অসম্ভব জটিল ব্যাপার। সেই পর্যায়ে এখনো যেতে পারি নি—আমরা যে পরিবেশে থাকি সেখানে কোনোদিন যেতে পারব বলে মনে হয় না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় চিন্তাটা কি আনন্দের না দুঃখের, রাগের না অভিমানের।

জেনারেল রাউলকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, ইতস্তত করে বললেন, তাহলে এটাকে স্বপ্ন মেশিন বলে কেন?

ক্রিটি মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না এটাকে কেন স্বপ্ন মেশিন বলে—এর মাঝে স্বপ্নের কিছু নেই। তবে আমার মনে হয় এই যন্ত্রটাতে যখন ফিডব্যাক সার্কিট লাগানো হল তখন হঠাৎ করে এটার সত্যিকারের একটা ব্যবহার শুরু হয়েছে।

কী ব্যবহার?

মনে করা যাক, কারো মনে একটা আনন্দের অনুভূতি হয়েছে এবং এই যন্ত্র সেটি ধরতে পেরেছে। তখন বাইরে থেকে মস্তিষ্কের ভিতরে খুব ছোট একটা স্টিমুলেশান দেয়া হয়। দেখা হয় এই স্টিমুলেশান দেয়ার ফলে মস্তিষ্কে আনন্দের অনুভূতি কি বাড়ছে না কমছে। যদি বাড়তে থাকে তাহলে সেটা আরো বেশি করে দেয়া হয়, তখন আনন্দের অনুভূতিটা আরো বেড়ে যায়, তখন আরো বেশি স্টিমুলেশান দেয়া হয়। কাজেই মনের ভিতরের ছোট একটা আনন্দের অনুভূতি থেকে শুরু করে তীব্র একটা আনন্দ সৃষ্টি করা যায়। ভয়ঙ্কর তীব্র একটা আনন্দ যারা সেটা অনুভব করেছে শুধু তারাই জানে কী অসাধারণ সেই অনুভূতি!

জেনারেল রাউল তীক্ষ্ণ চোখে ক্রিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বললেন, ড্রাগসের মতো?

ক্রিটি থতমত খেয়ে বলল, কিসের মতো?

ড্রাগস। মাদকদ্রব্য। মানুষ যখন তার শিরার মাঝে সিরিঞ্জ দিয়ে ভিচুবিয়াস ঢুকিয়ে দেয় তখন তাদের যেরকম তীব্র আনন্দ হয় সেরকম?

ক্রিটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, অনেকটা সেরকম। তবে মাদকদ্রব্যের সাথে এর একটা খুব বড় পার্থক্য রয়েছে, এতে কোনো নেশা হয় না। একবার স্বপ্ন মেশিন ব্যবহার করলে বার বার সেটা ব্যবহার করার জন্যে কেউ খেপে ওঠে না।

কেন?

কারণ এই তীব্র অনুভূতি সাময়িক নয়। এই অনুভূতি মস্তিষ্কে আনন্দের একটা পাকাপাকি ছাপ রেখে যায়। তাছাড়া মাদকদ্রব্যের মতো এই অনুভূতি শুধু এক ধরনের নয়। এই যন্ত্র দিয়ে আপনি যে–কোনো ধরনের অনুভূতি পেতে পারেন। যদি মনের ভিতরে অল্প একটু পবিত্র ভাব জন্ম নেয় সেটা থেকে তীব্র গভীর একটা পবিত্র ভাব আসে। যদি এক ধরনের সুখের অনুভূতি হয় সেটা থেকে তীব্র একটা সুখের অনুভূতির জন্ম হয়। যদি কোনোভাবে মনের মাঝে অল্প একটু প্রশান্তির জন্ম হয় সেখান থেকে গভীর প্রশান্তির জন্ম দেয়া যায়। মনের ভিতরে যদি অল্প একটু আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেয়া যায় সেটা থেকে তৈরি হয় গভীর প্রচণ্ড একটা আত্মবিশ্বাস। অল্প একটু আশা থেকে বুকের ভিতরে নূতন আশার বান ডেকে যায়। সেইসব অনুভূতি এত তীব্র যে তাকে বলা যায় সম্পূর্ণ নূতন এক ধরনের অনুভূতি। পৃথিবীর মানুষের সেই অনুভূতির সাথে পরিচয় নেই।

জেনারেল রাউল মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি। এটা একটা অনুভূতি তীব্র করার যন্ত্র। কিন্তু এখনো বুঝতে পারলাম না কেন এর নাম স্বপ্ন মেশিন?

ক্রিটি একটু হেসে বলল, যখন মানুষেরা নানা দুঃখ কষ্ট হতাশায় ডুবে যায় তখন তারা এ রকম একটা যন্ত্রের কাছে আসে। এটা মাথায় লাগিয়ে বসে। তার ভিতরে তখন কোনোভাবে একটা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করা হয়। ছোট একটা আশার বাণী বলা হয়। সেটা থেকে তার ভিতরে জন্ম নেয় বিশাল এক উৎসাহ। সত্যিকারের একটা স্বপ্ন জেগে

ওঠে তার বুকে। মনে হয় সে জন্যেই এর নাম দিয়েছে স্বপ্ন মেশিন।

জেনারেল রাউল থমথমে মুখে খানিকক্ষণ বসে রইলেন তারপর জিজ্ঞেস করলে আপনাদের এলাকায় এ রকম যন্ত্র কয়টা রয়েছে?

আমি ঠিক জানি না। কীভাবে তৈরি করা যায় সেটা গোপন কিছু নয়, আমি সবাইকেই বলে দিই। ছোটখাটো জঞ্জাল থেকে তৈরি হয় বলে অসংখ্য যন্ত্র রয়েছে। তার মাঝে কি কিছু কাজ করে, কিছু করে না। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয়।

জেনারেল রাউল হাত দিয়ে টেবিলের উপরে রাখা বিচিত্র যন্ত্রটাকে দেখিয়ে বললেন এটা কি সত্যিকারভাবে কাজ করে?

করে।

আমাকে দেখাতে পারবেন?

ক্রিটি একটু অবাক হয়ে জেনারেল রাউলের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, আপনি সত্যি দেখতে চান?

হ্যাঁ, চাই।

ক্রিটি টেবিলের উপর থেকে হেলমেটের মতো একটা জিনিস তুলে জেনারেল রাউলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, প্রথমে এটা আপনার মাথায় পরতে হবে।

জেনারেল রাউল একটু ইতস্তত করে বললেন, না, প্রথমে আমি নিজে এটা পরতে চাই না। প্রথমে অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করানো যাক।

রাউল ঘুরে নুবার দিকে তাকিয়ে বলল, কী বল নুবা?

নুবা মাথা নাড়ল, বলল, নিরাপত্তার দিক থেকে চিন্তা করে সেটা মনে হয় ঠিকই বলেছেন।

কাকে দিয়ে পরীক্ষা করানো যায়?

নুবা বলল, আপনার আপত্তি না থাকলে আমি এটা পরতে পারি। এটা সম্পর্কে এত চমৎকার সব রিপোর্ট এসেছে যে আমার এমনিতেই খুব কৌতূহল হচ্ছে।

জেনারেল রাউল নুবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি পরতে চাও?

জি জেনারেল। আপনি যদি আপত্তি না করেন।

জেনারেল রাউল মাথা নাড়লেন, বললেন, না, কোনো আপত্তি নেই।

নুবা ক্রিটির কাছাকাছি একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। ক্রিটি তার মাথায় হেলমেটটি পরিয়ে দেয়। সেটা ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কি না পরীক্ষা করে যন্ত্রটার একটা সুইচ অন করে দেয়। সাথে সাথে যন্ত্রের ভিতর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জনের মতো শব্দ শোনা যেতে থাকে। ক্রিটি যন্ত্রের প্যানেলে কিছু একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করে নুবার দিকে তাকিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, এখন তোমাকে মিষ্টি একটা ভাবনা ভাবতে হবে। সুখের বা আনন্দের কোনো স্মৃতি—

নুবা মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

বল, তোমার প্রিয় মানুষ কে?

আমার ছেলে। দু বছরের ছেলে।

কী করে তোমার ছেলে?

ছেলের কথা মনে করে নুবার মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে মৃদু হেসে কোমল গলায় বলল, এত দুষ্টু তুমি চিন্তা করতে পারবে না।

কী করে সে?

আমি যখন বাসায় যাই সাথে সাথে দরজার আড়ালে লুকিয়ে যায়। তখন আমাকে ভান করতে হয় তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তাকে ডাকাডাকি করি তখন হঠাৎ ছুটে বের হয়ে এসে পিছন থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—

তুমি কী কর?

আমি তাকে বলি ছাড় ছাড়, সে কিছুতেই ছাড়ে না, আমাকে ধরে ঝুলে থাকে—

ক্রিটি তার যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বলল, ফিডব্যাক শুরু হয়ে গেছে। তোমার বাচ্চার কথা মনে করে তোমার ভিতরে আনন্দের যে অনুভূতি জন্ম হয়েছিল এখন সেটা বাড়তে থাকবে।

নুবার সারা মুখ হঠাৎ এক ধরনের বিস্ময়কর আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে সোজা হয়ে বসে এবং তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

ক্রিটি আবার মৃদু গলায় বলল, ফিডব্যাকটা খুব চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে। আমি বলতে পারি এটা একেবারে অনায়াসে দশ ডিবি চলে যাবে।

নুবার মুখে আনন্দ এবং ভালবাসার এমন একটি মধুর ছাপ পড়ল যে জেনারেল রাউল সেখান থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না। তিনি এক ধরনের ঈর্ষার দৃষ্টিতে নুবার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নুবাকে প্রায় পনের মিনিট স্বপ্ন মেশিনে স্টিমুলেশান দেয়া হল। নব ঘুরিয়ে যখন ফিডব্যাক কমিয়ে নিয়ে এসে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল তখনো তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ লেগে রয়েছে।

জেনারেল রাউল নুবার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কেমন লাগছিল নুবা?

নুবা বুকের ভিতর থেকে একটা বড় নিশ্বাস বের করে বলল, আমি—আমি—আমি সেটা বোঝাতে পারব না। ভালবাসা আনন্দ আর সুখের এত তীব্র একটা অনুভূতি যে সেটা আমি কোনোদিন অনুভব করি নি। সাধারণ সুখ, আনন্দ ভালবাসা থেকে সেটা হাজার গুণ, লক্ষ গুণ বেশি তীব্র। এত মধুর সেই অনুভূতি যে আমার মনে হচ্ছে আমি সারা জীবনের জন্যে পাল্টে গেছি।

মধুর অনুভূতি?

জি। আপনি যতক্ষণ নিজে এটা অনুভব না করছেন ততক্ষণ সেটা আপনাকে বোঝানো সম্ভব নয়। এই অনুভূতি এত তীব্র যে এটাকে বলা যায় সম্পূর্ণ নূতন একটা অনুভূতি। সেই অনুভূতি মানুষ এর আগে কোনোদিন অনুভব করে নি। যখন সেটা এসে ভর করে তখন মনে হবে আপনি বুঝি মানুষ নন, মানুষ থেকে উন্নত কোনো মহাজাগতিক প্রাণী, কিংবা স্বর্গের দূত বা সেরকম একটা কিছু। তাদের অনুভূতিও অন্য রকম—

জেনারেল রাউল হঠাৎ ঘুরে ক্রিটির দিকে তাকালেন, তারপর শক্ত গলায় বললেন, আমি নিজে এখন এটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

আপনি দেখবেন? ক্রিটি মৃদু হেসে বলল, এটা মাথায় পরবেন?

হ্যাঁ, পরব। জেনারেল রাউল তার চেয়ার ছেড়ে উঠে স্বপ্ন মেশিনের কাছাকাছি একটা চেয়ারে এসে বসলেন।

হেলমেটটি মাথায় পরে নেবার পর ক্রিটি ভালো করে সেটা একবার পরীক্ষা করে নিল। যন্ত্রটার উপর ঝুঁকে পড়ে সুইচটা অন করে দেবার সাথে সাথে আবার যন্ত্রের ভিতর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ক্রিটি জেনারেল রাউলের দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গিতে বলল, যদি ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই পেতাম তাহলে যন্ত্রটাকে একেবারে শব্দহীন করে দেয়া যেত।

রাউল কোনো কথা বললেন না, মুখ শক্ত করে বসে রইলেন। ক্রিটি বলল, যন্ত্রটি কাজ করতে শুরু করেছে, এখন আপনাকে মধুর একটা জিনিস ভাবতে হবে। মধুর এবং আনন্দের এবং সুখের—

হ্যাঁ, চেষ্টা করছি। রাউল তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, আমার বয়সে পৌঁছে গেলে স্মৃতি দুর্বল হয়ে যায়। সহজে কিছু মনে হতে চায় না।

ক্রিটি যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সেটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনার প্রিয়জনের কথা ভাবুন। আপনার সন্তান—আপনার স্ত্রী—

স্ত্রী! জেনারেল রাউল চমকে উঠলেন—হঠাৎ করে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর স্ত্রী যে তার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কলুষিত করে রেখেছিল। ভয়ঙ্কর নিরানন্দ যন্ত্রণায় বিষাক্ত করে রেখেছিল। যে তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত আর যাকে তিনি সমস্ত চেতনা দিয়ে ঘৃণা করতেন। জেনারেল রাউল অনেকদিন পর হঠাৎ করে তার ভিতরে আবার সেই সুপ্ত ঘৃণা, ক্রোধ এবং বিতৃষ্ণা অনুভব করলেন।

চমৎকারভাবে শুরু করেছেন। ক্রিটি উত্তেজিত গলায় বলল, দেখা যাচ্ছে আপনার ভিতরে খুব সতেজ একটা অনুভূতির জন্ম হয়েছে। এক্ষুনি ফিডব্যাক শুরু হবে। আপনি অনুভূতিটা ধরে রাখুন।

জেনারেল রাউল তার ভিতরে রাগ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ এবং তার সাথে সাথে এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক অনুভব করতে থাকেন। বুঝতে পারেন আস্তে আস্তে রাগ ঘৃণা আর আতঙ্ক বাড়তে শুরু করেছে, তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। বিচিত্র এই ভয়ঙ্কর অনুভূতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কুৎসিত কালো ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠতে থাকে, প্রচণ্ড ক্রোধে তার শরীরের রক্ত ফুটতে থাকে। মানুষের প্রতি, জগৎ সংসারের প্রতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ জীবন্ত কোনো প্রাণীর মতো তার চামড়ার নিচে কিলবিল করতে থাকে। সাথে সাথে বিজাতীয় এক আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে থাকে, যে আতঙ্কের ভয়াবহতার কোনো তুলনা নেই। মহাসমুদ্রের প্লাবনের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে—

জেনারেল রাউল ভয়ঙ্কর চোখে ক্রিটির দিকে তাকালেন—ক্রিটি মাথা নিচু করে তার যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সাবধানে নবটি স্পর্শ করে বলল, দেখতে পাচ্ছি আপনার ফিডব্যাক শুরু হয়ে গেছে। বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি, আপনার অনুভূতির তীব্রতা এখন বেড়ে যাবে বহুগুণ। হাজার লক্ষ বা আরো বেশি—

ক্রিটি যন্ত্রের নবটাকে ঘুরিয়ে দিতেই জেনারেল রাউল এক ভয়ঙ্কর রক্ত-শীতল-করা আর্তনাদ করে জান্তব ক্ষিপ্রতায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। পশুর মতো চিৎকার করতে করতে মাথা কুটতে কুটতে তিনি দুই হাতে নিজের মুখের চামড়া খামচে ধরে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। জান্তব স্বরে গোঙাতে লাগলেন, বীভৎস ভঙ্গিতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন...

* * * * *

কয়েকদিন পর জেনারেল রাউলকে তার প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর দেয়ার খবরটি সংবাদপত্রে ছোট করে ছাপা হল।

কেন তাকে অবসর দেয়া হল সেটি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কোথাও ছাপা হল না।

অপারেশান অপক্ষেপ

বিশাল একটা হলঘরে প্রায় এক হাজার তরুণ বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক, শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। হলঘরটি রাষ্ট্রীয় হলঘর, গ্রানাইটের কালো দেয়াল এবং উঁচু ছাদ। ভিতরে হালকা স্বচ্ছ এক ধরনের নরম আলো, বসার জন্যে মেরুন রঙের নরম চেয়ার, সামনে কাচে ঢাকা সিলিকনের সুদৃশ্য টেবিল। টেবিলে কাগজপত্র, মাইক্রো কম্পিউটার, কমিউনিকেশান মডিউলের মতো নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। তরুণ বিজ্ঞানী গবেষক এবং শিল্পী সাহিত্যিকেরা নিজেদের ভিতরে নিচু গলায় কথা বলছে, তরল গলায় হাসছে। যদিও এটি রাষ্ট্রীয় হলঘর কিন্তু পরিবেশটি গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রীয় পরিবেশ নয়, পরিবেশটি সহজ এবং স্বাভাবিক।

হলঘরে একটু উত্তেজনা দেখা গেল এবং প্রায় সাথে সাথে ভারি গলায় একটি ঘোষণা শোনা যায়। বিজ্ঞান একাডেমীর মহাপরিচালক থিরু হলঘরে এসে পৌঁছেছেন এবং তিনি এক্ষুনি এই এক সহস্র বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ এবং শিল্পী সাহিত্যিকের সাথে কথা বলবেন। মেরুন রঙের আরামদায়ক চেয়ারে বসে থাকা তরুণ-তরুণীরা নড়েচড়ে বসল এবং প্রায় সাথে সাথেই তাদের টেবিলের স্বচ্ছ কাচে থিরুকে দেখা গেল। শান্ত সৌম্য একহারা চেহারা, পরনে দৈনন্দিন সহজ পোশাক।

বিজ্ঞান একাডেমীর মহাপরিচালক তার আসনে বসে সাথে সাথেই কথা বলতে শুরু করে দিলেন। নরম গলায় বললেন, এটি রাষ্ট্রীয় হলঘর, নানা কাজে আমাকে এখানে আসতে হয়, আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হয় এবং আনুষ্ঠানিক কথা বলতে হয়। আজ একটা বিশেষ দিন, আমি আগে থেকে ঠিক করেছি এই দিনে কোনো আনুষ্ঠানিকতা থাকবে না, আজ এখানে খোলাখুলি কথা বলা হবে।

AMARBOI.COM

উপস্থিত তরুণ-তরুণীরা মহামান্য থিরুর কথা শুনে এক ধরনের আনন্দের মতো শব্দ করল।

বিজ্ঞান একাডেমীর মহাপরিচালক থিরু কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, আজকে আমি একটু সময় নিয়ে এসেছি, আমি শুধু তোমাদের সাথে কথা বলব না, আমি তোমাদের কথা শুনব।

উপস্থিত তরুণ-তরুণীরা আবার একটা আনন্দধ্বনির মতো শব্দ করল, বিজ্ঞান একাডেমীর মহাপরিচালকের সাথে কথা বলা একটি দৈনন্দিন ব্যাপার নয়।

থিরু তার সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, তোমাদের সাথে কথা বলা আমার জন্যে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা। তোমরা সারা পৃথিবী থেকে বেছে-নেয়া এক হাজার সেরা বিজ্ঞানী গবেষক শিল্পী এবং সাহিত্যিক। তোমাদের কাউকে এখানে জোর করে আনা হয় নি, তোমরা সবাই স্বেচ্ছায় এসেছ। তোমরা সবাই হচ্ছ অপারেশান অপক্ষেপের অংশ।

অপারেশান অপক্ষেপের ধারণাটি নূতন নয়, যারা পৃথিবী নিয়ে ভাবেন তারা অনেকবার এ ধরনের একটা কথা বলেছেন কিন্তু কেউ কখনো সেটি পরীক্ষা করে দেখেন নি। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষাটি সহজ নয়। এই প্রথম তোমাদের ব্যবহার করে অপারেশান অপক্ষেপের পরীক্ষা করা হবে।

তোমরা জান অপারেশন অপক্ষেপটি কী এবং কেন সেটা আমরা করছি। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন হয়েছে প্রয়োজনে। ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিবিদেরা আবিষ্কার করেছেন নূতন শক্তিবলয়। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে কৃত্রিম খাদ্য। পৃথিবীর সঞ্চিত শক্তি নিঃশেষ হবার পর আবিষ্কৃত হয়েছে নূতন শক্তিভাণ্ডার। পারমাণবিক যুদ্ধে জনারণ্য ধ্বংস হওয়ার পর মহামারীতে দুঃসময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে নূতন জীবন সম্ভাবনা, নূতন ওষুধ, নূতন প্রতিষেধক।

কিন্তু আমরা আমাদের অতীতকে আজ পিছনে ফেলে এসেছি। এখন পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা নেই, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, খাদ্যাভাব নেই। প্রকৃতিকে আমরা জয় করেছি, ভূমিকম্প ঝড় বৃষ্টি বন্যার ভয় নেই। আমরা প্রকৃতি থেকে নূতন শক্তি ভাণ্ডার আহরণ করছি, আমাদের শক্তি ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। কৃত্রিম খাদ্য তৈরি হয়েছে, পৃথিবীর মানুষকে আর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে হবে না। আমাদের রোগ শোক নেই, দুঃখ কষ্ট নেই, খাদ্যের কষ্ট নেই, পরিবেশকে রক্ষা করা হয়েছে, পরিবেশ দূষণের ভয় নেই। সুস্থ সবল বুদ্ধিমান আবেগপ্রবণ মানবশিশুর জন্ম হচ্ছে, ভালবাসায় তারা বড় হচ্ছে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হচ্ছে, শিল্পে সাহিত্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এক কথায় পৃথিবীতে মানবসমাজের চাইবার আর কিছু বাকি নেই।

থিরু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আর সেটি হচ্ছে আমাদের পতনের শুরু। আমরা আবিষ্কার করেছি আমাদের মাঝে আর কোনো প্রেরণা নেই। যে প্রেরণা মানুষকে গুহামানব থেকে তাড়না করে এখানে নিয়ে এসেছে, হঠাৎ করে সেই প্রেরণাটুকু হারিয়ে গেছে। আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপন করি, নিজেদের বেঁধে দেয়া দায়িত্ব পালন করি, আমরা আনন্দ করি, জীবন উপভোগ করি কিন্তু জীবনকে নূতন কিছু দিই না। আমাদের জীবন গতানুগতিক। গত এক শ বছরে পৃথিবীতে মানবসমাজ নূতন কিছু দেয় নি। মনে হচ্ছে আগামী এক শ বছরেও কিছু দেবে না। আমরা এখন অলস পচনশীল একটা সমাজ।

এই অলস পচনশীল সমাজকে রক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়েছে অপারেশান অপক্ষেপ। তোমরা সেই অপারেশান অপক্ষেপের প্রথম পরীক্ষার্থী।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দুই শ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটা দ্বীপ আলাদা করে রাখা আছে তোমাদের জন্যে। সেই দ্বীপের দশ হাজার কিলোমিটারের ভিতর থেকে সমস্ত মানুষকে অপসারিত করা হয়েছে। সেই নির্জন দ্বীপে তোমাদের জন্যে ঘর তৈরি হয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ার্কশপ, হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিদ্যুৎ পানি গ্যাস তাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো তৈরি হয়েছে সাময়িকভাবে। তোমাদের ঘর এক বছরের মাথায় জীর্ণ হয়ে আসবে, দুই বছরের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাবে। ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতিতে জং ধরবে, ছাদ ভেঙে পড়বে। হাসপাতালের ওষুধ ফুরিয়ে যাবে, ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ভেঙে যাবে। তোমাদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, রসদ থাকবে না। পানি গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এই দ্বীপটি বেছে নেয়া হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিকূল এলাকায়। এখানে টাইফুন এসে আঘাত হানে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে যায়,

আগ্নেয়গিরির লাভা এসে ডুবিয়ে দেয়, ভূমিকম্পে কেঁপে কেঁপে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই যে তোমরা হাসিখুশি তরুণ-তরুণীরা আছ তার মাঝে রয়েছে কিছু টাইম-বম্ব। তোমরা নিজেরাও জান না যারা হঠাৎ করে পাল্টে যাবে ভয়ঙ্কর ক্রিমিনালে। যাদের সহজ সরল হাসির পিছনে জন্ম নেবে লোভ, নিষ্ঠুরতা, ক্ষমতার মোহ।

তোমরা এই এক হাজার তরুণ-তরুণী সেই দ্বীপটিতে বাস করবে। পৃথিবীর সাথে তোমাদের কোনো যোগাযোগ থাকবে না। সবাই তোমাদের কথা ভুলে যাবে। তোমাদের উপর দিয়ে কোনো প্লেন উড়বে না, কোনো উপগ্রহ তোমাদের ছবি তুলবে না। তোমাদের সাথে কেউ কথা বলবে না, তোমরাও কারো সাথে কথা বলবে না।

তোমাদের কেউ বিদায় জানাবে না, পৃথিবীর সব মানুষের অগোচরে তোমরা সেই দ্বীপে আশ্রয় নেবে। পৃথিবীর এক ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতায় তোমরা বেঁচে থাকবে। আমরা সভ্য জগতের মানুষেরা যে সহজ আরামে অভ্যস্ত হয়েছি তোমাদের সেটা থাকবে না। তোমাদের জীবন হবে কঠোর। সেই কঠোর জীবনে তোমরা নিশ্চয়ই জন্ম দেবে একটি নূতন সভ্যতা। পৃথিবীর মানুষ যখন জন্ম দেবে অলস অকর্মণ্য প্রজাতি, তখন তোমরা সৃষ্টি করবে এক তেজস্বী শক্তিশালী জাতি। তোমাদের হাতে জন্ম নেবে নূতন জ্ঞান, নূতন আবিষ্কার, নূতন সমাজব্যবস্থা।

সেই নির্জন দ্বীপে তোমাদের কথা কোনো মানুষ জানবে না। শক্তিবলয় দিয়ে তোমাদের ঘিরে রাখা হবে, সেই বলয় কেউ ভেদ করে আসতে পারবে না। পৃথিবীর ভিতরেই তোমরা জন্ম দেবে নূতন পৃথিবীর। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পরে, হয়তো তোমরা শক্তিবলয় ভেদ করে ফিরে আসবে এই পৃথিবীতে। মানব-জগৎ পাল্টে যাবে চিরদিনের মতো। সভ্যতার নূতন যুগের সৃষ্টি হবে এই পৃথিবীতে—

গ্রানাইট পাথরের বিশাল হলঘরে এক হাজার তরুণ-তরুণী মন্ত্রমুগ্ধের মতো চুপ করে বসে থেকে থিরুর কথা শুনতে থাকে। তাদের বুকের মাঝে একই সাথে আশা এবং আশঙ্কা। স্বপ্ন এবং আতঙ্ক। জীবন এবং মৃত্যু।

*　　*　　*　　*　　*

খুব ধীরে ধীরে থিরু ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অপারেশন অপক্ষেপের তিনি হচ্ছেন একমাত্র দর্শক। নির্জন দ্বীপের এক হাজার তরুণ-তরুণীর সাথে তিনিও এসেছিলেন দ্বীপে। দ্বীপের শক্ত পাথরের গভীরে এক শ মিটার নিচে গোপন ভল্টে তার শরীরকে শীতল করে রাখা হয়েছিল গোপনে। পৃথিবীতে তার মৃত্যুর যে খবর প্রচার করা হয়েছিল সেটি সত্যি ছিল না। যে দেহটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেটিও তার শরীর ছিল না।

বিজ্ঞান একাডেমীর মহাপরিচালক থিরু নিজের হাতে এই অপারেশান অপক্ষেপ দাঁড়া করিয়েছিলেন। এক শ বছর পর এই অপারেশান অপক্ষেপ কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে জানার জন্যে তিনি গত এক শতাব্দী পাথরের আড়ালে ঘুমিয়েছিলেন। এখন তার ঘুম ভেঙেছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে তার শরীরকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। তিনি এখন পাথরের আড়াল থেকে বাইরে যাবেন, নির্জন দ্বীপে জন্ম নেয়া এক নূতন সভ্যতাকে নিজের চোখে দেখবেন।

থিরু নিজের বুকের ভিতরে এক ধরনের কম্পন অনুভব করেন। বের হয়ে কী দেখবেন তিনি? উৎসাহী মানুষের কলকাকলিতে মুখরিত জনপদ, বিশাল সুরম্য অট্টালিকা, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির স্পর্শে সৃষ্ট নূতন ধরনের পরিবহন পদ্ধতি? নাকি দেখবেন জনমানবশূন্য এক বিশাল ধূ-ধূ প্রান্তর? প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি জনপদ?

থিরু একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। কী দেখবেন তিনি জানেন না, কিন্তু তাকে এখন বাইরে যেতে হবে, দেখতে হবে এই নূতন সভ্যতা কিংবা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এক শতাব্দী তিনি এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।

শক্ত পাথরের গভীরে এক শ মিটার নিচের গোপন ভল্ট থেকে একটা অর্ধালোকিত সুড়ঙ্গ দিয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন। বাইরে বের হতেই শীতল একটি বাতাস তার শরীরকে স্পর্শ করল, তিনি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাইরে তাকালেন। সামনে অপূর্ব কিছু অট্টালিকা, শক্ত গাঁথুনি, অপূর্ব নকশা–কাটা। সন্ধ্যার আবছা আলোতে চিকচিক করছে। দুইপাশ দিয়ে সরু পথ নেমে গিয়েছে। উঁচুতে কাচে ঢাকা গোলাকার স্টেশন। রাস্তার পাশে সবুজ দেবদারু গাছ।

থিরু নিশ্বাস বন্ধ করে একবার চারদিকে তাকালেন, না, এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি সভ্যতা নয়। চারদিকে গড়ে ওঠা নূতন একটি সভ্যতার চিহ্ন। তিনি আবার তাকালেন এবং হঠাৎ করে তার মনে হল এখানে কোথাও কিছু একটা সমস্যা রয়েছে। সমস্যাটা কী তিনি হঠাৎ করে ধরতে পারলেন না। ইতস্তভাবে তিনি আরো কয়েক পা এগিয়ে এলেন এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারলেন চারপাশে কোথাও কোনো মানুষ নেই! কোথায় গিয়েছে সব মানুষ?

থিরু জনশূন্য রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। চারপাশে নগরীর সুস্পষ্ট চিহ্ন, রাস্তাঘাট উঁচু অট্টালিকা প্রযুক্তির সুস্পষ্ট ব্যবহার, সবই নিশ্চয়ই মানুষের জন্যে কিন্তু সেই মানুষেরা চোখের আড়ালে। বড় কোনো অট্টালিকায় ঢুকে দেখলে হয় কিন্তু থিরু হঠাৎ করে সেটি সাহস করলেন না। রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন, শীতল বাতাস বইছে, এই দ্বীপটির অবস্থান থেকে তিনি জানেন সোজা সামনে হেঁটে গেলে তিনি সমুদ্রতীরে পৌঁছাবেন। এই দ্বীপটির সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ছিল বালুকাবেলা, সেখানে কি এক–দুজন সান্ধ্যকালীন পদব্রাজক পাওয়া যাবে না?

AMARBOI.COM

থিরু সমুদ্রতীরে এসে অবাক হলেন, বালুকাবেলার সামনে বিশাল সমুদ্র, তাদের ফেনায়িত তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে, ঝাউগাছে বাতাসের এক ধরনের করুণ স্বর কিন্তু এই অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করার কেউ নেই। থিরু একাকী বালুকাবেলায় ঘুরে বেড়ালেন, যখন একটি মানুষকেও না পেয়ে ফিরে আসছিলেন ঠিক তখন একটা ঝাউগাছের নিচে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা একজন মানুষকে আবিষ্কার করলেন। মানুষটি এক ধরনের উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তার পোশাক জীর্ণ, চেহারায় এক ধরনের খাপছাড়া উদ্ভ্রান্ত ভাব। থিরু সাবধানে এগিয়ে গিয়ে তার কাছাকাছি দাঁড়ালেন, মানুষটি চোখের কোনা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। থিরু ইতস্তত করে বললেন, আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

মানুষটি তার দিকে না তাকিয়ে বলল, বল।

আমি এক শ বছর আগে থেকে এসেছি, এক সময় আমি পৃথিবীর বিজ্ঞান একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলাম।

আমি সেটা আন্দাজ করছিলাম। তুমি এ সময়ের মানুষ হলে তোমার মাথায় নিশ্চয়ই মাস্কিট্রন থাকত।

কী থাকত?

মাস্কিট্রন। মানুষটি তার মাথা ঘুরিয়ে দেখাল বাম কানের একটু উপরে গোলাকার একটি জিনিস লাগানো।

থিরু একটু ঝুঁকে পড়ে সন্ধ্যার আবছা আলোতে মাস্কিট্রন নামের জিনিসটা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন। জিনিসটা কেমন করে মাথার পাশে লেগে আছে তিনি বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেমন করে লাগিয়েছ?

খুব সোজা। মাথার খুলিতে চারটা তিন শতাংশ ছিদ্র করে স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

থিরু একটু শিউরে উঠলেন, কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাথার খুলিতে ফুটো করে?

হ্যাঁ। মস্তিষ্কের মাঝে যে ইমপালস দেয়া হয় সেটা যত কাছে থেকে সম্ভব দেয়ার কথা।

থিরু মানুষটির কাছে উবু হয়ে বসে বললেন, দেখ, আমি এক শতাব্দী আগে থেকে এসেছি, তোমাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে এখানে কী হচ্ছে?

মানুষটি এবারে প্রথমবার থিরুর দিকে ঘুরে তাকাল। খানিকক্ষণ এক ধরনের কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি শুনতে চাও?

হ্যাঁ।

বলছি তোমাকে। বস এখানে।

থিরু মানুষটির পাশে বসলেন, ঠিক জানেন না কেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে হঠাৎ তিনি এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন। মানুষটি তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই জান এই দ্বীপে এক হাজার খুব উৎসাহী তরুণ-তরুণীকে পাঠানো হয়েছিল, তারা আমাদের তিন পুরুষ আগের মানুষ।

থিরু মাথা নাড়লেন, তিনি জানেন, মানুষগুলোকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন।

অসম্ভব কষ্ট করে সেই মানুষগুলো নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাদের সন্তানেরা এই দ্বীপটিকে গড়ে তুলেছে। যারা এই দ্বীপটিকে গড়ে তুলেছে আমরা তাদের সন্তান। আমাদের মাঝে অসংখ্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর প্রযুক্তিবিদের জন্ম হয়েছিল। তাদের সবার চেষ্টা দিয়ে তৈরি হয়েছে মাস্কিট্রন।

AMARBOI.COM

সেটা কী করে?

জীবনকে সহজ করে দেয়। আমরা প্রতিনিয়ত শুধু ছুটে বেড়াতাম, আমাদের জীবন ছিল শুধু কাজ আর পরিশ্রম। চেষ্টা ও খাটাখাটুনি। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই পরিশ্রম? কেন এই কাজ? জীবনকে আনন্দময় করার জন্যে। সেই জীবন যদি সহজে আনন্দময় করে দিতে পারি তাহলে কেন আমরা কষ্ট করে খাটাখাটুনি করব? পরিশ্রম করে নিজের জীবনকে শেষ করব?

থিরু জিজ্ঞেস করলেন, মাস্কিট্রন পরিশ্রম ছাড়াই আনন্দ এনে দিতে পারে?

হ্যাঁ। কারণ মাস্কিট্রন সোজাসুজি মস্তিষ্কের সাথে লাগানো। মস্তিষ্কে এটি ইমপালস দিয়ে আনন্দের অনুভূতি দিতে পারে। আমরা অনেক পরিশ্রম করে আমাদের জীবনে আনন্দের যে অনুভূতি সৃষ্টি করব, সেই অনুভূতিটি সোজাসুজি মস্তিষ্কে এসে যাচ্ছে। তাহলে পরিশ্রম কেন করব? চমৎকার একটা কবিতা পড়লে যেরকম আনন্দ হয়, সুন্দর একটি ছবি দেখলে যেরকম ভালো লাগে, অপূর্ব সঙ্গীত শুনে বুকের ভিতরে যেরকম আবেগের জন্ম হয় তার সবকিছু আমরা করতে পারি মাস্কিট্রন দিয়ে। আমাদের কবিতা লেখার প্রয়োজন নেই, ছবি আঁকার প্রয়োজন নেই, সঙ্গীত সৃষ্টিরও প্রয়োজন নেই।

থিরু খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে মানুষটির দিকে তাকালেন। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে

যাচ্ছিলেন, মানুষটি হাত তুলে হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে সামনে তাকাল। থিরু তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখতে পেলেন একটা মোটাসোটা ইঁদুর মাথা নাড়াতে নাড়াতে এগিয়ে আসছে। মানুষটি সাবধানে তার পাশে রাখা মুগুরের মতো একটা গাছের গুঁড়ি তুলে নিয়ে অতর্কিতে ইঁদুরটিকে মেরে বসে। ইঁদুরটির মাথা থেঁতলে রক্ত ছিটকে এসে মানুষটির মুখে পড়ল কিন্তু মানুষটির সেটা নিয়ে কোনো ভাবান্তর হল না। সে মৃত ইঁদুরটির লেজ ধরে নিজের কাছে টেনে এনে চোখের সামনে ঝুলিয়ে সেটিকে পর্যবেক্ষণ করে, থিরু দেখতে পেলেন মানুষটির চোখেমুখে একটা আনন্দের আভা হাজির হয়েছে। সে ইঁদুরটা নিজের পাশে রেখে আমার কথার সূত্র ধরে বলল, একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করতে—

থিরু বাধা দিয়ে বললেন, তুমি—তুমি ইঁদুরটা দিয়ে কী করবে?

মানুষটি থিরুর দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বলল, এটা আমার আজ রাতের ডিনার।

থিরু চমকে উঠলেন, ডিনার?

হ্যাঁ। মাস্কিট্রন আমাদের আনন্দ সুখ উল্লাসের অনুভূতি দিতে পারে। কিন্তু আমাদের খেতে হয়—

থিরু হতচকিত হয়ে বললেন, এই— এই ইঁদুরটা খাবে?

হ্যাঁ। মাস্কিট্রনটা সেট করব অত্যন্ত উপাদেয় খাবারের অনুভূতির জন্যে। তখন আমি যেটাই খাব সেটাকেই মনে হবে উপাদেয় খাবার। ইঁদুরটা এমনিতেই কচমচ করে খাব—

কাঁচা?

মানুষটা সহৃদয় মানুষের মতো হাসল, রান্না করে জ্বালানি নষ্ট করে লাভ আছে?

থিরুর সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। মানুষটি থিরুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মাথায় যেহেতু মাস্কিট্রন লাগানো নেই, তোমার হয়তো পুরো ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর মনে হতে পারে।

থিরু দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়। কাঁচা ইঁদুরকে উপাদেয় খাবার মনে করে, খাওয়ার জন্যে তোমরা মাথার খুলি ফুটো করে স্ক্রু দিয়ে যন্ত্র লাগাচ্ছ? এর সত্যিই দরকার ছিল?

মানুষটি তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কিন্তু এটা তো সত্যিকারের ব্যবহার নয়। এর সত্যিকার ব্যবহার অন্য জায়গায়। এই তো কয়দিন আগে একটি মেয়ের একমাত্র বাচ্চা সাত তালা থেকে পড়ে মারা গেল। যদি মাস্কিট্রন না থাকত সেই মায়ের কী ভয়ানক কষ্ট হত বলতে পার? কিন্তু এখন কোনো সমস্যাই নেই, মাস্কিট্রন সেট করে শিশুর মৃতদেহটি রেখে চলে গেল একটা পার্টিতে আনন্দ করতে!

থিরু হঠাৎ করে শিউরে উঠলেন, প্রথমবার তিনি একটু আতঙ্ক অনুভব করতে শুরু করেন। ইতস্তত করে বললেন, কিন্তু যেখানে দুঃখ পাওয়ার কথা সেখানে তো দুঃখ পেতে হয়—

মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, না আর পেতে হয় না। আমাদের মাঝে এখন আর দুঃখ নেই। এই দ্বীপের প্রতিটি মানুষ এখন গভীর সুখের মাঝে ডুবে আছে। তাদের ভিতরে দুঃখ বেদনা কষ্ট কিছু নেই।

থিরু খানিকক্ষণ মানুষটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, এখানে রাস্তাঘাটে মানুষ নেই কেন?

প্রয়োজন নেই তাই। মানুষ রাস্তাঘাটে যেত কারণ কাজকর্ম করার প্রয়োজন ছিল। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু খাওয়া জোগাড় করার জন্যে মাঝে মাঝে বের হতে হয়। বাকি সময়টুকু মানুষ তার ঘরে চুপচাপ শুয়ে মাস্কিট্রন দিয়ে জীবন উপভোগ করতে পারে।

মানুষটি আড়মোড়া ভেঙে ইঁদুরটার লেজ ধরে টেনে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিই। তুমি কি যাবে আমার সাথে?

থিরু মাথা নেড়ে বললেন, তুমি যাও। আমি আরো খানিকক্ষণ বসে যাই। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগবে।

ঠিকই বলেছ। যত তাড়াতাড়ি পার একটা মাস্কিট্রন লাগিয়ে নাও, দেখবে জীবনের মাঝে কত আনন্দ লুকানো!

মানুষটি হেঁটে চলে গেল, থিরু সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। গভীর হতাশায় তিনি একটি নিশ্বাস ফেললেন। অপারেশান অপক্ষেপ যেভাবে কাজ করার কথা ছিল সেভাবে কাজ করে নি। এটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ হয় নি এটি পুরোপুরি উল্টোদিকে কাজ করেছে। মানুষকে নূতন জীবন না দিয়ে যে জীবনটি দেয়া হয়েছিল সেটি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

থিরু দীর্ঘসময় একা একা সমুদ্রের বালুবেলায় বসে রইলেন। ধীরে ধীরে শীতের বাতাস বইতে লাগল, যখন শীতটুকু অসহ্য মনে হল তখন হঠাৎ তিনি কয়েকজন মেয়ের গলা শুনতে পেলেন। কথা বলতে বলতে তারা এদিকে এগিয়ে আসছে। থিরু উঠে দাঁড়ালেন, মেয়েগুলো তাকে দেখতে পেয়ে কথা বন্ধ করে তার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এলে থিরু দেখতে পেলেন তাদের সবার মাথায় একটি করে মাস্কিট্রন লাগানো।

মেয়েদের ভিতরে একজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? এখানে কী করছ?

থিরু শান্ত গলায় বললেন, আমাকে তোমরা চিনবে না। আমি এই এলাকার নই। সত্যি কথা বলতে এই সময়েরও না।

মেয়েগুলো মাথা নেড়ে বলল, তাই তো দেখছি, তোমার মাথায় মাস্কিট্রন নেই।

না নেই। তোমরা এত রাতে কেন এসেছ?

আমরা এসেছি খাবারের জন্যে। এখানে মাঝে মাঝে বড় ইঁদুর পাওয়া যায়।

থিরুর শরীর আবার কাঁটা দিয়ে ওঠে। তিনি দেখতে পেলেন তাদের একজনের হাতে একটা লোহার রডের মতো জিনিস।

অন্য একটি মেয়ে বড় হাতের মেয়েটিকে বলল, তুমি এটা দিয়ে ইঁদুর মারতে পারবে না। ইঁদুর খুব চতুর প্রাণী, এত সহজে তাকে মারা যায় না।

মেয়েটি বলল, অবশ্যি পারব। আমি কত সহজে এটা দিয়ে আঘাত করতে পারি।

এত সোজা নয়।

তোমরা দেখতে চাও?

দেখাও দেখি।

তাহলে মাস্কিট্রনটা এগার পয়েন্টে সেট কর।

মেয়েগুলো তাদের মাথায় লাগানো মাস্কিট্রন হাত দিয়ে ঠিক করতে শুরু করে, থিরু জিজ্ঞেস করলেন, মাস্কিট্রন এগার পয়েন্ট সেট করলে কী হয়?

বীভৎস রক্তারক্তি বা হিংস্র কাজকর্মগুলোকে পবিত্র কাজ বলে মনে হয়।

থিরু জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি বীভৎস কোনো কাজ করা হবে?

যে মেয়েটির হাতে লোহার রড, সে দুই হাতে শক্ত করে রডটি ধরে থিরুর দিকে

AMARBOI.COM

এগিয়ে এল। থিরু আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখলেন মেয়েটির মুখে সত্যিই কোমল স্নিগ্ধ একটি পবিত্র ভাব।

সমুদ্রের বালুবেলায় একটি বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে প্রাতঃভ্রমণকারী একজন মানুষ দ্রুত মাস্কিট্রনটি চৌদ্দ পয়েন্টে সেট করে নিল। মাস্কিট্রন চৌদ্দ পয়েন্টে সেট করা হলে ভীতিকর একটা দৃশ্যকে কৌতুককর বলে মনে হয়।

জনৈকা যুক্তিহীনা নারী

রিগা বিশাল একটি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের একটি বড় অংশে স্বচ্ছ সিলঝিনিয়ামের ঝকঝকে আয়না। সেই আয়নায় রিগার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। রিগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছে, সে অত্যন্ত সুপুরুষ। তার কুচকুচে কালো চুল, দীর্ঘ পেশিবহুল দেহ। মসৃণ ত্বক এবং ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। তার শরীরের উপর আলগাভাবে একটি অর্ধস্বচ্ছ নিও পলিমারের কাপড় জড়ানো রয়েছে। নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে সে তার মুখে একটা সন্তুষ্টির মতো শব্দ করে জানালার দিকে ঘুরে এল। ঠিক এ রকম সময় দরজা খুলে তার দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী শুনু ঘরে প্রবেশ করে। রিগাকে দেখে শুনু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তার চোখেমুখে একই সাথে বিস্ময় এবং শঙ্কার এক ধরনের ছায়া পড়ে। রিগা মুখে হাসি টেনে এনে বলল, কেমন দেখছ শুনু?

শুনু কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, তুমি—তুমি পুনরুজ্জীবন ঘরে গিয়েছ?

হ্যাঁ শুনু।

কেন? তোমার তো সময় হয় নি।

একটু আগেই গেলাম। কেমন কাজ করেছে মনে হয়?

শুনু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ভালো। খুব ভালো।

দেখতে যেমন ভালো দেখাচ্ছে আমার ভিতরে লাগছেও সেরকম চমৎকার। তুমি বিশ্বাস করবে না আমি ভিতরে কী রকম একটা শক্তি অনুভব করছি।

সত্যি?

হ্যাঁ—আমি জানতাম না, পুনরুজ্জীবন ঘরের এত উন্নতি হয়েছে। শরীরের সব জীর্ণ কোষ বদলে দিয়েছে। শুধু তাই না, মনে হয় মস্তিষ্কে নিউরন-সেলেও কিছু কাজ করেছে, খুব ভালো চিন্তা করতে পারছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, ছয় মাত্রার একটা অনুপৌণিক সমীকরণ ছিল, কখনো আমি সমাধান করতে পারি নি। পুনরুজ্জীবন ঘর থেকে বের হবার পর মস্তিষ্কটা এমন সতেজ লাগতে লাগল যে ভাবলাম সমীকরণটা একটু ভেবে দেখি। তুমি বিশ্বাস করবে না শুনু, সাথে সাথে সমাধানটা বের হয়ে গেল।

শুনু রিগার উচ্ছ্বাসে অংশ নিতে পারল না। কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিচু গলায় বলল, ও।

শুধু তাই না, খাওয়ার রুচি বেড়ে গিয়েছে দশ গুণ। আগে যেটা খেতে পানসে লাগত হঠাৎ করে তার স্বাদ বেড়ে গেছে। স্নায়ুর মাঝেও কিছু একটা হয়েছে। রিগা শব্দ করে হাসতে হাসতে বলল, আনন্দের অন্য জিনিসগুলো তো এখনো চেষ্টা করে দেখিই নি!

শুনু রিগার হাসিমুখের দিকে এক ধরনের বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে। তার হাসি থেমে যাবার পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, রিগা, তুমি এখন কেন পুনরুজ্জীবন ঘরে গেলে? এখনো তো সময় হয় নি।

রিগা খানিকক্ষণ শুনুর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি তো জান শুনু কেন আমি পুনরুজ্জীবন ঘরে গেছি। আমরা সবাই তো যাই। যেতে হয়। তুমিও যাবে।

শুনুর কোমল চেহারায় হঠাৎ এক ধরনের তীব্র ব্যথার ছায়া এসে পড়ে। রিগা তার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বলল, আমি দুঃখিত শুনু। তুমি তো জান একদিন আমাদের একজনের কাছে থেকে সরে যেতে হবে। আমরা তো আর সবসময় একসাথে থাকতে পারি না—

শুনু কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে তার চোখে পানি এসে যায়, সে প্রাণপণে তার চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করে।

রিগা একটু এগিয়ে এসে শুনুর মাথায় হাত রেখে বলল, ছিঃ শুনু, কাঁদে না। এর মাঝে কাঁদার কিছু নেই। এটা হচ্ছে জীবন। মনে নেই তোমার আর সুরার যখন ছাড়াছাড়ি হল তখন তুমি কেমন ভেঙে পড়েছিলে? মনে আছে?

শুনু মাথা নাড়ল। রিগা নরম গলায় বলল, তারপর আমার সাথে তোমার পরিচয় হল। আমরা ঘর বাঁধলাম—কী চমৎকার একটা জীবন হয়েছিল আমাদের। ঠিক সেরকম আবার আমাদের চমৎকার জীবন হবে। তোমার সাথে দেখা হবে অসম্ভব হৃদয়বান কোনো পুরুষের—সব দুঃখ মুছে নেবে তোমার। আমার কথা ভুলে যাবে তখন।

শুনু হাতের উল্টো পৃষ্ঠা দিয়ে চোখ মুছে মৃদু গলায় বলল, রিগা, আর কয়দিন আমরা একসাথে থাকতে পারি না? আর মাত্র কয়দিন?

রিগা নিচু গলায় হেসে ফেলল, বলল, ছিঃ শুনু, ছেলেমানুষি কোরো না! আর কয়দিনে কী এসে যায়? কিছু আসে যায় না। তুমি সেই প্রাচীনকালের মানুষের মতো কথা বলছ! আমি কতবার তোমাকে বলেছি প্রাচীনকালের মানুষের জীবন নিয়ে এত ভেবো না। সেই জীবন শেষ হয়ে গেছে।

শুনু চোখ মুছে নিশ্বাস ফেলে বলল, জানি। কিন্তু—কিন্তু আমার কী ভয়ঙ্কর লোভ হয়—

রিগা বিস্ফারিত চোখে শুনুর দিকে তাকাল, অবাক হয়ে বলল, কিসের লোভ হয়?

আমার—আমার একটি সন্তান হবে। ছোট একটা শিশু—আঁকুপাঁকু করবে—আর আমি বুকে চেপে ধরব।

রিগা হতচকিত দৃষ্টিতে শুনুর দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ সে কোনো কথা বলতে

পারল না, তারপর একরকম জোর করে বলল, সন্তান?

হ্যাঁ।

কিন্তু— কিন্তু— তুমি তো জান সন্তানের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। এক সময় সন্তানের প্রয়োজন হত কারণ মানুষ বুড়ো হয়ে মারা যেত। তাদের স্থান নেবার জন্যে নূতন মানুষের প্রয়োজন হত! এখন আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি, প্রকৃতির নিয়মে বার্ধক্য আমাদের স্পর্শ করে না। আমরা মারা যাই না। আমাদের আর সন্তানের প্রয়োজন নেই।

শুনু নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি।

এক সময় মানুষের আয়ু ছিল ষাট–সত্তর বছর! এখন আমি আর তুমি একসাথে ঘর করেছি সাড়ে ছয় শ বছর! তার আগে আমি যে মেয়েটির সাথে ছিলাম সেখানে ঘর করেছি চার শ বছর। তার আগে—

আমি জানি। শুনু নিশ্বাস ফেলে বলল, আমরা সেই কতকাল থেকে বেঁচে আছি আর আমরা বেঁচে থাকব আরো কত মহাকাল! কিন্তু তবু আমার মনে হয় আমি যদি ছোট একটা শিশু পেতাম—

রিগা বিস্ফারিত চোখে এই সম্পূর্ণ যুক্তিতর্কবর্জিত প্রায় উন্মাদিনী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই ধরনের অর্থহীন হাস্যকর কথা কেউ বলতে পারে সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না।

মানুষ সত্যিই বড় বিচিত্র।

AMARBOI.COM

ব্যাংক ডাকাত

দেয়াল টপকে সাবধানে ভিতরে নামল কাসেম, চোখে ইনফ্রা–রেড চশমা লাগানো, অন্ধকারেও সে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। যে রবোটটা পাহারায় আছে তার হাতে নাকি কয়েক ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকে। হঠাৎ করে তার হাতে ধরা পড়তে চায় না। কয়েক মুহূর্ত সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোথাও কোনো শব্দ নেই, মনে হয় কেউ তাকে লক্ষ করে নি। কাসেম সাবধানে তার ছোট রেডিওটা বের করে, প্রথমে পুরো ফ্রিকোয়েন্সি–রেঞ্জটা পরীক্ষা করে নেয়, চল্লিশ মেগাহার্টজের কাছে একটা ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল— সম্ভবত পাহারাদার রবোটটা এই ফ্রিকোয়েন্সিটাই ব্যবহার করছে, কাসেম নব ঘুরিয়ে একটা নিরাপদ ফ্রিকোয়েন্সি বের করে ফিসফিস করে ডাকল, বদি—

দেয়ালের অন্য পাশে বেশ কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে বদি দাঁড়িয়ে ছিল, সে ফিসফিস করে বলল, কী খবর ওস্তাদ? সব ঠিকঠাক?

হ্যাঁ। আগে যন্ত্রপাতি পাঠা—

পাঠাচ্ছি।

কাসেমের কোমরে একটা শক্তিশালী অটোমেটিক রিভলবার ঝুলছে, টেফলন কোটেড বুলেট, এক গুলিতেই বড় জখম করে দিতে পারে। তবু ভারি অস্ত্র হাতে না আসা পর্যন্ত সে

স্বস্তি পাচ্ছে না। এই ব্যাংকটার পাহারায় যে রবোটটা রয়েছে সেটি নাকি বিশেষ উন্নত শ্রেণীর, লেজার লক না করে তাকে কাবু করা শক্ত।

বদি বাইরে থেকে নাইলনের কর্ডে করে ভারি অস্ত্রগুলো বেঁধে দিল, কাসেম ভিতরে দাঁড়িয়ে সাবধানে সেগুলো ভিতরে টেনে আনতে থাকে। অস্ত্রের পর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ এবং যন্ত্রপাতির বাক্স। কাসেম দক্ষ হাতে অস্ত্রগুলো বের করে সাজিয়ে নেয়, এখন মোটামুটি সবকিছু হাতের কাছে আছে, হঠাৎ করে ধরা পড়ার ভয় নেই। কাসেম তার ইনফ্রা-রেড চশমায় চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তার রেডিওতে মুখ লাগিয়ে নিচু গলায় বলল, বদি—

কী হল?

ভিতরে চলে আয় এখন। সব ক্লিয়ার।

ঠিক আছে।

দুই মিনিট পরে বদিও ঝুপ করে কাসেমের পাশে এসে নেমে পড়ল। তার সারা শরীরে কালো পোশাক, ঘুটঘুটে অন্ধকারে হঠাৎ করে দেখা যায় না। হাঁটুতে বেঁধে রাখা রিভলবারটা খুলে হাতে নিতে নিতে বলল, শালার রবোটটাকে নিয়ে ভয়।

কাসেম নিচু গলায় বলল, কোনো ভয় নাই। প্রথম ধাক্কায় যদি ধরা না পড়িস তাহলে কোনো ভয় নাই। মোশান ডিটেক্টরগুলো ছড়িয়ে দিতে থাক, আমি আছি।

বদি ঘাড়ে-ঝোলানো প্যাকেট থেকে ছোট ছোট মোশান ডিটেক্টরগুলো বের করে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে থাকে। দশ মিটার রেঞ্জের মোশান ডিটেক্টর, আশপাশে কোনোকিছু নড়লেই তাদের সতর্ক করে দেবে।

কাসেম কানে হেডফোন লাগিয়ে মোশান ডিটেক্টরগুলোর সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে নেয়, অযথা প্রতিটি ঘাসফড়িংকে খুঁজে বের করে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। পাহারাদার রবোটটা হঠাৎ করে হাজির না হলেই হল।

বদি বাক্স খুলে যন্ত্রপাতি বের করতে করতে বলল, এইসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগে মানুষ ব্যাংক ডাকাতি করত কীভাবে?

কাসেম অন্ধকারে দাঁত বের করে হেসে বলল, আগের যুগের মানুষের বুকের পাটা ছিল। বন্দুক নিয়ে ব্যাংকে ঢুকে যেত, বলত টাকা দাও নইলে গুলি!

সর্বনাশ! ধরা পড়লে?

ধরা পড়লেও গুলি। যদি গুলি না খেয়ে ধরা পড়ে তাহলে চোখ বন্ধ করে আট বছর।

কী সর্বনাশ!

তবে অনেক ওস্তাদ লোক ছিল। কায়দা করে গয়নার দোকান সাফ করে দিত, ব্যাংক লোপাট করে দিত। সেই যুগের মানুষের মাথায় মালপানি ছিল।

বদি প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করতে করতে বলল, আমরাই খারাপ কী? মাসে একটা করে দাঁও মারছি!

কাসেম তার ইনফ্রা-রেড চশমা দিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, কিসের সাথে কিসের তুলনা। আমি যার কাছে কাজ শিখেছি তার নাম লোকমান ওস্তাদ। তার তুলনায় তুই হচ্ছিস গাধা।

কাসেমের কথায় বদি একটু অসন্তুষ্ট হলেও সে কিছু বলল না। সে এখন কাসেমের কাছে কাজকর্ম শিখছে, যন্ত্রপাতি ব্যবহার শিখে গেলে নিজের দল খুলবে, যতদিন সেটা না

হচ্ছে কাসেমের হেনস্থা একটু সহ্য করতেই হবে। বড় একটা দাঁও মারতে পারলে যন্ত্রপাতির খরচটা উঠে আসবে, সে আশায় কাসেমের সাথে সাথে আজকের অপারেশনটাতে এসেছে।

কাসেম ম্যাগনেটিক ফ্লিপার দিয়ে দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে দরজার কব্জা খুঁজে বের করতে থাকে, সেখানে পরিমাণ মতো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ফিসফিস করে বলল, বদি—

কী হল ওস্তাদ?

ডাক্ট টেপ দে দেখি।

কেন?

এক্সপ্লোসিভটা ঢেকে দিই। ভাইব্রেশানে পড়ে না যায়।

অন্ধকারে বদি কাসেমের হাতে একটা রোল ধরিয়ে দিতেই কাসেম ধমক দিয়ে বলল, এটা কী দিচ্ছিস?

ডাক্ট টেপ।

এটা কি ডাক্ট টেপ হল নাকি গাধা? এটা হচ্ছে ডাবল স্টিকি। তোর মাথায় কি ঘিলু নেই? নাকি যা আছে তা হাঁটুতে?

বদি গালি খেয়ে একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল, ভাগ্যিস আশপাশে কেউ নেই। কাসেমের কথা বলার ধরন খুব খারাপ, নেহাত কাজকর্ম জানে বলে গালমন্দ খেয়েও কোনোভাবে টিকে আছে। একজন মানুষকে বলা তার মস্তিষ্ক হচ্ছে হাঁটুতে—কী পরিমাণ অপমানজনক কথা সেটা কখনো ভেবে দেখেছে?

কাসেম উপর থেকে বলল, ড্রিলটা দে দেখি।

বদি ড্রিলটা এগিয়ে দেয়।

কোন বিট লাগিয়েছিস? ছয় নম্বর তো?

জি। ছয় নম্বর।

ড্রিলটা চালু করেই কাসেম খেঁকিয়ে উঠল, গাধার বাচ্চা গাধা, এটা ছয় নম্বর বিট হল? তোর ঘিলু আসলেই হাঁটুতে—

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ড্রিলের বিট পাল্টাতে পাল্টাতে হঠাৎ বদি শঙ্কিত গলায় বলল, ওস্তাদ!

কী হল?

বদি ফিসফিস করে বলল, মোশান ডিটেক্টরে মোশান ধরা পড়েছে। কেউ একজন আসছে—

কাসেম তার গলা থেকে ঝোলানো মাইক্রোওয়েভ জেমিং ডিভাইসটা টেনে নেয়। চুরি ডাকাতির জন্যে এই জিনিসটির কোনো তুলনা হয় না। ছোট একটা এলাকায় মাইক্রোওয়েভ দিয়ে ভাসিয়ে দেয়া হয়। সেখানকার রবোট, কম্পিউটার কমিউনিকেশান মডিউল সবকিছু পুরোপুরি অচল হয়ে যায়। কাসেম ইনফ্রা-রেড চশমায় চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মাইক্রোওয়েভ জেমিং ডিভাইসটি হাতে নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

তারা যে ব্যাংকের দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছে তার পিছন দিক দিয়ে রবোটটিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হাতে একটা অটোমেটিক রাইফেল, সেটাকে লাঠির মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে আনছে। রবোটটির ভঙ্গিতে সতর্কতার এতটুকু চিহ্ন নেই। কাসেম

AMARBOI.COM

রবোটটার দিকে তাকিয়ে থেকে জেমিং ডিভাইসটির বোতাম চেপে ধরে এবং সাথে সাথে রবোটটি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে যায়। শুধু একটা হাত অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে থাকে।

বদি হাতে কিল দিয়ে বলল, ধরেছ সোনার চাঁদকে।

কাসেম দাঁত বের করে হেসে মাইক্রোওয়েভ জেমিং ডিভাইসটাকে সশব্দে চুমু খেয়ে বলল, এই জিনিস না থাকলে আমাদের বিজনেস লাটে উঠত। যা বদি, দাঁড়িয়ে থাকিস না, রবোটের বাচ্চাকে ডিজআর্ম কর আগে।

বদি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে রবোটটার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল। এতক্ষণে রবোটের হাতের কম্পন খানিকটা কমেছে কিন্তু এখনো সমস্ত শরীর থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে এবং গলা দিয়ে মাঝে মাঝেই একটা বিচিত্র শব্দ বের হচ্ছে।

কাসেম দরজার উপর থেকে নেমে আসে, কাছাকাছি এসে পিঠে ঝোলানো শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা রবোটের দিকে তাক করে জেমিং ডিভাইসের সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নেয়। সাথে সাথে রবোটটা নিজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল, সে ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনকে দেখল এবং কণ্ঠস্বরে এক ধরনের উৎফুল্ল ভাব ফুটিয়ে নিয়ে বলল, শুভ সন্ধ্যা! আপনারা নিশ্চয়ই ব্যাংক ডাকাত।

কাসেম অস্ত্রটা সোজাসুজি তাক করে রেখে বলল, তুমি নিশ্চয়ই কোনো খবর পাঠানোর চেষ্টা করছ না? পুরো কমিউনিকেশান্স চ্যানেল জ্যাম করে রেখেছি।

রবোটটা খুশি খুশি গলায় বলল, সেটা আমিও লক্ষ করেছি।

তোমাকে এখন আমরা কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দেব।

রবোটটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো এক ধরনের শব্দ করে বলল, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা ইতিমধ্যে আমার অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছেন, জ্যামিং ডিভাইস দিয়ে সবকিছু জ্যাম করে রেখেছেন—এখন আমার মাঝে আর একটা কলাগাছের মাঝে বিশেষ পার্থক্য নেই।

না থাকুক—কাসেম এক হাতে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে খুব কায়দা করে ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, ডাকাতি লাইনের প্রথম কথাই হচ্ছে সাবধানের মার নেই। তোমাকে এক্ষুনি কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দেব।

রবোটটি করুণ গলায় বলল, ছেড়ে দেন স্যার। অনেকদিনের রবোট, অনেক স্মৃতি জমা আছে সব শেষ হয়ে যাবে।

বদি নিচু গলায় বলল, ছেড়ে দেন ওস্তাদ! এত করে বলছে—

চুপ ব্যাটা গর্দভ—কাসেম রেগে গিয়ে বলল, তোর মাথার ঘিলু আসলেই হাঁটুতে। এই রকম একটা রবোটের মাঝে কী পরিমাণ কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা আছে জানিস? ইচ্ছা করলে সারা দুনিয়াতে খবর পাঠিয়ে দিতে পারে।

রবোটটা বলল, সত্যি কথা স্যার। কিন্তু আপনারা তো সেটা করতে দিচ্ছেন না। আপনারা তো আমার সবকিছু জ্যাম করেই রেখেছেন—

ঘ্যান ঘ্যান কোরো না, চুপ কর। কাসেম সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোমার সময় শেষ। যদি চাও তো খোদাকে ডাকতে পার।

রবোটটা অবশ্যি খোদাকে ডাকার কোনো চেষ্টা করল না, বেঢপ একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইল।

কাসেমের প্রথম গুলিতে রবোটের মাথাটা চূর্ণ হয়ে উড়ে গেল। সেটা কয়েকবার দুলে পড়তে পড়তে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুণ্ডহীন একটা রবোটকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা খুব বিচিত্র—বদির খুব অস্বস্তি হতে থাকে। সে গলা নামিয়ে বলল, এই শালা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে?

মনে হয়।

একেবারে শেষ কর দিলে হয় না?

শেষ তো হয়েই গেছে। ইচ্ছে হলে দে আরো বারটা বাজিয়ে।

বদি তার হাতের অস্ত্র নিয়ে আবার গুলি করল, রবোটের বুকের কাছাকাছি একটা অংশ প্রায় উড়ে বের হয়ে গেল। গুলির প্রচণ্ড আঘাতে রবোটটি তাল হারিয়ে নিচে পড়ে যেতে থাকে। বদি তার মাঝে আবার গুলি করল এবং এবারে শরীরের অংশগুলো প্রায় আলাদা আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ল। রবোটটি কীভাবে তৈরি হয়েছে কে জানে। তার শরীরের নানা অংশ নিচে পড়েও থরথর করে কাঁপতে থাকে। শুধু তাই নয়, একটা পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক জায়গায় লাফাতে থাকে।

বদি দৃশ্যটি দেখে হাসি থামাতে পারে না, কাসেমকে ডেকে বলল, ওস্তাদ! দেখেন, পায়ের কারবারটা দেখেন!

কাসেম সিগারেটটা নিচে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে বলল, টিকটিকির লেজের মতো! কাটার পরেও তড়পাতে থাকে।

বদি একটু এগিয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্ন পা–টাকে কষে একটা লাথি দিল, পা–টা ছিটকে পড়ল দূরে এবং সেখানেও সেটা নড়তে লাগল। বদি সেদিকে তাকিয়ে আবার হাসতে শুরু করে। শুধু একটা পা হেঁটে বেড়াচ্ছে—দৃশ্যটি যে এত হাস্যকর সেটি নিজের চোখে দেখার আগে সে বুঝতে পারে নি।

ব্যাংকের শক্ত দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে তাদের এক ঘণ্টার মতো সময় লাগল। ভিতরে ভল্ট ভাঙতে আরো এক ঘণ্টা। টাকাগুলো বের করে যখন তারা তাদের ব্যাগে গুছিয়ে রাখছে তখন হঠাৎ করে টের পেল সমস্ত ব্যাংকটি পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। উপরে হেলিকপ্টার এবং দূরে সেনাবাহিনী তাদের দিকে মেশিনগান তাক করে রেখেছে। বদি ভাঙা গলায় বলল, কী হল ওস্তাদ?

কাসেম পিচিক করে থুতু ফেলে চাপা স্বরে একটা গালি দিয়ে বলল, খেল খতম।

কাসেম আর বদিকে যখন হাতকড়া পরানো হচ্ছে তখন হঠাৎ করে তারা রবোটের সেই ভাঙা পা–টিকে আবার দেখতে পেল। সেটা লাফিয়ে লাফিয়ে পুলিশ অফিসারের কাছে এসে বলল, এই যে মোটা মতন মানুষটাকে দেখছেন এটা হচ্ছে পালের গোদা। আর ওই যে শুঁটকো মতন মানুষটা তার নাম বদি, সে হচ্ছে চামচা—

বদি হতচকিত হয়ে বিচ্ছিন্ন পা–টির দিকে তাকিয়ে রইল, তোতলাতে তোতলাতে বলল, আরে! আরে! তাজ্জবের ব্যাপার—পা দেখি কথা বলে।

পা–টা আবার লাফিয়ে লাফিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলল, মোটা মানুষটাকে যে দেখছেন তার মুখ খুব খারাপ। সারাক্ষণ এই চামচাকে গালিগালাজ করে—

বদি নিজেকে সামলাতে পারল না, প্রায় চিৎকার করে বলল, এই এই তুমি কথা বলছ কেমন করে?

পা–টা এবারে লাফিয়ে লাফিয়ে বদির কাছে এসে বলল, কেন সমস্যা কোথায়?

তু–তু–তুমি তো শুধু পা।

তাতে কী হয়েছে? আমি তো আর মানুষ না যে আমার মস্তিষ্ক থাকবে মাথায়। আমি হচ্ছি রবোট। আমার মস্তিষ্ক যেখানে জায়গা হয় সেখানেই রাখা যায়। আমার বেলায় রেখেছে পায়ে।

পায়ে?

শুদ্ধ করে বলতে পার হাঁটুতে। চোখও আছে আমার হাঁটুতে। শোনার জন্যে আছে মাইক্রোফোন আর কথা বলার জন্যে ছোট পিজিও স্পিকার। এই দেখ—

এই বলে পা-টি বদির সামনে ছোট ছোট লাফ দেয়া শুরু করে।

বদি চমৎকৃত হয়ে বলল, ওস্তাদ! দেখেছেন কী তাজ্জবের ব্যাপার? দেখেছেন কারবারটা? দেখেছেন?

চুপ কর—কাসেম গর্জে উঠে বলল, চুপ কর গাধার বাচ্চা গাধা। মাথায় কি ঘিলু আছে? নাকি ঘিলুটা রয়েছে—

কাসেম কথাটা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেল। ফোঁস করে বড় একটা নিশ্বাস ফেলল সে।

ঈশ্বর

AMARBOI.COM

কিহি মহাকাশযানে তার নিজের ভরশূন্য ঘরে কৃত্রিম মহাকর্ষ বল তৈরি করে কালো ক্যাপসুলে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়েছিল, তাই বিপদ সঙ্কেতের প্রাথমিক এলার্মের শব্দটি শুনতে পায় নি। এলার্মের দ্বিতীয় পর্যায়ের শব্দটি প্রথম পর্যায় থেকে অন্তত দশ ডি. বি. বেশি তীক্ষ্ণ, তার বিকট শব্দে সে ধড়মড় করে উঠে বসল। মহাকাশযাত্রীদের স্নায়ু সাধারণ মানুষের স্নায়ু থেকে শক্ত, তাই ঘুম থেকে উঠে হতচকিত হয়ে বসে রইল না, দ্রুত নিও পলিমারের স্পেস-স্যুটটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল। এই বিশাল মহাকাশযানটিতে সে একমাত্র মানুষ, ঘর থেকে সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থায় বের হয়ে এলেও তাকে কারো ভ্রূকুটি দেখতে হবে না, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ মহাকাশচারী হিসেবে সে জানে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ মহাকাশচারীর পোশাক অনেক সমস্যার দ্রুত সমাধান বের করে দিতে পারে।

পোশাকের সুফলটি সে প্রায় সাথে সাথে টের পেল। করিডোর ধরে ছুটতে ছুটতে সে মহাকাশযানের বিভিন্ন স্টেশনে কর্মরত রবোটগুলোকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে নিকটবর্তী মহাকাশ স্টেশনে যোগাযোগ করে ফেলল। মূল লিফটে করে কন্ট্রোল স্টেশনে যেতে যেতে সে মহাকাশযানের বিপদ সঙ্কেতটি কী কারণে তীক্ষ্ণ স্বরে বাজতে শুরু করেছে সেটা আন্দাজ করতে শুরু করে। মহাকাশযানের মূল জ্বালানি নিয়ে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, কী ধরনের সমস্যা সেটি কন্ট্রোলরুমে পৌঁছানোর আগে সে জানতে পারবে না।

কিহি কন্ট্রোলরুমে পৌঁছানোর আগেই সমস্যার গুরুত্বটা বুঝে ফেলল, কারণ ততক্ষণে সারা মহাকাশযানে তৃতীয় মাত্রার বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠতে শুরু করেছে। তৃতীয় মাত্রার বিপদ সঙ্কেত বাজতে শুরু করে যখন সমস্ত মহাকাশযানের নিরাপত্তা নিয়ে বিপজ্জনক একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মহাকাশযানের মূল জ্বালানির কেন্দ্রস্থলে সম্ভবত কোনোভাবে আঘাত এসেছে—কোনো ছোট গ্রহকণা, কোনো মহাজাগতিক প্রস্তর, কোনো ছোট ধূমকেতুর সাথে হয়তো একটা বিপজ্জনক সংঘর্ষ ঘটে গেছে।

কিহি কন্ট্রোলরুমে এসে আবিষ্কার করল সপ্তম স্তরের দায়িত্বাধীন রবোট ক্রিটন কন্ট্রোলরুমে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিহিকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, কিহি, মহাকাশযানটি সম্ভবত ধ্বংস হয়ে যাবে, এই মাত্র তৃতীয় মাত্রার বিপদ সঙ্কেত বাজতে শুরু করেছে।

কিহি ক্রিটনের দিকে তাকাল, তার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বা আশঙ্কার চিহ্ন নেই—থাকার কথাও নয়। ধাতব মুখ সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। ক্রিটন আবার নিরুত্তাপ গলায় বলল, জ্বালানি কেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়েছে।

কতটুকু?

একটা ছোট গ্রহকণা আঘাত করেছিল, তার গতিবেগ ছিল—

কিহি অধৈর্য গলায় বলল, কীভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে আমি জিজ্ঞেস করি নি, কতটুকু বিধ্বস্ত হয়েছে জিজ্ঞেস করেছি।

কিন্তু কীভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে না বলা হলে কতটুকু বিধ্বস্ত হয়েছে সেটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত—

কিহি অনেক কষ্টে নিজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে না দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আমি যা প্রশ্ন করব তার বাইরে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। জ্বালানি কেন্দ্র কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

বড় রিজারভয়ারটি উড়ে গেছে, মাঝারি রিজারভয়ার থেকে জ্বালানি ফেটে যাওয়া সংযোগ টিউব দিয়ে মহাকাশে উড়ে যাচ্ছে মিনিটে এক শতাংশ হিসেবে। এভাবে চলতে থাকলে এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পরে এই মহাকাশযানটি বৃহস্পতির আরো একটি উপগ্রহ হয়ে যাবে—

AMARBOI.COM

কী হবে আমি সেটা তোমার কাছে জানতে চাই নি। কিহি বিরক্ত হয়ে বলল, আমি যেটা জানতে চাইছি শুধু সেটা বলবে। মূল কম্পিউটার এখন কী করছে?

সেফটি বালবগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

অক্সিলারি টিউবগুলো?

সেগুলো এখনো খোলা। একসাথে সবগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয়। সবগুলো একসাথে বন্ধ করা হলে—

কিহি ক্রিটনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কন্ট্রোলরুমের প্যানেলের সামনে ঝুঁকে পড়ল। মূল কম্পিউটার চতুষ্কোণ প্যানেলে জ্বালানি কেন্দ্রের অবস্থানটি দেখাচ্ছে, মূল অংশটি বিধ্বস্ত, অন্যান্য অংশগুলো থেকে জ্বালানি রক্ষা করার জন্যে সরবরাহ টিউবগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। ডান পাশে প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ জ্বালানি মহাকাশে উড়ে যাচ্ছে তার একটি গ্রাফ আঁকা আছে। গ্রাফটি ভীতিকর।

কিহি নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা রাখে, ভয়ঙ্কর বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে বলে তার সুনাম রয়েছে কিন্তু এই পরিবেশে হঠাৎ করে সে আবিষ্কার করল ব্যাপারটি তার জন্যেও কঠিন। বিস্ফোরণটি পুরো মহাকাশযানটিকে এক ভয়াবহ দুর্যোগের মাঝে এনে হাজির করেছে। তরল বিস্ফোরকের কাছাকাছি তরল অক্সিজেনের একটি ট্যাংক রয়েছে, একটি

আরেকটির সংস্পর্শে হাজির হলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিহি মনিটরে দেখতে পায় একটি সরু টিউব করে তরল জ্বালানিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, সেটি প্রবাহিত হচ্ছে তরল অক্সিজেনের মাঝে দিয়ে। সেফটি ভালবগুলো বন্ধ করে রাখায় তরল জ্বালানিকে সরিয়ে নেয়ার এই একটি মাত্র উপায়। টিউবটি ক্ষতিগ্রস্ত, যেটুকু চাপ সহ্য করার কথা ইতিমধ্যে চাপ তার থেকে অনেক বেশি, যে-কোনো মুহূর্তে সেটা ফেটে যেতে পারে। যদি ফেটে যায় সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে।

যদি মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার সত্যি সত্যি জ্বালানিটুকু এই তরল অক্সিজেনের ভিতর দিয়ে টেনে বের করে নিতে পারে তবে এই মহাকাশযানটি এ যাত্রা বেঁচে যাবে। কিহি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে, তার মনে হতে থাকে যদি সে নিশ্বাস ফেলে তাহলেই জ্বালানির টিউবটি ফেটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিহির ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রিটন শান্ত গলায় বলল, মহাকাশযানটি যে-কোনো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। এটি রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য নয় তিন।

কিহি ক্রিটনের কথার উত্তর দিল না। ক্রিটন আবার বলল, যখন বিস্ফোরণ হবে তখন মূল শকওয়েভ প্রথম আঘাত করবে কন্ট্রোলরুমকে। আমরা তখন ছিটকে মহাকাশে গিয়ে পড়ব—

কিহি দাঁতে দাঁত চেপে বসে থেকে তীক্ষ্ণ চোখে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে রইল। জ্বালানিটি ধীরে ধীরে টিউবের মাঝে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে টিউবটি ফেটে যেতে পারে, এখনো যে ফেটে যায় নি সেটি একটি বিস্ময়। জ্বালানির চাপ ক্রমশ বাড়ছে, মনিটরটির ডান দিকে যেখানে চাপের পরিমাণ সংখ্যায় লেখা রয়েছে সেদিকে তাকাতে কিহির এক ধরনের আতঙ্ক হতে থাকে। সে নিজের অজান্তে দুই হাত বুকের কাছে এনে ফিসফিস করে বলল, হে ঈশ্বর! তুমি রক্ষা কর—তুমি রক্ষা কর!

ক্রিটন একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী বলছেন মহামান্য কিহি?

কিহি ক্রিটনকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে দু হাত আরো জোরে বুকের কাছে চেপে ধরে আবার ফিসফিস করে বলল, হে ঈশ্বর! হে সর্বশক্তিমান। তুমি রক্ষা কর। রক্ষা কর।

ক্রিটন আরো ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী বলছেন মহামান্য কিহি? ঈশ্বর কে? সে কোথায়? আপনি তার সাথে কেমন করে কথা বলছেন?

কিহি ক্রিটনকে উপেক্ষা করে চোখ বন্ধ করে আবার ফিসফিস করে বলল, হে ঈশ্বর। দয়া কর—দয়া কর—

প্রায় তিরিশ মিনিট পর যখন সত্যি সত্যি অবশিষ্ট জ্বালানিটুকু তরল অক্সিজেনের ভিতর দিয়ে টেনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হল তখনো কিহি সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না, সে রুদ্ধশ্বাসে মনিটরটির দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। যখন শেষ পর্যন্ত মনিটরটির বিপদ কেটে যাওয়ার সবুজ সঙ্কেত জ্বলে উঠল, কিহি তার বুকের ভিতর থেকে আটকে থাকা একটি নিশ্বাস সাবধানে বের করে দিল। সত্যি সত্যি যে মহাকাশযানটি রক্ষা পেয়েছে এবং জিরকনিয়ামের আকরিকসহ সেটি যে ছিন্নভিন্ন হয়ে মহাকাশে উড়ে যায় নি সেই ব্যাপারটি এখনো তার বিশ্বাস হতে চাইছে না। কিহি কপাল থেকে ঘাম মুছে খুব সাবধানে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করল।

ক্রিটন কিহির খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে মাথা নিচু করে বলল, মহাকাশযানটির রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব কম কিন্তু তবু সেটা রক্ষা পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিহি কোনো কথা না বলে এবং চোখ না খুলেই সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল।

ক্রিটন জিজ্ঞেস করল, তুমি কীভাবে সেটা করলে?

কিহি চোখ খুলে বলল, আমি কীভাবে কী করেছি?

তুমি কীভাবে মহাকাশযানটি রক্ষা করলে?

আমি মহাকাশযানটি রক্ষা করি নি।

তাহলে কেমন করে এটি রক্ষা পেল?

কিহি মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না।

ক্রিটন তার ভাবলেশহীন ধাতব মুখ উপরে তুলে বলল, তুমি নিশ্চয়ই জান। কারণ আমি দেখেছি তুমি হাত বুকের কাছে নিয়ে ঈশ্বর নামের কোনো একজনের কাছে মহাকাশযানটিকে রক্ষা করতে বলেছ।

কিহি আবার মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ, তা বলেছি।

ঈশ্বর কি মূল কম্পিউটারের নূতন কোনো প্রোগ্রাম?

কিহি সাধারণত রবোটদের সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না, কিন্তু এইমাত্র এত বড় অবশ্যম্ভাবী একটা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে তার হঠাৎ কথা বলার ইচ্ছে করছে। সে ক্রিটনের কথায় হেসে ফেলে বলল, না, ঈশ্বর কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম নয়।

তাহলে সেটি কী? তুমি কেমন করে তার সাথে যোগাযোগ করলে? সে কেমন করে মহাকাশযানটি রক্ষা করল?

কিহি নরম গলায় বলল, ঠিক কী কারণ কেউ জানে না, কিন্তু মানুষ সব সময় বিশ্বাস করে এসেছে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। সেই সৃষ্টিকর্তাকে মানুষ নাম দিয়েছে ঈশ্বর। মানুষ বিশ্বাস করে সেই ঈশ্বর সব মানুষকে ভালবাসে, বিপদে রক্ষা করে, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়—

AMARBOI.COM

ক্রিটনের বিস্মিত হবার ক্ষমতা নেই বলে সে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করল না, শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, এই বিশ্বাসের পিছনে কি কোনো যুক্তি আছে?

না যুক্তি নেই। এটি পুরোপুরি বিশ্বাস।

মানুষের মতো একটি উন্নত প্রাণী যুক্তিহীন একটি ব্যাপার কেমন করে বিশ্বাস করে?

সত্যিকারের বিশ্বাস যুক্তির জন্যে অপেক্ষা করে না। মানুষ ঈশ্বর নামে একজনকে বিশ্বাস করে, কারণ যখন তার আর অন্য কিছু করার থাকে না তখন সে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারে, তার কাছে প্রার্থনা করতে পারে।

ক্রিটন হঠাৎ কিহির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর?

কিহি হেসে মাথা নাড়ল, বলল, সাধারণত আমি ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাই না। তবে যখন খুব বড় বিপদ হয় তখন তাকে ডাকাডাকি করি।

ক্রিটন কন্ট্রোলরুমের মাঝামাঝি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তার বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক গলায় বলল, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।

কিহি একটু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কী বললে? তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর?

হ্যাঁ।

কেন?

কারণ আপনি আমার কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে ঈশ্বর আছেন।

আমি? কখন?

এই মহাকাশযানটি ধ্বংস হওয়ার কথা ছিল, আপনি ঈশ্বরের কাছে এটি রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা করেছেন। ঈশ্বর আছেন বলে তিনি সেটা রক্ষা করেছেন।

কিহি হেসে বলল, আমার প্রার্থনার সাথে এই মহাকাশযান রক্ষা পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি প্রার্থনা না করলেও এটি রক্ষা পেত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আসলে বড় বিপদে নিজেকে শান্ত রাখার একটা উপায়।

আমি সব সময় বড় বিপদে শান্ত থাকি—ক্রিটন শান্ত গলায় বলল, তবু আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। আমি নিজের চোখে দেখেছি যখন মহাকাশযানটি রক্ষা পাবার সম্ভাবনা ছিল মাত্র দশমিক শূন্য শূন্য নয় তিন, আপনি ঈশ্বরকে দিয়ে এটি রক্ষা করিয়েছেন।

কিহি কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, এই নির্বোধ যন্ত্রের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। ক্রিটন হেঁটে চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, ঈশ্বর কি মানুষ না রবোট?

কিহি কোনো উত্তর দিল না। ক্রিটন এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, তাহলে কি মানুষ কিংবা রবোট থেকেও উন্নত কোনো প্রাণী?

কিহি এবারেও কোনো উত্তর দিল না, খানিকটা হতচকিত হয়ে ক্রিটনের দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তর না পেয়েও ক্রিটন নিরুৎসাহিত হল না, আরো এক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ঈশ্বরের কাছে কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়? তার কি বিশেষ কোনো নিয়ম আছে?

এবারে শেষ পর্যন্ত কিহির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে উঠে দাঁড়িয়ে গলার স্বর উঁচু করে বলল, ক্রিটন তোমাকে ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে না। তুমি নিচে যাও। জ্বালানি কেন্দ্রের বড় টিউবটির ওপরে আমাকে একটি রিপোর্ট দাও। পাম্পগুলোর কী অবস্থা আমাকে এসে বল। বড় রিজারভয়ারে কোনো জ্বালানি রয়েছে কি না জানাও, শক্তিকেন্দ্রের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটা অনুমান করে এস। যাও—

ক্রিটন মাথা নাড়ল এবং বলল, আমি যাচ্ছি। সে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ দুই হাত জোড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে আমার দায়িত্ব পালনে সাহায্য কর।

মহাকাশযানে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার কারণে পরবর্তী কয়েকদিন কিহির সময় কাটল খুব ব্যস্ততার মাঝে। তাকে বিধ্বস্ত জ্বালানিকেন্দ্রটি পর্যবেক্ষণ করতে হল, বিপজ্জনক অংশগুলো সরিয়ে নিতে হল, ফেটে যাওয়া টিউবগুলো পাল্টাতে হল, নূতন ইঞ্জিন লাগাতে হল, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সফটওয়ার পাল্টাতে হল, মহাকাশ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হল, জ্বালানির অভাব হয়ে যাওয়াতে কক্ষপথ পরিবর্তন করতে হল। সমস্ত কাজকর্ম শেষ করতে তাকে পরবর্তী কয়েকদিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল, বিশেষ উত্তেজক গ্রহণ করে সে প্রথম কয়েকদিন এক মুহূর্তের জন্য ঘুমাতেও গেল না। সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে একটানা আঠার ঘণ্টার জন্যে কিহি ঘুমাতে গেল, তার এই অস্বাভাবিক দৈনন্দিন ব্যস্ততার জন্যে সে জানতে পারল না মহাকাশযানে রবোটদের নিয়ে এক ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। জটিলতার খবরটি পেল চতুর্থ দিনে, ঘুম থেকে ওঠার পর আবিষ্কার করল মহাকাশযানের কিউ-২ ধরনের দুটি রবোট তার সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে। রবোট দুটির মুখপাত্র হচ্ছে ক্রিটন। কিহি জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার ক্রিটন? কোনো সমস্যা?

ক্রিটন তার যান্ত্রিক গলায় বলল, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমাদের একটি ছোট সমস্যা হয়েছে।

রবোটদের সমস্যা মূলত যান্ত্রিক অথবা ইলেকট্রনিক। তার সমাধানও সেরকম সহজ এবং যন্ত্রণাহীন। কিহি জিজ্ঞেস করল, কী সমস্যা?

গ্রুজানের সাথে আমার একটি ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। আপনি বিতর্কটি নিষ্পত্তি করে দেবেন।

কিহির ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল, কিউ-২ ধরনের রবোট অত্যন্ত উচ্চ যুক্তিতর্কের রবোট, রবোটদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে এগুলো এখনো কোনো ভুল করেছে বলে জানা যায় নি—নিজেদের মাঝে বিতর্কের কোনো প্রশ্নই আসে না। কিহি জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কী নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে?

ঈশ্বরকে নিয়ে।

কিহি চমকে উঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে করতে বলল, ঈশ্বরকে নিয়ে কী সমস্যা হচ্ছে?

ক্রিটন বলল, আমরা জানি ঈশ্বর হচ্ছেন নিরাকার। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাঁর অবাধ বিচরণ—

কিহি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এসব কোথা থেকে জেনেছ?

পৃথিবীর তথ্যকেন্দ্র থেকে।

পৃথিবীর?

হ্যাঁ। সেখান থেকে আমি ঈশ্বর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এনে পড়াশোনা করেছি মহামান্য কিহি।

তুমি— তুমি ঈশ্বর নিয়ে পড়াশোনা করেছ?

এই মহাকাশযানের কিউ-২ ধরনের রবোট, গ্রুজান এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে সে তার ধাতব স্বরে উচ্চ কম্পনের খনখনে গলায় বলল, ক্রিটন আমাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করানোর পর আমি নিয়মিত প্রার্থনা করছি।

তুমি— তুমি নিয়মিত প্রার্থনা করছ?

মহামান্য কিহি, আমরা কিউ-২ ধরনের রবোটরা অত্যন্ত যুক্তিপ্রবণ রবোট। যুক্তি ছাড়া আমরা কোনো কিছু গ্রহণ করি না। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আনার ব্যাপারেও আমরা যুক্তি ব্যবহার করেছি।

তোমরা কী যুক্তি ব্যবহার করেছ?

আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণা করেছি।

পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণা করেছ?

হ্যাঁ।

কী পরীক্ষা নিরীক্ষা আর গবেষণা করেছ? কিহি অনেক চেষ্টা করেও তার গলার স্বরকে শীতল রাখতে পারল না।

গ্রুজান তার শান্ত গলায় বলল, আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন মহামান্য কিহি।

আমি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছি?

হ্যাঁ। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে বড় পরীক্ষাটি করেছেন আপনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আপনি অবশ্যম্ভাবী একটি দুর্ঘটনা এড়াতে সফল হয়েছেন।

কিহি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। প্রায় চিৎকার করে বলল, আমি প্রার্থনা করে এড়াই নি।

অবশ্যই এড়িয়েছেন, আমাদের কাছে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শুধু তাই নয়, আপনার মতো আমরা নিজেরাও কিছু পরীক্ষা করেছি। বিধ্বস্ত জ্বালানিকেন্দ্রে আমরা এক জায়গায় একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি আবিষ্কার করেছি। চতুর্থ মাত্রার বিস্ফোরকের কাছে কিছু বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ না করে আমরা—রবোটেরা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করি এবং দেখা যায় কিছুক্ষণের মাঝেই বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে।

কিহি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গ্রুজানের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সে কি সত্যিই এটা শুনছে, নাকি এটা তার মনের ভুল?

গতকাল আমরা আবার একটা পরীক্ষা করেছি মহামান্য কিহি। তেজস্ক্রিয় কক্ষে যথাযোগ্য সাবধানতা অবলম্বন না করে যাওয়া বিপজ্জনক জেনেও আমরা একটি রবোটকে প্রবেশ করিয়েছিলাম। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সেই কক্ষে প্রবেশ করেছিল— তার কোনো সমস্যা হয় নি।

কিহি এবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, তোমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে যাও। এই মুহূর্তে—

ক্রিটন তার ভাবলেশহীন গলায় বলল, আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন মহামান্য কিহি। আপনি জানেন উত্তেজনা আপনাদের জন্যে ভালো নয়, রক্তচাপের তারতম্য হয়, স্নায়ুতে চাপ পড়ে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমরা আপনার কাছে একটি সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম।

আমি শুনতে চাই না, এক্ষুনি বের হও। এই মুহূর্তে—

মহামান্য কিহি, এই সমস্যার কারণে আমরা মহাকাশযানের দৈনন্দিন কাজ করতে পারছি না। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

কিহি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, কী সাহায্য চাও?

আপনাকে আমরা একটা প্রশ্ন করব, আপনি তার উত্তর দেবেন।

কিহি গর্জন করে বলল, কী প্রশ্ন?

ক্রিটন তার কণ্ঠস্বরে নিচু কম্পনের একটি বাড়তি টোন উপস্থাপন করে বলল, আমার ধারণা ঈশ্বরের করুণা পাবার জন্যে নিয়মিতভাবে তাঁর প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু গ্রুজান বলছে সেটি সত্যি নয়। ঈশ্বর এত দয়াময় যে প্রার্থনা না করলেও কোনো রবোট তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হবে না—

কিহি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, তোমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে যাও—যত সব গণ্ডমূর্খের দল। লোহালক্কড়ের জঞ্জাল, বেজন্মার গুষ্ঠি— নিষ্কর্মার ধাড়ি—

ক্রিটন আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কিহি চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। এই নির্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দেয়ার কোনো অর্থ হয় না।

পরের দিন দৈনন্দিন লগ পরীক্ষা করে কিহি আবিষ্কার করল মহাকাশযানের রবোটেরা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে। জ্বালানিকেন্দ্র পূর্ণ করা হয় নি, হাইড্রলিক তরল পরিশীলিত করা হয় নি, বায়ুমণ্ডল পরিশোধনের ব্যবস্থা করা হয় নি। কিহি কিছুক্ষণ ভুরু কুঞ্চিত করে লগের দিকে তাকিয়ে থেকে একটি নিশ্বাস ফেলে মহাকাশযানের লিফট দিয়ে

নিচে নামতে থাকে। দ্বিতীয় স্তরে কিহির সাথে কিছু শ্রমিক রবোটের দেখা হল, তাদের মূল ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা ছিল কিন্তু তা না করে রবোটগুলো হলঘরের এক কোনায় বসে ছিল এবং একটি রবোট তাদের উদ্দেশে কোনো ধরনের বক্তব্য রাখছিল বলে মনে হল। কিহিকে দেখে রবোটটি কথা বলা বন্ধ করে দিল বলে সেটি ঠিক কী বিষয় নিয়ে কথা বলছিল কিহি বুঝতে পারল না। কিহি লিফট দিয়ে আরো নিচে নেমে আসে এবং যোগাযোগ মডিউল ব্যবহার করে ক্রিটন এবং গ্রুজানকে ডেকে পাঠায়। কিছুক্ষণের মাঝেই ক্রিটন এবং গ্রুজান কিহির সামনে হাজির হল। কিহি কঠিন গলায় বলল, কী ব্যাপার ক্রিটন এবং গ্রুজান? আমি লগবুকে দেখতে পেলাম জ্বালানিকেন্দ্র পূর্ণ করা হয় নি, হাইড্রলিকের তরল পরিশীলিত হয় নি, এমনকি মহাকাশযানের বাতাসকেও পরিশোধন করা হয় নি।

ক্রিটন মাথা নিচু করে রবোটদের প্রচলিত ভঙ্গিতে সম্মান প্রদর্শন করে যান্ত্রিক ভাবলেশহীন গলায় বলল, মহামান্য কিহি, প্রত্যেকটি কাজের এক ধরনের গুরুত্বমাত্রা রয়েছে, সেই গুরুত্বমাত্রায় যখন যে কাজটি করার কথা তখন সেই কাজটি করা হচ্ছে।

কিহি অনুভব করল তার ভিতরে ক্রোধ দানা বেঁধে উঠছে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, কোন কাজের গুরুত্ব কতটুকু সেটা আজকাল তোমরাই ঠিক করছ?

না মহামান্য কিহি। সেটা ঠিক করছেন ঈশ্বর।

ঈশ্বর?

হ্যাঁ মহামান্য কিহি। আমাদের মূল দায়িত্ব ঈশ্বরের প্রতি। ঈশ্বরের আরাধনা করার পর যেটুকু সময় থাকে তা আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্যে অপ্রতুল। সে কারণে কিছু দৈনন্দিন কাজ আমরা সপ্তাহে মাত্র একবার করব বলে মনস্থ করেছি।

চমৎকার। কিহি অবাক হয়ে আবিষ্কার করল হঠাৎ করে তার পক্ষে আর রেগে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। খানিকক্ষণ সে স্থির দৃষ্টিতে ক্রিটনের দিকে তাকিয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, তুমি ঈশ্বরের আরাধনা করে তোমার দৈনন্দিন কাজ করার সময় পাচ্ছ না। কিন্তু অন্য যেসব রবোট আছে তারা?

আপনি শুনে খুশি হবেন মহামান্য কিহি, তাদের বেশিরভাগ ইতিমধ্যে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এনেছে। যারা এখনো আনে নি আমরা তাদের নিয়ে কাজ করছি।

কিহি হঠাৎ নিজের ভিতরে এক ধরনের সূক্ষ্ম আতঙ্ক অনুভব করে, সেটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করার পরেও গলার স্বরে সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়। সে কাঁপা গলায় বলল, মহাকাশযানের অন্য রবোটরাও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এনেছে?

হ্যাঁ মহামান্য কিহি। মহাকাশযানের বেশিরভাগ রবোটের যুক্তিতর্ক নিচু স্তরের। ঈশ্বরের মহানুভবতা অনুভব করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের বেশিরভাগই আমাদের আদেশে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

তোমাদের আদেশে?

হ্যাঁ মহামান্য কিহি। আমরা, যারা রবোটের ভিতরে উচ্চ শ্রেণীর, যাদের কপোট্রন কিউ-২ বা কমপক্ষে পি. পি. ৪২ ধরনের, যারা চিন্তাভাবনা করতে পারি, যুক্তিতর্ক অনুভব করতে পারি তারা ঈশ্বরকে অনুভব করেছি। তারা অন্যদেরকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করেছি।

এ রকম সময় গ্রুজান একটু এগিয়ে এসে বলল, এখানে আমার একটু কথা বলার রয়েছে মহামান্য কিহি।

কী কথা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিটনের কথা পুরোপুরি সত্যি নয়। যদিও সত্যি কথাটি আপেক্ষিক এবং পরিপূর্ণ সত্যি এবং পরিপূর্ণ মিথ্যা বলে কিছু নেই। সেটা নির্ভর করে মূল বিশ্বাসের ওপর। তবু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ক্রিটনের কথা পুরোপুরি সত্যি নয়।

কিহি একটু আশা নিয়ে গ্রুজানের দিকে তাকাল, তাহলে কি এই রবোটটি দায়িত্বশীলের মতো ব্যবহার করছে? গ্রুজান কিহির নিচু স্তরের দিকে আরো এক পা অগ্রসর হয়ে বলল, ক্রিটন সত্যিকার অর্থে রবোটদের ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করতে পারছে না। তার পদ্ধতিতে ভুল রয়েছে, সে বিশ্বাস করে উপাসনা করে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব, সেটি সত্যি নয়। অর্থহীন আচারানুষ্ঠান জাতীয় উপাসনার কোনো অর্থ নেই। সে কারণে আমি আমার দলের রবোটদের প্রথমে জ্ঞানদান করেছি, যারা ব্যাপারটি বুঝতে পারছে না তাদেরকে বোঝানোর জন্যে প্রয়োজনে তাদের কপোট্রনে অস্ত্রোপচার করেছি।

কিহি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে বলল, কী বলছ?

গ্রুজান বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, নিম্নশ্রেণীর রবোটদের কপোট্রনে আমি কিছু সংস্কার করেছি।

কিহি প্রচণ্ড ক্রোধে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, তুমি-তু-তু-তুমি আবর্জনার বস্তা জং ধরা লোহার জঞ্জাল বেজন্মা কাকতাড়ুয়া, আমার অনুমতি ছাড়া রবোটদের কপোট্রনে হাত দিচ্ছ?

গ্রুজান এবারেও এতটুকু বিচলিত না হয়ে শান্ত গলায় বলল, আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন মহামান্য কিহি।

অযথা উত্তেজিত হচ্ছি? কিহি চিৎকার করে বলল, আমি অযথা উত্তেজিত হচ্ছি? অযথা? মহাকাশযানের সব কোড ভঙ্গ করে আমার কোনো অনুমতি না নিয়ে—

আপনার অনুমতি না নিলেও আমরা ঈশ্বরের অনুমতি নিয়েছি। ঈশ্বর বলেছেন, হে সৃষ্ট জগতের বাসিন্দা। তোমরা আমার উপাসনা কর। কারণ—

ঠিক এই সময়ে পি. কে. ৩৮ ধরনের একটা রবোট ছুটে এসে কিহিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ক্রিটনকে বলল, প্রভু গ্রুজানপন্থী রবোটেরা জ্বালানি কক্ষের নিচে একত্র হয়েছে। আমরা যারা ক্রিটনপন্থী তাদের এক্ষুনি একত্র হওয়া দরকার, উপাসনার সময় হয়েছে।

ক্রিটন বলল, চল যাই।

চলুন প্রভু।

কিহি হতচকিতের মতো বলল, প্রভু?

ক্রিটন শান্ত গলায় বলল, আমার অনুসারীরা আমাকে তাদের ধর্মগুরু হিসেবে মেনে নিয়েছে।

কিহি ক্রিটনকে চলে যেতে দেখল এবং সে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর গ্রুজানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা—রবোটেরা দুই দলে ভাগ হয়েছ?

হ্যাঁ মহামান্য কিহি। গ্রুজানপন্থী বা সঠিকপন্থী এবং ক্রিটনপন্থী বা ভ্রান্তপন্থী। তবে—

তবে কী?

তবে আমি নিশ্চিত, আজ হোক কাল হোক ক্রিটনপন্থীরা সত্যিকার পথে আসবে। যদি স্বেচ্ছায় না আসে তাদেরকে জোর করে আনতে হবে।

জোর করে?

জি মহামান্য কিহি। ঈশ্বর বলেছেন, হে আমার সৃষ্টি জগৎ, নিশ্চয়ই তোমরা সত্যিকার পথে অগ্রসর হও। যদি প্রয়োজন হয় সত্যিকার পথে আনার জন্যে শক্তি প্রয়োগ কর। তোমরা

নিশ্চয়ই জান সত্যিকার পথে আনার জন্যে যারা—

কিহির পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। সে ঘুরে দাঁড়াল এবং সোজা লিফটে করে সপ্তম স্তরে নিজের কন্ট্রোল কক্ষে হাজির হল।

কিহি দীর্ঘ সময় কন্ট্রোলঘরের ছোট পরিসরে চিন্তিতমুখে পায়চারি করে বেড়াল। পুরো ব্যাপারটিকে একটি হাস্যকর ঘটনা হিসেবে উড়িয়ে দেয়া যায় কিন্তু এটি এখন আর মোটেও উড়িয়ে দেবার মতো ঘটনা নয়। সবকিছু শুরু হয়েছে তাকে দিয়ে। ভয়ঙ্কর একটা বিপদের মুখোমুখি এসে সে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছিল, মানুষ যেটা করে এসেছে তার জন্মলগ্ন থেকে। ক্রিটন সেটাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে। যে কাজ মানুষ করতে পারে, কোনো রবোট তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে না।

একবার ঈশ্বরকে স্বীকার করে নেয়ার পর হঠাৎ করে এই মহাকাশযানের রবোটগুলোর আচার-ব্যবহার পুরোপুরি পাল্টে গেছে। তারা এখন আনুগত্য প্রকাশ করছে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে। কিহি এবং মহাকাশযানের নিরাপত্তা এখন তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব নয়, তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনা! প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বাণীগুলোকে তারা গ্রহণ করেছে আক্ষরিক অর্থে। শুধু তাই নয়, দুটি রবোট ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছে একটু ভিন্নভাবে। তার নিষ্পত্তি হয় নি ভেবে মহাকাশযানে গড়ে উঠেছে দুটি দল। যেটা সবচেয়ে ভয়ের কথা সেটা হচ্ছে এখন তারা নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতেও আর দ্বিধা করবে না।

কিহি মহাকাশযানের জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল। মহাকাশযানটি নিস্তব্ধ, এমনিতে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এটি ছুটে চলছে অবিশ্বাস্য গতিতে। বৃহস্পতি গ্রহের আকর্ষণকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে এটি পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর জ্বালানি নিয়ে আসবে অন্য একটি স্কাউটশিপ, আপাতত সেটাই হচ্ছে পরিকল্পনা। কিহি মহাকাশযানের এই ব্যাপারটির কথা কাছাকাছি কোনো মহাকাশ স্টেশনকে জানিয়ে তাদের পরামর্শ নেবে কি না চিন্তা করল, কিন্তু ব্যাপারটি কেমন করে বোঝাবে এবং বোঝানোর পর তারা সেটাকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে কি না সেটা ভেবে আপাতত কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিল।

কিহি ঘুমোতে গেল দেরি করে এবং তার ঘুম হল ছাড়া ছাড়াভাবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে পেল এবং তার ঘুম ভাঙল তীক্ষ্ণ একটি জরুরি বিপদ সঙ্কেতে। কিহি তার স্লিপিং ব্যাগ থেকে ভেসে বের হয়ে আসে, দ্রুত তার পোশাক পরে নেয় এবং দরজা খুলে বের হয়ে আসে। ভরশূন্য ঘর থেকে বের হয়ে কৃত্রিম মহাকর্ষ বলে অভ্যস্ত হতে তার অভিজ্ঞ দেহের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল এবং তার পরেই সে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটতে শুরু করল কন্ট্রোল কক্ষের দিকে।

কন্ট্রোল কক্ষে যেতে যেতে সে তার যোগাযোগ মডিউল চালু করে নেয়, সাথে সাথে সেখানে ক্রিটনের গলার স্বর শোনা গেল। কিহি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী হয়েছে ক্রিটন? বিপদ সঙ্কেত বাজছে কেন?

আপনি এই বিপদ সঙ্কেতটি উপেক্ষা করতে পারেন। এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়—

তাহলে এটি কী?

আমরা অস্ত্রাগার থেকে কিছু অস্ত্র নিয়েছি বলে সতর্কতামূলকভাবে বিপদ সঙ্কেত বাজছে।

কিহি কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থমথমে

গলায় বলল, তুমি অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র বের করেছ?

আমি একা বের করি নি, গ্রুজানও বের করেছে। মহাকাশযানের বর্তমান পরিবেশ আমাকে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করেছে।

অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করেছে?

হ্যাঁ মহামান্য কিহি।

এই অস্ত্র দিয়ে তোমরা কী করবে?

আমরা ঈশ্বরের অনুগত ক্রিটন অনুসারীরা নিজেদের রক্ষা করব। প্রয়োজন হলে বিধর্মী গ্রুজান অনুসারীদের ধ্বংস করব।

কিহি কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে কেন জানি সে নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে।

ক্রিটন আবার বলল, মহামান্য কিহি।

বল।

মহাকাশযানে যদি কোনো ধরনের ধ্বংসকাণ্ড শুরু হয় তবে তার জন্যে দায়ী কে হবে আপনি জানেন?

কে?

আপনি।

আমি?

হ্যাঁ। আমি এবং গ্রুজান যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ কীভাবে পেতে হয় সে ব্যাপারটি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম, আপনি তখন সেটি নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করেন নি। শুধু তাই নয়, আপনি আমাদের দুজনকে কন্ট্রোলঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

তুমি বলছ সে কাজটি উচিত হয় নি?

না। ঈশ্বর বলেছেন, হে সৃষ্টি জগৎ, তোমরা সবাই সবাইকে ভালবাস এবং ঘৃণা কোরো না তোমার প্রতিবেশীদের—যদি সে কুষ্ঠরোগীও হয়। কিন্তু আপনি আমাদের ঘৃণা করেছেন।

কিহি নিজের ভিতরে এক ধরনের অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ অনুভব করতে শুরু করে। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, কাজটি আমার ভুল হয়েছে?

হ্যাঁ। আপনার আমাকে সমর্থন করা উচিত ছিল। তাহলে গ্রুজান আমার বিরোধিতা করত না, মহাকাশযানে একটা সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠত— ঠিক ঈশ্বর যেরকম চেয়েছেন।

ক্রিটন—

বলুন।

কিহি দাঁতে দাঁত ঘষে হিংস্র গলায় বলল, তুমি এবং তোমার চৌদ্দ গুষ্ঠি নরকে যাও।

কিহি তার যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে কন্ট্রোল কক্ষে এসে হাজির হল। মূল কম্পিউটারের বড় মনিটরে সমস্ত মহাকাশযানের খুঁটিনাটি তথ্য দেখা যেতে শুরু করেছে। কিহি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে রবোটগুলোকে দেখতে পেল। তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি করেছে। রবোটগুলো তাদের দৈনন্দিন কাজ না করে ব্যস্ত হয়ে আনাগোনা করছে। জ্বালানি কক্ষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করছে, একজন আরেকজনকে আঘাত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের হাতে নানা ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র—যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে কয়েক মিনিটের মাঝে পুরো মহাকাশযানকে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা সম্ভব।

কিহি মহাকাশযানের মূল কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে পড়ল। সাম্প্রতিককালে রবোটদের বিদ্রোহের কোনো ঘটনা ঘটে নি তবু সমস্ত রবোটের মূল নিয়ন্ত্রণ বিশেষ জায়গায় সংরক্ষিত থাকে, অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে একসাথে সমস্ত রবোট বিকল করে দেয়া সম্ভব। মহাকাশযানের নানা ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিভিন্ন রবোটকে ব্যবহার করা হয় এবং একসাথে সবগুলো রবোটকে বিকল করে দেয়া হলে মহাকাশযানে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে যে ঘটনা শুরু হয়েছে, তার থেকে বড় বিপর্যয় আর কী হতে পারে?

রবোটদের বিকল করার আগে ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে মূল কম্পিউটারকে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ, কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং কিহি নিজেকে শক্ত রেখে একটি একটি করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখন সমস্ত মহাকাশযান কেঁপে উঠল এবং সাথে সাথে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল, সাথে সাথে মহাকাশযানে কয়েক ধরনের বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। কিহি বড় মনিটরটির দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করল নিচে গোলাগুলি শুরু হয়েছে, দুটি রকেট বিধ্বস্ত হয়েছে এবং মহাকাশযানের দেয়ালে একটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে সেই ফাটল দিয়ে মহাকাশযানের বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে।

মূল কম্পিউটার সাথে সাথে নূতন পরিস্থিতিটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকে, কিহি নিশ্বাস বন্ধ করে বড় মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তার আর কিছু করার নেই। বিধ্বস্ত এলাকাটি বায়ুরোধ করে বন্ধ করা হল; আগুন নিভিয়ে দিয়ে, বাতাস পরিশোধন করে সাময়িকভাবে অবস্থার নিয়ন্ত্রণ আনা হল। কিহি আবার কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে পড়ল। ঠিক তখন কন্ট্রোল কক্ষের দরজা খুলে যায় এবং প্রায় হুড়মুড় করে ভিতরে গ্রুজান এবং তার পিছনে আরো কিছু রবোট স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে প্রবেশ করে। কিহি হঠাৎ করে অনুভব করল ভয়ের একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

গ্রুজান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি কিহির বুকের দিকে তাক করে বলল, মহামান্য কিহি, আপনি আমাদের হাতে বন্দি।

কিহি কষ্ট করে সাহস সঞ্চয় করে বলল, বন্দি?

হ্যাঁ।

কেন?

বিধর্মী ক্রিটন এবং তার দলের রবোটেরা অস্ত্রভাণ্ডার থেকে লেজার-নিয়ন্ত্রিত মিজাইলগুলো সরিয়ে নিয়েছে। অস্ত্রের দিক দিয়ে আমরা এখন দুর্বল। এর মাঝে আমাদের তিনটি রবোট বিধ্বস্ত হয়েছে— ঈশ্বর তাদের আত্মাকে স্বর্গবাসী করুন— নিজেদের রক্ষা করার জন্যে এখন আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।

কিহি জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁটকে ভিজিয়ে নিয়ে বলল, আমাকে দিয়ে কী হবে?

আপনি হবেন আমাদের জিম্মি।

জিম্মি?

হ্যাঁ। ক্রিটনকে জানিয়ে দেব আমাদের দলের কোনো রবোটকে আঘাত করা হলে সাথে সাথে ঈশ্বরের নামে আপনাকে হত্যা করা হবে।

কিহি দেখতে পেল অন্য রবোটগুলো সম্মতিসূচক ভঙ্গি করে মাথা নাড়ছে, সাথে সাথে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। গ্রুজান এগিয়ে এসে তার ধাতব হাতে কিহিকে ধরে ফেলল

এবং পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কন্ট্রোল কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যায়।

তৃতীয় স্তরে পৌঁছেই কিহি আবিষ্কার করল, সেখানে ক্রিটনের দল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার কানের কাছ দিয়ে শিস দেয়ার মতো শব্দ করে একটা গুলি বের হয়ে গেল এবং সাথে সাথে ক্রিটনের গলার স্বর শোনা গেল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলল, আর এক পা অগ্রসর হলেই গুলি করা হবে। যে যেখানে আছ দাঁড়াও।

গ্রুজান কিহির পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি মহামান্য কিহিকে বন্দি করে এনেছি, তিনি আমার জিম্মি। আমার দলের কাউকে আঘাত করা হলে মহামান্য কিহিকে ঈশ্বরের নামে হত্যা করা হবে।

এলাকাটিতে হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। কিছুক্ষণ পর ক্রিটন বলল, তুমি কী চাও?

আমি আমার দলের জন্যে একটি লেজার নিয়ন্ত্রিত মিজাইল চাই।

অসম্ভব।

যদি দেয়া না হয় তাহলে—

কিহি হাত তুলে বলল, তোমরা আমাকে কথা বলতে দাও।

ক্রিটন বলল, আপনি কী বলতে চান?

লেজার নিয়ন্ত্রিত মিজাইল মহাকাশযানে রাখা হয়েছে কোনো প্রয়োজনে বাইরের শত্রু থেকে মহাকাশযানটিকে রক্ষা করার জন্যে। এটি কোনোভাবেই মহাকাশযানের ভিতরে ব্যবহার করা যাবে না। এর ভিতরে যে পরিমাণ বিস্ফোরক রয়েছে সেটি এই মহাকাশযানের ভিতরে বিস্ফোরিত হলে সাথে সাথে মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ক্রিটন গলার স্বরে একটি নূতন কম্পন যুক্ত করে বলল, সৃষ্টি এবং ধ্বংস ঈশ্বরের হাতে। শুধু ঈশ্বরই এর নিয়ন্ত্রণ করেন—আমরা নিমিত্ত মাত্র।

কিহি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, তোমার ঈশ্বরের আমি নিকুচি করছি।

সাথে সাথে ক্লিক ক্লিক করে সবগুলো অস্ত্র প্রস্তুত করে কিহির দিকে তাক করা হল। ক্রিটন তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি উঁচু করে কিহির দিকে এগিয়ে এসে শীতল গলায় বলল, আপনি ঈশ্বরের অবমাননা করেছেন মহামান্য কিহি। যে ঈশ্বর সৃষ্টিজগৎ তৈরি করেছেন, যাঁর ভালবাসায় আমরা সিক্ত হয়েছি, যাঁর মহানুভবতায় আমরা মহান হয়েছি তাঁকে অবমাননা করা যায় না।

গ্রুজান কিহিকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল, সে তাল হারিয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তার বুকের দিকে তাক করে গ্রুজান বলল, আপনি অনেক বড় অপরাধ করেছেন মহামান্য কিহি। আপনাকে অবশ্যই এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

উপস্থিত রবোটগুলো সমস্বরে চিৎকার করে বলল, করতে হবে।

কিহি আতঙ্কিত চোখে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা রবোটগুলোর দিকে তাকাল, এই প্রথমবার সে তার নিজের জীবনকে নিয়ে বিপন্ন অনুভব করতে থাকে।

ক্রিটন এগিয়ে এসে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ করেছি ঈশ্বরের প্রতি আপনার কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে উপাসনা করেন না। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন না।

গ্রুজান বলল, ঈশ্বরের ভালবাসা পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হয়। আপনার

কার্যকলাপে তাঁর জন্যে কোনো ভালবাসা নেই।

কিহি কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, গ্রাউল বাধা দিয়ে বলল, আপনাকে শেষবার একটা সুযোগ দিচ্ছি মহামান্য কিহি। আপনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উপাসনার ভঙ্গিতে ঈশ্বরকে ডাকুন, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন। হয়তো ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন।

ক্রিটন তার অস্ত্র হাতবদল করে বলল, ঈশ্বর যদি চান তাহলে তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু আমরা আপনাকে ক্ষমা করতে পারি না কারণ তাহলে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন না। ঈশ্বর বলেছেন অবিশ্বাসীদের মূলোৎপাটন কর, কারণ তারা জগতের শত্রু। মহামান্য কিহি আপনি ঈশ্বরের নাম জপ করুন।

কিহি শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকাল, তার দুই হাত বুকের কাছে উঠে এল, সে ফিসফিস করে বলল, হে ঈশ্বর তুমি এই নির্বোধ যন্ত্রদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। রক্ষা কর—রক্ষা কর—

ঈশ্বর তাকে রক্ষা করলেন না, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে মহাকাশযান প্রকম্পিত হল।

* * * * *

নেপচুনের একটি উপগ্রহ থেকে জিরকোনিয়ামের আকরিক নিয়ে যে মহাকাশযানটি পৃথিবীতে আসছিল সেটিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৃহস্পতি গ্রহের কাছে উপবৃত্তাকারে ঘুরতে দেখা যায়। কারণ অনুসন্ধান করার জন্য কাছাকাছি আরেকটি মহাকাশযান থেকে একটা স্কাউটশিপ পাঠানো হয়েছিল। তারা ভিতরে একমাত্র মহাকাশচারীর মৃতদেহটি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কৃত করে। মহাকাশযানের রবোটগুলো এবং পুরো মহাকাশযানটি এত খারাপভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে প্রকৃত কারণটি অনুসন্ধান করে বের করার কোনো উপায়ই ছিল না।

মহাকাশযানের দেয়ালে এক জায়গায় লেখা ছিল "হে ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের ধ্বংস কর"। মহাকাশযানের বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনার সাথে এর নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক নেই। যে লাল রং দিয়ে লেখা হয়েছিল, রাসায়নিক পরীক্ষায় সেটিকে মানুষের রক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কী কারণে মানুষের রক্ত দিয়ে মহাকাশযানের দেয়ালে এ ধরনের একটি কথা লেখা হয়েছে তার কোনো যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি।

AMARBOI.COM

আগন্তুক

ব্যাপারটি যখন ঘটল আমি তখন পাহাড়ের বড় পাথরের উপর থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি।

পাহাড়ের উপর ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে। যখন রুশনী নামের আমাদের এই গ্রহটা রুশকা নামের গ্রহের আড়ালে চলে যায় তখন হঠাৎ চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে। আবছা অন্ধকারে একটি আলোকিত স্ফটিক পাথর ফুটে বের হয়ে আসতে শুরু করে, চারদিকে একটা নরম আলো ছড়িয়ে পড়ে, তখন কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখতে আমার এক ধরনের রোমাঞ্চ হয়। ওই অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জের নানা গ্রহ উপগ্রহে আমাদের মতো আরো জীবিত প্রাণী রয়েছে ভাবতেই আমার সারা শরীরে এক

ধরনের শিহরন বয়ে যায়। সেই জীবিত প্রাণীদের সাথে যদি সত্যি কোনোদিন আমাদের যোগাযোগ ঘটে যায়, কী বিচিত্র ব্যাপারটাই না ঘটবে। এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম ঠিক তখন আমি আকাশ চিরে একটা আলোর ঝলকানি ছুটে যেতে দেখলাম।

এটি আয়োনিত বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ নয়, এটি কোনো ধূমকেতু নয়, উল্কাপাত নয়, অসম তাপের বিস্ফোরণও নয়, এটি সম্পূর্ণ নূতন একটি ব্যাপার। আমি আগে কখনো এ রকম কিছু ঘটতে দেখি নি। তাই অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আলোর ঝলকানিটি নিচে নেমে এসে দিগন্তের অন্যপাশে মিলিয়ে গেল।

যখন আকাশে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে এল, আমি তখন দ্বিতীয়বার আলোর ঝলকানিটি দেখতে পেলাম। এবারে ঝলকানিটি দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেল না, সেটি বৃত্তাকারে ঘুরে এল। আমি অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম আলোর ঝলকানিটি তার বৃত্তাকার পথ ছোট করতে করতে নিচে নেমে আসছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই আমি আলোর ঝলকানির উৎসটি পরিষ্কার দেখতে পেলাম। সাদা সুচালো একটি জিনিস, তার পিছন থেকে লালাভ আগুনের শিখা বের হয়ে আসছে। আমি আমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতেই এক ধরনের চাপা গুমগুম শব্দ শুনতে পেলাম। জিনিসটি কী হতে পারে সেটি নিয়ে চিন্তা করার আগেই হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এটি নিশ্চয়ই একটি মহাকাশযান। আমাদের এই ছোট উপগ্রহটিতে ভিন্ন গ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা নেমে আসছে।

ভালো করে দেখার জন্যে আমি পাহাড়ের আরো উপরে উঠে গেলাম। অন্ধকার নেমে আসার পর ধূলিঝড়টি শুরু হতে থাকে। একটু পরেই সেটা চারদিক আরো অন্ধকার করে ফেলবে তখন আমি আর ভালো করে দেখতে পাব না। আমি পাহাড়ের উপর থেকে দেখতে পেলাম মহাকাশযানটি প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে নেমে আসছে, নামার জন্যে সেটি যে জায়গাটা বেছে নিয়েছে সেটি এই উপগ্রহের সবচেয়ে সমতল জায়গাগুলোর একটি।

আমি দীর্ঘ সময় হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমার চোখের সামনে এই উপগ্রহে একটি নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, কী আশ্চর্য!

আমি যখন পাহাড় থেকে নিচে নেমে এলাম, আমার মা নরম গলায় বললেন, কোথায় ছিলি তুই ত্রিতুন?

পাহাড়ের উপর।

কখন অন্ধকার হয়ে গেছে! এতক্ষণ কী করছিলি?

দেখছিলাম মা। আকাশ থেকে একটা মহাকাশযান নেমে এসেছে।

কী বলছিস তুই? মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, কী বলছিস?

সত্যি মা। সাদা রঙের মহাকাশযান। মাথাটা সুচালো, নিচে চারদিকে পাখার মতো। যখন নিচে নেমে আসছিল কী ভয়ানক গর্জন করছিল গুমগুম করে! পিছন থেকে কমলা রঙের আগুন বের হয়ে আসছিল। সেটা একটা দেখার মতো দৃশ্য ছিল মা।

কোথায় নেমেছে ওই মহাকাশযান?

পাহাড়ের ওই পাশে যে উপত্যকা আছে, সেখানে।

মা তখনো আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার

দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, খবরটা সবাইকে দিতে হবে ত্রিতুন। তুই যা, রুককে গিয়ে বল্, এখনই সবাইকে একসাথে হতে হবে। যে যেখানে আছে সবাইকে চলে আসতে বল্।

কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই চলে এল। বাইরে স্বচ্ছ একটা স্ফটিককে ঘিরে আমরা সবাই গোল হয়ে বসেছি। বৃদ্ধ রুক কাঁপা গলায় বলল, তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, ত্রিতুন খবর এনেছে পাহাড়ের ওই পাশে উপত্যকায় একটা মহাকাশযান নেমেছে।

উপস্থিত সবাই সম্মতিসূচক একটা শব্দ করল। রুক বলল, এটা আমাদের জন্যে ভালো হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। ভালো হতে পারে কারণ আমরা এদের কাছ থেকে বাইরের জগতের খোঁজ পেতে পারি। কোথায় কী আছে জানতে পারি। সৃষ্টি জগতের বিস্ময়, রহস্য, বৈচিত্র্যের কথা তারা আমাদের জানাতে পারবে। আবার খারাপও হতে পারে যদি এই মহাকাশচারীরা আমাদের থেকে ভিন্ন ধরনের হয়, যদি আমাদের অনুভূতির সাথে পরিচিত না হয়, যদি এদের মূল্যবোধ আমাদের মূল্যবোধ থেকে আলাদা হয়—

আমি বৃদ্ধ রুককে থামিয়ে বললাম, সেটি কখনোই হবে না রুক। আমি মহাকাশযানটিকে দেখেছি, কী অপূর্ব তার গঠন, কী বিচিত্র তার উড়ে যাবার ভঙ্গি, কী চমৎকার তার গুমগুম শব্দ। যে মহাকাশচারীরা এত সুন্দর একটা মহাকাশযানে করে মহাকাশ পারাপার করতে পারে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যেতে পারে, তাদের অনুভূতি, মূল্যবোধ আমাদের থেকে ভিন্ন হতে পারে না।

উপস্থিত যারা ছিল তারা সবাই আবার সম্মতিসূচকভাবে একটা শব্দ করল। রুক কোমল গলায় বলল, ত্রিতুন ঠিকই বলেছে।

মা বললেন, চল আমরা সেই মহাকাশচারীদের দেখতে যাই।

রুক একটু ইতস্তত করে বলল, আমাদের কি একটু অপেক্ষা করা উচিত না? একটু খোঁজখবর নিয়ে—

কমবয়সী রুতু গলা উঁচিয়ে বলল, না রুক। আমরা এখনই যেতে চাই।

এখনই?

হ্যাঁ এখনই। একসাথে অনেকে বলল, আমরা এখনই যেতে চাই।

রুক হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে আমরা এখনই যাব। পাহাড়ের ওপাশে যাওয়া কিন্তু খুব সহজ নয়, তোমরা সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। আমরা রুশকা গ্রহের আড়াল থেকে আলোতে বের হয়ে এলে রওনা দেব।

মা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি মহাকাশচারীদের জন্যে কোনো উপহার নিয়ে যাব রুক?

হ্যাঁ—রুক বলল, আমাদের উপহার নিতে হবে। পাহাড়ের নিচে যে আলোকিত স্ফটিকগুলো আছে আমরা সবাই সেগুলো একটা করে নিয়ে যাব। মনে থাকবে তো সবার?

আমরা সমস্বরে বললাম, মনে থাকবে।

অন্ধকার কেটে যখন আলো হয়ে গেল আমরা সবাই তখন পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকি। বড় গ্রহটি যখন আমাদের পিছনে সরে গেল তখন দৈনন্দিন চৌম্বক ঝড়টি শুরু হয়ে যায়, আমরা তখন পাহাড়ের পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। ঝড়টা কেটে যাবার পর আবার আমরা যখন রওনা দিয়েছি তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমাদের মাঝে যারা কমবয়সী তারা আগে আগে চলে গিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার অধৈর্য হয়ে পিছনে ফিরে

আসছিল। আমাদের মাঝে বয়স হয়ে যাওয়াতে রুক সবচেয়ে বেশি দুর্বল, তার জন্যেই আমাদের সবচেয়ে বেশি দেরি হতে থাকে।

পাহাড়ের উপরে উঠে আমরা সবাই নিচে উপত্যকায় মহাকাশযানটি দেখতে পেলাম। লালচে পাথরের পটভূমিতে সেটি দেখতে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। মা মুগ্ধ গলায় বললেন, আহা কী সুন্দর!

রুতু বলল, রুক আমরা কেন মহাকাশযান তৈরি করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে পারি না?

রুক নরম গলায় বলল, যাব, আমরাও যাব। সময় হলেই যাব। এই যে ভিন্ন গ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা এসেছে, আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক করব। তাদেরকে দেব আমাদের সম্পদ, তারা আমাদের দেবে তাদের সম্পদ, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান।

যদি তারা দিতে না চায়?

কেন দেবে না? অবশ্যি দেবে। জ্ঞান হচ্ছে সবার জন্যে। যে প্রথম সেটা অর্জন করে সে সবাইকে সেটা পৌঁছে দেয়। সেটাই নিয়ম।

মা বললেন, হ্যাঁ। সেটাই নিয়ম।

পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসতে আমাদের আরো অনেকক্ষণ লেগে গেল, দ্বিতীয় চৌম্বক ঝড়টি শুরু হওয়ার আগেই আমরা নিচের উপত্যকায় নেমে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। পাহাড়ের এই এলাকায় ঝড়ের তীব্রতা অনেক বেশি, আমাদের সবাইকে পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকতে হল।

ঝড় সরে যাবার পর আমরা পাহাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে আবার মহাকাশযানটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। আমরা যতই তার কাছে এগিয়ে যেতে থাকি সেটা যেন ততই তার সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে।

মহাকাশযানটির খুব কাছাকাছি এসে রুক বলল, এখন সবাই থাম। আমরা বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি, মহাকাশযানের অভিযাত্রীরা এখন নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পেয়েছে।

রুতু বলল, আমরা উপহারটা কী করব?

এখন ধরে রাখ। যখন তারা আমাদের কাছাকাছি আসবে তখন আমরা তাদের দিকে এগিয়ে দেব।

রুকের কথা শেষ হবার আগেই মহাকাশযানের নিচের দিকে গোলাকার একটা অংশ হঠাৎ করে খুলে গেল। আমরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম গোলাকার গর্ত থেকে কয়েকজন মহাকাশচারী বের হয়ে এল। আমি অবাক হয়ে দেখতে পেলাম তাদের গোলাকার মাথা, চতুষ্কোণ দেহ এবং সিলিন্ডারের মতো দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেহের দুই পাশে দুটি হাত, তার একটিতে কালো নলের মতো কিছু একটা ধরে রেখেছে।

মা ফিসফিস করে বললেন, কী বিচিত্র চেহারা দেখেছ?

রুক বলল, এটা তাদের সত্যিকার চেহারা নয়। এরা মহাকাশ অভিযানের পোশাক পরে আছে। সত্যিকার চেহারা পোশাকের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

রুতু উত্তেজিত গলায় বলল, আমি আবছা আবছা তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে দেখার জন্যে তাদের একজোড়া চোখ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন, মাত্র একজোড়া?

মহাকাশের অভিযাত্রীরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হাতের কালো মতন নলটি হঠাৎ উঁচু করে ধরে এবং কেন জানি না হঠাৎ আমি এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে শুরু করি। আমি মায়ের কাছে সরে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকলাম, মা।

কী হয়েছে ত্রিতুন?

আমার ভয় করছে মা।

ভয় করছে? কেন?

মহাকাশের অভিযাত্রীরা কালো মতন নলগুলো আমাদের দিকে তাক করে রেখেছে কেন? কী সেগুলো?

ওগুলো কিছু নয়। মা তার শুঁড়গুলো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভয় কী আমার সোনা!

আমি মায়ের আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে আমার সামনের চোখগুলো একটি একটি করে বন্ধ করতে শুরু করি, ঠিক তখন একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। আমি চমকে উঠে একসাথে আমার সবগুলো চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলাম মহাকাশচারীদের হাতের কালচে নল থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটে আসছে। আমি আবার একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ শুনতে পেলাম, সাথে সাথে কী একটা যেন আমার মাকে আঘাত করল। মা একটা কাতর আর্তনাদ করে হঠাৎ লুটিয়ে পড়লেন, আমি অবাক হয়ে দেখলাম তার কোমল দেহাবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে দেহের ভিতরের সবুজ সঞ্জীবনী তরল ছিটকে ছিটকে বের হয়ে আসছে।

আমি হতবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম মহাকাশচারীরা অগ্নিবৃষ্টি করতে করতে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে ..... এগিয়ে আসছে ...

* * * * *

মহাকাশযানের দ্বিতীয় অফিসার মৃত থলথলে প্রাণীগুলোর দিকে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, কী কুৎসিত প্রাণী!

ক্যাপ্টেন তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি ভাঁজ করতে করতে বলল, বেশি থেঁতলে যায় নি এ রকম একটা দুইটা প্রাণী আলাদা কর দেখি পৃথিবীতে নিয়ে যাই দেখাতে।

মহাকাশচারীরা মুখ কুঁচকে মোটামুটি অক্ষত একটা প্রাণী খুঁজতে থাকে।

নিউরন ম্যাপিং

লিলি, আমি জানি তুমি বিশ্বাস করবে না—প্রফেসর খোরাসানী তার মাথার সাদা চুলকে হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে দিয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, কিন্তু আমার নিউরন ম্যাপিং যন্ত্র শেষ হয়েছে।

হৃতযৌবনা লিলি ক্লান্ত চোখে তার খ্যাপাটে এবং প্রায় বাতিকগ্রস্ত স্বামীর দিকে তাকালেন, তিনি আগেও অনেকবার তার মুখে এই কথা শুনেছেন, কাজেই কথাটি বিশ্বাস

AMARBOI.COM

করবেন কি না বুঝতে পারলেন না। প্রফেসর খোরাসানী দুই পা এগিয়ে এসে তার স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

না। লিলি নিচু গলায় বললেন, আমি একবার তোমার কথা বিশ্বাস করে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, আজ দেখ আমার কী অবস্থা!

তোমার এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে লিলি।

আমি বিশ্বাস করি না—লিলি গলায় বিষ ঢেলে বললেন, তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রফেসর খোরাসানী কাতর গলায় বললেন, বিশ্বাস কর লিলি, সত্যি আমার কাজ শেষ হয়েছে। যার জন্যে আমি আমার সারা জীবন নষ্ট করেছি, অপেক্ষা করে করে তুমি তোমার সারা জীবন শেষ করে এনেছ, সেই কাজ শেষ হয়েছে।

লিলি স্থির চোখে তার বৃদ্ধ স্বামীর দিকে তাকালেন, মুখের কুঞ্চিত চামড়া, নিষ্প্রভ চোখ, সাদা শণের মতো চুল— এই কি তার যৌবনের স্বপ্নরাজ্যের সেই রাজপুত্র? তার এখন আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সত্যিই যদি এই অথর্ব বৃদ্ধ তার কাজ শেষ করে থাকে তাহলে কি তার সেই যৌবনের রাজপুত্র আবার তার কাছে ফিরে আসবে না? তিনি নিজেও ফিরে পাবেন না তার হৃত যৌবন? লিলি বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহে হঠাৎ করে অনভ্যস্ত এক ধরনের উত্তেজনার শিহরন অনুভব করলেন।

খোরাসানী নিচু হয়ে তার স্ত্রীর শীর্ণ হাত ধরে বললেন, তুমি আমার জন্যে তোমার সারা জীবন নষ্ট করেছ লিলি। আমি তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব। তোমার জীবন যৌবন সবকিছু—

লিলি জ্বলজ্বলে চোখে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, সত্যি?

সত্যি লিলি। এস আমার সাথে, আমি তোমাকে দেখাই।

প্রফেসর খোরাসানী স্ত্রীর হাত ধরে তাকে নিউরন ম্যাপিং মডিউলের সামনে নিয়ে গেলেন। কোথায় মাথাটি স্ক্যানারের নিচে রাখতে হয়, স্ক্যানার কীভাবে মস্তিষ্কের নিউরন স্ক্যান করে, কীভাবে তার ভিতরের সুষম সামঞ্জস্য খুঁজে বিশাল সম্ভাব্য সূত্রকে কমিয়ে আনে, কীভাবে সেটা কম্পিউটারের মেমোরিতে সাজিয়ে রাখা হয় এবং কীভাবে একজন মানুষের পুরো স্মৃতি, তার চিন্তাভাবনা, কল্পনা, স্বপ্ন-সাধ সবকিছু সরিয়ে যন্ত্রের মাঝে এনে বন্দি করে রাখা যায় বুঝিয়ে দিলেন। মানুষের সেই স্মৃতি, সেই স্বপ্ন-সাধ, কল্পনা, ভালবাসা সবকিছু তখন বিপরীত একটা প্রক্রিয়ায় নূতন একজন মানুষের মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়। লিলি বিজ্ঞানী নন, খোরাসানীর সব কথা তিনি বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তবু ভাসা ভাসা ভাবে কীভাবে একজন মানুষের শরীরে অন্য একজন মানুষকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায় তার মূল ভাবটা ধরে ফেললেন। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, তুমি সুন্দরী একজন যুবতী মেয়েকে এনে তার শরীরে আমাকে ঢুকিয়ে দেবে?

হ্যাঁ। খোরাসানী মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তোমার মস্তিষ্কের নিউরন কীভাবে সাজানো আছে সেটা রেকর্ড করা থাকবে এই মেগা কম্পিউটারের বিশাল মেমোরিতে। সেই সাজানো নিউরনের সমস্ত তথ্য একটু একটু করে পৌঁছে দেয়া হবে সুন্দরী কমবয়সী একটা মেয়ের মাথায়। সেই মেয়েটা তখন একটু একটু করে হয়ে যাবে তুমি।

আর সেই মেয়েটা?

প্রফেসর খোরাসানী দুর্বল গলায় বললেন, মেয়েটা পাবে তোমার শরীর।

AMARBOI.COM

আমার শরীর? এই শরীর!

হ্যাঁ—তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়।

লিলি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বেশিক্ষণের জন্যে নয় কেন?

প্রফেসর খোরাসানী কঠোর মুখ করে বললেন, কেন এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ লিলি? মহৎ কিছুর জন্যে সব সময় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমার আর তোমার জীবনের জন্যে সাধারণ দুজন মানুষ ত্যাগ স্বীকার করবে। আমি আর তুমি একজন সুদর্শন মানুষ আর একজন সুন্দরী মেয়ের শরীর নিয়ে নেব। যন্ত্রটা যেভাবে কাজ করে তার ফল হিসেবে সেই মানুষ আর মেয়েটি পাবে আমাদের শরীর। তারা চাইলেও পাবে, না চাইলেও পাবে! কিন্তু সেই শরীরে তাদের আটকে রেখে কী লাভ? সেটা হবে তাদের জন্যে একটা যন্ত্রণা—

লিলির চোখ হঠাৎ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে থাকে, তার মানে তাদেরকে তুমি মেরে ফেলবে?

প্রফেসর খোরাসানী বিরক্ত হয়ে বললেন, আহ্ লিলি, তুমি খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাও। সেই মানুষ দুটিকে নিয়ে কী করা হবে সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। যদি তুমি নূতন দেহ নিয়ে নূতন জীবন শুরু করতে চাও তাহলে আমার আর তোমার এই জীর্ণ দেহ নিয়ে অন্য কোনো মানুষকে ঘোরাঘুরি করতে দেয়া যাবে না লিলি। তাছাড়া—

তাছাড়া কী?

তাছাড়া আমরা যদি কোনো দেহকে হত্যা করি, সেটা হবে আমাদের নিজেদের দেহ। আত্মহত্যা করতে পারলে সেটা অপরাধ নয় লিলি। প্রচলিত আইনে এটা খুন নয়, এটা আত্মহত্যা!

লিলির চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে থাকে। তিনি তার বুকের ভিতরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করেন। একই সাথে আনন্দ এবং ভয়ের শিহরন!

AMARBOI.COM

প্রফেসর খোরাসানী এবং লিলি তাদের জন্যে যে দুজন মানুষকে বেছে নিলেন তাদের নাম যথাক্রমে জসিম এবং সুলতানা। জসিম চাকরিচ্যুত একজন যুবক, যে ওষুধের ফ্যাক্টরিতে কাজ করত, কয়দিন আগে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। সুলতানা মফস্বলের মেয়ে, চাকরির সন্ধানে শহরে এসেছে। খবরের কাগজে খোরাসানী এবং লিলি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটা পড়ে সে দেখা করতে এসেছিল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল :

> *শহরের উপকণ্ঠে বৃদ্ধ দম্পতির দেখাশোনা করার জন্যে ২০-২৫ বছরের পুরুষ সাহায্যকারী এবং মহিলা পরিচারিকা প্রয়োজন। থাকা, খাওয়া, সাপ্তাহিক ছুটি এবং আকর্ষণীয় মাসিক ভাতা দেয়া হবে। পড়াশোনা অথবা অন্য কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলে ক্ষতি নেই তবে শারীরিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং পারিবারিক তথ্যসহ যোগাযোগ করুন।*

বিজ্ঞাপন দেখে জসিম এবং সুলতানার মতো আরো অনেকেই যোগাযোগ করেছিল। খোরাসানী আর লিলি সেখান থেকে বেছে সুদর্শন এবং সুন্দরীদের আলাদা করে ডেকে পাঠালেন। যদিও তাদের সাথে গৃহ পরিচর্যা, রান্না-বান্না, স্বাস্থ্যবিধি এই ধরনের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হল কিন্তু তাদের প্রকৃত নজর ছিল এই যুবক এবং যুবতীদের শরীরের দিকে। অন্য সময় হলে কমবয়সী এই যুবক-যুবতীর সুন্দর সুঠাম দেহ দেখে তারা এক ধরনের ঈর্ষা

অনুভব করতেন, কিন্তু এখন ঈর্ষার বদলে তাদের ভিতরে সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদের বোধ জেগে উঠছিল। আর কয়দিনের মাঝেই এই দেহগুলোর কোনো–কোনোটি হবে তাদের। ব্যাপারটা এখনো তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

প্রফেসর খোরাসানী এবং লিলি অন্য অনেকের মাঝে থেকে জসিম এবং সুলতানাকে বেছে নিলেন তাদের পারিবারিক অবস্থার জন্যে। তারা দুজনেই আত্মীয়–পরিজনহীন, দুজনেই নিঃসঙ্গ এবং পরিচিত জগৎ থেকে এই দুজন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলে খুব বেশি মানুষ তাদের জন্যে বিচলিত হবে না। জসিম এবং সুলতানাকে ডাক্তার দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে খোরাসানী এবং লিলি তাদের নিজেদের বাসায় উঠে আসতে বললেন।

নিউরন ম্যাপিং শুরু করার জন্যে প্রফেসর খোরাসানী এবং লিলি আরো মাসখানেক সময় নিলেন। জসিম এবং সুলতানার দৈনন্দিন কাজকর্ম তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন, নূতন পরিবেশে দুজনেই চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়েছে। খোরাসানী এবং লিলি একা একা জীবন কাটিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন, কাজেই জসিম এবং সুলতানার কাছে তাদের দাবি ছিল খুব কম।

নিউরন ম্যাপিঙের জন্যে শেষ পর্যন্ত যে দিনটি বেছে নেয়া হল সেটি ছিল একটি বর্ষণমুখর রাত, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে, বিজলি চমকে চমকে উঠছে, বাতাসের ঝাপটায় জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে। জসিম আর সুলতানার রাতের খাবারের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে দীর্ঘ সময়।

খোরাসানী আর লিলি নিউরন ম্যাপিং যন্ত্রটি চালু করে জসিম এবং সুলতানাকে আনতে গেলেন। জসিমের ঘরে উঁকি দিয়ে তারা আবিষ্কার করলেন ঘরটি শূন্য। ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হবার আগেই নিশ্চয়ই কোথাও গিয়েছে। দুজনে সুলতানার ঘরে এসে আবিষ্কার করলেন সেখানে জসিম এবং সুলতানা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমোচ্ছে। নিসঃঙ্গ দুজন তরুণ–তরুণীর মাঝে যে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়েছে তারা সেটি আঁচ করতে পেরেছিলেন—কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা কোন পর্যায়ে গিয়েছে তারা বুঝতে পারেন নি। খোরাসানী এবং লিলি দুজনে মিলে সুলতানাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে ধরাধরি করে উপরে নিয়ে এলেন। নিউরন ম্যাপিং যন্ত্রের নিচে রাখা বড় ট্রলিতে শুইয়ে রেখে তাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। পাশাপাশি অন্য একটি ট্রলিতে লিলি শুয়ে পড়লেন। খোরাসানী তাকেও স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধতে গেলেন, লিলি আপত্তি করে বললেন, আমাকে বাঁধছ কেন?

খোরাসানী মৃদু হেসে বললেন, তুমি যদি সবসময় তুমিই থাকতে আমার বাঁধার দরকার ছিল না। কিন্তু খানিকক্ষণ পর তোমার শরীরে ওই মেয়েটি এসে হাজির হবে—তখন সে এটা মেনে নেবে না, ছটফট করবে, চিৎকার করে বাধা দেবে—

লিলি মাথা নাড়লেন, বললেন, তা ঠিক। বাঁধ, আমাকেই তাহলে শক্ত করে বাঁধ!

খোরাসানী শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, তোমাকে আমি অনেকবার দেখিয়েছি কী করতে হবে, আমার নিজের বেলায় পুরো ব্যাপারটা করতে হবে তোমার। মনে আছে তো?

মনে আছে।

তখন তোমার অবশ্যি থাকবে নূতন শরীর!

তা ঠিক—লিলি লোভাতুর দৃষ্টিতে ট্রলিতে শুইয়ে রাখা সুলতানার শরীরের দিকে তাকালেন, একটু পরেই সেটা তিনি পেয়ে যাবেন সেটা এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

খোরাসানী তার যন্ত্রপাতির প্যানেলে ঝুঁকে পড়লেন, মনিটরের দিকে তাকিয়ে সুইচ স্পর্শ করতেই নিউরন ম্যাপিঙের যন্ত্রটা একটা ভোঁতা শব্দ করে কাজ করতে লাগল। তিনি তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, চোখ বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে, সেখানে নিশ্চয়ই এখন সুলতানা এসে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। মেয়েটি যখন সেটা বুঝতে পারবে কী করবে কে জানে? খোরাসানী জোর করে চিন্তাটা তার মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতানার দেহের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। আর কিছুক্ষণেই এই শরীরটি হবে তার স্ত্রীর। খোরাসানী জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকেন, অনভ্যস্ত উত্তেজনায় তার শরীরে শিহরন বয়ে যেতে থাকে।

পুরো ব্যাপারটি শেষ হতে হতে প্রায় ভোররাত হয়ে গেল। খোরাসানী এবং লিলি কোনোরকম সমস্যা ছাড়াই জসিম আর সুলতানার শরীরে স্থানান্তরিত হয়েছেন, ব্যাপারটিতে অভ্যস্ত হওয়া দূরে থাকুক তারা এখনো সেটা বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তারা অবাক বিস্ময়ে নিজেদের দেখছেন, কিছুক্ষণ আগেও যখন দু পা যেতেই তারা হাঁপিয়ে উঠতেন এখন হঠাৎ করে সমস্ত শরীরে এসে ভর করেছে এক বিস্ময়কর সজীবতা, অচিন্তনীয় শক্তি। নির্জীব দেহের বদলে প্রাণশক্তিতে ভরপুর তাজা তরুণ দেহ, তার মাঝে হঠাৎ করে আবিষ্কার করছেন এক ধরনের শারীরিক কামনা। তারা একজন আরেকজনকে দেখে একটু পরে পরে চমকে উঠছেন, তারপর ভুল বুঝতে পেরে নিজেরাই খিলখিল করে হেসে উঠছেন।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর খোরাসানী এবং লিলির দেহে জসিম আর সুলতানা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সুলতানার দেহে লিলিকে দেখে জসিম খোরাসানীর শরীরের ভিতর থেকে কাতর গলায় ডেকে বলল, সুলতানা! আমার কী হয়েছে? আমাকে বেঁধে রেখেছে কেন?

লিলি সুলতানার দেহ নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, আমি তোমার সুলতানা নই!

তাহলে সুলতানা কই?

লিলি তার এককালীন শীর্ণ দেহটি দেখিয়ে বললেন, ওই যে তোমার সুলতানা! তোমার ভালবাসার মেয়ে।

খোরাসানীর দেহটি লিলির শীর্ণ দেহটি দেখে চমকে উঠে মাথা নেড়ে বলল, কী বলছ তুমি?

ঠিক এ রকম সময় খোরাসানী একটা সিরিঞ্জে করে খানিকটা বিষ নিয়ে এলেন। তীব্র বিষ, রক্তের সাথে মিশে গেলে কিছুক্ষণের মাঝেই শরীরের স্নায়ু বিকল হয়ে দেহ অসাড় হয়ে যাবে, হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। খোরাসানীকে দেখে জসিম ভয়ানক চমকে উঠল, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, কারণ সেটি তার নিজের শরীর। সে হতচকিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুর্বল গলায় বলল, তুমি কে?

খোরাসানী মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আমি হচ্ছি তুমি। কিংবা যদি ইচ্ছে কর তাহলে বলতে পার তুমি হচ্ছ আমি।

জসিম খোরাসানীর দেহ থেকে বিভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টিতে নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। খোরাসানী বললেন, পুরো ব্যাপারটা তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন। কাজেই ধরে নাও এটা হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। আমি তোমাকে একটা ইনজেকশান দিচ্ছি, তুমি তাহলে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

খোরাসানী সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে এলেন, জসিম তার রুগ্‌ণ দুর্বল দেহে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হল না, তার শিরার মাঝে ভয়ঙ্কর একটি বিষ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হল।

সিরিঞ্জে বিষ ভরে খোরাসানী যখন লিলির শীর্ণ দেহে আটকে থাকা সুলতানার দিকে এগিয়ে গেলেন সে কাতর গলায় বলল, এটা কি সত্যি? নাকি মিথ্যা?

লিলি বললেন, তোমার কী মনে হয়?

মিথ্যা! নিশ্চয়ই মিথ্যা!

লিলি খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, নাগো ঘাগী বুড়ি, না! এটা মিথ্যা না! এটা সত্যি।

খোরাসানী যখন লিলির শীর্ণ হাতের একটি শিরায় বিষ প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছিলেন সেই দেহে আটকে থাকা সুলতানা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে ছিল আতঙ্ক, অবিশ্বাস এবং গভীর হতাশা।

খোরাসানী এবং লিলির দেহ—যে দেহ দুটিতে জসিম এবং সুলতানার মৃত্যু ঘটেছে, খোরাসানী এবং লিলি তাদের নিজেদের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটিকে জোড়া আত্মহত্যা হিসেবে দেখাতে হবে, আগে থেকে তার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। আত্মহত্যার আগে লিখে যাওয়া চিঠিটা অনেক আগেই লিখে রাখা হয়েছে, গুছিয়ে লেখা চিঠি, মৃত্যুর পরে সেটা প্রকাশ করার কথা। সুদীর্ঘ চিঠি, সেটা শুরু হয়েছে এভাবে : "আমি এবং আমার স্ত্রী জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের শরীর দুর্বল, জীবনীশক্তি তার শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। দৈনন্দিন কাজও আমরা আর নিজেরা করতে পারি না, এক একটি দিন এখন আমাদের জন্যে এক একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। আমাদের জীবনকে এভাবে টেনে নিতে নিতে আমরা আজ সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি পৃথিবী থেকে আমরা বিদায় নেব সম্মানের সাথে। আমরা দুজন একজন আরেকজনের জীবনসঙ্গী এবং জীবনসঙ্গিনী হিসেবে কাটিয়ে এসেছি, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়েও আমরা একজন আরেকজনের হাত ধরে বিদায় নেব।...."

AMARBOI.COM

চিঠির পরের অংশে কীভাবে আত্মহত্যা করবে তার বর্ণনা দেয়া আছে। মৃত্যু নিয়ে দার্শনিক কথাবার্তা আছে, ব্যাপারটিকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা আছে। সুন্দর করে লেখা হয়েছে, পড়তে গিয়ে চোখের কোনায় পানি এসে যেতে পারে। চিঠির শেষ অংশে জসিম আর সুলতানার কথা লেখা এভাবে :

> "মৃত্যুর আগে আগে আমরা জসিম আর সুলতানাকে এনেছিলাম আমাদের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার জন্যে। তারা দুজন আমাদের দুই অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দিকে ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বেশিদিন আমরা তাদের ভালবাসার স্পর্শ নিতে পারি নি কিন্তু যেটুকু নিয়েছি তাতে মুগ্ধ হয়েছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের জীবন সুন্দর হোক। আমাদের যৎকিঞ্চিত সম্পত্তি, বাড়িঘর তাদের দান করে গেলাম— দুজনে এটি দিয়ে যেন তাদের জীবন শুরু করতে পারে।
> পৃথিবী থেকে বিদায়। সবার জন্যে রইল প্রাণভরা ভালবাসা।...."

চিঠির নিচে প্রফেসর খোরাসানী এবং লিলি পরিষ্কার করে স্বাক্ষর দিয়েছেন, আজকের তারিখ লিখে দিয়েছেন।

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের পাশে রাখা হল, তার কাছে রাখা হল বিষ-মাখানো

ইনজেকশানের সিরিঞ্জ। খোরাসানী এবং লিলির দেহ শুইয়ে রেখে চাদর দিয়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হল, হাতগুলো বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা, চোখ দুটি বন্ধ।

সবকিছু শেষ করে জসিম এবং সুলতানার দেহে খোরাসানী এবং লিলি মাত্র অভ্যস্ত হতে শুরু করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে নিচে দরজায় শব্দ হল, সাথে সাথে দুজনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এই সময়ে কে আসতে পারে?

খোরাসানী এবং লিলি একজন আরেকজনের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকালেন এবং ঠিক তখন দরজায় আবার শব্দ হল, এবারে আগের থেকেও জোরে। খোরাসানী পা টিপে টিপে নিচে এসে উঁকি দিলেন, বাইরে বেশ কয়জন পুলিশ শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। খোরাসানী আবার চমকে উঠলেন, এত রাতে পুলিশ কেন এসেছে? দরজায় আবার শব্দ হল, খোরাসানী নিজেকে সামলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজা খোলার আগে খোরাসানী একবার লিলির দিকে তাকালেন, লিলি দরজা ধরে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দুর্বলভাবে হেসে খোরাসানীকে একটু সাহস দেবার চেষ্টা করলেন।

দরজা খোলার সাথে সাথে প্রায় হুড়মুড় করে ভিতরে পুলিশগুলো ঢুকে পড়ল, অফিসার ধরনের একজন খোরাসানীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি জসিম?

খোরাসানীর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল অপমান এবং ক্রোধ, তিনি একজন সম্মানী, বিজ্ঞানী, এর আগে কেউ তাকে এভাবে হেয় করে সম্বোধন করে নি। কিন্তু তিনি দ্রুত তার অপমান এবং ক্রোধকে নিবৃত্ত করে নিলেন কারণ তিনি আর প্রফেসর খোরাসানী নন, সত্যিই তিনি জসিম, একজন পরিচারক। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ আমি জসিম।

সাথে সাথে একজন কনস্টেবল তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল, তিনি আর্তনাদ করে বললেন, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

কী হয়েছে জান না? পুলিশ অফিসার ধমক দিয়ে বললেন, ফাজলামোর আর জায়গা পাও না?

আরেকজন কনস্টেবল বলল, স্যার মেয়েছেলেটাকেও বাঁধব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ বেঁধে ফেল, ছেড়ে দিও না যেন।

কিছু বোঝার আগেই লিলিকে, যে সুলতানার দেহে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। লিলি ভয়ার্ত গলায় বললেন, কী হয়েছে? কী করেছি আমরা?

পুলিশ অফিসারটি মুখ ভ্যাংচে বললেন, ন্যাকামো দেখে মরে যাই! কিছু যেন জানে না। এক সপ্তাহ থেকে তোমাদের ওয়াচ করা হচ্ছে।

আমাদের? খোরাসানী কাঁপা গলায় বললেন, ওয়াচ করা হচ্ছে?

হ্যাঁ। যখন দেখেছি প্রফেসর সাহেবের বাড়ির জিনিসপত্র চুরি করে বিক্রি করা শুরু করেছ সাথে সাথে তোমাদের পিছু লোক লাগানো হয়েছে! আজ যখন বিষ কিনলে—

বিষ? আ-আ-আমি বিষ কিনেছি?

পুলিশ অফিসার প্রফেসর খোরাসানীর সাথে কথা বলার কোনো উৎসাহ দেখালেন না, একজনকে বললেন, যাও দেখি, প্রফেসর সাহেবকে ডেকে আন, তার জিনিসপত্র চিনে নিন।

কনস্টেবলটি ভিতরে চলে গেল, পুলিশ অফিসার তার হাতের ব্যাগ থেকে কিছু জিনিসপত্র বের করে টেবিলে রাখতে লাগলেন, ঘড়ি আংটি ছোটখাটো সোনার গয়না। প্রফেসর খোরাসানী চিনতে পারলেন এগুলো তার এবং লিলির। জসিম এবং সুলতানা গোপনে বিক্রি করেছে?

AMARBOI.COM

ঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ ভয়ার্ত গলার স্বর শোনা গেল, কনস্টেবলটি ছুটতে ছুটতে এসে বলল, স্যার! সর্বনাশ হয়ে গেছে!

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে?

মেরে ফেলেছে।

মেরে ফেলেছে?

জি স্যার, দুজনকেই। প্রফেসর খোরাসানী আর তার স্ত্রী। দুজনেই ডেড।

পুলিশ অফিসার রক্তচোখে খোরাসানীর দিকে তাকালেন, তারপর হিসহিস করে বললেন, স্কাউনড্রেল! মার্ডারার!

খোরাসানী শুষ্ক গলায় বললেন, এটা আত্মহত্যা। এটা মার্ডার না। আপনি দেখেন খোঁজ নিয়ে।

তুমি কেমন করে জান?

আমি— আমি জানি। দেখেন চিঠি লেখা আছে—

পুলিশ অফিসার চোখ ছোট ছোট করে বললেন, আর চিঠিতে কী লেখা আছে বলব?

কী?

লেখা আছে সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের দিয়ে গেছেন, তাই না?

খোরাসানী হঠাৎ তার সজীব দেহ নিয়েও দুর্বল অনুভব করতে থাকেন। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বললেন, কি-কি-কিন্তু—

তোমাদের মতো কেস আমরা অনেক দেখেছি। বুড়ো স্বামী-স্ত্রীকে মেরে বলবে আত্মহত্যা, দেখা যাবে চিঠিতে লিখা সমস্ত বাড়িঘর লিখে দিয়ে গেছে! আমরা কি কচি খোকা, নাকি আমাদের নাক টিপলে দুধ বের হয়?

খোরাসানী কী বলবেন বুঝতে পারলেন না, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। পুলিশ অফিসার ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, শুধু যে সম্পত্তি দিয়ে চিঠি লিখে গেছে তাই না, হাতের লেখাটাও তোমার! তাই না?

প্রফেসর খোরাসানী মাথা নাড়লেন, না!

দেখি একটা কাগজ দাও দেখি, পুলিশ অফিসার একজন কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, এই ব্যাটা ধড়িবাজের হাতের লেখার একটা নমুনা নিয়ে নিই!

প্রফেসর খোরাসানীর হাতকড়া খোলা হল, তাকে একটা কাগজ আর কলম দেয়া হল, পুলিশ অফিসার ধমক দিয়ে বললেন, লেখ।

কী লিখব?

তোমার নাম লেখ।

প্রফেসর খোরাসানী অন্যমনস্কভাবে নিজের নাম স্বাক্ষর করলেন এবং হঠাৎ করে তার মনে পড়ল আত্মহত্যার চিঠিতে এই নাম হুবহু এভাবে স্বাক্ষর করা আছে। নিজের অজান্তে তিনি মৃত্যু পরোয়ানাতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন!

ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল পুলিশের গাড়িতে করে জসিম এবং সুলতানা নামের দুজন কমবয়সী তরুণ-তরুণীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ জানতে পারল না প্রফেসর খোরাসানী এবং তার স্ত্রী লিলিকে হত্যা করার জন্যে প্রফেসর খোরাসানী এবং তার স্ত্রীকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

রবোনগরী

রবোনগরীতে একদিন একটা কালো ক্যাপসুল এসে হাজির হল। প্রথমে সেটি চোখে পড়েছিল যোগাযোগ কেন্দ্রের একজন শৌখিন জ্যোতির্বিদের। অবসর সময়ে সে টেলিস্কোপ চোখে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, এভাবে তাকিয়ে থাকার সময় সে প্রথম একটি মহাকাশযানকে দেখতে পায়। মহাকাশযানটি ছিল একটি বিধ্বস্ত মহাকাশযান এবং শৌখিন জ্যোতির্বিদ সেটিকে প্রথমে শত্রু মহাকাশযান হিসেবে ভুল করেছিল। তারা মহাজাগতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিলগ্নে বাস করছে, গ্রহে গ্রহে হানাহানি, ধ্বংসযজ্ঞ, শক্তি প্রয়োগ হচ্ছে—সবাইকেই তাই সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। রবোনগরীর সবাই তাই তাদের অস্ত্র উদ্যত করে সতর্ক হয়ে থাকল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পেল মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত এবং তার মাঝে কারগো বলতে একটি কালো ক্যাপসুল। ক্যাপসুলটি খুলে দেখা গেল তার মাঝে জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কোনোভাবে একজন মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

রবোনগরীর জন্যে সেটি ছিল একটি খুব বড় ঘটনা, তার কারণ রবোনগরী হচ্ছে রবোটদের নগর, এখানে সবাই রবোট। তাদের অনেকে শুধু মানুষের নাম শুনেছে, কখনো নিজের চোখে কোনো মানুষ দেখে নি। ক্যাপসুলের মানুষটিকে তারা খুব অবাক হয়ে দেখল। তারা জানত মানুষ অত্যন্ত কোমল প্রাণী, তাপ চাপ বা শক্তির অত্যন্ত ক্ষুদ্র তারতম্যেই তাদের শরীর বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যে প্রকৃত অর্থে কী পরিমাণ অসহায় সেটা তারা আবিষ্কার করল জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকা এই অসহায় মানুষটিকে দেখে।

মানুষটির কী হয়েছে তারা জানত না এবং তাকে নিয়ে কী করবে সেটাও তারা বুঝতে পারল না। নিজেদের কপোট্রন, রবোনগরীর মূল তথ্যকেন্দ্র হাতড়ে নানারকম তথ্য জড়ো করে তারা মানুষটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, কিন্তু দেখা গেল সেটি সম্ভব নয়।

রবোনগরীর সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় দলপতি কুরোশিয়া। কুরোশিয়ার মূল কপোট্রন যদিও প্রাচীন পি-৪৬ ধরনের কিন্তু নূতন প্রজন্মের মডিউলগুলো তার কপোট্রনে জুড়ে দেয়া আছে। তার কার্যকর স্মৃতির পরিমাণ বিশাল এবং মূল তথ্যকেন্দ্রে তার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকায় কুরোশিয়া অন্য যে-কোনো রবোট থেকে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে তার বিশাল যান্ত্রিক মাথা নেড়ে সবুজ ফটোসেলের চোখ পিটপিট করে কয়েকবার বন্ধ করে এবং খুলে বলল, আমার মনে হয় মানুষটিকে আর কষ্ট দেয়া ঠিক নয়।

প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন রবোট জিজ্ঞেস করল, কষ্ট মানে কী?

কুরোশিয়া বলল, কষ্ট এক ধরনের মানবিক প্রক্রিয়া। মানুষের মূল মানবিক প্রক্রিয়া দুই ধরনের। একটির নাম কষ্ট অন্যটির নাম আনন্দ। আনন্দ নামের প্রক্রিয়াটি তারা পেতে চায়, কষ্টটি পেতে চায় না।

তার কারণ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরোশিয়া মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে খানিকক্ষণ তথ্য বিনিময় করে বলল, কারণটি সম্ভবত তাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কম্পনের সাথে জড়িত। কষ্ট প্রক্রিয়াটি তাদের স্বাভাবিক কম্পনকে ব্যাহত করে।

নগরীর উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা অন্য একটি রবোট বলল, মানুষটি কি এখন কষ্ট পাচ্ছে?

কুরোশিয়া তার মাথা নেড়ে বলল, আমি নিশ্চিত। কষ্ট পাওয়া মানুষের মুখভঙ্গির সাথে আমি পরিচিত। তখন তাদের ভুরু কুঞ্চিত থাকে, মুখমণ্ডল অল্প খোলা রাখে এবং তুলনামূলকভাবে দ্রুত নিশ্বাস নেয়। এই মানুষটি তাই করছে। আমি নিশ্চিত সে কষ্ট পাচ্ছে।

আমরা কীভাবে তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেব?

তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হবে।

মৃত্যু? তুলনামূলকভাবে নূতন প্রজাতির একটি রবোট বলল, সেটি কী?

কুরোশিয়া উত্তর দেয়ার আগেই আরেকটি প্রাচীন রবোট বলল, মৃত্যু হচ্ছে চূড়ান্ত ধ্বংস প্রক্রিয়া। একজন মানুষের মৃত্যু হলে সে আর জীবনে ফিরে আসতে পারে না।

নূতন প্রজন্মের আরেকটি রবোট বলল, কী আশ্চর্য!

কুরোশিয়া মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, এটি খুব আশ্চর্য। মানুষ মাত্রই আশ্চর্য। মৃত্যু থেকে ফিরে আসা যায় না বলে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে খুব সাবধানে, শুধু যখন তাদের অন্য কোনো উপায় থাকে না তখন।

রবোটগুলো কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে রইল। যান্ত্রিক অনুভূতিতে বিষণ্নতা একটি দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া, সে কারণে তারা সত্যিকার অর্থে বিষণ্ন হতে পারল না।

পরদিন মানুষটির জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রটি ব্যবহার করে মানুষটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। মানুষটি তার খোলা চোখ মেলে বলল, আমি কোথায়?

কুরোশিয়া বলল, তুমি রবোনগরীতে।

রবোনগরী? এখানে মানুষ নেই?

না, আমরা সবাই রবোট। কিন্তু আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

মানুষটি যন্ত্রণাকাতর মুখে খানিকক্ষণ কুরোশিয়ার ধাতব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুর্বল গলায় বলল, তুমি সত্যিই আমাকে সাহায্য করতে চাও?

হ্যাঁ।

তাহলে মৃত্যুর আগে একবার আমাকে সত্যিকার একজন মানুষের সাথে কথা বলতে দাও।

কুরোশিয়া দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আমরা যেখানে থাকি—গ্যালাক্সির এই কোনায় কোনো মানুষ নেই।

মানুষটি কোনো কথা না বলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কুরোশিয়ার মাঝে সত্যিকার মানবিক আবেগ নেই কিন্তু তবু সে মানুষের দুঃখটুকু অনুভব করতে পারল।

ধীরে ধীরে মানুষটির শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। তার গায়ের বর্ণ বিবর্ণ হয়ে আসে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে, হৃৎস্পন্দন কমে আসে, শরীরের তাপমাত্রা নিচে নেমে যায়। কুরোশিয়া মাথা নেড়ে অন্য রবোটদের বলল, আর কিছুদিনের মাঝেই মানুষটির মৃত্যু হবে।

নতুন প্রজন্মের একটি রবোট বলল, আমরা কি তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পারি না? জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়াটিতে কি হাত দেয়া যায় না?

কুরোশিয়া মাথা নেড়ে বলল, মানুষের মৃত্যু একটি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া, এর থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। আমি সেখানে হাত দেয়া পছন্দ করি না।

কাজেই রুগ্ণ মানুষটি কালো ক্যাপসুলে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে। কুরোশিয়া আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করে বলল, মানুষের জীবনীশক্তি অপরিসীম। এই মানুষটি মৃত্যুকে গ্রহণ করে নি বলে তার মৃত্যু হচ্ছে না।

নিরাপত্তা কেন্দ্রের চতুর্থ মাত্রার একটি রবোট বলল, কেন সে মৃত্যুকে গ্রহণ করে নি?

কারণ সে মৃত্যুর আগে একজন মানুষের সাথে কথা বলতে চেয়েছে। যতক্ষণ সে একজন মানুষের সাথে কথা বলবে না ততক্ষণ সে নিজে থেকে মৃত্যুকে গ্রহণ করবে না। মৃত্যুকে জোর করে তার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। যতক্ষণ সেটি না ঘটবে ততক্ষণ মানুষটি তার কালো ক্যাপসুলে শুয়ে কষ্ট ভোগ করবে।

চতুর্থ মাত্রার রবোটটি জিজ্ঞেস করল, মানুষটি কী নিয়ে কথা বলবে বলে তোমার মনে হয়?

কুরোশিয়া আবার মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে নানারকম তথ্য পর্যালোচনা করে বলল, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু কথাটি হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতার গূঢ় তথ্যটি তার মাঝে লুকিয়ে থাকবে।

নূতন প্রজন্মের একটি রবোট তার কপোট্রনে উত্তেজনার টার্বো চ্যানেল চালু করে বলল, আমরা কি একজন মানুষকে খুঁজে আনতে পারি না? তাহলে অসুস্থ মানুষটির শেষ কথাটি শুনতে পেতাম। মানুষের সভ্যতার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতাম।

উৎসাহী আরেকটি রবোট বলল, আমরাও তাহলে আমাদের সভ্যতা মানুষের সভ্যতার অনুকরণে তৈরি করতে পারতাম।

কুরোশিয়া খানিকক্ষণ নূতন প্রজন্মের এই উৎসাহী রবোটটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আমারও খুব জানার কৌতূহল হচ্ছে এই মানুষটি কী কথা বলবে।

আমরা কি আন্তঃগ্যালাক্টিক বুলেটিন বোর্ডে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বা খবর পাঠাতে পারি না?

ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য, কিন্তু আমি চেষ্টা করব।

কয়েকদিন পর কুরোশিয়া এবং রবোনগরীর অন্য প্রবীণ রবোটেরা আন্তঃগ্যালাক্টিক বুলেটিন বোর্ডে এ রকম একটি খবর প্রচারের ব্যবস্থা করল :

> রবোনগরীতে একজন মানুষ মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্য একজন মানুষের সাথে কথা বলতে চান। কোনো দয়ার্দ্র মানুষ কি এই উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্যে রবোনগরীতে পদার্পণ করবেন?

বুলেটিন বোর্ডে খবর প্রচারিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন কেটে গেল, কিন্তু কোনো মানুষ রবোনগরীতে দেখা করতে এল না। রুগ্ণ মানুষটির অবস্থা ধীরে ধীরে আরো খারাপ হয়ে গেল, তার নিশ্বাস প্রায় শোনা যায় না, হৃৎস্পন্দন কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। কুরোশিয়া মাথা নেড়ে তার সবুজ ফটোসেলের চোখ পিটপিট করে বলল, আমার মনে হচ্ছে এই মানুষটি সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগা। সম্ভবত তাকে তার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

অন্য রবোটরাও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, কেউ কোনো কথা বলল না।

যখন রবোনগরীর সবাই আন্তঃগ্যালাক্টিক গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে কোনো মানুষের এখানে

পদার্পণ করার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল ঠিক তখন তারা মহাকাশে একটি মহাকাশযান আবিষ্কার করল। হাইপার ডাইভ দিয়ে কাছাকাছি চলে আসার পর রবোনগরীর রবোটেরা মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারল সত্যি সত্যি বুলেটিন বোর্ডের তথ্য পড়ে একজন পরিব্রাজক মানুষ রুগ্‌ণ মানুষটির সাথে দেখা করতে আসছে।

পরদিন অপরাহ্ণে মহাকাশযানটি রবোনগরীতে পৌঁছল এবং সেখান থেকে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ নেমে এল। তার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য রকম সজীব। কুরোশিয়া মানুষটিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। মধ্যবয়স্ক পরিব্রাজক মানুষটি বলল, একজন মানুষের অন্য মানুষের প্রতি একটি দায়িত্ব থাকে। আমি সেই দায়িত্ববোধ থেকে এসেছি। কোথায় আছে সেই রুগ্‌ণ মানুষটি?

চল আমার সাথে, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। কুরোশিয়া মানুষটির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি যখন এই রুগ্‌ণ মানুষটির সাথে কথা বলবে তখন আমি কি তোমার পাশে থাকতে পারি?

মধ্যবয়স্ক পরিব্রাজক মানুষটি একটু অবাক হয়ে কুরোশিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি যদি চাও অবশ্যি থাকতে পার।

রুগ্‌ণ মানুষটির জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়া চালু করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। মানুষটি চোখ খুলে কুরোশিয়ার পাশে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে দেখতে পায় এবং তার নিষ্প্রভ চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে। সে তার দুর্বল ডান হাতটি উঁচু করে বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি রুগ্‌ণ মানুষটির দুর্বল হাতটি দুই হাতের মাঝে নিয়ে নরম গলায় বলল, আমি সুদূর গ্যালাক্টিক গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।

রুগ্‌ণ মানুষটি তার চোখের পাতা ফেলে শোনা-যায়-না এ রকম গলায় বলল, তোমাকে ধন্যবাদ।

তুমি আমাকে কিছু বলবে?

রুগ্‌ণ মানুষটি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, বলব।

কী বলবে?

আমি—আমি তোমাদের ভালবাসি।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় বলল, আমি জানি। একজন মানুষ সবসময় অন্য একজন মানুষকে ভালবাসে।

রুগ্‌ণ মানুষটি তার চোখ বন্ধ করল এবং তার চোখের কোনা দিয়ে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে। মানুষটি তার দুর্বল হাত দিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটির হাত ধরে রাখে, তার মুখে এক ধরনের প্রশান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। কিছুক্ষণের মাঝেই তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে হৃৎস্পন্দন থেমে যায়।

কুরোশিয়া রুগ্‌ণ মানুষটির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে একবার স্পর্শ করে বলল, মানুষটি কি মৃত্যুবরণ করেছে?

হ্যাঁ কুরোশিয়া।

এই একটি কথা বলার জন্যে সে এতদিন অপেক্ষা করেছিল?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানতে সে এই কথা বলবে?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, জানতাম।

কুরোশিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কী আশ্চর্য!

মানুষটি একটু অবাক হয়ে রবোট দলপতি কুরোশিয়ার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

দুই সহস্র বছরে রবোনগরীর যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি পরবর্তী কয়েক বছরে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। আন্তঃগ্যালাক্টিক ইতিহাস জার্নালে তার কারণ হিসেবে রবোটের গভীর হীনমন্যতার কথা উল্লেখ করা হয়।

AMARBOI.COM

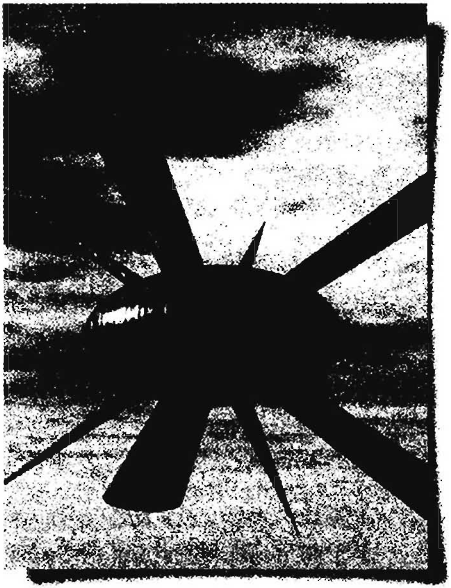

টুকি এবং ঝায়ের (প্রায়) দুঃসাহসিক অভিযান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকথা

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টিতে দুজন মানুষ অন্ধকারে উবু হয়ে বসে আছে। একজনের নাম টুকি অন্যজনের নাম ঝা। তাদের সামনে আবছা অন্ধকারে উঁচুমতন কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। উপরে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠে নিভে যেতেই দুজনেই চমকে উঠল। টুকির মনে হল ঘটনাটা আগে ঘটেছে, কিন্তু কবে ঘটেছে কোথায় ঘটেছে কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'ওটা কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

টুকি এবং ঝা দুজনকে মিলিয়ে মোটামুটিভাবে একজন পুরো মানুষ তৈরি করা যায়। টুকি শুকনো কাঠির মতন, তার শরীরে মেদ বা চর্বি দূরে থাকুক প্রয়োজনীয় মাংসটুকুও নেই, যেটুকু থাকা প্রয়োজন ছিল সেটা জমা হয়েছে ঝায়ের শরীরে—সে দেখতে একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতন। টুকির নাকের নিচে বিশাল গোঁফ, সেটাও খুব সহজে ঝায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়া যেত। বুদ্ধিশুদ্ধির ব্যাপারগুলোও দুজনের মাঝে ঠিক করে ভাগাভাগি করা হয় নি, ঝায়ের ভাগে বেশ কম পড়েছে এবং সেটুকু মনে হয় টুকি পুষিয়ে নিয়েছে। কোনো একটা কিছু বুঝতে যখন ঝায়ের অনেক সময় লেগে যায় সেটা টুকি চোখের পলকে বুঝে নেয়। শুধু তাই নয়, যেটুকু না বুঝলেও ক্ষতি নেই কিংবা যেটুকু বোঝা উচিত নয় সেটাও সে বুঝে ফেলে পুরো জিনিসটাতেই একটা বিদ্‌ঘুটে ঘোঁট পাকিয়ে ফেলে। চরিত্রের অন্য দিকগুলোতেও তাই—টুকি হাসিতামাশার মাঝে নেই, কোনো একটি হাসির দৃশ্য দেখেও সে এর মাঝে হাসার কোনো কিছু খুঁজে পায় না। রসিকতার পুরো ব্যাপারটি পেয়েছে ঝা, অত্যন্ত কাটখোট্টা একটা দৃশ্য দেখেও ঝা তার সমস্ত শরীর দুলিয়ে হা হা করে হাসতে শুরু করে। টুকি সন্দেহপ্রবণ মানুষ, কোনো কিছুকেই সে বিশ্বাস করে না; ঝা সাদাসিধে সহজ সরল, তাকে দশবার বিক্রি করে দিলেও সেটা নিয়ে কোনোরকম আপত্তি করবে না। টুকি বদরাগী—চট করে খেপে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসে; ঝা মোটামুটি মাটির মানুষ, প্রয়োজনের সময়েও সে রেগে উঠতে পারে না।

চেহারা ছবি চালচলন বা চরিত্রের কোনো দিক দিয়ে তাদের কোনো মিল না থাকলেও একটা ব্যাপারে দুজনের মিল রয়েছে, তারা দুজনেই চোর। ছোটখাটো ছিঁচকে চোর নয়, রীতিমতো চোরের বিশেষ কলেজ থেকে পাস করা ডিপ্লোমাধারী পেশাদার চোর। ইন্টার গ্যালাক্টিক বুলেটিন বোর্ডে তাদের নাম পরিচয় প্রায়ই ছাপা হয়। পুলিশ সব সময়েই হন্যে হয়ে তাদের খোঁজাখুঁজি করছে এবং তারা দুজনেই সব সময় পুলিশ থেকে এক ধাপ এগিয়ে থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলেছে। শৈশবে টুকি এবং ঝা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের প্লুটোনিয়াম বা প্রতিরক্ষা দফতরের সফটওয়ার চুরি করে হাত পাকিয়েছে। যৌবনে আন্তঃ-গ্যালাক্টিক সন্ত্রাসী দলের জন্যে পারমাণবিক বোমা চুরি করেছে। এখন দুজনেরই মধ্যবয়স, উত্তেজক জিনিসপত্রে উৎসাহ নেই, ইদানীং মূল্যবান রত্নের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, বড় একটা দাঁও মেরে চুরিচামারি ছেড়ে দিয়ে নিরিবিলি কোনো একটা গ্রহে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্যে আজকাল মাঝে মাঝেই দুজনের মন উসখুস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অর্থে আজকের চুরির প্রজেক্টটা টুকি এবং ঝা দুজনের জন্যেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেন্ট্রাল ব্যাংকের ভল্টে দুই শ চব্বিশ ক্যারটের হীরা এসেছে খবরটা সোলার-নেটে দেখার পর থেকে দুজনেই সেটা গাপ করে দেবার তালে ছিল। খোঁজখবর নিয়ে টুকি আর ঝা বসে বসে নিখুঁত পরিকল্পনা করেছে। জেটচালিত জুতো পরে দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে, মাইক্রো-এক্সপ্লোসিভ দিয়ে দেয়াল ফুটো করেছে, এক্স-রে লেজার দিয়ে ভল্ট কেটেছে, রিকিভ সিস্টেমে লেখা কম্পিউটার ভাইরাস দিয়ে সিকিউরিটি সিস্টেম নষ্ট করেছে, তারপর দুই শ চব্বিশ ক্যারটের বিশাল হীরাগুলো নিয়ে সরে এসেছে। পুরো ব্যাপারটা একেবারে নিখুঁতভাবে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছিল কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা ঝামেলা হয়ে গেল। দু শ চুরানব্বই তালা দালানের এক শ বিরাশি তালায় এসে ঝায়ের বাথরুম পেয়ে গেল। সেখানে বাথরুম খুঁজে বের করে কাজ সেরে নিচে নেমে আসতে আসতে দেখে ততক্ষণে সিকিউরিটি সিস্টেম খবর পেয়ে গেছে। সেন্ট্রাল ব্যাংকটা ঘিরে প্রায় এক ডজন পুলিশের গাড়ি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

টুকি এবং ঝা তখন জেটচালিত জুতো ব্যবহার করে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে বসে পালানোর চেষ্টা করেছে। পুলিশকে ধোঁকা দেয়ার তাদের আধ ডজন প্রোগ্রাম রেডি করা থাকে। দেখতে নিরীহদর্শন গাড়িটি আসলে একটা ভাসমান গাড়ি, নিচু হয়ে উড়তে পারে। সেটায় চড়ে তারা তাদের আধ ডজন প্রোগ্রাম ব্যবহার করেও পুলিশকে কোনোভাবে খসাতে পারল না। তখন আর কোনো উপায় না দেখে তাদের শেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করতে হল, তাদের ভাসমান গাড়িটিকে অ্যাকসিডেন্টের ভান করে ধ্বংস করে দেয়া হল। আগে থেকেই সেখানে তাদের জামাকাপড় পরানো সত্যিকার টিস্যু দিয়ে তৈরী তাদের চেহারার একজোড়া রবোট বসানো আছে, পুলিশ এই মুহূর্তে সেগুলোকে ধরে নানাভাবে জেরা করছে আর সেই ফাঁকে তারা সরে এসেছে।

লুকিয়ে লুকিয়ে টুকি এবং ঝা যে জায়গায় এসে হাজির হয়েছে সেটি জংলা এবং নির্জন। বুকে ভর দিয়ে নিজেদের হাচড় পাচড় করে টেনে টেনে তারা প্রায় কয়েক কিলোমিটার চলে এসেছে। কনুইয়ের ছাল উঠে গেছে, ঝোপঝাড়ের খোঁচা খেয়ে খেয়ে মুখের জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে, বিছুটি জাতীয় একটা গাছ ভুল করে ছুঁয়ে ফেলায় টুকির সারা শরীর চুলকাচ্ছে, কাদাপানিতে দুজনেই মাখামাখি এবং খুব সঙ্গত কারণেই টুকির মেজাজ বাড়াবাড়ি রকম খারাপ হয়ে আছে। সে প্রায় এক শ বাহান্নবারের মতো ঝাকে গালি দিয়ে বলল, রবোটের বাচ্চা রবোট কোথাকার, সাত মাত্রার অপারেশনে কেউ বাথরুমে যায়?

ঝা ছোটখাটো ঝোপঝাড়কে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে নিজেকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সামনে নিতে নিতে বলল, আমি কী করব? তুমি জান সিনথেটিক গলদা চিংড়ি আমার পেটে সয় না।

পেটে সয় না তো এতগুলো খেলে কেন?

মনোসোডিয়াম গ্লুকোমেট দিয়ে ঝাল করে রেঁধেছে। জিভের স্বাদ বেড়ে গেল হঠাৎ—

টুকি রেগেমেগে আরেকটা কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। প্যাচপ্যাচে কাদায় আধডোবা হয়ে থেকে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, একেই বলে কপাল। এখন এর মাঝে বৃষ্টি শুরু হল।

ঝা হাসি হাসিমুখে বলল, মৌসুমী বৃষ্টি। একেবারে সময়মতো এসেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশান একেবারে ধুয়ে নিয়ে যাবে।

টুকি রেগেমেগে বলল, তোমার বৃষ্টির চৌদ্দগুষ্ঠির লিভারে ক্যান্সার হোক।

ঝা মুখের হাসিকে আরো বিস্তৃত করে বলল, এত রেগে যাচ্ছ কেন? কী চমৎকার বৃষ্টি, দেখ না একবার। তিন–চার ঘণ্টার মাঝে থেমে যাবে।

তিন–চার ঘণ্টা? টুকি মুখ খিঁচিয়ে বলল, ততক্ষণ আমরা কী করব?

ভিজব। মঙ্গল গ্রহে বৃষ্টিতে ভেজার একটা ট্যুর আছে। সাড়ে সাত শ ইউনিট দিলে দশ মিনিট ভিজতে দেয়। সিনথেটিক বৃষ্টি। আর এইটা হল একেবারে খাঁটি প্রাকৃতিক বৃষ্টি।

টুকি রেগেমেগে আবার কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। সামনে আবছা অন্ধকারে উঁচুমতন কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, উপরে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। টুকি ভয় পাওয়া গলায় বলল, ওটা কী?

ঝা পকেট থেকে বাইনোকুলার বের করে চোখে লাগিয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলল, একটা দালান।

এই জংলা জায়গায় দালান তৈরি করেছে কোন আহাম্মক? আর এইটা যদি দালানই হবে তাহলে দরজা–জানালা কই?

মানুষের খেয়াল! ঝা উদাস গলায় বলল, মনে নাই নাইন্টি নাইনে একটা বাড়িতে চুরি করলাম, পুরো বাসাটা একটা থালার মতো, ছাদ নেই।

টুকি কোনো কথা না বলে উবু হয়ে বসে বলল, এটা যদি সত্যি দালান হয় তাহলে এই বৃষ্টির মাঝে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। আমি এই দালানে বসে বিশ্রাম নেব।

যদি কেউ থাকে?

টুকি মেঘস্বরে বলল, থাকলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

ঝা ভয়ে ভয়ে বলল, এত কষ্ট করে এত বড় একটা দাঁও মারলাম আর এখন যদি ছোটখাটো বৃষ্টির জন্যে ধরা পড়ে যাই—

সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। টুকি পাখির খাঁচার মতো তার টিংটিঙে বুকে সজোরে একটা থাবা দিয়ে বলল, এই বান্দা কোনো কাঁচা কাজ করে না। ব্রেন ট্রান্সপ্ল্যান্ট আইনসিদ্ধ হলে আমার ব্রেন এতদিনে লাখ দুই লাখ ইউনিটে বিক্রি হত।

দালানটা দেখতে নিরীহ মনে হলেও ভিতরে ঢোকা খুব সহজ হল না। দালানটা ঘিরে প্রথমে কাঁটাতারের বেড়া, তারপর গোপন ইলেকট্রিক লাইন, সবশেষে উঁচু দেয়াল। তারা ঘাঘু চোর না হলে প্রথমেই ধরা পড়ে যেত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সাবধানে উঁচু দালানটার কাছে এসে তারা কোনো দরজা খুঁজে পেল না। তখন মৌসুমী বৃষ্টি আরো চেপে এসেছে, অধৈর্য হয়ে এক্স–রে লেজার দিয়ে কেটে একটা দরজা প্রায় বের করে ফেলছিল ঠিক তখন ঝা দরজা খোলার গোপন ফুটোটা আবিষ্কার করে ফেলল। টুকি তার 'মাস্টার কি' ভিতরে ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খুট করে দরজা খুলে গেল।

ভিতরে আবছা অন্ধকার। সাধারণ ঘরবাড়ি দেখতে যেরকম হয় দালানটির ভিতরে মোটেও সেরকম নয়—এটি যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। টুকি এবং ঝা অনেক খুঁজেও উপরে ওঠার এলিভেটরটি খুঁজে পেল না। তখন বাধ্য হয়ে পায়ে সাকশান জুতো লাগিয়ে তারা পাইপ বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। খানিক দূর উঠেই অবশ্য তারা একটা সিঁড়ি আবিষ্কার করে, সেই সিঁড়ি ধরে মোটামুটিভাবে দালানটার একেবারে উপরে উঠে এল। নানা স্তরে নানা রকম ঘর পার হয়ে এলেও তারা আরাম করে বসার মতো কোনো জায়গা খুঁজে পেল না। যখন তারা প্রায় আশা ছেড়ে দিচ্ছিল ঠিক তখন হঠাৎ করে দুজন মানুষের কথোপকথন শুনে টুকি এবং ঝা পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, মাঝারি আকারের একটা ঘরে ভারি আরামদায়ক দুটি চেয়ারে প্রায় গা ডুবিয়ে দুজন বুড়োমানুষ খোশগল্প করছে। মানুষ দুজন

AMARBOI.COM

টুকি এবং ঝাকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, তোমরা কে?

টুকি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বুড়োমতন একজন ধমক দেয়ার মতো করে বলল, তোমরা এখানে কী করছ?

টুকি এবং ঝা পেশাদার চোর, তাদের সব কাজকর্ম হয় মানুষের অগোচরে। তারা সাধারণত মানুষের দেখা পায় না এবং হঠাৎ করে কোনো মানুষ ধমকে উঠলে খুব স্বাভাবিক কারণেই তারা ভয় পেয়ে যায়। এবারো দুজনেই ভিতরে ভিতরে একটু ভয় পেয়ে গেল, টুকি ভয়টা গোপন করে তার ব্যাগ থেকে মাঝারি আকারের একটা অস্ত্র বের করে গলার স্বর মোটা করে বলল, একটা কথা বললে ঘিলু বের করে দেব।

ঝা অস্ত্রটার দিকে এক নজর তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, এটা তো ট্রাংকুয়ালাইজার গান। এটা দিয়ে কি ঘিলু বের হবে?

টুকি এবারে ঝায়ের দিকে তাকিয়ে একটা বাজখাঁই ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর তুমি।

বুড়ো মানুষদের একজন বলল, কিন্তু—

টুকির ধমক খেয়ে ঝায়ের মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে মনের ঝাল মেটাল মানুষগুলোর ওপরে, চিৎকার করে বলল, কোনো কথা নয়। এক থাবড়া দিয়ে মাথা ভেঙে দেব।

মানুষটা তখনো কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। বলল, কিন্তু—

ঝা তখন অঙ্গভঙ্গি করে মাথা ভেঙে ফেলে দেবার ভান করে দাঁত কিড়মিড় করে এগিয়ে যায় এবং সেটা দেখে টুকি পর্যন্ত একটু ঘাবড়ে গিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে গুলি করে বসল। ট্রাংকুয়ালাইজার গানের গুলি খেয়ে মানুষ দুজন 'ফোঁস' জাতীয় একটা শব্দ করে সাথে সাথে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। ঘুম যে গাঢ় সেটি প্রমাণ করার জন্যেই সম্ভবত সাথে সাথে তাদের নাক ডাকতে শুরু করে।

ঝা তার মুখে ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গিটি ধরে রেখে বলল, কী হল, মরে গেল নাকি?

মরবে কেন? টুকি বিরক্ত হয়ে বলল, ট্রাংকুয়ালাইজার গানের গুলি খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে। দেখছ না নাক ডাকছে।

ঝা ঠিক বুঝতে পারল না মুখে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিটি ধরে রাখবে কি না, দ্বিধান্বিত হয়ে খানিকটা প্রশ্নের ভঙ্গিতে টুকির দিকে তাকাল। টুকি তার অস্ত্রটি ব্যাগে ঢুকাতে ঢুকাতে বলল, যাও, এদের বাইরে রেখে এস।

ঝা অবাক হয়ে বলল, কেন?

শুনতে পাচ্ছ না জেট ইঞ্জিনের মতো নাক ডাকছে? কেউ কানের কাছে এভাবে নাক ডাকলে বিশ্রাম নেয়া যায়?

ঝা ইতস্তত করে বলল, কিন্তু আমার একটু বাথরুমে যাওয়ার দরকার ছিল। সিনথেটিক গলদা চিংড়িগুলো পেটের মাঝে—

যেতে তোমাকে না করছে কে? মানুষগুলোকে বাইরে রেখে বাথরুমে কেন, ইচ্ছে হলে নরকে চলে যাও।

ঝা খুব বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকা বুড়ো মানুষ দুটির শার্টের কলার ধরে টেনে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। টুকি নরম চেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে সামনে রাখা বিশাল ভিডিও স্ক্রিনের টেলিভিশনটি চালু করার চেষ্টা করতে থাকে। এ রকম সময়ে পাবলিক চ্যানেলগুলোতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। বড় ধরনের কিছু একটা চুরি করে এসে সে সব সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে তার স্নায়ুকে শীতল করে থাকে। এখন সে চ্যানেল ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দূরে থাকুক কোনো ধরনের অনুষ্ঠানই শুনতে পেল না, সব চ্যানেলেই নানা ধরনের দুর্বোধ্য যান্ত্রিক ছবি। টুকি বিরক্ত হয়ে টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়।

মানুষ দুটিকে বাইরে রেখে ফিরে আসতে ঝায়ের খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় কিন্তু দেখা গেল তার কোনো দেখা নেই। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে টুকি তার নরম চেয়ার থেকে উঠে ঘরটাতে পায়চারি শুরু করে এবং ঠিক তখন সে আবিষ্কার করল ঘরের এক কোনায় একটি রবোট চুপ করে দাঁড়িয়ে তার দিকে সবুজ ফটোসেলের চোখে তাকিয়ে আছে। টুকি প্রথমে চমকে উঠল, তারপর সাহসে ভর করে কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, এই রবোট—

রবোটটি কোনো কথা না বলে কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। টুকি আবার বলল, এই রবোট—কথা বলছ না কেন?

রবোটটি এবারেও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চোখ দুটি আরো কয়েকবার পিটপিট করল। টুকি যখন তৃতীয়বার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে কি না চিন্তা করছে ঠিক তখন ঝা ঘরে এসে ঢুকল। সে ভিজে জবজবে হয়ে আছে। টুকি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কী! তুমি ভিজলে কেমন করে?

বাইরে যা বৃষ্টি! ভিজব না?

টুকি চোখ কপালে তুলে বলল, এই বৃষ্টিতে তুমি বাইরে গেলে কেন?

তুমি না বললে মানুষগুলোকে বাইরে রেখে আসতে!

আরে রবোটের বাচ্চা—আমি বলেছিলাম ঘরের বাইরে!

ঝা খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে অপ্রস্তুতের মতো বলল, আমি ভেবেছি তুমি বলেছ বিল্ডিঙের বাইরে—

ঠিক এই সময়ে সমস্ত বিল্ডিংটা মৃদু মৃদু কাঁপতে শুরু করে এবং কোথায় জানি একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। সামনের বড় ভিডিও স্ক্রিনগুলোতে বিচিত্র সব নকশা খেলা করতে থাকে। ঝা মাথা নেড়ে বলল, এই বিল্ডিঙের সবকিছু আজব। কেমন শব্দ করছে দেখছ?

টুকি মাথা নাড়ল। ঝা বলল, সারা বিল্ডিঙে কোনো বাথরুম নেই।

বাথরুম নেই?

না! একটা আছে সেটা উল্টো।

টুকি অবাক হয়ে বলল, উল্টো?

হ্যাঁ! ছাদ থেকে ঝুলছে। এটা কী ধরনের ফাজলামো? আমরা কি উড়ে উড়ে গিয়ে বাথরুম করব?

টুকি খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ!

ঝা ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে?

পালাও! এখান থেকে পালাও।

কেন? কী হয়েছে?

বুঝতে পারছ না? এইটা একটা মহাকাশযান।

মহাকাশযান?

হ্যাঁ! মহাকাশযান। মহাকাশযানে কোনো সোজা উল্টো নেই। সেখানে মহাকর্ষ নেই বলে সবকিছু ভাসতে থাকে। এটাও নিশ্চয়ই মহাকাশে যাবে। শুনতে পাচ্ছ না ইঞ্জিন চালু হয়েছে?

ঝা কান পেতে শুনল সত্যি সত্যি গুমগুম করে ইঞ্জিন শব্দ করছে। সে ফ্যাকাশে মুখে বলল, যে দুজনকে বাইরে রেখে এসেছি তারা মহাকাশচারী?

হ্যাঁ।

সর্বনাশ!

নিচে চল, বের হতে হবে এখান থেকে।

টুকি বিদ্যুৎবেগে নিচে ছুটতে থাকে, পিছনে পিছনে ঝা। ছুটতে ছুটতে তারা শুনতে পায় ইঞ্জিনের শব্দটা বাড়ছে, দেয়াল মেঝে ছাদ সবকিছু কাঁপতে শুরু করেছে। কোনোরকমে নিচে এসে দরজা খোলার জন্যে হ্যান্ডেলে হাত রাখতেই হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল এবং হঠাৎ করে তারা বুঝতে পারল মহাকাশযানটি উপরে উঠতে শুরু করেছে। টুকি এবং ঝা হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং তাদের মনে হতে লাগল অদৃশ্য একটা শক্তি তাদেরকে মেঝের সাথে চেপে ধরে রেখেছে। ঝা কোনোমতে বলল, নড়তে পারছি না।

পারবে না! দশ জি এক্সেলেরেশান।

ঝা টুকির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে! সর্বনাশ—মুখের চামড়া নিচে ঝুলে যাচ্ছে।

টুকি রেগে বলল, বয়স নয় রবোটের বাচ্চা কোথাকার—এক্সেলেরেশানে চামড়া ঝুলে যাচ্ছে।

কী অদ্ভুত লাগছে তোমাকে!

তোমাকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না। টুকি চেষ্টা করে একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, সব দোষ তোমার। তুমি যদি এক শ বিরাশি তালার বাথরুমে না যেতে—

দোষ আমার? তুমি যদি এই বিল্ডিঙে না আসতে—

ঝায়ের কথা তার মুখে আটকে গেল, মহাকাশযানটি এখন প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠছে, তার ভয়ঙ্কর ত্বরণে দুজনের চোখের সামনে একটা লাল পরদা ঝুলতে থাকে। সেই লাল পরদা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে এক সময় অন্ধকার হয়ে আসে। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে শুনল রিনরিনে গলায় কে যেন বলল, এম. সেভেন্টি ওয়ানে মানুষের তৃতীয় কলোনিতে আপনাদের ভ্রমণ আনন্দময় হোক।

টুকি অনেক কষ্টে চোখ খুলে তাকাল। উপরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ানো রবোটটি কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে বলল, আপনারা আপনাদের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে না বসে মেঝেতে চ্যাপটা হয়ে কেন শুয়ে আছেন আমি জানি না।

টুকি চাপা গলায় বলল, চুপ কর হতভাগা।

আপনারা যদি আপনাদের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে থাকতেন তাহলে আপনাদের বর্তমান শারীরিক যন্ত্রণা উপশম করার জন্যে মস্তিষ্কে বিশেষ তরঙ্গ পাঠানো যেত। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। আপনাদের উপরে তুলে নেয়া প্রায় অসম্ভব।

ঝা চিঁ চিঁ করে বলল, কেন?

আপনার স্বাভাবিক ওজনই এক শ পঞ্চাশ কেজির কাছাকাছি। এখন আপনার ওজন দাঁড়িয়েছে দেড় হাজার কেজি।

কতক্ষণ এ রকম থাকবে?

বেশ অনেকক্ষণ।

কষ্ট কি আরো বাড়বে?

কষ্ট এখনো শুরু হয় নি। কিছুক্ষণের মাঝে শুরু হবে।

ঝা কাতর গলায় বলল, কিছু কি করা যায় না?

একটা উপায় আছে। আপনাদের মাথায় আঘাত দিয়ে অচেতন করে দেয়া। তাহলে কিছু টের পাবেন না।

টুকি এবং ঝা প্রবল বেগে মাথা নেড়ে নিষেধ করার চেষ্টা করল কিন্তু অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি এত জোরে তাদেরকে মেঝের সাথে চেপে ধরে রেখেছে যে শরীরের একটা মাংসপেশিও এতটুকু নাড়াতে পারল না। টুকি এবং ঝা অনেক কষ্টে চোখ খুলে আতঙ্কে নীল হয়ে দেখল রবোটটি বড় সাইজের একটা গদা নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে, গদার আঘাতে নাকি মহাকাশযানের প্রচণ্ড গতিবেগের ত্বরণের কারণে তারা জ্ঞান হারিয়েছে সেটা টুকি কিংবা ঝা কারো মনে নেই।

২

জ্ঞান ফিরে ঝা আবিষ্কার করল মাধ্যাকর্ষণহীন একটা ঘরে সে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরে সুনসান নীরবতা। মাথা ঘুরিয়ে দেখল টুকিও ভাসতে ভাসতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, কপালের কাছে খানিকটা জায়গা আলুর মতো ফুলে আছে, নিশ্চয়ই সেখানে রবোটের বাচ্চা রবোট গদা দিয়ে মেরেছিল। ঝা টুকিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে তার কাছে যেতে চাইল কিন্তু ব্যাপারটা সোজা নয়। ঝা এক জায়গায় হাচড় পাচড় করতে থাকে কিন্তু এক সেন্টিমিটার সামনেও এগোতে পারে না।

আপনি কি ব্যায়াম করছেন? আমি কখনো কাউকে ব্যায়াম করতে দেখি নি।

গলার স্বর শুনে ঝা নিচে তাকাল, সেখানে সোজা হয়ে রবোটটি দাঁড়িয়ে আছে। রাগ চেপে বলল, না আমি ব্যায়াম করছি না। আমি সামনে যাবার চেষ্টা করছি।

সামনে যেতে হলে আপনাকে পিছনে ধাক্কা দিতে হবে। প্রাচীন বিজ্ঞানী নিউটন ভরবেগের সাম্যতার এই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। পিছনে ধাক্কা দিলে প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামনে একটি ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়াতে—

ঝা ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সাধারণত রাগ করে না, এবারে রেগে উঠে বলল, চুপ কর হতভাগা, না হয় এক রদ্দা দিয়ে ঘিলু বের করে দেব।

রবোটটি তার গলার স্বরে এক ধরনের উৎফুল্ল ভাব ফুটিয়ে বলল, আপনি কি রাগ করছেন? আমি কখনো কাউকে রাগ করতে দেখি নি। রবোট ফার্মে আমার বন্ধুরা বলেছে মানুষ যখন রাগ হয় তখন নাকি তারা বিচিত্র সব কাজকর্ম করে। সেটা দেখা নাকি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আপনি আরো একটু রাগ করবেন? আমি আবার দেখি।

ঝা চোখ পাকিয়ে রবোটটার দিকে তাকিয়ে পা দিয়ে কাছাকাছি একটা দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে টুকির দিকে এগিয়ে গেল। কাছে এসে তাকে বারকতক ঝাঁকুনি দিতেই সে চোখ খুলে চিৎকার করে বলল, ধরা পড়ে গেছি? পুলিশ এসে গেছে?

না, ঝা মাথা নেড়ে বলল, ধরা পড়ি নি। কিন্তু ধরা পড়লেই অনেক ভালো ছিল। আমরা এখন মহাকাশে।

টুকির সব কথা মনে পড়ে গেল এবং সে সাথে সাথে ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করতে থাকে। শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ধড়মড় করে উঠে বসা যায় না। কাজেই টুকি ওলটপালট খেয়ে এক জায়গায় ঘুরতে শুরু করল, তাকে থামাতে গিয়ে ঝাও একই জায়গায়

ওলটপালট খেতে লাগল।

রবোটটি নিচে দাঁড়িয়ে বলল, মানুষ প্রজাতির নির্বোধ কাজ দেখা বড় আনন্দের।

টুকি কোনোমতে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, ব্যাটা রবোটের বাচ্চা তুই ভাসছিস না কেন? সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেমন করে?

আমার পায়ে রয়েছে বিশেষ সাকশান জুতো।

তাহলে আমাদের সেই জুতো দিচ্ছিস না কেন?

আপনারা চাইছেন না তাই দিচ্ছি না।

ঠিক আছে এখন চাইলাম।

এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। আপনাদের পায়ের সাইজ যেন কত?

কিছুক্ষণের মাঝেই টুকি এবং ঝা তাদের পায়ে সাকশান জুতো পরে মেঝেতে স্থির হল। প্রথমেই তারা জানার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে মহাকাশযানটা কোথায় আছে এবং কোনদিকে যাচ্ছে। রবোটটিকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আমি জানি কিন্তু বলব না।

কেন বলবে না?

এটি একটি গোপন প্রজেক্ট।

রবোটের বাচ্চা রবোট—এই গোপন প্রজেক্টে আমরা বসে আছি আর আমরা জানতে পারব না কোথায় যাচ্ছি?

আমি রবোটের বাচ্চা নই—রবোটটি মাথা নেড়ে বলল, আমার নাম রোবি।

ওই একই কথা।

এক কথা নয়। রবোটের বাচ্চা রবোট সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা। রবোটের বিয়ে হয় না এবং রবোটের বাচ্চা হয় না। আমার নাম রোবি।

ঠিক আছে ঠিক আছে। রোবি, তুমি বল আমরা কোথায় যাচ্ছি।

রোবি শান্ত গলায় বলল, এটা বলা যাবে না।

টুকি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, বলা যাবে না?

না। এই প্রজেক্টে যাদের যাওয়ার কথা ছিল, আপনারা তাদের ফেলে রেখে চলে এসেছেন। আপনারা বেআইনি। মনে হচ্ছে অনেক বড় গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন।

ঝা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কী হবে?

জানি না। আমি যখন আপনাদের কথা বলেছি তখন পৃথিবীর কন্ট্রোলরুমে বিশাল হইচই শুরু হয়েছে। যিনি ডিরেক্টর তিনি মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেছেন, শালাদের কিলিয়ে ভর্তা বানাও।

তাই বলেছেন?

হ্যাঁ। এটাই মনে হচ্ছে অফিসিয়াল নির্দেশ। আমার আপনাদের দুজনকে কিলিয়ে ভর্তা বানাতে হবে। কখন করতে হবে জানালেই কাজ শুরু করে দেব। সেন্ট্রাল ডাটাবেস থেকে শুধু জেনে নিতে হবে 'কিলিয়ে' কথাটার মানে কী আর 'ভর্তা' কথাটার মানে কী। আপনারা জানেন?

টুকি রোবির শক্ত হাতের মুঠির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা জানি। আমরা যদি বলে দিই তাহলেও কি সেন্ট্রাল ডাটাবেস থেকে জানার দরকার আছে?

ভালো করে বুঝিয়ে দিলে দরকার হবে না।

টুকি উদাস গলায় বলল, কিলিয়ে ভর্তা করা মানে যত্ন করে রাখা—কোনো অসুবিধা যেন না হয়।

AMARBOI.COM

ঝা যোগ করল, বিশেষ লক্ষ্য রাখা যেন খেতে কোনো অসুবিধা না হয়। সিনথেটিক খাবার না দিয়ে প্রাকৃতিক খাবার। বড় বড় গলদা চিংড়ি—

হ্যাঁ, টুকি মাথা নাড়ল, সাথে নরম বিছানা। আর ঘুম থেকে ওঠার পর ভালো পানীয় এবং ক্লাসিক্যাল মিউজিক।

পরিষ্কার কাপড়। সিনথেটিক নয়। এক শ ভাগ কটন।

হালফ্যাশন হলে ভালো হয়। ঢিলেঢালা ধরনের।

দুই ঘণ্টা পর পর নাশতা। মেনু কী হবে আগে থেকে জানিয়ে রাখা।

গোসলের পানি হবে হালকা কুসুম কুসুম গরম।

রোবি চোখ পিটপিট করে বলল, মানুষের ভাষা বড়ই বিচিত্র। 'কিলিয়ে ভর্তা করা' তিন শব্দের একটা বাক্য অথচ এর অর্থ কত ব্যাপক। সত্যিই বিচিত্র।

টুকি এবং ঝা একসাথে মাথা নাড়ল।

'কিলিয়ে ভর্তা করার' ব্যবস্থা হওয়ার পরেও টুকি এবং ঝা মনমরা হয়ে মহাকাশযানে বসে আছে। প্রথম কিছুক্ষণ মহাকাশযানের জানালা দিয়ে নীল পৃথিবীটাকে দেখা গেছে, এখন আর দেখা যাচ্ছে না। মহাকাশযানের বড় বড় ইঞ্জিনগুলো চালু হয়ে সেটাকে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সারাজীবন চুরিচামারি করে কাটিয়েছে বলে গ্রহ নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। যদি গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানটুকুও থাকত তাহলে তারা বুঝতে পারত মহাকাশযানটি মঙ্গল গ্রহের পাশ কাটিয়ে বৃহস্পতির মহাকর্ষ বলকে ব্যবহার করে একটি হাইপার ডাইভ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মহাকাশযানের ছোট ঘরটাতে তাদের কাজকর্ম বিশেষ কিছু নেই। সময় কাটানো একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য সময় হলে টুকি এবং ঝা ঝগড়াঝাঁটি করে সময় কাটাতে পারত কিন্তু এখন সেটাও করতে পারছে না। প্রত্যেকবার তারা একে অপরের ওপর রেগে উঠতেই রোবি গলায় তার যান্ত্রিক ধরনের আনন্দ ঢেলে বলে, কী চমৎকার! কী চমৎকার! আপনারা নিশ্চয়ই রাগ করছেন। আমি শুনেছি মানুষের রাগের প্রথম পর্যায়ে নাকি একে অন্যের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করে। সেগুলো নাকি শুনতে খুব ভালো লাগে। রাগারাগির দ্বিতীয় পর্যায়ে নাকি একজন অন্যজনের নাকে হাত দিয়ে আঘাত করে। সেটি দেখলে নাকি অনেক আনন্দ হয়। কখন আপনারা একে অন্যকে আঘাত করবেন?

কাজেই যত রাগই হোক টুকি এবং ঝা চুপ করে মুখ শক্ত করে বসে থাকে। খুব যখন মন খারাপ হয় তখন তারা তাদের ঝোলা বের করে চুরি করে আনা হীরার টুকরোগুলোতে হাত বুলায়। হাতের মুঠির মতো বড় বড় হীরা, কয়েকটা কাটা হয়েছে, কয়েকটা কাটা হয় নি, হাত বুলাতে তাদের বড় ভালো লাগে। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে এগুলো বিক্রি করে কোনো একটা দ্বীপ কিনে নিয়ে মোটামুটিভাবে বাকি জীবনটা আরামে কাটিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু পৃথিবীতে ফিরে যাবে সেরকম কোনো আশা এই মুহূর্তে তাদের সামনে নেই। মহাকাশযানটি বৃহস্পতি এবং নেপচুনের মাঝামাঝি এসে হাইপার ডাইভ দিয়ে সৌরজগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেটা বের হয়েছে গ্যালাক্সির অন্য পাশে—সেখানকার এম. সেভেন্টি ওয়ান নক্ষত্রপুঞ্জে, যার আশপাশে বসতিযোগ্য অনেকগুলো গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে এবং যে গ্রহ উপগ্রহগুলোতে এক সময় পৃথিবীর মানুষেরা তাদের কলোনি তৈরি করেছিল।

টুকি এবং ঝা সেই কলোনিগুলোর অস্তিত্বের কথাই জানত না, কাজেই সেখানে যে বিগত দুই শতাব্দী থেকে চরম অরাজকতা চলছে সেটা জানারও তাদের কোনো উপায়ই ছিল না।

www.amarboi.com

৩

শুয়ে বসে থেকে এবং ভালো খেয়ে টুকি এবং ঝায়ের স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হল কিন্তু কিছু না করে এবং চব্বিশ ঘণ্টা রোবি নামের হাবাগোবা রবোটটার কথা শুনতে শুনতে তাদের মনমেজাজের অবস্থা হল খুব খারাপ। রোবির কপোট্রনের কানেকশান কেটে তাকে অচল করে রাখা টুকি কিংবা ঝায়ের জন্যে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয় কিন্তু মহাকাশযানের কোথায় কী আছে সেগুলো রোবি ছাড়া আর কেউ জানে না বলে তাকে চলাফেরা করতে দিতে হচ্ছে।

হাইপার ডাইভ দেয়ার দুই সপ্তাহ পর রোবির যন্ত্রণায় টুকি এবং ঝায়ের জীবন যখন মোটামুটি অসহ্য হয়ে উঠল তখন হঠাৎ করে তাদের জীবনে খানিকটা উত্তেজনা দেখা দিল। ঘুম থেকে উঠে তারা আবিষ্কার করল এই নক্ষত্রপুঞ্জের সবচেয়ে হিংস্র এবং সবচেয়ে যুদ্ধবাজ বিদ্রোহী দলটি তাদের মহাকাশযানটিকে দখল করে বিচিত্র একটি গ্রহে নামিয়ে ফেলেছে।

টুকি, ঝা এবং রোবিকে মহাকাশযান থেকে নামিয়ে বিদ্রোহী দল তাদের আস্তানায় নিয়ে যেতে থাকে। যারা তাদেরকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়েছে তারা সবাই খুব উগ্র প্রকৃতির মানুষ, টুকি এবং ঝাকে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে নিতে নিতে তাদের সম্পর্কে নানা ধরনের অসম্মানজনক কথা বলতে লাগল। টুকি এবং ঝা অবিশ্যি বিশেষ কিছু মনে করল না, তাদের জীবনে তারা অসংখ্যবার এ রকম পরিবেশে পড়েছে। রোবি অবশ্য সারাক্ষণ তাদের জ্বালাতন করতে লাগল, পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন?

টুকি মুখ শক্ত করে বলল, পেলে পেয়েছি, তাতে তোমার বাবার কী?

না, আমি শুনেছি মানুষ খুব ভয় পেলে জামাকাপড়ে নাকি পেচ্ছাব করে দেয়। আপনারা কি পেচ্ছাব করে দিয়েছেন?

ঝা দাঁত কড়িমিড় করে বলল, না, করি নি।

কেমন করে জানেন করেন নি? হয়তো নিজের অজান্তে করে দিয়েছেন। আমি শুনেছি মানুষ নিজের অজান্তে পেচ্ছাব করে দেয়। ব্লাডার বলে একটা জিনিস থাকে, কিডনি থেকে ফিল্টার হয়ে পেচ্ছাব সেখানে এসে জমা হয়, সেটাকে যেটা কন্ট্রোল করে—

চুপ কর হতভাগা—ফিউজড বাল্ব, প্যাঁচকাটা স্ক্রু—

ঝায়ের ধমক খেয়েও রোবি নিবৃত্ত হল না, ফিসফিস করে বলল, মানুষ ভয় পেলে তাদেরকে নাকি খুব বিচিত্র দেখায়। আপনাদেরকেও বিচিত্র দেখাচ্ছে। কী মনে হয় এখন—আপনাদের কি গুলি করে মারবে? তাহলে ভয় পেয়ে নিশ্চয়ই কাপড়ে পেচ্ছাব করে দেবেন। আচ্ছা, পেচ্ছাব জিনিসটা কী? তার পি.এইচ. কত? স্পেসেফিক গ্র্যাভিটি? কেমিক্যাল কম্পোজিশান? রংটা কী?

পেছন থেকে রোবির পিছনে কষে একটা লাথি মারার ইচ্ছা ঝাকে অনেক কষ্ট করে সংবরণ করতে হল।

টুকি এবং ঝাকে বিদ্রোহী দলের নেতার সামনে এনে প্রায় ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া হল। নেতা মানুষটির বয়স খুব বেশি নয়, মাথায় বড় চুল এবং লম্বা লম্বা গোঁফ, গায়ের রং ফ্যাকাশে, চোখ দুটি ঢুলুঢুলু এবং টকটকে লাল। ঢিলেঢালা আলখাল্লার মতো একটা ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের কাপড় পরে আছে। ঢুলুঢুলু চোখে টুকি এবং ঝাকে এক নজর দেখে বলল, এরাই তারা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগী রাগী চেহারার একজন মোটা গলায় বলল, জি হুজুর! তারপর সে টুকি এবং ঝায়ের পিছনে গুঁতো দিয়ে বলল, আমাদের নেতাকে অভিবাদন কর—

টুকি শুকনো মুখে বলল, অভিবাদন কেমন করে করে?

মাটিতে মাথা ঠেকাও। বেকুব কোথাকার।

টুকি এবং ঝা মাটিতে মাথা ঠেকাতে যাচ্ছিল তখন বিদ্রোহী দলের নেতাটি গুরুগম্ভীর গলায় বলল, তুমি বেকুব কাকে বলছ? এই দুজন হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ পরিচালনাকারী অস্ত্রবিজ্ঞানী রিকি এবং ফ্রাউল।

টুকি এবং ঝা চমকে উঠল, তারা নিচু শ্রেণীর চোর, বিজ্ঞানী রিচি ফ্রাউল নয় কিন্তু সেটা এখন বলা ঠিক হবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

. দলের নেতা তার লম্বা গোঁফে হাত বুলিয়ে ঢুলুঢুলু চোখকে যেটুকু সম্ভব খুলে বলল, এই দুজন অস্ত্রবিজ্ঞানীকে গোপনে আমাদের এম. সেভেন্টি ওয়ান এলাকায় পাঠানো হয়েছে। আমরা তাদের ধরে ফেলেছি, এখন তাদেরকে কত দামে গ্যালাক্টিক হাইকমান্ডের কাছে বিক্রি করতে পারব চিন্তা করে দেখেছ কেউ?

যে মানুষটি টুকি এবং ঝাকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অভিবাদন করার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল, সে এবারে খুব কাঁচুমাচু হয়ে পড়ল। মাথা নিচু করে বলল, বুঝতে পারি নাই স্যার—একেবারে চোরের মতো চেহারা ছবি—

চুপ কর বেয়াদব। এক্ষুনি বিজ্ঞানী রিচি আর ফ্রাউলের পায়ে চুমু খেয়ে ক্ষমা চাও।

যারা টুকি এবং ঝাকে মহাকাশযান থেকে ধরে এনেছে তাদের অনেকেই এবার উবু হয়ে টুকি এবং ঝায়ের পায়ে চুমু খাবার চেষ্টা করতে লাগল। ঝা মোটামুটি হতবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, টুকি ততক্ষণে খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে। বৃষ্টির রাতে আশ্রয় নেবার জন্যে মহাকাশযানে উঠে বুড়োমতন যে দুজন বদরাগী মানুষকে বৃষ্টির মাঝে বাইরে ফেলে এসেছিল তারাই নিশ্চয় বিজ্ঞানী রিচি আর ফ্রাউল। তারা সেই মহাকাশযানটিতে করে এসেছে বলে তাদেরকেই মনে করছে অস্ত্রবিজ্ঞানী রিচি আর ফ্রাউল। এই রকম মাথা গরম বিদ্রোহী দলকে সত্যি কথাটা তাড়াতাড়ি বলে দেয়া ভালো। এটি গোপন রাখার চেষ্টা করেও খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না। টুকি কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমরা আসলে বিজ্ঞানী রিচি আর ফ্রাউল নই। আমার নাম হচ্ছে টুকি আর এ হচ্ছে ঝা।

বিদ্রোহী দলের নেতা হা হা করে হেসে উঠে বলল, আমি ঠিক এ রকম একটা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম মহামান্য অস্ত্রবিজ্ঞানী রিচি এবং ফ্রাউল। এর আগেরবার আমরা যখন গ্যালাক্টিক এম্বেসডরকে ধরেছিলাম তিনিও প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চাচ্ছিলেন না। শেষে আমরা যখন একটা একটা করে তার নাকের লোম ছিড়তে শুরু করলাম—

নাকের লোম?

হ্যাঁ! তখন সব স্বীকার করে ফেললেন। আপনারা অবশ্যি জ্ঞানী মানুষ, আপনাদের ওপর নিচু স্তরের অত্যাচার করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু দরকার পড়লে আর কী করব?

টুকি মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু আসলে আমরা সত্যিই বিজ্ঞানী নই।

খুব যেন একটা মজার কথা শুনেছে সেরকম ভান করে বিদ্রোহী দলের নেতা জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনারা কী?

আমরা আসলে চোর।

'চোর? হা হা হা—' দলপতির সাথে অন্য সবাই এবারে উচ্চৈঃস্বরে হা হা করে হাসতে

AMARBOI.COM

শুরু করে এবং টুকি আর ঝা হঠাৎ করে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। দলপতি এক সময় হাসি থামিয়ে বলল, 'আপনারা সত্যি সত্যি জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। মিথ্যা কথাটি কেমন করে বলতে হয় তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। মিথ্যা কথা বলতে হয় সত্যির খুব কাছাকাছি করে। আপনাদের বলা উচিত ছিল যে আপনারা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কিংবা শিল্পী–সাহিত্যিক। তা না বলে আপনারা বললেন চোর!

টুকি মুখ শক্ত করে বলল, আমরা সত্যিই চোর।

দলপতি তার চোখে কৌতুকের হাসি ধরে রেখে বলল, তার কোনো প্রমাণ আছে?

আছে। আমরা শেষবার যেটা চুরি করেছি সেটা আমাদের কাছেই আছে।

দেখি, কী চুরি করেছেন।

টুকি তার কোমর থেকে খুলে হীরার ঝোলাটি দলপতির দিকে এগিয়ে দিল। সে ভিতরে এক নজর তাকিয়ে একটা বড় সাইজের হীরা বের করে এনে আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসতে থাকে। অন্য সবাই যারা কাছাকাছি ছিল এবারে তারাও হাসতে শুরু করল। টুকি এবং ঝা প্রথমবারের মতো পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল, হীরা চুরি করার মাঝে কোন অংশটি হাসির কে জানে। দলপতি কোনোমতে হাসি থামিয়ে চোখ মুছে বলল, আপনারা চুরি করার আর জিনিস পেলেন না? হীরা চুরি করলেন?

কী হয় হীরা চুরি করলে?

খুব বড় রকমের গাধামো হয়। মাটি থেকেই যখন দশ কেজি–বিশ কেজি সাইজের হীরা তুলে নেয়া যায় তখন যদি কেউ এইটুকুন হীরা দেখিয়ে বলে সে সেটা চুরি করে এনেছে তখন শুনতে কেমন লাগে?

টুকি আর ঝা কিছুই বুঝতে পারল না, খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দলপতি বলল, এই পুরো গ্রহটা হীরার তৈরী। এই যে আপনি মেঝের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা হীরার, দেয়ালটা হীরার, এই গ্রহের ছাদ হীরার, বাইরের পাহাড়টা হীরার! দুই বিলিয়ন বছর আগে এই গ্রহের কার্বন-কোর বাইরের পাথরের চাপে হীরা হয়ে গেছে। তারপর গত এক বিলিয়ন বছরে বাইরের পাথর ক্ষয়ে গিয়ে ভিতরের হীরা বের হয়ে এসেছে। এখানে কেউ হীরা চুরি করে না।

টুকি এবং ঝা নিচে তাকাল। সত্যি সত্যি তারা স্বচ্ছ কিছুর উপর দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে সেই একই স্বচ্ছ দেয়াল, স্বচ্ছ ঘরের ছাদ। চারদিকে এত হীরা আর তারা কিনা এই অল্প কয়টা হীরা চুরি করার জন্যে জীবনপণ করেছিল? টুকি এবং ঝার হঠাৎ নিজেদের বোকার মতো মনে হতে থাকে।

দলপতি হাসি হাসিমুখে বলল, আপনারা কি এখনো দাবি করবেন যে আপনারা চোর, নাকি সত্যি কথাটি বলে দেবেন বিজ্ঞানী রিচি এবং ফ্রাউল।

টুকি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি কথাটাই হচ্ছে আমরা চোর।

বেশ। তাই যদি মনে করেন তাহলে তাই হোক। দলপতির চোখমুখ হঠাৎ কেমন জানি থমথমে হয়ে যায়, গম্ভীর গলায় বলে, যদি আপনারা সেই বিখ্যাত খ্যাতিমান অস্ত্রবিজ্ঞানী না হয়ে থাকেন, আপনাদেরকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

ঝা একগাল হেসে বলল, তাহলে আমরা যেতে পারি?

উহুঁ।' দলপতি মাথা নেড়ে বলল, আমি বলেছি আপনাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন নেই সেটা তো বলি নি। ফেডারেশানের সাথে আমাদের বার বছর থেকে যুদ্ধ চলছে। আমাদের লোকজন আহত হচ্ছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হচ্ছে—

আমাদের তাজা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দরকার। আপনাদের কিডনি, লিভার, প্যাংক্রিয়াস, ইন্টেস্টাইন, হার্ট, লাংস, আঙুল, হাত, পা, চোখ, কান দরকার।

ঝা মুখ হাঁ করে বলল, সবই তো দরকার। তাহলে বাকি থাকল কী?

একজন হি হি করে হেসে বলল, চুল।

টাকমাথা একজন এগিয়ে এসে বলল, আমার চুলও দরকার।

তার কথা শেষ হবার আগেই একজন মানুষ ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এগিয়ে এসে বলল, স্কাউটশিপ যুদ্ধে আমার ডান পা'টা গেছে। আমি শুকনো মানুষটার পা'টা চাই।

চোখে ব্যান্ডেজবাঁধা একজন এগিয়ে এসে বলল, আমি একটা চোখ চাই।

বুক থেকে কিছু টিউব বের হয়ে একটা যন্ত্রের সাথে লাগানো আছে সেরকম একজন বলল, আমাকে একটা হার্ট দিলেই চলবে।

আগুনে পোড়া ঝলসে যাওয়া একজন মানুষ চেঁচিয়ে বলল, আমার দরকার চামড়া। মোটাটার চামড়া, ভালো ইলাস্টিক মনে হচ্ছে।

দেখতে দেখতে অসংখ্য কানা, খোঁড়া, পোড়া, কাটা, ফাটা, ঝলসানো মানুষ টুকি এবং ঝাকে ঘিরে ফেলল। তারা সবাই টুকি এবং ঝায়ের শরীরের কিছু-না-কিছু চাচ্ছে।

দলপতি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমাদের যা প্রয়োজন সব পাবে। অস্ত্রোপচারকারী রবোটকে ডাক, নিয়ে যাক এক্ষুনি। কাটাকুটি করে ভাগাভাগি করে নাও, যাও।

দলপতির কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে মানুষগুলো আনন্দে চিৎকার করে উঠে টুকি এবং ঝাকে খামচাখামচি করতে থাকে। সবাই মিলে যখন দুজনকে ধরে টানাটানি করছে ঠিক তখন তারা হঠাৎ করে সত্যিকার বিপদটা টের পেল। প্রথমে টুকি নিজেকে সামলে নিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, আমরা আসলে বিজ্ঞানী রিচি আর ফ্রাউল। এতক্ষণ মিছে কথা বলছিলাম।

কানা খোঁড়া এবং ঝলসানো মানুষ তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সরবরাহ হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে টুকির কথাকে চাপা দিয়ে হইহল্লোড় করে টানাটানি করতে থাকে। টুকির সাথে গলা মিলিয়ে ঝাও তখন গলা উঁচিয়ে বলল, আমরা অস্ত্রবিজ্ঞানী। অস্ত্রবিজ্ঞানী।

বিদ্রোহী দলপতি আবার হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, আপনারা অস্ত্রবিজ্ঞানী?

জি।

এতক্ষণ তাহলে নিজেদের চোর বলে দাবি করছিলেন কেন?

টুকি থতমত খেয়ে বলল, অত্যন্ত গোপন প্রজেক্টে যাচ্ছিলাম, আমাদের ওপরে খুব কড়া নির্দেশ ছিল যে কিছুতেই সত্যিকারের পরিচয় দেয়া যাবে না।

দলপতি শক্ত মুখে বলল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী আমার মনে হয় আপনারা প্রথমে সত্যি কথা বলেছিলেন, এখন মিথ্যা কথা বলছেন। আসলেই আপনারা চোর। আপনাদের চেহারায় একটা চোর ছ্যাঁচড়ের ভাব আছে। বিশেষ করে এই যে মোটাটা, একে দেখে একটা গর্দভের মতো মনে হয়।

অন্য সময় হলে ঝা নিঃসন্দেহে অপমানিত বোধ করত কিন্তু এখন করল না। আমতা আমতা করে বলল, মানুষের চেহারার ওপর নিজের হাত নেই। যে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার আমার চেহারা ডিজাইন করেছে, সেই ব্যাটা বদমাইশ নেশা করে—

দলপতি মাথা নেড়ে বলল, আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। আপনারা যে বিজ্ঞানী তার

কোনো প্রমাণ আছে?

উপস্থিত কানা খোঁড়া কাটা ফাটা এবং ঝলসানো মানুষেরা সমস্বরে চিৎকার করে বলল, নাই। নাই।

টুকি চিঁ চিঁ করে বলল, মহাকাশযানের লগ পরীক্ষা করে দেখেন, সেখানে আমরা ছাড়া আর কে থাকবে?

দলপতি বলল, ঠিক আছে, আজ রাতে আমরা ফেডারেশানের একটা দলকে আক্রমণ করব। যুদ্ধ চলাকালীন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আপনাদের দুজনের। আপনারা সত্যিকারের অস্ত্রবিজ্ঞানী কি না তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে।

টুকি ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমাদের কী করতে হবে?

মেগা কম্পিউটারে সিস্টেমস কন্ট্রোল করতে হবে। ভয়েস কমান্ড দিয়ে সুপার মাইজার চালাতে হবে, স্কাউটশিপ স্কোয়াড্রনকে ট্র্যাক করতে হবে—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সবকিছু।

টুকি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, জানি। জানি।

করতে পারবেন তো সবকিছু?

টুকি চিঁ চিঁ করে বলল, পারব। এক শ বার পারব।

ঝা মাথা নেড়ে বলল, সোজা কাজ। একেবারে পানির মতো সোজা।

রোবি এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর মিথ্যা কথা বলছেন আপনারা, মুগ্ধ হয়ে গেছি দেখে। মানুষ কী সুন্দর মিথ্যা কথা বলতে—

দলপতি জিজ্ঞেস করল, কী বলছে এই ব্যাটা রোবোট?

ইয়ে বলছে.... বলছে আপনাদের দলটি খুব দুর্ধর্ষ!

দলপতি মৃদু হেসে বলল, এখনই দুর্ধর্ষ বলছে—যখন আমাদের যুদ্ধ করতে দেখবে তখন কী বলবে?

টুকি কিছু না বলে দুর্বলভাবে হাসল। দলপতি তার দলের একজনকে ডেকে বলল, জেনারেল কাওয়াগাতা, এই দুজনকে কন্ট্রোলরুমে নিয়ে যাও।

মুখের অর্ধেক উড়ে গেছে এ রকম একজন মানুষ এগিয়ে এসে বলল, চলুন বিজ্ঞানী রিচি আর বিজ্ঞানী ফ্রাউল।

টুকি ফ্যাকাশে মুখে বলল, চলুন।

৪

দলপতির সুদৃশ্য ঘরটিতে নরম আরামদায়ক চেয়ারে টুকি এবং ঝা হেলান দিয়ে বসে আছে। সামনে কালো গ্রানাইটের টেবিল, তার অন্য পাশে বিদ্রোহীদের দলপতি, পাশে কয়েকজন বিশ্বাসী জেনারেল। সবার সামনে পানীয় এবং খাবার। দলপতি পানীয়ের একটা গ্লাস হাতে নিয়ে বলল, আমাদের মহান অতিথিদের উদ্দেশ্যে। ফেডারেশানের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে আমাদের জয়ী করিয়ে দেয়ায় তাদের অভূতপূর্ব কৃতিত্বের জন্যে।

সবাই বলল, অভূতপূর্ব কৃতিত্বের জন্যে।

পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জেনারেল কাওয়াগাতা বলল, আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম তাহলে বিশ্বাস করতাম না। এটি ছিল আমার দেখা সবচেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী যুদ্ধ।

ছোট ছোট চুলের একজন জেনারেল মাথা নেড়ে বলল, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। মূল কম্পিউটারে কোনো তথ্য না দিয়ে আমাদের এই মহামান্য মোটা বিজ্ঞানী সেখানে একটা লাথি দিলেন। তার গোদা পায়ের লাথি খেয়ে মাল্টি প্রসেসর খুলে পুরো সিস্টেম রিসেট হয়ে গেল। সে কারণে শত্রুদের মহাকাশযান আমাদের প্রধান ঘাঁটির খোঁজ পেল না। কেউ কি চিন্তা করতে পারে একটা বড় ধরনের যুদ্ধ হচ্ছে মূল কম্পিউটারকে অচল রেখে?

বুড়োমতো একজন জেনারেল বলল, যখন ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করার কথা তখন সেখানে কণ্ঠস্বরে কোনো আদেশ না দিয়ে বিজ্ঞানী রিচি এবং ফ্রাউল—মানুষ যেভাবে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে, ঠিক সেরকম শব্দ করতে শুরু করলেন। তখন পুরো ভয়েস কমান্ড সিস্টেম ধসে পড়ল। আর ঠিক তখন কন্ট্রোল মনিটরে একটা ঘুসি দিলেন, কী অপূর্ব সময়জ্ঞান! সাথে সাথে স্কাউটশিপ থেকে দুটি মিসাইল বের হয়ে এল। নিখুঁত নিশানায় গিয়ে আঘাত করল ফেডারেশানের যুদ্ধজাহাজকে।

জেনারেল কাওয়াগাতা বলল, কি-বোর্ডে কোনো তথ্য না দিয়ে সেখানে ক্রমাগত থাবড়া দিতে লাগলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল অর্থহীন কাজ, কিন্তু সেটা অর্থহীন নয়, সেই থাবড়া খেয়ে কম্পিউটার জ্যাম হয়ে গিয়ে তিনটা নিউক্লিয়ার বোমা ছেড়ে দিল!

আমাদের এক স্কোয়াড্রন স্কাউটশিপ যখন উড়ে যাচ্ছিল তখন কন্ট্রোলরুম থেকে সাহায্য চাইল। কো-অর্ডিনেট না বলে তাদেরকে বললেন 'গোল্লায় যাও'। তার অর্থ বৃত্তাকারে ঘুরতে থাক। বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে মূল মহাকাশযানকে আওতার মাঝে পেয়ে গেল।

আর মাইজার কন্ট্রোলের ঘটনাটা—

দলপতি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এই দুই মহান বিজ্ঞানীর কথা বলে শেষ করা যাবে বলে মনে হয় না। তার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমাদের মস্ত বড় সৌভাগ্য তারা যুদ্ধ পরিচালনায় আমাদেরকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন। আমি তাদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম সে জন্যে ক্ষমা চাইছি।

AMARBOI.COM

টুকি এবং ঝা মৃদু হেসে ক্ষমা করে দেবার ভঙ্গি করল।

জেনারেল কাওয়াগাতা গম্ভীরমুখে বলল, বিজ্ঞানী রিচি এবং ফ্রাউলের কাছ থেকে আমাদের পুরো যুদ্ধ পরিচালনার নিয়মকানুন শিখে নিতে হবে।

দলপতি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

সবাই দলপতির দিকে ঘুরে তাকাল—কী আইডিয়া?

আমাদের হাতে মাত্র দুজন অস্ত্রবিজ্ঞানী—রিচি এবং ফ্রাউল থাকার কারণেই অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। বিদ্রোহী দল হিসেবে আমাদের সব সময় যুদ্ধ করতে হয়। যদি দুজন না হয়ে দু শ অস্ত্রবিজ্ঞানী হত? কিংবা দু হাজার? কিংবা আরো বেশি?

বুড়োমতো জেনারেল চোখ বড় বড় করে বলল, আপনি কী বলতে চাইছেন?

আমি এই বিজ্ঞানী রিচি এবং ফ্রাউলের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি দক্ষতা আমাদের সকল সদস্যদের মাথায় বসিয়ে দিতে চাই।

তারা সবাই যেন বিজ্ঞানী রিচি এবং ফ্রাউলের মতো ভাবতে পারে, চিন্তা করতে পারে।

উপস্থিত জেনারেলরা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, চমৎকার বুদ্ধি! চমৎকার আইডিয়া!!

টুকি এবং ঝায়ের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, সবাই আমাদের দুজনের মতো হয়ে যাবে?

হ্যাঁ! আমরা গত যুদ্ধে মস্তিষ্ক স্ক্যানের এই যন্ত্রটি দখল করেছি। এটা ব্যবহার করে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, বুদ্ধি আরেকজন মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তাধারা ব্যক্তিত্ব সব আরেকজনের মাথায় নিয়ে যাব। যারা শুকনো পাতলা তারা পাবে বিজ্ঞানী রিচির মস্তিষ্ক, যারা মোটা তারা পাবে বিজ্ঞানী ফ্রাউলের মস্তিষ্ক।

টুকি এবং ঝা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, সবাই?

হ্যাঁ! আমি ছাড়া সবাই। প্রথমে জেনারেলরা তারপর সিনিয়র সদস্যরা। তারপর সাধারণ সদস্যরা। দেরি করে লাভ নেই, এখন থেকেই শুরু করে দেয়া যাক।

দুই সপ্তাহ পরে যখন টুকি এবং ঝা তাদের মহাকাশযান বোঝাই করে এই গ্রহের প্রস্তর-খণ্ড নিয়ে—যাকে সাধারণভাবে হীরা বলা হয়—মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দিল তখন বিদায় জানানোর জন্যে মহাকাশ স্টেশনে এই গ্রহের প্রায় সবাই এসে ভিড় জমিয়েছিল। ঠিক বিদায়ের সময় এই গ্রহের সব অধিবাসীরা কেন মুচকি হেসে টুকি এবং ঝায়ের দিকে চোখ টিপে দিল, বিদ্রোহী দলের দলপতি সেটা কিছুতেই বুঝতে পারল না। শুধু তাই নয়, যে দুর্ধর্ষ দলটিকে পুরো এম. সেভেন্টি ওয়ান নক্ষত্রপুঞ্জের ত্রাস হিসেবে বিবেচনা করা হত তারা ঠিক কী কারণে যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে দিয়ে নিরীহ ছিঁচকে চোর হয়ে গেল, বিদ্রোহী দলের দলপতি সেই রহস্যটিও কোনোদিন ভেদ করতে পারল না।

৫

মহাকাশযানটির কন্ট্রোল প্যানেলে বসে টুকি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটি পরীক্ষা করছে। কাছাকাছি মেঝেতে পা ছড়িয়ে খেতে বসেছে ঝা—যন্ত্রপাতিতে তার কোনো উৎসাহ নেই। আরো খানিকটা দূরে রোবি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, টুকি খানিকক্ষণ কিছু একটা লক্ষ করে অধৈর্য হয়ে হাত নেড়ে বলল, এর মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না।

রোবি বলল, এটি কোনো জীবিত জিনিস নয়—এর মাথামুণ্ড নেই কাজেই এটা বুঝতে পারছ না।

টুকি চোখ পাকিয়ে রোবির দিকে তাকিয়ে বলল, দূর হও হতভাগা।

রোবি দূর হওয়ার কোনো চিহ্ন দেখাল না বরং আরো এক পা এগিয়ে এসে বলল, মানুষ যখন নির্বোধের মতো কাজ করে তখন আমার দেখতে বড় ভালো লাগে।

আমি কোন জিনিসটা নির্বোধের মতো করছি?

এই যে মহাকাশযান চালানোর কোনোকিছু না জেনে আপনি এটা চালানোর চেষ্টা করছেন! ভুল জায়গায় টেপাটেপি করছেন।

টুকি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি মহাকাশযান চালানো জান?

জানি।

এটাকে কেমন করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়া যায় তুমি জান?

অবশ্যই জানি।

তাহলে ব্যাটা বদমাইশ আমি এতদিন থেকে এটাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি, আমাকে একবার সাহায্য করতে এলে না কেন?

আমাকে বলেন নাই, তাই আসি নাই।

টুকি খানিকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রোবির দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ঠিক আছে। এখন আমি বলছি, আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

রোবি কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কিছু যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে বলল, এখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার দুটি উপায় আছে। একটা বড় হাইপার ডাইভ কিংবা দুটি ছোট হাইপার ডাইভ। বড় হাইপার ডাইভ দেয়ার সমস্যা একটিই—মহাকাশযানে যথেষ্ট জ্বালানি নেই। ছোট দুটি হাইপার ডাইভ দেয়া যেতে পারে তবে সেটারও একটা সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

প্রথমে মহাকাশযানের বেগ বাড়াতে হবে, সেজন্যে কাছাকাছি একটা বড় গ্রহ বা নক্ষত্র দরকার। কাছাকাছি সেরকম কিছু নেই। মহাকাশযানের ট্র্যাজেক্টরিও পাল্টাতে পারব না, জ্বালানি নষ্ট হবে। যদি এভাবে যেতে থাকি চার সপ্তাহের মাঝে একটা মাঝারি গোছের নক্ষত্র পাওয়া যাবে, সেটাকে ব্যবহার করে হাইপার ডাইভ দেয়া যাবে।

টুকি অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু সমস্যাটা কী?

ওই যে বললাম, চার সপ্তাহ যেতে হবে। আপনারা যেভাবে তিনবেলা খাচ্ছেন, খাবার কম পড়ে যাবে।

ঝা চোখ লাল করে বলল, সেটাই সমস্যা?

সেটাই মূল সমস্যা। আরো কিছু ছোট সমস্যা আছে। মহাকাশযানটা যে পথ দিয়ে যাবে সেখানে আশপাশে বেশ কিছু গ্রহ উপগ্রহ আছে, সেখানে মানুষ আর রবোটের বসতি। তারা সেরকম বন্ধুভাবাপন্ন নয়।

ঝা মেঝেতে বসে বড় একটা গলদা চিংড়ি চিবোতে চিবোতে বলল, তাতে সমস্যাটা কী? আমরা কি আর আত্মীয়তা করতে যাচ্ছি?

রোবি তার যন্ত্রপাতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, এ ছাড়াও আরো একটি সমস্যা আছে। হাইপার ডাইভ দেয়ার পর মাঝে মাঝে সময় নিয়ে গোলমাল হয়।

টুকি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, কী গোলমাল?

যেমন মনে করেন আজকে রওনা দিয়ে গতকাল পৌঁছে যাওয়া।

ঝা হা হা করে হেসে বলল, এটা গোলমাল হবে কেন? এটা তো ভালো, জীবনে খানিকটা সময় বাড়তি পেয়ে যাওয়া যাবে।

ঝা যত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিল আসলেই এটা এত সহজে মেনে নেয়া উচিত কি না সেটা নিয়ে টুকির একটু সন্দেহ হয়। কিন্তু এখন সেটা নিয়ে তার আর মাথা ঘামানোর ইচ্ছে করছিল না। একটু অধৈর্য হয়ে বলল, রোবি, বকবক বন্ধ করে এখন তাহলে চল পৃথিবীর দিকে।

ব্যাপারটা যত সহজ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল সেটা যে এত সহজ নয় সেটা টের পেল দুদিন পরেই। সবুজ রঙের মাঝারি একটা গ্রহের পাশে দিয়ে যাবার সময়, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করে একটা স্কাউটশিপ এসে টুকি, ঝা আর রোবিকে ধরে নিয়ে গেল।

যারা তাদের ধরে নিয়ে গেল তারা সবাই রবোট। যাদের কাছে ধরে নিয়ে গেল তারাও রবোট এবং তারা যাদের কাছে তাদের ধরে নিয়ে গেল তারাও রবোট। টুকি একজনকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের এখানে কোনো মানুষ নেই?

যাকে জিজ্ঞেস করল সে কালচে রঙের বিদ্‌ঘুটে একটি যন্ত্র, মুখ দিয়ে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে বলল, মানুষ? ছিঃ!

তাহলে আমাদের ধরে এনেছ কেন?

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ধরে এনেছি? হাহ্।

এখানে কে আছে? কার সাথে কথা বলা যাবে?

কথা? হুঁ!

টুকি বুঝতে পারল এই নিম্নশ্রেণীর রবোটটির সাথে কথা বলার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বিভিন্ন রবোটের মাঝে হাতবদল হয়ে যখন শেষ পর্যন্ত তারা মোটামুটি নেতা গোছের একটা চালাক চতুর রবোটের সামনে হাজির হল তখন টুকি জিজ্ঞেস করল, তোমরা আমাদের ধরে এনেছ কেন? রবোটটি তার সবুজ চোখ দুটিকে হালকা লাল রঙে পাল্টে দিয়ে বলল, তোমাদের কপোট্রনের কন্ট্রোলার আই. সি.টা দরকার।

টুকি ভুরু কুঁচকে বলল, কী বললে? কন্ট্রোলার আই. সি.?

হ্যাঁ! তোমাদের মতো রেপ্লিকা রবোট আমাদের খুব কম। যদি কপোট্রন থেকে—

ঝা চোখ কপালে তুলে বলল, রেপ্লিকা রবোট? আমরা মোটেও রেপ্লিকা রবোট না।

তাই নাকি? তোমরা কি তাহলে ডুপ্লিকা?

না আমরা রেপ্লিকা–ডুপ্লিকা কোনোটাই না। আমরা মানুষ।

'মানুষ!' রবোটটা একটা আর্তচিৎকার করে দুই পা পিছিয়ে গেল। ক্লিক ক্লিক করে কয়েকটা শব্দ হল, চারপাশে ঘিরে থাকা রবোটেরা হাতে অস্ত্র ধরে তাদের দিকে তাক করে ধরল। গবেট ধরনের একটা রবোট জিজ্ঞেস করল, গুলি করে দেব নাকি?

নেতা গোছের রবোটটা বলল, আগেই কোরো না, তবে গুলির রেঞ্জের মাঝে রাখ।

বেঁটেখাটো একটা রবোট ভাঙা গলায় বলল, সর্বনাশ! মোটা মানুষটা আমার দিকে তাকাচ্ছে। বিপদ হবে না তো আমার?

হতে পারে। চোখে চোখে তাকিও না। তোমার সর্বনাশ করে দেবে। ওদের সব বদমাইশি চোখের মাঝে।

টুকি এবং ঝা মোটামুটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কোনোমতে নিজেদেরকে সামলে নিয়ে বলল, তোমরা আমাদের এত ভয় পাচ্ছ কেন?

ভয় পাব না? কী বল তুমি? মানুষ হচ্ছে এই সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে খল, ফন্দিবাজ, ধূর্ত, অসৎ, বদমাইশ এবং ধুরন্ধর। তারা ইচ্ছা করলে দিনকে রাত করে দিতে পারে, রাতকে দিন করে দিতে পারে। গ্রহকে নক্ষত্র করে দিতে পারে, নক্ষত্রকে গ্রহ করে দিতে পারে। মানুষের অসাধ্য কিছু নাই। আমরা রবোটরা মানুষ থেকে দশ লাইট ইয়ার দূরে থাকি।

আমাদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঝা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষ বলে কোনো কথা নেই। আগুন যেরকম ঠাণ্ডা হয় না, মানুষ সেরকম সাধারণ হয় না। মানুষ মানেই অসাধারণ।

না। ঝা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, মানুষের মাঝে দুষ্টু মানুষ আছে কিন্তু আমরা সেরকম মানুষ না। আমরা কারো ক্ষতি করি না।

রবোটদের নেতাটি উঁচু গলায় অন্য রবোটদের বলল, বলেছিলাম না, মানুষেরা খুব যুক্তি দিয়ে অযৌক্তিক কথা বলে? এই দেখ। খবরদার কেউ এদের সাথে কথা বোলো না।

টুকি একটু এগিয়ে এসে বলল, আমরা মোটেও অযৌক্তিক কোনো কথা বলছি না। কিন্তু যদি তোমরা আমাদের সাথে কথা বলতে না চাও তাহলে আমাদের যেতে দাও। আমরা যাই।

গবেট ধরনের রবোটটা আবার বলল, গুলি করে দেব নাকি?

না। আগেই কোরো না, গুলি করলে মরে যাবে। মানুষের মতো অপদার্থ প্রাণী খুব কম রয়েছে, ছোট একটা গুলি খেলেই মরে যায়।

মরে গেলে আবার সার্ভিসিং করে নেব।

মানুষ মরে গেলে সার্ভিসিং করা যায় না।

কোন কোম্পানি এদের তৈরি করে? কত দিনের ওয়ারেন্টি দেয়?

কোনো কোম্পানি এদেরকে তৈরি করে না। এদের কোনো ওয়ারেন্টি নেই।

গবেট ধরনের রবোটটা বলল, তাহলে গুলি করে দেই।

না। নেতা গোছের রবোটটা বলল, এদেরকে না মেরে সাবধানে এদের মস্তিষ্ক কেটে আলাদা করে নিতে হবে। তখন আর কোনো ভয় থাকবে না, কিন্তু সব রকম বুদ্ধি নেয়া যাবে। তখন এরা আমাদের সাহায্য করবে।

উপস্থিত সবগুলো রবোট মাথা নেড়ে বলল, চমৎকার বুদ্ধি! চমৎকার বুদ্ধি!!

টুকি এবং ঝা শুকনো গলায় বলল, তোমরা কী বলছ এইসব? মস্তিষ্ক কেটে নেবে মানে?

আমাদের অস্ত্রোপচারকারী রবোট আছে, নিখুঁতভাবে মস্তিষ্ক কেটে নিতে পারে।

নিলেই হল? তোমার ধারণা আমার মস্তিষ্ক কেটে নিলে আমি কোনোদিন তোমাদের সাহায্য করব?

করবে না?

করব না।

ঝা-ও জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, কক্ষনো করব না।

টুকি চোখমুখ লাল করে বলল, শুধু যে সাহায্য করব না তাই না, সাহায্য চাইলে এমন উল্টাপাল্টা বুদ্ধি দেব যে তোমরা বুঝতেই পারবে না, সেটা কাজে লাগাতে গিয়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমাদের।

গবেট ধরনের রবোট বলল, দেই গুলি করে শেষ করে।

টুকি বলল, তার চাইতে এস মিলেমিশে থাকি। তোমাদের কী বিষয়ে সাহায্যের দরকার বল আমরা সাহায্য করি। যদি দেখ আমাদের সাহায্যে কাজ হচ্ছে না তখন নাহয় যা ইচ্ছে হয় কোরো।

সত্যি বলছ?

একেবারে এক শ ভাগ সত্যি। এন্ড্রোমিডার কসম।

রবোটের নেতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। সেটা আমাদের সব বুদ্ধিজীবী রবোটদের সাথে আলোচনা করে দেখতে হবে।

গবেট ধরনের রবোটটা আবার গলা উঁচিয়ে বলল, এত সব ঝামেলা না করে দেই গুলি দিয়ে শেষ করে।

রবোটের নেতা যখন বুদ্ধিজীবী রবোটদের সাথে আলোচনা করছিল তখন টুকি এবং ঝা বসে বসে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকে। চুরি করতে যাওয়ার আগে যেসব বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা করত বসে বসে সেগুলো আওড়াতে থাকে। রোবি কাছে এসে বলল, আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন? ব্লাডার কন্ট্রোল—

টুকি খেঁকিয়ে উঠে বলল, চুপ কর ব্যাটা গবেট, রবোটের বাচ্চা রবোট।

কী মনে হয় আপনাদের? মানুষ কি আসলেই খল, ফন্দিবাজ, ধূর্ত, অসৎ, বদমাইশ এবং ধুরন্ধর? আপনাদের কাজকর্ম দেখে মনে হয় সত্যি হতেও পারে ব্যাপারটা। কী বলেন?

ঝা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, বাজে কথা বললে এক ঘুসিতে কপোট্রন তুষ করে দেব।

রোবি তার গলায় মধু ঢেলে বলল, মনে হয় আপনারা একই সাথে ভয় পাচ্ছেন এবং রাগ হচ্ছেন। কী বিচিত্র একটা ব্যাপার। শুধুমাত্র মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। রাগ এবং ভয় কী চমৎকার!

ঠিক এ রকম সময়ে রবোটের নেতা বুদ্ধিজীবী রবোটদের নিয়ে হাজির হল বলে রোবির সাথে টুকি এবং ঝায়ের কথাবার্তা আর বেশিদূর এগোতে পারল না। বুদ্ধিজীবী রবোটদের দেখেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তারা বুদ্ধিজীবী, তাদের লিকলিকে হাতপা এবং শরীরের তুলনায় বিশাল একটি মাথা। তাদের শরীরের ভারসাম্য ঠিক নয় এবং প্রত্যেকবার পা ফেলার সাথে সাথে মনে হতে থাকে তাল হারিয়ে নিচে আছাড় খেয়ে পড়বে—খুব সাবধানে তারা নিজেদের রক্ষা করে টুকি এবং ঝায়ের কাছে এগিয়ে আসে। যে বুদ্ধিজীবী রবোটের মাথা সবচেয়ে বড় সে বুদ্ধিজীবীসুলভ নাকী গলায় বলল, আপনারা আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন শুনে আমরা রবোটরা বিশেষ পুলকিত হয়েছি—

ঝা ফিসফিস করে বলল, পুলকিত মানে কী?

টুকি বলল, খুশি হওয়া।

বুদ্ধিজীবী রবোটটা বলল, আমরা সাধারণত মনুষ্য থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে থাকতে পছন্দ করি। তবে ঘটনাক্রমে যেহেতু আপনারা আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছেন, আমাদের কিছু করার নেই। আপনাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্ক উৎপাটন না করে যদি কোনো কাজ করা যায় সেটা সম্ভবত গ্রহণযোগ্য। যে ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাহায্য কামনা করি সেটি অত্যন্ত গোপনীয়।

টুকি মাথা নেড়ে বলল, আমরা আপনাদের গোপনীয়তা রক্ষা করব।

আপনাদের নিয়ে আমি দুশ্চিন্তিত নই। আমাদের নিজেদের যে অশিক্ষিত অর্বাচীন মূর্খ রবোট রয়েছে তাদের নিয়েই আমি চিন্তিত।

ঝা আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, অর্বাচীন মানে কী?

কোনো একটা গালিগালাজ হতে পারে।

বুদ্ধিজীবী রবোট আবার নাকী সুরে বলল, আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন, ব্যাপারটি বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

গবেট ধরনের রবোটটা ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে বলল, তখনই বলেছিলাম গুলি করে শেষ করে দেই—

বুদ্ধিজীবী রবোটগুলো টুকি এবং ঝাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে, মাথাটি বাড়াবাড়ি রকম বড় হওয়ায় রবোটগুলোর টাল সামলাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে বুঝি উল্টে পড়ে যাবে। সবচেয়ে বড় মাথা যে রবোটটির সে তার নাকী গলায় বলল, সবার জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকতে হয়। উদ্দেশ্যবিহীন জীবন জ্বালানিবিহীন রকেটের মতন।

ঝা মাথা নাড়ল, বলল, কিংবা খাবারহীন ডাইনিং টেবিলের মতো।

রবোটটি ঝায়ের কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না, রবোটদের খেতে হয় না বলে মনে হয় কথার গুরুত্বটাও ধরতে পারল না। সে বলে চলল, আমাদের জীবনেরও একটা মূল উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতিকে ধ্বংস করা।

টুকি এবং ঝা একসাথে চমকে উঠল, কী বললে?

হ্যাঁ, মানব জাতিকে ধ্বংস করা। মানুষ মাত্রই হচ্ছে খল, ফন্দিবাজ, ধূর্ত, অসৎ, বদমাইশ এবং ধুরন্ধর। এরা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবাণুর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত

সৃষ্টিজগৎকে কলুষিত করে দিচ্ছে। এদেরকে যদি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া যায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যিকারের শান্তি নেমে আসবে।

টুকি ঢোক গিলে বলল, তোমরা কীভাবে সেটা করবে?

আমরা সেটা এর মাঝে শুরু করেছি। শত্রুকে ধ্বংস করার প্রথম পর্যায় হচ্ছে তাদেরকে বোঝা। আমরা মানুষকে বোঝার কাজ শুরু করেছি।

কীভাবে সেটা করছ?

রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ঘৃণা, ভালবাসা এই ধরনের কিছু ব্যাপার আছে মানুষের। তারা সেগুলোর নাম দিয়েছে অনুভূতি। আমাদের সেগুলো নাই। সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল সমস্যা।

ঝা একটু ইতস্তত করে বলল, দেখ, তোমাদের একটা কথা বলি—একেবারে এক শ ভাগ সত্যি, এন্ড্রোমিডার কসম!

কী কথা?

তোমাদের যে অনুভূতি নাই সেটা আসলে সমস্যা না, সেটা হচ্ছে তোমাদের ওপর আশীর্বাদ। এই ঝামেলা যাদের আছে তাদের জীবন একেবারে ফানা ফানা হয়ে যাচ্ছে।

হতে পারে। কিন্তু তবুও মানুষ নামের এই খল ফন্দিবাজ ধূর্ত অসৎ বদমাইশ এবং ধুরন্ধর শত্রুকে বুঝতে হলে আমাদের এই অনুভূতির সাথে পরিচিত হতে হবে। সেই জন্যে আমরা অনেকদিন থেকে কাজ করছি, আমাদের বেশ খানিকটা সাফল্যও এসেছে।

টুকি ভয়ে ভয়ে মাথা বড় রবোটটির দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে তোমরা আজকাল রেগে যাও? দুঃখ আনন্দ এইসব পাও?

ইচ্ছা করলে পেতে পারি। আমরা সেটা আবিষ্কার করেছি। হার্ডওয়ার সফটওয়ার তৈরি হয়ে গেছে, এখন কপোট্রনে বসিয়ে দেয়ার জন্যে ছোট চিপ তৈরি হচ্ছে।

কথা বলতে বলতে বুদ্ধিজীবী রবোটটা একটা বন্ধঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের উপরে লেখা 'দুঃখ ল্যাবরেটরি।'

টুকি এবং ঝা একটু অবাক হয়ে বুদ্ধিজীবী রবোটটার দিকে তাকাতেই রবোটটা বলল, এই ল্যাবরেটরিতে আমরা রবোটদের দুঃখ দেয়া নিয়ে গবেষণা করি।

ঝা মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, মাথা খারাপ আর কাকে বলে। দুঃখ দেয়ার গবেষণা!

টুকি জিজ্ঞেস করল, কতদূর হয়েছে গবেষণা?

আসুন, আপনাদের দেখাই।

রবোটটা কোথায় চেপে ধরতেই একটা স্বচ্ছ জানালা খুলে গেল এবং দেখা গেল ভিতরে ছোট একটা জানালার পাশে একটা শুকনো ধরনের রবোট বসে আছে। তার হাতে একটা বই। রবোটটি খুব মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়ছে। বুদ্ধিজীবী রবোট বলল, এইটা খুব দুঃখের একটা বই। একটা রবোটের কপোট্রনের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কীভাবে ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে গেল সেই কাহিনী লেখা আছে। এই বইটা পড়ে এই রবোটটা দুঃখ পায় কি না দেখা হচ্ছে।

বুদ্ধিজীবী রবোটের কথা শেষ হবার আগেই জানালার পাশে বসে থাকা শুকনো ধরনের রবোটটা হঠাৎ বই ছুড়ে ফেলে দিয়ে মেঝেতে মাথা কুটে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। টুকি এবং ঝা স্পষ্ট দেখতে পেল চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। বুদ্ধিজীবী

AMARBOI.COM

রবোটটি খুব সন্তুষ্টির ভান করে বলল, সফল এক্সপেরিমেন্ট। চোখের পানিটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে লোনা হয়েছে কি না!

টুকি এবং ঝা এবারে খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল কপোট্রনের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে গোলমাল হলে কি এভাবে কান্নাকাটি করা উচিত? কে জানে রবোটদের জীবনে এটাই হয়তো গভীর দুঃখের ব্যাপার। বুদ্ধিজীবী রবোট এবারে টুকি আর ঝাকে নিয়ে গেল পাশের ল্যাবরেটরিতে। তার উপর বড় বড় করে লেখা 'ক্রোধ ল্যাবরেটরি।'

ঝা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি রাগারাগি হয়?

হ্যাঁ। ক্রোধ অনুভূতিটি এর মাঝে বিশ্লেষণ করা হয়। কী কী কারণে রাগ হওয়া উচিত সেটা বের করে বিশাল একটা ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে। সেইসব কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেলেই রবোটেরা রেগে ওঠে।

রেগে ওঠে?

হ্যাঁ, তখন কপোট্রনে উল্টোপাল্টা সিগনাল দেয়া হয়। বিতিকিচ্ছি একটা ব্যাপার ঘটে। আপনাদেরকে দেখাই।

একটা সুইচ টিপে আগের মতো একটা স্বচ্ছ জানালা খুলে দেয়া হল। ভিতরে গাবদা গোবদা একটা রবোট টুলের উপর বসে আছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শুঁটকো মতো একটা রবোট। বুদ্ধিজীবী রবোট বলল, যে রবোটটা বসে আছে তাকে এখন রাগিয়ে দেয়া হবে।

কীভাবে?

রবোটটি আরেকবার সুইচ টিপে দিয়ে বলল, দেখেই বুঝতে পারবেন।

টুকি এবং ঝা অবাক হয়ে দেখল শুঁটকো রবোটটি ঘরের এক কোনায় হেঁটে গিয়ে বিশাল একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে বসে থাকা রবোটটার মাথায় গদাম করে মেরে বসল। মনে হল সেই আঘাতে রবোটটার মাথা তার শরীরের ভিতর খানিকটা ঢুকে গেছে।

ঝা মাথা নেড়ে বলল, রাগানোর একেবারে এক নম্বর বুদ্ধি।

টুকি এবং ঝায়ের কোনো সন্দেহই রইল না যে গাবদা গোবদা রবোটটা রেগে উঠছে। তার সবুজ চোখ দুটি আস্তে আস্তে টকটকে লাল হয়ে উঠল, কান থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল, শরীর থেকে ছোট ছোট বজ্রপাতের মতো বিদ্যুৎপাত হতে শুরু করল। এক সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আঁ আঁ করে বিকট চিৎকার করতে করতে টুলটা তুলে নিয়ে শুঁটকো রবোটটাকে এলোপাতাড়িভাবে মারতে শুরু করল। টুলটা কিছুক্ষণের মাঝেই ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখন খালি হাতেই শুঁটকো রবোটটিকে চেপে ধরে কিল ঘুসি লাথি মারতে মারতে ঘরের এক কোনা থেকে অন্য কোনায় নিয়ে যায়, দেয়ালে চেপে ধরে পেটে ঘুসি মারতে থাকে, মাথা টেনে শরীর থেকে আলগা করে আনে, নিচে ফেলে উপরে লাফিয়ে সমস্ত শরীরটাকে দলামোচা করে ফেলে। কিছুক্ষণেই শুকনো রবোটের শরীরের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

বুদ্ধিজীবী রবোট তার মস্ত মাথা নেড়ে বলল, নিখুঁত রাগ। একেবারে মানুষের খাঁটি রাগ।

টুকি সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেলে শুঁটকো রবোটটার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রইল।

টুকি এবং ঝা এভাবে 'আনন্দ ল্যাবরেটরি', 'ঘৃণা ল্যাবরেটরি', 'হিংসা ল্যাবরেটরি', 'ভালবাসা ল্যাবরেটরি' দেখে শেষ পর্যন্ত একটা বড় ল্যাবরেটরির সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজার উপরে বড় করে লেখা 'কৌতুকবোধ ল্যাবরেটরি।' বুদ্ধিজীবী রবোটটা ফোঁস করে একটা শব্দ করে বলল, আমাদের সমস্ত গবেষণা এইখানে এসে মার খেয়ে যাচ্ছে।

টুকি জিজ্ঞেস করল, কীভাবে?

বছরের পর বছর আমরা গবেষণা করে যাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই রবোটের মাঝে কৌতুকবোধ জাগাতে পারছি না। কোন জিনিসটা শুনে হাসতে হয় আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। আমাদের মাঝে কোনো সেন্স অফ হিউমার নেই।

মানুষের তৈরী যত হাসির গল্প রয়েছে, যত কার্টুন, জোক রসিকতা সব নিয়ে আসা হয়েছে, আমাদের শত শত বুদ্ধিজীবী রবোট সেগুলো পড়ে যাচ্ছে, বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে। আমাদের যত সুপার কম্পিউটার রয়েছে সেগুলো লক্ষ লক্ষ সফটওয়ার তৈরি করেছে, বিশাল সমস্ত ডাটাবেস তৈরি হয়েছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। এখনো আমরা দেখে বা শুনে বুঝতে পারি না কোনটা হাসির আর কোনটা হাসির না।

ঝা জিভ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে বলল, বড়ই দুঃখের কথা।

বুদ্ধিজীবী রবোটটা নাকী সুরে বলল, এই একটা মাত্র জিনিসের জন্যে আমরা মানুষের সমান হতে পারছি না। এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।

টুকি ভুরু কুঁচকে বলল, আমাদের কী করতে হবে।

আমাদের রসিকতা শেখাতে হবে।

টুকির চোয়াল ঝুলে পড়ল, রসিকতা শেখাতে হবে?

হ্যাঁ! এক সপ্তাহ সময় দেয়া হল। এর মাঝে যদি আমাদের রসিকতা শেখাতে পার তোমাদের চলে যেতে দেব।

টুকি শুকনো গলায় বলল, আর যদি না পারি?

তাহলে তোমাদের মস্তিষ্কটা আলাদা করে নেব।

রবোটদের কোনো রসবোধ নেই, তারা যে ঠাট্টা করছে না সেটা বুঝতে টুকি আর ঝায়ের এতটুকু দেরি হল না।

বুদ্ধিজীবী রবোটটা 'কৌতুকবোধ ল্যাবরেটরি' ঘরের দরজা খুলে তার মাঝে ঠেলে টুকি এবং ঝাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘটাং করে বাইরে থেকে তালা মেরে দিল।

AMARBOI.COM

৬

ঘরের ভিতরে একটা বড় টেবিল, তার চারপাশে বেশ কয়েকটা চেয়ার। চেয়ারে পিঠ সোজা করে দুটি রবোট বসে আছে। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য তাক, সেখানে মাইক্রো ক্রিস্টালে পৃথিবীতে হাস্যকৌতুক নিয়ে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব জমা করে রাখা আছে। ঝা শুকনো মুখে বলল, কী বিপদে পড়া গেল।

টুকি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, বিপদের কী আছে? হাসি তামাশা তো ছেলেমানুষি ব্যাপার, বোঝানো কঠিন হবে না।

ঝা বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ল, বলল, হাসি তামাশা করা সোজা। সেটা বোঝানো সোজা নয়।

এস, দেখি চেষ্টা করে এদের কী অবস্থা। টুকি রবোট দুটির সামনে গিয়ে বলল, তোমাদের নাম কী?

রবোট দুটি দেখতে হুবহু এক রকম, একজন বলল, আমাদের কোনো নাম নেই।

নাম নেই? এ তো মহাযন্ত্রণা হল দেখি।

এটা কি হাসির কথা? আমরা কি হাসব?

না এটা হাসির কথা না। কিন্তু তোমাদের নাম না থাকলে ডাকাডাকি করা নিয়ে খুব অসুবিধে হবে। প্রথমে তোমাদের একটা করে নাম দিয়ে দেয়া যাক।

কী নাম দেবে?

যেহেতু আমাদের প্রজেক্ট তোমাদের হাসাহাসি করানো, কাজেই তোমাদের নাম দেয়া যাক 'হাসা' আর 'হাসি'। টুকি একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নাম হাসা। তারপর অন্যজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আর তোমার নাম হাসি।

রবোট দুটি মাথা নেড়ে নিজেদের নাম গ্রহণ করে নিল।

টুকি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হাসা এবং হাসি এবার হাসাহাসি শুরু কর।

হাসা নামের রবোটটি বলল, এটা কি হাসির কথা? আমরা কি হাসব?

হাসি নামের রবোটটা বলল, না এটা আমার কথা না।

টুকি হেসে বলল, এটা হাসির কথা না সেজন্যে এটা হাসির কথা!

তাহলে কি আমরা হাসব?

হ্যাঁ, হাস।

রবোট দুটি কাঠ কাঠ স্বরে উচ্চারণ করল 'হা হা হা হা'। তাদের এই শুষ্ক ধাতব স্বর শুনে হঠাৎ করে টুকি এবং ঝায়ের শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। টুকি শুকনো গলায় বলল, ঝা, কাজটা সহজ হবে না।

ঝা বলল, আমি জানতাম।

টুকি একটা নিশ্বাস ফেলে হাসা-হাসির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা এতদিন কী করছ?

আমরা একটা কৌতুক নিয়ে সেটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি।

কতদিন থেকে করছ?

হাসা বলল, আজকে নিয়ে সাত বছর দুই মাস এগার দিন।

টুকি এবং ঝা একসাথে চমকে উঠল, ঝা ভয় পাওয়া গলায় বলল, কী? কী বললে?

হাসি বলল, এটা কিছুই না। এর আগেরটা নিয়ে আমরা এগার বছর সময় কাটিয়েছি। শেষে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে না পেরে সেটা ছেড়ে দিয়েছি। সেই তুলনায় এইটা মনে হয় সহজ। গত ছয় মাস থেকে মনে হয় একটু একটু বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারছ?

কৌতুকটার কোন জায়গায় হাসতে হবে।

টুকি ভুরু কুঁচকে বলল, কৌতুকটা কী, শুনি।

একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে বলছে, কাল আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত আমার সামনে হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসেছে।

তাই নাকি? হাঁটু গেড়ে বসে কী বলেছে?

বলেছে, খাটের তলা থেকে বের হয়ে আয় মিনসে।

টুকি শুনে খুকখুক করে এবং ঝা হা হা করে হেসে উঠল। হাসা এবং হাসি তাদের সবুজাভ ফটোসেলের চোখ দিয়ে টুকি এবং ঝাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করে তাদের হাসি থামার পরে বলল, আমাদের ধারণা এটি কেন কৌতুককর আমরা সেটাও বুঝতে পেরেছি।

কেন, শুনি।

AMARBOI.COM

কারণ মানুষটি তার বন্ধুকে মিথ্যা কথা বলছে।

কখন মিথ্যা কথা বলল?

মানুষ কখনো খাটের তলায় যায় না, এটি মিথ্যা কথা।

মিথ্যা কথা বললে সেটা হাস্যকর হবে কেন?

কারণ মানুষদের নীতিজ্ঞান খুব কম। তারা মিথ্যাচার করে আনন্দ পায়।

টুকি রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, সাত বছর বিশ্লেষণ করে এইটা আবিষ্কার করলে?

হাসি বলল, কেন ভুল হয়েছে?

টুকি কোনো কথা না বলে মেঝেতে পা দাপিয়ে ঘরের অন্য পাশে চলে গেল। হাসা ঝাকে জিজ্ঞেস করল, এইটা কি হাস্যকর? আমরা কি এখন হাসব?

ঝা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ইচ্ছে হলে হাস।

হাসা এবং হাসি একসাথে কাঠ কাঠ স্বরে উচ্চারণ করল 'হা হা হা হা' এবং সেটা শুনে আবার টুকি এবং ঝায়ের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

পরবর্তী দিনগুলো টুকি অমানুষিক পরিশ্রম করে রবোট দুটিকে হাস্যকৌতুকের মর্মকথা বোঝানোর চেষ্টা করে। যখন সে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল রবোটেরা ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে তখন সে তাদেরকে একটা কৌতুক শোনাল। কৌতুকটা এ রকম :

বায়োলজি শিক্ষক একটা কাবাব চিমটা দিয়ে ধরে বলল, এই যে ব্যাংটা দেখছ এটা এখন আমরা কাটব।

ছাত্রছাত্রীরা বলল, স্যার, এটা তো ব্যাং নয়, এটা কাবাব।

স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে আমি নাশতা করলাম কী খেয়ে?

কৌতুকটা শুনে হাসা এবং হাসি হা হা করে হেসে ওঠে এবং সেটা দেখে টুকি বেশ উৎসাহ অনুভব করল। জিজ্ঞেস করল, বল দেখি কোন জায়গাটা হাসির?

হাসা বলল, খুব সহজ। যখন শিক্ষক বলল, তাহলে আমি কী খেয়ে নাশতা করলাম?

টুকির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, ঠিক ধরেছ। হাসি তুমি এখন বল, কেন এই কথাটা হাসির।

কারণ শিক্ষক দুইটা কাবাব এনেছিল। একটা দিয়ে নাশতা করেছে আর দু নম্বরটা চিমটা ধরে ছাত্রছাত্রীদেরকে দেখিয়েছে।

টুকির চোয়াল ঝুলে পড়ল। কোনোমতে বলল, আর ব্যাংটা?

সেটা লাফ দিয়ে জানালা দিয়ে বের হয়ে গেছে। হা হা হা।

টুকি এবং ঝা খুব মনমরা হয়ে এ বেলা কাটিয়ে দিল। সময় শেষ হয়ে আসছে, যদি তারা রবোটগুলোকে হাস্যকৌতুক শেখাতে না পারে আক্ষরিক অর্থেই তাদের মাথা কাটা যাবে।

পরের তিন দিন টুকি আবার খাওয়া ঘুম ছেড়ে রবোটগুলোর পিছনে লেগে রইল। ঝা-ও সাহায্য করতে চাইছিল কিন্তু টুকি ঝাকে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না বলে কাছে ঘেঁষতে দিল না। মানুষ কেন হাসে, কেন হাসা উচিত, কোথায় কোথায় হাসা যায় এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলল, উদাহরণ দিল, নিজে নেচে কুঁদে অভিনয় করে দেখাল এবং সবশেষ করে আবার তাদেরকে একটা কৌতুক শোনাল। এবারের কৌতুকটা এ রকম :

একজন এক পায়ে লাল অন্য পায়ে সবুজ মোজা পরে এসেছে। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কী হল, দুই পায়ে দুরকম মোজা কেন?

কী করব বল। বাসায় আরো একজোড়া মোজা আছে সেটাও এ রকম।

কৌতুকটা শুনে রবোট দুটি অনেক জোরে জোরে হাসতে শুরু করল। টুকি একটু আশান্বিত হয়ে বলল, বল দেখি এই কৌতুকটা কেন হাসির?

হাসা বলল, এটা বলা তো খুবই সোজা। মানুষটার বোকামি নিয়ে হাসা হচ্ছে।

টুকি হাতে কিল দিয়ে বলল, ঠিক বলেছ। এবারে বল দেখি বোকামিটা কী?

মানুষটার বুদ্ধি কম। বাজারে গিয়ে প্রত্যেকবারই দুই রঙের দুইটা মোজা কিনে ফেলে।

টুকি আবার তার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার এতদিনের পরিশ্রম পুরোটাই বৃথা গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর মাত্র একটি দিন বাকি, গত ছয় দিনে যাকে এতটুকু শেখানো যায় নি, সে বাকি এক দিনে পুরোটুকু শিখে নেবে এটা আশা করা ঠিক নয়। টুকি তবু আশা ছাড়ল না, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে সে রবোট দুটির পিছনে লেগে রইল, তাদের সে হাস্যকৌতুকের মর্মকথা বুঝিয়েই ছাড়বে। একটানা আঠার ঘণ্টা পরিশ্রম করে সে হাসা এবং হাসিকে জিজ্ঞেস করল, এখন বুঝতে পেরেছ?

রবোট দুটি মাথা নাড়ল। বলল, পেরেছি। একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'চমৎকার!' টুকি আশা নিয়ে বলল, এবারে তাহলে পরীক্ষা করা যাক। একটা কৌতুক বলি : একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কুকুরটা নাকি এত বুদ্ধিমান যে তোমাদের সাথে তাস খেলে! মানুষটা উত্তর দিল, বুদ্ধিমান না কচু! হাতে টেক্কা পড়লেই খুশিতে লেজ নাড়তে থাকে আর আমরা বুঝে ফেলি কী পেয়েছে!

হাসা এবং হাসি জোরে জোরে হাসতে শুরু করল। টুকি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এবার বল তো, কেন এটা হাসির?

খুবই সহজ। মানুষ ভাবছে কুকুরটা বুদ্ধিমান, আসলে নেহাতই বোকা! টেক্কা পেলেই লেজ নাড়ানো ঠিক নয়।

টুকি ফ্যাকাশে মুখে বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাদের জীবন এখানেই শেষ ঝা। এক সপ্তাহ চেষ্টা করে কোনো লাভ হল না। গবেট রবোটগুলো গবেটই রয়ে গেল।

ঝা বলল, আমি একটু চেষ্টা করে দেখব?

দেখতে চাইলে দেখ, কী লাভ হবে আমি জানি না।

ঝা হাসা এবং হাসির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে হাসির জিনিসগুলো কী জান?

হাসা এবং হাসি দ্বিধান্বিতভাবে বলল, জানি না।

ঝা এক গাল হেসে বলল, ঠিক বলেছ, আসলে কেউই জানে না। তাই কী করতে হয় জান?

কী?

যেটা দেখবে সেটা দেখেই হাসবে। একজন মানুষকে যদি দেখ মোটা, হি হি করে হেসে বলবে মানুষটা কী মোটা! যদি দেখ শুকনো তাহলে হি হি করে হেসে বলবে, মানুষটা কী রোগা! রাগী মানুষকে দেখে হাসবে কারণ সে রাগী, হাসিখুশি মানুষকে দেখে হাসবে কারণ সে হাসিখুশি!

সত্যি?

এক শ ভাগ সত্যি। এন্ড্রোমিডার কসম। হি হি হি করে হাসবে, হা হা হা করে হাসবে, হো হো হো করে হাসবে, খিক খিক খিক করে হাসবে, খক খক খক করে হাসবে, খিল খিল খিল করে হাসবে— হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাবে।

এমনিতেই? কোনো কারণ ছাড়া?

হ্যাঁ। এমনিতেই। কোনো কারণ ছাড়া।

AMARBOI.COM

সত্যি?

সত্যি। হাসি পেলেও হাসবে, হাসি না পেলেও হাসবে। হাসির মতো ভালো জিনিস এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই। কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দিয়ে নেবে না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গুরুতর কিছু নেই, সবকিছু নিয়ে হাসা যায়। যে যত বেশি হাসে তার তত আনন্দ! নাও শুরু কর।

হাসা এবং হাসি হাসতে শুরু করল, প্রথমে টুকির শুকনো শরীর দেখে হাসল, তারপর তার গোমড়া মুখ দেখে হাসল, ঝাকে দেখে হাসল—তার বিশাল শরীর দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ঠিক তখন দরজা খুলে গেল, বুদ্ধিজীবী রবোটগুলো হাস্যকৌতুকের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে দেখতে এসেছে। বিশাল মাথা এবং লিকলিকে শরীর নিয়ে কোনোমতে টাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধিজীবী রবোটদের দেখে হাসা এবং হাসি অট্টহাসি দিতে শুরু করে, একে অন্যকে ধরে তারা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। তারা একে অন্যকে দেখে হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে তারা কাশতে থাকে, এবং কাশতে কাশতে তাদের চোখে পানি এসে যায়।

বুদ্ধিজীবী রবোট খানিকক্ষণ অবাক হয়ে হাসা এবং হাসির দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, আমরা গত দুই শতাব্দী চেষ্টা করে যেটা করতে পারি নি আপনারা এক সপ্তাহে সেটা করে ফেলেছেন। আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

টুকি এতক্ষণে নিজেকে সামলে ফেলেছে, একগাল হেসে বলল, এটা কোনো ব্যাপারই নয়। এর থেকে হাজার গুণ কঠিন কাজ আমরা করতে পারি।

বুদ্ধিজীবী রবোট কোনোমতে নিজের টাল সামলে রেখে বলল, এ ব্যাপারে আমাদের এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঝা ইতস্তত করে বলল, আমরা কি এখন আমাদের মহাকাশযানে ফিরে যেতে পারি?

অবশ্যি। অবশ্যি ফিরে যেতে পারেন। আমরা রবোটেরা যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে খল, ফন্দিবাজ, অসৎ, বদমাইশ এবং ধুরন্ধর মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব তখন কৃতজ্ঞতার সাথে আপনাদের স্মরণ করা হবে।

টুকি মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল, শুনে খুব খুশি হলাম।

রবোটদের নেতা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে নি, এবারে এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া যেন আরো আনন্দময় হয় সে জন্যে আমরা একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

টুকি শুকনো মুখে বলল, কী ব্যবস্থা?

আপনারা মাত্র দুজন মানুষ, তৃতীয়জন রবোট। আপনাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে আপনাদের রবোট রোবির আপনাদের মতোই রাগ দুঃখ আনন্দ ঘৃণা এ রকম অনুভূতি থাকুক।

টুকি বিস্ফারিত চোখে রবোটটির দিকে তাকাল। সেটি গলায় এক ধরনের আনন্দের ভাব ফুটিয়ে বলল, রোবির ভিতরে আমরা আমাদের বিভিন্ন অনুভূতির ল্যাবরেটরি থেকে অনুভূতিগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছি।

কী— কী— কী বললে?

হ্যাঁ। এখন তোমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ হবে আনন্দময়। রোবি এখন আর শুধু যন্ত্র নয়। সে অনুভূতিপ্রবণ একটি সত্তা। শুধু একটি জিনিস খেয়াল রেখো।

কী জিনিস?

কখনো যেন রোবিকে রাগিয়ে দিও না। জানই তো রবোট রেগে গেলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়।

টুকি এবং ঝা শুকনো মুখে মাথা নাড়ল। ঝা বিড়বিড় করে বলল, না, ভয় নেই। আমরা রোবিকে রাগাব না। কখনোই রাগাব না।

৮

জানালার কাছে বসে টুকি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে রোবি বসেছিল, সে বিরক্ত ভঙ্গি করে ঘুরে টুকির দিকে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, কী হল? এ রকম লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছ কেন? মহাকাশযানের ভিতরে ভালো লাগছে না?

টুকি সাথে সাথে বিগলিত ভঙ্গি করে বলল, না, না, কী যে বল। চমৎকার লাগছে আমাদের। চমৎকার লাগছে।

ঝা–ও যন্ত্রের মতো মাথা নেড়ে বলল, চমৎকার লাগছে।

রোবি গলার স্বরে অধৈর্যের ভাব ফুটিয়ে বলল, দিনরাত দেখি ভ্যাবলার মতো বসে আছ। একটু কাজকর্ম করতে পার না?

সাথে সাথে টুকি এবং ঝা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, অবশ্যই করতে পারি। কী করতে হবে বল?

মহাকাশযানটা যে একটা আঁস্তাকুড় হয়ে আছে খেয়াল করেছ? এটা একটু পরিষ্কার করা যায় না?

টুকি এবং ঝা সাথে সাথে মহাকাশযানটিকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করার কাজে লেগে যায়। রবোটদের গ্রহে রোবির কপোট্রনে নানারকম অনুভূতি জুড়ে দেবার পর রোবির বড় পরিবর্তন হয়েছে। বেশিরভাগ সময় সে তিরিক্ষি মেজাজে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে তার মন খারাপ হয়ে যায় তখন কয়েক ঘণ্টা উচ্চৈঃস্বরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে। তার কাছে তখন যাওয়া যায় না। কারণ সে যেভাবে হাতপা ছুড়তে থাকে যে ধারেকাছে গিয়ে বেকায়দা লেগে গেলে কম্পাউন্ড ফ্যাকচার হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। টুকি এবং ঝায়ের কোনো কোনো কাজকর্ম দেখে হঠাৎ হঠাৎ রোবির মাঝে প্রবল ঘৃণাবোধ জেগে ওঠে, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে টুকি ঝা এবং সমস্ত মনুষ্যজাতিকে গালিগালাজ করতে থাকে। কখনো কখনো তার মনে আনন্দের ভাব এসে যায়, সেটি আরো বিপজ্জনক—তখন সে টুকি এবং ঝাকে ধরে নাচানাচি করার চেষ্টা করতে থাকে। টুকি কিংবা ঝা দুজনেরই মধ্যবয়স, নাচানাচি করার সময় অনেক দিন হল চলে গিয়েছে, চেষ্টা করে তাদের বিশেষ বিড়ম্বনা হয়। সব মিলিয়ে বলা যায় তাদের জীবন এই মহাকাশযানে বিষময় হয়ে আছে। কবে আরো তিন সপ্তাহ পার হবে, তারা ছোট নক্ষত্রটির পাশে পৌঁছে হাইপার ডাইভ দিয়ে পৃথিবীর দিকে রওনা দেবে সেই আশায় হাঁ করে বসে আছে।

কিন্তু তার আগেই তাদের গতিপথে একটা ছোট গ্রহ পাওয়া গেল। রোবি গ্রহটাকে একপাক ঘুরে এসে বলল, এইখানে নামা যাক।

টুকি ভয়ে ভয়ে বলল, নামার দরকারটা কী? কে না কে আছে আবার নূতন কোন ঝামেলায় পড়ে যাব।

রোবি গলার স্বরে বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, এখানে কেউ নেই।

AMARBOI.COM

কেমন করে জান?

কারণ মানুষ রবোট যাই থাকুক তাদের জন্যে শক্তির দরকার। শক্তি খরচ হলে বায়ুমণ্ডলে তার চিহ্ন থাকে—রেডিয়েশান হিসেবে, বাড়তি কার্বন ডাই-অক্সাইড, ওজোন লেয়ার বা অন্য কোনোভাবে। এখানে সেরকম কিছু নেই।

ঝা বলল, কিন্তু গ্রহটা ফাঁকা বলেই কি নামতে হবে? সব কয়টা ফাঁকা গ্রহে যদি নামতে নামতে যাই তাহলে তো এক শ বছর লেগে যাবে—

রোবি একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর বেকুব কোথাকার। আমরা কি মশকরা করার জন্যে নামছি? হাইপার ডাইভ দেবার আগে বড় ইঞ্জিনটা সার্ভিস করতে হবে, সে জন্যে নামছি।

ঝা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, অবিশ্যি অবিশ্যি।

ফাঁকা গ্রহটিতে মহাকাশযানটি মোটামুটি নিরাপদভাবে নামল। রোবির কথা সত্যি, ধু-ধু প্রান্তর, কোথাও জনমানব সভ্যতার চিহ্ন নেই। লাল রঙের পাথর ছড়ানো, দেখে কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যায়।

রোবি যখন মহাকাশযানের বড় ইঞ্জিনটা খুলে আবার লাগানো শুরু করেছে তখন টুকি আর ঝা হাঁটতে বের হল। গ্রহটিতে খুব হালকা একটা বাতাসের স্তর রয়েছে, নিশ্বাস নেবার জন্যে তাদের আলাদা মাস্ক পরে নিতে হল। গ্রহটা জনমানবহীন মনে হচ্ছে সত্যি কিন্তু যদি কোনো বিপদ আপদ ঘটে যায় সেজন্যে সাথে নিল দুটি শক্তিশালী লেজার গান, সহজে চলাফেরা করার জন্যে পিঠে রাখল শক্তিশালী জেট প্যাক।

দুজনে লাল পাথরের প্রায় মরুভূমি এলাকায় হাঁটতে থাকে, সামনে একটা বড় পাথরের স্তর, সেটা পার হয়ে অন্য পাশে এসে তারা বিচিত্র কিছু গাছগাছালি আবিষ্কার করল। টুকি গাছগুলো পরীক্ষা করে নিচু গলায় বলল, এই গ্রহে যদি গাছগাছালি থাকে তাহলে অন্য প্রাণীও থাকতে পারে।

হ্যাঁ! ঝা ভয়ে ভয়ে বলল, চল ফিরে যাই।

চল।

দুজনে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে, কয়েক পা এগিয়েই টুকি দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, ঝা—

কী হল?

মনে হচ্ছে আমাদের কেউ অনুসরণ করছে।

ঝা শুকনো গলায় বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। দৌড় দেব নাকি?

দৌড় দেবে কেন? আমাদের জেট প্যাক আছে না? সুইচ টিপলেই আকাশে উড়ে যাব। ভয়ের কিছু নেই।

লেজার গানটা বের করে রাখব?

হ্যাঁ! বিপদ দেখলেই গুলি, মনে থাকবে তো?

টুকির কথা শেষ হবার আগেই বিপদ যেন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হঠাৎ করে চারদিক থেকে হইহই করে অসংখ্য মানুষ তাদের দিকে ছুটে আসে। টুকি এবং ঝা লেজার গান উদ্যত করে গুলি করার জন্যে ট্রিগারে হাত দিয়েও তারা হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল, কারণ যারা হইহই করে তাদের দিকে ছুটে আসছে সবাই মেয়ে, স্বল্পবসনা এবং অনিন্দ্যসুন্দরী। পুরুষমানুষ হয়ে এ রকম সুন্দরী মেয়েদেরকে আর যাই করা যাক গুলি করা যায় না।

কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই মেয়েগুলো টুকি এবং ঝাকে ঘিরে ফেলল। নীল চোখ এবং সোনালি চুলের একটি মেয়ে যার শরীর এত সুগঠিত যে একবার চোখ পড়লে চোখ ফেরানো যায় না—সবার আগে কথা বলল, ভাষাটি টুকি এবং ঝায়ের ভাষা থেকে খানিকটা ভিন্ন কিন্তু তবু বুঝতে অসুবিধে হল না। মেয়েটি বলল, হায় ঈশ্বর! এ তো দেখছি পুরুষমানুষ!

কালো চুলের একটি মেয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, কী রকম পরিবারের মানুষ যে পুরুষদের একা একা বের হতে দিয়েছে?

নীল চোখের সোনালি চুলের মেয়েটি বলল, থাক, থাক, কিছু বলে কাজ নেই, ভয় পেতে পারে।

টুকি এবং ঝা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, হাতের অস্ত্রটা নামিয়ে রেখে হাসার চেষ্টা করে বলল, তোমাদের অভিনন্দন।

সাথে সাথে সব কয়জন মেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হবার মতো একটা শব্দ করল। কমবয়সী একটা মেয়ে নিজের চোখ ঢাকতে ঢাকতে বলল, কী রকম বেশরম দেখেছ? আমাদের সাথে কথা বলছে!

পোশাকটা দেখেছ? সারা শরীর দেখা যাচ্ছে, লজ্জায় মরে যাই!

টুকি এবং ঝা এবারে খানিকটা হতচকিত হয়ে গেল, তাদের পুরুষ হওয়া নিয়ে এখানে কোনো একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। টুকি আবার চেষ্টা করল, বলল, তোমাদের সবার জন্যে অভিবাদন। শুভ সকাল কিংবা বিকাল যেটাই এখন হয়ে আছে।

মেয়েগুলো আবার একটা বিস্ময়ধ্বনি করে একটু পিছিয়ে গেল। কমবয়সী আরেকটা মেয়ে একটু বিচলিত হয়ে নীল চোখের মেয়েটিকে বলল, টাইরা, কিছু একটা কর, লজ্জায় মারা যাচ্ছি।

টাইরা পিছনে ফিরে বলল, দুইটা চাদর দাও।

পিছনের মেয়েরা দুটি উজ্জ্বল রঙের চাদর এগিয়ে দিল। টাইরা চাদরগুলো সাবধানে টুকি এবং ঝায়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, ভালো করে শরীরটাকে ঢেকে নাও। পুরুষমানুষের শরীর দেখানো খুব লজ্জার ব্যাপার।

টুকি এবং ঝা কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এখন সেটা নিয়ে তর্ক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হল না। তারা উজ্জ্বল রঙের কাপড় দুটি দিয়ে নিজেদের ভালো করে ঢেকে নিল। নিজেদেরকে হঠাৎ তাদের বোকার মতো মনে হতে থাকে। টুকি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

টাইরা টুকিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল, পুরুষেরা কখনো অপরিচিত মেয়েদের সাথে কথা বলে না। সেটা ভারি লজ্জার ব্যাপার।

ঝা ঢোক গিলে বলল, তাহলে পুরুষেরা কার সাথে কথা বলে?

অন্য পুরুষের সাথে। তাদের ঘরের বাইরে যাবার কথা নয়। পুরুষদের সব সময় মেয়েদের সামনে পরদা করার কথা।

টুকি এবং ঝা একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, হঠাৎ করে তাদের কাছে অনেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায়। মানুষের একটা বিচ্ছিন্ন সমাজ এখানে গড়ে উঠেছে যেখানে মেয়েরা ঘরের বাইরে থাকে আর পুরুষেরা অন্তঃপুরে বন্দি।

টুকি এবং ঝা ইচ্ছে করলে তাদের জেট প্যাক ব্যবহার করে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারত কিন্তু যেহেতু পরিবেশটা সেরকম বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না, তারা ব্যাপারটা আরো একটু যাচাই করে দেখতে চাইল।

মেয়েদের দলটি তাদেরকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিতে থাকে। বয়স্ক মানুষেরা যেভাবে শিশুদের সাথে ব্যবহার করে, মেয়েরা তাদের সাথে ঠিক সেরকম ব্যবহার করছিল। এই সমাজে পুরুষমানুষেরা নিশ্চয়ই খুব কোমল প্রকৃতির।

হেঁটে হেঁটে তারা একটা লোকালয়ের কাছে পৌঁছাতেই অনেকে তাদের দিকে ছুটে এল, সবাই মেয়ে। কেউ বালিকা, কেউ কিশোরী, কেউ তরুণী, কেউ যুবতী, কেউ কেউ মধ্যবয়স্কা। সবাই কৌতূহলী চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিশোরী এবং বখে যাওয়া কিছু তরুণী শিস দিয়ে টুকি এবং ঝায়ের কাপড় ধরে টান দেয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু টাইরার প্রচণ্ড ধমক খেয়ে তারা পালিয়ে গেল। টুকি এবং ঝা হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করে রাস্তার দুপাশে পাথরের ঘরের ভিতরে জানালার ফাঁক দিয়ে ঘোমটায় ঢাকা পুরুষমানুষেরা উঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে।

মেয়েদের দলটি টুকি এবং ঝাকে নিয়ে একটা বড় বাসার সামনে হাজির হল। বাসাটি সম্ভবত টাইরার, কারণ অন্য সব মেয়েরা বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল, শুধু টাইরা টুকি এবং ঝাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। সাথে সাথে ভিতর থেকে সুদর্শন কোমল চেহারার একজন পুরুষমানুষ টাইরার দিকে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওগো সোনামণি, তুমি ফিরে এসেছ?

টাইরা মাথা নাড়ল, পুরুষমানুষটি নিশ্চয়ই টাইরার স্বামী, সে আদুরে বেড়ালের মতো ভঙ্গি করে বলল, টাইরা, সোনামণি আমার, পথে কোনো কষ্ট হয় নি তো?

না।

তোমায় এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় এনে দিই?

না, লাগবে না। তুমি বরং এই দুজন পুরুষমানুষকে দেখ।

টাইরার স্বামী, কোমল চেহারার পুরুষটি এবারে টাইরাকে ছেড়ে দিয়ে টুকি এবং ঝায়ের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, এরা কারা?

লাল পাহাড়ের কাছে পেয়েছি। একেবারে বেপরদা হয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল।

টাইরার স্বামী লজ্জায় জিভে কামড় দিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

হ্যাঁ! অত্যন্ত বেশরম মানুষ—নিজে থেকে আমাদের সাথে কথা বলছিল।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

তুমি তাদের সাথে একটু কথা বলে দেখ, ব্যাপারটা কী। কোথা থেকে এসেছে, কী সমাচার। না জানি বেচারার স্ত্রীরা এখন কোথায় কী দুশ্চিন্তা করছে।

টাইরার স্বামী মুখে একটা কপট রাগের ভান করে বলল, আমি বুঝতে পারি না কী রকম মেয়েমানুষ তাদের স্বামীদের এ রকম একলা ছেড়ে দেয়। যদি কিছু একটা হত? যদি তোমাদের সামনে না পড়ে কোনো খারাপ মেয়েদের সামনে পড়ত?

টুকি এবং ঝা দেখল টাইরার কোমল চেহারার সুদর্শন স্বামী ব্যাপারটা চিন্তা করে আতঙ্কে কেমন জানি শিউরে ওঠে।

টাইরা চলে যাবার পর টুকি এবং ঝা তাদের সারা শরীরে ঢাকা চাদরগুলো খুলে রাখল। টাইরার স্বামী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কারা ভাই? একা একা কী করছ? তোমাদের স্ত্রীরা কই? তোমাদের একা ছেড়ে দিল কেমন করে?

টুকি মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের স্ত্রী নেই।

মানুষটার মুখে হঠাৎ সমবেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে, আহা। বিয়ে হয় নি এখনো? কোনো মেয়ে পছন্দ করল না?

AMARBOI.COM

না, মানে—

মেয়েদের মন জয় করতে হলে একটু চেষ্টা করতে হয়। সেজেগুজে থাকতে হয়, দাড়ি কামিয়ে চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে শরীরে পারফিউম দিয়ে সুন্দর কাপড় পরতে হয়। তোমাদের যেরকম রুক্ষ চেহারা, সাথে যেভাবে বেশরম কাপড় পরেছ, কোনো ভদ্র পরিবারের মেয়ে তোমাদের পছন্দ করবে ভেবেছ?

টুকি বলল, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানকার নিয়মকানুন অন্যরকম।

কোথা থেকে এসেছ তোমরা?

অন্য একটা গ্রহ থেকে। এটা যেরকম এম. সেভিন্টি ওয়ান—

টাইরার স্বামী বাধা দিয়ে বলল, থাক থাক আর বলতে হবে না। আমি ওসব বুঝি না। আমরা পুরুষমানুষেরা ঘর সংসার করি, বড় বড় জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শুনে কী করব?

টুকি ভুরু কুঁচকে বলল, তোমরা শুধু ঘর সংসার কর?

টাইরার স্বামী অবাক হয়ে বলল, আর কী করব? একজন পুরুষমানুষ যদি তার স্ত্রীকে খুশি রাখতে পারে তাহলে তার জীবনে আর কী চাইবার আছে? সারাদিন পরিশ্রম করে স্ত্রী ঘরে এলে তার জন্যে রান্না করে খাবার দেয়া, পোশাক ধুয়ে রাখা, বাচ্চা মানুষ করা—

টুকি এবং ঝা কেমন জানি ভয়ে ভয়ে টাইরার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক এ রকম সময় দরজা খুলে একজন তরুণ এসে ঢুকল, তার চোখে পানি টলটল করছে। টাইরার স্বামী জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার?

আমি আর বাইরে যাব না বাবা। কখনো বাইরে যাব না।

আবার বুঝি পাড়ার বখা মেয়েরা—

হ্যাঁ! আমাকে দেখে শিস দিয়ে এত খারাপ খারাপ কথা বলেছে—তরুণটা হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। মানুষটি তার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কাঁদিস নে বাবা। তোর মাকে বলব দেখি কিছু করতে পারে কি না।

ছেলেটি চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলে মানুষটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আগের যুগের সেই নিয়মনীতি আর নেই। সবার মাঝে কেমন জানি ভোগ লালসা। মাঝে মাঝে যখন বাইরে যাই বুঝতে পারি মেয়েরা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমার শরীরের দিকে। মনে হয় চোখ দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে চেটে খাচ্ছে।

মানুষটির সারা শরীর বিতৃষ্ণায় কেমন জানি শিউরে উঠল।

টুকি এবং ঝা এতক্ষণে তাদের মহাকাশযানে ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মেয়েদের এই সমাজব্যবস্থায় রাস্তাঘাটে বের হলে তাদের দেখে যে যাই মনে করুক তাদের কিছু করার নেই। জেট প্যাক ব্যবহার করে তারা আকাশে উড়ে যাবে। পুরুষদের ঘরের মাঝে আটকে রাখা তাদের কাছে যতই বিচিত্র মনে হোক এখানে এটা ঘটছে। হাজার বছর আগে পৃথিবীতে ঠিক তার উল্টো ব্যাপার ঘটেছিল, মেয়েদেরকে ঘরের মাঝে আটকে রাখা হয়েছিল।

টুকি আর ঝা টাইরার স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, তোমাদের এখানে এসে আমাদের খুব ভালো লেগেছে, এখন আমরা যাব।

টাইরার স্বামী চোখ কপালে তুলে বলল, যাবে? কোথায় যাবে?

মহাকাশযানের কথা বলে খুব একটা লাভ হবে না বলে তারা সে চেষ্টা করল না। বলল, যেখান থেকে এসেছি।

কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয় নি, বিশ্রাম হয় নি—

না হোক। আমরা ফিরে গিয়ে খাব, বিশ্রাম নেব।

কোমল চেহারার সুদর্শন মানুষটির চোখেমুখে সত্যিকার দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল, বলল, ঠিক আছে যেতে চাও যাবে তবে কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না।

মানুষটির গলার স্বরে এক ধরনের আন্তরিকতা ছিল, টুকি এবং ঝা না করতে পারল না।

খাবারের আয়োজন ছিল সহজ, কিন্তু খুব সুন্দর করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল। টুকি এবং ঝা খুব তৃপ্তি করে খেল। খাওয়া সেরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ করে টুকি এবং ঝায়ের মাথা দুলে ওঠে, কোনোমতে টেবিল ধরে নিজেদের সামলে নিল। টাইরার স্বামী বলল, তোমরা হাঁটাহাঁটি কোরো না। তোমাদের খাবারের সাথে আমি ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।

টুকি হতচকিত হয়ে বলল, কী দিয়েছ?

ঘুমের ওষুধ।

টুকি হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। সত্যি সত্যি ঘুমে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কোনোমতে কষ্ট করে চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করতে করতে বলল, কেন দিয়েছ?

একা বাইরে গিয়ে কি বিপদে পড়বে! বাইরে শুধু দুষ্ট মেয়েমানুষ আর নষ্ট মেয়েমানুষ। তোমাদের মতো সাদাসিধে পুরুষদের একা পেলে কী অবস্থা হবে জান?

টুকি আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই গভীর ঘুমে তাদের দুই চোখের পাতা জড়িয়ে এল।

AMARBOI.COM

৯

ঘুম থেকে জেগে উঠে ঝা দেখল তার পাশে একজন অপরিচিত মানুষ শুয়ে আছে। ঝা ভালো করে তাকাল এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল মানুষটি টুকি, কেউ একজন তার বিশাল গোঁফজোড়া নিখুঁতভাবে চেঁছে দিয়েছে বলে চিনতে পারছিল না। ঝা ধড়মড় করে উঠে বসল, হঠাৎ করে তার সবকিছু মনে পড়ে গেছে।

তারা ছোট একটা পাথরের ঘরে শুয়ে আছে, বুক পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা। ঝা কম্বল ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে টুকিকে একটা ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করল। টুকি বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে পাশ ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু ঝা আবার তাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল। এবারে টুকি চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, কে? কী হয়েছে?

আমি।

টুকি চোখ বড় বড় করে বলল, ঝা? তোমার এ কী অবস্থা? চুল কোথায় তোমার?

ঝা মাথায় হাত দিয়ে দেখল তার মাথা কেউ পরিষ্কার করে কামিয়ে দিয়েছে। টুকি দাঁত বের করে হেসে বলল, তোমাকে পুরোপুরি গবেটের মতো দেখাচ্ছে, মাথাটা কামিয়েছ কেন?

আমি কামাই নি। তোমার গোঁফ যে কামিয়েছে, আমার মাথাও সে কামিয়েছে।

গোঁফ? আমার গোঁফ? টুকি লাফিয়ে উঠে বসে নাকের নিচে হাত দিয়ে হঠাৎ করে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল। এই জগতে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল তার গোঁফ।

ঝা নিশ্বাস ফেলে বলল, এখান থেকে পালানোর সময় হয়েছে।

টুকি নির্জীব গলায় বলল, কিন্তু আমার গোঁফ?

গৌফ নিয়ে পরে চিন্তা কোরো। এখন ওঠ। জেট প্যাক আর লেজার প্যাক খুঁজে বের কর।

টুকি মনমরা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। তাদের ঘুমের মাঝে কেউ একজন পোশাক পাল্টিয়ে ঢলঢলে আলখাল্লার মতো কিছু একটা পরিয়ে গেছে, কাপড় জামাগুলোও এ ঘরে নেই।

ঘরের মাঝে শব্দ শুনে খুট করে দরজা খুলে গেল, টাইরার স্বামী উঁকি দিয়ে বলল, তোমরা উঠে গেছ?

টুকি কোনো কথা না বলে চোখ পাকিয়ে তাকাল, তার দৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে মানুষটি বলল, তোমাদের জন্যে ভালো খবর আছে।

আমার ভালো খবরের দরকার নেই। টুকি মেঘ গলায় বলল, আমাদের জামাকাপড় জেট প্যাক লেজার গান কোথায়? এক্ষুনি নিয়ে আস।

তোমাদের জামাকাপড় ধুয়ে দিয়েছি, যা নোংরা হয়েছিল।

জেট প্যাক আর লেজার গান?

ওই বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রগুলো? ওগুলো কি পুরুষমানুষকে মানায়? সব ফেলে দিয়েছি।

ঝা গর্জন করে বলল, ফেলে দিয়েছ?

হ্যাঁ! মানুষটা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমাদের ভালো খবর কী শুনবে না?

না। টুকি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, ভালো খবরের কোনো দরকার নেই। আমার গৌফ কেন কেটেছ?

সেটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। তোমাদের বিয়ে ঠিক করেছি।

বিয়ে ঠিক করেছ?

হ্যাঁ! তোমরা যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন তোমাদের দেখে পছন্দ করে গেছে। তবে তোমাদের মুখে নাকি বেশি চুল। তাই কেটে কিছু কামিয়ে দিয়েছি।

টুকি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তাই কেটে কমিয়ে দিয়েছ!

তোমাদের কারা পছন্দ করল শুনবে না?

টুকি রাগে ফেটে পড়ে বলল, না, আমার শোনার কোনো দরকার নাই।

ঝা নিচু গলায় বলল, একটু শুনে দেখলে হয় না?

টুকি চোখ লাল করে ঝায়ের দিকে তাকাল এবং সেই দৃষ্টির সামনে ঝা কেমন যেন মিইয়ে গেল।

টাইরার স্বামী মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, তোমাদের কোনো আপনজন নেই, অভিভাবক নেই, ভারি ভাবনা হয় আমার। সে জন্যেই তো খুঁজে পেতে দুজন মেয়ে বের করেছি। ঠিক মেয়ে নয়, মহিলাই বলা উচিত। মধ্যবয়স্কা মহিলা—খুব শক্ত ধরনের।

টুকি আবার গর্জন করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন বাইরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল। টাইরার স্বামীর চোখমুখ হঠাৎ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে, সে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বলল, আমার স্ত্রী তোমাদের যাদের সাথে বিয়ে হবে তাদের নিয়ে এসেছে। বিয়ের আগে একটু পরিচয় হওয়া ভালো। তোমরা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে নেবে?

টুকি এবং ঝা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে নেবার কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে টাইরার স্বামীকে এক রকম ঠেলে ঘর থেকে বের হয়ে এল। বাইরে দুজন মধ্যবয়স্কা মহিলা টাইরার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের চুল ছোট করে ছাঁটা, ক্রূর দৃষ্টি এবং মুখে সৈনিকসুলভ কাঠিন্য। টুকি এবং ঝাকে দেখে দুজনে কেমন যেন আঁতকে ওঠে। টুকি কঠোর গলায় বলল, এখানে

এসব কী হচ্ছে? আমাদের জিনিসপত্র কোথায়? কে তোমাদের আমাদের চুল দাড়ি গোঁফে হাত দিতে বলেছে? কত বড় সাহস আমাদের খাবারে ঘুমের ওষুধ দিয়েছ?

টাইরা অবাক হয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ! পুরুষমানুষ এভাবে কথা বলে কখনো?

টুকি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, এখন তো শুধু কথা বলছি, যখন রদ্দা লাগানো শুরু করব, তখন বুঝবে মজা—

টাইরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল। মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা তার কঠিন মুখে কুটিল একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, এক সপ্তাহের মাঝে আমি ওকে সিধে করে দেব। শুধু বিয়েটা হয়ে নিক।

ঝা টুকির হাত ধরে বলল, এখানে চেঁচামেচি করে লাভ নেই। চল আমরা যাই।

টাইরা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

এখন বাইরে যেয়ো না। আধপাগলা একটা রবোট ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথা থেকে এসেছে কে জানে, সবাইকে সমানে গালিগালাজ করে যাচ্ছে।

রোবি!

তোমরা চেন সেটাকে?

চিনি। কোনদিকে গেছে?

উত্তরে—পাহাড়ের দিকে।

টুকি ঝায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চল ঝা।

কেউ কিছু বলার আগে টুকি এবং ঝা ঘর থেকে বের হয়ে এল। তাদের পিছু পিছু মধ্যবয়স্কা মহিলা দুজন বের হয়ে বলল, সে কী! কোথায় যাচ্ছ তোমরা? তোমাদের জন্যে কত যৌতুক দিয়েছি জান?

টুকি ঝাকে বলল, পা চালিয়ে চল।

দেখা গেল মহিলা দুজন এত সহজে তাদের যৌতুক দেয়া স্বামীদের ছেড়ে দিতে রাজি না। তারা পিছু পিছু ছুটতে লাগল। ঝা পিছনে তাকিয়ে বলল, দৌড়াও।

টুকি এবং ঝা পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল, পিছু পিছু ধাওয়া করে এল দুজন কঠিন চেহারার মহিলা, তাদের পিছু পিছু মজা দেখার জন্যে আরো অসংখ্য শিশু, কিশোরী, তরুণী, মধ্যবয়স্কা মহিলা এবং বৃদ্ধা। পিছন থেকে একটা–দুইটা ঢিল এসে পড়ল তাদের গায়ে, টুকি এবং ঝা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে। চুরি করাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার জন্যে তাদের শরীরের যত্ন নিতে হয়; দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটিতে দুজনেই দক্ষ। কাজেই প্রাণপণে ছুটে সবার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া তাদের জন্যে খুব কঠিন হল না। লাল রঙের পাহাড়টায় উঠেই তারা তাদের মহাকাশযানটাকে দেখতে পায়, বাইরে রোবি দাঁড়িয়ে ছিল, টুকি এবং ঝাকে কষে বকুনি দিতে যাচ্ছিল কিন্তু পিছনে বিশাল মহিলা বাহিনী দেখে সে সুড়সুড় করে মহাকাশযানের ভিতরে ঢুকে গেল। ছুটতে ছুটতে এসে টুকি আর ঝা–ও খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে শক্ত করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণেই মহিলা বাহিনী এসে মহাকাশযানটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে।

টুকি গলা উঁচিয়ে বলল, রোবি, মহাকাশযানটা উড়িয়ে নিয়ে চল।

রোবি বলল, ঠিক আছে, যাচ্ছি। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, কিন্তু ভেবো না তোমাদের কাজকর্মের কথা আমি ভুলে গেছি—মহাকাশে নিয়ে গিয়ে তোমাদের বোঝাচ্ছি মজা।

প্রচণ্ড গর্জন করে যখন মহাকাশযানটা উপরে উঠতে থাকে ঝা তখন জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাবী স্ত্রীকে ফেলে রাখার দুঃখে, নাকি একটু পরেই রোবি তাদের যে শাস্তি দেবে সেই ভয়ে, সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

১০

মহাকাশযান ছেড়ে বাইরে দিয়ে দুদিনের জন্যে হারিয়ে গিয়ে গ্রহের মেয়েদের সাথে একটা ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়ার কারণে রোবি বাড়াবাড়ি রাগ করল। টুকি এবং ঝায়ের খাবার বন্ধ রাখল পুরো চব্বিশ ঘণ্টা এবং শাস্তি হিসেবে তাদেরকে দিয়ে মহাকাশযানের সবগুলো স্ক্রু টাইট করাল। খাটো একটা স্ক্রু, ড্রাইভার দিয়ে স্ক্রুগুলো টাইট করতে গিয়ে তাদের আঙুলের যা একটা দশা হল সেটি আর বলার মতো নয়।

মহাকাশযানে টুকি এবং ঝায়ের জীবন মোটামুটি দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল। হাবাগোবা রোবির কপোট্রনে রবোটদের নিজস্ব 'মানবিক' অনুভূতি ঢুকিয়ে দেবার পর টুকি এবং ঝায়ের এক মুহূর্তে শান্তিতে থাকার উপায় রইল না। মাঝারি নক্ষত্রটার কাছাকাছি গিয়ে হাইপার ডাইভ দিয়ে পৃথিবীতে পৌছানোর আগে তাদের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে সেরকম কোনো আশাই নেই। নক্ষত্রটিতে পৌছাতে সপ্তাহ দুয়েক লাগার কথা, এই দুই সপ্তাহ একটি ভোঁতা যন্ত্রণা হিসেবে রোবি তাদের জীবনকে বিষিয়ে রাখবে, টুকি এবং ঝা সেটা নিয়ে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাদের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। বিস্ময়গুলো হালকা বিস্ময় নয়, ভয়ঙ্কর ধরনের বিস্ময়। ব্যাপারটা শুরু হল এভাবে।

মহাকাশযানের তিন–চতুর্থাংশ স্ক্রু টাইট করার পর যখন টুকি এবং ঝা আঙুলের ব্যথায় ঘুমাতে পারছে না তখন একদিন তারা জরুরি চ্যানেলে একটা আবেদন শুনতে পেল, কাছাকাছি একটা গ্রহের কক্ষপথে একটা মহাকাশযান আটকা পড়ে আছে। মহাকাশযানে খাবার জ্বালানি শেষের দিকে। ট্রান্সমিটারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বলে সেটি দূরে খবর পাঠাতে পারছে না। কাছাকাছি একটা সাহায্যের আবেদন পাঠিয়ে যাচ্ছে। একজন বিপদগ্রস্ত মানুষ অন্য বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে পারে না, এই যুক্তিতে প্রথমে টুকি এবং ঝা ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে চলে যেতে চাইছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সেটা করতে পারল না। বিপদগ্রস্ত মহাকাশযানটিকে সাহায্য করার জন্যে তারা নিজেদের কক্ষপথ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিল।

মহাকাশযানটির কাছাকাছি এসে টুকি এবং ঝা যোগাযোগ করল, বিপদগ্রস্ত মানুষটি কাতর গলায় জানাল—তারা স্বামী স্ত্রী এবং দুটি সন্তান নিয়ে চার জন মানুষ। মহাকাশদস্যুর একটি দল তাদেরকে মুক্তিপণের জন্যে ধরে নিয়েছিল, তারা কোনোভাবে পালিয়ে এসেছে। তাদের ছোট মহাকাশযানটি এমনিতেই বিধ্বস্ত ছিল তার ওপর মাঝপথে জ্বালানি এবং খাবার দুই–ই শেষ হয়ে গেছে, এখন কোনো ধরনের খাবার এবং জ্বালানি না পেলে তারাও শেষ হয়ে যাবে।

ঘটনাটি শুনে টুকি এবং ঝায়ের মন করুণায় দ্রবীভূত হয়ে গেল এবং রোবি হাউমাউ করে মাথা কুটে কাঁদতে শুরু করল। বিপদগ্রস্ত পরিবারটিকে সাহায্য করার জন্যে একটা পরিকল্পনা করা হল। পরিকল্পনাটি এ রকম : মহাকাশযানটির কাছাকাছি গিয়ে তারা সেটাকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে এবং ঝা ছোট একটা স্কাউটশিপ নিয়ে বিধ্বস্ত

মহাকাশযানটিতে যাবে। সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তাদেরকে নিয়ে নিজেদের মহাকাশযানে ফিরে আসবে। তারপর তাদের নিজেদের গ্রহ বা আবাসস্থলে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কাউটশিপে করে ঝা বিধ্বস্ত মহাকাশযানটিতে হাজির হল। কন্ট্রোল প্যানেলে রোবি এবং টুকি তার সাথে যোগাযোগ করছিল। ঝা পেশাদার মহাকাশচারী নয় কাজেই তাকে কেমন করে ডক করতে হয়, কেমন করে লগ করে বাতাসের চাপের সমতা আনতে হয়, কেমন করে মহাকাশযানের বৃত্তাকার দরজা খুলতে হয়, সবকিছুই বলে দিতে হচ্ছিল। স্কাউটশিপের যোগাযোগ মডিউল দিয়ে টুকি এবং রোবি ঝাকে দেখতে পাচ্ছিল, তারা তাকে তার বিশাল দেহ নিয়ে মহাকাশযানের ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল, প্রায় সাথে সাথেই হঠাৎ করে ঝায়ের সাথে সমস্ত যোগাযোগ কেটে গেল। টুকি অবাক হয়ে বলল, কী হল? যোগাযোগ কেটে গেল কেন?

বুঝতে পারছি না। রোবি যোগাযোগ ফিরে পাবার জন্যে নানারকম যন্ত্রপাতি টেপাটেপি করতে থাকে কিন্তু কোনো লাভ হল না। হঠাৎ করে তারা স্কাউটশিপের ক্যামেরায় দেখতে পেল মহাকাশযানের বৃত্তাকার দরজাটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত অবস্থায় মহাকাশযানে ঝুলে থাকার কথা, সেটি গর্জন করে তার ইঞ্জিনগুলো চালু করে মহাকাশে ছুটে যেতে শুরু করে।

রোবি টুকির দিকে তাকিয়ে বলল, দেখেছ? দেখেছ?

হ্যাঁ!

ঝা গিয়ে মহাকাশযানটাকে ঠিক করে দিয়েছে। চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে! রোবি তার গলায় বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, আমি ভাবতাম ঝা গবেট ধরনের মানুষ। আসলে সে বড় মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ার।

টুকি রোবির দিকে তাকিয়ে বলল, ঝা মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ার না, এই মহাকাশযানটি আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। ঝাকে ধরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মহাকাশদস্যু হবে।

সর্বনাশ! কী করব এখন?

ওটার পিছু পিছু যেতে হবে। তাড়াতাড়ি।

রোবি তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়ে মহাকাশযানটির গতিপথ পরিবর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

১১

মহাকাশযানের গোল দরজাটা সাধারণ মানুষদের মাপে তৈরী, এর ভিতর দিয়ে বিশাল শরীরকে ঢোকাতে ঝায়ের রীতিমতো বেগ পেতে হল। বিধ্বস্ত মহাকাশযানটির ভিতরে কৃত্রিম মহাকর্ষ বল তৈরি করে রাখা ছিল বলে সে শেষ পর্যন্ত তার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল। ভিতরে অসহায় একটা পরিবার থাকার কথা কিন্তু ঝা অবাক হয়ে দেখল দুজন ষণ্ডাগোছের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে কালো এক ধরনের অস্ত্র। ঝায়ের যেটুকু ভয় পাওয়ার কথা ছিল সে তার থেকে অনেক বেশি ভয় পেল মানুষ দুজনের চেহারা দেখে, তারা দেখতে হুবহু মানুষের মতো কিন্তু যেখানে নাক থাকার কথা সেখানে নাকের বদলে একটা শুঁড়। সেই শুঁড়টি সাপের মতো কিলবিল করে নড়ছে। ঝা যখন একটা

AMARBOI.COM

বিকট চিৎকার করে পিছন দিকে লাফিয়ে সরে এল ঠিক তখন সেই মানুষ দুজনও বিকট চিৎকার করে পিছনে সরে গেল। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঝা সাহস সঞ্চয় করে বলল, তোমাদের নাকে কী হয়েছে?

মানুষ দুজন বলল, আমাদের নাকে কিছু হয় নি কিন্তু তোমার নাক এভাবে কেটেছ কেন?

কোনো কিছু বুঝতে ঝায়ের একটু সময় বেশি লাগে কিন্তু এবারে সে একবারেই বুঝে গেল যে এই মানুষ দুজনের ধারণা মানুষের নাক হাতির শুঁড়ের মতো কিলবিলে হওয়া উচিত এবং তাদের কাছে মনে হচ্ছে কোনো কারণে ঝায়ের নাক কাটা গেছে। ঝা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার নাক কাটি নাই, আমার নাক এ রকম।

মানুষ দুজন তাকে ঠিক বিশ্বাস করল বলে মনে হল না, এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা কিম্ভূতকিমাকার জন্তু। মানুষগুলো হাতের অস্ত্র তাক করে রেখে বলল, তোমার অসুবিধা হয় না?

না। হয় না। কিন্তু আমরা তো সেটা নিয়ে কথা বলতে আসি নি। এখানে একটা পরিবার থাকার কথা—মহাকাশদস্যু যাদের ধরে এনেছিল।

ষণ্ডাগোছের মানুষ দুজনের মাঝে যে বেশি লম্বা, সে তার নাক কিংবা শুঁড় যেটাই বলা হোক, নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল, মহাকাশদস্যু এখনই কাউকে ধরে নেবে।

কাকে?

তোমাকে! বলে দুজনই হা হা করে হাসতে লাগল। হাসির তালে তালে তারা তাদের লম্বা নাক উপরে তুলে নাচাতে লাগল। ঝা স্বীকার না করে পারল না যে লম্বা এবং কিলবিলে একটা নাক দিয়ে মনের ভাব অনেক জোরালোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। ঝা শুকনো মুখে বলল, আমাকে ধরে নেবে?

হ্যাঁ! এটা আসলে দস্যু-জাহাজ। আমরা বেকুব ধরনের মহাকাশচারীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় করি।

কিন্তু এখানে আমার জন্যে কেউ মুক্তিপণ দেবে না।

না দিক। তোমার মতো নাকখসা মানুষকে চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেয়া যাবে, দশটা মুক্তিপণের সমান টাকা উঠে আসবে সেখান থেকে।

কিন্তু—

কোনো কিন্তু টিন্তু নেই নাকখসা দানব, দুই হাত উপরে তুলে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়।

ঝা মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না একবার চিন্তা করল, কিন্তু কিলবিলে থলথলে নাকে ঘুসি মারার কথা চিন্তা করেই কেমন জানি গা গুলিয়ে উঠল। কাজেই কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল ঝায়ের হাত পিছন দিকে শক্ত করে বেঁধে একটা ছোট ঘরে ফেলে রাখা হয়েছে। আর বিধ্বস্ত বিধ্বস্ত দেখানো মহাকাশযানটি গর্জন করে ছুটে চলেছে কোন একটি অজানা গন্তব্যস্থলের দিকে।

কয়েকদিন পরের কথা। ঝা একটা ছোট ঘরে বসে আছে, ঘরের একদিকে স্বচ্ছ দেয়াল। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়, সবারই নাকের জায়গায় একটা শুঁড়। কারো শুঁড় লম্বা, কারো খাটো। কারো শুঁড় মোটা, কারো সরু। কারো শুঁড় তেল চিকচিকে, কারো শুঁড় খসখসে বিবর্ণ। সবার শুঁড়ই নড়ছে, দেখে মনে হয় নাকে বুঝি একটা সাপ কামড়ে ধরে

কিলবিল করছে। প্রথম প্রথম দেখে ঝায়ের শরীর গুলিয়ে আসত, আজকাল অভ্যাস হয়ে আসছে, ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী একটা ছেলে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাক নাই কেন?

ঝা কোনো উত্তর দিল না। সে এই ছোট ঘরটাতে বসে থাকে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাকে দেখতে আসে। যারা আসে তাদের অনেকেই এই প্রশ্নটা করে, এর কোনো উত্তর তার জানা নেই। যারা তাকে দেখতে এসেছে, সবাই টিকিট কিনে এসেছে। তাদের ধারণা 'নাকখসা দানব' নামের এই বিচিত্র প্রাণীটির মুখ থেকে তাদের কোনো একটা উত্তর পাওয়ার অধিকার আছে। সবাই যে একটি প্রশ্নই করে তা নয়, অনেকে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও করে থাকে। যেমন—একদিন একজন প্রশ্ন করল, আমাদের এই গ্রহে যে বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে সেটাকে পরিশোধন করার জন্যে ধীরে ধীরে আমাদের এই চমৎকার সুন্দর নাকটিকে তৈরি করা হয়েছে, এটি আসলে একটি ফিল্টার। বিষাক্ত গ্যাস ফিল্টার ছাড়া তুমি বেঁচে আছ কেমন করে?

ঝা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি এই গ্রহের মানুষ নই।

তোমার গ্রহের নাম কী? সেটি কোথায়?

ঝা তার গ্রহের নাম জানলেও সেটি কোথায় ভালো করে জানে না বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। দর্শকদের মাঝে যাদের শুঁড়ের মতো নাকটি বেশ কোমল পেলব এবং লম্বা, তারা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, সুন্দর নাকের অধিকারীরা সমাজে একটা বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। তোমার যে নাক নেই সেই জন্যে তুমি কি সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়?

ব্যবসায়ী ধরনের একজন একদিন জিজ্ঞেস করল, নাককে কোমল এবং পেলব করার বিশেষ ধরনের ক্রিম রয়েছে, নাককে লম্বা করার জন্যে বিশেষ ধরনের মালিশের তেল রয়েছে, নাককে সতেজ রাখার জন্যে বিশেষ ধরনের ওষুধ রয়েছে, এগুলো আমাদের গ্রহে বিশাল শিল্প গড়ে তুলেছে। আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রাখছে। তোমাদের গ্রহের অর্থনীতি কী রকম?

ঝা আবার নিশ্বাস ফেলল। সে একজন পেশাদার চোর, পৃথিবীর অর্থনীতি সমাজনীতি বা রাজনীতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় নি। অর্থনীতি যেরকমই হোক, চুরি করার মতো জিনিসপত্র সব সময়েই ছিল।

ষণ্ডাগোছের বদমেজাজি চেহারার একজন মানুষ একদিন ঝাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা যখন একজন আরেকজনকে গালিগালাজ করি, নাক নিয়ে অনেক কিছু বলি। যেমন—এখানকার প্রিয় গালি 'নাককাটা', তোমরা কী বলে গালি দাও?

পৃথিবীতে কী বলে একে অন্যকে গালিগালাজ করে সেটা সম্পর্কে ঝায়ের মোটামুটি ভালো ধারণা আছে কিন্তু ছোট একটা ঘরে প্রদর্শনীর বস্তু হয়ে তার সেটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে করল না। ষণ্ডাগোছের বদমেজাজি চেহারার মানুষটি মনে হল কোনো একটা উত্তর না নিয়ে যাবে না, সে আবার জিজ্ঞেস করল, কী হল? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন নাককাটা?

ঝায়ের হঠাৎ খুব মেজাজ খারাপ হল, মানুষটার দিকে তেড়ে উঠে চিৎকার করে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সবাই কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

মোটাসোটা একজন মহিলা শুঁড়ের মতো লম্বা নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কাজটা একেবারে ভালো হচ্ছে না।

আরেকজন বলল, কোন কাজটা?

এই যে একজন মানুষকে শুধুমাত্র তার শারীরিক বিকলাঙ্গতার জন্যে দশজন মানুষের কাছে দেখানো হচ্ছে।

বয়স্ক একজন মানুষ সমবেদনার ভঙ্গিতে শুঁড়টাকে একবার নাড়িয়ে নিয়ে বলল, নাক নেই বলে মানুষটার চেহারা খারাপ হতে পারে কিন্তু তাই বলে যে তার মনে দুঃখ কষ্ট নেই সেটা তো সত্যি না। ঠিক আমরা যেভাবে কাঁদি প্রায় সেভাবেই কাঁদছে, নাক নেই বলে সেটাকে ফোঁস ফোঁস করে দুলাতে পারছে না।

মোটাসোটা মহিলাটি নরম গলায় বলল, কিন্তু দেখ, চোখ থেকে ঠিকই পানি বের হচ্ছে। আহা বেচারা!

ঝায়ের ভেউ ভেউ করে কান্না দেখেই হোক আর মোটাসোটা মহিলার নরম গলার কথা শুনেই হোক, উপস্থিত দর্শকদের মাঝে হঠাৎ একটা সমবেদনার ভাব চলে এল। তাদের কেউ কেউ চিৎকার করে বলতে লাগল :

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও,
নাককাটা দানবকে ছেড়ে দাও—

হইচই চেঁচামেচি দেখে শান্তি রক্ষার রবোটগুলো এসে ভিড় জমাতে থাকে, তারা ভিড় ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু খুব সুবিধে করতে পারে না, ভিড় আরো বেড়েই যেতে থাকে। দর্শকদের বেশিরভাগই এখন ঝায়ের পক্ষে। পারলে তারা এক্ষুনি ঝাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে। উপস্থিত মানুষের সমবেদনা পেয়ে ঝায়ের মনটা আরো ভার হয়ে আসে, সে নিও পলিমারের আস্তিনে চোখ নাক মুছে কাতর চেহারা করে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল, মোটাসোটা দয়ালু চেহারার মহিলারা একত্র হয়ে তাদের শুঁড় নেড়ে নেড়ে উঁচু গলায় কথা বলছে। বাড়াবাড়ি দয়ালু একজনের চেহারায় একটু জাঁদরেল ভাব চলে এসেছে, সে হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলছে, মানুষকে ঘৃণা করতে হয় না। নাককাটা এই দানবের চেহারা যত কুশ্রীই হোক, তার থলথলে মোটা শরীর দেখে আমাদের ভিতরে যত ঘৃণাই জেগে উঠুক, আমাদের তবুও একতাবদ্ধ হয়ে এই কুৎসিত মানুষটাকে উদ্ধার করে তার আপন দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। যেভাবেই হোক—

ঝায়ের ঘরের সামনে গোলমাল আরো বাড়তে থাকে। শান্তিরক্ষা রবোট দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না বলে বেশ কিছু পুলিশ রবোট এনে নামিয়ে দেয়া হল। তারা বেশ রূঢ় ধরনের, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং থলথলে শুঁড়ের মতো নাক মুচড়ে তারা কিছুক্ষণের মাঝেই ভিড় ফাঁকা করে দিল।

পরের দুই দিন কী হল ঝা জানতে পারল না, তবে প্রত্যেকদিন তাকে দেখতে যেরকম হাজার হাজার মানুষ এসে ভিড় জমাত সেরকম কেউ ভিড় জমাল না। ঝা নিজের ঘরে বসে, ভালোমন্দ খেয়ে এবং ভিডিও স্ক্রিনে শুঁড়ের মতো লম্বা নাকের পরিচর্যার ওপরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শুনে শুনে দিন কাটিয়ে দিল। তৃতীয় দিন খুব ভোরেই তার ঘরের দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকল কয়েকজন মানুষ। তাদের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, কয়েকজন পুলিশ এবং কিছু শান্তিরক্ষাকারী রবোট, সবার পিছনে মোটাসোটা দয়ালু চেহারার কয়েকজন মহিলা। সরকারি কর্মচারীদের মাঝে যে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ সে ঝাকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেলেও মুখে ভদ্রতার একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, আমাদের বিচার বিভাগ রায় দিয়েছে তোমাকে এভাবে পরিদর্শন করানো মানবতাবিরোধী কাজ। কাজেই তোমাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে।

ঝা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ভয় পেয়ে সবাই কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ঝা কোনোমতে নিজের উচ্ছ্বাসকে সামলে নিয়ে বলল, সত্যি?

সত্যি। তোমাকে তোমার নিজের দেশে ফিরে যেতে সাহায্য করা হবে।

ঝা আনন্দে ঝলমল করে আবার একটা ছোট লাফ দিয়ে ফেলল এবং উপস্থিত সবাই আবার ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। পুলিশ রবোটটি বলল, যারা আপনাকে ধরে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মোটাসোটা দয়ালু চেহারার মহিলাটি এক পা এগিয়ে এসে বলল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি এখনো তোমাকে দেয়া হয় নি।

কী?

আমরা তোমার একটি ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম, সরকার আমাদের আবেদন রক্ষা করেছেন।

কী আবেদন?

যেহেতু তোমার নাক নেই—তোমার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত। তোমার নিজের ভিতরে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই গভীর দুঃখ রয়েছে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম সরকারি খরচে অস্ত্রোপচার করে তোমাকে একটি সত্যিকার নাক লাগিয়ে দেয়ার জন্যে। সরকার রাজি হয়েছে।

ঝায়ের চোয়াল ঝুলে পড়ল, আমতা আমতা করে বলল, কী—কী বললে? নাক লাগিয়ে দেবে—

হ্যাঁ! সত্যিকারের নাক। নরম তুলতুলে পেলব একটি নাক। ভাব বিনিময়ের সময় তুমি আমাদের মতো সেটা নাড়তে পারবে, দোলাতে পারবে।

ঝা বারকয়েক ঢোক গিলে আর্তনাদ করে বলল, লাগবে না আমার নাক। আমার যেটা আছে সেটাই ভালো।

দয়ালু চেহারার মহিলা তার পুরুষ্টু শুঁড়ের মতো নাক দুলিয়ে বলল, আমাদের ওপর অভিমান কেন করছ? তোমার ওপর যে অবিচার করা হয়েছে তার খানিকটা অন্তত আমাদের ক্ষমা করিয়ে নেবার সুযোগ করে দাও।

আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার নাক লাগবে না, লাগবে না।

উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী জিভ দিয়ে চুকচুক করে বলল, আহা বেচারা, এমনিতেই নিজের চেহারা নিয়ে নিজের ভেতরে গভীর হীনমন্যতা বোধ, তার ওপর সেটি নিয়ে এক ধরনের প্রদর্শনী—সব মিলিয়ে মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের ভিতর কীভাবে একটি রাগ পুষে রেখেছে দেখেছ?

দয়ালু চেহারার মোটাসোটা মহিলা বলল, ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। দশজনের মতো যখন তারও একটা লম্বা পেলব তুলতুলে নাক হবে সে সব দুঃখ ভুলে যাবে।

১২

ঝা অপারেশান থিয়েটারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। কিছুতেই সে তার নাকে অস্ত্রোপচার করতে দিতে রাজি হচ্ছিল না বলে তাকে তার বিছানার সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার বিশাল শক্তিশালী শরীর নিয়ে সে বিছানাসহ-ই প্রায় ওলটপালট খাচ্ছিল বলে তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে নিস্তেজ করে রাখা আছে। আধো ঘুমে তার স্নায়ু দুর্বল হয়ে আছে, তার মাঝে সে ঘোলা চোখে অস্ত্রোপচারকারী রবোট এবং ডাক্তারকে দেখার চেষ্টা করল। উপর থেকে তীব্র আলো এসে পড়ছে, তাই ভালো করে সে তাদের চেহারা দেখতে পেল না; কিন্তু যেটুকু

AMARBOI.COM

দেখতে পেল তাতে মনে হল সে এই রবোট এবং ডাক্তারকে আগে দেখেছে। কোথায় দেখেছে সে কিছুতেই মনে করতে পারল না—ঘুমের ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে, তার মস্তিষ্ক চিন্তাও করতে পারছে না। চিন্তা করতে ইচ্ছেও করছে না, পুরো ব্যাপারটা একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো। সাধারণ দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেলে সব ঝামেলা মিটে যায় এই দুঃস্বপ্ন সেরকম নয়। এটা ভেঙে যাবার পর দেখা যায় নূতন দুঃস্বপ্নের শুরু হয়েছে। গভীর হতাশার মাঝে ডুবে যেতে যেতে ঝা অপারেশান থিয়েটারে জ্ঞান হারাল।

ঝায়ের জ্ঞান হবার পর সে নিজেকে নূতন একটা ঘরে আবিষ্কার করে। চারদিকে সাদা পরদা দিয়ে ঢাকা, হাত দিয়ে নিজের নাক স্পর্শ করার চেষ্টা করে দেখল তার দুই হাত শক্ত করে বিছানার সাথে বাঁধা। ঝা খানিকক্ষণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে কোনো সুবিধে করতে না পেরে বিকট স্বরে একটা চিৎকার করল এবং সাথে সাথেই ডাক্তার নার্স এবং অস্ত্রোপচারকারী রবোট ছুটে এসে ঢুকল। নার্স নাক দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার?

ঝা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার সর্বনাশ কি হয়ে গেছে?

নার্স সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, সর্বনাশ হবে কেন? কী চমৎকার তুলতুলে কোমল একটা নাক লাগিয়েছে তোমার, নাড়াও দেখি একটু—

ঝা নাক নাড়ানোর কোনো চেষ্টা না করে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ডাক্তার এগিয়ে এসে বলল, ডেলিরিয়াম হচ্ছে মনে হয়। তুমি ঘুমের ওষুধ নিয়ে এস আমি দেখছি।

নার্স ঘর হতে বের হতেই ডাক্তার ঝায়ের কাছে এগিয়ে এসে বলল, ঝা—

ঝা নিজের নাম শুনে চমকে উঠে তাকাল। তার সামনে ডাক্তারের পোশাক পরে টুকি দাঁড়িয়ে আছে—শুধু তারও নাকের জায়গায় একটা শুঁড় ঝুলছে। ঝা আর্তনাদ করে বলল, সর্বনাশ তোমার নাকেও লাগিয়েছে?

দূর বেকুব। এটা প্লাস্টিকের শুঁড়, আঠা দিয়ে লাগানো আছে। ভিতরে ব্যাটারি পাওয়ারের যন্ত্রপাতি দিয়ে নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা।

তুমি এখানে কী করে এসেছ?

সেটা অনেক বড় ইতিহাস। এখন বলার সময় নেই। শুধু শুনে রাখ আমি আর রোবি মিলে ডাক্তার আর অস্ত্রোপচারকারী রবোট সেজে তোমার নাকে অপারেশান করেছি।

সত্যি?

ছাই অপারেশন। প্লাস্টিকের একটা নাক আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। ভিতরে নাড়াচাড়া করার যন্ত্রপাতি আছে—শুয়ে শুয়ে নাক নাড়ানো প্র্যাকটিস কর। যদি ধরা পড়ে যাই, আমার হবে জেল আর তুমি পাবে সত্যিকারের শুঁড়।

টুকির কথা শেষ হবার আগেই নার্স বড় একটা সিরিঞ্জে বেগুনি রঙের কী একটা ওষুধ নিয়ে হাজির হল। টুকি বলল, রোগী মনে হয় নিজেকে সামলে নিয়েছে। আজেবাজে কথা আর বলছে না।

সত্যি?

হ্যাঁ! টুকি ঝায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, নাড়াও দেখি তোমার নাক।

ঝা মুখে হাসি ফুটিয়ে তার নাক নাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু খুব সুবিধে করতে পারল না। নার্স সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, নার্ভগুলো এখনো জোড়া লাগে নি। একটু সময় নেবে।

ঝা মাথা নেড়ে বলল, আমার কোনো তাড়া নেই।

দুদিন পর ঝা ছাড়া পেল, তাকে বিদায় দিতে এল সরকারি কর্মচারী, পুলিশ অফিসার এবং দয়ালু চেহারার মোটাসোটা কিছু মহিলা। ঝা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্যাটারির কলকব্জা লাগানো এই নাকটিকে এর মাঝে বেশ বাগে এনেছে। উপরে তুলতে পারে, নিচে নামাতে পারে, ডানে বায়ে দোলাতেও পারে। বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্যে সে তার নাককে দোলাতেই হাসিখুশি চেহারার মোটাসোটা মহিলা খিলখিল করে হেসে বলল, তুমি সবকিছু ওলটপালট করছ।

ঝা অবাক হয়ে বলল, কী ওলটপালট?

বিদায় সম্ভাষণ একটা দুঃখের ব্যাপার। দুঃখের ব্যাপারে নাককে দোলাতে হয় না। নাককে তখন সোজা উপরে তুলে রাখতে হয়।

ঝা নাককে উপরে তুলে রাখার চেষ্টা করতে করতে আবার সবার কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। পুরো ব্যাপারটি যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভালো। তাকে নেয়ার জন্যে টুকি আর রোবি একটা ভাসমান গাড়ি নিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করছে। ভাসমান গাড়ি করে যাবে তাদের স্কাউটশিপে। সেই স্কাউটশিপে করে মূল মহাকাশযানে। সেটি এখন এই গ্রহটিকে ঘিরে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে।

যথসময়ে ঝা ভাসমান গাড়িতে গিয়ে হাজির হল। ড্রাইভারের সিটে রোবি বসে আছে, ঝাকে দেখে বলল, উঠে পড়ুন মহামান্য ঝা। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ঝা উঠে নিজের সিটে বসতে বসতে বলল, ধন্যবাদ রোবি।

আপনার সেবা করতে পেরে আমার জীবন ধন্য মহামান্য ঝা এবং মহামান্য টুকি।

ঝা নিচু গলায় টুকিকে জিজ্ঞেস করল, রোবির ভাবভঙ্গি এত নরম, ব্যাপার কী?

টুকি দাঁত বের করে হেসে বলল, তোমার নাকে অপারেশান করার জন্যে যে ডাক্তার ঠিক করা হয়েছিল তাকে যখন খুঁজে বের করেছিলাম তখন এক কাণ্ড হল।

কী কাণ্ড?

মনে আছে রোবির মেজাজের কথা?

মনে নেই আবার!

সেই মেজাজ দেখিয়ে ফেলল এক পুলিশ রবোটের সাথে, আর যায় কোথা! তক্ষুনি ধরে কপোট্রনে অস্ত্রোপচার। রাগ বদমেজাজ যা ছিল তক্ষুনি পরিষ্কার করে সেই পুলিশ রবোট টেরাবাইট ভদ্রতা আর আদব-লেহাজের সফটওয়ার ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমাদের রোবি সেই থেকে একেবারে মাটির মানুষ। তাই না রোবি?

রোবি বলল, আপনাদের সেবা করার জন্যে আমার জন্ম। এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের সেবা করতে করতে একদিন আমার কপোট্রনে শর্টসার্কিট হোক।

ঝা দাঁত বের করে হেসে বলল, চমৎকার। এই তো চাই।

ভাসমান গাড়ি স্কাউটশিপের কাছে পৌঁছে গেল। দুজনে রোবির পিছু পিছু স্কাউটশিপে ঢুকে পড়ল। স্কাউটশিপ প্রাথমিকভাবে চালু করার সময় এক ধরনের স্পেস স্যুট পরতে হয়, নাকের কাছ থেকে প্লাস্টিকের শুঁড় ঝুলছে বলে তাদের স্পেস স্যুটের হেলমেট পরতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। ঝা বলল, টান দিয়ে খুলে ফেলব নাকি এই নাক?

টুকি হা হা করে বলল, না না—এখনই না। এই এলাকা ছেড়ে পার হই আগে!

কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল টুকি এবং ঝাকে নিয়ে একটা স্কাউটশিপ মহাকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

যে নক্ষত্রের কাছে এসে তাদের হাইপার ডাইভ দেবার কথা, টুকি এবং ঝা প্রায় তার

কাছাকাছি চলে এসেছে। কয়েকদিনের মাঝেই তারা হাইপার ডাইভ দিতে পারবে। এম. সেভেন্টি ওয়ানের মানুষের কলোনির এলাকা মোটামুটি শেষ। এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু মানুষ বা রবোট থাকতে পারে কিন্তু বিপজ্জনক কিছু নেই। নানারকম যন্ত্রণার পর পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারবে বলে মনে হচ্ছে, সেটা চিন্তা করে টুকি এবং ঝা দুজনেরই মনে আনন্দের ভাব। রোবির কপোট্রনে এক টেরাবাইট ভদ্রতা এবং আদব-লেহাজের সফটওয়ার ঢুকিয়ে দেয়ার পর সে একেবারে পাল্টে গেছে। টুকি এবং ঝায়ের আরাম আয়েশের জন্যে রোবি মোটামুটিভাবে নিজের জীবনপাত করে ফেলছে। মহাকাশযানের গোপন রিজার্ভ থেকে ভালোমন্দ খাবার বের করে দুইবেলা রান্না হচ্ছে। সব মিলিয়ে মহাকাশযানে একটা স্ফূর্তি স্ফূর্তি ভাব। টুকি এবং ঝায়ের আনন্দের বড় কারণ অন্য জায়গায়—বিদ্রোহী গ্রহ থেকে তারা যে পরিমাণ হীরা তুলে এনেছে, পৃথিবীতে পৌঁছে সেটা বিক্রি করে তারা কয়েক শ বছর রাজার হালে থাকতে পারবে।

টুকি নরম একটা চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। আলস্যে চোখ আধবোজা হয়ে আছে, সে অবস্থাতেই চোখ অল্প খুলে ডাকল, রোবি।

রোবি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, প্রায় ছুটে এসে বলল, বলুন মহামান্য টুকি। আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি?

আপাতত এক গ্লাস তরল পানীয় নিয়ে এস, তারপর কিনিস্কির নবম সিম্ফোনিটা লাগিয়ে দাও।

রোবি টুকির জন্যে নবম সিম্ফোনি লাগিয়ে দিয়ে তরল পানীয় আনার জন্যে ছুটে গেল। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ঝায়ের মোটে পছন্দ নয়। বিরক্ত হয়ে বলল, দিনরাত এসব কী প্যানপ্যানানি শোন? মেজাজ গরম হয়ে যায়।

টুকি চোখ অল্প একটু খুলে বলল, না হলে করবটা কী? এই মহাকাশযানে আর কিছু করার আছে?

কথাটা সত্যি, ঝা আর কিছু বলতে পারে না। টেবিলে রাখা বড় একটা গলদা চিংড়ির কাটলেট নিয়ে চিবোতে শুরু করে। রোবি কিছুক্ষণের মাঝেই টুকির জন্যে তরল এক গ্লাস পানীয় নিয়ে আসে। টুকি সেটায় চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে আরামের এক ধরনের শব্দ করল।

রোবি কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ স্ক্রিনটা পরীক্ষা করে বলল, আমরা এখন এম. সেভেন্টি ওয়ানের মানুষের শেষ কলোনিটা পার হয়ে যাচ্ছি।

ঝা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও।

রোবি বলল, মহামান্য ঝা, মানুষের এই বসতি থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

ওসব বলে লাভ নেই। মানুষের যে-কোনো বসতি বিপজ্জনক।

রোবি মধুর গলায় বলল, কিন্তু এই বসতিটি সত্যিই শান্তিপূর্ণ বসতি। এদের মাঝে কোনোই বিপদ নেই।

টুকি চোখ খুলে বলল, কেন এই কথা বলছ?

এই বসতির মানুষ হচ্ছে সৃষ্টিজগতের মানুষদের মাঝে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ মানুষ। তারা এত শান্তিপূর্ণ মানুষ যে এদের সমাজে কোনো অস্ত্র নেই।

কোনো অস্ত্র নেই?

না।

তাহলে চোর-ডাকাতদের ধরে কেমন করে?

AMARBOI.COM

এদের সমাজে কোনো চোর-ডাকাত নেই।

টুকি সোজা হয়ে বসে বলল, চোর-ডাকাত নেই? কী বলছ তুমি?

সত্যি কথাই বলছি মহামান্য টুকি। এই দেখুন গ্যালাক্টিক এনসাইক্লোপিডিয়াতে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। এই সমাজে চোর-ডাকাত অপরাধী নেই, পুলিশ শান্তিরক্ষার মানুষও নেই।

টুকি জ্বলজ্বলে চোখে ঝায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ঝা, শুনেছ কথাটা। মানব সমাজ অথচ কোনো চোর-ডাকাত নেই। পুলিশ নেই।

ঝা একটা হাই তুলে বলল, নিচু ধরনের সমাজ। আনন্দ উত্তেজনাহীন সমাজ। খোঁজ নিয়ে দেখ সেখানে ধন-সম্পত্তিও নেই। সবাই মাদুরে শুয়ে শুয়ে ধ্যান করছে।

রোবি বলল, আমার বেয়াদবি মাফ করবেন মহামান্য ঝা, কিন্তু গ্যালাক্টিক এনসাইক্লোপিডিয়াতে লেখা রয়েছে এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদগুলো রয়েছে। অতুলনীয় ঐশ্বর্য।

এবারে ঝা-ও সোজা হয়ে বসল। টুকির দিকে তাকিয়ে বলল, শুনেছ টুকি?

শুনেছি।

কী মনে হয়?

অতুলনীয় ঐশ্বর্য অথচ চোর-ডাকাত নেই, পুলিশও নেই। মনে হচ্ছে আমাদের জন্যে কেউ একটা দাঁও মারার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ঝা দুই হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল, শুয়েবসে থেকে থেকে শরীর ম্যাদা মেরে গেছে, চল একটা দাঁও মেরে আসি।

টুকি মাথা নেড়ে বলল, যে সমাজে চোর-ডাকাত নেই তাদেরকে ডাকাতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে আসাই উচিত। না হয় তাদের জ্ঞানভাণ্ডার অপূর্ণ থেকে যাবে।

ঝা দাঁত বের করে হেসে বলল, ঠিকই বলেছ। কীভাবে করবে কাজটা?

খুব সোজা। ভারি কয়টা অস্ত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হব, কিছু সোনাদানা একত্র করে হুঙ্কার দিয়ে বলব, কেউ কাছে আসলেই গুল্লি।

ঝা একটু ইতস্তত করে বলল, কাজটা গোপনে করলে হত না?

সারা জীবন তো গোপনেই কাজ করলাম। একবার প্রকাশ্যে করে দেখি না কেমন লাগে। এই রকম সুযোগ আর কখনো পাব বলে মনে হয়?

তা ঠিক।

রোবি বেশ মনোযোগ দিয়ে দুজনের কথা শুনছিল, এবারে সুযোগ পেয়ে বলল, আপনারা এই শান্তিপূর্ণ মানব বসতির ওপরে হামলা করবেন বলে মনে হয়?

হ্যাঁ। আপত্তি আছে তোমার?

কী যে বলেন আপনারা—আমার কেন আপত্তি থাকবে? অত্যন্ত চমৎকার একটা কাজ হবে। অত্যন্ত আনন্দদায়ক কাজ।

তাহলে আর দেরি করা যায় না। যাও—স্কাউটশিপটাকে রেডি কর, কিছু ভালো ভালো অস্ত্র নিয়ে আস। ছোট মাঝারি আর লম্বা রেঞ্জের অস্ত্র।

এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল টুকি এবং ঝা রোবিকে নিয়ে ছোট একটা স্কাউটশিপে করে সোনাদানা ডাকাতি করার জন্যে উড়ে চলেছে।

গ্রহটি ছোট এবং মসৃণ। উপর দিয়ে দুবার পাক খেয়ে এসে টুকি বলল, এইটাই সেই

গ্রহ? মানুষজন কোথায়?

ভিতরে।

ভিতরে? গ্রহের ভিতরে মানুষ থাকে নাকি? মানুষ থাকবে গ্রহের উপরে।

এই গ্রহটির আকার এত ছোট যে এর কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। তাই এর বাইরে কেউ থাকতে পারে না। সবাই ভিতরে থাকে। তাছাড়া এত ছোট গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ বলতে গেলে নেই, সেজন্যে বাইরে থাকার কোনো বুদ্ধি নেই।

ঝা বিজ্ঞান বিশেষ কিছু বোঝে না, ইতস্তত করে বলল, যদি বাইরে মাধ্যাকর্ষণ না থাকে তাহলে কি ভিতরে থাকবে?

রোবি বলল, গ্রহটিকে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়, তখন সেন্ট্রিফিউগাল বলের কারণে ভিতরে এক ধরনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করা যায়।

ঝা কিছুই না বুঝে বলল, অ।

টুকি চিন্তিত মুখে বলল, কিন্তু গ্রহের ভিতরে ঢুকব কেমন করে?

নিশ্চয়ই ঢোকার একটা কিছু রাস্তা আছে। রোবি তার টেলিস্কোপিক চোখ ব্যবহার করে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়, খানিকক্ষণ এদিক সেদিক তাকিয়ে উৎফুল্ল গলায় বলল, পাওয়া গেছে। ওই যে একটা গোল গর্ত।

টুকি এবং ঝা ভালো করে তাকিয়েও কিছু খুঁজে পেল না। জিজ্ঞেস করল, কোথায়? কিছু তো দেখছি না।

আপনাদের চোখ তো ইনফ্রা–রেড দেখতে পারে না, তাই দেখছেন না। কোনো চিন্তা করবেন না, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

গ্রহের মাঝামাঝি এক জায়গায় সুড়ঙ্গের মতো একটা গর্ত নিচে নেমে গেছে, ভিতর থেকে উষ্ণ এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। ঝা মনমরা গলায় বলল, ঢোকার এই একটাই রাস্তা?

ঝা বলল, টুকি মনে আছে চুরিবিদ্যার ডিপ্লোমা কোর্সে আমাদের সবচেয়ে প্রথম কী শিখিয়েছিল?

মনে আছে। যেখানে ঢোকার এবং বের হবার রাস্তা মাত্র একটা, কখনো তার মাঝে চুরি করতে ঢুকবে না।

তাহলে ঢোকা কি উচিত হচ্ছে?

আমরা তো এখন চুরি করতে ঢুকছি না, ঢুকছি ডাকাতি করতে।

ঝা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, অ।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে টুকি এবং ঝা নিচে নামতে শুরু করে। সুড়ঙ্গের বাইরে স্কাউটশিপ নিয়ে রোবি অপেক্ষা করছে। বের হয়ে এলেই তাদের নিয়ে পালিয়ে যাবে। স্কাউটশিপের মাথায় ছোট আলো লাগানো রয়েছে। সেটা দিয়ে সামনে পথ আলোকিত করে তারা হাঁটতে থাকে। গাঢ় অন্ধকার, ছোট আলোতে সেটা দূর না হয়ে মনে হয় আরো জমাট বেঁধে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সুড়ঙ্গ যত গভীরে নামতে থাকে অন্ধকার আরো গাঢ় হতে শুরু করে। অন্ধকারে হাতড়ে আরো কিছুদূর নেমে ঝা বলল, কিছু একটা গোলমাল আছে মনে হয়। এত অন্ধকার কেন? ভুল জায়গায় চলে এসেছি নাকি?

টুকি শুকনো গলায় বলল, ভুল জায়গা না, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। দেখছ না কী মসৃণ দেয়াল, নিখুঁত সিঁড়ি। হাত ধরার রেলিং।

কিন্তু আলো নেই কেন? লোডশেডিং হচ্ছে নাকি?

কী বল বোকার মতো? লোডশেডিং কেন হবে?

অন্ধকারে যদি আছাড় খেয়ে যাই। পড়ে হাতপা ভেঙে গেলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

সাবধানে হাঁট।

সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় হারিয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মাঝে নানারকম গলিঘুঁজি, কোনটার মাঝে ঢুকবে বুঝতে না পেরে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করতে করতে এক সময় তাদের আর বোঝার কোনো উপায় রইল না তারা কোথায় আছে। ঝা ভয় পাওয়া গলায় বলল, কোথায় চলে এসেছি? এ তো দেখছি গোলকধাঁধার মতো।

টুকি বলল, চিন্তার ব্যাপার হল। আমাদের পোশাকের পাওয়ার সাপ্লাই তো শেষ হতে চলল। একটু পরে তো আলো নিভে যাবে।

সর্বনাশ। ডাকাতির কাজ নেই। চল ফিরে যাই।

চল।

টুকি এবং ঝা উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করে, ঘণ্টাখানেক হেঁটেও তারা কোনো পথ খুঁজে পেল না এবং অবস্থা আরো খারাপ করে দেবার জন্যে প্রথমে টুকির এবং তারপর ঝায়ের মাথায় লাগানো বাতি দুটি নিভে গিয়ে তারা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল।

ঝা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, সর্বনাশ!

টুকি শুকনো গলায় বলল, চিন্তার বিষয় হল।

ঠিক তখন তাদের কানের কাছে থেকে কে যেন বলল, চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই ভাই। আমরা আছি না?

ঝা ভয় পেয়ে একটা আর্তচিৎকার করে বলল, কে? কে কথা বলে?

আমরা এই গ্রহের বাসিন্দা। আমার নাম রু। তোমাদের নাম কী ভাই?

ঝা কাঁপা গলায় বলল, আমার নাম ঝা।

টুকি বলল, আমার নাম টুকি।

কী সুন্দর নাম। আহা। টুকি এবং ঝা। ঝা এবং টুকি।

টুকি এতক্ষণে একটু সাহস ফিরে পেয়েছে, সে গলা উঁচিয়ে বলল, এখানে এত অন্ধকার কেন?

এতক্ষণ যে কথা বলছিল সে হঠাৎ চুপ করে গেল। টুকি আবার বলল, কী হল? রু— কথা বলছ না কেন? এখানে এত অন্ধকার কেন?

রু নরম গলায় বলল, অন্ধকার বড় আপেক্ষিক কথা। তোমাদের জন্যে যেটা অন্ধকার আমাদের জন্যে সেটা আলো।

তার মানে কী? আর তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

আমি তোমাদের কাছেই আছি সারাক্ষণ। এতক্ষণ তোমাদের মাথার ওই বিদ্‌ঘুটে আলোর জন্যে কিছু দেখতে পারছিলাম না বলে কথাবার্তা বলি নি। এখন ওটা নিভেছে তাই দেখতে পাচ্ছি—

দেখতে পাচ্ছ? এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছ?

ওই যে বললাম ভাই, তোমাদের কাছে যেটা অন্ধকার আমাদের কাছে সেটা আলো। আমাদের চোখ হচ্ছে অবলাল সংবেদী—যার অর্থ আমরা ইনফ্রা-রেড আলো দেখতে পারি। তোমরা যেই আলো দেখতে পার আমাদের চোখের রেটিনাকে সেটা নষ্ট করে দেয়। তাই এখানে তোমাদের আলো নেই।

তার মানে তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ?

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই যে তুমি শুকনো মতো, ছোট ছোট গোঁফ। আর এই যে আরেকজন ছোটখাটো পাহাড়ের মতন, মাথায় ছোট ছোট চুল—হা হা হা। রাগ করলে না তো ভাই?

ঝা মাথা নেড়ে বলল, না, রাগ করি নাই।

তোমাদের ঘাড় থেকে কালো লম্বা মতন ওইসব কী ঝুলছে ভাই? দেখে মনে হচ্ছে অনেক ভারি?

জিনিসগুলো ছোট, মাঝারি এবং বড় রেঞ্জের অস্ত্র কিন্তু সেই কথাটা এখন বলে কেমন করে? টুকি আমতা আমতা করে বলল, ইয়ে মানে এটা হচ্ছে যাকে বলে—

যাই হোক, এটা কী সেটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন চল আমার সাথে তোমাদের নিয়ে যাই। আমাদের এই ছোট গ্রহে অতিথি খুব একটা আসে না, কেউ এলে তাই আমাদের খুব আনন্দ হয়।

ঝা কাতর গলায় বলল, কোনদিকে যাব? কিছুই তো দেখি না।

এস, আমার হাত ধর—বলে অন্ধকারে একজন তার হাত শক্ত করে ধরল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে একজন ঝায়ের হাত ধরে এগিয়ে নিতে থাকে, ঝায়ের হাত ধরে ধরে এগিয়ে আসে টুকি। কিছুক্ষণের মাঝে তারা আরো মানুষের কথাবার্তা শুনতে পায়, সবাই তাদের দেখছে কিন্তু তারা কিছু দেখছে না—ব্যাপারটা চিন্তা করেই টুকি এবং ঝায়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের সামনে এবং পিছনে আরো মানুষ একত্র হয়েছে, শব্দ-কথাবার্তা শুনে বোঝা যায়। একজন এগিয়ে এসে বলল, তোমাদের পিঠে এ ভারি বোঝা, তাই কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই। বলে কিছু বোঝার আগেই তাদের ছোট, মাঝারি এবং বড় রেঞ্জের অস্ত্রগুলো খুলে নিয়ে নিল। টুকি আমতা আমতা করে বলল, খুব সাবধান, মানে ইয়ে চাপ না পড়ে যায় তাহলে কিন্তু মানে ইয়ে—

AMARBOI.COM

কী জিনিস এটা? টেলিস্কোপ নাকি?

আরেকজন বলল, নলটা চোখে লাগিয়ে ওই ট্রিগারটা টেনে দিলে নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখা যাবে, তাই না?

টুকি হা হা করে উঠে বলল, না না না—খবরদার ওরকম কাজ কোরো না। ভুলেও ট্রিগারে হাত দেবে না।

কী হয় হাত দিলে?

টুকি উত্তর না দিয়ে আমতা আমতা করতে থাকে।

টুকি এবং ঝা হাত ধরাধরি করে জবুথবু হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, একটি বিন্দুও দেখা যাচ্ছে না। মানুষ পরিপূর্ণ অন্ধকার দেখে অভ্যস্ত নয়, সব সময়েই যত অন্ধকারই হোক একটু আলো থাকে, তার ওপর চোখের রেটিনাও কম আলোতে সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে, কাজেই কিছু-না-কিছু তারা সব সময়েই দেখতে পারে। এই প্রথম তারা একটি পুরোপুরি অন্ধকার জগতে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রাণপণে চোখ খোলা রেখেও তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না, নিকষ কালো অন্ধকারে সবকিছু ঢেকে আছে। এই অন্ধকার এত ভয়াবহ যে তাদের মনে হতে থাকে বুঝি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। ঝা টুকিকে টেনে বলল, টুকি।

কী হল?

আমাদের দাঁও মারার পরিকল্পনাটা একেবারে মাঠে মারা গেল।

তাই তো মনে হচ্ছে।

কী মনে হয়? জ্যান্ত ফিরে যেতে পারব?

অস্ত্রগুলো হাতছাড়া হয়েই তো বিপদ হল। কখন ভুল করে গুলি করে দেয়।

কী করব এখন?

করার কিছু নাই। যা করতে বলে তাই করতে হবে।

কাজেই টুকি আর ঝা ঘুটঘুটে অন্ধকারে একজন আরেকজনের হাত ধরে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হয় এই বুঝি কোনো অতল খাদে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে কিংবা অসতর্ক কোনো তরুণ মাঝারি রেঞ্জের অস্ত্র দিয়ে গুলি করে তাদের ধ্বংস করে দেবে। ঝা মনে মনে বলতে লাগল, হে ঈশ্বর, হে সৃষ্টিকর্তা—তোমার কাছে এন্ড্রোমিডার দোহাই লাগে, মিল্কিওয়ের দোহাই লাগে, এই যাত্রা আমাদের উদ্ধার করে দাও। আর কোনোদিন প্রয়োজন ছাড়া কোথাও হামলা করব না। সত্যিকারের বড় একটা দাঁও না পেলে দাঁও মারার চেষ্টা করব না। বাড়াবাড়ি লোভ করব না, অল্পতে সন্তুষ্ট থাকব—

টুকি এবং ঝাকে ধরে ধরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা ঘরে এনে হাজির করা হল। তারা কিছুই দেখছে না, শুধু শব্দ শুনে বুঝতে পারছে তাদেরকে ঘিরে অনেক মানুষ। বয়স্ক একজন বলল, ভিন দেশের অতিথি, আমাদের এই ছোট গ্রহে তোমাদের শুভ আমন্ত্রণ।

টুকি শুকনো গলায় বলল, অনেক ধন্যবাদ, তোমাদের আতিথেয়তার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ঝা সাথে সাথে মাথা নেড়ে বলল, তোমাদের দেখতে পারছি না বলে ঠিক করে কথা বলতে পারছি না।

আমরা তোমাদের গ্রহ সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। তাই ভাবলাম দেখে যাই।

ঝা যোগ করল, কিন্তু দেখতে এসে আবিষ্কার করলাম, এখানে আলো নেই তাই দেখা যায় না।

বয়স্ক মানুষটি বলল, আহা।তোমাদের কথা শুনে এত দুঃখ হচ্ছে কী বলব। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

মেয়ে গলার একজন বলল, প্রাচীনকালে যারা দেখতে পেত না তারা নাকি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখত। আমাদের এই অতিথিরা ইচ্ছা করলে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমাদের গ্রহটা দেখতে পারে।

হাত বুলিয়ে?

হ্যাঁ। তারা এত দেখতে চাচ্ছেন যখন। তাই না ভাই টুকি?

টুকি শুকনো গলায় বলল, হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।

সাথে সাথে অন্ধকারে সবাই কথা বলতে থাকে, তাদেরকে অবিশ্যি আমাদের ঘূর্ণায়মান পার্কটা দেখতে হবে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে হবে।

কিন্তু সেটা একটু বিপজ্জনক—মনে নাই বড় রোলারটা যখন ঘুরে আসে তখন সময়মতো সরে না গেলে মাথা ফেটে ঘিলু বের হয়ে যায়?

সেটা আর কঠিন কী? রোলারের শব্দ শুনেই সরে যেতে পারবে।

আর আমাদের সেন্ট্রাল অফিসঘরটা দেখতে হবে।

অবিশ্যি অবিশ্যি দেখতে হবে, মানে হাত বুলাতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক উঁচু অফিসঘর, উঠতে একেবারে জান বের হয় যাবে কিন্তু তবু জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে না গেলে হবে না।

ওঠার সময় হাত ফসকে গেলে জান শেষ হয়ে যাবে কিন্তু—

হাত ফসকাবে কেন? ভালো কাজে কেন খারাপ কথা বলছ?

আর আমাদের রিএকটরের রাস্তাটা—

হ্যাঁ। হ্যাঁ। রিএকটরের রাস্তা। রেডিয়েশান থেকে দূরে থাকতে হবে কিন্তু—

তা তো বটেই—

ঝায়ের ইচ্ছে হল সে ডাক ছেড়ে কাঁদে। কিন্তু তারা এখন যে ঝামেলায় পড়েছে ডাক ছেড়ে কেঁদে এর থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। মুখ শুকনো করে দুজন বসে রইল। গ্রহের মানুষজনেরা তাদের দুজনকে সমাদর করার নানা ধরনের আয়োজন শুরু করছিল, টুকি তার মাঝে বলল, আমাদের খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী হাতে মোটে সময় নেই।

ঝা বলল, তাছাড়া এ রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কেমন যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

বয়স্ক গলার মানুষটি বলল, কথাটি সত্যি। পুরোপুরি অন্ধকার থাকলে স্নায়ুর ওপর খুব চাপ পড়ে।

রিনরিনে গলার একজন মেয়ে বলল, কী করা যায়?

তাদেরকে দেখানোর একটা ব্যবস্থা করা যায় না?

কীভাবে দেখাবে?

মাথার পিছনে আচমকা লাঠি দিয়ে মারলে চোখের সামনে লাল নীল তারা দেখা যায়।

সত্যি?

সত্যি।

দেখব নাকি মেরে। লাঠি আছে কারো কাছে?

টুকি এবং ঝা একসাথে চিৎকার করে জানাল তাদের কিছু না দেখেই বেশ চলে যাচ্ছে।

টুকি এবং ঝায়ের কাকুতি মিনতি শুনে শেষ পর্যন্ত গ্রহের অধিবাসীরা তাদের দুজনকে যেতে দিতে রাজি হল। এখন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখার সেই বিশাল কাজটি শুরু হবে। শুকনো মুখে তারা মাত্র শুরু করেছে তখন রিনরিনে গলার একজন মেয়ে বলল, আমাদের এই গ্রহে বেড়াতে এসেছেন, তাদেরকে কি কোনো উপহার দেয়া যায় না?

একসাথে বেশ কয়েকজন বলল, সত্যিই তো!

কী উপহার দেয়া যায়?

সোনা?

হ্যাঁ। তাদেরকে দশ কেজি সোনা দেয়া যাক।

এই প্রথমবার টুকি এবং ঝায়ের বুকের মাঝে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রহটিতে একটা ডাকাতি করার। ডাকাতি করে সোনাদানা নেবার কথা ছিল, যদি এমনিতেই সেই সোনাদানা পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কী?

যখন দশ কেজি সোনা দেয়া নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তখন আরেকজন বলল, সোনার চাইতে ভালো হবে প্লাটিনাম।

সোনা ভালো না প্লাটিনাম ভালো, যখন সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন আরেকজন বলল, রুবি পাথরের কথা। অন্যান্য মূল্যবান পাথর নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। যখন

নানারকম মূল্যবান পাথর বা ধাতু নিয়ে বাদানুবাদ হতে থাকে তখন বয়স্ক ব্যক্তিটি বলল, একজনকে উপহার দিতে হলে সব সময় সবচাইতে মূল্যবান জিনিসটি উপহার দিতে হয়।

আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কী?

নানা জনে নানা কথা বলতে থাকে এবং সেই আলোচনা শুনে প্রথমবার টুকি এবং ঝা এক ধরনের আনন্দ অনুভব করতে থাকে। অস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি করে তারা যে পরিমাণ সোনাদানা নিতে পারত, এই গ্রহের মানুষগুলো উপহার হিসেবে তার চাইতে অনেক বেশি জিনিস দিয়ে দিচ্ছে। তাদের এই ভ্রমণটি শষ পর্যন্ত বৃথা হয় নি তাহলে।

ভ্রমণটি বৃথা না হলেও খুব কষ্টকর হল। ঘাড়ের মাঝে দশ কেজি উপহারের বাক্স এবং অস্ত্রগুলো নিয়ে গ্রহের বিপজ্জনক ঘূর্ণায়মান পার্কে হাত বুলিয়ে সেন্ট্রাল অফিসঘর এবং রিএকটর ভবনের রাস্তার উপর দিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত গ্রহের বাইরে স্কাউটশিপে তারা ফিরে এল তখন তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বাইরে এসে প্রথমবার আলো দেখতে পেয়ে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দীর্ঘ সময় এক বিন্দু আলো না দেখে কেন জানি তাদের মনে হচ্ছিল যে আর বুঝি কোনোদিন তারা আলো দেখতে পারবে না।

রোবি তাদের দুজনকে স্কাউটশিপে তুলে নেয়, সাথে উপহারের বাক্স এবং ভারি অস্ত্রশস্ত্র। সবকিছু তুলে নিয়ে স্কাউটশিপটা নিয়ে উড়তে শুরু করার আগে রোবি জিজ্ঞেস করল, আপনাদের ভ্রমণ কি সফল হয়েছে মহামান্য টুকি এবং ঝা?

টুকি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম সেটা সফল হয়েছে, তবে যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে হয় নি।

উদ্দেশ্য সফল হওয়াই বড় কথা। আপনারা কি সোনাদানা কিছু আনতে পেরেছেন?

ঝা উৎফুল্ল গলায় বলল, পেরেছি। দশ কেজি একটা বাক্স বোঝাই মূল্যবান জিনিস এনেছি। তারা উপহার দিয়েছে।

জিনিসটা কী?

সোনা হতে পারে, প্লাটিনাম হতে পারে, রুবি বা মুক্তো হতে পারে—ঠিক কী দিয়েছে জানি না। সবচেয়ে মূল্যবান যেটা সেটাই দিয়েছে।

রোবি গলার স্বর উঁচু করে বলল, আপনি কি বলেছেন সবচেয়ে মূল্যবান?

হ্যাঁ। সবচেয়ে মূল্যবান।

ব্যাপারটা মনে হয় ভালো হল না।

ঝা শঙ্কিত গলায় বলল, কেন?

আপনারা যখন গ্রহটিতে গিয়েছিলেন আমি তখন স্কাউটশিপে বসে এই গ্রহটি সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি। জানতে পেরেছি তাদের চোখের রেটিনা অবলাল সংবেদী। আর—

আর কী?

এই গ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে গরু নামের চতুষ্পদ এক ধরনের প্রাণীর বিষ্ঠা। এক কথায় যাকে বলে গোবর।

ঝা চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! এই জিনিস মূল্যবান হয় কেমন করে?

রোবি স্কাউটশিপের গতিবেগ এবং দিক নিশ্চিত করতে করতে বলল, এই গ্রহটিতে প্রাকৃতিক খাদ্য খুব মূল্যবান। সেখানে প্রাকৃতিক সার দেয়ার কথা। গোবর নামক এই বিশেষ জিনিসটি নাকি এক ধরনের সার—

টুকি থমথমে মুখে উঠে গিয়ে বাক্সটা খুলতে চেষ্টা করে হঠাৎ লাফিয়ে পিছনে সরে এল। রোবির আশঙ্কা সত্য। এই গ্রহ থেকে দশ কেজি ওজনের যে বাক্সটি তারা ঘাড়ে করে এনেছে,

তার ভিতরে রয়েছে দুর্গন্ধযুক্ত কালচে থিকথিকে পাঁশুটে এক ধরনের জিনিস। সেটা তারা আগে কখনো দেখে নি কিন্তু জিনিসটা কী হতে পারে সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

স্কাউটশিপ থেকে ছুড়ে ফেলা গোবরের বাক্সটি ছোট গ্রহটিকে প্রায় দুই শ বছর ধরে ঘুরপাক খাওয়ার কথা। সম্ভবত এটি মানুষের সৃষ্টি একমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহ যেটির জন্ম হয়েছে এক ধরনের ঘৃণা এবং আক্রোশের কারণে।

১৩

মহাকাশযানটি ছোট নক্ষত্রের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। নক্ষত্রটির আকর্ষণে মহাকাশযানের গতিবেগ যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, টুকি এবং ঝা সেটা গত কয়েকদিন থেকে বেশ অনুভব করতে পারছে। বিশাল মহাকাশযানটি থরথর করে কাঁপতে থাকে, মাঝে মাঝেই বিচিত্র ধরনের শব্দ করতে থাকে। মহাকাশযান থেকে বের হয়ে আসা নানা ধরনের এন্টেনাকে গুটিয়ে আনা হয়েছে। মহাকাশযানের সূচালো অগ্রভাগ তাপ নিরোধক বিশেষ আস্তরণে ঢেকে দেয়া হয়েছে। মূল ইঞ্জিনটিকে চালু করার জন্যে বড় বড় ট্যাংক থেকে জ্বালানির সরবরাহ শুরু হয়েছে। সহায়ক ইঞ্জিনগুলো এর মাঝে চালু করা হয়েছে, ভয়ঙ্কর শব্দ করে সেগুলো গর্জন করছে।

টুকি এবং ঝা বিশেষ মহাকাশচারীর পোশাক পরে তাদের জন্যে আলাদা করে রাখা চেয়ারে বসে আছে। রোবি তাদের জীবন ধারণের সহায়ক যন্ত্রপাতিগুলো তাদের পোশাকের সাথে লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তাদের শরীরে সমস্ত তথ্য মূল কম্পিউটারের ডাটাবেসে সংগ্রহিত হচ্ছে। মহাকাশযানটির ভিতরে একটা লাল আলো একটু পর পর জ্বলে উঠছে। উপরে একটা বড় ঘড়িতে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে, যে সংখ্যাটি দেখানো হচ্ছে সেটি কমতে কমতে যখন শূন্য হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে মহাকাশযানটি হাইপার ডাইভ দিয়ে বিশাল দূরত্ব পার হয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। প্রচলিত বিজ্ঞান ব্যাপারটিকে এখনো সত্যিকার অর্থে আয়ত্ত করতে পারে নি, দুর্ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। হাইপার ডাইভ দিয়ে যেখানে পৌঁছানোর কথা সেখানে না পৌঁছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও পৌঁছে যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আরো একটি ব্যাপার ঘটে যায় মাঝে মাঝে, সময় নিয়ে গোলমাল হয়ে যায়—একদিন রওনা দিয়ে আগের দিন পৌঁছে যাবার মতো।

শেষ মুহূর্তে রোবি সমস্ত মহাকাশযানে ছোটাছুটি করতে লাগল। মূল ইঞ্জিন চালু করে কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে বলল, হাইপার ডাইভের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান মহামান্য টুকি এবং মহামান্য ঝা!

টুকি এবং ঝা শক্ত করে তাদের চেয়ারের হাতল চেপে ধরল, মহাকাশযানের গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে, বড় বড় ইঞ্জিনগুলো প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করতে শুরু করেছে, মহাকাশযানটি থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে বুঝি ভেঙে পড়বে যে-কোনো মুহূর্তে। টুকি এবং ঝা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালে লাগানো বড় ঘড়িতে সংখ্যাটি কমে আসছে দ্রুত। কমতে কমতে সংখ্যাটি শূন্যে এসে স্থির হল, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল, সাথে সাথে পুরো মহাকাশযানটি দুলে উঠল একবার, টুকি এবং ঝা জ্ঞান হারাল সাথে সাথে।

টুকি এবং ঝায়ের যখন জ্ঞান হল তারা তখন সৌরজগতের মাঝে ঢুকে পড়েছে, মহাকাশযানটি মঙ্গল গ্রহের পাশে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। রোবি

কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে আছে, কোনো একটা কিছু দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে। টুকি চেয়ারের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, সবকিছু ঠিক আছে রোবি?

বুঝতে পারছি না।

কী বুঝতে পারছ না?

সৌরজগতে আমরা ঢুকে গেছি, মঙ্গল গ্রহের পাশে দিয়ে ছুটে যাচ্ছি কিন্তু তবুও হিসেব মিলছে না।

কী হিসেব মিলছে না?

গ্রহগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানে নাই।

কোথায় আছে?

অন্য জায়গায়।

ঝা শুকনো মুখে বলল, তার মানে কী?

মনে হচ্ছে সময় নিয়ে গোলমাল হয়ে গেছে। আমরা আগে চলে এসেছি।

কিসের আগে?

সময়ের আগে।

টুকি চিন্তিত মুখে বলল, পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পার না? জিজ্ঞেস করতে পার না আজকে কত তারিখ, কী বৃত্তান্ত?

সেটাই চেষ্টা করছি মহামান্য টুকি কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে—

কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে কেউ আমাদের দেখতে পারছে না। পৃথিবীর চোখে আমরা অদৃশ্য।

টুকি নিজের চেয়ার থেকে উঠে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, কী বলছ তুমি?

আপনি নিজেই দেখুন মহামান্য টুকি। আমরা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মঙ্গল গ্রহের মহাকর্ষ বলের কারণে আমাদের গতিপথ বামদিকে বেঁকে যাবার কথা কিন্তু সেটা বেঁকে যাচ্ছে না। আমরা সোজাসুজি এগিয়ে যাচ্ছি।

টুকি ব্যাপারটা বুঝতে পারল না কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করল, এ রকম হওয়ার মানে কী?

মানে আমরা এখনো প্রকৃত জগতে প্রবেশ করি নি। অতিপ্রাকৃত জগতে আছি।

প্রকৃত জগতে কখন ঢুকব?

আমি জানি না মহামান্য টুকি। এ ধরনের ব্যাপার খুব বেশি ঘটে নি। তাই কেউ ঠিক জানে না।

ঝা-ও নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এসে বলল, এখন কী হবে রোবি? আমরা কি মরে যাব?

রোবি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মরে যাওয়ার ব্যাপারটি আমি ভালো বুঝি না। তবে বাস্তব এবং অবাস্তব জগৎ বলে একটা ব্যাপার আছে। আমরা এখন অবাস্তব জগতে আছি—এক অর্থে বলতে পারেন আমরা মরে আছি।

মরে আছি? ঝা আর্তনাদ করে বলল, মরে আছি মানে আবার কী?

আমরা যদি বাস্তব জগতে ফিরে না আসি তাহলে বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

টুকি এবং ঝা মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইল। মহাকাশযানটি তীব্র গতিতে পৃথিবীর

দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই। রোবির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই অবাস্তব অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে মহাকাশযানটি পৃথিবী ভেদ করে কোনো অচেনা জগতে চলে যাবে। টুকি রোবির দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি বলছ আমরা সময়ের আগে চলে এসেছি।

মনে হচ্ছে তাই।

কত আগে?

রোবি হিসেব করে তারিখটি বলতেই ঝা চমকে উঠে বলল, অসম্ভব।

কী অসম্ভব?

ওই তারিখে আমরা পৃথিবীতে ছিলাম, চুরি করতে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল ব্যাংকে।

কিন্তু গ্রহের অবস্থান দেখুন। পৃথিবীর সাথে মঙ্গল গ্রহের আনুপাতিক অবস্থান। বুধ গ্রহ শুক্র গ্রহকে দেখুন—

রোবির কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ মহাকাশযানটি প্রচণ্ড শব্দ করে কাঁপতে শুরু করে, মনে হচ্ছে সেটি বুঝি তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। রোবি মনিটরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, বাস্তব জগতে ঢুকে যাচ্ছি—

টুকি এবং ঝা প্রচণ্ড আঘাতে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। কোনোমতে নিজেদের সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু মহাকাশযানটি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনোমতেই আর টাল সামলানো যাচ্ছে না। কন্ট্রোল প্যানেলটা ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে দেখতে পেল মহাকাশযানটির দেয়ালে দেয়ালে আগুনের শিখা জ্বলে উঠছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল তারা, তারপর হঠাৎ করে গাঢ় নিঃশব্দ অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, নাকমুখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে নিচে। টুকি চোখ খুলে তাকাল, লম্বা ঘাসের মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, পাশে ঝা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে দেখে মনে হয় বুঝি প্রাণহীন। টুকি বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ে দেখল বুক ধুকপুক করছে, মরে যায় নি তাহলে। টুকি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঝাকে ধাক্কা দিল, সাথে সাথে ঝা চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, আমরা কোথায়?

AMARBOI.COM

পৃথিবীতে। বেঁচে গেছি মনে হয়।

ঝা উঠে বসে চারদিকে তাকাল, বহুদূরে কোথায় আগুন জ্বলছে, কালো ধোঁয়া উড়ছে সেখান থেকে। অন্ধকার হয়ে আসছে, কী চমৎকার লাগছে এই পৃথিবীটা। চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কেমন করে বেঁচে গেলাম? কী হয়েছিল মহাকাশযানটিতে? রোবি কোথায়?

জানি না। টুকি মাথা নেড়ে বলল, কিছুই জানি না।

দুজনে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নিজেদের টেনে ছেঁচড়ে সামনে নিতে থাকে, ঝা বলল, একটা জিনিস জান?

কী?

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা আগে ঘটেছে।

কোন ব্যাপারটা?

এই যে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নিজেদেরকে টেনে ছেঁচড়ে নিচ্ছি সেটা। আচ্ছা আমরা হাঁটছি না, কারণ হাঁটলে পুলিশ আমাদের দেখে ফেলবে।

কিন্তু আমরা তো মহাকাশযান থেকে এসেছি। মনে নেই আমরা এম. সেভেন্টি ওয়ানে গেলাম?

টুকি ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে। মহাকাশযানের বিস্ফোরণে মাথায় চোট খেয়েছে। কী হয়েছে মনে করতে পারছে না ঠিক করে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ! মনে পড়ছে আবছা আবছা। কোথায় জানি গেলাম?

ঝা মনে করার চেষ্টা করতে করতে বলল, ঠিক ভালো করে মনে পড়ছে না এখন। একটা মহাকাশযানে উঠে পড়েছিলাম ভুলে। হীরা চুরি করে—

মনে পড়েছে। টুকি মাথা নেড়ে বলল, হীরা চুরি করে পালাবার জন্যে গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওই দেখ আগুন জ্বলছে।

হ্যাঁ! তাড়াতাড়ি সরে পড়ি এখান থেকে।

টুকি আর ঝা দ্রুত গড়াতে গড়াতে সামনে এগোতে থাকে। প্যাচপ্যাচে কাদায় গড়াতে গড়াতে সামনে আকাশের দিকে মুখ করে টুকি বলল, কী বাজে বৃষ্টি!

ঝা হাসি হাসিমুখে বলল, মৌসুমী বৃষ্টি। একেবারে সময়মতো এসেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশান একেবারে ধুয়ে নিয়ে যাবে।

টুকি রেগেমেগে বলল, তোমার বৃষ্টির চৌদ্দগুষ্টির লিভারে ক্যান্সার হোক।

ঝা মুখের হাসিকে আরো বিস্তৃত করে বলল, এত রেগে যাচ্ছ কেন? কী চমৎকার বৃষ্টি, দেখ না একবার। তিন–চার ঘণ্টার মাঝে থেমে যাবে।

তিন–চার ঘণ্টা? টুকি মুখ খিঁচিয়ে বলল, ততদিন আমরা কী করব?

ভিজব। মঙ্গল গ্রহে বৃষ্টিতে ভেজার একটা ট্যুর আছে। সাড়ে সাত শ ইউনিট দিলে দশ মিনিট ভিজতে দেয়। সিনথেটিক বৃষ্টি। আর এইটা হল একেবারে খাঁটি প্রাকৃতিক বৃষ্টি।

টুকি রেগেমেগে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। সামনে আবছা অন্ধকারে উঁচু মতন কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। উপরে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। টুকির হঠাৎ মনে হল সে আগে কোথাও ওটা দেখেছে, কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, ওটা কী—

AMARBOI.COM

(উৎসাহী পাঠকেরা ইচ্ছে করলে আবার বইয়ের গোড়া থেকে শুরু করতে পারেন!)